তত্ত্ব-কৌমুদী

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

দশম ভাগ। ১৮০৯ শক।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনুমত্যানুসারে প্রকাশিত।

কলিকাতা

১৩নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ ব্রাহ্মমিসন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও ২১১ নং
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয় হইতে প্রচারিত।

প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কলিকাতায় ২৷০ মফস্বলে ৩৲

সূচী পত্র।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।

তত্ত্ব কৌমুদী

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১০ম ভাগ।
৩য় সংখ্যা।

১লা জ্যৈষ্ঠ শনিবার, ১৮০৯ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৮।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥
মফস্বলে
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

পূজার আয়োজন

হে বাঞ্ছিত, হে প্রিয়, তুমি সৃষ্টির অন্তরালে প্রাণের আড়ালে লুকাইয়া আছ, আমার ইচ্ছা করে যে, তোমার গুপ্ত আবাসে গিয়া তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি, বিরলে তোমার সঙ্গে দুদণ্ড আলাপ করিয়া প্রাণের পিপাসা শান্ত করি। পৃথিবীর কোলাহলে বড়ই উত্যক্ত হইয়াছি, তোমাকে ছাড়িয়া লোকের ছুটা ছুটী দেখিয়া মর্ম্মবেদনা পাইয়াছি। কলরব পূর্ণ ভবের এ বাজার হইতে শান্তিরসাস্পদ তোমার আবাসে লইয়া চল, সে আশ্রমের বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিয়া আত্মা চরিতার্থ হউক, নীরব শান্তির মধ্যে তোমার সহিত মিলনের সুখ অনুভব করিয়া আমি ধন্য হই। নির্জ্জন হইলে কি নিজ মুখে পরিত্রাণের দু একটা গুপ্ত রহস্য ব্যক্ত করিবেনা? আমি তোমার মুখ হইতে, স্বকর্ণে স্বর্গের তত্ত্ব জানিতে চাহি। লোকে বলে তোমার কথা শুনা যায় না, আমি সে কথা মানি না। তোমার কথাই কথা প্রভু,—মোহন সঙ্গীত, প্রাতঃসমীরণের মধুরতা তাহার নিকট পরাস্ত; তোমাকে ছাড়িয়া যে কথা, তাহা কেবল অসার অপদার্থ শব্দ। আমার সুমতি হউক, নির্জ্জন সহবাস-লব্ধ তোমার কথামৃত আমার প্রত্যেক অস্থিতে লিখিত হউক; অমূল্য ও পরিত্রাণপ্রদ যে সুধাবাণী আমি যেন দুর্দ্দিনের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখি।

আমি কি তোমাকে বাস্তবিক চাই, যথার্থই কি তুমি আমার বিত্ত হইতে প্রিয়, পুত্র হইতে প্রিয়, আমার প্রাণ কি তোমাকে সত্য সত্যই সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিতে দিয়াছে? তবে এত নিদারুণ নির্জ্জীব শুষ্কতা কেন? কি হবে প্রভু, আমার উপায়! তুমি ভিন্ন কে আমাকে ভাল কোরে তোমাকে চাওয়াবে। ধর্ম্মরাজ্যে যাওয়া যে এত দুরূহ, তাহা কে আগে জানিত। আত্মা সদাই নিদ্রিত, সময়ে সময়ে যে জাগ্রত হই সে কেবল স্বপ্নের মত। যত পারিয়াছি, সংসারাসক্তির তুলা দিয়া আত্মার কর্ণ বন্ধ করিয়াছি, তাই এখন তোমার পরিত্রাণপ্রদ আহ্বান ও নিমন্ত্রণ শুনিতে পাইতেছি না। অপরাধের ভার ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। আপনার মুখ দেখিয়া সময়ে সময়ে আপনারই আতঙ্ক হয়? অশ্রুজল এখন আমার অন্নপান হইয়াছে। তোমার আগমনের আর কত বিলম্ব, শিশু-প্রাণ আর কত সহিবে। শীঘ্র আসিয়া দুর্দ্দিনের মেঘ দূর কর, সংসার-প্রমত্ততা ও তোমার প্রতি অনাদরের নাম ও নিশান পর্য্যন্ত চিরদিনের তরে লুপ্ত হউক।

তোমার দণ্ড কি কখন সহ্য করি নাই, পাপের যাতনাতে কি কখন দগ্ধ হই নাই, এখনও যে ক্ষতের চিহ্ন বর্ত্তমান। তবে তোমার দণ্ডের কথা ভুলিয়া যাই কেন? কি সাহসে তোমাকে অবহেলা করি; তুমি কি যে সে লোক, তোমার বিধি লঙ্ঘন করিয়া কে তোমার সাজার হাত এড়াইতে পারে? পাপী যতক্ষণ অনুতপ্ত না হয়, ততক্ষণ তুমি তাহার কাছে অশনি অপেক্ষা ভীষণ, লৌহ অপেক্ষা কঠিন। তোমাকে ভয় করিতে শিখাও। আমার এই শিক্ষা বড় আবশ্যক হইয়াছে। অমিত পরাক্রম ত্রিভুবনের রাজা, আমার এত বড় আস্পর্দ্ধা যে, তোমার ডাক শুনিয়াও আমি নিদ্রিত থাকি, তুমি উঠিতে বলিলেও আমি শুইয়া থাকি, তুমি প্রাণে প্রবেশ করিতে চাহিলেও আমি ব্যস্ত ও সময় নাই বলিয়া তোমাকে ফিরাইয়া দিতে সাহসী হই। আমি আমার সর্ব্বনাশ করিতেছি, আমার উপর যাদের ভার তাদের অনিষ্ট করিতেছি, আমার অসার জীবন তোমার জগতের কি কাজে লাগিতেছে? প্রভু আমাকে সুতীক্ষ্ণ আঘাত করিয়া বিশুদ্ধ কর। তোমার দণ্ডের ভয় যদি আমার মনে জাগরুক থাকে, তবে আমি পাপ ও আসক্তি, তোমার প্রতি অবহেলা ও আলস্য হইতে মুক্তি লাভ করিব।

প্রভাত পবন বহিতেছে, মন নিদ্রাভঙ্গ করিয়া আলস্য শয্যা হইতে গাত্রোত্থান কর। দেখ দেখি মুক্ত বাতায়নরন্ধ্র দিয়া কোন্ রবির বিমল অথচ শীতল রশ্মি-রেখা প্রাণে আসিতেছে। কার আগমনের সৌরভে তোমার দূষিত বাষ্পপূরিত হৃদয় পূর্ণ হইয়াছে। এখন আর ঘুমাইয়া থাকা সঙ্গত নহে। উঠ, তুচ্ছ পার্থিব বন্ধন ছিন্ন করিয়া উঠ, এমন রূপ দেখিবে, এমন মোহন বংশীরব প্রাণে শুনিবে যাহা

জন্মে দেখ নাই, স্বপ্নেও শুন নাই। আর সকলে উঠিয়া তোমার অনেক আগে মন্দিরে গিয়াছে, তুমি যাও নাই বলিয়া প্রভু আপনি তোমাকে লইতে আসিয়াছেন। এখন আর শয়ন করিয়া থাকা ভাল দেখায় না। এতদিন যা করেছিলে,তা করেছিলে, এখন স্বর্গীয় অতিথিকে জীবন দিয়া অভ্যাগতোচিত সৎকার কর। অতিথি অতি আদরের পাত্র, তোমার সৌভাগ্যক্রমে যদি বিশ্বের রাজা আজ তোমার দ্বারে অতিথি বেশে আসিয়াছেন, তাঁহাকে অনাদর করিও না, তিনি যে তোমার অপবিত্র হৃদয় ভিক্ষা করিতেছেন, তাঁহার ইচ্ছা অপূর্ণ করিও না।

শব্দ-নিবৃত্তি শান্তি নহে। আত্মার শান্তি অন্যপ্রকার। বাসনার কোলাহল নিবৃত্তি ও চিত্তের বিক্ষিপ্ততা বিনাশ হইলে আত্মা শান্তি লাভ করে। চিন্তা যতদিন চিন্তামনিকে না পায়, ততদিন বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত থাকে। লক্ষ্য স্থির না হইলে আত্মার বিশ্রাম অসম্ভব। শরীরের শ্রান্তি, শারীরিক ক্রিয়া নিরোধ সাপেক্ষ। আত্মার প্রকৃতি অন্যরূপ, উহার শান্তি ও উদ্যমশীলতায় প্রভেদ নাই। ঈশ্বর শান্তিনিকেতন, অথচ তাঁহার কর্ম্মের বিরাম নাই।' এই গভীর সত্য প্রকৃতরূপে যদি আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতাম, তাহা হইলে বাহিরের শব্দ নিরোধের জন্য সময় নষ্ট না করিয়া আত্মার একাগ্রতা সাধনে তৎপর হইতাম।

যখন সূর্য্যের উত্তাপে শরীর দগ্ধ হয়, তখন সে উত্তাপের অস্তিত্ব বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ থাকে না। যে জলে ভিজিতেছে, সে জলের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইতে পারে না। দুরন্ত শীতে গৃহে অগ্নি রাখিয়া, মানুষ যখন শয্যার অন্তস্তরে মুখ লুকায়,তখন তাহাকে শীতের অস্তিত্ব তর্ক করিয়া বুঝাইতে হয় না। অবিশ্বাসী প্রাণ, দেখ দেখি, স্বর্গীয় প্রভুর আবির্ভাবের আঁচ তোমার মর্ম্মে লাগিতেছে কি না, পরমাত্মার অসীমতা তোমার সসীম অস্তিত্বে ঠেকিতেছে কি না। যদি সে আঁচ লাগিয়া থাকে, সে অনন্ততা ঠেকিয়া থাকে, তাহা হইলে তোমার অবিশ্বাসের পথ রুদ্ধ হইয়াছে।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রস্তাব।

প্রাপ্য বস্তু একই।

পূজনীয় ভগবৎগীতাকার তাঁহার মহামূল্য গ্রন্থের কোন কোন স্থলে কর্ম্মযোগকে, কোন কোন স্থলে জ্ঞানযোগকে, কোন কোন স্থলে বা ভক্তিযোগকে প্রাধান্য দিয়াছেন। কোন্ বস্তুটীকে তিনি শ্রেষ্ঠ মনে করেন তাহা স্থির করা বড়ই কঠিন। ইহাকে আপাততঃ আধ্যাত্মিক অস্থিরতা ও শিথিলতার ফল বলিয়া বোধ হইতে পারে; কিন্তু আমাদের বোধ হয় ইহা আধ্যাত্মিক গভীরতারই ফল। ধর্ম্মার্থীর প্রাপ্য বস্তু প্রকৃত পক্ষে একটী মাত্র, দুটী নহে, তিনটিও নহে। কিন্তু সেই একটী বস্তরই তিনটী দিক্। যিনি বস্তুটীর একটী দিক্ মাত্র দেখেন, তিনি কেবল সেদিকটারই বিশেষ প্রশংসা করেন; যিনি অপর আর একটা দিক্ দেখেন, তিনিও তাঁহার দৃষ্ট দিক্টাকেই প্রাধান্য দেন। কিন্তু যিনি বস্তুটাকে প্রকৃতরূপে, সমগ্ররূপে দেখিয়াছেন, তাঁহাকে বড় মুস্কিলে পড়িতে হয়। তিনি বিশেষ ভাবে কোন্ দিক্কার প্রশংসা করিবেন বুঝিতে পারেন না। প্রাপ্য বস্তুটী হচ্চে ঈশ্বরের সহিত আধ্যাত্মিক যোগ; ইহার তিনটী দিক্—জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম। যে জ্ঞান আত্মাকে ঈশ্বর প্রাপ্তি করায়, ঈশ্বরের সহিত আত্মাকে গভীর যোগে আবদ্ধ করে, তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু আর কি হইতে পারে? প্রকৃত জ্ঞান আস্বাদন করিলে ইহা অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠতর বস্তু আছে বলিয়া বোধ হয় না; যত দিন আস্বাদন না করা যায়, তত দিনই এরূপ বোধ হয়। তেমনি যে স্বর্গীয় প্রীতি হৃদয়কে ভগবচ্চরণে কঠিন বন্ধনে নিবদ্ধ করে, সেই ভক্তি নামধেয় পরমবস্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বস্তু আর কি হইতে পারে? তেমনি আবার, যে কর্ম্ম আধ্যাত্মিক যোগেরই বাহ্য প্রকাশ মাত্র, ঈশ্বরেচ্ছা ও মানবেচ্ছার গাঢ় সম্মিলনে যাহার উৎপত্তি, সেই পবিত্র কর্ম্মযোগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বস্তুই বা আর কি হইতে পারে? সূক্ষ্মদর্শী সাধক যখন জ্ঞানের প্রাধান্য কীর্ত্তন করেন, কি ভক্তির মাহাত্ম্য বর্ণনা করেন, কি কর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করেন, তখন তিনি ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর প্রশংসা কীর্ত্তন করেন না,—ভিন্ন ভিন্ন দিকে দাঁড়াইয়া, ভিন্ন ভিন্ন নামে, এক অখণ্ড বস্তুরই মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। প্রাপ্য বস্তুটা একই; ইহার একটা দিক্ যদি ধরিতে পারা যায়, তবে অপর দিক্ গুলিও আয়ত্ত হইবে, কেন না প্রত্যেক দিকই অপর দুই দিক্কার সহিত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ। একজন লোক জ্ঞান লাভ করিয়া কেবল জ্ঞানীই থাকিয়া যাইতে পারে, তাঁহার ভক্তি ও কর্ম্ম সাধন না হইতেও পারে; অথবা একজন লোক ভক্তি লাভ করিয়া কেবল ভক্তি লইয়াই থাকিতে পারে, জ্ঞান ও কর্ম্ম না পাইতেও পারে, কিম্বা পক্ষান্তরে একজন লোক জ্ঞান ও ভক্তি হইতে বঞ্চিত থাকিয়া কেবল কর্ম্ম লইয়াই থাকিতে পারে,—আমরা এই সকল কথা বিশ্বাস করি না। যে সকল স্থলে এরূপ ঘটে বলিয়া বোধ হয়, সে সকল স্থলে কথিত জ্ঞান প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান নহে, কথিত ভক্তি প্রকৃত ভগবৎভক্তি নহে এবং কথিত কর্ম্ম প্রকৃত আধ্যাত্মিক কর্ম্মযোগ নহে। প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান যাহা, তাহা ভক্তি ও কর্ম্মযোগের অবশ্যম্ভাবী কারণ, ইহার উন্নতির সঙ্গে ভক্তি ও কর্ম্মযোগের উন্নতি অনিবার্য্য; এমন কি, প্রকৃত জ্ঞানযোগের সহিত ভক্তি ও কর্ম্মযোগের প্রভেদ করা অসম্ভব। কোথায় জ্ঞানের সীমা ও ভক্তির এবং ইচ্ছাযোগের আরম্ভ, তাহা নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। তেমনি প্রকৃত ঈশ্বর-ভক্তি যাহা, তাহার সহিত জ্ঞান ও সেবার প্রভেদ নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। তেমনি, ঐকান্তিক ঈশ্বর-সেবার ভাব যাহা, তাহা হইতে জ্ঞান ও ভক্তির ভাগটুকুকে পৃথক করিয়া লওয়া অসম্ভব। অসম্ভব এই জন্য যে পৃথক করিয়া লইলে আর কিছুই থাকিবে না। জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা একত্র করিয়া একটু ভাবিলেই বুঝা যায়, প্রকৃত জ্ঞান, প্রকৃত ভক্তি ও প্রকৃত কর্ম্মযোগ অভিন্ন বস্তু।

চতুর্থ কথা—ব্রাহ্মসমাজের জ্ঞানগৌরব কমিয়া গিয়াছে। এদেশে এখনও ব্যক্তিগত জ্ঞানগৌরবের বিলক্ষণ আদর আছে। কোন সমাজে একজন অসাধারণ প্রতিভা-সম্পন্ন পুরুষ থাকিলে, তাঁহার প্রতিভা ও চরিত্রের জ্যোতিঃ সমগ্র সমাজে প্রতিবিম্বিত হইয়া, তৎপ্রতি লোকের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিয়া থাকে। স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেনের গৌরব-মধ্যাহ্নে তাঁহারই উজ্জ্বল আলোকে ব্রাহ্মসমাজের মুখ উজ্জ্বল ছিল। ব্রাহ্মসমাজের ভূত ইতিহাসে সেই কাল সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবান্বিত; সেই সময়ে ব্রাহ্মসমাজ লোকের যেরূপ শ্রদ্ধা-ভাজন ছিল, আজ আর তেমন নাই,—আজি কালি ব্রাহ্ম-সমাজে তেমন উজ্জ্বল প্রতিভা-সম্পন্ন লোক নাই বলিয়া।

ব্রাহ্মসমাজের কতকগুলি হীনচরিত্র লোক ক্রমে অল্পাধিক আধিপত্য ও সম্মান লাভ করিয়া অবশেষে আপনাদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ব্রাহ্মসমাজের উপর বিবিধ দোষারোপ করিয়া ইহাকে লোকচক্ষে হীন করিতে চেষ্টা করে; ইহাদের উপযুক্ত শাসনের জন্য সমাজে কোনও বন্দোবস্ত নাই। আমাদের অসাবধানতা নিবন্ধন এই সকল ধর্ম্মজ্ঞানবিহীন লোক-দিগকে প্রশ্রয় দিয়া আমরা ব্রাহ্মসমাজের গুরুতর ক্ষতি করিতেছি। ব্রাহ্মসমাজের বাহিরের যে সকল ব্যবসায়ী লোক ব্রাহ্মসমাজের অন্যায় কুৎসা রটনা করিয়া বেড়ায়, তাহাদিগকে আমরা তুচ্ছ করি; তুচ্ছ করাও কর্ত্তব্য। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের ক্রোড়ে বর্দ্ধিত হইয়া যে সকল ব্যক্তি আপনাদিগের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য বা আত্মদোষ লাঘবার্থ ব্রাহ্মসমাজের উপরে অসত্য অভিযোগ প্রচার করিয়া ইহাকে লোকসমাজে অপদস্থ করিতে চায়, তাহাদের এই সকল জঘন্য কুৎসা রটনার প্রতি আমরা তেমন উপেক্ষা করিলে চলিবে কেন?

শেষ কথা এই যে, আমরা আমাদিগের অভিমান, অজ্ঞানতা ও অসাবধানতা নিবন্ধন ব্রাহ্মসমাজের যেরূপ গুরুতর ক্ষতি করিতেছি, অপর কাহারও দ্বারা সে ক্ষতি হইতেছে না। এখনও সময় আছে; এখনও চেষ্টা করিলে ঈশ্বরাশীর্ব্বাদে আমরা পুনরায় লোকের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসভাজন হইতে পারি। কিন্তু সে চেষ্টা করে কে? সে কথা কাহারই বা কাণে উঠে?

প, ব।

ব্রাহ্মসমাজে হিন্দুযোগ।

ব্রাহ্মসমাজে কিছুদিন হইতে এক অভিনব সাধন-প্রণালী প্রবেশ লাভ করিয়াছে। এই অভিনব সাধনের সমুদায় তত্ত্ব অযথারূপে গোপন রাখা হয় বলিয়া ব্রাহ্ম সাধারণে তৎসম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিতে পারেন না। কিন্তু সাধনাব-লম্বীগণের বাহ্যিক আচার-আচরণ, কথাবার্ত্তা, এবং সাধারণ মতামত দৃষ্টে যতদূর বুঝিতে পারা যায়, তাহাতে ইহাকে ব্রাহ্মধর্ম্মবিরোধী বলিয়া বিশেষ প্রতীতি হয়। এতকাল এই অভিনব সাধন সম্বন্ধে প্রকাশ্য আলোচনা করা আবশ্যক বোধ হয় নাই, কিন্তু যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে আর আমাদিগের উদাসীন থাকা কোন মতে উচিত হইবে না। ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশুদ্ধতা রক্ষার্থ, ব্রাহ্মসমাজের পবিত্রতা রক্ষার্থ, দেশের ভবিষ্য মঙ্গলের মুখ চাহিয়া, আর এই গোপনীয় সাধনপ্রণালীর প্রতি ব্রাহ্মসাধারণের ঔদাসীন্য প্রকাশ করা বিধেয় নহে।

আমরা এই অভিনব সাধন-সম্বন্ধে যে সামান্য জ্ঞান ও সামান্য অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহা অনেকটা বাহির হইতে,—এই সাধনাবলম্বী বন্ধুগণের আচার-আচরণ, ভাবস্বভাব, দেখিয়া; এবং তৎসম্বন্ধে তাঁহাদের সঙ্গে সাধারণ ভাবে যৎ-সামান্য কথাবার্ত্তা কহিয়া আমরা যাহা বুঝিয়াছি, তাহাতে ভ্রম থাকিতে পারে, থাকিবার সম্ভবনাও অল্পাধিক আছে। কিন্তু তজ্জন্য যোগী ব্রাহ্মগণই সম্পূর্ণরূপে দায়ী। তাঁহাদের সাধন অতিশয় গোপনীয় ব্যাপার; গুরুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তাহা গ্রহণ না করিলে তৎসম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করা যায় না; তাঁহাদের গণ্ডিভুক্ত না হইলে তৎসম্বন্ধে বিশেষ তত্ত্ব অবগত হওয়া অসাধ্য। সুতরাং যাঁহারা গড্ডলিকা-প্রবাহের মত না বুঝিয়া-সুঝিয়া একটা ব্যাপারে লিপ্ত হইতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহাদের পক্ষে এই সাধন সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব। কোনও কোনও বন্ধু এই যোগসাধন অবলম্বন করিয়া পরে তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনরায় প্রাচীন ব্রহ্মোপাসনা প্রণালীকেই শ্রেষ্ঠতম সাধন বলিয়া পুনর্গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাদিগের নিকট হইতে এই অভিনব সাধন সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিবার সম্ভাবনা ছিল, যোগ-সাধন অবলম্বন করিবার সময় প্রবেশার্থীকে যাবজ্জীবন তৎসম্বন্ধীয় সমুদায় কথা ও তত্ত্ব গোপন রাখিবার জন্য নিদারুণ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হয় বলিয়া ইহাদিগের নিকট হইতেও কোনও বিশেষ তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় না। [illegible] এই অভিনব সাধন-তত্ত্ব জ্ঞাত হইবার জন্য আমাদিগকে অনন্যোপায় [illegible]য়া বর্ত্তমান প্রশ্নের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে। কোনও অভিজ্ঞ ব্রাহ্মযোগী সাহস করিয়া এই অভিনব যোগতত্ত্ব প্রচার করিতে অগ্রসর হইলে আমরা অবনতমস্তকে তাহার উপযুক্ত সম্মান ও আদর করিতে প্রস্তুত হইব।

ব্রাহ্মসমাজে নবপ্রবিষ্ট এই সাধনপ্রণালী হিন্দুযোগের শাখা বিশেষ। একজন উচ্চশ্রেণীর চিন্তাশীল যোগ-সাধককে আমরা একবার তাঁহাদের সাধনের দার্শনিক ভিত্তি কি, তাহা বুঝাইয়া দিতে বিশেষ অনুরোধ করি। তিনি [illegible] সুস্পষ্ট ভাষায় আমাদিগকে বলেন,—"আমি এ সম্বন্ধে অতি অল্পই জানি; ইহার দর্শন টর্শন বুঝি না। কেবল এই দেখিতেছি যে, এই সাধন যত টুকু অভ্যাস করিতেছি, তাহাতেই পরম উপকৃত হইতেছি।" আমরা এই উত্তরে সন্তুষ্ট না হইয়া বলিলাম,—"ইহার দার্শনিক ভিত্তি কিছু অবশ্যই আছে; নতুবা আপনার মত একজন চিন্তাশীল ব্যক্তি ইহা গ্রহণ করিতে পারিলেন কিরূপে?" তখন ইনি বলিলেন;—"শিবসংহিতা প্রভৃতি পড়িতে পার।"

দ্বিতীয়তঃ—প্রাণায়াম এই সাধনের একটী অতি প্রধান অঙ্গ। এই সাধনাবলম্বীগণ বলেন ষট্চক্র ভেদ হইলেই অন্তরে ব্রহ্মজ্যোতিঃ দর্শন হয়।

প্রধানতঃ এই দুই কারণেই আমরা এই অভিনব সাধন

কিন্তু নিয়মিত সভ্যগণের কার্য্যোপলক্ষে প্রায় সর্ব্বদা স্থানান্তরে থাকিতে হয় বলিয়া ইহার কার্য্য নিয়মমতে চলে না। পটিয়ায় যে কয়েক জন সভ্য সর্ব্বদা থাকেন, তাঁহারাই ইহার জীবন রক্ষা করিতেছেন। সেই সমাজটির কতিপয় সভ্য মধ্যে মধ্যে চট্টগ্রামে একত্র হইয়া প্রার্থনাদি করিতেন। একদিন নবদ্বীপ বাবুর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইলে নানা প্রকার কথার পর তিনি এই সমাজের বিষয় জানিতে পারিয়া ইহার উন্নতির জন্য যত্নবান্ হন, এবং কিরূপে কার্য্য হইলে ইহার উন্নতি হইতে পারে, তদ্বিষয় চিন্তার জন্য ২৭শে মার্চ্চ তারিখে আমার বাড়ীতে একটী সভা আহুত হয়। তাঁহাতে উপস্থিত প্রায় ২৫ জন সভ্যের মধ্যে এই স্থির হয় যে পটিয়াতে যাহা আছে, তাহা শাখারূপে রাখিয়া চট্টগ্রাম সহরে "চট্টগ্রাম প্রার্থনাসমাজ" নামে একটী সমাজ করিলেই ইহার কার্য্য সুসম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা; সুতরাং সর্ব্ব সম্মতিক্রমে তাহাই স্থির হইয়া বিগত ২৭শে মার্চ্চ রবিবার "চট্টগ্রাম প্রার্থনা সমাজ" প্রাতিষ্ঠিত হইয়াছে। সম্প্রতি ১৬ জন ভদ্রলোক ইহার সভ্যশ্রেণীতে ভুক্ত হইয়াছেন, ক্রমে দিন দিন আরও অনেক ভদ্রলোক যোগ দিতেছেন। ইহা যদিও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভূত নয়, কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহিত ইহার আন্তরিক অনেকটা মিল রহিয়াছে। এ পর্য্যন্ত চারিটী রবিবার ইহার কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। নবদ্বীপ বাবুই এই কয়েক দিন আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন এবং তিনি নিম্নলিখিত চারিটী বিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন—১। প্রার্থনার ফল। ২। প্রার্থনা সমাজ সকলের মিলনের স্থান। ৩। নিত্য উপাসনা। ৪। পরীক্ষাতেই বিশ্বাস দৃঢ় হয়।

যাত্রামোহন বাবু প্রার্থনা সমাজের জন্য তাঁহার বাহিরের ঘরটী ব্যবহার করিতে দিয়া সমাজের নিকট কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন।

আমরা আশা করি কলিকাতার সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ এই প্রার্থনা সমাজটীর কল্যাণ ও উন্নতির জন্য সাহায্য করিবেন এবং সর্ব্বদা আমাদিগের প্রাণে যাহাতে বল থাকে, তদ্বিষয় যত্ন করিবেন।

বিগত ৭ই এপ্রিল তারিখে নবদ্বীপ বাবু পটিয়া যাইয়া তথায় স্থানীয় ইংরেজি স্কুল গৃহে "মানবের শ্রেষ্ঠতা" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন; ইহাতে অনেক প্রাচীন এবং পদস্থ লোক সকল যোগ দান করেন; প্রায় দুই শত ভদ্র লোক উপস্থিত ছিলেন। ইহা ব্যতীত দুই চারিটী বন্ধুকে লইয়া উপাসনাদি করেন এবং ভদ্রলোকদিগের সহিত আলাপ পরিচয়াদি করেন। পটিয়া হইতে পুনরায় সহরে আইসেন এবং পূর্ব্বমত কার্য্যাদি করেন। চট্টগ্রাম প্রার্থনা সমাজে বর্ষশেষ এবং নূতন বৎসর উপলক্ষে বিশেষ উপাসনাদি হইয়াছিল এবং এক দিন পাহাড়েও উপাসনা হয়; কিন্তু দুঃখের বিষয় সকলে তাহাতে যোগ দান করিতে পারেন নাই। তিনি নিজের এই সকল কার্য্যের পর প্রায়ই নববিধান সমাজে যোগ দান করিতেন। বিগত ১৫ই এপ্রিল অত্রস্থ মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়ে "বর্ত্তমান সময়" এই বিষয়ে এক প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন; তাহাতে বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী ধর্ম্ম কি এবং ধর্ম্মেতে এত বিবাদ কেন এইটী বিশেষ রূপে বিবৃত করেন। স্থানাভাবে প্রকাশ্য বক্তৃতাদি হইতে পারে নাই। মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ যে তাঁহাদের বিদ্যালয় ছাড়িয়া দিয়াছিলেন তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। এ বক্তৃতায়ও অনেক পদস্থ লোক উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রাম প্রার্থনা সমাজ নবদ্বীপ বাবুর নিকট চিরঋণী রহিল। তিনি যেরূপ যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত ইহার উন্নতি চেষ্টা করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতেছি। পরম পিতার নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, তিনি যে কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন তাহাতেই জীবন শেষ করুন। তাঁহার আত্মা ক্রমে সত্যের দিকে উন্নত হউক, এবং তাঁহার জীবনে সর্ব্বদা ঈশ্বরের কার্য্য জয়যুক্ত হউক!

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন খাস্তগির
সম্পাদক, চট্টগ্রাম প্রার্থনা সমাজ।

ডিব্রুগড়—আসাম।

বিগত ১লা মে রবিবার প্রাতে ডিব্রুগড় ব্রাহ্মসমাজের মন্দির প্রতিষ্ঠা হইয়া গিয়াছে। ঐ দিন অপরাহ্নে তত্রত্য ছাত্রদিগের জন্য একটী ছাত্রসমাজও সংস্থাপিত হইয়াছে। পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় এই উপলক্ষে উপাসনা ও উপদেশাদি প্রদান করেন। তাঁহার প্রাতের উপদেশের সারমর্ম্ম এই:—

"আমরা অনেক সময় নদী দিয়া গমনকালে দেখিতে পাই, এক এক নদীর মধ্যে সুন্দর সুন্দর গ্রাম বসিয়া গিয়াছে। দশ বৎসর পূর্ব্বে যে স্থানে নদী ছিল, বিবিধ জল জন্তুর বাসস্থান ছিল, যেখানে কত শত লোক প্রাণত্যাগ করিত, সেখানে আজ সুদৃশ্য বৃক্ষরাজি-শোভিত সুন্দর গ্রাম, সেখানে আজ কত লোকের আশ্রয়স্থান। এই গ্রাম দেখিয়া আমরা কি অনুমান করিতে পারি? ইহা কি এক দিনেই হইয়াছে? না ক্রমে ক্রমে হইয়াছে? ক্রমে ক্রমে ইহার সূত্রপাত হইয়াছে। প্রথমে একটী সামান্য বৃক্ষ স্রোতে ভাসিয়া আসিয়া এক স্থানে লাগিয়া থাকে, ক্রমে একটী একটী করিয়া বালুকণা আসিয়া তাহাতে জমিয়া একটী চড়া ও সৈকত ভূমি রূপে পরিণত হয়, তার পর ঘাস ও নানাবিধ বৃক্ষ জন্মিয়া একটী সুন্দর স্থান হয়। পরে মানুষ দেখিতে পাইয়া আসিয়া বাস করিয়া থাকে এবং ক্রমে ঐটী সমৃদ্ধিশালী গ্রামরূপে পরিণত হয়। ইহার ভিত্তি সামান্য বৃক্ষ ও বালুকণা। এইরূপ যেমন আমরা নদীতে বেড়াইতে বেড়াইতে একটী গ্রাম দেখিয়া সিদ্ধান্ত করি, সেইরূপ যখন কোন স্থানে একটী ধর্ম্ম সমাজ দেখি, তখনও আমার তাই মনে হয়। এই স্থানটী ভাল ছিল না। এক সময় এখানে ভগবানের নাম করা কঠিন হইয়া উঠিত, জানি না কোন্ কারণে এই স্থানে শুভ মুহূর্ত্তে ব্রহ্মের নাম হইল। সেই যে মানুষের শ্রম রূপ একটী বালুকণা পড়িয়াছিল, তাহাতেই চারি দিক হইতে ক্রমে ক্রমে বালুকণা জমিল, জমিতে জমিতে প্রথমে চড়া ও পরে সৈকতভূমিরূপে পরিণত

হইল। এই যে সমাজ, ইহার ভিত্তি কোথায়? ব্রহ্ম-কৃপা। ব্রহ্ম-কৃপা বৃক্ষের ন্যায় আসিয়া নদীতটে জমিল, তাহাতে মানুষরূপ বালুকণা নানা দেশ হইতে একটী একটী করিয়া আসিয়া জুটিল। তাহারা বালু-কণা। বালু-কণা না হইলে ধর্ম্মসমাজ হইতে পারে না। বালু-কণার ন্যায় বিনয়ী হইতে হইবে। জ্ঞানের অভিমান থাকিলে কি মানুষ বালু-কণা হইতে পারে? মানুষ যতদিন বালু-কণা না হইবে, ততদিন কি আর ধর্ম্ম সমাজ হইতে পারে? ব্রহ্মকৃপা যাহারা অবলম্বন করিবে, তাহারা বিনয়ী হইবে। ধার্ম্মিক মানুষের পদতলে পড়িয়া থাকিবেন, মাথায় উঠিবেন না। নানক বলিতেছেন:—

অন্তর্যামী পুরুষ বিধাতে শ্রদ্ধা মন কি পূরে,
নানকদাস ইয়া সুখ মাঁগে কর মেরে সান্তনকি ধুরে।

অন্তর্যামী বিধাতা পুরুষেতে আমার হৃদয়ের শ্রদ্ধা পূর্ণরূপে যাউক, আমার হৃদয়ের ভার তাঁহাতে পূর্ণরূপে থাকুক, হে বিধাতা! আমাকে সাধুদের পায়ের ধুলি করিয়া রাখ। এইরূপ বিনয়ী না হইলে সমাজ জমিবে না। যখন মানুষ ধুলিকণার মতন বিনয়ে বিনয়ে মিলিবে, তখনই সমাজ গঠিত হইবে। আমাদের মিলন হয় না কেন? কেন না আমরা বিনয়ী হই না। যদি বালু-কণা অন্য কিছু হইত, তবে কি স্রোতের মধ্যে চড়া পড়িত? না। বালু-কণা যদিও ক্ষুদ্র, তথাপি তাহাদের নিকট স্রোতস্বিনীর বল কিছুই নহে। যখন মানুষ বালু-কণার মত একত্রে আসিয়া মিলিবে, তখন কাহার সাধ্য তাহাকে সেই স্থান হইতে চ্যুত করে? কারণ, তাহারা এমন মিশ খাইয়া গিয়াছে,যে তাহাদিগকে কেহ হেলাইতে দুলাইতে পারে না। সমাজ স্থাপনের ভিত্তি ব্রহ্মকৃপা ও মানুষরূপ বালু-কণা এইরূপ এক হইয়া যখন মানুষ ঈশ্বরের আশা ভরসা রাখিয়া মানুষকে ডাকে,তখন দেখে,ছিল সমুদ্র—জলজন্তুর বাস, এখন তাহা হইয়াছে গ্রাম—প্রশস্ত আশ্রয়ভূমি। ইহা দেখিয়া কে না আসিয়া থাকিতে পারে? আদত সমাজ হয় না, তাই প্রকৃত ধর্ম্ম আসে না। কেবল কয়েকটী মত ও ভাবের সমাবেশ নহে, কিন্তু যদি বাস্তবিক আমরা জীবন দ্বারা দেখাইতে পারি যে, যাহা ছিল ভয়ানক জন্তুর বাস, তাহা এখন প্রেমের ছায়া, শান্তির গৃহ, তবে লোক আসিবে না কেন? আজ যে সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল, ইহাকে আমি বাহিরের ঘর বলিতে পারি না, ইহা প্রেমের ঘর, প্রেমে মিলিত হইল, ভগবানের নাম লইয়া ধন্য হইল। এইরূপ যদি আমরা ব্রাহ্ম সমাজকে প্রেমের ঘর করিতে পারি, তবে কে না আসিবে? নদীর মধ্যস্থ গ্রামে কে না যায়? কেমন সুন্দর জলবায়ু, কেমন সুন্দর দৃশ্য! বাস্তবিক আমরা যদি ধর্ম্মজীবন দেখাইতে পারি, চরিত্র বিশুদ্ধ হয়, তবে মানুষ না আসিয়া টিকিতে পারে না। তার জন্য আজকার প্রাতঃকালকে আমি ধন্য মনে করিতেছি, কেন না এই প্রাতঃকালে আজ ব্রহ্মকৃপার উপরে কয়েকটী বিন্দু মিলিল। যদি এই গুলি বালু-কণা হইতে পারে, তবে ব্রহ্মকৃপার উপর সংস্থিত এই সমাজ অটল থাকিবে। সকলে প্রেমে মিলিত হউন। বালু-কণা এক আরকে ছাড়ে না, এক আরকে রক্ষা করে। সেইরূপ বিনয়ের সহিত মিলিত হউন। এইরূপে প্রাণে যদি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে মানুষ আসিবে না কেন? ভিত্তি ব্রহ্ম, মানুষের প্রীতি ভক্তি তাহাতে মিলিবে, ভালবাসার ছায়া পড়িবে, প্রভুর নামের সুমিষ্ট ফল ভোজন করিয়া লোকে আনন্দ পাইবে। ঈশ্বর দয়া করুন, যেন ব্রহ্ম-কৃপার উপর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, মানুষ বালু-কণার ন্যায় বিনয়ী হউক, তাহাতে শান্তির ফল ফলুক, সকল নরনারী তাহা ভোগ করুক।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

"তত্ত্ব-কৌমুদী"র বর্ত্তমান সংখ্যা সমুদায় পাঠকের হস্তগত হইবার পূর্ব্বেই আমাদের প্রিয়তম সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নবম সাম্বৎসরিক উৎসব আরম্ভ হইবে। এই সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রত্যেক সভ্যের পক্ষে বিশেষ চিন্তার সময়। কি কি মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্ম হইয়াছে, সেই সকল উদ্দেশ্য কত দূর সংসিদ্ধ হইয়াছে বা হইতেছে, সেই সকল উদ্দেশ্য সাধনের পথে কি কি বিঘ্ন রহিয়াছে, আমরা প্রত্যেকে সেই সকল উদ্দেশ্য সাধনের কত টুকু সাহায্য করিতেছি, কত টুকুই বা ব্যাঘাত দিতেছি,—প্রত্যেক সভ্যের পক্ষে এখন এই সমুদায় গুরুতর বিষয় চিন্তা করা আবশ্যক। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য যাহা, তাহা আমাদের নিজ নিজ জীবনে কত দূর আয়ত্ত হইয়াছে, কত দূর অনায়ত্ত রহিয়াছে, তাহাও প্রত্যেকের ভাবিয়া দেখা উচিত। সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের উদ্দেশ্য যাহা, সমাজভুক্ত প্রত্যেক ব্রাহ্ম জীবনেরই সে উদ্দেশ্য, অথবা সে উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। ব্যক্তিগত একাধিপত্য দূর করিয়া, সকলে সদ্ভাবে মিলিত হইয়া সাধারণ বিবেক ও সদ্বিবেচনার সাহায্যে সমাজের কার্য্য নির্ব্বাহ করা যদি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একটী উদ্দেশ্য হয়, আমাদের প্রত্যেকের ভাবিয়া দেখা উচিত আমাদের জীবন এই উচ্চ লক্ষ্য সাধনের পক্ষে কত দূর অনুকূল, কত দূরই বা প্রতিকূল; আমরা ব্যক্তিগত পক্ষপাতিত্ব এবং আত্মাভিমান পরিত্যাগ করিয়া সমাজের সাধারণ মতকে সম্মান করিতে কতদূর শিক্ষা করিয়াছি। আধ্যাত্মিক সঙ্কীর্ণতা বিনাশ করিয়া জ্ঞান-প্রীতি-পবিত্রতা-সমন্বিত পূর্ণাঙ্গ ধর্ম্ম প্রচার যদি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একটী উদ্দেশ্য হয়, আমাদের প্রত্যেকের ভাবিয়া দেখা উচিত আমরা নিজ নিজ জীবনে এই পূর্ণাঙ্গ আদর্শ ধর্ম্ম সাধনে কতদূর চেষ্টা করিতেছি, কতদূরই বা উপেক্ষা করিতেছি; আমরা নিজের জীবন দ্বারা আধ্যাত্মিক সঙ্কীর্ণতার প্রশ্রয় দিতেছি অথবা উদার ধর্ম্ম সাধনের সাহায্য করিতেছি। বিবিধ উপায়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করা যদি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একটী উদ্দেশ্য হয়, আমাদের প্রত্যেকের ভাবিয়া দেখা উচিত আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের কতদূর সাহায্য করিতেছি; আমরা নির্দ্দিষ্ট প্রচারক মহাশয়দের উপর প্রচারের ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছি, না প্রত্যেকে কায়মনোবাক্যে যত দূর সাধ্য প্রচার কার্য্যের সাহায্য করিতেছি।

কতকগুলি বিষয়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। কতকগুলি কারণে আমাদের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজরূপ গৃহের প্রতি আমরা বিশেষরূপে আসক্ত। (১) এখানে আমাদের আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ। ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যের ভিতরে থাকিয়া আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য আমরা যে কোন উপায় অবলম্বন করিতে পারি, যে কোন সত্যের আশ্রয় লইতে পারি, সমাজ তাহার বিরোধী হন না। আমরা স্বয়ং ছাড়িয়া না গেলে সমাজ আমাদিগকে ছাড়েন না, সমাজ আমাদিগকে উৎপীড়ন করেন না। এখানে ব্যক্তিগত সঙ্কীর্ণতা ও বিদ্বেষ যে নাই, তাহা নহে; কিন্তু সমাজের সাধারণ মত ও কার্য্যপ্রণালী অতি উদার। এমন প্রশস্ত মুক্তবায়ুসেবিত গৃহ আর কোথায় পাইব? (২) এই গৃহের কার্য্যে গৃহবাসী প্রত্যেকেরই হাত আছে। আমি সমাজের বিশেষ কার্য্যভার প্রাপ্ত ব্যক্তি হই, আর নাই হই, আমি নিশ্চয় জানি, সমাজের উন্নতিকল্পে আমার যাহা কিছু বলিবার আছে, যে কোন প্রস্তাব করিবার আছে, তাহা অবাধে শ্রুত এবং বিবেচিত হইবে। আমার ব্যক্তিগত মত সমাজে চলিল না বলিয়া যদি দুঃখিত হই, এই ভাবিয়া আশ্বস্ত হইতে পারি যে কোন ব্যক্তিবিশেষের মতই এখানে চলে না। যাহা সাধারণের মত,তাহা সময়ে সময়ে ভ্রান্ত হইতে পারে, কিন্তু সমাজ মধ্যে তাহা চলিলে কাহারই বিশেষ ক্ষোভের কারণ থাকে না। এই নিয়মতন্ত্র প্রণালী বর্ত্তমান সময়ে সমগ্র ভারতের আদর্শ; ইহার আদর্শে অনেক সমাজ সমিতি গঠিত হইতেছে। কিন্তু আমরা বহুকালব্যাপী জাতীয় এবং সামাজিক দাসত্বে এতদূর হীন হইয়া গিয়াছি যে, আমরা অনেক সময় এই নিয়মতন্ত্র প্রণালীর মহত্ত্ব ও গুরুত্ব অনুভব করি না। (৩) এখানে নারীর অধিকার, পুরুষের সহিত নারীর সমতা, নারীর ভগ্নীত্ব সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। ইহা মনে করিলে ন্যায়পরায়ণ মুক্ত হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়। এখানে নারী সাধারণ সভ্যের অধিকারভাগিনী, এখানে নারী কমিটির সভ্য, এখানে নারী সভায় বক্তা, এখানে নারী প্রচার কার্য্যে সহায়, এখানে নারী সমাজমন্দিরে আচার্য্যের আসনে আসীনা। নারীর পক্ষে এবং ভগ্নীর হিতাকাঙ্ক্ষী পুরুষের পক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ন্যায় প্রিয় স্থান আর কোথায়? (৪) এখানে যুবক বিশেষ যত্ন, আদর ও সম্মানের পাত্র। তাঁহার ধর্ম্ম, সমাজতত্ত্ব ও নীতি শিক্ষার জন্য এখানে ছাত্রসমাজ, ব্রহ্মবিদ্যালয়, নৈতিক বিদ্যালয়, হিতসাধক মণ্ডলী প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ইন্‌ষ্টিটিউশন প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তিনি অল্পবয়স্ক বলিয়া এখানে উপেক্ষিত হওয়া দূরে থাক, তিনি উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইলে সমাজের উচ্চতম কার্য্যেরও ভার পাইতে পারেন এবং পাইয়া থাকেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ শিক্ষিত যুবকের পক্ষে বিশেষ আকর্ষণের বস্তু। আমাদের গৃহের অনেক অভাব আছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু অভাব সত্ত্বেও এই সকল কারণে ইহা আমাদের নিকট বিশেষরূপে প্রিয়।

পূর্ব্বোক্ত চারিটী আহ্লাদের বিষয় ভাবিতে গিয়া সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের সমাজের চারিটী গভীর অভাবের বিষয় মনে পড়িয়া হৃদয় দুঃখিত ও চিন্তিত হয়। (১) আমাদের আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা আছে বটে, এবং ধর্ম্মসমাজের ইহা একটী অমূল্য ভূষণ বটে, কিন্তু আমাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক একতার বড়ই অভাব। আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষে স্বাধীনতা যেমন একান্ত আবশ্যক, আধ্যাত্মিক একতাও তেমনি আবশ্যক। পরস্পরের আধ্যাত্মিক একতা ও সহযোগীতা ব্যতিরেকে পূর্ণাঙ্গ ধর্ম্ম সাধন কখনই সম্ভব নহে। কিন্তু আমাদের একতা ও সহযোগীতা কত অল্প! আধ্যাত্মিক সাধন ও ধর্ম্মচর্চ্চার উদ্দেশে আমাদের যে সকল ইন্‌ষ্টিটিউশন আছে,উপাসক-মণ্ডলী, সঙ্গত, তত্ত্ববিদ্যা সভা, ব্রাহ্মবন্ধু সভা—এই সমুদায়ের আভ্যন্তরিক অবস্থা নিতান্ত অসন্তোষকর। এই সমুদায়ের সাহায্যে, পরস্পরের সমবেত চেষ্টা দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের চেষ্টা কতঅল্প লোকের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়! আমরা অভ্রান্ত গুরু, পুরোহিত, শাস্ত্র ও লোকাচারের অত্যাচার হইতে মুক্ত হইয়াছি; কিন্তু মুক্ত অথচ বিনীত ভাবে পরস্পরের নিকট শিক্ষা লাভ করা, পরস্পরের সাহায্যে উন্নতি লাভ করা রূপ উচ্চতর সাধন এখনো ভালরূপে গ্রহণ করিতে পারি নাই। ইহাই আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রধান অন্তরায়। (২) আমরা সমাজ মধ্যে নিয়মতন্ত্র প্রণালী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি বটে, কিন্তু ইহা এখনো সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয় নাই, এখনো ইহার অনেক অসম্পূর্ণতা আছে যাহা অতি যত্নের সহিত দূর করিতে হইবে; বিশেষতঃ আমাদের মধ্যে প্রকৃত নিয়ম তান্ত্রিক ভাবের (Constitutional spirit) এখনও বিশেষ অভাব। আমরা অনেকেই এখনো মতের অনৈক্য স্থলে অন্যের মতকে, বিশেষতঃ সাধারণের মতকে, যথেষ্ট সম্মান করিতে শিখি নাই। (৩) আমাদের মহিলারা পুরুষের সমান অধিকার পাইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা সে অধিকারের সম্পূর্ণ ব্যবহার করিতেছেন না। তাঁহাদের মধ্যে তেমন জাগ্রত ধর্ম্ম ভাব কৈ? সমাজের উন্নতি কল্পে তাঁহাদের বিশেষ ব্যগ্রতা ও সহযোগীতা কৈ? মহিলাদিগের আধ্যাত্মিক উন্নতি সমাজের পক্ষে একটী বিশেষ চিন্তার বিষয়। কিন্তু মহিলাদিগের মধ্য হইতে কেহ কেহ এই বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী ও যত্নবতী না হইলে বিশেষ ফল লাভের আশা নাই। (৪) আমাদের যুবকেরা যত্ন, শিক্ষা ও আদর লাভ করিতেছেন বটে, কিন্তু আমাদের অবলম্বিত যুবক-শিক্ষা-প্রণালী এখনো নিতান্ত অসম্পূর্ণ, এবং যুবকগণের মধ্যেও নিয়মিত ধর্ম্মশিক্ষা লাভের ইচ্ছা ও যত্ন নিতান্ত অল্প। যুবকগণ সমাজে প্রবেশ করিয়া সাধারণ ভাবে কতক গুলি স্থূল স্থূল বিষয় মাত্র শিক্ষা করেন। তাঁহাদিগকে বিশেষ ভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধনে দীক্ষিত ও উন্নত করিবার চেষ্টা করা হয় না; যুবকগণও ধর্ম্মের উচ্চতর সাধন রাজ্যে প্রবেশ করিবার বিশেষ ব্যগ্রতা প্রদর্শন করেন না। এরূপ শিথিলতা অবিলম্বে দূর হওয়া আবশ্যক।

সংবাদ।

নবম সাম্বৎসরিক উৎসব—সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের নবম সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে আগামী ১লা জ্যৈষ্ঠ শনিবার অপরাহ্ণ ৬॥ ঘটিকার সময় উপাসনা-মন্দিরে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী "ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের বিঘ্ন" বিষয়ে একটী বক্তৃতা দিবেন। ২রা জ্যৈষ্ঠ প্রাতঃসন্ধ্যা উপাসনা এবং অপরাহ্ণে পাঠ ও সংকীর্ত্তন হইবে।

শ্রাদ্ধ—বিগত ৫ই বৈশাখ জেলা হুগলির অন্তর্গত হড়া গ্রামে বাবু ভুবনমোহন ঘোষের মাতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতাস্থ এবং গ্রামবাসী কয়েকজন বন্ধু অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন। বিগত ২২এ এপ্রিল কলিকাতায় বাগ-আঁচড়া নিবাসী বাবু যোগেন্দ্রনাথ মল্লিকের পরলোকগতা খুল্লপিতামহীর শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন।

দুর্ভিক্ষ—কুমিল্লা নিবাসী বাবু গুরুদয়াল সিংহের আবেদনানুসারে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহক সভা বীরভূম দুর্ভিক্ষ ফণ্ডের উদ্বৃত্ত টাকা হইতে ত্রিপুরা জেলাস্থ দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ ১০০৲ টাকা দেওয়া স্থির করিয়াছেন। তন্মধ্যে ৫০৲ টাকা প্রেরিত হইয়াছে।

কাঁথি—ইতিমধ্যে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কয়েকজন ব্রাহ্ম-বন্ধু সমভিব্যাহারে কাঁথি ব্রাহ্মসমাজের নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে গমন করেন। কাঁথিতে নব্য-হিন্দু ধর্ম্মের পক্ষপাতী অনেক শিক্ষিত লোক আছেন; কিন্তু অভ্যাগত ব্রাহ্মবন্ধুগণকে স্থানীয় ব্রাহ্ম হিন্দু সকলেই বিশেষভাবে আদর অভ্যর্থনা করেন। ২০এ ও ২২এ এপ্রিল বুধবার ও শুক্রবার হিন্দুধর্ম্মের পক্ষপাতী-গণের সহিত শাস্ত্রী মহাশয়ের অনেক তর্ক ও আলোচনা হয়। ২১এ এপ্রিল বৃহস্পতিবার শাস্ত্রী মহাশয় "আধুনিক ভারতে ধর্ম্ম বিপ্লব" সম্বন্ধে প্রকাশ্য বক্তৃতা দেন; সভাতে স্থানীয় প্রায় সমস্ত শিক্ষিত ও পদস্থ লোকই উপস্থিত ছিলেন। শনিবার আর একটী বক্তৃতা হয়,তাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রধান প্রধান মত সমূহ ব্যাখ্যাত হয়। রবিবার প্রাতে বহু সমারোহের সহিত মন্দির প্রতিষ্ঠা হয় এবং "বিশ্বাস ও উৎপীড়ন" বিষয়ে উপদেশ হয়। সায়ংকালে নগর-সংকীর্ত্তন ও প্রকাশ্যস্থলে বক্তৃতা হয় এবং তৎপরে রাত্রি-কালীন্ উপাসনা হয়।

গাজিপুর—গাজিপুরে তিনটী ব্রাহ্মসমাজ আছে; পুরাতন গাজিপুর ব্রাহ্মসমাজ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দুটী সমাজ গঠিত হইয়াছে; একটী নববিধান-সংস্পৃষ্ট, অপর একটী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সংস্পৃষ্ট। বাবু সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় শেষোক্ত সমাজের উৎসাহী আচার্য্য। এতদ্ব্যতীত গোরাবাজারে আর একটী নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইটীও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সংস্পৃষ্ট। বিগত ২১এ হইতে ২৭এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত গোরাবাজার সমাজের তৃতীয় সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। ৩১এ মার্চ্চ হইতে ২রা এপ্রিল পর্য্যন্ত গাজিপুর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-সংস্পৃষ্ট ব্রাহ্মসমাজের এবং ১৬ই মার্চ্চ নববিধান-সংস্পৃষ্ট ব্রাহ্ম সমাজের ১৫শ সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে।

বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—পূর্ব্ব প্রকাশিত প্রচার কার্য্যের পর নিম্নলিখিতরূপ কার্য্য করিয়াছেন;—মজিলপুর হরিসভায় "চৈতন্যের মহত্ব" বিষয়ে বক্তৃতা, জাঙ্গিপাড়া কৃষ্ণ-নগরে প্রজাসাধারণ সভায় "একতা," "নিস্বার্থ দেশহিতৈষিতা" "খোলাভাটী" প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা। ২৬এ চৈত্র গ্রীষ্মাবকাশ জন্য ছাত্রদিগের বাটী গমন উপলক্ষে কলিকাতার কোন ছাত্র নিবাসে বিশেষ উপাসনা। ২৯এ চৈত্র হাজারিবাগ ব্রাহ্মসমাজের উৎসবের উদ্বোধন। ৩০এ চৈত্র প্রাতে ও সন্ধ্যার পর হাজারিবাগ ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা ও উপদেশ। ১লা বৈশাখ, প্রাতে হাজারিবাগ ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা ও উপদেশ, অপরাহ্ণে আলোচনা ও সংগীত, সন্ধ্যার পর প্রার্থনা ও নগর-সংকীর্ত্তন। ২রা বৈশাখ, হাজারিবাগ ব্রহ্মমন্দিরে সন্ধ্যার পর উপাসনা। ধার্ম্মিক ও সংসারীর তুলনা উপদেশের বিষয়। সম্পাদকের গৃহে স্ত্রীলোকদিগের জন্য সংগীত ও সংকীর্ত্তন। ৫ই বৈশাখ, হাজারিবাগ ব্রাহ্মসমাজে প্রাতে ও সন্ধ্যার পর উপাসনা ও উপদেশ। ৮ই বৈশাখ হাজারিবাগ ব্রহ্মমন্দিরে গীতা পাঠ ও আলোচনা। ১২ই বৈশাখ হাজারিবাগ ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে উপাসনা এবং সন্ধ্যার পর উপাসনা ও উপনিষদের একটী শ্লোক ব্যাখ্যা, ১৩ই বৈশাখ 'কেশব হল' প্রতিষ্ঠা এবং তদুপলক্ষে সঙ্গীত ও 'কেশবচন্দ্রের মহত্ব' বিষয়ে বক্তৃতা। ১৫ই সমাজমন্দিরে সঙ্গত। ১৮ই "সমাজ সংস্কার" বিষয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতা। ১৯এ প্রাতে ও সন্ধ্যায় উপাসনা ও উপদেশ।

দান—বেনারস ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক বাবু গুরুচরণ সমাদার লিখিয়াছেন:—কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে বেনারস ব্রাহ্মসমাজের সংস্পৃষ্ট পাবলিক থষ্টিক্ লাইব্রেরির সাহায্যার্থ নিম্নলিখিত এককালীন দান সমূহ সমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের হস্তগত হইয়াছে:—

শ্রীযুক্ত বাবু পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় (করৌলির মহারাণীর প্রাইভেট সেক্রেটারি) ১০৲, ক্ষেত্রনাথ ঘোষ (কাণপুর) ১০৲, মহেন্দ্রনাথ সরকার (বেনারস) ২৲, রামচন্দ্র মল্লিক (বেনারস) ২৲, রামরূপ ঘোষ (মৃজাপুর) ৫৲, নীলমণি পাল (বেনারস) ১৲, একজন বন্ধু (বেনারস) ২৲, হারাণচন্দ্র বসু (বর্দ্ধমান) ১৲, জনৈক হিতেচ্ছু (বেনারস) ॥০, গোপালচন্দ্র কর্ম্মকার (বেনারস) ॥০, সমষ্টি—৩৪৲।

নামকরণ—গত ২৩এ বৈশাখ বরিশালনিবাসী বাবু রাখালচন্দ্র রায়ের পুত্রের নামকরণ ও অন্নারম্ভ ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। স্থানীয় প্রচারক বাবু কালীমোহন দাস এবং বাবু মনোরঞ্জন গুহ দুইবেলা দুইজনে উপাসনার কার্য্য করিয়াছেন। বালকটীর নাম দেবকুমার রাখা হইয়াছে।

বিলডিংফণ্ড কমিটীর চাঁদা আদায়।

১৮৮৫ সনের জানুয়ারি হইতে ১৮৮৭ সনের এপ্রেল পর্য্যন্ত যে সমস্ত চাঁদা আদায় হইয়াছে তাহার তালিকা।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের জের——————————৩২,৬৯৬৸৶৪ পাই

নাম	স্থান	টাকা
বাবু গিরিশচন্দ্র রায়	কলিকাতা	৪৲
,, কালীনাথ দত্ত	মজিলপুর	৪৲
,, কালীশঙ্কর সুকুল	কলিকাতা	১০৲
,, মহেন্দ্রনাথ দাঁ	তেজপুর	২০৲
,, প্রসন্নকুমার রায় চৌধুরী	বালিগঞ্জ	২৲
,, ত্রৈলোক্য নাথ দেব	কলিকাতা,	২৲
,, তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়	ঐ	২॥০
,, জগচ্চন্দ্র দাস	আসাম	৫০৲
,, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	কলিকাতা	৩৲
,, কৃষ্ণকুমার মিত্র	ঐ	৬৲
,, দুর্গানন্দ সেন	মেদিনীপুর	১২৲
,, কেদারনাথ রায় মুন্সেফ		৪০৲
,, দুকড়ি ঘোষ	কলিকাতা	১০৲
,, রজনীনাথ রায়	ঐ	৭৫,
,, পবনচন্দ্র মল্লিক	বালীয়া	
,, জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস	কলিকাতা	১০৲
,, রাধানাথ রায়	কটক	১০৲
,, কিশোরীলাল রায়	কাঁকিনা	২৲
,, গিরিশচন্দ্র রায়	ঐ	২৲
,, কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ	১৲
,, সারদাচরণ ডাক্তার	ঐ	১৲
,, গৌরলাল রায়	ঐ	২৲
,, গোবিন্দচন্দ্র বক্সী	ঐ	১৲
,, হরিনাথ ঠাকুর	ঐ	।৶০
,, কুঞ্জলাল সরকার	ঐ	॥০
,, কৃষ্ণচন্দ্র দাস	ঐ	৴০
,, বঙ্কবিহারী পোদ্দার	ঐ	॥০
,, নীলকমল সিংহ	ঐ	২৲
,, গৌরসুন্দর রায়	ঐ	১৲
,, উমাচরণ সেন	জলপাইগুড়ি	১৲
,, মোহিনীমোহন বসু	ঐ	২৲
,, রাজকুমার সেন	চন্দ্রগ্রাম, ত্রিপুরা	১০৲
,, জানকীবল্লভ সেন জমিদার	রঙ্গপুর	৫০৲
,, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	কলিকাতা	১॥৶০
,, কালীচরণ ঘোষ	ঐ	২০৲
,, উপেন্দ্রনাথ দে	সৈয়দপুর	২৲
,, কালীনাথ পরামাণিক	কলিকাতা	৫৲
,, শিবচন্দ্র দেব	কোন্নগর	৫৲
,, জগৎহরি সেন	ভবানীপুর	২৲
,, অভয়াদাসবসু	কলিকাতা	৫৲
,, বাবু বৈকুণ্ঠচন্দ্র বসু	ঐ	২৫৲
কুমার মহিমারঞ্জন রায়চৌধুরী	কাকিনীয়া	২০০৲
একজন দরিদ্র	কোচবিহার	
মাঃ মহেন্দ্রনাথ মিত্র		
বাবু দলুসিং	ঢাকা	১৲
মহারাজ	বর্দ্ধমান	৩০০৲
বাবু কালীমোহন ঘোষ	দেরাদুন	১৪৲
,, বিপিনচন্দ্র পাল	কলিকাতা	২৫৲
,, যদুমণি ঘোষ	কটক	৫০৲
,, বিপিনবিহারী বসু	লক্ষ্নৌ	২৫৲
একজন বন্ধু—মাঃ শিবনাথ শাস্ত্রী		৫৲
বাবু বিপিনবিহারী রায়	মাণিকদহ	১০০৲
কেদারনাথ রায়	কলিকাতা	২৪॥০
ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়	ঐ	৫০৲
আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়	ঐ	১২,
যদুনাথ চৌধুরী	ঐ	৫০০,
বরদানাথ হালদার	লক্ষ্মীপুর	৬০৲

মন্দিরের ঋণ শোধার্থ আদায়।

নাম	স্থান	টাকা
বাবু বিপিনবিহারী রায়	মাণিকদহ	১০৲
,, প্রকাশচন্দ্র দেব	শিলং	১০৲
,, লক্ষ্মীকান্ত দাস	আসাম	১০৲
,, আনন্দমোহন বসু	কলিকাতা	১০৲
শ্রীযুক্তা স্বর্ণপ্রভা বসু	ঐ	১০৲
একজন দরিদ্র	কোচবিহার	১৲
বাগআঁচড়া ব্রাহ্মসমাজ		১০৲
বাবু গুণাভিরাম বড়ুয়া	নওগাঁ	৫৲
উদয়রাম দাস	আসাম	১০৲
,, শিবচন্দ্র দেব	কোন্নগর	১০৲
,, মথুরামোহন গঙ্গোপাধ্যায়	কলিকাতা	১০৲

,, কালীকুমার ঘোষ আদায় করিয়াছেন।

নাম	স্থান	টাকা
বাবু আশুতোষ ঘোষ	৪৲	
,, বিপ্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲	
,, জয়গোপাল দে	১৲	
,, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ	১৲	
,, যদুনাথ দত্ত	১৲	
,, মণীন্দ্রনাথ দত্ত	১৲	
,, বিনোদবিহারী বসু	১৲	
,, দলুসিং		৩৲
,, ব্রজেন্দ্রকুমার বসু	ডুমরাওন	১২,
একজন দরিদ্র	কোচবিহার	
,, তিনকড়ি বসু	পচম্বা	১০·

১৮৯৭৶

৩৪,৫৯৩॥৪ পাই

শ্রীগুরুচরণ মহলানবিশ
সাঃ ব্রা স বিল্‌ডিংফণ্ড কমিটির সম্পাদক

বিজ্ঞাপন।

৫০।৬০ বৎসর হইতে চলিল এই আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়া এদেশে জ্ঞান ধর্ম্ম বিস্তার করিতেছেন। এমন অনেক কৃতবিদ্য স্বদেশানুরাগী বিচক্ষণ লোক আছেন যাঁহারা এই সমাজভুক্ত। আবার এমনও অনেক লোক আছেন, যাঁহারা সমাজভুক্ত না হইয়াও ইহার কার্য্যে যথেষ্ট সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কলিকাতা ও মফস্বলে এই উভয় প্রকার লোকের সংখ্যা অল্প হইবে না। সম্প্রতি আমরা একটী ব্রাহ্মসমিতি প্রতিষ্ঠিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। যে কোনরূপে হউক যাঁহারা এই সমাজের সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া থাকেন, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্ব স্ব নাম ধাম সমাজের কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট সত্বর লিখিয়া পাঠাইলে আমরা বাধিত হইব।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক,—আদি ব্রাহ্ম সমাজ।

১৩নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিসন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচ দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও ২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে ১লা জ্যৈষ্ঠ প্রকাশিত।

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি ২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়।

	As.
* Almanac 1886 (Paper) As. 6, (Cloth) As. 8, reduced	2
1887	6
*Brahmo Year Book 1876	12
" 1877	12
" 1878	Re. 1
1879	" 1
1880	1
1881	1-8
1882	1
* The Gleams of the New Light	5
* Trust Deed of the Sadharan Brahmo Samaj Prayer Hall	2
* Whispers from the Inner Life	4
* A Discourse on the Nature and Progress of Theism	
* Lecture on Man	3
Roots of Faith	5
Practical Sermons by the late Rev. Dr. Carpenter	8
British Rule in India	6
বামা রচনাবলী ১ম ভাগ	১৲
নারীশিক্ষা ২য় ভাগ	৸০
মুক্তি ও তাহার সাধন সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশ	১৷৷০
ফুলের মালা	৴১০
মুক্তাহার	।০
সত্যদাসের সৎপ্রসঙ্গ	।/০
পৌরাণিক আখ্যায়িকা	/০
লহরী পদ্য (শ্রীমতী কুমুদিনী বসু প্রণীত)	৷৷০
* উপদেশমালা (আচার্য্যগণের উপদেশ)	।৶০
* প্রকৃতি চর্চ্চা	
* চিন্তামঞ্জরী (পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কৃত)	
* চিন্তাশতক (৺ প্রমদাচরণ সেন কৃত)	৶০
* প্রকৃত বিশ্বাস	/০
* জাতিভেদ (২য় প্রবন্ধ) (পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কৃত)	/১০
* জীবন-কাব্য (পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও অন্য কয়েক জনের লিখিত পদ্য)	৶০
ব্রহ্মোপাসনা প্রণালী	৶০
কেন আছি?	৴১০
* সাথী	৴১৫
* চরিত রহস্য	।০
* গৃহধর্ম্ম (পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কৃত)	।৶০
* জীবনালোক (কাগজের মলাট)	।/০
* ঐ (কাপড়ের মলাট)	৷৷০
* চিন্তাকণিকা (বাবু সীতানাথ দত্ত কৃত)	৴১০
* জীবনবিন্দু	৷৷০
* ব্রহ্মসংগীত ২য় ভাগ ২য় সং	৶০
* ঐ ১ম ভাগ ৪র্থ সং (কাগজের মলাট)	১।০
* ঐ ঐ (কাপড়ের মলাট)	১৷৷০
* সঙ্গীত রঞ্জন	
ধর্ম্মবিষয়ক প্রশ্নোত্তর (পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী কৃত)	/০
দীপ্তশিরার অভিষেক	১০
ধর্ম্মকুসুম	/০
ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা এবং আমার জীবনে ব্রাহ্মসমাজের পরীক্ষিত বিষয় (পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী কৃত)	৶০
* ব্রাহ্মধর্ম্ম ও নববিধান (ঐ)	৶০
* আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মের তালিকা	৶০
* জাতিভেদ ১ম প্রবন্ধ (পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কৃত)	৴১০
* পরকাল (ঐ)	৴১০
* প্রার্থনার আবশ্যকতা ও যুক্তি যুক্ততা (ঐ)	৴১০
* নীতি মালা	৶০
* সাধু দৃষ্টান্ত (জীবনালোক প্রণেতা কৃত)	৴১০
* সৎপ্রসঙ্গ	/১০
* সৎসঙ্গী (জীবনালোক প্রণেতা কৃত)	।০

ঈশ্বর স্তোত্র	/১০
ত লতিকা ১ম খণ্ড	৷৷০
* ব্রহ্মোপাসনা কর্ত্তব্য কেন? (পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কৃত)	৴১০
বক্তৃতা মঞ্জরী	৶০
দুঃখীপাপীর প্রতি ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তব্য (বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কৃত)	/১০
ব্রাহ্মধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রশ্নোত্তর	/০
সঙ্গীত মঞ্জরী (বাবু কালী প্রসন্ন ঘোষ প্রণীত)	।০
জীবন গতি নির্ণয় (বাবু চণ্ডীচরণ সেন প্রণীত)	।৶০
ব্রহ্ম পূজা (পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী কৃত)	৴১০
মহাত্মা রাজা রামমোহন (পদ্য)	৴১০
কুসুমহার	৶০
মহাত্মা থিওডোর পার্কারের জীবন চরিত (বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কৃত)	৸০
মার্টিন লুথারের জীবন চরিত (বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত)	।০
কারাকুসুমিকা (ঐ কর্ত্তৃক সংকলিত)	।৶০
বেদিয়া বালিকা (ঐ)	৶০
চিরজীবী (পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন কৃত)	।০
বঙ্গমহিলার প্রতি উপদেশ	/০
ধর্ম্মসাধন ১ম ভাগ	।০
ঐ ২য় ভাগ	৷৷৶০
মানব চরিত্রে প্রতিজ্ঞার বল (পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কৃত)	৴১০
চিরযাত্রী (পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন কৃত)	৷৷০
অলর্কচরিত্র (ঐ)	।০
ব্রাহ্মবচন সংগ্রহ	।৶০
চারুদত্তের গুপ্ত ধনাবিষ্কার (পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন কৃত)	/১০
যাজ্ঞবল্ক্য জীবনী (ঐ)	৶০
* তত্ত্বকৌমুদী একত্রে বাধা প্রতি খণ্ড	২৲
সাধন বিন্দু (বাবু সীতানাথ দত্ত কৃত)	।০
ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা (বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কৃত)	৷৷০
বৈরাগ্য (পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন কৃত)	৶১০
শান্তি ঐ	
সমাজ রক্ষা ও সামাজিক উন্নতি (পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কৃত)	৴১০
ঈশ্বর অচেতন শক্তি কি সচেতন পুরুষ? ঐ	৴১৫
ধর্ম্ম কি? ঐ	/০
চিন্তাবিন্দু	৶১০
*পাপীর নবজীবন লাভ	৶০
ব্রহ্ম সংগীত শিক্ষা	৷৷৶০
টম্‌কাকার কুটীর	৸০
ঐ ৩য় ভাগ	১৲
সারধর্ম্ম (বাবু রাজনারায়ণ বসু কৃত)	/১০
বিবিধ সন্দর্ভ (বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কৃত)	৷৷০
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা (বাবু রাজনারায়ণ বসু কৃত) ৷৷৶০ স্থলে	৷৷০
আত্ম-চিন্তা (পাপীর নব-জীবন লাভ প্রণেতা কৃত)	৶০
আখ্যানকুসুম	।/০
বালকবন্ধু	/০
মহম্মদ চরিত (বুদ্ধদেব চরিত প্রণেতা কৃষ্ণকুমার মিত্র কৃত)	১৲
মহাত্মা সেণ্টপলের জীবন বৃত্তান্ত	১৲
স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যা শিক্ষার আবশ্যকতা	৴১০
আশ্চর্য্য স্বপ্ন দর্শন	।/০
জ্যোতি কণা (বাবু দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী প্রণীত)	১।৶০
মহাপুরুষ জীবনী	।০
রাজা রামমোহন রায় (বালক বালিকাদিগের জন্য)	৴১৫
লক্ষ্মীমণী চরিত	।০
আত্মোন্নতি	৶০
বঙ্গগৃহ	৷৷৶০
কুমুদনাথ	৶০
পরমহংস রামকৃষ্ণের উক্তি ১ম ভাগ	/০
ঐ ২য় ভাগ	

* এই চিহ্নিত পুস্তকগুলি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিজস্ব

নূতন পুস্তক ! নূতন পুস্তক !!

* উপহার ।

(সপ্তপঞ্চাশত্তম মাঘোৎসবের সময় অভিনন্দন পত্রের উত্তরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের উপদেশ)

সুন্দর কাপড়ে বাঁধা। মূল্য ।০

বিজ্ঞাপন ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দাতব্য ও প্রচার কার্য্যের দাতব্য হিসাবে যাঁহার নিকট যাহা প্রাপ্য আছে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক সকলে এই সময় আপন আপন দেয় প্রদান করিলে, বিশেষ উপকৃত হওয়া যায়! সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেক ব্যয়ের প্রয়োজন অর্থাভাবে তাহা সুন্দর ও সুশৃঙ্খলরূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারে না। অতএব সভ্য, মহোদয়গণ এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হন একান্ত প্রার্থনা। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগের নিকট লিখিত অনেক পত্র ফিরিয়া আসিতেছে। ইহা দ্বারা অনুমিত হয়, তাঁহারা স্থান পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। যাহারা অল্প সময়ের মধ্যে স্থান পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহারা বর্ত্তমান ঠিকানা জানাইলে বাধিত হইব।

সাঃ ব্রাঃ সমাজ কার্য্যালয় — শ্রীশশিভূষন বসু

২৫শে ফেব্রুয়ারি ১৮৮৭ — সহঃ সম্পাদক, সাঃ ব্রাঃ সমাজ

বিজ্ঞাপন ।

তত্ত্ব-কৌমুদী ।

তত্ত্বকৌমুদীর গ্রাহক মহাশয়দিগের নিকট বিনীত নিবেদন তাঁহারা অতি শীঘ্র আপনাদের দেয় মূল্য প্রদান করিয়া বাধিত করিবেন। পত্রিকার মূল্য অধিকদিন অনাদায় থাকিলে কোন রূপেই সুশৃঙ্খলার সহিত কার্য্য চলিতে পারে না। সুতরাং গ্রাহক মহাশয়গণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাইতেছে তাঁহারা সকলেই অনুগ্রহপূর্ব্বক তত্ত্বকৌমুদীর মূল্য প্রদানে মনোযোগী হইবেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়
২১১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা — কার্য্যাধ্যক্ষ।

বিজ্ঞাপন ।

"ব্রাহ্ম বালক বালিকার জন্ম রেজিষ্টারি"

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয়ে ব্রাহ্ম বালক বালিকাদিগের জন্মের রেজিষ্টারি করা হইয়া থাকে। নবজাত শিশুগণের ন্যায় বয়স্ক বালক বালিকাদিগেরও জন্ম বিবরণ ইহাতে রেজিষ্টারি হইতে পারিবে। প্রত্যেক জন্ম রেজিষ্টারির ফি চারি আনা মাত্র। যে সকল ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা তাঁহাদিগের সন্তানগণের জন্ম বিবরণ স্থায়ীরূপে রক্ষা করিবার ইচ্ছা করেন ফি সহিত নিম্নলিখিত বিবরণ গুলি পাঠাইলে রেজিষ্টারি করা হইবে—

১। পিতামাতার নাম।
২। কোন্ সন্তান (১ম কি ২য় প্রভৃতি) বালক বা বালিকা।
৩। বিজ্ঞাপন কারীর নাম ও ঠিকানা।
৪। জন্মস্থান ও সময় (বর্ষ, মাস, দিবস, ঘণ্টা)

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়
২১১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা — শ্রীশশিভূষণ বসু, সহকারী সম্পাদক

বিজ্ঞাপন ।

"সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ উপাসনালয়"

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা মন্দির নির্ম্মাণার্থ যে অর্থ ব্যয় হইয়াছে তাহার দরুন এখনও সহস্রাধিক টাকা ঋণ রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন মন্দিরের সম্মুখের বারেন্দাটী প্রস্তুত হয় নাই। ঐ বারেন্দাটী না হওয়ায় উপাসনালয় এখনও অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। বারেন্দাটী প্রস্তুত করিতে প্রায় চারি হাজার টাকার প্রয়োজন। অতএব বিনীত নিবেদন যাঁহারা মন্দিরের চাঁদা স্বাক্ষর করিয়া এ পর্য্যন্ত টাকা দেন নাই, তাঁহারা দয়া করিয়া শীঘ্র শীঘ্র স্বীয় স্বীয় দেয় অর্থ প্রদান করিয়া করেন নাই তাঁহারাও অনুগ্রহ পূর্ব্বক কিছু কিছু দান করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে ঋণদায় হইতে মুক্ত করুন!

২১০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা — নিবেদক
শ্রীগুরুচরণ মহলানবিশ
বিল্ডিং ফণ্ড কমিটির সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন ।

'স্থায়ী প্রচার ফণ্ড'

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের স্থায়ী প্রচার ফণ্ডে অনুগ্রহ পূর্ব্বক যাঁহারা দানাঙ্গীকার করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতেছে যে শীঘ্র শীঘ্র তাঁহাদের অঙ্গীকৃত অর্থ প্রদান করিয়া বাধিত করিবেন। ব্রাহ্মসমাজের হিতৈষীগণ যাঁহারা এ পর্য্যন্ত এই ফণ্ডের সাহার্য্যার্থ কিছুই দানাঙ্গীকার করেন নাই, তাঁহাদের নিকট বিনীত অনুরোধ যেন এই কার্য্যের গুরুত্ব অনুভব করিয়া সকলেই যথাসাধ্য সাহায্য প্রদান করিয়া বাধিত করেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়
২১১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা — শ্রীশশিভূষণ বসু, সহকারী সম্পাদক।

NOTICE.

INDIAN MESSENGER

The subscribers to the Indian Messenger are requested to pay off their dues without further delay. Every one can easily understand that what amount of difficulties we are to undergo when the subscribers do not pay off their dues in time. Moreover there are some who do not condescend to pay their subscription even for the first year. We once more remind them kindly to send their subscriptions at their earliest opportunity.

I. M. Office
211, Cornwalis Street — B. L. GANGULY. *Manager, I. Messenger.*

NOTICE.

A charity section has lately been opened in connection with the Sadharan Brahmo Samaj with the object of alleviating the sufferings of miseries irrespective of creed and colour. We earnestly hope the general public will come forward with their assistance, upon which alone the life of such institutions depends.

Subscriptions may be sent to the undersigned.

210/4 Cornwallis Street — DEVIPRASANNA RAICHOWDHURI, *Secretary, Charity Section S. B. Samaj*

বিজ্ঞাপন ।

ব্রাহ্মমিসন্ প্রেস ।

এই প্রেসে পুস্তক, সংবাদপত্র, চেক, দাখিলা, ফারম ও অন্যান্য নানাপ্রকার মুদ্রণ কার্য্য নির্দ্ধারিত মূল্যে, নিয়মিত সময়ের মধ্যে ও সুন্দররূপে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। মফস্বলের কার্য্যের প্রুফসংশোধনের ভারও লওয়া গিয়া থাকে। এই প্রেস হইতে যাহা আয় হইবে, তাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থ ব্যয় হইবে। মফস্বলের বন্ধুগণ এই প্রেসে কার্য্য দিয়া আমাদিগকে বাধিত করিবেন।

ব্রাহ্মমিসন্ প্রেস,
১৩নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট। — শ্রীকুঞ্জবিহারী সেন। ম্যানেজার

বিজ্ঞাপন ।

ব্রাহ্মমিসন্ প্রেস ট্রাক্ট।

এই প্রেস হইতে প্রতি মাসে ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ক প্রবন্ধ সকল মুদ্রিত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে। মূল্য পুস্তকের আকৃতি অনুসারে নির্দ্ধারিত হইবে, অর্থাৎ প্রতি ফর্ম্মা ৴১০ হিসাবে লওয়া যাইবে। যাঁহারা নিয়মিত গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আমাদিগকে জ্ঞাত করিলে পুস্তক প্রকাশ হইবা মাত্র তাঁহাদিগকে পাঠান যাইবে। আগামী মাসে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত "সামাজিক ব্যাধি" নামক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে। মফস্বলস্থ ব্রাহ্মবন্ধুগণ এই ট্রাক্টের জন্য গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া আমাদিগকে বাধিত করিবেন। ৴১০ মাশুলে একত্রে ১০।১২ খানি পুস্তক যাইতে পারে।

ব্রাহ্মমিসন্ প্রেস, — শ্রীকুঞ্জবিহারী সেন।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১০ম ভাগ।
৪র্থ সংখ্যা।

১৬ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার, ১৮০৯ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৮।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩
প্রতি খণ্ডের মূল্য

পূজার আয়োজন

সখা ওই ডাকিছে আমায়।

(১)

কাতরে মুখের পানে চেয়ে
সখা ওই ডাকিছে আমায় ;
বেজে ওঠে হৃদয়ের বীণা,
রহিতে যে পারি না হেথায়।

(২)

নয়নের জল ঝরে পড়ে,
ভাবাবেশে প্রাণ ভেসে যায় ;
প্রেম বাহু প্রসারিয়ে, 'সখা, সখা' বলে
সখা ওই ডাকিছে আমায়।

(৩)

তোমরা কি শুনেছ সে স্বর,
তোমরা কি দেখেছ তাঁহায় ?
হৃদয়ের দ্বারে দাঁড়াইয়া
সখা বলে, 'সখা, আয় আয়'।

(৪)

কাতর সে প্রণয়ের কথা
হৃদয়-মাতান ভালবাসা ;
অনন্ত প্রেমের বাহুপাশে
জড়াইয়া মিটেনাক আশা।

(৫)

ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও মোরে,
বুঝেছি গো দেখ নাই তায় ;
জগতের ক্ষুদ্র প্রেম দিয়ে
পুরাইতে চাহিছ হিয়ায়।

(৬)

হৃদয়ের অনন্ত পিপাসা
জগত কি মিটাইতে পারে ?
তবে কেন পথ ভুলে হেথা
আইলে রে ছাড়িয়া তাঁহারে ?

(৭)

দীন হীন কাঙ্গালীর বেশে
পড়ে আছি পৃথীর ধূলায় ;
মুখ পানে চেয়ে প্রাণ সখা
কত না কাতরে বলে 'আয়'।

(৮)

একবার কাণ পেতে শোন,
আঁখি মেলি দেখরে তাঁহায়,
নয়নে রহে না অশ্রুধার—
সখা ওই ডাকিছে আমায়।

আহ্বান।

ধন, রত্ন, সকলি তোমার,
ত্রিভুবন, তোমার ভাণ্ডার,
কিন্তু নাহি তব, দীনতা বিভব,
আমি দিব, আছে তা আমার।

স্থান, তব অনন্ত আসন,
রবি শশী তার আভরণ,
চাও কি বসিতে, অনুতপ্ত চিতে ?
আছে মম বিছাব এখন।

সারাদিন, ধরায় গগণে,
কত কথা, গোপনে গোপনে
আমিই কি রব কেবল নীরব,
মন ব্যথা চাপি নিজ মনে ?

কি বুঝাব—তুমি জ্ঞানময়—
কীটাধমে, হওগো সদয় ;
এসো, বস্যে, শোন—শোনাও আপন
পরিত্রাণ-বাণী সুধাময়।

মূলে একটী বিস্মৃতিশূন্য চিরজাগ্রত আত্মা থাকা আবশ্যক। যিনি পূর্ব্ব প্রবাহিত ভাবস্রোতের সহিত পর-প্রবাহিত ভাবস্রোতকে সংযুক্ত করেন, তিনি কখনও বিস্মৃত হন না, নিদ্রিত হন না, তিনি নিত্য সাক্ষী; ভাবস্রোত তাঁহার সম্মুখ দিয়া প্রবাহিত হইয়া যায়, (তিনি নিজেই তাহা প্রবাহিত করেন) কিন্তু ভাবের জ্ঞান তাঁহাতে স্থির নিত্য ভাবে বর্ত্তমান থাকে। পাঠক নানা দৃষ্টান্ত লইয়া উপরোক্ত যুক্তিটীর পরীক্ষা করুন্, দেখিবেন সমস্ত জ্ঞানের মূলে নিত্য সাক্ষী চিরজাগ্রত পরমাত্মা বর্ত্তমান। মায়াবাদী অভিজ্ঞতার কথা, অচ্ছেদ্য ভাবযোগের (Inseparable Association) কথা যতই বলুন্ না কেন, সমুদায়ের মূল এক নিত্যসাক্ষী বিশ্বাত্মা। জগতের উপকরণরূপী ভাব সমূহ তাঁহাতে নিত্যযোগে সংযুক্ত আছে বলিয়াই উহারা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে সংযুক্তাকারে প্রকাশিত হইতেছে। কল্যকার জগৎ আর অদ্যকার জগৎ যে এক তাহা জানিতে পারিতাম না, কল্যকার আমি আর অদ্যকার আমি যে এক তাহা জানিতে পারিতাম না, সংক্ষেপতঃ জ্ঞান অসম্ভব হইত, এবং এই জ্ঞান-প্রতিষ্ঠিত জগৎ অসম্ভব হইত, যদি জ্ঞানের মূলে আত্মার আত্মারূপে সেই নিত্য সাক্ষী পরমাত্মা বর্ত্তমান না থাকিতেন। নিরুপাধিক নির্গুণ আত্মাবাদী মায়াবাদ চিন্তাসাগরের একটা বাহিরের তরঙ্গ মাত্র। একটু গভীরভাবে চিন্তাসাগরে ডুবিলেই ইহার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ উপাসনা। *

অনেক স্থলে এরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, নিজ জীবনেই ইহা সময়ে সময়ে দেখিতে পাইয়াছি, যে একজন ব্রাহ্ম প্রতিদিন নিয়মিতরূপে ব্রাহ্মসমাজের নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে উপাসনা করিতেছেন, মধ্যে মধ্যে হয়ত সরস ভাবও পাইতেছেন, অথচ জীবন উন্নত হইতেছে না। এইরূপে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, এমন কি, বৎসরেরপর বৎসর চলিয়া যায়, তথাপি জীবনের কিছুই উন্নতি লক্ষিত হয় না। ধর্ম্ম সমাজে এরূপ জীবন অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক লোক দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহাদের চরিত্র নির্দ্দোষ, তাঁহারা পরোপকারী, কর্ম্মঠ লোক, ভাল কথাও অনেক কহিতে পারেন; কিন্তু তাঁহাদের আভ্যন্তরিক জীবন-স্রোত জমিয়া গিয়াছে, প্রবাহশূন্য হইয়া গিয়াছে। কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে তাঁহাদের ঈশ্বরোপলব্ধি যত টুকু ছিল, আজও ঠিক্ তত টুকুই আছে, তাঁহারা তাঁহাকে উজ্জ্বলতরভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে তাঁহারা ঈশ্বরকে যতটুকু প্রীতি করিতেন, আজও তত টুকুই করিতেছেন, তাঁহাদের ঈশ্বর-প্রীতি কিছুই বর্দ্ধিত হয় নাই। কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে ঈশ্বরের জন্য, ধর্ম্মের জন্য যতটুকু ত্যাগস্বীকার করিতে পারিতেন, এখনো তত টুকুই পারেন, অধিক পারেন না। পূর্ব্বে সংসারের প্রতি, নিজের সুখ স্বার্থের প্রতি যতটুকু আসক্তি ছিল, আজও তাহাই আছে, কিছুই কমে নাই। পূর্ব্বে মুখের চেহারা যেরূপ ছিল, আজও তাহাই আছে, মুখে কোন উজ্জ্বলতর রেখা পড়ে নাই। এরূপ অবস্থা অল্লাধিক পরিমাণে সকলেই অনুভব করিয়া থাকিবেন। এরূপ অবস্থাতে হৃদয়ের বরফ যে একেবারেই গলে না তাহা নহে। হয়ত উৎসবাদি উপলক্ষে, হয়ত কোন বিশেষ শুভ ঘটনা উপলক্ষে, কোন সাধু সহবাসে হৃদয় কিয়ৎ পরিমাণে বিগলিত হয়, জীবনে কতক সংগ্রাম উপস্থিত হয়। কিন্তু এই সংগ্রামে কেবল এই মাত্র লাভ হয় যে, জীবনের যতটুকু উন্নতি হইয়াছে, ততটুকু কোন প্রকারে রক্ষিত হয়, জীবন পশ্চাৎগামী হয় না; কিন্তু এই সংগ্রামে জীবন স্থায়ী ক্রমিক উন্নতির পথে প্রতিষ্ঠিত হয় না, জীবনে অবিচ্ছেদ্য উন্নতির স্রোত প্রবাহিত হয় না।

এরূপ দুরবস্থার কারণ কি? এরূপ দুরবস্থার নানা কারণ থাকিতে পারে; একটী বিশেষ কারণ প্রত্যক্ষ উপাসনার অভাব। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভেদে উপাসনা দ্বিবিধ। নিজের অভিজ্ঞতাতে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পরিচয় না পাইয়া, ঈশ্বরকে সাক্ষাৎভাবে প্রকৃত বস্তু বলিয়া অনুভব না করিয়া, তিনি আছেন ইহা সাধু মুখে বা লোক পরম্পরায় শুনিয়া, অথবা অধিক হইলে জগৎ কৌশলাদি দেখিয়া বুদ্ধি দ্বারা তাঁহার অস্তিত্ব স্থির করিয়া যে বিশ্বাস জন্মে, সে বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া যে উপাসনা করা যায়, সে উপাসনাকে পরোক্ষ উপাসনা বলিতেছি। সংক্ষেপতঃ, পরোক্ষ অসাক্ষাৎ বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত যে উপাসনা, তাহারই নাম পরোক্ষ উপাসনা। আর, ঈশ্বরকে অন্তরে বাহিরে প্রকৃত অনতিক্রমণীয় সত্তারূপে স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিয়া যে জীবন্ত উপাসনা করা যায় তাহারই নাম প্রত্যক্ষ উপাসনা। এই দ্বিবিধ উপাসনার কতিপয় লক্ষণ, ফল এবং ইহাদের কয়েকটী পার্থক্য যথাসাধ্য উল্লেখ করিতেছি।

১। পরোক্ষ উপাসনা অল্লাধিক পরিমাণে কল্পনার অধীন। "ইহাতে ঈশ্বর আছেন," "ঈশ্বর আছেন," বা "তুমি আছ," "তুমি আছ" এরূপ চিন্তাদ্বারা অথবা কোন নাম জপদ্বারা ঈশ্বরের বর্ত্তমানতা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতে হয়। এরূপ চিন্তা বা জপে যে কিছু উপকার হয় না তাহা নহে, অনেক উপকার হয়। ইহাতে মনের চঞ্চলতা দূর হয়; ইহাতে অন্ততঃ সেই সময়ের জন্য ঈশ্বরের বর্ত্তমানতাতে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে ও হৃদয়ে ভাবের উদ্রেক হয়। কিন্তু ইহাতে যে ঈশ্বরোপলব্ধি হয় তাহা প্রকৃত ঈশ্বরোপলব্ধি নহে। উহা কেবল মানসিক ব্যায়ামের ফল, আত্মাতে ঈশ্বরের স্বয়ং প্রত্যক্ষ প্রকাশ নহে। ইহা যে কেবল মানসিক ব্যায়ামের ফল, ঈশ্বরের প্রকৃত প্রকাশ নহে তাহার প্রমাণ এই যে, এরূপ উপাসনার অব্যবহিত পরেই ঈশ্বরাস্তিত্বে সন্দেহ আসিতে পারে এবং সময়ে সময়ে আসিয়া থাকে। ঈশ্বরের প্রকৃত প্রকাশ উপলব্ধি করিলে এরূপ হইত না। প্রত্যক্ষ উপাসক যিনি তিনি ঈশ্বরোপলব্ধি করিবার জন্য "তুমি আছ" "তুমি আছ" বলেন না, কোন নামও জপ করেন না, তিনি কেবল প্রজ্ঞাচক্ষুতে, জ্ঞানমার্জ্জিত চক্ষুতে

* সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা-মন্দিরে প্রদত্ত উপদেশের ভাব গ্রহণে লিখিত।

প্রথমে সংসার হইতে তাড়াইয়া দিয়া অবশেষে তাঁহাকে পাইবার জন্য মানুষকেও সংসার ত্যাগ করিয়া নির্জ্জন অরণ্যে গিয়া তপস্যা করিতে পরামর্শ দেন। পরমেশ্বরের সঙ্গে যে সংসারের কোন সম্পর্ক আছে তাহা তাঁহারা কার্য্যতঃ স্বীকার করেন বলিয়া বোধ হয় না। এই মতাবলম্বী লোকেরা ইহজীবনকে কারাগার স্বরূপ বিবেচনা করেন ও এই কারাগার হইতে মুক্ত হইতে পারিলেই আপনাদিগকে ধন্য ও সুখী মনে করেন। এই জন্য ইঁহারা পার্থিব জীবনের সকল বিষয়ে উদাসীন। সংসারের প্রলোভন হইতে দূরে পলায়ন করিয়া, মানব প্রকৃতি-নিহিত প্রবৃত্তি নিচয়ের বিনাশ সাধন পূর্ব্বক একাকী নির্জ্জনে স্বীয় ইষ্টদেবতার ধ্যানে চিত্ত সমাধান করাই ইঁহাদের মতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবার কথা ইঁহাদের কল্পনাতেও আসে না।

আর এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁহাদের বিশ্বাস এই যে, পার্থিব জীবন মানবাত্মার পক্ষে বিদ্যালয় স্বরূপ। ইহা শিক্ষার অবস্থা, পরীক্ষার অবস্থা। এখানে থাকিয়া মানুষ পরকালের জন্য উপযুক্ত হয়। ইঁহাদের মতে মৃত্যুর পরেই প্রকৃত জীবনের আরম্ভ। পৃথিবীতে মানুষ যে ভাবে জীবন কাটাইবে তদনুসারে সে মৃত্যুর পর স্বর্গ বা নরকে গমন করিবে। এই দুই শ্রেণীর লোকের মধ্যেই এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁহারা মনে করেন যে, স্বর্গ বলিয়া একটী বিশেষ স্থান আছে; পরমেশ্বর স্বয়ং সেখানে বিরাজমান। সাধুগণ মৃত্যুর পর সেই স্থানে বাস করিবার অধিকার লাভ করেন। সেখানে দুঃখ নাই, শোক নাই, জরা নাই মৃত্যু নাই, পরীক্ষা নাই প্রলোভন নাই। ইঁহাদের বিবেচনায় এই অমৃতলোকে যাইবার জন্য প্রস্তুত হওয়াই পার্থিব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য; মানুষকে পৃথিবী হইতে স্বর্গে লইয়া যাওয়াই ধর্ম্মের একমাত্র লক্ষ্য।

ফলতঃ এই স্বর্গলোকে গমন করিবার জন্য, সেখানে গিয়া ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য দেখিয়া কৃতার্থ হইবার জন্য, দুঃখ শোকের প্রভাবের অতীত হইয়া ভূমানন্দ উপভোগ করিবার জন্য সকল ধর্ম্মাবলম্বী লোকই ব্যাকুল। কেহ কেহ আবার এই স্বর্গকে সকল প্রকার শারীরিক সুখের আবাস ভূমি বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। যে যাহা হউক, এই স্বর্গ লাভ করিবার জন্য, দুঃখ-শোক-পূর্ণ পৃথিবী ছাড়িয়া সেই সুখধামে গমন করিবার জন্য মানুষ না করিয়াছে এমন কর্ম্ম নাই, না সহিয়াছে এমন দুঃখ নাই। ধর্ম্মের জন্য মানুষ এ পর্য্যন্ত যত শারীরিক ক্লেশ সহ্য করিয়াছে এমন কিছুরই জন্য নহে। মৃত্যুর পর অনন্তকাল স্বর্গে বাস করিবার অধিকার পাইবে, এই আশায় অনেকে আজীবন শারীরিক ক্লেশ সহ্য করিতে, এমন কি, অবশেষে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেও সঙ্কুচিত বা ভীত হয় নাই। এই পৃথিবী ছাড়িলে পর সুখধামে যাওয়া যাইবে তাহার জন্য মানুষের কত উৎসাহ, কত আনন্দ, কত ত্যাগস্বীকার!

ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন, ঈশ্বরকে সংসার হইতে তাড়াইয়া দিলে চলিবে না, পৃথিবী হইতে স্বর্গরাজ্য দূরে রাখিয়া দিলে চলিবে না। ইহার তুল্য ভ্রম আর হইতে পারে না। এই ভ্রমে জগতের অনেক অনিষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে। ঈশ্বরকে সংসারে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে; পৃথিবীতে স্বর্গ আনিতে হইবে। ইহকাল ও পরকালের মধ্যে প্রভেদ নাই; ব্যবধান নাই। এই পৃথিবীতে থাকিয়াই স্বর্গে বাস করা যায়। স্বর্গ বলিয়া কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই; আপনার উন্নত অবস্থা, পরমেশ্বরের সহিত যোগের অবস্থা, আত্মার মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ—ইহাই স্বর্গ, ইহা ভিন্ন আর স্বর্গ নাই, থাকিতে পারে না। সকল স্থানে থাকিয়াই এই অবস্থা লাভ করা যাইতে পারে—পারে কেন?—এই অবস্থা লাভ করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। ঈশ্বর হইতে আত্মার যে বিচ্ছিন্ন অবস্থা, তাহাই নরক, সম্পূর্ণরূপে তাঁহার অধীন হওয়া—ইহারই নাম সশরীরে স্বর্গবাস; ইহারই নাম জীবন্মুক্ত অবস্থা।

বস্তুতঃ স্বর্গরাজ্য বাহিরের জিনিস নহে। ইহা ভিতরের জিনিস। যিনি প্রাণের মধ্যে ইহা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন, অপরের হৃদয়ে ইহা প্রতিষ্ঠিত দেখিবার জন্য ইচ্ছা হওয়া তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। এই জন্যই জীবন্মুক্ত মহাত্মাগণ, প্রেমিক ভক্তগণ কেবল আপনারা স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। জগতের নরনারী সকলে যাহাতে সাধু হইতে পারে, পরমেশ্বরকে লাভ করিতে পারে তাহার জন্য তাঁহাদের প্রাণ লালায়িত হয়; জগতের দুঃখ পাপ দেখিয়া তাঁহাদের প্রাণ কাঁদে। তাই তাঁহারা সকলকে ঈশ্বরের দিকে লইয়া যাইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেন। ইহারই নাম পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা। যিনি পরমেশ্বরকে পাইয়াছেন তাঁহার আর স্বর্গবাসের বাকি কি রহিল? স্বয়ং ঈশ্বর যাঁহার হৃদয়ে সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, স্বর্গ ত তাঁহার প্রাণের মধ্যে। যে গৃহে সেই গৃহদেবতার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেই গৃহই ত স্বর্গ। এইরূপ লোকের সংখ্যা, এইরূপ পরিবারের সংখ্যা যতই বাড়িতে থাকিবে ততই পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার দিন নিকটবর্ত্তী হইবে। ইহা দুই একদিন বা দুই একবৎসরের কর্ম্ম নহে। ঈশ্বরের বিশ্বাসী সন্তানকে সহস্র বাধাবিঘ্ন, সহস্র নৈরাশ্যের মধ্যেও আশাপূর্ণ প্রাণে খাটিয়া যাইতে হইবে। ফলের জন্য ব্যাকুল হইলে চলিবে না। এই আশা পূর্ণমাত্রায় ফলবতী হইতে কত লক্ষ বৎসর লাগিবে কে বলিতে পারে?

আমরা আবার বলি—ঈশ্বরকে সংসার হইতে তাড়াইয়া দিলে চলিবে না। পরমেশ্বরকে তাঁহার সংসার হইতে পৃথক্ করিয়া দিলে কেবল অবিশ্বাস ও পাপের দ্বার উন্মুক্ত করা হয়। মানব প্রকৃতিকে একেবারে বিনাশ করে এমন সাধ্য কাহার আছে? তুমি বনেই যাও আর যেখানেই যাও, প্রবৃত্তি তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাইবে। প্রলোভন বাহিরে নয়, প্রলোভন মনে। যদি বাস্তবিক পাপ দমন করিতে চাও, প্রবৃত্তির উপর আধিপত্য করিতে চাও, তবে পরমেশ্বরকে সংসার হইতে দূর করিয়া দিও না—সংসারের মধ্যে গৃহদেবতারূপে তাঁহাকে বসাও—সংসারের প্রত্যেক ব্যক্তি ও বস্তুর মধ্যে তাঁহার কৃপা অনুভব করিতে চেষ্টা কর—তিনি যে সকল প্রবৃত্তি দিয়াছেন তাহা তাঁহার ইচ্ছার অধীনে আনয়ন করিতে প্রাণপণে যত্ন কর—

সকল প্রকার সাংসারিক সুখকে তাঁহার দান বলিয়া কৃতার্থ চিত্তে গ্রহণ কর—কি প্রকৃতির শোভার মধ্যে কি অন্যস্থানে, কি সজনে কি নির্জ্জনে, কি গৃহে কি কার্য্যালয়ে পবিত্র পরমেশ্বরের প্রকাশ দেখিবার জন্য সচেষ্ট হও—দেখিবে সমস্ত জগৎ তোমার পক্ষে তীর্থস্থান স্বরূপ, দেবমন্দির স্বরূপ হইবে। যে সকল পদার্থ এখন প্রলোভন স্থানীয় হইয়া তোমার চিত্তকে কলুষিত করিতেছে, সেই সকল পদার্থই পরমমিত্রের ন্যায় তোমাকে ঈশ্বরের নিকট যাইবার সাহায্য করিবে, তোমার বসন ভূষণ, পরিবার পরিজন, পুত্র কন্যা, সংসারের প্রত্যেক পদার্থ তোমার চক্ষে এক নূতনভাব ধারণ করিবে। যদি হৃদয়ে এই স্বর্গ দেখিতে চাও, যদি সশরীরে স্বর্গে বাস করিতে চাও, তবে সর্ব্বাগ্রে প্রাণের মধ্যে ঈশ্বরের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা কর।

এই পৃথিবীতে থাকিয়াই এই অবস্থা লাভ করা যাইতে পারে। ঈশ্বরের সাধুভক্ত সন্তানগণ এই পৃথিবীতে থাকিয়াই নিজ নিজ জীবনে এই অবস্থার প্রারম্ভ অনুভব করিয়াছিলেন। নিতান্ত দীন হীন পাপীর হৃদয়েও পরম দয়াময় পরমেশ্বর কখন কখন এই অবস্থার পূর্ব্বাভাস প্রকাশিত করেন। যিনি কখনও প্রাণ খুলিয়া পরমেশ্বরের উপাসনা করিয়াছেন, যিনি কখনও প্রাণের মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনিই ইহার সাক্ষী। তবে আমরা ইহা অসম্ভব মনে করিব কেন?

আত্মার স্বাধীনতা।

চতুর্থ প্রস্তাব।

বহির্জ্জগৎ ও অন্তর্জ্জগৎ কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলে চিরবদ্ধ; সুতরাং স্বাধীনতা বলিয়া জগতে যে কিছু আছে, ইহা অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি স্বীকার করিতে চান না।

কার্য্যকারণ শৃঙ্খল সত্ত্বেও রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা রহিয়াছে। কার্য্যকারণের সহিত উক্ত প্রকার স্বাধীনতার বিরোধ নাই। রাজনৈতিক বা সামাজিক স্বাধীনতা ও অধীনতা উভয়ই সমভাবে কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলের অন্তর্বর্ত্তী।

ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিবার,—প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার যে স্বাধীনতা তাহা কেহই অস্বীকার করেন না। যাঁহারা আত্মার স্বাধীনতা অস্বীকার করেন, তাঁহারা কখন এমন কথা বলেন না যে, মানুষের ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিবার স্বাধীনতা নাই। ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিবার এবং কোন প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইলে সাধ্যমত তাহা অতিক্রম করিবার ক্ষমতা যে মানুষের আছে, ইহা কোন শ্রেণীর দার্শনিকই অস্বীকার করেন না।

তবে যাঁহারা আত্মার স্বাধীনতা অস্বীকার করেন, তাঁহারা কি বলেন? তাঁহারা বলেন যে, মানুষ যাহাই কেন করুক না, তাহার প্রত্যেক চিন্তা, ভাব, বাসনা ও ইচ্ছা অচ্ছেদ্য কার্য্যকারণ-সূত্রে বদ্ধ। প্রত্যেক মানসিক অবস্থার কারণ পূর্ব্ববর্ত্তী মানসিক অবস্থা। প্রত্যেক মানসিক অবস্থার পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থার কার্য্য। কার্য্য অবশ্য কারণের অধীন। সুতরাং প্রত্যেক মানসিক অবস্থা শৃঙ্খল-বদ্ধ।

একটি কার্য্য অনুষ্ঠিত হইল। উহার কারণ কি? ইচ্ছা (will), ইচ্ছার কারণ কি? অভিসন্ধি (motive), অভিসন্ধির কারণ কি? চরিত্র (disposition), চরিত্রের কারণ কি? পিতৃ মাতৃ চরিত্র এবং চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী অবস্থা। এক শ্রেণীর দার্শনিকেরা এইরূপে তর্ক করিয়া প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করেন যে, জড় জগতের ন্যায় মানুষও কার্য্যকারণ শৃঙ্খল-বদ্ধ। বাস্তবিক তাঁহাদের মতে মানুষ জ্ঞান, ভাব, বাসনা ও ইচ্ছা-সমন্বিত কল মাত্র। তাঁহারা মানুষের ভিতরে সকলই কার্য্যকারণময় দেখেন; সুতরাং স্বাধীনতার স্থান দেখিতে পান না।

কিন্তু পূর্ব্বে সুস্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, মনুষ্যের ভিতরে কার্য্যকারণ শৃঙ্খলের অতীত স্থান আছে, সুতরাং স্বাধীনতারও থাকিবার স্থান আছে। কার্য্যকারণ সূত্রের সীমা—মানসিক অবস্থা সকল (mental phenomena); কিন্তু পরিষ্কাররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, আমি বা আত্মা মানসিক অবস্থা নহে। সকলের অস্তিত্ব মানসিক অবস্থা আমি বা আত্মার উপরে নির্ভর করে। আত্মারূপ সাগরে মানসিক অবস্থারূপ অগণ্য তরঙ্গ উঠিতেছে ও মিশাইতেছে। আমি বা আত্মা কার্য্যকারণ সূত্রের অতীত; সুতরাং উহাই স্বাধীনতার অধিষ্ঠান ভূমি।

আন্তরিক স্বাধীনতার বিরুদ্ধে আর একটি যুক্তি সচরাচর শুনিতে পাওয়া যায়। পরমেশ্বর যখন ত্রিকালজ্ঞ, প্রত্যেক মনুষ্যের ভাবী জীবনের প্রত্যেক ঘটনা তাঁহার অসীম জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে, পাপ কি পুণ্য যাহাই কেন কর না, সকলি যখন তিনি পূর্ব্বে হইতে জানেন, তখন মানুষের স্বাধীনতা কোথায়? তিনি যেরূপ জানেন সেইরূপই ঘটিবে; কাহার সাধ্য তাহা অন্যথা করে?

এই আপত্তিটি খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিবার পূর্ব্বে সরল ভাবে স্বীকার করিতেছি যে, আত্মার স্বাধীনতার বিরুদ্ধে যতপ্রকার যুক্তি আছে, তন্মধ্যে এইটি সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। ইহার মীমাংসা করা সহজ নহে। যাহা হউক, এসম্বন্ধে যাহা কিছু বুঝি, যথাসাধ্য পরিষ্কার করিয়া ব্যক্ত করিতেছি।

প্রথমতঃ, পরমেশ্বরের জ্ঞান ও মানুষের কার্য্য এ উভয়ের মধ্যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নাই। তিনি জানেন বলিয়া মানুষ করে, এমন নহে; মানুষ করে বলিয়া তিনি জানেন। আমি একটি মিথ্যকথা বলিয়াছি, তুমি জান। তুমি জান বলিয়া আমি বলিয়াছি, এমন নহে; আমি বলিয়াছি বলিয়াই তুমি জান। তোমার জ্ঞান ও আমার মিথ্যাকথা বলা এ উভয়ের মধ্যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নাই। তুমি জান, সুতরাং এমন কেহ বলিবে না যে, আমি স্বাধীন ভাবে মিথ্যাকথা বলি নাই। তুমি জানিতে পারিয়াছ বলিয়া যে, আমার সত্য বলিবার ক্ষমতা ছিল না, এরূপ নহে।

এস্থলে কেহ বলিতে পারেন যে, ভাবীকার্য্যের সহিত অতীত কার্য্যের তুলনা কেমন করিয়া হইবে? উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য কোথায়? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, অসাদৃশ্যই বা কোথায়? ইহাই কেবল দেখ যে, অতীত কার্য্যের সহিত যেমন তদ্বি-

ষয়ক জ্ঞানের কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নাই, সেইরূপ ভাবীকার্য্যের সহিতও তদ্বিষয়ক জ্ঞানের কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নাই। আমরা স্বাধীন ভাবে যাহা করিব, ত্রিকালজ্ঞ ঈশ্বর তাহা জানেন। তাহাতে আমাদের স্বাধীনতা লোপ হইবে কেন? তিনি মনুষ্যকে স্বাধীন শক্তি দিয়াছেন। সেই স্বাধীন শক্তির কি ফল হইবে,—প্রত্যেক মনুষ্য স্বাধীনতার কিরূপ ব্যবহার করিবে, অনন্ত পুরুষ তাহা পূর্ব্ব হইতেই জানেন; ইহাতে স্বাধীনতার বিনাশ হইবে কেন? আবার বলি, তাঁহার ভাবী-জ্ঞানের সহিত মনুষ্যের কার্য্যের সহিত তো কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নাই। তিনি যদি মনুষ্যকে বলপূর্ব্বক পাপ ও পুণ্য কার্য্য করাইয়া দিতেন, তাহা হইলে অবশ্য আমাদের স্বাধীন ক্রিয়া থাকিত না। তিনি তো বলপূর্ব্বক কাজ করান না; তিনি কেবল জানেন আমরা কি করিব। তাহাতে আমাদের স্বাধীনতা চলিয়া যাইবে কেন?

এস্থলে কেহ বলিতে পারেন যে, পরমেশ্বর যাহা জানেন মনুষ্য কি তাহার অন্যথা করিতে পারে? আমি কোন বিশেষ সময়ে বিশেষ দুষ্কর্ম্ম করিব, পরমেশ্বর জানেন, আমি কি তাহার অন্যথা করিতে পারি? আমি কি সেই দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত থাকিতে পারি?

পরমেশ্বর যাহা জানেন, তাহা হইতে বিরত হইবার ক্ষমতা অবশ্য আমাদের আছে। বিরত হইবার ক্ষমতা আছে বলিয়াই আমাদের কার্য্য স্বাধীন কার্য্য। পরমেশ্বর আমাদিগকে স্বাধীন শক্তি দিয়াছেন। সুতরাং আমরা যাহা করিব, তাহা না করিবার শক্তি আমাদের আছে;—তাহা হইতে বিরত হইবার শক্তি অবশ্য আমাদের আছে; কিন্তু আমরা বিরত হইব না, আমরা ঈশ্বর প্রদত্ত শক্তির অপব্যবহার করিব, ইহাই তিনি জানেন। আমাদের স্বাধীন শক্তির কিরূপ ব্যবহার করিব, তাহা তিনি জানেন।

এ সকল কথাতে অনেকে সন্তুষ্ট হইবেন না। তাঁহারা বলিবেন যে, যে কার্য্য স্বাধীনভাবে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা কি পূর্ব্ব হইতে জানা যাইতে পারে? স্বাধীন শক্তি-প্রসূত কার্য্যের কি ভাবীজ্ঞান সম্ভব? আমরা যতদূর জানি, মনুষ্যের পক্ষে সম্ভব নহে। কিন্তু পরিমিত মনুষ্যের পক্ষে অসম্ভব বলিয়া কি অনন্ত পরমেশ্বরের পক্ষেও অসম্ভব? পরমেশ্বরকে মানুষের মত মনে করার ন্যায় ভ্রমান্ধতা আর কি আছে? মানুষ যাহা পারে না, পরমেশ্বরও তাহা পারেন না? মানুষ স্বাধীনতা-প্রসূত কার্য্য পূর্ব্ব হইতে জানিতে পারে না বলিয়া কি পরমেশ্বরও পারেন না? ইহার তুল্য অসার ও অসঙ্গত কথা আর কি আছে? পরমেশ্বরের ভাবীজ্ঞান এবং মনুষ্যের স্বাধীন কার্য্যের সামঞ্জস্য আমরা ধারণা করিতে পারি না। এ কথা যথার্থ। কিন্তু আমরা ধারণা করিতে না পারিলেই যে সত্য অসত্য হইয়া যাইবে, এমন নহে। এমন অনেক বিষয় আছে, যাঁহা আমরা ধারণা করিতে পারি না, অথচ তাহা সত্য। আমাদের ধারণা শক্তির অতীত হইলেও, স্বাধীন কার্য্যের ভাবীজ্ঞান অনন্তস্বরূপের পক্ষে সম্ভব।

ন, চ।

পত্র-প্রেরকগণের প্রতি নিবেদন।

এবার স্থানাভাবে আমরা প্রেরিত পত্রগুলি কোন আকারেই প্রকাশ করিতে পারিলাম না। তৎসঙ্গে অনেকগুলি সংবাদ অপ্রকাশিত রহিল। কটকনিবাসী "জনৈক গ্রাহক" তত্ত্ব-কৌমুদীর সম্পাদন কার্য্য সম্বন্ধে কতকগুলি মন্তব্য লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। মন্তব্যগুলি উদাহরণ-সম্বলিত না হওয়াতে এবং লেখক নিজের নাম ও ঠিকানা না দেওয়াতে সেগুলি আপাততঃ আমাদের কোন কাজে আসিল না। গ্রাহক মহাশয় মন্তব্যগুলি উদাহরণ-সম্বলিত করিয়া পুনরায় লিখিয়া পাঠাইলে এবং তৎসঙ্গে নিজের নাম ও ঠিকানা পাঠাইলে আমরা বাধিত হইব। তত্ত্বকৌমুদীর কোন কোন প্রবন্ধের নিম্নে যে লেখক-দিগের নামের চিহ্নস্বরূপ দুটী অক্ষর বসান থাকে, তাহার কারণ এই যে, কোন কোন প্রাপ্ত প্রস্তাবের ভাবের সহিত সম্পাদকের সাধারণ সহানুভূতি ও একতা থাকিলেও বিশেষ বিশেষ মতের সহিত অনৈক্য হয়, সুতরাং উপরোক্ত উপায়ে সম্পাদককে উক্তরূপ প্রস্তাবের দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইতে হয়। উক্ত চিহ্ন লেখক মহাশয়দিগের অনুমতি ক্রমেই প্রদত্ত হয়। সম্পাদকের নিজের লিখিত প্রস্তাবে এবং যে সকল প্রাপ্ত প্রস্তাবের সহিত সম্পাদকের উক্ত রূপ অনৈক্য হয় না, সেই সকল প্রস্তাবের নিম্নে কোন চিহ্ন দেওয়া হয় না।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।

নবম জন্মোৎসব।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নবম জন্মোৎসব উপলক্ষে বিগত ১লা জ্যৈষ্ঠ শনিবার অপরাহ্নে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় উপাসনা মন্দিরে "ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের বর্ত্তমান বিঘ্ন" বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন। বক্তা প্রথমতঃ ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিরোধী-দিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেন, (১) প্রাচীন সম্প্রদায়, (২) নব্য সম্প্রদায়। প্রাচীন সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের বিঘ্ন এই—(১) শাস্ত্রের উপর অন্ধ বিশ্বাস। আমরা কোন অভ্রান্ত শাস্ত্র মানি না ইহা শুনিলে তাঁহারা আমাদের প্রায় কোন কথাই শুনিতে চান না। (২) ধর্ম্মজীবনের আদর্শ সম্বন্ধে ভ্রান্ত মত। সংসারের সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট হইয়া ব্রহ্মে আত্মা সমাধান করাকেই তাঁহারা উচ্চতম ধর্ম্ম মনে করেন। ব্রাহ্ম-সমাজ-প্রচারিত সমগ্রসীভূত ধর্ম্মের আদর্শ তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম করান নিতান্ত কঠিন। (৩) জাতিভেদ। ইহাতে তাঁহাদের হৃদয়কে এত সঙ্কীর্ণ করিয়া রাখিয়াছে যে, যে ধর্ম্ম মতে ও কার্য্যে উভয়তঃ জাতিভেদ অস্বীকার করে, তাহার সত্যাসত্যতা তাঁহারা আর উদারভাবে বিচার করিতে পারেন না। অতঃপর ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিরোধী নব্য সম্প্রদায়কে বক্তা তিন ভাগে বিভক্ত করেন—(১) উদরম্ভরী, (২) কদাচারী, (৩) পুনরুত্থানকারী। উদরম্ভরী সম্প্রদায় উদরপূর্ত্তি হইলেই তৃপ্ত,

ইহারা ধর্ম্মের ধার ধারে না। তবে অন্যের সঙ্গে পড়িয়া মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মদিগকে গালাগালি দিতে ছাড়ে না। দ্বিতীয় সম্প্রদায় মদ্যপান প্রভৃতি কদাচারে রত; ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে ইহাদের চটার বিশেষ কারণ এই যে ব্রাহ্মসমাজ মদ্যপান, দুশ্চরিত্রতা, নাট্যশালার দূষিত ব্যবস্থা সম্বন্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন। কাজে কাজেই মধ্যে মধ্যে ইহাকে গালাগালি ও বিদ্রূপ না করিলে চলিবে কেন? পুনরুত্থান-কারী সম্প্রদায় মৃতপ্রায় হিন্দু ধর্ম্মকে জাগাইতে চান। ইহা-রাই ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষ বিরোধী। পুনরুত্থানকারী বলিলেই ব্রাহ্ম-বিরোধী বুঝায়। ব্রাহ্ম-বিরোধী পুনরুত্থানকারীর নামা-ন্তর মাত্র। যাহা হউক এই সকল সম্প্রদায়ের বিপক্ষতা ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রচারের প্রকৃত বিঘ্ন নহে। ইহাঁদের হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের কোন ভয় নাই। ইহারা যদি প্রকৃত বিশ্বাসী উপাসনাশীল হইতেন, তাহা হইলে ইহাঁদের বিপক্ষতাকে ভয় করিতাম। কিন্তু বাস্তবিক ইহাঁরা যে ধর্ম্মের পক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছেন সে ধর্ম্মে ইহাদের সকলেরই অল্পাধিক অবিশ্বাস জন্মিয়াছে। ইহাঁরা যে সে ধর্ম্মের অধীনতা স্বীকার করিতেছেন ইহা কপটতার ফল। সন্দেহ ও কপটতা হইতে প্রকৃত বিশ্বাস-প্রসূত ধর্ম্মের কোন ভয়ই নাই। সূর্য্যোদয়ে যেমন হিম গলিয়া যায় তেমনি সত্যালোকের বিস্তারে এই সমুদয় বিপক্ষতা উড়িয়া যাইবে। ব্রাহ্মগণ বিশ্বাসী নির্ভরশীল হইলে এক ফুৎকারে এই সকল অসার বিপক্ষতা উড়াইয়া দিতে পারেন। সত্য প্রথমে আপাততঃ দুর্ব্বল বলিয়া বোধ হইলেও ইহা সময়ে সমুদায় অসত্যের উপর জয় লাভ করে। জন ষ্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছেন যে, যখন ধর্ম্মাত্মা ষ্টিফেন শত্রুগণ কর্তৃক প্রস্তরাঘাতে নিহত হইলেন তখন কে ভাবিতে পারিত যে সময়ে সেই নিরাশ্রয় দুর্ভাগা ব্যক্তির সরল ধর্ম্মের নিকট তৎ-কালীন্ প্রকাণ্ড সভ্যতাকে মস্তক অবনত করিতে হইবে। সন্দেহ, দুর্নীতি ও কপটতা মেরুদণ্ডবিহীন—ইহারা সত্য ও প্রকৃত বিশ্বাসের প্রবল আঘাত সহ্য করিতে অসমর্থ। ঈশ্বরের বিধানে এই সকলকে অবশ্যই পতিত হইতে হইবে। সুতরাং আমাদের প্রকৃত বিঘ্ন বাহিরে নহে, ভিতরে। আমা-দের প্রকৃত বিঘ্ন (১) আমাদের ভ্রাতৃভাব ও একতার অভাব (২) আমাদের বিশ্বাসের অভাব; কত ব্রাহ্ম বিশ্বাসের অভাবে ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিয়াছেন! (৩) আমাদের অনেকের মধ্যে সাংসারিকতার প্রাদুর্ভাব; (৪) অনেকের মধ্যে উপা-সনাশীলতার অভাব। এই সমুদায় অতি ভয়ানক বিঘ্ন। বিশেষ যত্নের সহিত আমাদিগকে এই সকল বিঘ্ন দূর করিতে হইবে। আর কিছু দ্বারা পৃথিবী জয় করা যায় না; পৃথিবী জয় করিবার একমাত্র অস্ত্র আধ্যাত্মিকতা ও সুনীতি।

বক্তৃতান্তে প্রার্থনা ও সঙ্গীত হয়।

২রা জ্যৈষ্ঠ রবিবার উৎসবের দিন। সে দিন প্রাতঃকালে, বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় উপাসনা করেন এবং "আধ্যা-ত্মিক পৌত্তলিকতা" বিষয়ে উপদেশ দেন। উপদেশের ভাব এই:—

সর্ব্ব প্রকার পৌত্তলিকতা বিনাশ করিয়া এক মাত্র সত্য-স্বরূপ পরমদেবতার সত্য পূজা প্রতিষ্ঠা করা ব্রাহ্মধর্ম্মের উদ্দেশ্য, ব্রাহ্মসমাজের লক্ষ্য। সত্য স্বরূপ পরম দেবতা সৃষ্টি স্থিতি পালন কর্ত্তারূপে জীবন্তভাবে ব্রহ্মাণ্ডে বাস করিতেছেন, প্রাণ পূর্ণ করিয়া প্রাণে বাস করিতেছেন। পৌত্তলিকতা সৃষ্ট-বস্তুকে তাঁহার স্থানে পূজা করিয়া তাঁহাকে অবমাননা করে, অগ্রাহ্য করে, দূরে রাখে। ব্রাহ্মধর্ম্মে একমাত্র পরমেশ্বর ভিন্ন দেবতা নাই, মুক্তিদাতা নাই; এই জন্য প্রকৃত ব্রহ্মো-পাসক পুত্তলিকার নিকট মস্তক অবনত করেন না। কেহ কেহ বলেন নিকৃষ্ট অধিকারীর পক্ষে পুত্তলিকার উপাসনা আবশ্যক, কিন্তু বাস্তবিক সত্য এই যে অজ্ঞানতা হইতেই পৌত্তলিকতার উৎপত্তি। সত্যস্বরূপকে না জানিয়া তাঁহার সহবাস-জনিত আনন্দ সম্ভোগ করিতে না পাইয়া অজ্ঞানী লোক তাঁহার স্থানে সামান্য পদার্থের উপাসনা করিয়া প্রাণের উচ্চ-তর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু সেই আকাঙ্ক্ষা এরূপ উপায়ে চরিতার্থ হইতে পারে না। জননী এবং শিশুর মধ্যে যে সম্বন্ধ, জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে সেই সম্বন্ধ। মাতৃ-স্তন্য পানে শিশুর শরীর পুষ্টি হয়, কাষ্ঠ-মূর্ত্তি মাতার অভাব পূর্ণ করিতে পারে না, কেবল ক্ষণকালের জন্য প্রবোধ দিতে পারে মাত্র। সেইরূপ পৌত্তলিকতা প্রাণের ক্ষুধা পিপাসা মিটাইতে পারে না। পরীক্ষা প্রলোভনে রক্ষা করিবার জন্য, পরিত্রাণ দিবার জন্য জীবন্ত মাতাকে চাই, জীবন্ত ঈশ্বরকে চাই। অজ্ঞানতার বিনাশে পৌত্ত-লিকতা বিনষ্ট হয়। জ্ঞানোদয়ে প্রকৃত আরাধ্য দেবতা প্রকাশিত হন। কিন্তু বাহিরের পৌত্তলিকতা বিনষ্ট করাই যথেষ্ট নহে, সর্ব্বপ্রকার পৌত্তলিকতা বিনাশ না করিলে প্রকৃত ব্রহ্মোপাসনার মহা ফল লাভ করা যায় না। পৌত্ত-লিকতা আমাদিগকে নানা প্রকারে আক্রমণ করে। বাহ্যিক পৌত্তলিকতার রাজ্য বিস্তৃত; চেতন, অচেতন নানা বস্তু ও জীব ঈশ্বরের মূর্ত্তিরূপে তাঁহার সিংহাসন অধিকার করে, কিন্তু এইখানেই পৌত্তলিকতার শেষ নহে। দেখিতে পাই, জড়োপাসনা পরিত্যাগ করিলেও অন্য প্রকার পৌত্তলিকতা—আধ্যাত্মিক পৌত্তলিকতা—চিত্তকে প্রলুব্ধ করে, ঈশ্বরের স্থান অধিকার করে। এই পৌত্তলিকতার অগণ্য মূর্ত্তি। পৌত্তলিকতার বাহ্যিক মন্দির ভগ্ন করিলেও অনেক স্থলে হৃদয়ে পুত্তলিকার মন্দির থাকিয়া যায়। এই সংসারের নানা প্রিয় বস্তু পুত্তলিকা সাজিয়া আত্মাকে বিপথগামী করে—অজ্ঞানতা ও নরকের অন্ধ দুর্গন্ধময় কূপে নিক্ষেপ করে। সংসারের ধন, মান, যশ, লোকানুরাগ, সুখলিপ্সা, স্ত্রী, পুত্র ইত্যাদি পুত্তলিকা হইয়া দাঁড়ায়। বাহিরের পৌত্তলিকতা ছাড়িয়াছি, কিন্তু হৃদয় মধ্যে অনুসন্ধান করিলে কত সময় দেখি, হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে এই পুত্তলিকা সমূহের কোন না কোনটার উপাসনা করিতেছি; হৃদয় মধ্যে ইহার দৃঢ় মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়া ইহার ধ্যান করিতেছি, ইহার চরণে শরীর, মন, এমন কি ধর্ম্মকে পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতেছি। ধনের জন্য কি না করি? মান, যশ, ইন্দ্রিয়সুখ প্রভৃতির জন্য কি না করি? কিন্তু একমাত্র সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মই ব্রাহ্মের

উপাস্য দেবতা; তাহার হৃদয়-সিংহাসন আর কাহারো জন্য নহে। ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দ রসপান করিয়া, ব্রহ্মের সেবাতে নিযুক্ত থাকাই ব্রহ্মোপাসকের জীবনের উদ্দেশ্য; আর সমুদায় বস্তু এই উদ্দেশ্যের উপায় মাত্র। ব্রহ্মোপাসক যে সংসার করেন, সে সংসারী হইবার জন্য নহে; তিনি যে ধন উপার্জ্জন করেন, সে ধনী হইবার জন্য নহে, তিনি যে জ্ঞান উপার্জ্জন করেন সে বিদ্যা বুদ্ধি প্রদর্শনের জন্য নহে। তাঁহার স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, গৃহধর্ম্ম, কেবল উক্ত মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, স্বার্থের জন্য নহে। স্বার্থের উদ্দেশে এই সমুদায় বস্তুর অনুশরণই পৌত্তলিকতা। এই সমুদায় বস্তু যখন হৃদয়কে অধিকার করে তখন ব্রহ্মোপাসনা বাহিরের ব্যাপার হইয়া উঠে। হায়! কত ব্রহ্মোপাসক এই পৌত্তলিকতার চক্রে পড়িয়া সংসার মায়ায় আবদ্ধ হইয়াছেন! কত ঈশ্বরোপাসক পূজার জন্য পুষ্প চয়ন করিতে গিয়া পুষ্পে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন! কেহ কেহ ধর্ম্ম সাধনের সাহায্য হইবে বলিয়া ধনোপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলেন, ক্রমে ধনোপার্জ্জনই তাঁহাদের পুত্তলিকা হইয়া দাঁড়াইল; ঈশ্বর পশ্চাতে পড়িয়া রহিলেন, ধনই সর্ব্বস্ব হইল। অতি যত্নে কৃপণের ন্যায় ইহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। দেবতার জন্য পুষ্প চয়ন করিতে গিয়া উপাসক পুষ্পেতেই মুগ্ধ হইলেন। ধন ঈশ্বর-প্রাপ্তির সাহায্য করিল না; স্বার্থ সাধনের উপায় হইয়া রহিল। কত উপাসক ঈশ্বর-সেবার উপযুক্ত হইবেন বলিয়া বিদ্যা উপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইলেন, বিদ্যা ধর্ম্মের অন্তরায় হইয়া উঠিল। বিদ্যা নাস্তিকতা আনয়ন করিল, বিদ্যা দেখাইল উপাসনা মূর্খতা মাত্র। কি পরিতাপ! জ্ঞান ঈশ্বর সাধনের সহায় না হইয়া স্বয়ং পুত্তলিকারূপে উপাসকের প্রাণ অধিকার করিল। আবার দেখি, ধর্ম্ম সাধনের সাহায্যের জন্য ব্রাহ্ম দার পরিগ্রহ করিলেন, অনেক পরিজন বর্গে বেষ্টিত হইলেন; কিন্তু পরিবার ধর্ম্ম জীবনের সহায় না হইয়া বিনাশের যন্ত্র হইয়া দাঁড়াইল। অবিবাহিত থাকিতে ব্রহ্ম ব্রাহ্মের প্রিয় বস্তু ছিলেন, বিবাহে ঘোর বিভ্রাট ঘটিল, পরিজনবর্গ ব্রহ্ম অপেক্ষা প্রিয়তর বস্তু হইয়া উঠিল। প্রাচীন ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ বলিয়াছিলেন "তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা"। সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরতর যে এই পরমাত্মা, ইনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, আর আর সকল হইতে প্রিয়। কিন্তু ব্রাহ্ম সংসারী হইয়া সংসার পুত্তলিকার চরণে দেহ, মন, প্রাণ সমুদায় উৎসর্গ করিলেন। এই পৌত্তলিকতা অতি ভয়ঙ্কর। বাহিরের পৌত্তলিকতা সহজে পরিত্যাগ করা যায়, কিন্তু এই আন্তরিক পৌত্তলিকতা সহজে পরিহার্য্য নহে। ইহা পরিত্যাগ করিতে হইলে বিশেষ সতর্ক হওয়া চাই। হৃদয়ে অকৃত্রিম প্রীতি ভক্তির সহিত ঈশ্বরের পূজা হওয়া আবশ্যক; এইরূপ পূজা না হইলে শীঘ্রই সংসারের কোন প্রিয় বস্তু হৃদয়ে ব্রহ্মের স্থান অধিকার করিবে, হৃদয়ের দেবতা হইয়া উঠিবে। কত ব্রাহ্ম উপাসনায় ক্লান্ত হইয়া, উপাসনার সুখ না পাইয়া, অন্য দেবতার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন, এবং ব্যাকুল ভাবে সংসারের কোন পৌত্তলিকাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন। হৃদয়ে প্রকৃত প্রীতি ভক্তির সঞ্চার না হইলে হৃদয়ে ব্রহ্মের স্থান হয় না। ব্রাহ্ম ভ্রাতা, ব্রাহ্মিকা ভগিনি, অদ্যকার শুভদিনে সবিনয় নিবেদন—হৃদয় অন্বেষণ করিয়া দেখ সংসারের কোন বস্তু ঈশ্বরের স্থান অধিকার করিয়া আছে কি না। যদি তাহাই হয়, জানিও পৌত্তলিক হইয়াছ, প্রকৃত উপাসনা হইতে বঞ্চিত হইয়াছ, মুক্তির পথে কণ্টক রোপণ করিয়াছ। সতী স্ত্রীর পক্ষে পতি যেমন, উপাসকের পক্ষে ব্রহ্ম তেমনি। যে স্ত্রী বিশ্বাস ভঙ্গ করে, সে স্ত্রীর সতীত্ব থাকে না। তেমনি উপাসক বিশ্বাস-ঘাতক হইলে, ঈশ্বরের প্রতি শিথিল হইলে, তাঁহার জ্ঞান ধ্যান অন্যকে দিলে তিনি ব্যভিচারী হন। প্রাণপতি পরমেশ্বর সকল সহ্য করেন, কিন্তু অন্য দেবতা তাঁহার স্থান অধিকার করিলে ইহা তাহার অসহ্য হয়। যে হৃদয় তাঁহাকে ছাড়িয়াও আরাম লাভ করে, সে হৃদয় হইতে তিনি সরিয়া পড়েন। তিনি চান সমুদায় হৃদয় তাঁহাকে অর্পণ করি। তিনি অজ্ঞানতা, দুর্ব্বলতা সহ্য করেন। তিনি ঐকান্তিকতা চান, ঐকান্তিকতাতে তুষ্ট হন। তাঁহাকে পূর্ণ হৃদয় অর্পণ করিলে তিনি সমুদায় অভাব দূর করেন। তাঁহাকে একমাত্র পতিরূপে গ্রহণ করিলে তিনি পাপীকে পুণ্যবান করেন। ব্রাহ্মধর্ম্মে সকল পৌত্তলিকতা পরিত্যজ্য, ঈশ্বরই একমাত্র মুক্তি দাতা হৃদয়েশ্বর, একমাত্র তাঁহাকে সার কর। তিনি আসুন; আগে তাঁর সম্মান, পরে সব হইবে। সংসার সুখ মিটিল না তাহাতে ক্ষতি নাই, প্রিয়তমের আশা ত মিটিল, তিনিত হৃদয়ে স্থান পাইলেন। তিনি হৃদয়কে অনন্ত সুখের স্থান করেন। তিনি সকল আশা পূর্ণ করেন।

অপরাহ্ণে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় প্রাচীন শাস্ত্র হইতে শ্লোক পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে ধর্ম্মালোচনা ও সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তন হয়। সায়ংকালে বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উপাসনা করেন এবং "নাম সাধন" বিষয়ে উপদেশ দেন। উপদেশের ভাব এইঃ—

ব্রাহ্মসমাজে অনেক দিন হইতে ঈশ্বরের নাম সাধনের কথা শুনা যাইতেছে। আমরা কত সময় উৎসাহভরে গান করি—"দয়াময় নাম সাধন কর।" আমরা কত সময় আনন্দের সহিত নাম-মাহাত্ম্য আলোচনা করিয়াছি, কীর্ত্তন করিয়াছি। বাস্তবিক নাম সাধন অতি মহৎ বস্তু, অপূর্ব্ব বস্তু। আমাদের দেশে বৈষ্ণব দিগের মধ্যে এই সাধনের প্রবলতা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কেবল বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে ইহা আবদ্ধ নহে, ভারতের সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায় মধ্যেই এই সাধন প্রচলিত। এই সাধন প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। অতি প্রাচীন কালে, উপনিষদের সময়ে আর্য্য মহর্ষিদিগের মধ্যে ইহা প্রচলিত ছিল। উপনিষদে নাম সাধন সম্বন্ধে অতি গভীর ভাবপূর্ণ অমূল্য উপদেশ আছে। উপনিষদ বলেন—

প্রণবোধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যঃ শরবৎ তন্ময়োভবেৎ॥

ওঁ এই শব্দের নাম প্রণব, ইহার অর্থ—সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা; ঋষি মুনিগণ ঈশ্বরকে এই নাম দিতেন। এই প্রণব ধনু-স্বরূপ। ধনু থাকিলেই তীর চাই; প্রণবরূপ ধনুতে আত্মারূপ শর লাগাইয়া দাও। প্রণবরূপ ধনুতে আত্মারূপ শর যোজনা করিয়া ব্রহ্মকে লক্ষ্য কর। শর যেমন লক্ষ্যে মগ্ন হইয়া যায়, তেমনি প্রণব উচ্চারণ করিতে করিতে আত্মা ব্রহ্মে মগ্ন হইয়া যায়। এক চিত্তে, প্রাণ মন দিয়া ওঁ জপ কর, ক্রমে আত্মা ব্রহ্মে মগ্ন হইয়া যাইবে। চিরদিন ভারতে নামসাধন প্রচলিত। অনেকে বলেন, নাম তো শব্দ মাত্র, হাওয়া মাত্র, ইহার আবার সাধন কি? একদিকে তাহাই, কিন্তু অন্যদিকে আবার নাম অতি অপূর্ব্ব পদার্থ

কাহারো বাড়ি খুঁজিয়া বাহির করিতে হইলে তাহার নাম করিয়া বাড়ির খুঁজ লইতে হয়। বাড়ি না পাওয়া পর্য্যন্ত নাম করি, বাড়ি পাইলে আর নাম করি না। যতদিন পরম বস্তুকে না পাওয়া যায় ততদিন তাঁহার নাম করিতে হয়, বস্তু পাইলে আর নামের প্রয়োজন থাকে না। একদিকে নাম হাওয়া, অপরদিকে ইহা মহা বস্তু। নাম ও বস্তুতে অচ্ছেদ্য যোগ। "বৃক্ষ" বলিলে কেবল একটা শব্দমাত্র বুঝায় না, "বৃক্ষ" বলিলে মূল, শাখা, পত্র প্রভৃতি সমন্বিত একটী বস্তু বুঝায়। তেমনি মনুষ্য, সূর্য্য প্রভৃতি নামের সহিত এক একটী বহুগুণশালী বস্তুর অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। নাম, বস্তুকে জ্ঞানের সহিত যোগ করে; কেবল জ্ঞানের সহিত নহে, হৃদয়ের সহিত যোগ করে। প্রিয় বস্তুর নাম করিলে প্রাণ কেমন করিয়া উঠে। নামের সঙ্গে হৃদয়ের ঘনিষ্ঠ যোগ। হিন্দু স্ত্রী স্বামীর নাম করেন না; শুনিলে ও প্রাণ কেমন করিয়া উঠে। নাম কিছু নয় কে বলিল? নামে প্রাণ টলায়; নামে মহাশক্তি বিদ্যমান। "দয়াময়" কেবল নাম মাত্র নহে, শব্দ মাত্র নহে। ইহা উচ্চারণে প্রাণ গলিয়া যায়। ভগবানের নাম অমৃতের ধাম, স্বর্গের সোপান, পরম পদার্থ, সাধনের পরম উপায়। অনেকে বলেন ঈশ্বরের আবার নাম কি? আমাদের মা বাপ আমাদিগকে নাম দিয়াছেন, তাই আমরা নাম পাইয়াছি; যাঁহার মা বাপ নাই তাঁহার নাম হইল কি রূপে? কে তাঁহার নাম রাখিল? এই কথার উত্তর দিতেছি। কুসংস্কারাপন্ন লোকে মনে করে ঈশ্বর বিশেষ বিশেষ স্থানে, কালে বা পাত্রে অবতীর্ণ হন। আমরা এই কথা মানি না; ইহা কুসংস্কার মাত্র। কিন্তু এই কথা মানি যে ঈশ্বর সকল স্থানে, সকল কালে, সকল যুগে অবতীর্ণ হইয়া আছেন। অযোধ্যায় বা জেরুজেলামে বিশেষ ভাবে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ইহা মানি না, কিন্তু ইহা মানি যে তিনি ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল বস্তুতে, জলে, স্থলে, শূন্যে সমানভাবে অবতীর্ণ হইয়া আছেন। চক্ষু মেলিলে কি দেখি? অচেতন জড়বস্তু দেখি? শূন্য দেখি? তাহা মানি না। আমার ইষ্ট দেবতা শক্তি, জ্ঞান, প্রেম, আনন্দরূপে জলে স্থলে শূন্যে বিরাজিত। মা বাপ বন্ধু হইয়া অবতীর্ণ। সব তিনি। অন্তরচক্ষু খুলিয়া গেলে বাহিরের চক্ষু ও তাঁহাকে দেখিতে পায়। ঐ গাছটা কি? আমাদের প্রাণ, জীবন, শক্তি, জ্ঞান এই সমস্ত কি? তাঁহার কৃপা। তাঁহারই কৃপা অন্ন জলরূপে জীবের ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ করিতেছে। তাঁহারই শক্তি, জ্ঞান, কৃপা, প্রেম জগৎরূপে প্রকাশিত। ভাগিরথী-স্রোত তাঁহারই কৃপা স্রোত। এই সমুদায় কবিত্ব নহে, খাঁটি সত্য। চারিধারে ব্রহ্মধাম, স্বর্গধাম প্রকাশিত। পরোক্ষ ভাবে নহে, প্রত্যক্ষভাবে সেই বিশ্বরূপকে দেখ। বাহিরে যেমন তাঁহার লীলা, অন্তরে তেমনি তাঁহার মহান আবির্ভাব। দেখিয়া শুষ্ক হইয়া যাই। ভক্তের কাছে জগৎ দেবালয়। ঈশ্বর বৃক্ষের নবপল্লবে অবতীর্ণ, সাধ্বী রমণীর পবিত্র মুখশ্রীতে, বালকের সরলতায়, মাতার মাতৃত্বে, বন্ধুর বন্ধুতায়, সাধুর সাধুতায় অবতীর্ণ। সর্ব্বথা সর্ব্বত্র অবতীর্ণ। তবে তাঁহাকে দেখা যায় না কেন? যত দিন হৃদয়ে না আসেন ততদিন দেখি না। ততদিন জগৎ অন্ধকারময় দেখি, শুষ্ক দেখি। প্রাণ যত দিন প্রেমশূন্য থাকে ততদিন দেখিনা। যত দিন আমার হৃদয় ঘরে অবতীর্ণ না হন, ততদিন তাঁহাকে দেখি না। তিনি যখন প্রাণে আসেন, প্রাণের ঘরে জন্ম গ্রহণ করেন, তখন প্রাণ আনন্দিত হয়। গরীবের ঘরে বড় লোক আসিলে যেমন সে অবাক হয়, তেমনি সাধক যখন দেখেন প্রভু তাঁহার প্রাণে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তখন তিনি অবাক হন, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হন। ঈশ্বর নিজের আলোতেই নিজে প্রকাশিত হন, তাঁহাকে অন্য আলোকের সাহায্যে দেখিতে হয় না। সূর্য্য প্রভৃতি জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ অন্য বস্তুকে দেখায়, আবার নিজের আলোকে নিজেও প্রকাশিত হয়। এইরূপে ভগবান ভক্ত হৃদয়ে অবতীর্ণ হন, ভক্তের ঘরে জন্ম গ্রহণ করেন। ভক্ত ভগবানের মা বাপ। এই কথায় শিহরিও না। যদি কেহ তাঁহার মা বাপ থাকে, সে ভক্ত। ভক্তই ভগবানের নামকরণ করিয়াছেন। ভগবানের অসংখ্য নাম, কেন না অসংখ্য গুণ। যখন যে ভাবে তিনি প্রকাশিত হইয়াছেন তখন সেরূপ নাম পাইয়াছেন। যে যেরূপে তাঁহাকে দেখিয়াছে সেরূপ নামেই তাঁহাকে ডাকিয়াছে। তাঁহার অশেষ দয়া অনুভব করিয়া তাঁহাকে বলি দয়াময়। সংসার দুঃখে তাঁহার আনন্দ অনুভব করিয়া তাঁহাকে বলি পরিপূর্ণমানন্দম্। জ্ঞানী শাস্ত্র-সিন্ধু মন্থন করিয়া তাঁহার জ্ঞানের সীমা না পাইয়া তাঁহাকে বলেন জ্ঞানময়। দীনদুঃখী সামান্য পর্ণকুটীরে তাঁহাকে লাভ করিয়া বলে তিনি দীনবন্ধু; ইত্যাদি। এই যে ভক্তের জীবনে প্রকাশিত নাম, এই সকল সিদ্ধ নাম ধরিয়া তাঁহাকে ডাকিতে হইবে, এই সকল সিদ্ধ নাম * সাধন করিতে হইবে। জীবনের পরীক্ষিত কথা বলিতেছি, এই নাম সাধনে বহু উপকার পাইয়াছি; যাহা পাইয়াছি তাহা বেদ বেদান্ত পড়িয়া পাই নাই। এই সাধনে জীবন কৃতার্থ হইয়া যায়। এই সাধনের সুবিধা এই যে ইহার জন্য বিশেষ স্থান কাল ও আয়োজনের আবশ্যকতা নাই, ইহা যেখানে সেখানে, যখন তখন, যে কোন অবস্থায় করা যায়। রাস্তায় চলিতেছ? কেন অসম্বদ্ধ চিন্তা কর, ভগবানের নাম কর। রাত্রিতে ঘুম হইতেছে না?—তাঁহার নাম কর। কার্য্য হইতে অবকাশ পাইয়াছ? নাম কর, শান্তি পাইবে। খেতে শুতে, চল্‌তে ফিরতে, সুখে দুঃখে, পাপে তাপে, সকল সময়ে সকল স্থানে সকল অবস্থাতে নাম কর; সকল দুঃখ চলে যাবে, ভবশৃঙ্খল ভগ্ন হইবে। মন্ত্র মিথ্যা নয়, মন্ত্র সত্য। নামে ঘোর পাপ যন্ত্রণার শান্তি হয়। "দয়াল নাম সিংহের শব্দ, নামে অরিগণ সব হয় শুব্ধ" ইহা প্রত্যক্ষ সত্য। চল একান্ত মনে নাম সাধন করি, সমাজের চেহারা ফিরিয়া যাক্, আমরা কৃতার্থ হইয়া যাই। ভক্তগণ নাম সাধনে কত অমৃতই পাইয়াছেন! আজই পড়িয়াছি একজন ভক্ত বলিতেছেন, "নামে কত অমৃত, আমার এক জিহ্বা না হইয়া অগণ্য জিহ্বা হইল না কেন, অগণ্য জিহ্বাতে নামামৃত পান করিতাম। আমার অসংখ্য কাণ হইল না কেন? অসংখ্য কর্ণে নাম শ্রবণ করিতাম।" ভক্তগণ নামে অগণ্য স্বর্গ দেখেন। চল যত্নের সহিত নাম সাধন করি। লম্বা লম্বা কবিত্ব পূর্ণ কথার বাধুনী করিয়া আরাধনা না করিলে কি হয় না? † প্রাণভরে তাঁহার নাম করিলেই যে জীবন কৃতার্থ হয়। কতদিন এই নাম সাধন করিতে হইবে? যতদিন প্রত্যক্ষ ভাবে ঈশ্বরকে না পাই।

বিজ্ঞাপন।

* অন্যের সিদ্ধনামে আমার কি উপকার হইবে? আমার সিদ্ধ নামেই আমার উপকার হইতে পারে।—ত, স,

† কবিত্ব না হইলে চলে, কিন্তু আরাধনা না হইলে চলে না; প্রাণ করি শ্রদ্ধেয় আচার্য্য মহাশয়ও তাহাই বলিবেন।—ত, স।

১৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিসন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র দত্ত দ্বারা ১৮ই জ্যৈষ্ঠ মুদ্রিত ও ২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১০ম ভাগ।
৫ম সংখ্যা।

১লা আষাঢ় মঙ্গলবার, ১৮০৯ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৮।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷০
মফস্বলে ৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

পূজার আয়োজন।

মায়ের আহ্বান।

মা আমার আকুল নয়নে পথ পানে চেয়ে আছে বসে ;
খেলা ধূলা ভাঙ্গ ভাই তোরা, ওই দেখ সন্ধ্যা হ'য়ে আসে।
পশ্চিমেতে ডুবিছে তপন, চেয়ে দেখ আর বেলা নাই,
জীবনের সন্ধ্যা দেখে প্রাণ কোথা মা, কোথা মা বলে ভাই।
সাধ সুখ অনন্ত বাসনা এখানেতে পূরিবার নয় ;
শৈশব যৌবন গেল ভেসে, জীবনের এ সন্ধ্যা সময়।
এখনও কি ভাঙ্গিবি না খেলা, বাড়ী কি যাবিনে ফিরে আর ?
কি সুখে ভুলিয়া হেথা বসে ? জননী যে ডাকিছে আমার।
দেখ। দাও পাগলিনী মায়ে, পথ পানে চেয়ে ব'সে আছে,
ছ'টী বাহু পসারিয়া ডাকে, 'আয় কোলে আয় বাছা কাছে।'
কত সুধা কতই রতন ঘরে ঘরে সাজান তথায় ;
বাসনার অনন্ত রসনা সেথায় জুড়াতে পা(ও)য়া যায়।
আশা যত ভেঙ্গেছে হৃদয়ে, মরমের অসহ্য যাতনা ;
দুখী ছেলে গেলে মার বুকে, করুণার উপর করুণা।
তবে কেন ধূলায় পড়িয়া, মিছামিছি করি হাহাকার ;
আকুল নয়নে পথ চেয়ে বসে আছে জননী আমার।
জীবনের সন্ধ্যা কাছে এল, জননী যে ডাকে বারে বারে,
স্থির নহে মায়ের পরাণ, ফিরিছে দুখীর দ্বারে দ্বারে।
খেলা ধূলা ভাঙ্গ ভাই তোরা, প্রেমময়ী ব্যাকুল পরাণ ;
শুনিতে পারি না বসে হেথা পাগলিনী মায়ের আহ্বান।

অধম জনকে কি এমনই করে ভাল বাসিতে হয়। চাহিবার আগে আশাতীত ফল পাই, বারমাস অষ্টপ্রহর সঙ্গে সঙ্গে সদাই চাও যে তোমার দিকে চেয়ে দেখি, আমার আর দেখিবার অবকাশ হয় না। তোমার সঙ্গে শুভ দৃষ্টি হলে যে জন্মের মত উদ্ধার হইয়া যাইব, এ কথাটা মাঝে মাঝে ভুলিয়া যাই। সকলই তোমার কাছ থেকে আমাকে নিতে হয়, অথচ নিজের কিছু দিবার ক্ষমতা নাই—দিবার ইচ্ছাই বা কতটুকু! তোমার খাই পরি, তোমারই প্রাণে জীবিত, দয়ায় প্রতিপালিত হইয়াও তোমার উপরে অস্ত্রাঘাত করি। এতেও তোমার মুখের প্রেম-জ্যোতি একটুও মলিন হয় না। ধিক্ আমাকে! নিষ্ঠুর, পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন এ প্রাণ, নহিলে আজও উহা আত্মবশে রহিয়াছে। প্রভু, দুষ্ট প্রাণকে বশ করিয়া অকৃতজ্ঞতা ও অপ্রেমের ঘোরতর পাপের দায় হইতে নিষ্কৃতি দাও।

তোমার প্রতি দেব-দুর্লভ প্রেম যে চাই, সে কেবল প্রাণের দায়ে। প্রাণ সংসারে কোন মতেই তৃপ্ত হবেনা, আমি কি করিব ? আমি কি উহাকে সংসারের জিনিস্ লয়ে তৃপ্ত থাকিতে বুঝাইতে কসুর করিয়াছি ? আমার সব [illegible] কিন্তু ব্যর্থ হইয়াছে। ভবাভিমুখী প্রাণের এই দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তি অতৃপ্ত রেখে আর কতদিন বাঁচিব। তোমার আমার মধ্যে প্রতিদান ও উপযুক্ততার তো কোন কথা উঠিতে পারে না। তবে প্রেমধন হইতে আর কেন বঞ্চিত থাকি ? তোমাকে ভাল বাসিতে পারাই আমার জীবনের গৌরব ও মহত্ব।

কি বলে তোমাকে ডাকিব ? তোমার আমার যে সম্বন্ধ ভাষার কোন্ কথা তাহা প্রকাশ করিবে ? অথচ সে সম্বন্ধের উপর নিত্যতর মধুরতর ও প্রকৃতর সম্বন্ধ আর নাই। কলঙ্কী কুৎসিতের প্রতি সর্ব্বগুণাধার সুন্দরের যে প্রেম, তাহার নিগূঢ় মর্ম্ম কেবল তোমারই জানা আছে, এত দিন ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। যতই সে সম্বন্ধের কথা ভাবি, ততই পার্থিব সম্বন্ধের সৌন্দর্য্য ম্লান হইয়া যায়। আমি তোমার কি নামকরণ করিব, তুমি আপনি তোমার নাম রাখ, ও সেই নাম আত্মার অস্থি মজ্জাতে লিখিয়া দেও। এমনি করে লেখ যে চেষ্টা করে না মুছিতে পারি।

যে সৈন্যদলে সেনাপতির আজ্ঞার সম্মান নাই, সে সৈন্যদলের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। যে ভক্তদলে ভক্তবৎসলের আদেশ প্রতিপালিত হয় না, সে ভক্ত দলের পতন অতি সন্নিকট। অনুবর্ত্তিতা ও প্রেমে একরূপ কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ

যখন দেখি যে অনুবর্ত্তীতার হ্রাস হইতেছে, তখনই প্রাণ চমকিয়া উঠে, প্রাণ বলে "আমার প্রাণত্ব চলিয়া যাইতেছে, আমি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না।" ক্ষুদ্রতম বিষয়েও প্রভুর ইচ্ছা অগ্রাহ্য করিবে না, প্রভুর আদেশের বিপরীত দিকে চলিবার ইচ্ছার সম্ভাবনা যতদিন না বিনষ্ট হইতেছে, ততদিন আত্মা নিরাপদ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।

পলনির্‌স তাঁহার পুত্রকে বলিয়াছিলেন, "প্রাণান্তে কলহে প্রবৃত্ত হইও না, যদি কখন প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে দেখিও, যেন তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী তোমার সঙ্গে আর কখন কলহ করিতে সাহসী না হয়।" আমার আত্মাকেও আমি বলি যে প্রলোভন হতে প্রাণপণে দূরে থাকিবে, কিন্তু একবার যদি প্রলোভনের হাতে পড়, এমনই মার মারিবে যেন প্রলোভনের চতুর্দ্দশ পুরুষ তোমার নিকট আর অগ্রসর হইতে না পারে। দুর্ব্বল বলিয়া কপট আলস্যে আপনার সর্ব্বনাশ করিও না, যাঁহার ইচ্ছার বলে ব্রহ্মাণ্ড জন্মিয়াছে, সেই অনন্ত শক্তিশালী পুরুষ সর্ব্বদা তোমার হৃদয়ে উপস্থিত। যার এমন সহায়, তার আবার কিসের ভয়?

প্রাচীন শক্তিবাদ।

সর্ব্বশক্তি পরং ব্রহ্ম নিত্যমাপূর্ণমদ্বয়ং।
যয়োল্লসতি শক্ত্যাসৌ প্রকাশমধিগচ্ছতি।
চিচ্ছক্তি ব্রহ্মণোরাম শরীরেষূপলভ্যতে।
স্পন্দশক্তি শ্চবাতেষু দার্ঢ্যশক্তি স্তথোপলে॥
দ্রবশক্তিস্তথাম্ভঃসু দাহশক্তিস্তথানলে।
শূন্যশক্তিস্তথাকাশে নাশশক্তির্ব্বিনাশিনি॥
যথাণ্ডান্তর্মহাসর্পো জগদস্তি তথাত্মনি।
ফল পত্র লতা পুষ্প শাখা বিটপ মূলবান্॥
বৃক্ষবীজে যথাবৃক্ষস্তথেদং ব্রহ্মণি স্থিতং॥
ক্বচিৎ কাশ্চিৎ কদাচিচ্চ তস্মাদুদ্যন্তি শক্তয়ঃ।
দেশ কাল বিচিত্রত্বাৎ ক্ষ্মাতলাদিব শালয়ঃ॥

যোগবাশিষ্ট—একাদশ সর্গ।

পরব্রহ্ম সর্ব্বশক্তির আধার, নিত্য, পূর্ণ, অদ্বিতীয়। তিনি যখন যে শক্তি সহকারে বিবর্ত্তিত হন তখন তদ্রূপে প্রকাশ পান। হে রাম, শরীরে ব্রহ্মের চিচ্ছক্তি, বায়ুতে স্পন্দনশক্তি, প্রস্তরাদিতে কাঠিন্যশক্তি, জলেতে দ্রবশক্তি, অগ্নিতে দাহিকা-শক্তি, আকাশে শূন্যশক্তি আর বিনশ্বর পদার্থে বিনাশ শক্তি উপলব্ধ হয়। যেমন (কারণাবস্থায়) অণ্ডমধ্যে মহাসর্প এবং বৃক্ষবীজে ফল, পত্র, লতা, পুষ্প, শাখা, স্কন্ধ ও মূলবিশিষ্ট বৃক্ষ নিহিত থাকে সেইরূপ এই জগৎ পরমাত্মাতে অবস্থিত রহিয়াছে। দেশ কালের বিচিত্রতানুসারে ভূমি হইতে বীজোৎপত্তির ন্যায় স্থান বিশেষে কালবিশেষে তাঁহা হইতে বিশেষ বিশেষ শক্তি উদ্ভূত হয়।

প্রাচীন অধ্যাত্মবাদ।

কোঽয়মাত্মেতি বয়মুপাস্মহে কতরঃ স আত্মা,
যেন বা রূপং পশ্যতি, যেন বা শব্দং শৃণোতি,
যেন বা গন্ধানাজিঘ্রতি, যেন বাচং ব্যাকরোতি,
যেন বা স্বাদু চাস্বাদু চ বিজানতি।

এষ ব্রহ্মৈষইন্দ্র এষ প্রজাপতিরেতেসর্ব্বে দেবা ইমানি চ পঞ্চ মহাভূতানি পৃথিবী বায়ুরাকাশ আপোজ্যোতীংষীত্যেতানীমানি চ ক্ষুদ্র মিশ্রাণীব। বীজানীতরাণি চাণ্ডজানি চ জারুজানি চ স্বেদজানি চোদ্ভিজ্জানি চাশ্বা গাবঃ পুরুষা হস্তিনো যৎকিঞ্চেদং প্রাণিজঙ্গমং চ পতত্রি চ যচ্চ স্থাবরম্। সর্ব্বং তৎ প্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং প্রজ্ঞানেত্রো লোকঃ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা—প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম।

ঐতরেয়োপনিষৎ—পঞ্চমখণ্ড।

আমরা যে পরমাত্মার উপাসনা করি, যাঁহার সাহায্যে মন রূপ দেখে, যাঁহার সাহায্যে শব্দ শ্রবণ করে, যাঁহার সাহায্যে গন্ধ আঘ্রাণ করে, যাঁহার সাহায্যে বাক্য উচ্চারণ করে, যাঁহার সাহায্যে স্বাদু অস্বাদু রস জ্ঞাত হয়, সেই পরমাত্মা কিরূপ?

ব্রহ্মা, ইন্দ্র, প্রজাপতি প্রভৃতি সমুদায় দেবগণ, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, অগ্নি এই পঞ্চভূত, ক্ষুদ্রাকার বিবিধ বস্তু, নানা প্রকার বীজ অণ্ডজ, জরায়ুজ স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ প্রাণী সমূহ, অশ্ব, গো, মনুষ্য হস্তি, যাবতীয় স্থাবরজঙ্গম খেচর প্রাণী তৎসমুদায়ই প্রজ্ঞানেত্র, * প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত; এই জগৎ প্রজ্ঞানেত্র, প্রজ্ঞা ইহার আশ্রয়. (অতএব) প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম প্রজ্ঞানরূপী।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রস্তাব।

আধ্যাত্মিক গুরুত্ব ও লঘুত্ব।

লঘু গুরুর বিচার বাহ্যজগতে যেরূপ অন্তর্জগতেও সেইরূপ। ফুৎকারে তৃণ আকাশে উত্থিত হয়, কিন্তু লৌহ-গোলক বলে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইলেও ভূতলে পড়িয়া যায়। বেলুন কেন উপরে উঠে? পার্শ্বস্থ বায়ু অপেক্ষা বেলুনস্থিত বাষ্পের ভার অল্প বলিয়া। এই গুরুত্ব ও লঘুত্ব আয়তন ও পরমাণু-সন্নিবেশ সাপেক্ষ। পরমাণু-সন্নিবেশ একরূপ হইলে, আয়তন অনুসারে ভার নির্দ্দিষ্ট হয়, আবার আয়তন এক হইলে পরমাণু সন্নিবেশের ঘনত্ব ও বিরলত্ব অনুসারে ভারের তারতম্য হইয়া থাকে। আত্মার গুরুত্ব ও লঘুত্বেরও এইরূপ প্রভেদ করা যাইতে পারে। আত্মা সারবান হইলেই চঞ্চলতার হস্ত হইতে রক্ষা পায়; অসার আত্মা "বায়ু-উৎক্ষিপ্ত তুষের ন্যায়"। বায়ু উঠিলে তাহার আর নিস্তার নাই। বাহ্যজগতের ন্যায় গুরুত্ব এখানেও আয়তন ও পরমাণু-সন্নিবেশ সাপেক্ষ। আত্মার গুণ সমষ্টি উহার আয়তন; গুণের পরিমাণ ও সংখ্যা অনুসারে উহার বৃহত্ত্ব ও ক্ষুদ্রত্ব নির্দ্দিষ্ট হয়। বৃহদায়তন আত্মাই অনেক

* বীজকে সর্ব্বাং প্রাণাতে অনেনেতি নেত্রং, প্রজ্ঞানেত্রং যস্য তদিদং প্রজ্ঞানেত্রং। প্রজ্ঞাচক্ষুর্যাদর্বং ব্রহ্মলোকঃ।—শঙ্করভাষ্য।

বিষয়ক বিশ্বাস ক্রমশঃ উজ্জ্বল হইয়া উঠে। বলা বাহুল্য যে, এই সম্বন্ধ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, এই জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, গভীর চিন্তা ও ধ্যান আবশ্যক। যাঁহারা এরূপ জ্ঞানকে কেবল শুষ্ক দর্শন-জ্ঞান বলিয়া অগ্রাহ্য করেন এবং উচ্চতর আধ্যাত্মিক জীবনের সহিত ইহার অপরিহার্য্য সম্বন্ধ বুঝিতে না পারিয়া ইহার সাধনে উপেক্ষা করেন, তাঁহাদের নিকট ঈশ্বরের নিত্য প্রেম, নিত্য লীলা সম্বন্ধীয় উচ্চতর সত্য সমূহ চিরদিনই অস্পষ্ট, সন্দেহাচ্ছন্ন থাকিয়া যায়, কেবল স্বপ্নের ব্যাপার বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু আত্মচিন্তা দ্বারা আত্মার সহিত ঈশ্বরের নিত্য নিগূঢ় যোগ হৃদয়ঙ্গম করিলে তাঁহার অনুপম প্রেমের তত্ত্ব উজ্জ্বল হইয়া উঠে। আত্মজ্ঞান কি দেখাইয়া দেয়? আত্মজ্ঞান দেখাইয়া দেয় আমার জীবন জাগরণ, বিস্মৃতি, স্বপ্ন, সুষুপ্তি সমুদায় অবস্থাতে ব্রহ্মের উপর নির্ভর করিতেছে, ব্রহ্ম দ্বারা জীবিত রহিয়াছে। আমি জীবনের কোন কালেই, কোন অবস্থায়ই কোন অন্ধ জড়শক্তির অধীন নহি; সর্ব্বকালে, সকল অবস্থাতে তাঁহারই অধীন হইয়া, তাঁহারই আশ্রয়ে স্থিতি করিতেছি। আমার নিজেরও এমন কোন শক্তি নাই, যাহা তাঁহা হইতে প্রাপ্ত নয়, তাঁহাতে ধৃত অবস্থিত নয়। এই যে উপাসনা মন্দিরের মনোহর দৃশ্য আমার সমক্ষে প্রকাশিত হইয়াছে, এই দৃশ্য, এই চিত্র, পরমাত্মা স্বয়ং আমার চিত্তপটে অঙ্কিত করিয়াছেন, এই দর্শন ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আত্মাঘটিত ব্যাপার, সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক ব্যাপার। শরীর দেখে না, জড়বস্তুও দেখাইতে পারে না, দেখে আত্মা, দেখায়ও আত্মা, দর্শন আত্মারই একটী অবস্থা মাত্র। এইরূপে দেখা যায়, দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন, প্রভৃতি সমুদায় জ্ঞান ব্যাপারই আত্মা-ঘটিত ব্যাপার, আত্মায় আত্মায় সংঘর্ষণ, আধ্যাত্মিক জ্ঞান-লীলা। আত্মাতে জ্ঞান-লীলা কেবল সেই করিতে পারে, যে আত্মার ভিতরে আছে, আত্মা যাঁহার হাতে আছে, আত্মা যাঁহার লীলার পুতুল। পুনরায়, যখন আমাদের জীবনের আর একদিকে তাকাই, যখন দেখি আমরা নিতান্ত বিস্মৃতিশীল, অথচ স্মৃতি আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিতেছে, আমরা বিস্মৃতিশীল হইলেও আমাদের জীবন সচ্ছন্দে চলিয়া যাইতেছে, তখন আত্মার সহিত পরমাত্মার নিগূঢ় যোগ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যাই। এই যে আমরা এই মন্দিরে বসিয়া ঈশ্বর-প্রসঙ্গ করিতেছি, এই সময়ে আমরা জীবনের কত কথা ভুলিয়া আছি, এক্ষণে একদিকে দেখিতে গেলে আমাদের সমস্ত পূর্ব্ব জীবন আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি। কিন্তু বলিতে বলিতেই আবার বিস্মৃত কথাগুলি, হারাণ বিষয়গুলি স্মরণে আসিতেছে, সংসারে প্রবেশ করিলে যথাসময়ে সমুদায়ই মনে পড়িবে। এইরূপে আমরা ক্ষণে ক্ষণেই বিস্মৃত হইতেছি, ক্ষণে ক্ষণেই আবার স্মৃতি লাভ করিতেছি। বিস্মৃতিকালে পূর্ব্ব জীবনের ব্যাপার সমূহ কোথায় যায়, কোথা হইতে আবার ফিরিয়া আসে, কেইবা আনিয়া দেয়? এই সকল ভাবিলে নিতান্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। যে বিস্মৃতিশূন্য নিত্য সাক্ষী পরমাত্মা এই সমুদায় ধারণ করিয়া থাকেন ও প্রত্যাখ্যান করেন, তিনি আত্মার কত নিকটে, তাঁহার সহিত আত্মার কি গাঢ় যোগ! আত্মা নিশ্চয়ই তাঁহার লীলার পুতুল। আবার যখন নিদ্রিত হই, অচেতন হই, একেবারে অবশ নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ি, জ্ঞান, স্মৃতি, বুদ্ধি, শক্তি সমস্তই হারাইয়া ফেলি, তখন আত্মা কাহার আশ্রয়ে স্থিতি করে, সেই নিরাশ্রয় অবস্থায় কে জীবনের হারাণ বিষয়গুলিকে যত্নের সহিত রক্ষা করে, কেই বা যথাসময়ে জাগ্রত করে এবং জীবনের হারাণ বস্তুগুলিকে প্রত্যর্পণ করে? না জাগা ত অতি সহজ হইত, জাগি কেন? জাগায় কে? জাগিলেও তো পূর্ব্বোক্ত বিষয়গুলি ফিরাইয়া না পাইতে পারিতাম, তাহা হইলেত জীবন আবার শিশুর অজ্ঞান অবস্থায় পরিণত হইত। কে যত্ন করিয়া সমুদায় প্রত্যর্পণ করে, আবার জীবন-লীলা খেলিতে থাকে? তিনিই, সেই নিদ্রাশূন্য চিরজাগ্রত পুরুষই, যিনি আত্মার নিত্য আশ্রয় ও অবলম্বন, আত্মা যাঁহার লীলার পুতুল। এইরূপে দেখিতে পাই, প্রত্যেক আত্মার সহিত পরমাত্মার নিগূঢ় সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। জীবন ধারণের জন্য, জীবনের উন্নতির জন্য যে যে দ্রব্য, যে যে উপকরণ আবশ্যক, সমস্ত তিনি সাক্ষাৎভাবে প্রত্যেক আত্মাকে প্রদান করিতেছেন। জ্ঞান, ভাব, শক্তি যাহাতে আমাদের জীবন গঠিত, এই সমস্ত আমাদের নিজায়ত্ত নহে, তিনি স্বয়ং সাক্ষাৎভাবে আমাদিগকে এই সমস্ত দিয়া জীবিত রাখিয়াছেন। প্রত্যেক জীবাত্মা, প্রত্যেক মানবজীবন তাঁহার অবিরাম নিত্য লীলার ক্ষেত্র। এই বিশেষ বিশেষ লীলাক্ষেত্রের সমষ্টির নামই জগৎ।

আত্মাতে প্রকাশিত এই দিব্যজ্ঞানের আলোকে যখন ঈশ্বরের প্রেম মুখ দেখি, তখন একেবারে অবাক্ হইয়া যাই, মুগ্ধ হইয়া যাই। তখন বুঝিতে পারি ঈশ্বরের সাধারণ কৃপা একটা কথার কথা মাত্র। ঈশ্বর সাধারণ ভাবে আমাদিগকে কৃপা করেন,ইহা বলিলে ঈশ্বরেতে মানুষের অসম্পূর্ণতা আরোপ করা হয় মাত্র। অথবা যদি সাধারণ কৃপার কোন অর্থ থাকে, সে কেবল এই মাত্র যে, বিশেষ কৃপার সমষ্টিকে এক অর্থে সাধারণ কৃপা বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর সাধারণ নিয়মে কার্য্য করেন, তাহা মিথ্যা নহে। কিন্তু ইহাতে তাঁহার সহিত আমাদের প্রত্যেকের বিশেষ সম্বন্ধ প্রকৃত পক্ষে সাধারণ হইয়া যায় না। তিনি সাধারণ নিয়মে কার্য্য করেন, কিন্তু তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র বিশেষ বিশেষ। তিনি প্রত্যেক আত্মার সহিত বিশেষ ভাবে নিত্য লীলা করিতেছেন। জীবনের সমুদায় ঘটনাই তাঁহার বিশেষ কৃপার ফল। প্রাতঃকাল হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত, সায়ংকাল হইতে পুনরায় প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত, সমস্ত দিন রাত্রি তিনি হৃদয়ক্ষেত্রে, জীবন ক্ষেত্রে প্রেম-লীলা করেন। তিনিই স্বয়ং জাগ্রত করেন, তিনিই প্রাতঃকালীন্ নাম জপ, নাম কীর্ত্তনের জন্য প্রাণকে আহ্বান করেন, তিনিই প্রাতঃকালীন্ শীতল বায়ু সেবনার্থ ডাকিয়া বাহিরে লইয়া যান, তিনিই তাঁহার সাক্ষাৎ কৃপারূপী শীতল জলে স্নান করান, তিনিই তাঁহার সাক্ষাৎ প্রসাদরূপী অন্ন আহার করান। তিনি আহার করান ইহা কি কবিত্ব? আমি আহার

করি ইহাই কি কেবল সত্য? কে বলিল? তিনি চক্ষুর চক্ষু হইয়া অন্ন না দেখাইলে আমি দেখিতাম না, তিনি অন্নের আধাররূপী হইয়া না থাকিলে অন্নের এক কণিকাও থাকিত না, আর তিনি আমার শরীরে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বল না দিলে আমার আহার পান সমুদায় কার্য্যই অসম্ভব হইত। স্থূলদর্শী অবিশ্বাসীর চক্ষে যে সকল ব্যাপার কেবল ভৌতিক, কেবল মানুষিক বলিয়া বোধ হয়, স্থূলদর্শী যে সমুদায় কার্য্যে কেবল পাচককে দেখেন, পরিজনকে দেখেন, কতকগুলি অচেতন বস্তু দেখেন, সূক্ষ্মদর্শী বিশ্বাসী সেখানে ব্রহ্মের জীবন্ত আবির্ভাব দেখিয়া ভাবে ডুবিয়া যান। এইরূপে তিনি আমাদিগকে পোষণ করেন। তিনি স্বয়ং শরীরে থাকিয়া অন্নপাক, রক্তসঞ্চালন প্রভৃতি শারীরিক ক্রিয়া সম্পাদন করেন। তিনি স্বয়ং কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া, শরীর মনে শক্তি সঞ্চারিত করিয়া আমাদিগকে কার্য্য করান। তিনি শরীরের সঙ্গে, আত্মার সঙ্গে চিরসংযুক্ত থাকিয়া যথা যাই নিত্য সঙ্গী হইয়া আমাদের সহিত বিচরণ করেন ও দৈনিক শত শত বিপদ আপদ হইতে রক্ষা করেন। তিনিই পরিশ্রমান্তে প্রাণে বিশ্রাম ও শান্তি দান করেন। তিনি জ্ঞানোপার্জ্জন কালে চক্ষুর চক্ষু হইয়া দেখান, বুদ্ধি ও প্রজ্ঞাতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া জ্ঞানালোক প্রকাশিত করেন। তিনিই প্রাণকে উপাসনার জন্য আহ্বান করেন, তিনি হাত যোড় করান, তিনি চক্ষু মুদ্রিত করান, তিনি মনকে শান্ত করেন, তিনি সত্য, প্রেম পবিত্র স্বরূপ হইয়া নিজ গুণে আত্মাতে প্রকাশিত হন, প্রেম শান্তি রসে প্রাণকে অভিষিক্তকরেন, পুণ্য বলে আত্মাকে বলীয়ান করেন। তিনিই বিবেকরূপে নিয়ত আত্মাতে প্রত্যাদেশ প্রেরণ করেন, পাপ হইতে রক্ষা করেন, পুণ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত করেন, নিয়ত ধর্ম্ম জীবনের উচ্চ হইতে উচ্চতর আদর্শ দেখাইয়া স্বর্গ রাজ্যের দিকে প্রলুব্ধ করেন। তিনি সাধু ভক্তদিগের নিকট লইয়া যান, শ্রোত্রের শ্রোত্র হইয়া তাঁহাদের মধুর উপদেশ শ্রবণ করান,মনকে বুঝান, প্রাণে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনিই দেশ কালের ব্যবধান চূর্ণ করিয়া আত্মাকে প্রাচীন আর্য্য ঋষিদিগের অরণ্য মধ্যস্থিত ব্রাহ্ম সমিতিতে লইয়া গিয়া গভীর তত্ত্ব কথা শ্রবণ করান, বুধি-বৃক্ষমূলে গভীর ধ্যান-মগ্ন হৃদয়-মুগ্ধকর বুদ্ধমূর্ত্তি দর্শন করান, কেনানের পর্ব্বতোপরি আসীন মহর্ষি ঈশার পবিত্র স্বর্গীয় উপদেশ শ্রবণ করান, ক্যাল্‌ভ্যারির বধ্যভূমিতে লইয়া গিয়া সেই প্রাণস্পর্শী অদ্ভুত আত্মসমর্পণের ব্যাপার দর্শন করান, প্রাচীন নবদ্বীপে প্রেমোন্মত্ত ভক্ত মণ্ডলীর মধ্যে লইয়া গিয়া প্রেমোচ্ছ্বাসে নৃত্য করান। এইরূপে প্রাচীন, আধুনিক জ্ঞানী, প্রেমিক, কর্ম্মী অসংখ্য সাধক সহবাসে লইয়া গিয়া আত্মাকে স্বর্গের শোভা প্রদর্শন করান, পরিত্রাণ পথে অগ্রসর করেন। আমি আমার নিজের জন্য যত ব্যস্ত সে ব্যস্ততাকে কোটী গুণ করিলেও তাঁহার ব্যস্ততার সমান হয় না। সাধারণত্ব কোথায়? সবই বিশেষ। আমার সমগ্র জীবন তাঁহার বিশেষ কৃপার লীলাক্ষেত্র। আমি তাঁহার বিশেষ কৃপার সাগরে অনুক্ষণ ডুবিয়া আছি; যাহা কিছু দেখি, যাহা কিছু শুনি, যাহা কিছু পাই, যাহা কিছু সম্ভোগ করি, যাহা কিছু সহ্য করি, সমুদায় তাঁহার এই বিশেষ কৃপা সাগরের তরঙ্গ। সূর্য্য, চন্দ্র, জল, বায়ু, সংসার, গৃহ, পরিজন, বন্ধু, সমাজ, সৎগ্রন্থ, সাধু, জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য, শান্তি সমুদায়ই তাঁহার বিশেষ কৃপা সাগরের তরঙ্গ। আমি নিয়ত তাঁর প্রেমসাগরে ভাসিতেছি। তাঁহার কৃপা অনন্ত, অসীম, অনির্ব্বচনীয়। তাঁহার কৃপা সম্পূর্ণ রূপে জানি না বলিয়া বাঁচিয়া আছি। ভাল রূপে জানিলে, অনুভব করিলে হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইত। যখন কিঞ্চিৎ দেখি, যখন দেখি আমি কি পাষণ্ড, নরাধম, কৃতঘ্ন, তাঁহাকে ছাড়িয়া, তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া সংসারের অসার বস্তু লইয়া ব্যস্ত রহিয়াছি, অপরদিকে তিনি আমার মস্তকে করুণার উপর করুণা চাপাইয়া আমাকে একেবারে প্রেমঋণে ডুবাইয়া দিতেছেন, তখন হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠে, হৃদয়ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হয়। তখন সরল ভাবে বলে:— "তোমার প্রেমের ভার, বহিতে পারিনে গো আর; প্রাণ উঠিছে কাঁদিয়া হৃদয় ভেদিয়া, তব স্নেহ দরশনে, লইনু শরণ মাগো অভয় চরণে।" কবে তাঁহার প্রেম জানিয়া, তাঁহার প্রেম অনুভব করিয়া প্রেমিক হইব, শুষ্কতা চিরদিনের মতন চলিয়া যাইবে।

কবে—

প্রেমে পাগল হ'য়ে হাসিব কাঁদিব,
সচ্চিদানন্দ সাগরে ভাসিব;
আপনি মাতিয়ে সকলে মাতাব,
হরিপদে নিত্য করিব বিহার!

দয়াময় শীঘ্র সেই শুভ দিন আনয়ন করুন্।

আত্মা ও প্রাতঃসমীরণ।

আত্মা "ঘুমন্ত জগতে জাগায়ে পরশে,
কুসুম বয়ান উল্লসি হরষে,
অভিষেকি তৃণে, মুকুতা বরষে,
বায়ু, গতি তব হতেছে কোথায়?"

প্রাতঃসমীরণ "ছিল মোর প্রতি, প্রভুর আদেশ—
কহিতে জগতে, করিয়া বিশেষ,
করিবেন তার গৃহেতে প্রবেশ।
প্রেম বারিবিন্দু, যে দিবে তাঁহায়।

"কহিলাম সবে পশি ঘরে ঘরে
এ শুভ সংবাদ; মৃতমহী পরে
জাগি উঠি সবে, সুললিত স্বরে
গাইতেছে তাই, সুমঙ্গল গান্।

"সে গীত লহরী বহিয়া যতনে,
যাইতেছি সুখে প্রভুর সদনে,
দেখা পথে, ফুল সুন্দরীর সনে,
অলির কারণ সে দিল পরাণ।"

সন্ধ্যার সময় কলিকাতা হইতে কয়েকজন ভক্তিভাজন ব্রাহ্মভ্রাতা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের শুভাগমনে আনন্দের স্রোত বহিতে লাগিল। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বেদীর কার্য্য করিলেন। বৈরাগ্য ও ভক্তি বিষয়ে উপদেশ হইল।

১৬ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার প্রাতে শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কবিহারী বসু মহাশয় উপাসনার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। উপাসনা ও সংকীর্ত্তনাদিতে ভগবানের কৃপা-স্রোত অবিরলধারে বহিতে লাগিল। অমরপুর ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের শুভাগমনে ও তাঁহাদের সংগীতে আনন্দবর্দ্ধন হইয়াছিল। সংগীত ও সংকীর্ত্তনে ভক্তগণ উন্মত্ত হইয়াছিলেন। অনেকেই উন্মত্তভাবে মহানন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন।

সন্ধ্যার পর কোন গৃহস্থ ভবনে উপাসনা হইল। অনেকগুলি লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে বিশেষ সুখের বিষয় এই যে, বহুসংখ্যক ভদ্রমহিলা নিবিষ্টচিত্তে উপদেশাদি শ্রবণ করিয়াছিলেন। 'নামে রুচি, জীবে দয়া' বিষয়ে দীর্ঘ উপদেশ হইয়াছিল। নাম মাহাত্ম্য বিষয়ে একটী পৌরাণিক আখ্যায়িকা বলা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বেদীর কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ভগবানের কৃপায় উৎসবে উপকার হইয়াছে।

কাল্না।

গত ২১শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার সন্ধ্যার পর উপাসনা। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করিলেন। শনিবার প্রাতে সমাজমন্দিরে উপাসনা এবং প্রার্থনা বিষয়ে উপদেশ। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আচার্য্য। সন্ধ্যার পর ছাত্র সমাজের উৎসব। "সকল বিদ্যাই ব্রহ্মবিদ্যা" উপদেশের বিষয়। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আচার্য্য।

২৩শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার প্রাতে সমাজমন্দিরে উপাসনা এবং 'ধর্ম্মজীবন' বিষয়ে উপদেশ। ভগবানের কৃপাস্রোত বিশেষরূপে অনুভূত হইয়াছিল। অনেকেই উদ্বেলিত হৃদয়ে ক্রন্দন করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বেদীর কার্য্য করেন। অপরাহ্ণে একটি প্রকাশ্য স্থানে 'সারধর্ম্ম' বিষয়ে বক্তৃতা। ৩।৪ শত লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। বক্তা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

২৪শে জ্যৈষ্ঠ সোমবার একটি প্রকাশ্যস্থানে শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় কতকগুলি শাস্ত্রীয় শ্লোকের অতি সুন্দর ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে নগর সংকীর্ত্তন করিতে করিতে সকলে সমাজ মন্দিরে উপস্থিত হন। শাস্ত্রী মহাশয় বেদীর কার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

ঐ দিবস কাল্নার কোন ভদ্রলোকের ভবনে মহিলাদিগের সমাজ হয়। অনেকগুলি ভদ্রমহিলা সমাগত হইয়াছিলেন। শ্রীমতী মাতঙ্গিনী দেবী উপাসনার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

২৫শে জ্যৈষ্ঠ শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট মহাশয়ের নবকুমারের নামকরণ হয়। শিশুটীর নাম নির্ম্মলচন্দ্র রাখা হইল। শাস্ত্রী মহাশয় উপাসনা করিলেন। প্রার্থনাপূর্ব্বক শিশুটীর মুখে পায়সান্ন দেওয়া হইল। অপরাহ্ণে "ব্রহ্মোপাসনা" বিষয়ে শাস্ত্রী মহাশয়ের বক্তৃতা হয়, কিন্তু বৃষ্টির জন্য ভাঙ্গিয়া যায়। তৎপরদিবস (২৬শে জ্যৈষ্ঠ অপরাহ্ণে) পুনর্ব্বার তিনি অতি সুন্দর বক্তৃতা করেন।

প্রেরিত পত্র।

৩ আইনের সংশোধন।

'ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার' পাঠে অবগত হইলাম যে ১৮৭২ সালের ৩ আইন সংশোধন বা পরিবর্ত্তন (amend) করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট শীঘ্রই যে আবেদন পত্র (memorial) দেওয়া হইবে, তাহাতে মেয়েদের বিবাহের ন্যূনতম [illegible] ১৪ হইতে ১৬ বৎসরে বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব [illegible]ছে, এবং ব্রাহ্মদের মধ্যে অনেকেই উক্ত পরিবর্ত্তনের [illegible] অনুভব করিতেছেন। সুতরাং এই সম্বন্ধে আমি যাহা ভাবিতেছি, ব্রাহ্ম সাধারণের গোচরার্থে আপনাদিগকে লিখিতেছি।

বর্ত্তমান সময়ে মেয়েদের বিবাহের ন্যূনতম বয়স বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাবটা আমি অত্যন্ত গুরুতর বলিয়া মনে করি এবং অবিলম্বে কার্য্যে পরিণত হইলে অনেক প্রকার বিপদের আশঙ্কা আছে বলিয়া ভয় করি। আমি ব্রাহ্মসমাজের রক্ষণশীল (Conservative) দলের লোক নহি এবং নিজেও ১৭ বৎসরের ন্যূনবয়স্কা মেয়েকে বিবাহ করি নাই। কিন্তু উদার দলস্থ হইলেও নির্দ্ধারিত ১৪ বৎসরকে আইনের দ্বারা ১৬ বৎসরে বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিতে পারিতেছি না। এবং মফঃস্বলে বাস করিয়া নিজে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এবং যাহা সময় সময় অনুভব করিয়াছি, তাহা বলিতেছি।

ব্রাহ্মদের সংখ্যা এখনও তত অধিক হয় নাই। যে অল্পসংখ্যক ব্রাহ্ম আছেন, তাঁহাদেরও অধিকাংশই বোধ করি মফস্বলে বাস করেন; এবং অনেককেই চারিদিকে হিন্দুসমাজস্থ লোকদিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া থাকিতে হয়। সুতরাং ব্রাহ্ম সন্তান—বিশেষতঃ বালিকাদিগকে—সুশিক্ষা প্রদান করা যে কত অসুবিধাজনক, এবং সময় সময় অসম্ভব হইয়া উঠে, ইহা কলিকাতাস্থ ব্রাহ্মরা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। ইহার উপরে আবার ব্রাহ্মরা সাধারণতঃই অর্থহীন এবং দরিদ্র। অনেকেই অর্থের অভাবে সন্তানদিগকে উপযুক্ত রূপে শিক্ষা দান করিতে পারিতেছেন না, এবং যাঁহারা অর্থের অভাবে শিক্ষা দান করিতে অক্ষম নহেন, মফস্বলে থাকা প্রযুক্ত তাঁহারাও তাঁহাদের সন্তানগণের শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিয়া উঠিতে পারেন না। কলিকাতাস্থ সামান্য অবস্থার কোন ব্রাহ্ম আপনার সন্তানের শিক্ষার যে প্রকার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন, মফস্বলস্থ কোন ধনী ব্রাহ্ম যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিয়াও সকল সময় সেই সুবিধা পাইবেন না। হিন্দুসমাজস্থ বালক বালিকাগণ বিবাহ সম্বন্ধে বড়ই কুশিক্ষা প্রাপ্ত হয়, অথবা অনেক অসৎ দৃষ্টান্ত দেখিতে পায়। উক্ত বালক বালিকাগণের সহিত ব্রাহ্ম

বাহির হইতে সঙ্কুচিত হইতেছেন। ২রা জ্যৈষ্ঠ, রবিবার, অপরাহ্নে দাণ্ডা গ্রামে ছাত্রসঞ্জীবনী সভায় নীতি বিষয়ে একটী সুদীর্ঘ ও সারগর্ভ উপদেশ প্রদত্ত হয়। ৭ই জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার, করটীয়ার ভূম্যধিকারী মহম্মদ আলী খাঁ সাহেবের বাড়ীতে অপরাহ্নে 'মহম্মদ চরিত' ও রাত্রীতে 'দেশের বর্ত্তমান অবস্থা' সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। বহুসংখ্যক মুসলমান ভদ্রলোক ও মৌলবী একত্রিত হইয়া আগ্রহ সহকারে বক্তৃতা শ্রবণ ও বক্তার প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কয়েক জন মৌলবী মহম্মদের বিবরণ ব্রাহ্মের মুখে বিবৃত হইতে আপত্তি করেন; কিন্তু সর্ব্বসম্মতিতে সে আপত্তি অগ্রাহ্য হইয়াছিল। ৯ই জ্যৈষ্ঠ,রবিবার, প্রত্যূষে আকুর টাকুর গ্রামে গমন করেন। তথায় অনেক ভদ্রলোক দলবদ্ধ হইয়া ব্রহ্মনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে টাঙ্গাইল বাজার প্রদক্ষিণ করিয়া বাবু মহেশচন্দ্র বিশ্বাসের বাড়ীতে উপস্থিত হন। অপরাহ্ণ ৫টার সময় কৃষ্ণবাবু 'নানক চরিত' সম্বন্ধে একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিয়া উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী ও মহিলাদিগকে ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন। ইতিপূর্ব্বে ২৪শে বৈশাখ, শুক্রবার, অপরাহ্নে সন্তোষ জাহ্নবী স্কুলগৃহে পশ্চিম ময়মনসিংহ সভায় 'স্ত্রী-শিক্ষা' বিষয়ে একটী উপদেশ প্রদান করেন। এ অঞ্চলে তিনি আরও অনেক কার্য্য করিবেন প্রস্তাব আছে। তদ্বিবরণ ক্রমে প্রকাশ করা যাইবে।

নূতন পুস্তক—বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের অন্যতর প্রচারক বাবু মনোরঞ্জন গুহ প্রণীত "জীবন সহায়" নামক ক্ষুদ্র পুস্তক পাঠ করিয়া আমরা অতিশয় আনন্দিত হইলাম। ইহাতে আধ্যাত্মিক উন্নতির সাহায্যকারী কতিপয় বহুমূল্য সার কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহা ব্রাহ্ম মিসন প্রেস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য তিন আনা মাত্র।

দান—সিন্দুরীয়াপটিস্থ বাবু মনিলাল মল্লিকের ধর্ম্মপরায়ণা পরলোকগতা মাতা ঠাকুরাণী ব্রাহ্মসমাজে ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ২০৲ বিশ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে।

বিবাহ—বিগত ২৪এ মে নওগাঁয়ে একটী ব্রাহ্ম বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্র ডাক্তার নন্দকুমার রায় ও পাত্রী রায় গুণাভিরাম বড়ুয়া বাহাদুরের কন্যা শ্রীমতী স্বর্ণলতা বড়ুয়া। বরের বয়স ৩৫ বৎসর, কন্যার বয়স ১৬। উভয়েই জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং উভয়েরই এই প্রথম বিবাহ। বিবাহ তিন আইন মতে রেজেষ্টারি হইয়াছে।

তত্ত্বকৌমুদীর মূল্য প্রাপ্তি।

(নবেম্বর, ১৮৮৬ পর্য্যন্ত)

বাবু অন্নদাচরণ কাস্তগিরি	কলিকাতা	১৲
„ অবিনাশচন্দ্র সরকার	সিকরোল	৩৲
„ রাজকুমার দত্ত,	জৈনসার	১॥০
„ লক্ষ্মীকান্ত বরকাকুটী,	তেজপুর	৮॥৵০০
„ অমৃতলাল মজুমদার,	সিরাজগঞ্জ	৫॥৵০
„ বৈষ্ণবচরণ মল্লিক,	হুগলি	৩৲
„ গিরিশচন্দ্র গুহ,	নারায়ণগঞ্জ	৩৲
বাবু ক্ষেত্রমোহন ধর,	কলিকাতা	১৲
„ নগেন্দ্রনাথ সেন	কলিকাতা	১৲
„ রাখালদাস চট্টোপাধ্যায়,	ভাগলপুর	৩৲
„ হেমচন্দ্র দাস,	কলিকাতা	১৲
„ দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়,	গোসাইপুর	১৲
„ নবীনচন্দ্র দাস,	উজীরপুর	
„ রাসবিহারী সেন,	বরিশাল	
„ রমানাথ বসু,	হাওড়া	১৲
শ্রীমতী রাজবালা রায়,	হরিনাভী	৩৲
রায় রাধাগোবিন্দ রায়বাহাদুর,	দিনাজপুর	৬৲
বাবু রামদুর্ল্লভ মজুমদার,	নওগাঁ	৬৸৶০
„ অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়,	শিলং	৩৲
„ হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,	হাতরস	১॥০
„ কালীকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়,	সৈয়দপুর	৩৲
„ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী,	হাজারিবাগ	৩৲
„ অমৃতলাল সিং,	সিমলা	৬৲
„ নবদ্বীপচন্দ্র প্রামাণিক,	ডিব্রুগড়	২৲
„ বিনোদবিহারী মজুমদার,	কলিকাতা	২॥০
„ গোপালচন্দ্র মল্লিক,	কলিকাতা	১৲
„ ভবানীনাথ বাগ্‌ছি,	টাঙ্গাইল	১৲
„ পূর্ণচন্দ্র বসু,	জোড়হাট	১৸০
„ আনন্দমোহন বসু,	কলিকাতা	২॥০
„ দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়,	গাজীপুর	৩৲
„ রামানন্দ মজুমদার,	গোবড়াছড়া	৩৲
„ হেরম্বচন্দ্র মৈত্র,	কলিকাতা	৩৲
„ রোহিণীকুমার দত্ত,	শ্যামনগর	৩৲
„ হরিদাস ভট্টাচার্য্য,	চক্রবেড়ে ব্রাহ্মসমাজ	১৲
„ আনন্দচন্দ্র রায়,	শিলিগুড়ি	৩৲
„ সারদাপ্রসাদ দত্ত,	চন্দননগর	১॥০
„ হরিনারায়ণ দাঁ,	বরাহনগর	২॥০
„ গোবিন্দচন্দ্র রক্ষিত,	গয়া	৬৲
„ বিহারীলাল চৌধুরী,	বরিশাল	৯৲
বাবু অতুলমোহন দাস,	ভবানীপুর,	২॥৶০
„ শ্রীনাথ গুহ,	ঢাকা	৩৲
„ উমেশচন্দ্র সুর,	কলিকাতা	২॥০
„ কেদারনাথ কুলভী,	বাঁকুড়া	১৲
„ দ্বারকানাথ ঘোষ,	কলিকাতা	১৲
„ উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়,	বেলুড়	৪৸০
„ ফেলুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,	এটোয়া	৫৲
শ্রীমতী হরসুন্দরী দেবী	বরিশাল	১॥০

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রচারফণ্ডে এককালীন দান।

বাবু যদুনাথ কাঞ্জিলাল,	বাগেরহাট	১৲
„ বাবু শ্যামাচরণ ধর,	খুলনা	১৲
„ গোবিন্দচন্দ্রদাস,	বাগেরহাট	২৲
„ আনন্দচন্দ্র সেন,	ঐ	॥০
„ তারিণীচরণ মৌলিক,	ঐ	১৲
„ রজনীকান্তমুস্তফী,	ঐ	১৲
„ নবীনচন্দ্রকর,	ঐ	১৲
„ অম্বিকাচরণ কর্ম্মকার,	ঐ	
„ নবীনচন্দ্র সিংহ,	ঐ	

১৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিসন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র দত্ত দ্বারা ২রা আষাঢ় মুদ্রিত ও ২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১০ম ভাগ।
৬ষ্ঠ সংখ্যা।

১৬ই আষাঢ় বুধবার, ১৮০৯ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৮।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৲
মফস্বলে ৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৶০

পূজার আয়োজন।

কিছু যেন দিতে সাধ করে।

ধীরে ধীরে বহে সমীরণ ঊষার মধুর সম্ভাষণে;
নিদ্রিত কুসুম জেগে উঠে চেয়ে দেখে আকুল নয়নে।
আম ডালে কাল দু'টী পাখী মুখে মুখে চেয়ে বসেছিল;
আঁধারের হ'লে বিসর্জ্জন প্রেমভরে পুলকে চাহিল।
মার কোলে দুধের মেয়েটী প্রভাতের বাতাস পাইয়ে;
ফুট ফুটে চোখ দু'টী মেলে ফ্যাল্‌ফেলিয়ে পড়িছে ঝুরিয়ে।
গোপনে বসিয়া কে গো তুমি এ জগত যখন ঘুমোয়;
পরাইয়া নব বেশভূষা ডেকে দাও ঊষার আলোয়—
আকুল পরাণে চেয়ে দেখি নিতুই নূতন রূপে সখা,
প্রেমমাখা মুখ খানি লয়ে জগত আমারে দেয় দেখা।
জেগে উঠে ঘুমান পরাণ নীরব রাগিণী কণ্ঠে ভাসে;
চেয়ে চেয়ে ঢলে পড়ে আঁখি প্রেমময়ী রূপের বিকাশে।
মা—মা বলে ডেকে উঠি কারে, কে জানে তা বুঝিতে পারিনে
প্রাণে প্রাণে জড়াইয়া ধরি ভয়ে ভয়ে কথাটী ফুটিনে—
পাছে তোমা হারাই জননি, চক্ষু তাপ সহেনা যে গায়;
বিভোর হইয়া রূপ দেখি প্রাণমন ঢেলে দিয়ে পায়।
ঊষার আলোকে বসে বসে প্রেমমাখা চরণ উপরে;
কে জানে মা আকুল পরাণে, কিছু যেন দিতে সাধ করে।

প্রভু! মানুষ নিজের বুদ্ধি হইতে যে সকল কথা বলে, যে সকল উপদেশ দেয়, তাহাতে ত কৈ প্রাণ ভিজে না। তুমি যাহাকে বলাও, তার কথা যেমন প্রাণে লাগে, অপরের কথা ত তেমন লাগে না। তুমি যদি একটা কথা বলাও, তুমি যদি একটা কাজ করাও, সেই একটা কথা, সেই একটা কাজ আমার নিজের বুদ্ধিপ্রসূত সহস্র কথা, সহস্র কার্য্য অপেক্ষা অধিক মূল্যবান্। তোমাকে যে না দেখিল, তোমার কথা প্রাণের মধ্যে যে না শুনিল, তোমাদ্বারা চালিত হইয়া যে কাজ না করিল, তাহার কথার ও কার্য্যের আবার মূল্য কি? তাহার উপদেশ মানুষের প্রাণকে স্পর্শ করিতে পারে না, মানুষকে পরিত্রাণ দিতে পারে না। আমি লোককে উপদেশ দিয়া কি করিব, যদি আমার প্রাণের মধ্যে তোমার প্রকাশ দেখিতে না পাই? হে প্রাণের প্রাণ! তুমি যদি আমার আত্মাকে অনুপ্রাণিত না কর, তবে যে আমার সহস্র সাধুকার্য্যও ভস্মে ঘৃত নিক্ষেপ মাত্র। তুমি আমার প্রাণে এস, তুমি আমার সঙ্গে কথা কও, তুমি আমার প্রাণটাকে স্পর্শ কর, নতুবা আমি নিজের শক্তিতে কিছুই করিতে পারিব না।

অজ্ঞ লোকে বুঝে না তাই কত চেষ্টা করিয়া তীর্থ ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। এই সমস্ত পৃথিবী যে একটী প্রকাণ্ড তীর্থ-স্থান তাহা বড় একটা কেহ ভাবে না। প্রভুর প্রকাশে জগতের প্রত্যেক বস্তু পবিত্র হইয়া রহিয়াছে। আমাদের প্রত্যেক অন্নগ্রাস ও পানীয় জল পবিত্র; আমাদের পরিধানের বসন পবিত্র; স্নানের জল পবিত্র; উপবেশনের স্থান পবিত্র; শয্যা পবিত্র; নিশ্বাস প্রশ্বাসের বায়ু পবিত্র। সমীরণ তাঁহারই পবিত্রতা বহন করিতেছে। আমাদের গৃহ পবিত্র; কার্য্যালয় পবিত্র; পথ ঘাট পবিত্র। বৃক্ষ লতা, ফল ফুল, পশু পক্ষী প্রভৃতি প্রত্যেক পদার্থের মধ্যে তাঁহার পবিত্র নাম অঙ্কিত রহিয়াছে। আমাদের স্ত্রী পুত্র পরিবার, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব ও অন্যান্য প্রত্যেক নরনারীর দেহ সেই পবিত্রস্বরূপের মন্দির। এই ভাবটী যখন হৃদয়ে উজ্জ্বল হয়, তখন এই সমস্ত পৃথিবীকে একটী প্রকাণ্ড দেবালয় বলিয়া বোধ হয়। দুঃখের বিষয়, এই ভাবটী আজিও স্থায়ী হইল না, স্বাভাবিক হইল না।

ধর্ম্ম যতদিন না নিশ্বাস প্রশ্বাসের মত স্বাভাবিক হয়, ততদিন রক্ষা নাই, উত্থানপতনের বিরাম নাই। যতদিন চেষ্টা ধর্ম্মপথে চলিতে হয়, পাপ তাড়াইতে হয়, যতদিন চিন্তা করিয়া ঈশ্বরের পবিত্রতা ও প্রেম অনুভব করিতে হয়, ঈশ্বরের সত্তা হৃদয়ঙ্গম করিতে হয়, ততদিন বুঝিতে হইবে, প্রকৃত ধর্ম্মপথে আমরা একপদও অগ্রসর হইতে পারি নাই; ততদিন আমাদের জীবনের উপর তিলমাত্র বিশ্বাস নাই। সমস্ত জীবনের কথা দূরে থাকুক, প্রতিদিনের উপাসনা যদি

এমন হয় যে, তাহার প্রভাবে অন্ততঃ সমস্ত দিন মনটা কম্পাসের কাঁটার মত ঈশ্বরের দিকে ফিরিয়া থাকে, তাহা হইলেও আমাদের বর্তমান অবস্থার পক্ষে যথেষ্ট হইল মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু তাই বা হয় কৈ? ঘড়ির কাঁটা যদি প্রতি মুহূর্তে চালাইয়া দিতে হয়, তবে কি তাহাতে কাজ চলে? প্রভূ! প্রতিদিন এমন করিয়া প্রাণের ঘড়িতে দম দিয়া দিও, যেন সমস্ত দিন তাহার জোরে চলিতে পারি।

প্রভূ! সেকালের লোক তোমাকে সংসার হইতে তাড়াইয়া দিয়া শেষে তোমাকে পাইবার জন্য সংসার পরিত্যাগ করিত। তুমি আমাদিগকে অন্যরূপ উপদেশ দিতেছ,—তুমি বলিয়াছ, তোমার সংসারে তোমাকে আনিতে হইবে। ভাই ভগ্নী, বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন সকলকে লইয়া তোমাকে মাঝখানে বসাইয়া তোমার পূজা করিতে হইবে। তোমার প্রদত্ত সুখ ভোগ করিতে হইবে, কিন্তু তোমাকে অতিক্রম করিয়া নহে। তুমি আমাদের হৃদয়কে তোমার সৌন্দর্য্যের প্রতি এমন করিয়া আকর্ষণ কর, যেন সেই আকর্ষণের বলে পাপের আকর্ষণ ছিন্ন হইয়া যায়। নতুবা শূন্য হৃদয়ে কেবল সাধনের বলে আমরা তোমাকে পাইব না। তুমি গৃহদেবতা হইয়া তোমার সংসারে অধিষ্ঠান কর। তাহা হইলেই আমাদের গৃহ দেবালয় হইবে, তাহা হইলে আমরা ঘরে বসিয়াই স্বর্গ পাইব। তোমার প্রকাশেই ধরাতলে স্বর্গধাম।

প্রভূ! তুমি আমার জীবন, তুমি আমার বল, তুমি আমার হৃদয়ের আলোক। তোমাকে ছাড়িলে আমাতে আর আমি থাকি না। তোমাকে না দেখিলে আমার প্রাণে কোনও সুখই থাকে না। তুমি প্রাণের মধ্যে প্রকাশিত না হইলে আমি যে কিছুই করিতে পারি না। জীবনশূন্য দেহ কি কোন কাজ করিতে পারে? তুমি আমার জীবন-তরীর কর্ণধার; তুমি হৃদয়ে না থাকিলে আমার জীবন ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়ায়। তুমি কি আমাকে দেখা দিবে না? তোমা বিনা যে আমার দিন চলে না। আমার যে তোমা বই আর গতি নাই। তুমি যে আমার অন্য সুখের পথে কাঁটা দিয়াছ। আমি অপরাধী বলিয়া, তোমার মূল্য বুঝি না বলিয়া, তোমাকে যত্ন করিতে জানি না বলিয়া যদি তুমি মুখ লুকাও, তবে আমি কার কাছে যাব? আচ্ছা আমি যেন এখন তোমার মূল্য বুঝি না, কিন্তু কোনও কালে বুঝিব কি? তোমার মূল্য কে বুঝিতে পারে বল দেখি? তবে আর তার জন্য আমার এক মাত্র সুখে আমাকে বঞ্চিত কর কেন? হৃদয়গৃহ শূন্য পড়িয়া আছে; আসিয়া পূর্ণ কর।

বৃষ্টি না হইলে পৃথিবী মরুভূমি হইয়া যাইত; কোনও বৃক্ষ বা শস্য উৎপন্ন হইত না। সেইরূপ মানবহৃদয়ে ঈশ্বরের করুণাবারি বর্ষিত না হইলে মনুষ্যের সমস্ত জীবনই বিফল হইয়া যায়। জল বিনা সহস্র কর্ষণেও শস্য উৎপন্ন হয় না; ঈশ্বরের কৃপা বিনা সহস্র চেষ্টাতেও মানুষ কিছু করিতে পারে না। ঈশ্বরের করুণা যখন মানুষের হৃদয়ে কার্য্য করিতে থাকে তখন যাহার কোন ক্ষমতা নাই সেও আশ্চর্য্য কার্য্য সকল সম্পন্ন করিতে পারে।

আমরা সমস্ত দিন যেভাবে দিন কাটাই তাহার উপর উপাসনার মধুরতা ও জীবন্ত ভাব অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। সমস্ত দিন যদি মন ঈশ্বরের দিকে কম্পাসের কাঁটার মত ফিরিয়া না থাকে, বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহা হইলে উপাসনা ভাল হইবে এরূপ আশা করাই অন্যায়। আমরা অনেক সময় ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না কেন, উপাসনা ভাল হইতেছে না। কিন্তু এই অবস্থায় বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে সমস্ত দিন ঈশ্বরের সহিত যোগ না থাকাই ইহার প্রধান কারণ। তাঁহাকে ছাড়িয়া আমরা যাহা কিছু ভাবি বা করি তাহাই উপাসনার সময় আমাদের শত্রু হয়

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রস্তাব।

সজীব ও মৃত ধর্ম্ম।

ঋণ করিয়া ধনী হওয়া যায় না। ঋণলব্ধ বস্তুকে নিজস্ব বলিয়া গর্ব্ব করা অপেক্ষা মূঢ়তা আর কি হইতে পারে? পরের অট্টালিকায় বাস করিয়া, পরের অর্থে সুখসেব্য নানাবিধ দ্রব্য আহার করা অপেক্ষা নিজের পর্ণকুটীরে বসিয়া স্বোপার্জ্জিত অর্থে শাকান্ন ভোজন করাও যে সহস্র গুণে অধিক বাঞ্ছনীয়, তাহাতে আর সন্দেহ কি? মানুষ কিন্তু সকল সময় তাহা বুঝিয়াও বুঝে না। পরের ধনে বড়মানুষী দেখান রোগটা অনেকেরই আছে। ঋণ করিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করা যাইতে পারে, কিন্তু ঋণের উপর নির্ভর করিয়া চিরদিন কোনও কারবার চলে না। পরের স্কন্ধে ভর করিয়া চিরদিন দাঁড়াইয়া থাকা যায় না।

জ্ঞান সম্বন্ধেও ঠিক্ এইরূপ। অনেকে কেবল বহুল পুস্তক পাঠ করিয়া জ্ঞানী বলিয়া পরিচিত হইতে চাহেন। কিন্তু পুস্তকগত বিদ্যা কার্য্যকালে কোন উপকারেই আসে না। নিতান্ত মূর্খ ব্যক্তির গৃহেও প্রকাণ্ড পুস্তকালয় থাকিতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া কেহ তাহাকে জ্ঞানী বলিবে না। সেইরূপ যিনি কেবল পুস্তকস্থ বিষয় পাঠ বা অভ্যাস করিয়াছেন তাঁহাকে জ্ঞানী বলা যায় না। তাঁহাকে বিদ্বান্ বল, পণ্ডিত বল, কিন্তু জ্ঞানী বলিও না। প্রকৃত চিন্তাশীল ব্যক্তি নিরক্ষর হইলেও জ্ঞানী; আর যিনি চিন্তাহীন, নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইলেও তিনি কেবল গতি ও বাক্‌শক্তিবিশিষ্ট পুস্তকালয় বিশেষ। পুস্তকলব্ধ বিদ্যার যে প্রয়োজন নাই তাহা নহে। কিন্তু সে প্রয়োজন কেবল চিন্তাশক্তিকে সাহায্য করা মাত্র।

আধ্যাত্মিক রাজ্যেও ঐ কথা। এখানেও অনেকে অপরের পরিচ্ছদ পরিয়া ধার্ম্মিক সাজিতে যান; অপরের উপার্জ্জিত সত্যরত্ন লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে অনেক সময় তাহা নিজস্ব মনে করিয়া আত্মপ্রতারিত হন। কিন্তু

ধর্ম্মের উচ্চ উচ্চ কথা শুনিলে বা কণ্ঠস্থ করিলেই ধার্ম্মিক হওয়া যায় না। পরের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করা যায় না। নিজের উপার্জ্জিত একটী সামান্য সত্য অপরের মুখলব্ধ সহস্র উচ্চ সত্য অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। ধর্ম্ম যে পরিমাণে আমার নিজস্ব হইয়াছে, সেই পরিমাণে উহা আমার পক্ষে সজীব। অপরের উপার্জ্জিত সত্য যতদিন না আমি নিজের হৃদয়ে প্রত্যক্ষ ভাবে উপলব্ধি করি, তত দিন উহা আমার পক্ষে মৃত। অপরের প্রচারিত সত্য যে পরিমাণে আমার চিন্তাশক্তিকে উত্তেজিত ও পরিচালিত করে, আমাকে সত্যলাভের চেষ্টায় প্রবর্ত্তিত করে, সেই পরিমাণে উহা আমার পক্ষে প্রয়োজনীয়। নতুবা আমার জীবনে উহার কোন কার্য্যকারিতা নাই। উহা আমার উন্নতির ভিত্তিভূমি হইতে পারে না।

মানসিক ও আধ্যাত্মিক অধীনতার দিন ক্রমে চলিয়া যাইতেছে। অভ্রান্ত আপ্তবাক্যের উপর, মহাজনপ্রবর্ত্তিত কর্ম্মকাণ্ডের উপর লোকের আস্থা ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছে। পরের মুখের কথায় এখন আর চিন্তাশীল লোকের মন তৃপ্তি মানিতে চাহে না। সে কালের লোকে প্রত্যক্ষ ভাবে ঈশ্বরকে দর্শন করিতেন, প্রাণের মধ্যে ঈশ্বরবাণী শ্রবণ করিতেন। একালেই বা তাহা হইবে না কেন? ঈশ্বরের ইচ্ছা কি এখন তাঁহার জগতে কার্য্য করিতেছে না? তাঁহার সৃষ্টির সহিত কি তাঁহার সম্বন্ধ বিলুপ্ত হইয়াছে? সেকালে যাহা সম্ভব ছিল একালে তাহা অসম্ভব হইবে কেন? সেকালে যাহা একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল, একালে তাহার প্রয়োজনীয়তার হ্রাস হইবে কেন? পূর্ব্বেও যেমন ঈশ্বরদর্শনের প্রয়োজন ছিল, প্রত্যক্ষ ভাবে ঈশ্বরবাক্য শ্রবণের প্রয়োজন ছিল, জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধস্থাপনের প্রয়োজন ছিল, এখনও তেমনি আছে। ইহাই ধর্ম্ম, ইহাই স্বর্গরাজ্যের সোপান। ইহা ব্যতীত অন্য উপায় নাই, অন্য পথ নাই। ইহাই ধর্ম্মের সার কথা। আর যাহা কিছু তাহা ইহার সাধন মাত্র, সহায় মাত্র। তোমার ঈশ্বরকে লইয়া আমি কি করিব? তুমি ঈশ্বরবাণী শুনিয়াছ, তাহাতে আমার কি? তুমি তাঁহাকে পিতা বলিয়া, মাতা বলিয়া, প্রভু বলিয়া, গুরু বলিয়া, রাজা বলিয়া, পরিত্রাতা বলিয়া, বন্ধু বলিয়া হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়াছ, তাহাতে আমার কি? আমার প্রাণেশ্বরকে আমি দেখিতে চাই, আমার হৃদয়ের মধ্যে তাঁহার প্রাণস্পর্শী বাক্য শুনিতে চাই, তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে চাই। আমার প্রাণের অনন্তপিপাসা আর কিছুতেই মিটিবার নয়। মানুষের কথায় আমার প্রাণ ভিজে না। মানুষের উপদেশ আমার প্রাণের অন্তস্তল স্পর্শ করে না। আমার প্রাণেশ্বরের সহিত আমি প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বন্ধ হইতে চাই। ইহাই পরিত্রাণ, ইহাই স্বর্গ। জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার নিত্য ও প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপন করাই ধর্ম্মের একমাত্র উদ্দেশ্য। যে ধর্ম্ম দ্বারা ইহা সংসাধিত হয় তাহাই সজীব ধর্ম্ম। যে উপদেষ্টা ইহার সাহায্য করেন, তিনিই যথার্থ ধর্ম্ম প্রচারক।

এই যে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ যোগ, ইহা সংস্থাপন করাই ব্রাহ্মধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ। ব্রাহ্মধর্ম্ম কোন প্রকার অভ্রান্ত আপ্তবাক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে কাহাকেও ব্যবধান বা মধ্যবর্ত্তিরূপে স্থাপন করা ব্রাহ্মধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরোধী। ইহার মতে গুরূপদেশের যদি কিছু উদ্দেশ্য থাকে তবে তাহা জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে পূর্ব্বোক্তরূপ প্রত্যক্ষ সম্বন্ধস্থাপন ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। যে উপদেষ্টা আপনাকে অন্তরালে রাখিয়া অপরকে এই প্রত্যক্ষ স্বর্গীয় যোগের পন্থা দেখাইয়া দেন, তিনিই মানব সমাজের যথার্থ উপকারী বন্ধু। আর যিনি ঈশ্বর ও মনুষ্যের মধ্যে আপনাকে ব্যবধানরূপে স্থাপিত করিতে চেষ্টা করেন, তিনি মানবাত্মার পরম শত্রু। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন, প্রত্যেক মনুষ্যেরই ঈশ্বরের নিকট যাইবার, তাঁহাকে প্রাণের মধ্যে দেখিবার, তাঁহাকে পিতা বলিয়া ডাকিবার অধিকার আছে;—কেবল যে অধিকার আছে তাহা নহে—প্রত্যেক মনুষ্যকে ইহা করিতেই হইবে, নতুবা পরিত্রাণ নাই। পরমেশ্বরকে হৃদয়ে দর্শন, প্রাণের মধ্যে তাঁহার মৃতসঞ্জীবনী বাণী শ্রবণ, তাঁহার সহিত আধ্যাত্মিক সংস্পর্শ সকল মনুষ্যের পক্ষেই সম্ভব, এবং ইহা ভিন্ন পরিত্রাণের অন্য উপায় নাই।

আমরা কিন্তু এমনই নির্ব্বোধ যে, এরূপ মহোচ্চ সত্য লাভ করিয়াও নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া আছি! এমন জীবন্ত ধর্ম্মের আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াও আমরা অসাড় ও মৃতবৎ পড়িয়া রহিয়াছি। আমরা যদি সজীব ধর্ম্ম সাধন করিতাম, পরমেশ্বরের সহিত প্রত্যক্ষ যোগ স্থাপন করিতে চেষ্টা করিতাম, তাহা হইলে আজি আমাদের জীবনের গতি অন্যরূপ হইত। বাস্তবিক দেখিতে গেলে আমরা অনেকেই ব্রাহ্মনামের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। যিনি প্রাণের মধ্যে সেই প্রাণেশ্বরের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই, তাঁহার সহিত প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারেন নাই, তাঁহার আবার ব্রাহ্মনামে অধিকার কি? আমি যদি আমার ইষ্টদেবতার দর্শনই না পাইলাম, তাঁহাকে যদি আমার ঈশ্বর বলিয়া বিশেষ ভাবে ধরিতে না পারিলাম, তবে আর আমার কিসের ধর্ম্ম? ধর্ম্ম যদি পোষাকি জিনিস হয়, ধর্ম্ম যদি জীবনের প্রত্যেক কার্য্যকে নিয়মিত না করে, ধর্ম্ম যদি প্রাণের অন্তস্তল পর্য্যন্ত আলোড়িত না করে, তবে তাহাকে অন্য যে নাম দিতে হয় দিও, কিন্তু ধর্ম্মনামে অভিহিত করিও না।

বিধান তত্ত্ব।*

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

এখন দেখা যাক্ এই সকল মহজ্জীবনরূপ বিধান যে জগতে আসে, তাহা কিরূপ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এবং এই সকল বিধান সম্বন্ধে আমাদের কর্ত্তব্য কি? বিধানের দুই উদ্দেশ্য, (১) নূতন সত্যের প্রকাশ, (২) নবজীবন-সঞ্চার। নূতন সত্যের অর্থ এস্থলে কেবল সেই সত্য নহে যাহা পূর্ব্বে কেহ

* সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা মন্দিরে প্রদত্ত উপদেশের ভাব।

কোথাও কখনও জানে নাই, শুনে নাই। নূতন সত্য বলিতে সেই সত্য বুঝায়, যে সত্য দেশের মধ্যে পাঁচ জন লোক জানে কিন্তু পাঁচ সহস্র বা পাঁচ লক্ষ লোক জানে না। নূতন সত্য বলিতে সেই সত্য বুঝায়, যে সত্য লোকে জানিয়াও ভুলিয়া যায়, পাইয়াও হারাইয়া ফেলে। এবং নূতন সত্য বলিতে সেই সত্য বুঝায়, যে সত্য মানুষের অন্তঃপ্রকৃতিতে নিহিত থাকে, লুক্কায়িত থাকে, কিন্তু বিশ্বাসীর জীবন্ত বাণী শুনিলেই নিতান্ত আত্মীয়ও নিকটস্থ সুহৃদ্ বলিয়া আত্ম-পরিচয় দেয়,—যে সত্য হৃদয়কন্দরে নিদ্রিত থাকে, কেবল বিশ্বাসীর ঢক্কাধ্বনিতুল্য গম্ভীর স্বর শুনিলেই জাগ্রত হয়। মহাত্মগণ এই সকল অতি প্রাচীন অথচ নূতন সত্য প্রকাশিত করেন, কেবল অন্ধভাবে বিশ্বাস করান না—প্রজ্ঞাচক্ষু, বিবেকচক্ষু খুলিয়া দেখাইয়া দেন এবং তাঁহাদের স্বর্গীয় তেজঃপূর্ণ জীবনদ্বারা মানবহৃদয়ে এই সকল সত্যপালনোপযোগী বলের সঞ্চার করিয়া দেন। "সংসারের সুখ অসার, এক নিত্য সত্য বস্তুই শান্তির অক্ষয় আধার" এই সত্য ভারত পূর্ব্বেও শুনিয়াছিল। কিন্তু যখন কিশোরবয়স্ক রাজপুত্র শাক্যসিংহ রাজসিংহাসন, রাজবিলাস, রাজবৈভবকে অসার জ্ঞান করিয়া বনগামী হইলেন, ও বহুবর্ষব্যাপী কঠোর তপস্যা ও গভীর ধ্যানদ্বারা সেই নিত্য ধন অন্বেষণ ও লাভ করিলেন, তখন সেই প্রাচীন সত্য নবভাবে, নব আলোকে, নব বলের সহিত মানবের সমক্ষে উপস্থিত হইল। শত্রুকে ক্ষমা করা উচিত, ইহা জগৎ বহুদিন পূর্ব্বে শুনিয়াছিল, প্রাচীন ইহুদীর নিকটেও ইহা নিতান্ত অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু যখন সেই ক্ষমার অবতার ঈশা ক্রুশ কাষ্ঠে আরোহণ করিয়া বিষম যন্ত্রণা নিপীড়িত শরীরে নৃশংস ঘাতকদের জন্য প্রার্থনা করিলেন, "পিতঃ! ইহাদিগকে ক্ষমা কর। কারণ ইহারা কি করিতেছে তাহা জানে না," তখন জগতের লোক মানবজীবনে ঐশ্বরিক ক্ষমাগুণের আশ্চর্য্য প্রকাশ দেখিয়া অবাক্ হইল, নীরবে অশ্রুপাত করিল। মানুষ যে ঈশ্বরের পুত্র তাহা ত জগৎ জানিত। কিন্তু ঈশ্বরপুত্র বলিলে কি বুঝায়, তাহা স্পষ্টরূপে বুঝাইলেন তিনি, যিনি জীবনব্যাপী ঈশ্বরসেবার পর পুরস্কারস্বরূপ ভীষণ অপঘাত মৃত্যু সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া বলিলেন,—"পিতঃ, যদি সম্ভব হয়, তবে এই বিষপাত্র অপসারিত কর, কিন্তু তথাপি আমার ইচ্ছা নয়, তোমার ইচ্ছা সম্পন্ন হউক।" ঈশ্বরকে সাধ্বীসতীর ন্যায় প্রাণপতিরূপে ভালবাসিতে হইবে, তাঁহার বিরহ আত্মার অসহ্য হইবে, ইহা আমরা অনেকেই জানি, কিন্তু আধ্যাত্মিক সতীত্ব কাহাকে বলে, ঈশ্বরের বিরহ যন্ত্রণা কিরূপ, ইহা কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারি তখনই, যখন চৈতন্যের জীবনরূপ উচ্ছ্বসিত তরঙ্গপূর্ণপ্রেম পারাবারের দিকে তাকাই। জ্ঞানীর উজ্জ্বল প্রজ্ঞাতে, যোগীর গভীর যোগে ঈশ্বরের সত্যভাবের যেরূপ উজ্জ্বল প্রকাশ, সেরূপ উজ্জ্বল প্রকাশ আর কোথায় দেখিব? বিশ্বপ্রেমিক, বিশ্বপ্রেমিকার উদার প্রেমে, মানবের দুঃখনিবারণের জন্য দুঃসহকষ্ট-সহিষ্ণুতাতে ঈশ্বরের প্রেমব্যস্ততার, ঈশ্বরের মাতৃভাবের যেরূপ উজ্জ্বল প্রকাশ, সেরূপ উজ্জ্বল প্রকাশ আর কোথায় দেখিব? ভক্তের উচ্ছ্বসিত সুমধুর প্রেমে ঈশ্বরপ্রেমের মধুরতার যেরূপ উজ্জ্বল প্রকাশ, সেরূপ উজ্জ্বল প্রকাশ আর কোথায় দেখিব? আর ধর্ম্মের জন্য নিপীড়িত, জ্বলন্ত অগ্নিতে, গভীর সাগরজলে, ভীষণ শ্বাপদ মুখে নিক্ষিপ্ত, অস্থিপেষী, ভীষণ-যন্ত্রণা-পীড়িত ধর্ম্মবীরের জীবন্ত পবিত্রতার ন্যায় ঈশ্বরের অনন্ত পবিত্রতার উজ্জ্বলতর প্রতিরূপ আর কোথায় দেখিব? এইরূপে দেখিতে পাই, সাধু ভক্ত মহাত্মাদিগের জীবনে ঈশ্বরের প্রকাশ কি উজ্জ্বল!

এই সমুদায় জীবন্ত বিধান সম্বন্ধে আমাদের কি কর্ত্তব্য? কর্ত্তব্য আমরা অল্পাধিক পরিমাণে সকলই বুঝিতে পারিতেছি। কিন্তু এই কর্ত্তব্য পালনে আমরা নিতান্ত বিমুখ। আমরা অনেকেই সেই সঙ্কীর্ণ নিষ্ক্রিয় ঈশ্বরবাদ মতে ছাড়িয়াছি; অনেক কাল হইল ঈশ্বরের জীবন্ত বিধানকে মতরূপে গ্রহণ করিয়াছি; কিন্তু বিধানবাদ কেবল মত মাত্র নহে, ইহা গভীর ঐকান্তিক সাধনের বিষয়। কিন্তু এই মহাসত্যের সাধনে আমাদের ভয়ানক শিথিলতা রহিয়াছে। এরূপ শিথিলতার ফল জীবন্ত বিশ্বাসের অভাব, ভক্তির অভাব, উৎসাহের অভাব, অহঙ্কার কৃতঘ্নতা, সাধুভক্তির অভাব ইত্যাদি। বিস্তীর্ণ ও বিচিত্র বিধান রাজ্য হইতে দূরে থাকিয়া নিজের সঙ্কীর্ণ হৃদয়কুটীরে আবদ্ধ থাকিলে এরূপ আধ্যাত্মিক দুর্দ্দশা উপস্থিত হওয়া কিছুই বিস্ময়কর নহে। এরূপ শিথিলতার বিশেষ কারণ বোধ হয় এই যে, ঈশ্বর-প্রেরিত বিধান সমূহের সহিত আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আমরা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারি না। এই সকল বিধান সাধারণ ভাবে জগতের মঙ্গলের জন্য আসিয়াছিল, এখনকার বিধান সমূহও সাধারণ ভাবে জগতের মঙ্গলের জন্য আসিয়াছে, আমরা অনেকেই এই মাত্র বিশ্বাস করি। কিন্তু বাস্তবিক পূর্ণ সত্য এই যে, জগতে যত বিধান আসিয়াছে ও আসিতেছে, অন্ততঃ যত গুলি আমাকে জানিতে দেওয়া হইয়াছে, তৎসমস্তই আমার জীবনের সহিত ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত; আমার জীবনের উপর সেই সমস্ত গুলিরই বিশেষ দাবি আছে। আমি যাহা কিছু শুনি, যাহা কিছু জানি—সমস্তই আমার উপর ঈশ্বরের সাক্ষাৎ কার্য্য। আমার সমস্ত জ্ঞানই ঈশ্বরপ্রেরিত জ্ঞান—ঈশ্বরানুপ্রাণনের ফল। এই যে ঈশ্বর আমার আত্মাতে জ্ঞান প্রেরণ করেন, এই জ্ঞানপ্রেরণের উদ্দেশ্য কেবল এই যে, আমি এই জ্ঞান কার্য্যে পরিণত করিব, আত্মাতে প্রকাশিত এই সকল পরমতত্ত্ব ঐকান্তিক যত্নের সহিত সাধন করিব। যে মুহূর্ত্তে শুনিলাম বিশ্বাসাবতার ঈশা ক্রুশে প্রাণ দিয়াছেন, আর এই প্রাণদানের উদ্দেশ্য মানব জীবনে সত্যের জয় ঘোষণা, মানবের মুক্তি, সেই মুহূর্ত্তে বুঝিলাম, বা বুঝা উচিত যে, ঈশা অন্য আর যাঁর জন্যই প্রাণ দিয়া থাকুন, আমার জন্য প্রাণ দিয়াছেন ইহা নিশ্চয়ই; এই অদ্ভুত লীলা আমার মুক্তির উদ্দেশে রচিত ইহাতে সন্দেহ নাই, ইহা আমার মুক্তিপথের সহায়রূপে আমাকে গ্রহণ করিতে হইবে। এই পরমতত্ত্ব আমার শুনিবার আর কোন প্রয়োজন থাকিতে পারে না। তাঁহার উচ্চারিত মহান্ সত্য সমূহ যে মুহূর্ত্তে আমার কর্ণে প্রবেশ করিল, সেই মুহূর্ত্ত হইতে তাহারা আমার জীবনের উপর এক ভয়ানক দাবি বসাইল। যে পর্য্যন্ত আমি সেই

সকল সত্যে সিদ্ধ না হই, সে সকল সত্য জীবনে পরিণত না করি, সে পর্য্যন্ত ঈশ্বরের নিকট আমার নিষ্কৃতি নাই। যতদিন পর্য্যন্ত নিম্নতর বিধি প্রচলিত থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত সেই বিধি অনুসারে চলিলেই যথেষ্ট। কিন্তু উচ্চতর বিধি প্রচলিত হইলেই, নিম্নতর বিধি অনুসারে চলা আর যথেষ্ট নহে। বুদ্ধদেব ও ঈশা প্রচারিত ধর্ম্মজীবনের উচ্চতর আদর্শ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে, মানুষ যে ভাবে জীবন কাটাইলে বিবেকের নিকট অব্যাহতি পাইত, এই সকল উচ্চতর আদর্শ প্রচারের পর কখনও আর সেরূপে চলিলে অব্যাহতি পাইতে পারে না। উচ্চতর বিধানের আগমনে জীবনের দায়িত্ব গুরুতর হইয়া উঠে। এই রূপে দেখি, প্রত্যেক বিধানের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের অতি নিকট সম্বন্ধ। জ্ঞানিগণের সঞ্চিত তত্ত্বজ্ঞান আমারই জন্য, ভক্তগণের সাধিত,প্রচারিত ভক্তিরাশি আমারই জন্য, জনহিতৈষী মহাত্মাদিগের গভীর মানবপ্রেম আমারই জন্য, পবিত্রাত্মাদিগের সঞ্চিত পবিত্রতাজল আমারই পরিত্রাণের জন্য, ধর্ম্মবীরদিগের প্রকাশিত ধর্ম্মবল আমারই বলসঞ্চারের জন্য। উপনিষদের গভীর তত্ত্বজ্ঞান, পাশ্চাত্য জ্ঞানীদিগের উজ্জ্বল ব্রহ্মবিদ্যা, খ্রীষ্টীয় বিধানের গভীর নির্ভর ও ঐকান্তিক সেবার ভাব, মহম্মদের জীবন্ত বিশ্বাস ও উৎসাহ, বৌদ্ধ বিধানের উদার প্রেম ও নির্ম্মল বৈরাগ্য, বৈষ্ণবগণের মধুর ভক্তি, বর্ত্তমান জীবন্ত ব্রাহ্মধর্ম্ম বিধান, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও গভীর যোগ, মহাত্মা কেশবচন্দ্রের উদার মত ও উচ্চ সাধনের আদর্শ, পার্শ্ববর্ত্তী ভ্রাতাভগ্নীদিগের বিবিধ গুণাবলী এই সমস্তই আমার জন্য। চারিদিক্ হইতে অসংখ্য বিধান আমাকে আহ্বান করিতেছেন। যে বিধানের দিকে তাকাই, সে বিধানই বলেন—আমাতে মনোনিবেশ কর, আমার তত্ত্ব অবগত হও, উজ্জ্বল প্রজ্ঞা, নির্ম্মল বিবেকের সাহায্যে আমাকে পরীক্ষা কর, আমাকে সাধন কর, আমাকে জীবনে আয়ত্ত কর। বিধান সমূহ বিধানপতির মূর্ত্তিমতি করুণা; বিধানের আহ্বান আর কিছুই নয়, তাঁহার করুণার আহ্বান, তাঁহারই আহ্বান। বিধান অগ্রাহ্য করা, বিধানতত্ত্ব আলোচনা না করা, বিধান জীবনে সাধন না করা, আর চিরব্যস্ত, হৃদয় দ্বারে দণ্ডায়মান, করুণাময়ী মায়ের আহ্বানকে অগ্রাহ্য করা একই কথা।

সুতরাং বিধান সম্বন্ধে আমাদের কি কর্ত্তব্য তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে। প্রথমতঃ, অহংকার পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা শিষ্যভাবাপন্ন হইয়া গভীর রূপে বিধানতত্ত্ব আলোচনা করিতে হইবে। আমি ধর্ম্ম জগতে নিতান্ত শিশু, আমাকে এখনও অনেক জানিতে হইবে, এখনও অসংখ্য তত্ত্ব কথা শিক্ষা করিতে হইবে, মনে এই পরিষ্কার ধারণা লইয়া চিরদিনের জন্য ব্রহ্মের আধ্যাত্মিক বিদ্যালয়ে নাম লিখাইতে হইবে। যে সমস্ত বিধানের তরঙ্গ অনেক দিন হইতে শরীরে লাগিতেছে, যে সমস্ত বিধানের স্রোত চারিদিকে প্রবাহিত হইতেছে,গভীর অধ্যয়ন ও চিন্তাযোগে সেই সমুদায়ের মধ্যে নিমগ্ন হইতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, এই আলোচনা-লব্ধ মহৎ সত্য সমূহ ঐকান্তিক যত্নের সহিত সাধন করিতে হইবে, জীবনে আয়ত্ত করিতে হইবে। এই মহৎ ব্রত সম্মুখে দেখিয়া কি আর নিশ্চিন্ত থাকা যায়? অলস থাকা যায়? আর কি বৃথা গল্প করিবার সময় আছে? আর কি বাহিরের অসার কোলাহলে ব্যস্ত থাকিবার সময় আছে? এস, সব ছাড়িয়া সাধনে মন দিই, জীবন কৃতার্থ হউক।

ব্রহ্মপরায়ণতা।

অনেক সময় এই চিন্তা আসিয়া মনকে আন্দোলিত করে যে, আমরা এত সাধন ভজন করিতেছি তবু কেন আশানুরূপ ফল পাইতেছি না? প্রাণের মর্ম্মস্থান হইতে দেবতা উত্তর দেন, "বৎস, সাধ্যমত কি সাধন ভজন করিতেছ?" মনকে তখন কঠিন আত্মপরীক্ষার মধ্যে ফেলিলে দেখিতে পাইবে যে, দেবতার কথা সত্য, আমাদের কথা মিথ্যা। আমরা সাধ্যমত সাধন ভজন করি না। সাধন ভজন দূরে থাকুক আমাদের প্রাণে আজিও যথেষ্ট ব্যাকুলতা দেখিতে পাই না।

ব্রহ্মকৃপাবাদী কতকগুলি লোক আছেন, তাঁহারা জীবের দুর্ব্বলতা প্রমাণ করিতে গিয়া জীব চেষ্টার স্ফূরণের আবশ্যকতা পর্য্যন্ত অস্বীকার করিয়া ফেলেন। তাঁহাদের মতে জীব এক প্রকার জড় বিশেষ, ব্রহ্মকৃপাবলে কেবল কার্য্যের স্ফূর্ত্তি হয়। ব্রহ্ম যে জীবের প্রাণ, ও ব্রহ্মসহায়তা ভিন্ন জীব যে ব্রহ্মের নিকটে পর্য্যন্ত আসিতে পারে না, এক দিকে এ কথাও যেমন ঠিক্, অপরদিকে ইহাও অলন্ত সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে যে, যেখানে জীবের চেষ্টার সমাপ্তি সেইখানেই ব্রহ্মকৃপার আরম্ভ। নদীস্রোত কি কাহারও স্নানের জন্য তাহার বাড়ীতে জল আনিয়া দেয়? না, স্নানার্থীকে চেষ্টা করিয়া নদীতে যাইতে হয় ও তথায় গিয়া আপন শরীরকে নদীজলে অবগাহন করাইতে হয়? অনন্তকালস্থায়িত্ব ঈশ্বরের একটী গুণ; তাঁহার প্রকৃতি চপলার মত চঞ্চল নহে,—অখণ্ডনীয় ও স্থির। তাঁহার ইচ্ছা অপরিবর্ত্তনীয় ও অবিকৃত। তাঁহার চরণনিঃসৃত করুণা-নদী অবিশ্রান্ত প্রবাহিত হইতেছে। সূর্য্য, চন্দ্র যেমন কাহারও কথা মানে না, শিশির বর্ষা যেমন কাহারও অনুরোধ শুনে না, তাঁহার করুণাও তেমনি কাহারও কথায় থামে না, কাহারও অনুরোধে বহে না, আপন মনে অনন্তকালকে স্নিগ্ধ ও শীতল করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। জীব যতক্ষণ না সেই প্রবাহের মধ্যে আপনাকে ফেলিতে পারে, ততক্ষণ সে স্রোতের বীচিভঙ্গাঘাত সম্ভোগ করিতে পারে না। জীবের চেষ্টা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে স্ফূর্ত্তি পাইলেই ব্রহ্মকৃপার বিকাশ পাইতে থাকে। অথচ এ কথাও সত্য যে, ব্রহ্মবল ভিন্ন জীব একটী পদও অগ্রসর হইতে পারে না। আত্মা ও পরমাত্মার সংযোগ ঠিক্ কোন্ স্থলে—ব্রহ্ম শক্তির কার্য্যকারিত্বের আরম্ভ কোথায় ও আত্মশক্তির স্ফূরণের শেষ কোন্ স্থানে—ইহা নির্ণয় করা সহজ নহে।

এখন যেন মানিলাম, তুমি চেষ্টা করিয়া আপনাকে ব্রহ্ম কৃপাবর্ত্তে ফেলিলে, তাহা হইলেই কি যথেষ্ট হইল? ব্রহ্মকৃপা

স্রোত হইতে কি তুমি আপনাকে তুলিয়া সংসারে ফিরাইয়া আনিতে পার না? সময়ে সময়ে শুভ মুহূর্ত্তে তোমার জীবন না হয় ধরণীতে স্বর্গধাম হইল, কিন্তু সময়ে সময়ে দুর্দ্দিনে তোমার জীবন যে নরক হইবে না, তাহা কে বলিল? সাময়িক যোগে তাই জীব অধিক দিন তৃপ্ত থাকিতে পারে না। স্থায়ী যোগের লালসা শীঘ্রই প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। নিষ্ঠা ও স্থিতিশীলতার ধর্ম্মজগতে তাই এত সম্মান। কি হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র, কি মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্র, কি খ্রীষ্ট ধর্ম্মশাস্ত্র সকল শাস্ত্রই এক বাক্যে নিষ্ঠার মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া থাকে, ঈশ্বরসন্তান হইয়া অনন্ত উন্নতিশীল আত্মা লইয়া তুমি কি পিতার অনন্তকালস্থায়িত্বের অনুকরণ করিতে শিখিবে না—তাঁহার সঙ্গে কেবল ক্রীড়া করিবে? এই স্থায়িযোগেচ্ছা ক্রমশঃ নিত্য দর্শন, নিত্য সম্ভোগ ও নিত্য সহবাস স্পৃহায় পরিণত হয়। মন শেষে এমন অবস্থায় উপনীত হয় যে, আহূত হইবামাত্র প্রাণের দেবতা প্রাণে প্রকাশিত হন, শুনিয়াছি মহর্ষি নারদ ঈশ্বরকৃপায় এই অবস্থায় উপনীত হইয়াছিলেন।

স্থায়িযোগস্পৃহার উপরে ব্রহ্মপরায়ণতার অবস্থান। এখানে আর মন এদিক্ ওদিক্ যাইতে পারে না, একেবারে ব্রহ্মের অধীন হইয়া পড়ে। লোকলজ্জা লোকভয়ের অধিকার লুপ্ত হয়। সাধকের মনোভৃঙ্গ বিভু পাদপদ্ম হইতে দূরে যাইতে পারে না; কাছে কাছে ঘুরিতে থাকে। স্থায়িযোগস্পৃহার অবস্থায় বরং একদিন পতনের সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু ব্রহ্মপরায়ণতার অবস্থায় পতনের দ্বার একেবারে রুদ্ধ হইয়া যায়। যে ব্রহ্মপরায়ণ হইয়াছে, সে অন্যদিকে চাহিবে কেন? যাহার মন বসে নাই সেই এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া থাকে। ব্রহ্মপরায়ণের দৃষ্টি ব্রহ্মে সুদৃঢ়রূপে সংলগ্ন, সে ব্রহ্ম হইতে চক্ষু ফিরাইতে পারে না। তাই গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,

মষ্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্তস্থা মতাঃ॥

সংসারের লোক জানে, যে যাহার পরায়ণ হয়, সে তাহাতে মগ্ন হইয়া থাকে, ব্রহ্মপরায়ণ তাই সংসারের কাছে সুপরিচিত। সংসার তাহাকে বিশ্বাস করে, তাহার কথায় সংসারের অশ্রদ্ধা হয় না। অল্পবিশ্বাসী ও তরল ধার্ম্মিকই লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারে না। ব্রহ্মপরায়ণ ব্রহ্ম ও সংসার দুইদিক রাখিতে চেষ্টা করেন না। অথচ তিনি যেমন দুইদিক্ রক্ষা করেন এমন সংসারী লোকে পারে না। সংসারে বাস করিয়াও তিনি সংসারের অতীত স্থান অধিকার করেন।

ব্রহ্ম লাভ করিতে যদি ইচ্ছা থাকে, তবে আমাদিগকে ব্রহ্মপরায়ণ হইতে হইবে। ব্রহ্ম অতি দুর্লভ পদার্থ। সংসারের প্রতি ষোল আনা টান বজায় রাখিয়া ব্রহ্মধন লাভ করিবার আশা দুরাশা মাত্র। প্রাণ যতদিন না ব্রহ্মপ্রবণ হইতেছে, ততদিন জীবনে বিশেষ উন্নতি দেখিতে পাইব না। একটু প্রতিকূল অবস্থায়, একটু শারীরিক অসুস্থতায় যে ধর্ম্মজীবন চঞ্চল হয়, সে ধর্ম্মজীবন লইয়া আমরা ব্রহ্মলাভ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি বলিয়া আমাদের পদে পদে এত দুর্দ্দশা। আমরা তাই না হইলাম সংসারপরায়ণ, না হইলাম ঈশ্বরপরায়ণ। আত্মপরায়ণ হইয়া আপনারাই আপনাদের গম্য পথের প্রতিবন্ধক রচনা করিতেছি। সমগ্র প্রাণটী আপনার হাতে রাখিব, মধ্যে মধ্যে ইচ্ছামত সংসারের সুখভোগ করিব, আর সময়ে সময়ে ব্রহ্মরূপসাগরে নিমগ্ন হইবার চেষ্টা করিব, এ প্রবঞ্চনা ভগবানের কাছে খাটিবে কেন? আক্ষেপের বিষয় এই যে, সংসারের প্রকৃতি ও ব্রহ্মের স্বরূপ ভালরূপে জানিয়াও ব্রহ্ম-করে প্রাণ সমর্পণ করিতে আজিও ইতস্ততঃ করিতেছি।

ধর্ম্ম প্রচার।

মানুষ যখন কোন সত্য লাভ করে তখন তাহা অপরের নিকট প্রচার করিবার জন্য তাহার মন স্বভাবতঃই ব্যগ্র হইয়া উঠে। সত্যের এমন এক শক্তি আছে যে, তাহার অধিকারী একাকী তাহা ভোগ করিয়া কখনই সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না। যতক্ষণ না অন্যে তাহা জানিতে পারে, ততক্ষণ স্থির হইয়া থাকা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। যিনি অন্ধকার অতিক্রম করিয়া আলোকের রাজ্যে আসিয়াছেন, অপরকে সেই আলোকে আনয়ন করিতে চেষ্টা করা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। কেবল আধ্যাত্মিক সত্য সম্বন্ধেই যে এই কথা খাটে তাহা নহে; কি বৈজ্ঞানিক, কি ঐতিহাসিক, কি দার্শনিক সকল প্রকার সত্যেরই এই বিশেষ শক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। আধ্যাত্মিক সত্যের জন্য যেমন লোকে অনায়াসে প্রাণ দিতে পারে, অন্য প্রকার সত্যের জন্যও সেইরূপ অনায়াসে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত হয় না। কারণ, সকল সত্যই ঈশ্বরের সত্য; সকল সত্যের মধ্যেই ঈশ্বরের শক্তি নিহিত আছে। এই জন্যই সত্যের অধিকারিগণ অপরের নিকট আপনাদের উপার্জ্জিত সত্যধন বিতরণের নিমিত্ত এত কষ্ট স্বীকার করিয়া থাকেন।

কিন্তু এই সত্য স্বোপার্জ্জিত হওয়া চাই, হৃদয়ে উজ্জ্বলভাবে উপলব্ধি করা চাই, ঈশ্বরের নিকট হইতে প্রত্যক্ষভাবে লাভ করা চাই। আমরা অপরের উপদেশ শুনিয়া বা পাঠ করিয়া যে সকল সত্য শিক্ষা করি, যতদিন না সাধনদ্বারা তাহা নিজস্ব করিয়া লইতে পারি, যতদিন না সেই সকল সত্য আমাদের হৃদয় সম্পূর্ণরূপে অধিকার করে, ততদিন আমাদের পক্ষে উহা মৃত ও শক্তিহীন। যে সত্য আমি ঈশ্বরের আলোকে প্রত্যক্ষ ভাবে উপলব্ধি করিতে পারি নাই, যে সত্যে আমার জলন্ত বিশ্বাস নাই, আমার জীবনের উপর সে সত্যের কোন প্রভাব থাকিতে পারে না; সে সত্য আমার জীবনকে পরিচালিত করিতে পারে না; সে সত্য আমাকে পরীক্ষা প্রলোভনের সময় রক্ষা করিতে পারে না; সে সত্য আমাকে পরিত্রাণের পথে লইয়া যাইতে পারে না। আমি ক্ষণিক উৎসাহ অথবা অন্য কোন ভাবদ্বারা পরিচালিত হইয়া তাহার প্রচারে প্রবৃত্ত হইতে পারি বটে, কিন্তু সে প্রচারে কোন ফল নাই; তাহাতে আমাকে ও অপরকে পরিত্রাণের পথে লইয়া যাইতে পারে না। যাহার নিজের হৃদয়ে উত্তাপ নাই, সে অপরের হৃদয়ে উত্তাপ সঞ্চার করিবে কিরূপে? যে নিজে মূর্খ সে কি

কখনও অপরের মূর্খতা দূর করিতে পারে? অন্ধের পক্ষে অপর অন্ধকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাওয়া অসম্ভব। যাহার নিজের দাঁড়াইবার স্থান নাই, সে কেমন করিয়া অপরকে আশ্রয় দিবে? সত্য প্রচার করিতে হইলে প্রাণের মধ্যে সত্যের অগ্নি প্রজ্বলিত হওয়া আবশ্যক। ইহাই সত্যপ্রচারের, ধর্ম্মপ্রচারের মূলমন্ত্র। যিনি ঈশ্বরের নিকট হইতে প্রত্যক্ষভাবে সত্য লাভ করেন নাই, যিনি সেই পরম প্রভুর স্পষ্ট আহ্বান হৃদয়ে শ্রবণ করেন নাই, তাঁহার প্রচার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার, ধর্ম্মপ্রচারক নাম গ্রহণ করিবার কোনও অধিকার নাই। তাঁহার পক্ষে অন্য কার্য্যে ব্যাপৃত থাকাই ভাল। পূর্ব্বে এক প্রবন্ধে বলা হইয়াছে, প্রত্যক্ষ উপলব্ধ একটী সত্য অন্য সহস্র সত্য অপেক্ষা অধিক মূল্যবান। পরমেশ্বরের স্বহস্তনিয়োজিত একজন বিশ্বাসী ধর্ম্মপ্রচারক স্ববুদ্ধিপ্রণোদিত সহস্র প্রচারক অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। অগ্নির একটী স্ফুলিঙ্গ পর্ব্বত প্রমাণ ভস্মরাশি অপেক্ষা অধিক কার্য্যকারী।

ধর্ম্মপ্রচারের আর একটী প্রধান অঙ্গ ভালবাসা। ঈশ্বরের প্রতি ও নর নারীর প্রতি যাঁহার প্রকৃত ভালবাসা নাই, তিনি প্রচারব্রতে ব্রতী হইবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। জগতের নর নারী পরমেশ্বরকে বিস্মৃত হইয়া সাংসারিকতা ও পাপের কূপে মগ্ন হইয়া রহিয়াছে, ইহা দেখিয়া যাঁহার প্রাণ কাঁদে না, ইহা দেখিয়া যিনি মর্ম্মাহত হন না, তাঁহার পক্ষে ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। তিনি কখনই পাপীর দুঃখে সহানুভূতি করিতে সমর্থ হন না; তিনি কখনই অন্যের হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারেন না। প্রেম বিনা ধর্ম্মপ্রচার অসম্ভব। বুদ্ধ, ঈশা ও চৈতন্য প্রেমের বলেই অসংখ্য নর নারীর হৃদয় আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ধর্ম্ম প্রচারকের আর একটী বিষয়ের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। বিনয় তাঁহার জীবনের একটী প্রধান লক্ষণ হওয়া উচিত। অহঙ্কারী ধর্ম্মপ্রচারকের ন্যায় কুৎসিত দৃশ্য জগতে অতি বিরল। কিন্তু ধর্ম্মপ্রচারক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে পদে পদে অহঙ্কাররূপ ভয়ানক শত্রুর হস্তে পতিত হইবার সম্ভাবনা। উপদেষ্টার স্থান অধিকার করিয়া আত্মাকে নিরহঙ্কার রাখা নিতান্ত সহজ কথা নহে। প্রকৃত পক্ষে প্রচারক নরনারীর সেবক ভিন্ন আর কিছুই নহেন। কিন্তু মানুষের দুর্ব্বলতা এমনই যে, অনেকে সেবা করিতে গিয়া প্রভু হইয়া বসেন; আপনাদিগকে অপরের গুরু ও উপদেষ্টা মনে করিয়া, উচ্চ ধর্ম্মভাববিশিষ্ট মনে করিয়া অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া উঠেন। আমরা কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া একথা বলিতেছি না। এ ত্রুটি কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষে বদ্ধ নহে। অনেকস্থলেই ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষ অনেক সময় বিনয়ী হইতে গিয়া অহঙ্কারের কূপে পতিত হয়। কিন্তু ধর্ম্মপ্রচারক মাত্রেরই ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, অহঙ্কার ধর্ম্মপ্রচারের একটী প্রধান শত্রু। বিনয় ভিন্ন, দীনতা ভিন্ন কেহ স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না এবং অপরকেও স্বর্গরাজ্যের পথ দেখাইয়া দিতে পারে না। ধর্ম্মপ্রচার বড় কঠিন ব্রত। ধর্ম্মপ্রচারের আভ্যন্তরীণ বিঘ্ন অনেক। ধর্ম্মসমাজে প্রথম প্রবেশকালে অনেকে নবীন উৎসাহের বশবর্ত্তী হইয়া প্রচারক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে উৎসুক হন। তাঁহাদের এই সাধু ইচ্ছা, এই উৎসাহ প্রশংসনীয়; কারণ, তাঁহাদের এই ইচ্ছার মধ্যে, এই উৎসাহের মধ্যে, কোনপ্রকার কপটতা নাই; তাঁহারা বাস্তবিকই সরলভাবে প্রচারকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে আমরা পূর্ব্বোক্ত কয়েকটী বিষয়ের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে অনুরোধ করি। নতুবা তাঁহাদের কেবল পরিশ্রম করাই সার হইবে। সে পরিশ্রমে কি তাঁহাদের নিজের, কি অপরের, কাহারও পরিত্রাণের পথ উন্মুক্ত হইবে না।

প্রদেশীয় ব্রাহ্মসমাজ।

বাগেরহাট।

বাগেরহাট ব্রাহ্মসমাজের চতুর্থ সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে প্রায় অষ্টাহকাল উৎসব হয়। এই উপলক্ষে বরিশাল হইতে বাবু মনোরঞ্জন গুহ, বাবু চণ্ডীচরণ গুহ, বাবু রাজকুমার ঘোষ, কলিকাতা হইতে বাবু হরিমোহন ঘোষাল কীর্ত্তনানন্দ (এবার আমরা ইঁহাকে এই উপাধি প্রদান করিয়াছি), কুমারখালী নিবাসী বাবু সতীশচন্দ্র মজুমদার, খুলনিয়া হইতে বাবু শ্যামাচরণ ধর ও নলধা নিবাসী বাবু তারকনাথ রাহা মহাশয় আগমন করিয়াছিলেন। দয়াল পিতার করুণাগুণে ইঁহাদের আগমনে ও স্থানীয় বন্ধুদিগের আগ্রহ ও ব্যাকুলতাতে, এবার উৎসবে আমরা আশাতীত আনন্দ লাভ করিয়াছি। অভাব আমাদের বিস্তর। আমাদের কোন সম্বল নাই, আয়োজন নাই, তথাচ কৃপাময়ের কৃপা প্রভাবে সকলই সুসম্পন্ন হয়। আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু বাবু জগদীশ্বর গুপ্ত মহাশয় স্থানান্তরিত হওয়া অবধি আমরা আধ্যাত্মিক সাহায্য ও লোক-বল সম্বন্ধে অসহায় হওয়াতে অত্যন্ত বিষন্ন ছিলাম। অন্তর্যামী দেবতা আমাদের মনের ভয় ভাবনা বিদূরিত করিয়া তাঁহার অমৃত স্রোত বর্ষণ করিয়াছেন। উৎসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১৮ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার। সন্ধ্যার পর উৎসবের জন্য প্রার্থনা ও সংক্ষিপ্ত উপাসনা।

১৯এ জ্যৈষ্ঠ বুধবার। প্রাতে উপাসনা। উৎসবের উদ্বোধন এবং উৎসবের সাবধানতা সম্বন্ধে উপদেশ। বাবু মনোরঞ্জন গুহ মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। বৈকালে আলোচনা ও সঙ্কীর্ত্তন। সামাজিক উপাসনার আবশ্যকতা সম্বন্ধে আলোচনা হয়। তিন চারি জন বন্ধু মন খুলিয়া এই গুরুতর বিষয়ে অনেক কথা বলেন। আলোচনাতে যে সমুদায় সত্য নির্দ্ধারিত হয়, তাহা উপস্থিত সভ্য ও শ্রোতা মাত্রেরই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। সে সময়ে সমাজে অনেকগুলি লোক উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যার পর উপাসনা। বাবু মনোরঞ্জন গুহ বেদীর কার্য্য করেন। তিনি "ভাব-সাধন ও ধর্ম্ম-সাধন" সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন।

উপদেশে অনেকে উপকৃত হইয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মসমাজে এই প্রকার উপদেশ বিশেষ আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়।

২০এ জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার। প্রাতে উপাসনা। খুলনিয়া হইতে আগত বন্ধু বাবু শ্যামাচরণ ধর মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন। "বিনয়ী না হইলে, আপনাকে অতি ছোট না জানিলে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না" এই মর্ম্মে উপদেশ প্রদত্ত হয়। রাত্রিতে উপাসনা। অত্রত্য স্কুলের হেড মাষ্টার বাবু ইন্দুভূষণ রায়চৌধুরী মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার উপদেশের সার মর্ম্ম দিতে পারিলাম না।

২১এ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার। সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাবু চুনিলাল সাহা মহাশয়ের প্রবাস বাটীতে সঙ্কীর্ত্তন ও ফিকিরচাঁদের গান হয়। অনেকগুলি শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যার পর সমাজ গৃহে সংক্ষিপ্ত আলোচনা হয়। তাহার পর বাবু আনন্দচন্দ্র সেন উকীল মহাশয়ের প্রবাস বাটীতে উপাসনা হয়। "ধর্ম্মের জন্য সংসার ছাড়িতে হয় না, সংসারে থাকিয়াই ধর্ম্মলাভের সুবিধা হয়" এই বিষয়ে উপদেশ হয়। উপদেশ স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইয়াছিল। তাঁহারা এই উপদেশ হইতে অনেক সত্য লাভ করিতে পারেন। উপাসনা স্থানে যে সমুদায় লোক উপস্থিত ছিলেন, সকলেই অতি আগ্রহের সহিত সেই উপদেশ শ্রবণ করিয়াছিলেন।

২২এ জ্যৈষ্ঠ শনিবার। প্রাতে উপাসনা। বাবু চণ্ডীচরণ গুহ মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। "ব্রহ্মাচলে বাসা বাঁধিলে আর কোন প্রকার উপদ্রবের ভয় থাকে না।" এই মর্ম্মে উপদেশ প্রদত্ত হয়। উপাসক মাত্রেই সেই উপদেশে অনেক সার সত্য লাভ করিয়া উপকৃত হইয়াছিলেন।

রাত্রিতে আলোচনা হয়। আলোচনার বিষয় "উপাসনার আবশ্যকতা"।

২৩এ জ্যৈষ্ঠ রবিবার। বাগেরহাট হইতে প্রায় তিন ক্রোশ ব্যবধান মঘিয়া নামে একখানি গ্রামে প্রচারযাত্রা। প্রাতে বাবু দিগম্বর সাহা মহাশয়ের বাটীতে উপাসনা। বাবু মনোরঞ্জন গুহ মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন। "অভিমান পরিত্যাগ করিয়া দীন হইতে না পারিলে, জাতি, বিত্ত, প্রভৃতির অহঙ্কার থাকিলে, নাম সাধন হয় না" এই মর্ম্মে উপদেশ প্রদত্ত হয়। উপাসনাস্থলে অনেকগুলি লোক উপস্থিত ছিলেন। খুব উৎসাহের সহিত সংকীর্ত্তন হয়।

অপরাহ্ন দুইটার সময় সেই গ্রামের জমীদার বাটী হইতে (এ প্রদেশে ইঁহাদিগকে রাজা নামে অভিহিত করিয়া থাকে, ও ইঁহাদের বাটীকে রাজবাড়ী কহে) কয়েকটী নব্যযুবক ও অন্যান্য লোক কীর্ত্তনাদিসহ আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া লইতে আইসেন। অপরাহ্ন চারিটার পর আমরা রাজবাড়ীতে উপস্থিত হই। বাটীর বহিঃপ্রাঙ্গনে গ্রামস্থ গণ্য মান্য ভদ্রলোক, ও আপামর সাধারণ সকলকে লইয়া একটি সভা আহূত হয়। সভাতে অনেক লোক উপস্থিত ছিলেন। উৎসাহের সহিত সঙ্কীর্ত্তনের পর বাবু মনোরঞ্জন গুহ "ধর্ম্ম বিনা সুখ নাই" এই মর্ম্মে একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা শ্রবণে সভাস্থ সকলেই প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। পরে বাবু হরিমোহন ঘোষাল কীর্ত্তনানন্দ ও বাবু হরিনাথ দাস মহাশয়দ্বয় কিছু কিছু বলেন। তদনন্তর কীর্ত্তন হয়। তাহার পর উপস্থিত ভদ্রলোকদিগের সহিত সংক্ষেপে আলাপাদি করিয়া আমরা বিদায় গ্রহণ করি। এই সভাতে উক্ত গ্রামনিবাসী বাবু শরৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ও কোন কোন বিষয় সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমরা এই সভার উদ্যোগকর্ত্তাদিগকে, ও যাঁহারা সভাস্থ হইয়া আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। অবশেষে এই গ্রামনিবাসী বাবু গোবিন্দচন্দ্র দাস মহাশয়কে আমাদের বিশেষ ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। ইনি বাগেরহাট লোক্যাল বোর্ডের সভাপতি ও অত্রত্য ব্রাহ্মসমাজের একজন উৎসাহী সভ্য। আমরা ইঁহারই নিমন্ত্রণ পাইয়া এই গ্রামে গমন করি। ইনি যথোচিত সমাদরে বন্ধুদিগের অতিথিসৎকার করিয়াছেন ও যাহাতে প্রচারকার্য্যের সাহায্য হয় তজ্জন্য বিধিমতে চেষ্টা ও যত্ন করিয়াছেন।

২৪এ জ্যৈষ্ঠ সোমবার। সন্ধ্যার পর অত্রত্য "রিপণ হলে" বাবু মনোরঞ্জন গুহ মহাশয় "আত্মার আরোগ্য লাভ" বিষয়ে একটী দীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। সভাস্থলে অনেক লোক উপস্থিত ছিলেন। হল লোকে পূর্ণ হইয়াছিল। যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, সকলেই বক্তার প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকলেই মনোযোগের সহিত তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন।

২৫এ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার। নগর সংকীর্ত্তন। সমাজপ্রাঙ্গণে সকলে সমবেত হইলে সংক্ষিপ্ত প্রার্থনার পর বহির্গমন। স্থানীয় অনেকগুলি লোক সংকীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে গমন করেন। স্থানে স্থানে কীর্ত্তন বেশ জমাট হইয়াছিল। বাজারে দোকানদারদিগকে সম্বোধন করিয়া বাবু মনোরঞ্জন গুহ ও বাবু হরিমোহন ঘোষাল কীর্ত্তনানন্দ মহাশয় কিঞ্চিৎ উপদেশ প্রদান করেন। কীর্ত্তন করিতে করিতে বাবু যদুনাথ কাঞ্জিলাল উকীল মহাশয়ের প্রবাস বাটীতে যাওয়া হয়। তথায় প্রমত্তভাবে গান করা হয়। সেখান হইতে সকলে একত্র গান করিতে করিতে সমাজ গৃহের দিকে গমন করেন। তথায় সকলে দণ্ডায়মান হইয়া কীর্ত্তনান্তে, "এই উৎসব যাহাতে আমাদের জীবনের নিত্য উৎসব হয়" এই প্রার্থনা করা হয়। এবার সংকীর্ত্তনে যে ভাবের উচ্ছ্বাস হইয়াছিল তাহা স্বর্গীয়। দয়াল পিতা আমাদিগকে দীনহীন কাঙ্গাল দেখিয়া তাঁহার অনন্ত করুণাগুণে স্বর্গের প্রেমস্রোত খুলিয়া দিয়াছিলেন। ইচ্ছা হয় এই স্রোতে ভাসিয়া যাই। দয়াময় পরমেশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন।

প্রেরিত পত্র।

আসামে কার্য্যক্ষেত্রে।

মহাশয়—বহুদিন হইতে সাধ ছিল, একবার আসাম প্রদেশ পরিভ্রমণ করিব, এবার অংশতঃ সেই সাধ মিটাই-

য়াছি। আসামের মধ্যে আমি প্রধানতঃ ধুবড়ি, গৌহাটী, তেজপুর, নওগাঁ, শিবসাগর ও ডিব্রুগড়, এই কয়েকটী স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছি। এতদ্ভিন্ন কয়েকটী চা-বাগান ও কয়লার খনি প্রভৃতি দেখিয়াছি। আসামে আমি অতি অল্প দিনই ছিলাম, সুতরাং আসাম সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা অল্পই। কিন্তু তাহা হইলেও পূর্ব্বোক্ত স্থানগুলি দেখিয়া আসামের উপর ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তব্য বিষয়ে আমি যাহা ভাবিয়াছি ও বন্ধুদিগের সহিত আলোচনা করিয়াছি, তাহা সাধারণ ব্রাহ্মমণ্ডলীকে অবগত করিবার অভিপ্রায়েই অদ্য এই বিষয়টী লইয়া সমুপস্থিত হইতেছি। "আসাম প্রকৃতির কাম্য-কানন।" আসামের ব্রহ্ম-পুত্র, আসামের পর্ব্বত-রাজি ও আসামের অরণ্যসমূহ অতুল শোভার আধার। এই প্রকৃতির লীলাক্ষেত্রে নানাজাতীয় লোকের বাস। এই সমস্ত লোকদিগকে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়:—(১) আসামের সাধারণ অধিবাসী, (২) আসামের পার্ব্বত্য জাতিসমূহ, (৩) ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ হইতে সংগৃহীত কুলি। এইসকল লোকের ধর্ম্ম, নীতি, শিক্ষা ও সামাজিক অবস্থা কিরূপ, এবং ব্রাহ্মসমাজ এইসকল সম্বন্ধে কি কি করিতে পারেন, তাহা একবার আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

প্রথমতঃ—আসামের সাধারণ অধিবাসী। বাঙ্গালার ন্যায় এখানেও হিন্দু ও মুসলমানের বাস। কিন্তু উভয় প্রদেশের মধ্যে তুলনা করিতে গেলে আসামের মুসলমান-সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। হিন্দুদিগের মধ্যে এখানেও ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি নানা জাতীয় লোক আছে। ইহাদিগের মধ্যে তিন প্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত। (১) তান্ত্রিক, (২) বৈষ্ণব, (৩) মহাপুরুষীয়। তান্ত্রিক ও বৈষ্ণবের সংখ্যা এখানে অত্যন্ত অল্প। মহাপুরুষীয় ধর্ম্মই এখানে সর্ব্বাপেক্ষা লব্ধপ্রতিষ্ঠ। মহাপুরুষীয়েরা একেশ্বরবাদী। মহাত্মা শঙ্করদেব ও মাধবদেব এই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। পৌত্তলিকতার উপর মহাপুরুষীয়দিগের ঘোর বিদ্বেষ। ইহাদিগের মূলমন্ত্রই এই যে:—

> "অন্য দেবা দেও
> ন করিবা সেও
> গৃহে ন্যা যাবা,
> প্রসাদ ন্যা খাবা,
> ভক্তি হব ব্যভিচার।"

অর্থাৎ অন্য দেব দেবীর সেবা করিবে না, যে গৃহে সেই সকল দেব দেবীর পূজা হয়, সেই সকল গৃহে যাইবে না, তাহাদিগের প্রসাদ খাইবে না, অন্যথা ভক্তির ব্যভিচার হইবে। মহাপুরুষীয়দিগের মধ্যে জাতিভেদও একপ্রকার নাই বলিলেই হয়। ইহারা ব্রাহ্মণদিগকে "বামনীয়া" বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন। আসামের প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই বড় বড় 'নামঘর' দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল গৃহে মধ্যে মধ্যে স্থানীয় অধিবাসীরা মিলিত হইয়া সঙ্কীর্ত্তনাদি করিয়া থাকেন এবং সময়ে সময়ে এই সকল গৃহে ভাগবতাদি গ্রন্থের পাঠ হইয়া থাকে। মহাপুরুষীয়েরা একেশ্বরবাদী হইলেও শিক্ষা ও উপযুক্ত জ্ঞানের অভাবে, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেক কুসংস্কার প্রবেশ করিয়াছে। গুরুবাদ ইহাদিগের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল। গুরুর আদেশই ইহাদিগের নিকট বেদ-বাক্য। ব্রাহ্মসমাজ যদি আসামে প্রচার ক্ষেত্র খুলিয়া পবিত্র ও বিশুদ্ধতর একেশ্বরবাদ প্রচার করিতে পারেন, তবে এই সকল লোক অতি সহজেই ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের উচ্চ ও মহৎ আদর্শের অনুবর্ত্তী হইতে পারিবে। বাঙ্গালার ন্যায় এখানে পৌত্তলিকতার সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে না, চারি শতাব্দী পূর্ব্বে মহাত্মা শঙ্করদেব ও মাধবদেব সে পথ পরিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। তাহার পর আসামের সমাজ। আমাদিগকে বঙ্গদেশে যে সকল সামাজিক কুপ্রথার জন্য নিয়ত প্রাণপণে খাটিতে হইতেছে, আসামে তাহা এক প্রকার নাই বলিলেই হয়। আসামের হিন্দুদিগের মধ্যে জাতিভেদের বন্ধন এত শিথিল যে, ব্রাহ্মণ ভিন্ন প্রায় অধিকাংশ জাতির মধ্যেই অসবর্ণ বিবাহ পর্য্যন্ত প্রচলিত আছে। তার পর বাল্যবিবাহ। আসামে কেবল ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেই বাল্যবিবাহ প্রচলিত আছে, অপর কোনও জাতির মধ্যে এই দূষণীয় প্রথা প্রচলিত নাই। তবে শুনিয়াছি আজি কালি বাঙ্গালী বাবুদের অনুকরণ করিতে গিয়া কোন কোন আসামী বাবুও বাল্যবিবাহ দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সে যাহা হউক, আসামে এই কুপ্রথা নাই বলিলেই হয়। তাহার পর বিধবাবিবাহ। বিধবাবিবাহও ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর সকল জাতির মধ্যেই প্রচলিত আছে। এই ত গেল আসামের সামাজিক অবস্থা। যদিও সময়ে সময়ে আসামের সামাজিক নীতি সম্বন্ধে অনেকে অনেক কুৎসিত দোষ আরোপ করিয়া থাকেন, তথাপি ইহা বলিতে হইবে যে, যদি এই সমাজ উপযুক্ত শিক্ষা ও কোন বিশুদ্ধতর সমাজকে আপনাদিগের আদর্শরূপে প্রাপ্ত হয়, তবে এই সমাজই এক দিন পবিত্রতায় ভারতের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারে। এই জন্যই বলি ব্রাহ্মগণ আসামে গিয়া আপনাদিগের উচ্চ আদর্শ প্রদর্শন করুন ও আসাম সমাজকে উন্নত ও বিশুদ্ধতর করিয়া লউন।

দ্বিতীয়তঃ—আসামের পার্ব্বত্য জাতি সমূহ। আমি এই সকল পার্ব্বত্যজাতির বিষয় কিছুই ভালরূপ অবগত হইতে পারি নাই, সুতরাং এ বিষয়ে আমি বিশেষ কোন কথা লিখিতে পারিতেছি না। বিগত বৎসর ভক্তিভাজন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় শিলংএ গিয়া খাসিয়া জাতিদিগের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন। খাসিয়া জাতিদিগের ধর্ম্মতৃষ্ণার বিষয় আমিও যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে বোধ করি প্রস্তাবিত খাসিয়া মিসন্ যত শীঘ্র খোলা হয় ততই মঙ্গলের বিষয়।

তৃতীয়তঃ—আসামের কুলি। আসামের কুলি কি, তাহা যাঁহারা নিয়মিতরূপে "সঞ্জীবনী" পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই কিয়ৎপরিমাণে অবগত আছেন। দাসত্ব প্রথা উঠিয়া যাওয়ার পর জগতে যদি কোন অমানুষিক ও অসভ্য প্রথা প্রচলিত হইয়া থাকে, তবে তাহা আইনে বাঁধিয়া হতভাগ্য কুলিদিগকে

আসামের ঘোর অরণ্য ও কঠিনহৃদয় চা-কর সাহেবদিগের পাশব অত্যাচারের কবলে নিক্ষেপ করা। আসামের চা-যদি রাসায়নিক উপায়ে বিশ্লিষ্ট করা যায়, তবে তাহার মধ্যে এই কয়েকটী জিনিস দেখিতে পাইবেন—অর্দ্ধ অংশ কুলিদিগের রক্ত, সিকি অংশ ব্যভিচার, আর অপর সিকি অংশ কুলিদিগের হৃদয়ের অপহৃত ধর্ম্মভাব। যাঁহাদের হৃদয়ে ধর্ম্ম ও নীতির প্রতি সম্মান আছে, তাঁহারা এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া কথনই আসামের চা, পান করা দূরে থাকুক, স্পর্শ করিতেও চাহিবেন না। ব্রাহ্মগণ! যদি তোমাদিগের স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি কোন কর্ত্তব্য থাকে, যদি তোমাদিগের হৃদয়ে দয়া ও ন্যায়ের প্রতি বিন্দুমাত্র সম্মান থাকে, মানবের দুঃখ বিমোচন করাই যদি সমস্ত কার্য্যের শ্রেষ্ঠ কার্য্য হয়, তবে একবার আসামে গিয়া কুলিদিগের জন্য খাটিয়া জীবনের শেষ রক্তবিন্দু পর্য্যন্ত নিঃশেষিত কর। বীরভূমের দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত অসহায় প্রজাপুঞ্জের জন্য এক সময় তোমরা যেমন কাঁদিয়াছিলে, তাহাদিগের দুঃখ বিমোচনের জন্য তোমরা যেমন শরীরের রক্ত জল করিয়া খাটিয়াছিলে, আজ একবার তেমনি ভাবে এস, আসামের জঙ্গলে ও পাহাড়ের নিম্নদেশে ব্যাঘ্র, ভল্লুক, মহিষ, গণ্ডার, হস্তিপ্রভৃতি শ্বাপদপরিবেষ্টিত চা-বাগান ও কয়লার খনির কুলিদিগের মধ্যে প্রবেশ করি ও তাহাদিগের দুঃখকাহিনী জগদ্বাসীর দ্বারে দ্বারে ঘোষণা করি। মানুষের দুঃখই যদি বিদূরিত না হইল, তাহাদিগের হৃদয় যদি প্রশান্তই না হইল, তবে আর ধর্ম্ম দাঁড়াইবে কোথায়? যে দেশের গরীবেরা দিবানিশি অত্যাচারের কঠোর পেষণে ছট্‌ফট্‌ করিয়া মরিতেছে, সে দেশে কি ধর্ম্ম দাঁড়াইতে পারে? তাই বলিতেছি, আগে এই দুঃখ ও দুর্দ্দশা দূর করিতে হইবে, তার পর ধর্ম্মের কথা বলিতে হইবে। তবেই তাহাতে শুভ ফল ফলিবে, নতুবা সমস্তই বৃথা হইবে। এই সকল কুলির মধ্যে খাটিতে হইলে এমন কতকগুলি লোক চাই, যাঁহারা কোন প্রকার অসুবিধাকেই অসুবিধা বলিয়া মনে করিবেন না, এমন কি,আবশ্যক হইলে রাজকীয় কারাগারের বিভীষিকা দেখিয়াও ভীত হইবেন না। আসামের কুলিদিগের জন্য দুই প্রকারে কার্য্য করিতে হইবে। প্রথমতঃ আসামের স্থানে স্থানে এমন বহুসংখ্যক গ্রাম বসিয়া গিয়াছে যাহার অধিবাসিগণ কেবল বাগানপ্রত্যাগত কুলি। এই সকল কুলিপল্লীর অধিবাসীরা সকলে এক দেশের নয়, এক জাতির নয়, এক সমাজের নয়, সকলে এক ভাষায় কথাও কহে না। ইহাদিগের মধ্যে কোন প্রকার ধর্ম্ম বা সামাজিক বন্ধনও নাই। আজ যাহারা স্বামী ও স্ত্রীরূপে একত্রে বাস করিতেছে, বরাবরই যে তাহারা সেই ভাবে বাস করিবে, তাহার কোনই স্থিরতা নাই। এই জন্য তাহাদিগের মধ্যে কোন প্রকার স্থায়ী পারিবারিক বন্ধনও নাই। এই সকল ধর্ম্ম-বিহীন, সমাজবিহীন ও পরিবারবিহীন লোকদিগকে ধর্ম্ম, সমাজ ও পরিবারবন্ধনে আবদ্ধ করিবার জন্য একদল লোককে এই সকল কুলি পল্লীতে নিয়ত পরিশ্রম করিতে হইবে। কুলিদিগের জন্য দ্বিতীয় প্রকার কার্য্য এই যে, কতকগুলি লোক নানা উপায়ে বাগানের অত্যাচার সকল সংগ্রহ করিবেন ও সেই সকল অত্যাচার নিবারণের জন্য বিহিত উপায় অবলম্বন করিবেন। আর কতকগুলি লোক আসামের বিচারালয় সমূহে যে সকল কুলিমোকদ্দমা হয়, তাহার তদ্বির করিবেন ও আসামের "হাকিম" দিগের প্রকৃত ছবি সাধারণকে দেখাইবেন। কুলিদিগের বিষয় আমি অতি সংক্ষেপেই এই স্থলে লিপিবদ্ধ করিলাম,কুলিদিগের জন্য আরও যাহা করিতে হইবে তাহা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেই বুঝিতে পারিবেন। আসামের কোন স্থানকে মধ্যবিন্দু করিয়া শীঘ্রই একটী ব্রাহ্ম কার্যক্ষেত্র উন্মুক্ত করা আবশ্যক। সেই কার্য্যক্ষেত্রে আমার মতে সর্ব্ব প্রথমে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয়ে হাত দেওয়া প্রয়োজনীয়—

১ম। বিবিধ উপায়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার।

২য়। আসাম সমাজের প্রতি আসামবাসীদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ।

৩য়। পার্ব্বত্যজাতিদিগের মধ্যে ক্রমে ক্রমে শিক্ষার প্রবর্ত্তন দ্বারা তাহাদিগের জ্ঞানোন্নতির সাহায্য করা।

৪র্থ। সাধারণ লোকদিগের মধ্যে বিনামূল্যে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করা ও অন্যান্য উপায়ে পরোপকার সাধন।

৫ম। আসামের কুলিদিগের দুর্দ্দশাবিমোচনের জন্য নানা উপায়ে চেষ্টা করা।

আমি অদ্য যে কয়েকটী প্রস্তাব লইয়া ব্রাহ্ম সাধারণের সমীপে সমুপস্থিত হইলাম, আশা করি তাহার প্রতি সকলেরই দৃষ্টি ও সহানুভূতি আকৃষ্ট হইবে। যাঁহারা এই শুভকার্য্যে আপনাদিগের জীবন উৎসর্গ করিতে চান, তাঁহারা অগ্রসর হউন, সাধু ইচ্ছার সহায় ভগবান তাঁহাদিগের সহায় হইবেন।

২০এ জুন। ১৮৮৭।
১৩নং কর্ণওয়ালিস্‌ ষ্ট্রীট্‌
কলিকাতা।

অনুগত
শ্রীবিনোদবিহারী রায়।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

উপাসক মণ্ডলীর সহিত আচার্য্যের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয় বলিয়া বোধ হয়। খৃষ্টীয় উপাসক মণ্ডলীসমূহের আচার্য্যগণ কেবল উপদেষ্টা মাত্র নহেন; তাঁহারা উপাসকমণ্ডলীর প্রত্যেক সভ্যের রোগ, শোক, বিপদ্‌ ও দুঃখ দারিদ্র্যের সময় প্রধান সহায়, বন্ধু ও পরামর্শদাতা। তাঁহারা উপাসকমণ্ডলীর বৈষয়িক, মানসিক, আধ্যাত্মিক সকল প্রকার অভাবের সহিত সহানুভূতি প্রদর্শন করেন এবং যথাসাধ্য সৎপরামর্শপ্রদানাদি দ্বারা ঐ সকল অভাব মোচনের চেষ্টা করিয়া থাকেন। মণ্ডলীর অন্তর্ভূত ব্যক্তিগণের প্রত্যেকের বাটীতে গিয়া তাঁহাদের সকল প্রকার অভাবের তত্ত্ব লওয়া, তাঁহাদের সহিত সদালাপ করা, উপাসকমণ্ডলীর উন্নতি ও অন্যান্য সদনুষ্ঠান সম্বন্ধে তাঁহাদের সহিত আলোচনাদি করা তাঁহারা আপনাদিগের একটী সর্ব্বপ্রধান কার্য্য বলিয়া মনে করেন। সকল আচার্য্যই যে ঠিক্‌ এইরূপ প্রণালীতে কার্য্য করেন তাহা আমরা বলি না। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই

আচার্য্য ও উপাসকমণ্ডলীর মধ্যে এইরূপ সুমিষ্ট সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মসমাজে, বিশেষতঃ কলিকাতায়, এই ঘনিষ্ঠতার অত্যন্ত অভাব। তাহার একটী প্রধান কারণ সমাজসম্বন্ধীয় কর্ম্ম করিবার লোক তত অধিক নাই; এই জন্য আচার্য্যকে অনেক সময় নানা প্রকার কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতে হয়। নতুবা সে সকল কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে, তাঁহাকে এই সকল কার্য্য হইতে অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণে অবসর দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এখন বোধ হয় তিনি উপাসকমণ্ডলীর সভ্যগণের সহিত আরও ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিবার অবকাশ পাইবেন। তিনি যদি অন্ততঃ মাসে একবার করিয়া প্রত্যেক রসভ্যে বাটীতে গিয়া তাঁহাদের তত্ত্ব লন, তাহা হইলেও বোধ হয় অনেক উপকার হইতে পারে। মফস্বলে সভ্য সংখ্যার অল্পতা, বিপক্ষদিগের উৎপীড়ন প্রভৃতি নানা কারণে বিশেষ চেষ্টাব্যতীতও আচার্য্য ও উপাসকদিগের পরস্পর সম্বন্ধ প্রায়ই এখানকার অপেক্ষা অধিকতর ঘনিষ্ঠ হইতে দেখা যায়।

নিষ্ঠা দেবতার লক্ষণ, চঞ্চলতা মানুষের প্রকৃতি। মানুষ যখন দেবতার অনুকরণ করিতে যায়, তখন তাহাকে কাজেই নিষ্ঠা অভ্যাস করিতে হয়। আমাদের সমাজে এ বিষয়ে ত্রুটি যথেষ্ট। আমাদের মধ্যে কয়জনের নিষ্ঠা আছে? মন হইল,দশদিন উপাসনা করিলাম; মন হইল না,দশমাস উপাসনা ছাড়িয়া দিলাম। আমার ধর্ম্মজীবন আমারই ইচ্ছার উপরে; চাই বাঁচি, চাই মরি। মরার দিকেই আবার টান বেশী। পুরাকালের ঋষিরা বলিয়াছেন,' আত্মাবাঅরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো-'নিদিধ্যাসিতব্যঃ' নিদিধ্যাসন আমাদের মধ্যে খুব বিরল। অবিশ্রান্ত প্রার্থনা, বারবার উপাসনা ও মনন বোধ হয় মুষ্টি প্রমাণ সাধকবৃন্দের মধ্যে আছে কি না সন্দেহ। আমাদের কেমন একটা আড় আড়, ছাড় ছাড় ভাব, সকল বিষয়েই তাচ্ছীল্য। ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ সাধন করা যদি আমাদের জীবনের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য হইত, তাহা হইলে আমরা বাধ্য হইয়া নৈষ্ঠিক ব্রহ্মপরায়ণ হইতাম। এখন আমাদের যে ভাব, তাহার মধ্যে ভদ্রতার অনুরোধ কতটুকু, লোকভয় কতটুকু, প্রকৃত ভাব কতটুকু নির্ণয় করা সুকঠিন।

মহর্ষি ঈশা বলিয়াছেন যে, অত্যাচারের প্রতিরোধ করিও না, বরং যে তোমার দক্ষিণ গণ্ডে আঘাত করিবে তাহাকে অন্য গণ্ড ফিরাইয়া দিবে। ইহাও কিন্তু সত্য যে পাপের অত্যাচারের প্রতিরোধ ভিন্ন ধর্ম্মজীবন লাভ করা একেবারেই অসম্ভব। ধর্ম্মভাব পরিবর্ত্তনশীল; যিনি তাহার উপর আপনার ধর্ম্মজীবন রাখিতে প্রয়াস পান, তিনি বালুকার উপরে গৃহ নির্ম্মাণ করেন। ধর্ম্মবীর তাঁহারাই যাঁহারা সুখে দুঃখে, বিপদে সম্পদে ঈশ্বরের চরণ সমভাবে ধরিয়া থাকেন। তাঁহারা প্রাণান্তেও পাপের প্ররোচনায় মুগ্ধ হন না, এবং অসৎচিন্তা ও অসৎ সংসর্গ হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকেন। তাঁহারা মিলনে শিথিল হন না, বিরহে অধীর হইয়া নিরাশার হস্তে আত্মসমর্পণও করেন না। ক্রমাগত সংগ্রাম করিতে হইবে, পাপের অনুরোধের প্রত্যুত্তরে কেবল "না" বলিতে হইবে। পাপসম্বন্ধে মন যদি সর্ব্বদাই খড়্গহস্ত হইয়া থাকে, তবেই ধর্ম্মভাব জীবনে বদ্ধমূল হইতে পারে। এখানে বাধা দেওয়াই, প্রতিরোধ করাই এক মাত্র কৌশল, একমাত্র মন্ত্র। ক্রোধকে পরাজয় করিতে ক্ষমার প্রয়োজন, কিন্তু পাপকে পরাজয় করিতে ক্রোধের আবশ্যকতা কুমতি যখন বলে "এই আমার একটা কথা শুন", মন যখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সন্দেহে চঞ্চল হইতে থাকে, তখন একমাত্র উপায় একেবারে "না" বলা। অভ্যস্ত পাপের সেবায় যাঁহাদের জীবন চলিয়া যাইতেছে তাঁহাদের উচিত কেবল "না" মন্ত্র সাধন করেন। কু বাসনা মনে আসিবে কি অমনি তাহার মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিব, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া যিনি জীবনপথে চলেন, পাপ তাঁহার দিক্ দিয়া চলে না। পাপ বেশ লোক চিনে, যেখানে সে আদর পাইবে জানে, সেইখানেই সে যাতায়াত করে। যেখানে সে তিরস্কার ও তাড়না লাভ করিবে সে দিকে সে প্রাণান্তে যাইতে চায় না।

আমাদের নিজের অবস্থা হীন বলিয়া অন্যের সঙ্গে আমরা ততটা সহানুভূতি করিতে পারি না। আপনার জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত, অপরের ভাবনা কেমন করিয়া ভাবিব? যে নিজে রোগে ছট্‌ফট্ করিতেছে,সে কি সেই সময় অন্য রোগীর কথা ভাবিতে পারে? সেই জন্য আমাদের জীবন অল্লাধিক পরিমাণে স্বার্থপর। আপনার ধর্ম্ম, আপনার ধর্ম্মচেষ্টা লইয়া আমরা সদাই ব্যাপৃত। আমাদের মধ্যে কয়জনের আত্মাকে "সার্ব্বজনিক" আত্মা বলিতে পারি? "সার্ব্বজনিক" আত্মাবিশিষ্ট লোকের এখন বড়ই আবশ্যক। যাহারা আপনাদের দুঃখ কষ্ট ভাবিবার আগে অপরের দুঃখ কষ্টের কথা ভাবে এমন লোক না হইলে, সমাজের জন্য জ্বলন্ত ভাবে কাহারা কার্য্য করিবে? ধর্ম্মজীবনের সংকীর্ণতা অতিশয় অনিষ্টকর ও সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য। মনকে অপরের জন্য কাঁদিতে, ভাবিতে শিখাইতে হইবে। ঈশ্বরের নিকট অপরের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করা ইহার একটী বিশেষ উপায়। কাহারও উপর যদি আমার স্নেহ থাকে, তাহার জন্য ঈশ্বরের কাছে কাঁদিতে আমার স্বভাবতঃই ইচ্ছা হয়। যে আত্মা ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া ডাকিতে শিখিয়াছে, সে কখনই আপনার জন্য প্রার্থনা করিয়া সন্তুষ্ট হয় না। আপনার জন্য প্রার্থনা করিতে করিতে অপরের জন্য প্রার্থনা আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে। এই প্রার্থনা নিরাকার আত্মার সহিত যোগ সাধনের প্রথম সূত্র। নিরাকার ভাই ভগিনীর সঙ্গে যোগ সাধন করিতে যদি কাহারও ইচ্ছা থাকে, অপরের জন্য তিনি যেন অবিশ্রান্ত প্রার্থনা করেন।

নিন্দা করা অপেক্ষা রসনার দূষণীয় ব্যবহার আর কিছু নাই। এ বিষয়ে আমাদের অন্তর্দৃষ্টি ও সাবধানতা এত কম, যে আমরা সমালোচনা ও নিন্দার প্রভেদ করিতে পারি না। আবার এই নিন্দা সকল সময় নিন্দার বিষয়ীভূত ব্যক্তির সমক্ষেও ঘটে না।

আত্মরক্ষণে অসমর্থ অবলা, শিশু বা গৃহপালিত পশুর প্রতি অত্যাচারকে সকলেই ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। কিন্তু অনুপস্থিত ব্যক্তির নিন্দা করিতে কয়জন আপত্তি করেন? আমাদের সমাজ হইতে যাহাতে এই জঘন্য রোগ একেবারে উঠিয়া যায় সে বিষয়ে সকলের সাধ্যমত চেষ্টা করা উচিত। নিন্দা করিতে হয় আপনার অসংখ্য দোষ কীর্ত্তন করিয়া নিন্দা কর। যদি না পার অপরের চরিত্র বিচার করিতে অগ্রসর হইও না। "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেসু" কথার গভীর তাৎপর্য্য আছে। যে ব্যবহার আপনার উপর প্রয়োগ করিতে সঙ্কুচিত হও অন্যের উপর তাহা প্রয়োগ করিতে লজ্জিত হওয়া উচিত।

ইংলণ্ডে রাজা কিম্বা রাণী যখন রাজপদে অভিষিক্ত হন, তখন তাঁহাকে একটী শপথ গ্রহণ করিতে হয়। সে শপথের মর্ম্ম এই যে, তিনি প্রাণপণে রাজধর্ম্ম প্রতিপালন করিবেন, প্রজার স্বাধীনতার উপর অন্যায়রূপে হস্তক্ষেপ করিবেন না ও প্রচলিত প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম বজায় রাখিবেন। যখন ঈশ্বরকে আমরা আমাদের মনোরাজ্যের রাজত্বপদে অভিষিক্ত করি, তখন তিনিও অঙ্গীকার করেন যে, আমাদিগকে পরিত্রাণ দিবেন। পৃথিবীর রাজগণ রাজধর্ম্ম প্রতিপালনের অঙ্গীকার সব সময়ে রক্ষা করিতে পারেন না। ঐশ ধর্ম্ম প্রতিপালনে কিন্তু ঈশ্বর কখনও পরাঙ্মুখ হন না। তাঁর মত আপন প্রতিজ্ঞা কে রক্ষা করিতে পারে? সকল সাধকের জীবনই এই কথার সাক্ষ্য দেয়। কত প্রতিজ্ঞাই আমরা লঙ্ঘন করি! দিনের মধ্যে যদি দশটী প্রতিজ্ঞা করি, তার দুইটী রাখা আমাদের পক্ষে কষ্টকর বোধ হয়। অনুসন্ধান করিলে আমাদের অন্তরে একটী প্রকাণ্ড সমাধি স্থান দেখিতে পাই, সেখানে ভগ্ন প্রতিজ্ঞার অস্থিরাশি স্তূপাকার হইয়া রহিয়াছে। ঈশ্বরের যে কথা সেই কাজ। তিনি বলিয়াছেন যে ডাকিলেই দেখা দিব; কাতরপ্রাণে সরলভাবে ডাকিবামাত্র অন্তরে আসিয়া উপস্থিত হন। দেবতার এই অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিলে দুঃখ দুর্দ্দিনে বিশেষ উপকার হয়। হৃদয়াকাশ নিরাশার মেঘে ঢাকিয়াছে, ঢাকিলই বা? প্রাণ নিতান্ত অবশ ও নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে, পড়িলই বা? পরিবর্ত্তন যাহা কিছু সকলই তো আমাতে আমার ঈশ্বরে তো কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। তিনি আমার যেমন সুন্দর, সুধাময়, শক্তিমান্, প্রেমময় পরিত্রাতা ছিলেন, এখনও তেমনই আছেন। তাঁহার প্রতিজ্ঞা যখন চিরকালই অক্ষুণ্ণ থাকিবে, তখন আমি যে একেবারে মারা যাইব, এমন চিন্তাকে কখনই মনে স্থান দিব না।

লিবারাল ও নববিধান পত্রিকা পাঠে জানিতে পারিলাম, যে ইণ্ডিয়ান্ উইটনেস রোজা উৎসবের কথা প্রসঙ্গে, মহাত্মা মহম্মদকে "ঘোর প্রতারক" বলিয়া গালি দিয়াছেন। ষ্টেটসম্যান বলেন, যে সম্পাদক ঐ কাগজেই আর এক স্থানে, বাল্যবিবাহকে "নির্লজ্জ কুলটা বৃত্তি" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এরূপ ভাষা ব্যবহারে কুফল বই কখনও সুফল ফলে না। একটী কোমল কথায় শত্রু পর্য্যন্ত পরাজিত হয়। একথা জানিয়াও অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রতি মহর্ষি ঈশার শিষ্যেরা যে মধ্যে মধ্যে এইরূপ কটূক্তি করিয়া থাকেন ইহা অতিশয় দুঃখের বিষয়। ইট মারিলে যে কেবল আততায়ীকে আঘাত করা হয় তাহা নহে, পাটকেল মারিবার প্রবৃত্তিও উৎপাদন করা হয়।

সংবাদ।

দান—বারাণসী ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়ে শ্রদ্ধেয় রাজনারায়ণ বসু ১৬ খানি ইংরাজী ও বাঙ্গালা পুস্তক এবং পণ্ডিত শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী ২৫ খানি উর্দ্দু ও হিন্দী পুস্তক দান করিয়াছেন।

ধর্ম্মপ্রচার—বাগেরহাট ও তৎসমীপবর্ত্তী স্থানের অনেকগুলি খৃষ্টীয়ান ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের মতামত সম্পূর্ণরূপে অবগত হইবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকদিগকে তথায় যাইতে অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছেন। ইঁহারা জাতিতে চণ্ডাল।

ইংলণ্ডে একেশ্বরবাদ—লণ্ডনের বিখ্যাত একেশ্বরবাদী মেঃ এ, ডি, টাইসেন পত্র লিখিয়াছেন যে গত বিশ বৎসরে ইংলণ্ডে একেশ্বরবাদের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। অধিকাংশ খৃষ্টীয় সম্প্রদায় ইহার দিকে অগ্রসর হইতেছে।

বামাবোধিনীর রচনা পুরস্কার—বামাবোধিনীর ২৫ তম বার্ষিক জন্মোৎসব উপলক্ষে ১০টী রচনা পারিতোষিক প্রদত্ত হইবে। এইপারিতোষিকে দুই প্রকার প্রতিযোগিতা থাকিবে, (১) স্ত্রীপুরুষ উভয়ের মধ্যে, (২) কেবল স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে। প্রথম প্রকার পারিতোষিকের মূল্য প্রত্যেকটী ৪০ টাকা করিয়া, দ্বিতীয় প্রকারের ২০ টাকা করিয়া। ১ম শ্রেণীর রচনার বিষয়—(১) আদর্শ বঙ্গ রমণী। (২) ভারতের দুঃখিনী বিধবা ও অনাথা স্ত্রীলোকদিগের জীবিকা লাভের কত প্রকার উপায় হইতে পারে? (৩) স্ত্রী ও পুরুষদিগের মধ্যে সামাজিক শিষ্টাচার। (৪) বর্ত্তমান অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা ও ইহার উন্নতি সাধনের উপায়। (৫) বিশ্ব-সেবা ব্রতে স্ত্রীলোকের সহকারিতা। ২য় শ্রেণীর রচনার বিষয়—(১) গৃহ-চিকিৎসা অর্থাৎ গাছ গাছড়া ও টোট্‌কা ঔষধে পীড়া আরোগ্য করণ। (২) প্রাচীন ও আধুনিক গৃহকার্য্য প্রণালী, ও ইহার উন্নতির উপায়। (৩) বাঙ্গালী স্ত্রীপরিচ্ছদ ও ইহার উৎকর্ষ সাধন। (৪) স্ত্রীজাতির পালনীয় ব্রত। (৫) নব্যা গৃহিণীদিগের নূতন অভাব ও তন্মোচনের উপায়। পারিতোষিক রচনা বর্ত্তমান বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে গৃহীত হইবে। তৎপরে সুযোগ্য পরীক্ষকগণ দ্বারা পরীক্ষিত হইয়া, যে রচনাগুলি পারিতোষিক লাভের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে, ১২৯৫ সালের ভাদ্র মাসে তাহ প্রাপ্য পুরস্কার লেখক ও লেখিকাদিগকে প্রদত্ত হইবে।

১৭ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিশন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র দত্ত দ্বারা ১৬ই আষাঢ় মুদ্রিত ও ২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১০ম ভাগ।
৭ম সংখ্যা।

১লা শ্রাবণ শনিবার, ১৮০৯ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৮

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷৷০
মফস্বলে ৩্
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

পূজার আয়োজন।

জাগাইয়া রাখ মা আমায়।

মাস পর মাস গেল চ'লে, বছরের উপর বছর,
ঋতু হ'তে ঋতুর বিদায়, এই ভব-বিধান অমর।
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ উপগ্রহ, কক্ষে কক্ষে ঘুরিয়া বেড়ায়,
শীত গ্রীষ্ম বসন্তের বায়ু প্রেমধন জগতে বিলায়।
নিতুই নূতন আলিঙ্গন, প্রণয়ের অনন্ত তুফান ;
পুরাণ রহিতে নারে হেথা, শোক দুখ লয়ে অভিমান।
প্রেমময় সখা হে আমার, তিল তিল নূতন করিয়া
পাপ শোক আত্ম-অভিমান, প্রেমস্রোতে দাওনা মুছিয়া।
পুরাতনে আছে—অবিশ্বাস, অপ্রেম, গভীর অনুতাপ ;
জগতের তুচ্ছ সুখে ভুলি' কত না করেছি ঘোর পাপ
নিরজনে ; তোমায় ভুলিয়া, অতি হীন সুখের আশায়
কোথা হ'তে কোথায় আসিনু, প্রভু গো মরি যে যাতনায়!
যশ মান ঐশ্বর্য্যের সখা, জগতের যত পরিচয় ;
তুমি শুধু ভাল বাস মোরে, অনাথসহায় দয়াময়।
অশ্রুমাখা ব্যাকুল পরাণে, একবার যখনি ডেকেছি,
অপরাধ তুচ্ছ করে' মোর তুমি বল "এসেছি, এসেছি!"
দুঃখী যারা জানে সে সান্ত্বনা, জড়াইয়া ধরে প্রাণে প্রাণে,
পৃথিবীর ঘোর অত্যাচারে, ঝরে অশ্রু—ভুলিতে না জানে।
জানি না মা, কি সুধা যে ঢাল, কোলে লয়ে অধম সন্তানে;
হাসিতে হাসিতে দেয় প্রাণ, প্রেমময়ি! তোমার চরণে।—
কত দিনে, কত দিনে মাগো, তুমি যে'লইবে মোরে কোলে,
স'ব দুখ স'ব অত্যাচার, ভাসিব না নয়নের জলে।
মাস বর্ষ ঋতুর বিদায়, রেখে যাবে শত সুখ স্মৃতি,
দেখে যাবে তোমায় আমায়, দিন দিন বাড়িতেছে প্রীতি।
শোক দুঃখ লয়ে পুরাতন, প্রতি পলে পড়িবে খসিয়া,
প্রেম প্রীতি অনন্তের পথে, নিত্য সুখ উঠিবে জাগিয়া।
ঊষা হ'তে গোধূলির শেষ, তোমার আদেশ শিরে ধরি',
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহদের মত, স্বার্থহীন পর সেবা করি',—
জীবনের শেষ দিনে মাগো, বন ফুল ঝরে যেই মত,
তোমার চরণ প্রান্তে পড়ি', মিটাইব আশা ছিল যত।
মা আমার কাছে থেক' তুমি, পারি যেন দিতে গো তোমায়
তোমারি প্রেমের বিনিময়ে, অভাগার মলিন হৃদয়।
প্রকৃতির শোভন ছবির, নিতুই নূতন আলিঙ্গনে,
জাগাইয়া রেখ মা আমায়, দাস করে জগতের সনে।
ঢেলে দাও প্রেমের মদিরা, মাতাইয়া দাও এ হৃদয়ে,
মোহে যেন ঘুমাই না হেথা, জাগাইয়া রেখো মা তনয়ে।'
সংসার—সে জানিনা কখন, ধীরে ধীরে আসে প্রাণ পাশে
হাসি মুখে কি যে গান গায়, ঘুমাই যে হাতের পরশে!
ভুলে যাই ক্ষণিকের সুখে, দেখেও না দেখিনা তোমায়
প্রাণে প্রাণে জড়াইয়া সদা, জাগাইয়া রাখ মা আমায়।
টুটে ঘুম ঝরে অশ্রু বুকে, শত বৃশ্চিকের জ্বালা প্রাণে
মা আমার প্রেমময়ী তুমি, তোমা ছাড়া শান্তি কোন্ খানে?
প্রকৃতির মধুর সঙ্গীত, নিতুই নূতন সুধা তার ;
প্রাণ ভ'রে শুনাও জননি! "জাগাইয়া রাখ মা আমায়।"

প্রভু! তোমার পূজার আয়োজন যে কিছুই সংগ্রহ করা হয় নাই, আমি কিরূপে পূজায় প্রবৃত্ত হইব? আমি ত সম্পন্ন ব্যক্তি নহি, আয়োজন কোথায় পাইব। আমি কাঙ্গাল, ভিখারী ও অশরণ। হৃদয় ছিন্ন, যাঁকে মাথায় রাখিয়া, বক্ষে রাখিয়াও মন স্থির হয় না, তাঁকে ছিন্ন হৃদয়াসনে কিরূপে বসিতে বলিব? আমি মলিন, কলঙ্কী, পাতকী, পবিত্রতার দীপ কেমন ক'রে জ্বালিব? অসাধুতার দূষিত গন্ধ যার প্রাণ হইতে নির্গত হইতেছে, সে কেমন ক'রে তোমাকে ধূপের সুবাস নিবেদন করিবে? তুমি এস নাই বলিয়া অনেকদিন হইতে আমার হৃদয় কানন শুকাইয়া রহিয়াছে। গাছে একটীও ফুল ফুটে না, তোমাকে অঞ্জলি দিতে পুষ্প কোথায় পাইব? ভক্তি বৃক্ষ আজও রোপণ করিতে পারিলাম না, চন্দন কিরূপে সংগ্রহ করিব? যার কিছু নাই, যে প্রকৃত কাঙ্গাল, সে কেমন করে' পূজা করিবে? সকলি যে তোমার, আমার বলিবার তো কিছুই নাই, তোমাকে দিব কি? অন্তরে দৈববাণী হইল, "তোমার যে কোন আয়োজনই নাই, ইহাই

আমার পূজার শ্রেষ্ঠ আয়োজন, তুমি যে আমার পূজার জন্য ব্যাকুল হইয়াছ, ইহাই যথেষ্ট আয়োজন।"

দয়াময় শরণাগত-বৎসল! অনেক বৎসর হইল তোমায় আমায় প্রথম দেখা শুনা হয়। এই কয়েক বৎসরের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, যে শত শত বিঘ্ন, বিপদের মধ্য দিয়া আসিয়াছি। যখন বিপদে পড়িয়াছিলাম, তখন মনে হয় নাই, যে আবার তোমার মুখারবিন্দ দেখিয়া সুখী হইব। তুমি করিলে কি! এমন মহাপাতকীর নিরাশগ্রস্ত হইবার পথ রুদ্ধ করিলে! তোমার অসাধারণ গুণ, অলৌকিক ব্যবহারের কথা আমি কি বলিব? আমার প্রাণ কতটুকু, ভাব কতটুকু, ভাব প্রকাশ করিবার শক্তিই বা কতটুকু! উপাসনা করি, সঙ্গীত করি, মনের ভাব প্রকাশ হয় না বলিয়া ব্যাকুল হই। ভক্তসমাজ আনন্দে তোমার গুণগান করিতেছেন, আমি যে ভাল ক'রে তোমার গুণ গাইতে পারি না, আমি তাহাতে কিরূপে যোগ দিব? তবে আমি কি নীরব হ'য়ে থাকিব? সবাই কথা কবে, আমি নির্ব্বাক র'ব? দেবতা বলিলেন, "বৎস, ব্যথিত হইও না, কেহই আমার মহা কথা কহিতে পারে না, অথচ কহিবার আর কথাও নাই। আমার কথা কহা কেবল কথা কহিবার চেষ্টা করা মাত্র।

অন্য লোকের অন্য কত অবলম্বন আছে। তাহাদের ব্রত আছে, জপ আছে, সংযম, উপবাস, তীর্থযাত্রা প্রভৃতি কত উপায় আছে। আমি যেদিন তোমার কাছে দাসখত লিখিয়াছি, সেই দিনই আমি অন্য উপায় অবলম্বন ছাড়িয়াছি। তুমিই আমার একমাত্র উপায়, তুমিই একমাত্র সাধন। তোমারই কৃপায় আমি তোমাকে দর্শন করিব, ধারণ করিব, প্রাপ্ত হইব। আমি তোমার মুখের দিকে কেবল চাহিয়া থাকিব, অমনি আমার শত উপবাস, সহস্র ব্রতপালনের ফল হইবে। মুক্ত হৃদয়ে আমি তোমার ক্ষুদ্রতম আদেশ পালন করিব, অমনি আমার লক্ষ পুরশ্চারণের ফল হইবে। জপ তপ আমার সকলই তুমি। তোমার প্রকাশ আমার আঁধার ঘরের আলো, তোমার প্রেম আমার নিত্য সহচর।

আমি দেখি যে প্রতিদিনই তোমার কাছে আসিয়া কাঁদি। তুমি আনন্দময় পূর্ণ স্বরূপ, তোমার ছেলের এত ক্রন্দন কেন? তুমি কাঁদাও, এমন কথা বলিব না। আপনার দোষে আপনি কাঁদি। একদিনও দেখিলাম না যে, ষোল আনা খুঁটিয়া তোমার কথা পালন করিলাম। কিন্তু আমার ক্রন্দন তো কেবল অনুতাপের কান্না নহে। তোমার দিকে চাহিলে তোমার প্রেমমাখা মুখখানি দেখিলে, আমার ইচ্ছা করে কাঁদিয়া সমস্ত প্রাণটাকে অশ্রুজলে পরিণত করিয়া তোমার চরণ ধৌত করিয়া দিব। তোমার কাছে বসিয়া আমার কাঁদিয়া যত সুখ, সংসারে উচ্চতম হাস্যের রোলেও আমি সে সুখ পাই না, অশ্রুবারি-বিন্দুরূপ স্বচ্ছকাচের মধ্য দিয়া তোমার মধুময় মুখছবি আমি যেন অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট দেখিতে পাই। ক্রন্দনের অধিকার হইতে আমাকে বঞ্চিত করিও না। আমি এখনও আশ মিটাইয়া কাঁদিতে পারি নাই।

প্রভু, পবিত্রাত্মারাই তোমাকে দেখিতে পান, এই মহাবাক্য আমার প্রাণে সর্ব্বদাই ত্রাস উৎপাদন করিতেছে। বিশুদ্ধান্তঃকরণেরাই যদি তোমাকে দেখিতে পান, তবে আমার উপায় কি? আমি তো এতদিনেও নিজের মন বিশুদ্ধ করিতে পারিলাম না। আমি তো দেবতা হইতে পারি নাই, এখনও মানুষ রহিয়াছি। তোমাকে একটুখানি দেখিতে না পাইলে, আমি পবিত্রতা জিনিসটা যে কি, তাহাই বুঝিতে পারিব না। অপবিত্রতা ভেদ করিয়া তোমার মুখরাগের পবিত্র কিরণ আসুক, আসিয়া আমার মুখকে পবিত্র ও সুন্দর করুক। আমিও যেমন তোমার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিতে ভালবাসি, তুমিও কি তেমনি আমার মুখ দেখিতে চাও না? তুমি আমার মুখ দেখিতে চাও, সেই জন্যই আশা হয় যে কুৎসিত, বিষণ্ণ প্রাণ সুন্দর ও সুখী হইবে।

যখনই তোমার কাছে ঘেঁসে বসি, তখনই তোমার ছেলে মেয়ের জন্য অনুরোধ কর। আমি যদি বলি যে, প্রভু, আপনার ভার বহিতে পারি না, অন্যের ভার কেমন ক'রে লইব? তুমি বল, 'আমাকে তোমার ভার দাও।' আমি যদি বলি, আমার বিদ্যা বুদ্ধি কই, আমার কি সাধ্য ভাই ভগিনীকে বুঝাই? তুমি বল, 'তোমাকে আমি আমার শক্তি দিব।' কাজেই আমাকে পরাস্ত হইতে হয়। তোমাকে কে আঁটিতে পারিবে? যখন তুমি মধুর কথায় স্বয়ং অনুরোধ কর, তখন তোমার অনুরোধকে কার সাধ্য লঙ্ঘন করে? তাই দেখ প্রভু, বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি। শক্তি নাই, অথচ ইচ্ছা আছে। এখন স্বর্গীয় মন্ত্রী, মন্ত্রণা দেও, কেমন ক'রে তোমার জগতের সেবা করিব। মন্ত্রণা দিয়া শক্তি সঞ্চার কর, তোমার দত্ত শক্তি ভিন্ন কি নিজবলে তোমার মন্ত্রণা পালন করিতে পারি?

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রস্তাব।

যোগতত্ত্ব।

গতবারে "সজীব ও মৃত ধর্ম্ম"-শীর্ষক প্রস্তাবে জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে যে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপনের কথা বলা হইয়াছে, তাহাই যোগশাস্ত্রের মূল তত্ত্ব। ধর্ম্মজগতে যোগ শব্দের অন্য অর্থ নাই। ঈশ্বরের সহিত আমাদের আত্মার এই যে ঘনিষ্ঠ, প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ, ইহা ভিন্ন আর যাহা কিছু যোগশব্দে অভিহিত হইয়া থাকে, তাহাকে প্রকৃত পক্ষে যোগ বলা যায় না। তাহা শারীরিক প্রক্রিয়াবিশেষ মাত্র। তাহাতে চিত্ত সমাধানের, মনঃসংযমের কতদূর সাহায্য হয়, তাহা আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু কোন শারীরিক ক্রিয়াবিশেষদ্বারা যে জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার যোগ বা সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে, একথা আমরা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি। প্রাণায়ামাদি ক্রিয়াকে চিত্ত-সমাধানের উপায় বলিয়া স্বীকার করিলেও, ঐ সকল প্রক্রিয়াকে যোগ বলা কতদূর যুক্তিসঙ্গত, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

উহাকে যোগ বলাও যাহা, আর উপায়কে উদ্দেশ্য বলা, পথকে গন্তব্য স্থান বলাও তাহাই। এতদ্ভিন্ন আমরা এ সম্বন্ধে যতটুকু জ্ঞানলাভে সমর্থ হইয়াছি, তাহাতে আমাদের বোধ হয় যে হঠযোগদ্বারা মানুষ যে সমাধি প্রাপ্ত হয়, তাহা এক প্রকার অচেতন অবস্থা মাত্র। এ অবস্থায় জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে যোগ সম্ভব বলিয়া আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। যে অবস্থায় আমার চৈতন্যই রহিল না, আমি বুঝিতেই পারিলাম না আমার প্রাণের মধ্যে কি হইতেছে, জানিতেই পারিলাম না আমার ইষ্ট দেবতা আমার হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়াছেন কি না,—তাহাকে যোগ বলি কি রূপে? আমি সচেতন থাকিয়া আমার প্রাণের দেবতাকে প্রাণের মধ্যে দেখিতে চাই, তাঁহার সহিত আমার সম্বন্ধ বুঝিয়া লইতে চাই, তাঁহার চরণ ধরিয়া থাকিতে চাই, সমস্ত প্রাণ মন তাঁহার চরণে ঢালিয়া দিতে চাই, সমস্ত শক্তির সহিত তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে চাই। আমি সজ্ঞানে আমার সমস্ত চিন্তা, ভাব ও ইচ্ছা ঈশ্বরের নামে উৎসর্গ করিতে চাই। ইহাকেই বলি যোগ। আর যে উপায়ে এই অবস্থা লাভ করা যায়, তাহাকেই বলি যোগশাস্ত্র।

আধ্যাত্মিক সত্যলাভের পক্ষে, আত্মার উন্নতি সাধনের পক্ষে, চিন্তাই একমাত্র উপায়। চিন্তা হইতেই ভাবের উৎপত্তি এবং ভাব হইতেই কার্য্যের উৎপত্তি। দৃষ্টান্তস্বরূপে প্রার্থনার সহিত চিন্তার কিরূপ সম্বন্ধ, দেখা যাউক। অভাব-বোধ ও তজ্জনিত ব্যাকুলতা ব্যতীত প্রার্থনা হইতে পারে না। কিন্তু এই অভাব-বোধ প্রস্ফুটিত করিবার উপায় কি? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, চিন্তাই অভাব-বোধ উৎপাদনের একমাত্র উপায়। এইরূপ প্রত্যেক বিষয়ে দেখান যাইতে পারে যে, আধ্যাত্মিক রাজ্যে যাইতে হইলে চিন্তা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। উপদেশ শ্রবণে বা পাঠে যে উপকার হয়, তাহারও মূল অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, অপরের প্রদত্ত উপদেশ আমাদের চিন্তা শক্তির সাহায্য করে বলিয়াই তাহা আমাদিগের পক্ষে কার্য্যকারী হয়। যে উপদেশ আমার চিন্তাকে জাগ্রত করিয়া না দেয়, তাহা আমার পক্ষে কোনও কাজেই আসে না। নিদিধ্যাসন বা ধ্যান, চিন্তার প্রগাঢ়তম অবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। মননকে যদি কেবল 'চিন্তামাত্র' বলা যায়, তাহা হইলে নিদিধ্যাসনকে 'চিন্তাদ্বারা উপলব্ধি করা' বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর জগতের প্রত্যেক বস্তুকে পূর্ণ করিয়া রহিয়াছেন, ইহা যদি আমি সাধারণ ভাবে চিন্তা করি, তবে তাহাকে মননের অবস্থা বলা যায়। কিন্তু সাধক যখন একাগ্রচিত্তে প্রাণের মধ্যে বা বহির্জগতে ঈশ্বরের সত্তা উজ্জ্বলভাবে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করেন, তখন তাঁহার আত্মার যে অবস্থা, তাহাকে নিদিধ্যাসন বলা যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন প্রভৃতি আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনের যে কিছু উপায় আছে, চিন্তাই তাহার মূলমন্ত্র। চিন্তা ভিন্ন আধ্যাত্মিক রাজ্যে একপদও অগ্রসর হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে যে প্রক্রিয়াদ্বারা এই চিন্তাশক্তির বিলোপ হয় এবং মন অচেতন অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহাকে আধ্যাত্মিক উন্নতির উপায় বলিব কি রূপে? এই চিন্তাহীন, নিষ্ক্রিয় অবস্থাকে যিনি আধ্যাত্মিক যোগের অবস্থা বলিতে চাহেন বলুন, আমরা কিন্তু এ অবস্থাকে আধ্যাত্মিক নামে অভিহিত করিতেই প্রস্তুত নহি।

যে অবস্থায় আমাদের আত্মা পাপের পথ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের সহিত পুনর্ম্মিলিত হয়; যে অবস্থায় আমরা প্রাণ খুলিয়া বলিতে পারি, 'প্রভু! আমার ইচ্ছা নয়, কিন্তু তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক'; যে অবস্থায় আমাদের সমস্ত চিন্তা, ভাব ও ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের অধীন হয়; তাহাই যথার্থ যোগের অবস্থা। যোগ শব্দের অর্থ আত্মার ক্রিয়াহীন বিশ্রামের অবস্থা নহে; সহস্র কার্য্যের মধ্যে তন্ময় চিত্তে ঈশ্বরের দিকে আত্মাকে ফিরাইয়া রাখার নামই প্রকৃত আধ্যাত্মিক যোগ। কর্ম্ম পরিত্যাগ না করিলে, সংসার ছাড়িয়া অরণ্যবাসী সন্ন্যাসী না হইলে, জগতের সকল বিষয়ে উদাসীন না হইলে ধর্ম্মলাভ করা যায় না, ব্রাহ্মধর্ম্ম একথা স্বীকার করেন না। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন সংসারে থাকিয়াই ধর্ম্ম সাধন করিতে হইবে; সংসারের প্রত্যেক বস্তুতে পরমেশ্বরের প্রকাশ দেখিতে হইবে; সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের অধীন হইয়া সংসারের যাবতীয় কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে, পরমেশ্বরের সহিত আত্মার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে। যিনি প্রত্যেক বিষয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন হইয়া সংসারে বাস করেন; সকল অবস্থাতেই যাঁহার প্রাণ প্রেমের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া প্রতিনিয়ত সেই প্রাণেশ্বরের দিকে ফিরিয়া থাকে; যিনি প্রাণের গভীরতম প্রদেশে ও বাহিরের প্রত্যেক বস্তুতে সর্ব্বক্ষণ পরমেশ্বরের প্রকাশ দেখিয়া কৃতার্থ হন; যাঁহার হৃদয়ের অনুরাগ-স্রোত সেই সৌন্দর্য্য সাগরকে ছাড়িয়া অন্য কোন দিকে প্রবাহিত হয় না; যাঁহার ক্ষুদ্রতম ইচ্ছাও সেই পরম প্রভুর ইচ্ছাকে কখন অতিক্রম করে না; তিনিই প্রকৃত যোগী। তিনি সংসারী হইয়াও বৈরাগী, আবার বৈরাগী হইয়াও সংসারী। মৎস্য যেমন জলছাড়া হইয়া বাঁচিতে পারে না, তিনিও তেমনি ঈশ্বরকে ছাড়িয়া প্রাণ ধারণ করিতে পারেন না। যিনি এই প্রকৃত আধ্যাত্মিক যোগের অবস্থা লাভ করিয়াছেন, তিনিই প্রাণ খুলিয়া প্রকৃতভাবে বলিতে পারেন,

"তোমারই নাথ! তোমারই চিরদিন আমি হে।"

ব্রহ্মস্বরূপ। *

এই বিষয়ে দেশীয় বা ইংলণ্ডীয় ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক প্রচলিত পুস্তক সমূহের একখানাও তৃপ্তিকর নহে। কোন পুস্তকেই এই বিষয়ের সন্তোষকর ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায় না। অনেকে ইহাতে হস্তক্ষেপই করেন নাই। জগতে মানুষের জ্ঞান অপেক্ষা উচ্চতর জ্ঞান আছে, মানুষের শক্তি অপেক্ষা মহত্তর শক্তি আছে, অনেক গ্রন্থ এই পর্য্যন্ত দেখাইয়াই ক্ষান্ত হন; যেন ইহাতেই ঈশ্বরাস্তিত্ব সপ্রমাণ হইল। এই জ্ঞান যে অনন্ত, এই শক্তি যে অনন্ত অনেকে ইহা দেখাইতে চেষ্টাও করেন না। কিন্তু যতক্ষণ ইহা না দেখান হয়, ততক্ষণ ঈশ্বরাস্তিত্ব সপ্রমাণ হইল না, দেবতার অস্তিত্বমাত্র সপ্রমাণ হইল। অথচ অনেকেই

* গত ১২ই আষাঢ় বাবু সীতনাথ দত্ত ব্রহ্মবিদ্যা সভায় এই বক্তৃতাটী পাঠ করিয়াছিলেন।

তদুপলক্ষে, "কেশবচন্দ্রের মহত্ব" বিষয়ে বক্তৃতা। ১৫ই বৈশাখ—সমাজ মন্দিরে আলোচনা। ১৮ই বৈশাখ—"সমাজ সংস্কার" বিষয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতা। ১৯এ বৈশাখ—প্রাতে ও সন্ধ্যার পর উপাসনা ও উপদেশ। ২১এ বৈশাখ—হাজারিবাগের অন্তর্গত চাতরা নগরে সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন। ২২এ বৈশাখ—ঐ নগরে সন্ধ্যার পর ভদ্রলোকদিগের সহিত ধর্ম্মালোচনা ও সংকীর্ত্তন। ২৬এ বৈশাখ—গয়া ব্রাহ্মসমাজে সংগীত। ২৮এ বৈশাখ—গয়ার কোন ভদ্রলোকের বাটীতে সঙ্কীর্ত্তন। ২৯এ বৈশাখ—গয়া গবর্ণমেণ্ট স্কুল হলে "ব্যক্তিগত উন্নতির সামঞ্জস্য" বিষয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতা। ২রা জ্যৈষ্ঠ—কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে সন্ধ্যার পর উপাসনা, এবং "নাম সাধন" বিষয়ে উপদেশ। ৯ই জ্যৈষ্ঠ—বাঁশবেড়ে ব্রহ্ম মন্দিরে উৎসবের উদ্বোধন। ১১ই জ্যৈষ্ঠ—বাঁশবেড়ের ভদ্রলোকদিগের সহিত সদালোচনা। ১৫ই জ্যৈষ্ঠ—বাঁশবেড়ে ব্রহ্ম মন্দিরে উপাসনা ও উপদেশ। ১৬ই জ্যৈষ্ঠ—ঐ গ্রামে সন্ধ্যার পর উপাসনা ও উপদেশ। ২১এ জ্যৈষ্ঠ—কালনা নগরে সন্ধ্যার পর উপাসনা। ২২এ জ্যৈষ্ঠ—ছাত্র সমাজে উপাসনা এবং "সকল বিদ্যাই ব্রহ্মবিদ্যা" বিষয়ে উপদেশ। ২৩এ জ্যৈষ্ঠ—কালনা সমাজমন্দিরে প্রাতে উপাসনা ও উপদেশ। ঐ দিন অপরাহ্নে কোন প্রকাশ্য স্থানে "সারধর্ম্ম" বিষয়ে বক্তৃতা। ৩০এ জ্যৈষ্ঠ—বাঁশবেড়ে সমাজে উপাসনা। ৬ই আষাঢ়—ঐ সমাজে উপাসনা।

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন—এই তিন মাস আসাম প্রদেশে প্রচারার্থ ভ্রমণ করিয়াছেন। তাঁহার কার্য্যের স্থূল বিবরণ এই রূপ;—তিনি প্রায় প্রত্যহ প্রাতঃকালে স্থানীয় ভদ্রলোকদিগের গৃহে গৃহে গমন করেন, ও তাঁহাদিগের সহিত আলাপ করিয়া ও নানা বিষয়ক আলোচনাদ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সাহায্য ও পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্য বৃদ্ধির চেষ্টা করিয়া থাকেন। যেখানে ব্রাহ্মদিগের বাস, সেখানে সাধারণ মহিলাদিগের মধ্যে প্রচার করিয়া থাকেন। সায়াহ্নে প্রায় অধিকাংশ দিনই স্থানীয় ভদ্রলোকদিগের গৃহে গীতা ও উপনিষদ প্রভৃতি শাস্ত্র সকল পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন এবং সেই সমস্ত শাস্ত্রীয় শ্লোক অবলম্বন করিয়া ব্রহ্ম-বিদ্যা বিষয়ক উপদেশাদি প্রদান করিয়া থাকেন। শাস্ত্র পাঠান্তে সঙ্গীত, সঙ্কীর্ত্তন ও প্রার্থনাদি হইয়া থাকে এবং মধ্যে মধ্যে উপদেশ ও বক্তৃতাদিও হয়। তাঁহার নিকট হোমিওপ্যাথিক বাক্স থাকায় অনেক সময় অনেক রোগীর চিকিৎসাও হইয়া থাকে। বিগত তিন মাসে তিনি পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে নওগাঁ, ডিব্রুগড়, শিবসাগর ও গৌহাটী প্রভৃতি স্থানে প্রচার করিয়াছেন। ১লা এপ্রিল তিনি দরং জেলা (তেজপুর) পরিত্যাগ করিয়া নওগাঁ যাত্রা করেন। নওগাঁ যাইবার সময় পথিমধ্যে সনাই নামক স্থানে একটী ব্রাহ্ম-পরিবার দেখিয়া যান ও সেখানে উপাসনাদি করেন। এখানে একটী চা বাগান আছে তথাকার কুলীদিগকে একদিন উপদেশ দেন ও কীর্ত্তন শুনান। এখানে পূর্ব্ব হইতেই একটী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইনি নওগাঁতে ১৬ দিন থাকিয়া উপাসনা, উপদেশ, আলোচনা, গ্রন্থপাঠ ও বক্তৃতাদি দ্বারা ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রচার করেন। ইহার মধ্যে একদিন বর্ষশেষ ও একদিন নববর্ষ উপলক্ষে নওগাঁ ব্রাহ্ম-সমাজে বিশেষ উপাসনা করেন ও উপদেশ দেন। একদিন বাবু শরচ্চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের পরলোকগত কন্যার আদ্যশ্রাদ্ধে আচার্য্যের কার্য্য করেন। নওগাঁয়ে প্রায় প্রত্যহই মহিলাদিগের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছেন। একদিন স্থানীয় হাইস্কুল গৃহে "জীবনের উৎস" বিষয়ে বক্তৃতা দেন। একদিন উদয় বাবুর বাটীতে পারিবারিক উপাসনা করেন ও সাধারণ লোকদিগকে উপদেশ দেন। নওগাঁ হইতে তিনি ডিব্রুগড় গমন করেন। ডিব্রুগড়ে প্রায় ২৫ দিন ছিলেন। এখানেও পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতেই কার্য্য করিয়াছেন। এখানে তিনি "সংসারের পরিণাম" ও "আশ্চর্য্যের আশ্চর্য্য" বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। ডিব্রুগড় ব্রাহ্ম-সমাজের মন্দির প্রতিষ্ঠা ও ডিব্রুগড় ছাত্রসমাজের সংস্থাপন উপলক্ষে উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। একদিন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনের কতকগুলি বিষয় আলোচনা করেন। মধ্যে একবার ব্রিটিশ শাসনের শেষ সীমা সদীয়া গমন করেন, এবং ছুমছুমা, সৈকোয়াঘাট, ধলা, মার্ঘারেটা ও টিকক্ পাহাড় প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করিয়া সেই সকল স্থানে উপাসনা, উপদেশ ও গ্রন্থপাঠাদি দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার করেন। ডিব্রুগড় হইতে তিনি শিবসাগর আসেন। সময়ের অল্পতা বশতঃ এখানে ৫ দিন মাত্র ছিলেন। এখানেও উপাসনা, উপদেশ, গ্রন্থপাঠ ও বক্তৃতাদি হয়। "শূন্যবাদ ও প্রত্যক্ষবাদ" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। শিবসাগর হইতে গুণাভিরাম বড়ুয়া মহাশয়ের কন্যার বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়া আবার নওগাঁয়ে আসেন। উক্ত বিবাহে আচার্য্যের কার্য্য করেন। একদিন স্থানীয় সমাজ মন্দিরে ও একদিন পরিবারে পারিবারিক উপাসনা করেন। নওগাঁ হইতে ইনি আবার তেজপুরে আগমন করেন। এবার এখানে দুই দিন ছিলেন। একদিন ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা করেন। তেজপুর হইতে গৌহাটী আসেন। স্কুল প্রভৃতি বন্ধ থাকায় গৌহাটীতে নিয়মিতরূপে প্রচার করিতে পারেন নাই। এখানে তিন দিন মাত্র ছিলেন। তিনদিনই উপাসনাদি হইয়াছিল। গৌহাটী হইতে গোয়ালপাড়া গমন করেন। এখানে ব্রাহ্ম সমাজ নাই; এখানে ১১ দিবস থাকিয়া উপাসনা, শাস্ত্র পাঠ আলোচনা ও বক্তৃতাদি দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার করিয়া ধুবড়ী গমন করেন। ধুবড়ীতে ৯ দিন অবস্থান করিয়া দুই দিন প্রকাশ্য বক্তৃতা ও এক দিন ছাত্র সমাজে বক্তৃতা করেন। মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্ম বন্ধুদিগের বাটীতে পারিবারিক উপাসনা, আলোচনা, পাঠ, ব্যাখ্যা প্রভৃতি দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার করেন। এখানে একটী ছাত্র সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইনি তথা হইতে গারো পর্ব্বতে গিয়াছেন।

নবদ্বীপ চন্দ্র দাস—চট্টগ্রামে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে সহানুভূতি করে এমন কোন সমাজ ছিল না, এজন্য তিনি গৃহে গৃহে যাইয়া আলাপ পরিচয়াদি করেন এবং বাড়ী বাড়ী উপাসনাদির পর কয়েকটী বন্ধু প্রাপ্ত হন। যাঁহাদের বিশ্বাস এবং অনুরাগ সাঃ ব্রাঃ সমাজের দিকে, সেই সব বন্ধু মিলিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যেই "চট্টগ্রাম প্রার্থনা সমাজ" নামে

একটী স্বতন্ত্র সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তিনি তথায় এ পর্য্যন্ত নিয়মিতরূপে কার্য্যাদি করিতেছেন। সমাজ নূতন বলিয়া অন্য কোন কার্য্য বিশেষরূপে হইতে পারিতেছে না। প্রথমতঃ ইহার উপাসকমণ্ডলীগঠন এবং গৃহাদির জন্যই অনেক সময় যাইতেছে। ঈশ্বর কৃপায় অনেক আশাও দেখা যাইতেছে। বাবু যাত্রা মোহন সেন বি,এল মহাশয় এই সমাজের জন্য তাঁহার গৃহ ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং নিজে ইহার জন্য বেশ খাটিতেছেন। এজন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। চট্টগ্রাম প্রার্থনা সমাজে নিয়মিত কার্য্যব্যতীত ভদ্রলোকদিগের গৃহে পারিবারিক উপাসনা ও উপদেশাদি দ্বারা এবং নানারূপ আলোচনা এবং প্রকাশ্য বক্তৃতাদ্বারা সহরে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হইতেছে,ইনি সহরেই অধিক সময় কাটাইয়াছেন। একবার মাত্র পটীয়া নামক একটী প্রসিদ্ধ পল্লীতে গমন করেন। এখানে মুন্সেফ্স্ কোর্ট ও হায়ার ক্লাশ ইংলিশ স্কুল আদি আছে। এখানে অনেক ভদ্র লোকের বাস। এখানে একটী প্রকাশ্য বক্তৃতা ও উপাসনাদি হইয়াছিল। এখন ইনি চট্টগ্রামেই আছেন।

পণ্ডিত শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী—বিগত তিন মাসে লাহোর ব্রহ্মমন্দিরে দুই রবিবার উপাসনা করিয়াছেন ও উপদেশ দিয়াছেন। প্রতি সপ্তাহে আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য তাঁহার প্রচার আফিসে কয়েকজন নির্দ্দিষ্ট বন্ধু মিলিত হইয়া থাকেন। তাঁহার গার্হস্থ্য সমাজে (sanctuary) নিয়মিতরূপে প্রতিদিন উপাসনা হইয়াছে। প্রচার আফিসে পুস্তক ও পত্রিকাদি পাঠ ও ধর্ম্ম বিষয়ক আলোচনাদির জন্য অনেক লোকের সমাগম হইয়া থাকে। এই সকল লোকদিগের মধ্যে অনেকে বন্নু, করাচী, লুধিয়ানা, নাব্বা, ঝিলম ও জামু প্রভৃতি স্থান হইতে আসিয়াছিলেন। বিগত তিন মাসে তিনি 'ধর্ম্ম-জীবন' পত্রিকার সম্পাদকতা ও (১) সঙ্গীত পুস্তক (উর্দ্দু), (২) লীলাবতী চরিত ২য় সংস্করণ (উর্দ্দু), (৩) মিরাট-উল-দিন ২য় ভাগ,২য় সংস্করণ (উর্দ্দু) (৪), ঈশ্বরোপাসনা প্রণালী (উর্দ্দু), (৫) পাপী আউর অমরজীবন (গুরুমুখী), ও (৬) দেবজীবনের আদর্শ (গুরুমুখী), এই কয়েকখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। ইনি বিগত এপ্রিল মাসে একবার বেলুচিস্থানে গমন করেন এবং সক্কর, কোয়েটা, হিরক ও সিবি, এই কয়েকটী স্থান পরিদর্শন করেন। সক্করে দুইবার শ্রীযুক্ত এম, সি, যোশীর গৃহে পারিবারিক উপাসনা হয়। এখানে "আত্মার পাপগ্রস্ত ও মুক্তজীবন" বিষয়ে এক বক্তৃতা করেন। কোয়েটাতে একটী ব্রাহ্মসমাজ আছে। ইনি এখানে এক সপ্তাহ ছিলেন। প্রতিদিন প্রাতে উপাসনা হয়। রবিবার সায়াহ্নে মন্দিরে উপাসনা করেন ও উপদেশ দেন। এখানে "আমাদিগের উপদেশ ও কার্য্য" "পাপগ্রস্ত আত্মা ও নবজীবন" এবং "আমাদিগের শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের বর্ত্তমান অবস্থা" বিষয়ে তিনটী বক্তৃতা করেন। হিরকে একদিন ছিলেন। এখানে "আমরা যে বীজ বপন করিয়াছি তাহার প্রকৃতি এবং ফল" বিষয়ে বক্তৃতা দেন। সিবিতে এক বাগানে উপাসনা হয়। এখানে "মুক্তি সম্বন্ধে আমাদিগের উপদেশ কি" বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী—বিগত তিন মাস নিয়মিতরূপে ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার পত্রিকার সম্পাদকতা ও কলিকাতাস্থ উপাসকমণ্ডলীর আচার্য্যের কার্য্য করেন। একদিন শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে বাবু আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের তৃতীয়া কন্যার নামকরণ উপলক্ষে ও আর একদিন কলিকাতায় বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের পরলোকগত মাতার সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধে আচার্য্যের কার্য্য করেন। নববর্ষ উপলক্ষে একদিন মন্দিরে উপাসনা করেন। কাঁথি ব্রাহ্মসমাজের মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে তথায় নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করেন। সেখানে উপাসনাদিতে আচার্য্যের কার্য্য করেন ও "আধুনিক ভারতে ধর্ম্মান্দোলন" ও "ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রধান প্রধান মত" বিষয়ে দুইটী বক্তৃতা করেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নবম বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে "ব্রাহ্মধর্ম্মের বর্ত্তমান বিঘ্ন" বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন। একবার রসপুর ও আমতা প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করেন। রসপুরে উপাসনাদি ও দুইটী বক্তৃতা হয়। এক দিনের বক্তৃতার বিষয় "সত্যধর্ম্ম ও তাহার নিদর্শন" ও অপর দিনের বক্তৃতার বিষয় "সুরাপানের অপকারিতা"। আমতাতে একটী বক্তৃতা হয়, তাহাতে ইংরাজি শিক্ষাদ্বারা আমাদিগের দেশের কি কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা বিশেষরূপে বুঝাইয়া দেন। আমতা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া একবার মুরশিদাবাদ ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে তথায় গমন করেন। সেখানে উপাসনাদি করেন ও "ঈশ্বরের সহিত মানবাত্মার সম্বন্ধ" বিষয়ে একটী বক্তৃতা দেন। মুরশিদাবাদ হইতে ফিরিয়া আসিয়া কালনাস্থ বন্ধু বাবু রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের তৃতীয়া কন্যা ও দ্বিতীয় পুত্রের নামকরণ উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় গমন করেন। কলিকাতা আহীরিটোলা উন্নতিবিধায়িনী সভায় "সমাজতত্ত্ব বিষয়ে কতকগুলি স্থূল স্থূল কথা" বিষয়ে একটী বক্তৃতা দেন। ছাত্রসমাজের বিগত অধিবেশনে ছাত্র সমাজের বর্ত্তমান বর্ষের কার্য্য আরম্ভ উপলক্ষে "ছাত্র জীবনের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য" বিষয়ে একটী বক্তৃতা করিয়াছেন। ইনি এখন কলিকাতাতে অবস্থান করিতেছেন।

বাবু শশিভূষণ বসু—হিজলাবট গ্রামে অবস্থিতি করিয়া আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু চাঁদমোহন মৈত্র মহাশয়ের ভবনে প্রায় নিত্য পারিবারিক উপাসনাকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন এবং প্রায়ই কুমারখালী ব্রাহ্মসমাজে উপাসনাকার্য্য নির্ব্বাহ ও উপদেশাদি দান করেন এবং তত্রত্য স্কুল গৃহে এক দিবস "বুদ্ধদেবের জীবন ও মত" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন ও সাধারণ লোকদিগের জন্য অন্য এক দিবস আর একটী বক্তৃতা করেন। পাবনা গমন করিয়া স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজ গৃহে "ধর্ম্ম এবং বিশ্বাসের দুর্জ্জয় বল ও পরাক্রম" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন, এবং সমাজে উপাসনা ও উপদেশ দান করেন। ধর্ম্মবন্ধুর জন্য প্রবন্ধ লিখেন। অনেক দিন হইতে তিনি রোগে আক্রান্ত হইয়া রহিয়াছেন, তন্নিবন্ধন তিনি তাঁহার নির্দ্ধারিত কার্য্যক্ষেত্রে যাইতে অক্ষম হইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। এখানে আসিয়াই প্রায় এক সপ্তাহকাল জ্বরভোগ

করেন এবং ঔষধাদি সেবন করিয়া কিছু আরোগ্য লাভ করেন। তৎপরে কোন ছাত্র নিবাসে সায়ংকালে মধ্যে মধ্যে উপাসনা ও আলোচনাদি করেন, এবং ছাত্রোপাসক সমাজে একদিন উপাসনা করেন।

বাবু অঘোর নাথ মুখোপাধ্যায়—২৪ পরগণার বান্ধব সমিতির কতিপয় সভ্যের সহিত দত্তপুকুর, যত্নরহাট, বাদুড়িয়া, রুদ্রপুর, বসিরহাট, জামালপুর, টাকি, শিবহাটী প্রভৃতি পল্লীর কোথাও বা উপাসনা, কোথাও বক্তৃতা, কোথাও বা ধর্ম্মালাপ কোথায় বা ব্রহ্ম সংকীর্ত্তন করিয়াছেন। তৎপরে কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের জন্মোৎসবের পর বড় বেলুন ব্রাহ্ম সমাজের জন্মোৎসব উপলক্ষে তথায় গমন করেন। তথায় দুই দিন উপাসনা নগর সংকীর্ত্তন ও ২।৩ স্থানে প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন। তাহার পর তন্নিকটস্থ হাড়গ্রাম নামক এক পল্লীতে একদিন উপাসনা, ধর্ম্মালাপ, নগর সংকীর্ত্তন ও প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন। তৎপরে বর্দ্ধমানের এক শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মের ভবনে উপাসনা ও ধর্ম্মালাপ করেন। তথা হইতে এক মাস মাত্র হইল কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া কোন্নগর ব্রহ্ম মন্দিরে প্রতি রবিবার উপাসনা করিতে গমন করেন ও মধ্যে মধ্যে কখন শিবপুর ও কখন চক্রবেড়ে ব্রাহ্ম সমাজে উপাসনা করিয়াছেন।

দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—বিগত তিন মাসের মধ্যে ইনি কটকে থাকিয়া উৎকল ব্রাহ্মসমাজে সাপ্তাহিক উপাসনায় প্রায় প্রতিবার উপাসনা করিয়াছেন এবং উপদেশ দিয়াছেন; স্থানীয় লোকের সহিত সুবিধা মতে ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলাপ করিয়াছেন এবং কোন কোন ব্যক্তির অনুরোধে তাঁহাদের বাটীতে উপাসনা করিয়াছেন। ২২এ ২৩এ এবং ২৪এ এপ্রেল এই তিন দিন স্থানীয় ছাত্র সমাজের উৎসব হয়। ছাত্র সমাজের উৎসবে আচার্য্যের কার্য্য, শাস্ত্র পাঠ এবং বক্তৃতা করেন। উৎকল ব্রাহ্মসমাজে কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলী না থাকাতে তিনি কতকগুলি নিয়মাবলী প্রস্তত করিয়া তদ্দারা সমাজের পুনর্গঠন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন কটকে অবস্থান কালে কয়েকবার পাদ্রি সাহেবদিগের সহিত খৃষ্টধর্ম্ম ও ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ে আলাপ করিয়াছেন। ইতিমধ্যে ২৯শে মে দিবসে তিনি কটক হইতে ঢেঙ্কানল যাত্রা করেন, তথায় কয়েকদিন অবস্থিতি করিয়া তত্রত্য রাজার ম্যানেজার ও স্থানীয় লোকদিগের সহিত ধর্ম্মসম্বন্ধে আলোচনা এবং প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন। এথানে অবস্থিতি কালে কয়েকজন পণ্ডিত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসায় তাঁহাদিগের সহিত "হিন্দুশাস্ত্র ও ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ে" আলাপ করেন। তৎপরে ৭ই জুন ঢেঙ্কানল হইতে কটকে ফিরিয়া আসিয়াছেন এবং পূর্ব্বমত কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। ইনি উড়িয়া ভাষা শিক্ষা করিবার জন্যও মধ্যে মধ্যে চেষ্টা করিয়াছেন। এই তিন মাসে ইনি যে যে স্থানে যে যে বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহা নিম্নে দেওয়া হইল।

৯ই এপ্রেল শনিবার—ছাত্র সমাজে 'নৈতিক বল' বিষয়ে বক্তৃতা। ১৩ই এপ্রেল বুধবার—কটক প্রিণ্টিংহলে 'ব্রাহ্ম সমাজ এবং ইহার লক্ষণ' বিষয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতা। ১৬ই এপ্রেল শনিবার—ছাত্রসমাজে 'মানব জীবনের ভিত্তি' বিষয়ে বক্তৃতা। ২৪এ এপ্রেল রবিবার—প্রিণ্টিংহলে ছাত্রসমাজের উৎসবে 'শিক্ষার দায়িত্ব কি' এই বিষয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতা। ৩০এ এপ্রেল শনিবার—ছাত্রসমাজে 'আত্মার পিপাসা' বিষয়ে বক্তৃতা। ১২ই মে বৃহস্পতিবার—কটক টাউন স্কুলে 'হিন্দু জাতির অবনতির কারণ কি' বিষয়ে বক্তৃতা। ৪ঠা জুন শনিবার—ঢেঙ্কানল মহারাজার স্কুল গৃহে 'মানবের উপাস্য কে' এই বিষয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতা। ১৮ই জুন শনিবার—কটক ছাত্রসমাজে 'প্রকৃত বিশ্বাসের লক্ষণ কি' বিষয়ে বক্তৃতা।

এতদ্ভিন্ন কটকে অবস্থান কালে সেখানে আদি ব্রাহ্মসমাজের যে শাখা আছে, তাহার সভ্যদিগের অনুরোধ ক্রমে কয়েকবার তাহাতেও উপাসনাদি করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণপ্রসাদ—বিগত তিন মাসের পূর্ণ কার্য্য-বিবরণ পাওয়া যায় নাই। আমরা 'সুখ-সম্বাদ পাঠে' অবগত হইলাম যে ইনি প্রতি বুধবার সায়ংকালে অযোধ্যা ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা, উপদেশ দান, ও গীতা পাঠাদি করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন একবার গণেশগঞ্জে গমন করিয়া "মুক্তি ও তাহার আবশ্যকতা" বিষয়ে একটী বক্তৃতা করিয়াছেন। কানপুরে গমন করিয়া অনেক ভদ্রলোকের সহিত ধর্ম্মালাপ করিয়াছেন। আলিগঞ্জে মহাবীরের মেলায় উপদেশ দিয়াছেন এবং ইতিমধ্যে একটী যন্ত্রালয় সংস্থাপিত করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বজরং বিহারী—অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া বেহারে অবস্থিতি করিতেছেন।

যাহাতে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সিটি কলেজের বি, এ শ্রেণীতে সপ্তাহে কয়েক ঘণ্টা পড়াইতে পারেন তন্নিমিত্ত সিটি কলেজ কাউনসিল কার্য্য নির্ব্বাহক সভার নিকট এক আবেদন করেন। কার্য্য নির্ব্বাহক সভা এই আবেদন গ্রাহ্য করিয়াছেন। এ জন্য তিনি সিটি কলেজে কয়েক ঘণ্টা নিয়মিত রূপে পড়াইতেছেন। গয়া নিবাসী বাবু তীর্থপ্রসাদ পাঁড়ে মহাশয় প্রচার শিক্ষার্থী হইয়া এক আবেদন করিয়াছেন, তাঁহার আবেদন এখনও বিবেচনাধীন রহিয়াছে।

এতদ্ভিন্ন বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র, উমেশচন্দ্র দত্ত, প্রভৃতি মহোদয়গণ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সহায়তা করিয়াছেন।

নিম্নলিখিত স্থান হইতে প্রচারক মহাশয়দিগের নিমন্ত্রণ আসিয়াছিল।—

রাঁচী, কালনা, মুর্সিদাবাদ, বড়বেলুন, বাঁশবেড়িয়া, বগুড়া, পাবনা, বাগেরহাট, রঙ্গপুর, কুষ্টিয়া, নীলফামারী, কাকিনীয়া, মাদারিপুর, শিবপুর।

দুর্ভিক্ষ—কালনা, কুমারখালি ও ত্রিপুরা হইতে অন্নকষ্ট প্রভৃতি নিবারণার্থ আবেদন আসিয়াছিল। ত্রিপুরা জেলার দরিদ্রদিগকে সাহায্য করিবার জন্য কার্য্য নির্ব্বাহক সভা ১০০৲ টাকা দান করেন। ইহার ৫০৲ টাকা মাত্র প্রেরণ করা হইয়াছে। অবশিষ্ট ৫০৲ টাকা আজিও প্রেরণ করা হয় নাই। কালনা ও

কুমারখালীতে সাহায্য করা কমিটি আবশ্যক মনে করেন নাই।

ব্রহ্মবিদ্যালয়—ব্রহ্মবিদ্যালয়ের কার্য্য কিছুদিন নিয়মিতরূপে চলিয়া গ্রীষ্মাবকাশের জন্য বন্ধ হয়। শীঘ্রই পুনরায় কার্য্য আরম্ভ হইবে।

তত্ত্ববিদ্যা সভা—ইতিমধ্যে সভার তিনটী অধিবেশন হইয়াছে; তাহাতে ক্রমান্বয়ে এই তিন বিষয়ে বক্তৃতা হইয়াছে—(১) হিন্দুযোগের দার্শনিক ভিত্তি; বক্তা বাবু বিপিনচন্দ্র পাল। (২) ঈশ্বরাস্তিত্ব বিষয়ে উপযোগিতার যুক্তি; বক্তা বাবু হীরালাল হালদার, বি, এ। (৩) ব্রহ্মস্বরূপ; বক্তা বাবু সীতানাথ দত্ত। সভার সহযোগে একটী সাপ্তাহিক আলোচনা সভা সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে মাসিক অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা হয়।

পুস্তক প্রচার—এই কমিটি ১ খানি হিন্দি পুস্তক প্রচার করিবার চেষ্টা করিতেছেন, ইহাঁদিগের পরামর্শানুসারে সমাজ বাবু সীতানাথ দত্ত প্রণীত "সাধন বিন্দু" ও বাবু জয়কৃষ্ণ মিত্র প্রণীত "ফুলের মালা" নামক পুস্তক দ্বয়ের ১ম সংস্করণের পুস্তক সমুদায় ক্রয় করিয়াছেন। বাবু জয়কৃষ্ণ মিত্র শেষোক্ত পুস্তকের সত্ব সমাজকে দান করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন।

স্থায়ী প্রচার ফণ্ড—এই ফণ্ডে বিগত তিন মাসের মধ্যে ৬০৷৷৴০ টাকা আদায় হইয়াছে। এক্ষণে এই ফণ্ডে সর্ব্বশুদ্ধ ১৯২০৶১০ টাকা হইয়াছে।

পুস্তকালয়—ইহার বন্দোবস্ত আজিও সব শেষ হয় নাই। আশা করা যায় শীঘ্র ইহার সুন্দর ব্যবস্থা হইবে।

ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার—ইহা পূর্ব্বের মতই চলিতেছে। বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, সীতানাথ দত্ত, ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়দিগের উপর ইহার সম্পাদনের ভার রহিয়াছে। ইহার আর্থিক অবস্থা এখনও ভাল হয় নাই।

তত্ত্বকৌমুদী—বাবু সীতানাথ দত্ত ও বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়গণ ইহার সম্পাদকের কাজ পরিত্যাগ করায় বাবু আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহার আর্থিক অবস্থা মন্দ নহে।

ফাইনেন্স সবকমিটি—সমাজের অর্থ সম্বন্ধে সমস্ত ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত এই সবকমিটি সংস্থাপিত হইয়াছে।

কলিকাতাস্থ উপাসকমণ্ডলী—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কলিকাতাস্থ উপাসক মণ্ডলীর বিগত ৩ মাসের মধ্যে ৩০এ চৈত্র বর্ষশেষ উপলক্ষে ও ১লা বৈশাখ নববর্ষ উপলক্ষে উৎসব হইয়াছে, এবং নিয়মিতরূপে সাপ্তাহিক উপাসনার কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, এই সময়ের মধ্যে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র, বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, বাবু সীতানাথ দত্ত মহাশয়গণ উপাসনার কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন প্রতি মঙ্গলবার সঙ্গত সভার অধিবেশন নিয়মিতরূপে হইয়াছে।

ছাত্র সমাজ—গ্রীষ্মাবকাশ নিবন্ধন স্কুল ও কালেজ সকল বন্ধ থাকায় ছাত্রসমাজের কার্য্য বন্ধ ছিল। ছুটীর পর বিদ্যালয় সকলের কার্য্য আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রসমাজেরও কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এই সমাজে একটী বক্তৃতা করিয়াছেন।

দাতব্য বিভাগ—বিগত তিন মাসে সর্ব্বশুদ্ধ ২৩ খানি সাহায্যপ্রার্থীর আবেদন পত্র আসিয়াছে, তাহার মধ্যে কয়েক খানির সাহায্য মঞ্জুর হইয়াছে, অবশিষ্টগুলির সম্বন্ধে এখনও কিছু স্থির হয় নাই, কেবল কয়েকখানি অগ্রাহ্য হইয়াছে। সাহায্যপ্রার্থীদিগের মধ্যে ২ জন এণ্ট্রান্স ও একজন এল, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। দাতব্য বিভাগ হইতে সাহায্য প্রাপ্ত ছাত্রদিগের মধ্যে ১০ জন ছাত্রকে সিটি কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয় অর্দ্ধ বেতনে ভর্ত্তি করিয়া আমাদিগের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। বর্ত্তমানে সর্ব্বশুদ্ধ ৩২ জন লোকে সাহায্য পাইতেছেন। সাহায্যের মোট সংখ্যা ৫৩৲ টাকা, এতদ্ভিন্ন পুস্তক খরিদের জন্যও কিছু কিছু সাহায্য করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার প্রণীত "উপাসনাই ধর্ম্মের প্রাণ" নামক পুস্তকের ৯৯ খণ্ড দাতব্য বিভাগে দান করিয়া আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। স্বর্গীয় ভ্রাতা রাধাচরণ ঘোষের উইলানুসারে এককালীন দান ২০৲ টাকা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

হিতসাধকমণ্ডলী, ব্রাহ্মবন্ধু সভা ও রবিবাসরীয় নৈতিক বিদ্যালয়ের কোন কার্য্য বিবরণ পাওয়া যায় নাই।

নূতন সমাজ—চট্টগ্রাম, নিবাধই, টাঙ্গাইল, বজ্রযোগিনী ও রঙ্গপুরে এক একটী নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ডিব্রুগড়ে একটী নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠিত ও একটী ছাত্রসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে।

অনুষ্ঠান—আমরা যতদূর সংবাদ পাইয়াছি তাহাতে জানিয়াছি যে এই তিন মাসের মধ্যে ৬টী জাতকর্ম্ম ও নামকরণ, ২টী বিবাহ, ১টী গৃহ প্রবেশ ও ২টী শ্রাদ্ধ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে।

মৃত্যু—বোম্বাইপ্রদেশনিবাসী লক্ষ্মণগণেশ মঞ্জ, নওগাঁস্থ বাবু শরচ্চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের কন্যা ও হটনা নিবাসী বাবু কালীকিশোর বিশ্বাস মহাশয়ের পত্নী ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিল্‌ডিং ফণ্ড কমিটীর সংক্ষিপ্ত আয় ব্যয় বিবরণ।

জমা		খরচ	
চাঁদা আদায়	১৯৲	ক্ষুদ্রব্যয়	।৴০
মৃত্যুকালে দান	২০৲	হাওলাত দান	১৯০৷৷৵১০
ঋণ আদায় প্রচারক নিবাসের জন্য যে ৪০০ শত টাকা ঋণ দেওয়া হয় তন্মধ্যে আদায়	১০০৲	পুকুর ভরাটির দরুণ হাওলাত	৩১।০
			২২২৶১০
ঋণশোধার্থ চাঁদাআদায়	৩৲	হস্তে স্থিত নগদ ও	
দানাধারে প্রাপ্ত	২৵৫	ষ্টক নোট	১৮৮৷৷৫
	১৪৪৵৫		৪১০৷৷৶১৫
পূর্ব্ব স্থিত	২৬৬৷৷৴১০		
	৪১০৷৷৶১৫		

মন্দিরের ঋণ শোধার্থ অধ্যক্ষ সভা স্থির করিয়াছিলেন যে অধ্যক্ষ সভার প্রত্যেক সভ্য এবং প্রত্যেক প্রতিনিধি ১০৲ দশ টাকা করিয়া দিয়া বিল্‌ডিং ফণ্ডের ঋণ শোধ করিয়া ফেলেন, কিন্তু সেই প্রস্তাব অনুসারে অতি অল্প সংখ্যক সভ্যই (১২টী সভ্য) টাকা দিয়াছেন। অবশিষ্ট সভ্যগণ যদি ঐ প্রস্তাবানুসারে টাকা দেন তাহা হইলে অতি সহজেই ঋণ শোধ হইতে পারে। আশা করা যায় এবার অধ্যক্ষ সভা বিশেষ মনোযোগী হইয়া মন্দিরটীকে ঋণমুক্ত করিবেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ১৮৮৭ সালের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক আয় ব্যয়ের বিবরণ।

আয়		ব্যয়	
প্রচার দান বার্ষিক	৪৩৲	প্রচার ব্যয়	৪১৩৸৵১০
ঐ মাসিক	১৫৪।০	কর্ম্মচারীর বেতন	৯৭৸৶১৫
ঐ এককালীন	৪১।০	মুদ্রাঙ্কণ ব্যয়	৯৲
প্রচার ফণ্ডে প্রাপ্ত		ডাকমাশুল	৩।৵০
চাউলের মূল্য	॥০	সিটী কলেজ (ব্রাহ্ম	
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ		ছাত্রদিগের বেতন)	৪৭৲
বার্ষিক	১১৯।০	কমিশন দান	৸৵০
ঐ মাসিক	২৮॥০	বিবিধ	১৫॥৫
ঐ এককালীন	২৬৸৵০	স্থায়ী প্রচার ফণ্ড*	৬৪৯৸৵১০
শুভকর্ম্মের দান	১২৲	গচ্ছিত শোধ	৫৲
তত্ত্বকৌমুদীর কর্ম্মচারীর		ঋণ দান	২।৵০
বেতন হিসাবে	৩২৲	পাথেয়	৩১॥৶১৫
বিবিধ হিসাবে	।০	পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ	
সিটী কলেজ (ব্রাহ্ম		গোস্বামীর মাসিক	২০৲
ছাত্রদিগের বেতন)	৪৭৲	হাওলাত শোধ	৯৲
স্থায়ী প্রচার ফণ্ড	৩০৲		
গচ্ছিত	২৪।৵		১৩০৫॥১৫
পাথেয়	২৬৲	স্থিত	৫১৴৫
হাওলাত	৯।০		
			১৩৫৬॥৵০
	৬৮৪॥০		
পূর্ব্বের স্থিত	৬৭২৵০		
	১৩৫৬॥৵০		

স্থায়ী প্রচার ফণ্ডের গত মে ও জুন মাসের হিসাব।

আয়		ব্যয়	
চাঁদা আদায়	৩০॥৵০	মনিঅর্ডার কমিশন	৴০
পূর্ব্বের স্থিত	১৮৮৯॥৴১০	স্থিত	১৯২০৶১০
	১৯২০।১০		১৯২০।১০

স্থিতের জায়—

ধার দেওয়া আছে	১৮৮৯।৴
নগদ মজুদ	৩০৸৵১০
	১৯২০৶১০

*গত মে মাস হইতে স্থায়ী প্রচার ফণ্ডের হিসাব জেনেরল ফণ্ড হইতে স্বতন্ত্র করা হইয়াছে এজন্য ৬৪৯৸৵১০ খরচ দেখান হইল।

পুস্তকের হিসাব

আয়		ব্যয়	
পুস্তক বিক্রয়ের বাকী		পুস্তক বাঁধাই	১৫৲
মূল্য আদায়	১৫৫৸/১২॥	মুদ্রাঙ্কণ	৫৯৵০
নগদ বিক্রয়	১৭৯॥৴১০	অপরের পুস্তক বিক্রয়ের	
সমাজের ১৫৩৸৵০		মূল্য শোধ	২৭৭৷৵০
অপরের ২৫॥৶১০		বিবিধ	২৫
		ডাক মাশুল	৸৵৫
১৭৯॥৴১০		পুস্তকের ডাকমাশুল	১৪৵১৫
কমিশন	১১৫।১৫	পুস্তক খরিদ	৬৩৴৫
পুস্তকের ডাকমাশুল	৩।৶১৫	কমিশন	১১৸/১৫
গচ্ছিত	১০১৸৶১২॥	গচ্ছিত শোধ	৸৵০
	৫৫৬৶৫		৪৪৪৸৵৫
গত ত্রৈমাসিকের		স্থিত	১৬০৪৸৭॥
স্থিত	১৪৯৩৵৭॥		
			২০৪৯॥৴১২॥
	২০৪৯॥৴১২॥		

জায়

হাওলাত দেওয়া আছে	১৫৬০৵
নগদ	৪৪॥৵৭॥
	১৬০৪৸৭॥

ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার।

আয়		ব্যয়	
মূল্য প্রাপ্তি	৩১৯৴১০	ডাকমাশুল	৯৩॥৵০
বিজ্ঞাপন হিসাবে	৩।৶১০	বিবিধ	৮৲১০
বিবিধ	৪৵১০	কর্ম্মচারীর বেতন	৫৫৲
ফেরত জমা	১৩।৵১০	কাগজ	৫৪৵০
হাওলাত	৩০৲	মুদ্রাঙ্কণ	৭৬৶০
পূর্ব্বস্থিত	১৩৮৵০	কমিশন	১৲
		হাওলাত দান	৫০৲
	৫০৮।০		
			৩৩৭৸৶১০
		হস্তেস্থিত	১৭০। ১০

স্থিত টাকার জায়			৫০৮।০
ধার দেওয়া আছে ১৩৫৲		দেনা	
নগদ	৩৫।১০	সাবেক	৫৬৭।০
		জুন পর্য্যন্ত মুদ্রাঙ্কণ	৫০৩৲
	১৭০।১০		
			১০৭০॥০

তত্ত্বকৌমুদী।

আয়		ব্যয়	
মূল্য প্রাপ্তি	৩০৯৸৵১৫	মুদ্রাঙ্কণ	৭৬৸৵০
নগদ বিক্রয়	১৲১০	কাগজ	৪৭৴০

গচ্ছিত		কর্ম্মচারীর বেতন	৩২৲
	———	।৭।৭৭	৯॥৵৫
	৩১৫৸৶৫	ডাকমাশুল	৪০৸০
গত ত্রৈমাসিকের		কমিশন	১৸৵০
স্থিত	৬৩২॥৶১০		———
	———		২০৫৶৫
	৯৪৮॥৵১৫	স্থিত	৭৪৩৷৶১
			৯৪৮॥৵১৫

জায়-

হাওলাত দেওয়া আছে	৬২৪৸৵১০
নগদ	১১৮॥৴০
	———
	৭৪৩৷৶১০

দাতব্য বিভাগের হিসাব।

আয়		ব্যয়	
এককালীন দান	৭৲	মাসিক	৯৮॥০
মাসিক চাঁদা	২৵০	এককালীন	১৪৷৴০
স্বর্গীয় রাধাচরণ ঘোষের		ডাকমাশুল	১॥০
উইলানুসারে দান	২০৲	বিবিধ	।০
কোন বন্ধু কর্ত্তৃক সংগৃহীত	১৷৵০		
,, একখানি বস্ত্র	॥০		১১৪॥৴০
শুভকর্ম্মের দান	২৲	স্থিত	১৩১॥১৫
পুস্তক বিক্রয় করিয়া	।৶১০		———
	———	মোট	২৪৬/১৫
	৩৩৷৶১০		
গত বারের স্থিত	২১২॥৵৫		
মোট	২৪৬/১৫		

হস্তেস্থিত টাকার জায়—

ব্যাঙ্কে	১০০৲
নগদ মজুদ	৩১॥১৫
	১৩১॥১৫

সম্পাদকীয় মন্তব্য

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে আমাদের কলিকাতাস্থ মন্দিরের কোন নির্দ্দিষ্ট আচার্য্য নাই। রবিবারে কে বেদীর কার্য্য করিবেন পূর্ব্বদিবস তাহা ঠিক্ হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে উপাসক মণ্ডলীর অবস্থা যে শোচনীয় হইয়া উঠিবে ইহাতে বিচিত্র কি? ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য সাধারণে্য প্রচার করা রবিবাসরীয় উপাসনার অন্যতর উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু উপাসক মণ্ডলীগঠন যে উহার প্রধান লক্ষ্য থাকা উচিত, ইহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। আমরা মনে করি যে উপাসক মণ্ডলী ও আচার্য্য একটী শরীর। যেমন সকল অঙ্গ অল্পাধিক পরিমাণে সাহায্য না করিলে শরীরের কোন কার্য্য সিদ্ধ হয় না, তেমনই মণ্ডলী ও আচার্য্য সমবেতভাবে চেষ্টা না করিলে বিশেষ কোন উন্নতি লাভের আশা নাই। সপ্তাহে একবার আসিয়া সাধারণ উপসনায় যোগ দিলে যে মণ্ডলী-গঠন হয় না, উপাসক মণ্ডলীর বর্ত্তমান বিচ্ছিন্ন ভাবই, তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ। এখানকার মণ্ডলী কোথায় মফঃস্বলস্থ মণ্ডলীর আদর্শ হইবে, না ইহার বন্ধন মফঃস্বল অপেক্ষা শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। যখন সপ্তাহের মধ্যে কেহ বাঁচিল কি মরিল, তাহার তত্ত্ব লইবার লোক নাই, দুই সপ্তাহ মন্দিরে কেহ না গেলে, তাহার জন্য কেহ চিন্তিত হওয়া আবশ্যক মনে করেন না, তখন আমরা মণ্ডলী নামের যোগ্য কি না সে বিষয়ে বিলক্ষণ সন্দেহ হয়। মণ্ডলীর হিতাহিতের জন্য যে উপদেষ্টা আপনাকে দায়ী মনে না করেন, যিনি মণ্ডলীর সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী না হন, তিনি উপদেষ্টা হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাকে আচার্য্য বলিতে পারি না। আচার্য্য নিয়োগ প্রণালীর আশু সংশোধন অতীব আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

আইনদ্বারা বাল্য বিবাহ রহিত করা যুক্তিসিদ্ধ কি না, এই বিষয়ে শ্রীযুক্ত বাবু জয়গোবিন্দ সোম সম্প্রতি এক খানি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন, তদুপলক্ষে সম্বাদ পত্রে আজি কালি একপ্রকার বেশ আন্দোলন চলিতেছে। সোম মহাশয় বলেন, যে বিগত তিন হাজার বৎসর হইতে ভারতবর্ষে বাল্যবিবাহ প্রচলিত। কিন্তু এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, যে এই প্রথা প্রচলিত থাকাতে ভারতবাসীর দৈহিক বা মানসিক কোন প্রকার অনিষ্ট হইয়াছে; বরং দেখা যায় যে বাল্যবিবাহ দম্পতিদিগের মধ্যে চিরকালই অনুরাগ বৃদ্ধি ও ব্যভিচার দমন করিয়াছে। বাল্যবিবাহ সমর্থন করিয়া তিনি আরও কয়েকটী যুক্তি দেখাইয়াছেন, সে সকল এখন বিস্তারিত করিয়া বলিব না। বারান্তরে ঐ সকল যুক্তির বিরুদ্ধে যাহা বলিবার আছে, তাহা প্রকাশ করিব। এখন আমরা কেবল একটী মাত্র কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হইব। ভাল মানিলাম, যে বাল্যবিবাহ অনেক সুফল প্রসব করিয়া থাকে, তাই বলিয়া কি উক্ত বিবাহ ন্যায় ও ধর্ম্মসঙ্গত হইবে? ধর্ম্মাধর্ম্ম, সত্যাসত্যের বিচার কি কেবল ফলাফল দেখিয়া হইবে? সোম মহাশয়ের একজন সমধর্ম্মী যে বলিয়াছেন, "আমাদের বয়ঃস্থা স্ত্রীলোকদিগকে সিন্ধুকে আবদ্ধ করিলে হয়ত তাঁহারা সচ্চরিত্র থাকিতে পারেন, কিন্তু তাই বলিয়া কি তাঁহাদিগকে সিন্ধুকে আবদ্ধ করিতে হইবে? তাঁহাদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে ইহা কি দেখিতে হইবে না, যে তাঁহাদিগকে বন্দী করিতে আমাদের কোন অধিকার আছে কিনা?" ইহা ঠিক্ কথা। বিদ্যালয়ে গেলে অন্য ছেলেদের সঙ্গে মিশিয়া অসচ্চরিত্র হইবে বলিয়া কে আপন সন্তানকে বিদ্যালয়ে পাঠাইতে ক্ষান্ত হন? স্বাধীনতা প্রত্যেক মানবের ঈশ্বরদত্ত সম্পত্তি—স্বাধীনতার অপব্যবহারের সম্ভাবনা আছে বলিয়া

যিনি অধীনতা প্রবর্ত্তন করিতে পারেন, তিনি বর্ত্তমান শতাব্দীর লোক নহেন। বিবাহ মানব জীবনের একটী গুরুতর ঘটনা, এমন কি সর্ব্বপ্রধান বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। ইহার উপরে সমগ্র পার্থিব জীবনের সুখ দুঃখ অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। এরূপ কার্য্যে স্বাধীন ভাবে মনোনয়ন করিবার প্রত্যেক মনুষ্যের অখণ্ড ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে। বাল্যবিবাহবাদিগণ এই অধিকার বিলুপ্ত করিতে চান বলিয়া তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের সহানুভূতি হয় না। ফলাফল লইয়া বাহিরে বাহিরে যুক্তিকৌশল প্রয়োগ করিলে কি হইবে? বাল্যবিবাহবাদী ও স্বাধীনবিবাহবাদীতে মূলেই পার্থক্য। বাল্যবিবাহবাদী বলেন, 'বিবাহে অধীন ভাবে চলিয়া এপর্য্যন্ত কাহারও অনিষ্ট হয় নাই, এখন স্বাধীন হইতে কেন ইচ্ছা কর?' স্বাধীনতাবাদী উচ্চতর ভূমির উপরে দণ্ডায়মান হইয়া বলেন, 'স্বাধীনতা ঈশ্বরের দান, উহাতে প্রত্যেক মানব সন্তানের অখণ্ড অধিকার, আমি কেমন করিয়া রমণীকুলকে উহা হইতে বঞ্চিত করিব?'

রুক্মা বাইয়ের মোকদ্দমার কাগজ পত্র ভারত গবর্ণমেণ্ট স্থানীয় গবর্ণমেণ্টদিগকে পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে বিবাহ সত্ত্ব পুনঃস্থাপনের মোকদ্দমার ডিক্রী অমান্য করিলে দৈহিক শাস্তি দিবার এখন যে বিধান আছে, তাহার কোন পরিবর্ত্তন করা উচিত কিনা। এখন একজন রমণী নিষ্ঠুরতা কি অন্য কোন ন্যায়সঙ্গত কারণেও যদি স্বামিসহবাসে অনিচ্ছুক হন, তবে বর্ত্তমান আইনানুসারে তাঁহার কারাদণ্ড হইতে পারে। ইহা হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের বিধান নহে, ইংলণ্ডে এই বিধি পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, কয়েক বৎসর হইল উঠিয়া গিয়াছে। ভারত গবর্ণমেণ্ট জানিতে চাহিয়াছেন যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টেরা এই বিষয়ে ইংলণ্ড ও ভারতের আইন সমান করা আবশ্যক মনে করেন কিনা? যে রমণী ইচ্ছা করিয়া স্বামীর নিকট যাইতে চায় না, বলপ্রয়োগপূর্ব্বক তাহাকে স্বামীর কাছে থাকিতে বাধ্য করা যে কিরূপে ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। স্বামী হইতে পৃথক থাকিবার কারণ যদি ব্যভিচার হয়, তাহা হইলে দণ্ড বিধি আইন অনুসারে তাহার উপযুক্ত দণ্ডের ব্যবস্থা হইতে পারে। দেওয়ানী কার্য্যবিধিতে তাঁহার কারাদণ্ডের স্বতন্ত্র বিধানের প্রয়োজন কি? যে অপরাধ ব্যভিচার মিশ্রিত না হইলে অধিকাংশ স্থলেই অপরাধ বলিয়াই গণ্য হইতে পারে না, ব্যভিচারের দণ্ডের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা সত্বে, সে অপরাধের জন্য পৃথক কারাদণ্ড ব্যবস্থা করা যে নিতান্ত অন্যায়, যুক্তিবিরুদ্ধ ও অনাবশ্যক, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

সংবাদ।

ব্রাহ্মবন্ধু সভা—গত ৩রা আষাঢ় বৃহস্পতিবার ব্রাহ্মবন্ধু সভার যে অধিবেশন হয়, তাহাতে "উপাসনা ও উপাসক মণ্ডলী" সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। বাবু মোহিনীমোহন রায় আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা করেন। তাঁহার কথার সার মর্ম্ম এই যে, জ্ঞান, প্রেম ও পুণ্য দ্বারা পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার যে যোগ তাহাই উপাসনা। কিন্তু জ্ঞান, প্রেম ও পুণ্যই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য; সুতরাং আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য বস্তু লাভ করিতে হইলে উপাসনা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। ব্রাহ্মসমাজে প্রকাশ্য উপাসনার যে পদ্ধতি প্রচলিত আছে, তাহা নির্জ্জন উপাসনারও বিশেষ উপযোগী। উহা বা উহার তুল্য অন্য কোন পদ্ধতি আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। কারণ, উহা দ্বারা জ্ঞান প্রীতি ও পবিত্রতার সমঞ্জসভাবে পরিচালনা হয়। বক্তার মতে আমাদের বর্ত্তমান আধ্যাত্মিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। তাঁহার মতে জীবনের আদর্শ পরিষ্কাররূপে হৃদয়ঙ্গম না করা এবং আচার্য্য ও উপাসক মণ্ডলীর মধ্যে এবং উপাসকদিগের পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের অভাব আমাদের এই দুরবস্থার প্রধান কারণ। তাঁহার মতে উপাসক মণ্ডলীর আধ্যাত্মিক উন্নতির চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকাই আচার্য্যের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। তাঁহার উপর সমাজের অন্যান্য কার্য্যের ভার যত অল্প থাকে ততই ভাল। বক্তৃতান্তে যে আলোচনা হয় তাহাতে বাবু সীতানাথ দত্ত, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ পি, কে, রায় ও চণ্ডীচরণ সেন স্বীয় স্বীয় মত প্রকাশ করেন। গত পূর্ব্ব বৃহস্পতিবার এই বিষয়ের পুনরালোচনা হয়। তাহাতে বাবু কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়, গুরুচরণ মহলানবিশ, শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী, হরনাথ বসু, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও পূর্ব্ব সভার কয়েক জন বক্তা নিজ নিজ মত প্রকাশ করেন। কলিকাতাস্থ উপাসক মণ্ডলীর যে একজন বিশেষ ভারপ্রাপ্ত আচার্য্য স্থায়িরূপে থাকা নিতান্ত প্রয়োজনীয় তাহা উপস্থিত ব্যক্তি মাত্রেই অনুভব করিয়াছেন।

প্রচারকার্য্য—ময়মনসিংহের যে সকল ব্রাহ্ম কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতায় অবস্থিতি করিতেছেন তাঁহারা উক্ত জেলায় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য "ময়মনসিংহ প্রচার সভা" নামে একটী সভা স্থাপন করিয়াছেন। টাঙ্গাইলে উহার একটী শাখা সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। টাঙ্গাইল হইতে উক্ত শাখা সভার সম্পাদক লিখিয়াছেন যে গ্রীষ্মের বন্ধের সময় বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র তথায় গিয়া বক্তৃতা ও অন্যান্য উপায়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা করেন। সম্প্রতি স্থানাভাববশতঃ টাঙ্গাইল বিভাগের স্কুল সব্‌ইনেস্পেক্টর বাবু মহিমচন্দ্র বসুর বাসায় উক্ত সভার কার্য্যাদি চলিতেছে। ময়মনসিংহ ইনষ্টিটিউশনের শিক্ষক বাবু গুরুগোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর উপর এক বৎসরের জন্য টাঙ্গাইল ও তৎসন্নিহিত স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবার ভার প্রদত্ত হইয়াছে।

ব্রাহ্ম বিবাহ বিধি—১৮৭২ সালের ৩ আইন সম্পর্কে বিবাহের বয়স বৃদ্ধি করিবার যে প্রস্তাব হইয়াছে তৎসম্বন্ধে আমরা তিনখানি পত্র পাইয়াছি। স্থানাভাববশতঃ এবারে ও গতবারে তাহার একখানিও প্রকাশিত হয় নাই। লেখকগণ তজ্জন্য অপরাধ লইবেন না।

১৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিসন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র দত্ত দ্বারা ৩২এ আষাঢ় মুদ্রিত ও ২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১০ম ভাগ। ৮ম সংখ্যা।

১৬ই শ্রাবণ রবিবার, ১৮০৯ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৮

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

পূজার আয়োজন।

"দূরে থাকা নাহি সাজে।"

বাঁধিয়া প্রেমের জালে, দূরে থাকা নাহি সাজে,
থাকিতে অন্যের কাছে, প্রাণে এবে বড় বাজে।
কি যাদু করেছ প্রাণে, জান তুমি যাদুকর,
চিত দেখি ফিরে ফিরে পড়ে তব পদপর।
আর কি জীবনসখা, মন আছে নিজ বশে,
ভুলিয়া তোমায় রব, মাতিয়া বিষয় রসে?
নিতান্ত অধীন আমি হয়েছি চোখের তব,
তোমার চাহনি, নাথ! মম অতুল বিভব।
সম্মুখে আসন পা'তি, বসিতে বলি না তায়,
তোমার আমার মাঝে প্রাণ (ও) থাকা বড় দায়।
হৃদয় আঁচল তাই, পেতে দিতেছি তোমায়,
কাঙ্গালের নিধি কি হে এসে বসিবে তথায়?
ভরসা হয় না বলি, বসো মলিন জীবনে,
তোমার কথায় জোর পাই, আশা আসে মনে।
আরো কাছে, আরো কাছে, এইবার দিলে ধরা,
প্রাণাগারে রেখে দিব, চিরবন্দী করে ত্বরা।

যখন তোমার আলোক প্রাণে উজ্জল থাকে, তখন মনে হয় না যে আর কখন পতন হইবে; যখন বুকে হাত দিয়া বুঝিতে পারি যে, তুমি প্রাণে প্রবেশ করিয়াছ, তখন আর মাটিতে পা ফেলিতে চাই না। কিন্তু যেই তোমার আলোক ম্লান হইয়া যায়, অমনি আমি প্রেম-বিহীন পক্ষী, জল-বিহীন নদী, প্রাণ বিহীন প্রাণী ও অর্থ বিহীন অর্থাধারের মত অপদার্থ ও অসার হইয়া পড়ি। তুমি বার বার দেখাইলে যে, তোমা ভিন্ন আমার প্রাণের কোনই অর্থ থাকে না, তবু আমার চৈতন্য হইল না! কলঙ্কী অস্পৃশ্য হ'য়ে "শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ" তোমাকে প্রাণে নিত্য প্রকাশিত থাকিতে বলিতে কি আমার সাহস হয়? একটু একটু যে তোমাকে পাই, ইহাতেই আমার জন্ম সফল হইতেছে, মনে করি। তোমার উপর কি আমার জোর করা সাজে?

তুমি যে আমাকে সদাই চাও, আমি তাহা বেশ বুঝিতেছি, মুক্তকণ্ঠে আমি তোমার চাওয়ার সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু আমি তোমাকে সদাই চাই কিনা, তুমিই বলিতে পার। তোমার প্রেম আস্তে আস্তে আসিয়া আমার প্রাণকে অধিকার করিতেছে, কিন্তু আমার প্রেম ধীরে ধীরে তোমাকে অধিকার করিতে সমর্থ হইতেছে কিনা তুমিই জান। আমার তত্ত্ব তুমি যেমন জান, তোমার তত্ত্বও কি আমি তেমনি জানি? তোমার গুপ্তচর নানা-বেশে আমার মনে ফিরিতেছে। আমার মন তো অনেক সময়ে বলে যে, সে তোমাকে ভাল বাসে, কিন্তু আমি তাহার কথা মানি না। তোমার কাছে সকল তত্ত্ব প্রকাশিত, আমার তীব্র সমালোচনা কর। তোমার শ্রীমুখ হইতে যত দিন না শুনিতেছি যে, আমার প্রেম তোমাকে ছুঁইয়াছে, ততদিন আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারি না। তুমি যখন আমাকে প্রেমিক বলিয়া ডাকিবে, তখন বুঝিব যে আমার জীবন সার্থক হইয়াছে।

আমি কি বলিতে পারি, ধন চাই না, মান চাই না, বন্ধুতার বা ঐশ্বর্য্যের বাসনা রাখি না, ভালবাসার মাধুর্য্য আকাঙ্ক্ষা করি না? মনের নিগূঢ়তম প্রদেশে প্রবেশ করিয়া দেখি যে, প্রভু ব্যতীত আরও কয়েকজন উপদেবতাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। তোমার পণ তো সামান্য নহে, তুমি বিভক্ত প্রেম গ্রহণ কর না। সর্ব্বস্ব পণ না করিলে তোমায় পাওয়া যায় না। সর্ব্বস্ব দিতে পারিতেছি না বলিয়া সদাই আপনার সঙ্গে বিবাদ করিয়া করিয়া একরূপ পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। প্রভু! বারমাস কি উজান ব'য়ে যাওয়া যায়? নিরাশ হইবার পূর্ব্বে আমার একটা ব্যবস্থা কর। আমার যদি দিতে বিলম্ব থাকে, তুমি কেন মনটাকে বল প্রকাশ করে হরণ করে সকল জঞ্জাল মিটাইয়া দেওনা! মানুষ হ'য়ে তোমাকে কাজের উপদেশ দিতে পারি না। তুমি কেমন করে আমাকে ত্রাণ করিবে, তোমাকে আমার সে কথা বলা কি ভাল দেখায়? তোমার

যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক, মনটা কিন্তু বড় চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছে, তাই তোমার ইচ্ছা শীঘ্র পূর্ণ করিতে এত অনুরোধ করিতেছি।

আমি তো কিছু সঞ্চয় করিতে পারি নাই যে, নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিব। আমি রোজ আনি, রোজ খাই; সকাল বেলা তোমার কাছে মাগিয়া পাতিয়া যাহা লাভ করি, তাহাতেই কষ্টে দিনপাত করি। সময়ে সময়ে রোজ চালানই আমার দায় হইয়া উঠে। প্রভু! আমার যাহা দরকার এখন তার চেয়ে কিছু কিছু বেশী করে দিও, নহিলে জমা করিতে পারিব না; আর জমা না করিলে বিপদ দুর্দ্দিনে কি অনাহারে মারা যাইব? আমার ঝুলি ভরিয়া আজ দান কর, তোমার ঐশ্বর্য্য সব তো আমারই জন্য; আমি যদিও তোমার কাছে ভিখারী, কিন্তু সৃষ্টির আমি রাজা। তুমিই আমাকে এই পদ দিয়াছ। দাতার শিরোমণি, আজ আশাতীত দান করিয়া ভিখারীকে একবার অবাক্ করিয়া দেও দেখি। আর যদি তাহা না দেও, তবে এমন একটী স্বর্গের ঝুলি দাও, যে ঝাড়িবামাত্র তাহা হইতে প্রয়োজনীয় ধর্ম্মবল ও পবিত্রতা পাইতে পারি।

আমার এত বড় স্পর্দ্ধা যে আমি তোমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলি! রাজাধিরাজ, বিচারক দণ্ডদাতা তোমার সঙ্গে আমার প্রবঞ্চনা! আমি তোমার কাছে গিয়া তোমাকে দেখাই যে আমি তোমারই, খানিক পরে আবার সংসারে আসিয়া সংসারকে বলি আমি তাহারই। আমি তবে কপট,—মিথ্যাবাদী। প্রভু এ কপটতা ও অসত্য ব্যবহারে দোষী না হয়ে জীবন কাটান কি সহজ কথা? পদে পদে আপনার দোষ দেখিতে পাই, আপনাকে আপনার মুখ দেখাইতে ইচ্ছা হয় না, জানিনা কি গুণ দেখিয়া তুমি মানবাত্মাকে প্রেম কর। আমার এ লুকোচুরি খেলা রোগ দূর কর। সরলতার শিষ্য কর। তুমি হক্কে প্রাণ, তোমার কাছে প্রাণের কথা লুকাইলে চলিবে কেন?

তোমার কাজের জন্য এখন অনেক লোকের দরকার। ধর্ম্মরাজ্যের বিরুদ্ধে সংসার, পাপ ও অবিশ্বাস একটী চক্রান্ত করিয়াছে। হুঁসিয়ার লোকের এখন বড়ই আবশ্যক। প্রভু, আমার দ্বারা কি তোমার ক্ষুদ্রতম কাজ (ও) হইতে পারে না? আমার জীবন কি কেবল ভাবিয়াই কাটিয়া যাইবে? যদি তুমি কাজ করিতে বল, তবেই আমার কাজে লাগিতে ভরসা হয়। তোমার কাজ করিতে খুব ইচ্ছা আছে, কিন্তু শক্তি কোথায়? কোমরে যদি জোর থাকে, তবেই তো কাজের সংগ্রামে মাতিতে পারি। তাই মনে হয় যদি তুমি ডাকিয়া কাজের ভার দাও, তাহা হইলেই আমার কাজ করা হয়। তোমার ডাকা তো সামান্য জিনিস নহে, সে ডাকের সঙ্গে সঙ্গে এমনি তাড়িত প্রবাহ ছুটে, যে চিররুগ্ন মৃতপ্রায় আত্মা নিমেষে নবজীবন ও অযুত হস্তীর বল লাভ করে। তবে তোমার ডাক যাহাতে শুনিতে পাই তাহার একটা উপায় কর। বাহিরের কাণ বন্ধ করিয়া দাও, স্বর্গের কর্ণ উন্মুক্ত কর যেন তোমার সুধা বাণী শুনিয়া পিপাসু আত্মার অনেক দিনের সাধ চরিতার্থ হউক।

বাহিরের প্রতিকূলতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমার সংগ্রামের সাধও বর্দ্ধিত হউক। স্বর্গের সেনাপতি তোমার সেনাদলকে বীরত্বের শিক্ষায় শিক্ষিত কর। শত্রুর উল্লাস ও বিকট রব যতই কর্ণ বধির করিবে, ততই যেন প্রাণে উৎসাহ ও উদ্যমের অগ্নি জ্বলিয়া উঠে। সংসারের জন্য, মিথ্যার জন্য, কপটতার জন্য, লোকে প্রাণ দিতে পারে, আর তোমার জন্য, সত্যের জন্য সরলতার জন্য আমি প্রাণ দিতে পারিব না? তোমার অধীনে থাকিয়া সমরে মাতিতে আমার অনেক দিন হইতে অভিলাষ। সে অভিলাষ পূর্ণ করিবার অবসর বুঝি এতদিনে উপস্থিত হইল। তোমার জন্য যদি প্রাণের শোণিতও প্রদান করিতে হয়, তবে কি আপনাকে ভাগ্যবান বলিয়া মনে করিব না?

বড় বিষম সময় পড়িয়াছে। দুদণ্ড যে নিশ্চিন্ত হইয়া তোমার কাছে বসিব তাহার যো নাই। চারিদিকে কত ব্যাঘাত, কত বিঘ্ন! সংসারের কাজ হইতে অবসর লইয়া যেই তোমার কাছে যাইব মনে করিতেছি, অমনি হয় ত কেহ দেখা করিতে আসিলেন। ভাল উপাসনার পর মনে হয় আরও একটু তোমার কাছে বসি, কিন্তু তাহার সুবিধা নাই, তখনই আহার করিয়া কার্য্যে যাইতে হইবে। তোমাকে একেবারে চিরদিনের মত প্রাণের সিংহাসনে বসাইতে না পারিলে আর উপায়ান্তর নাই। ইহা ভিন্ন সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মসাধন করা, তোমাকে লাভ করা অসম্ভব দেখিতেছি। কর্ম্মযোগ চাই—সহস্র কর্ম্মের মধ্যেও প্রাণটা তোমার দিকে ফিরিয়া থাকা চাই। উপাসনাই করি, আর কাজই করি, আর বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে আলাপই করি, সকল সময়ে ও সকল অবস্থার মধ্যেই যাহাতে তোমাকে ধরিয়া থাকিতে পারি, এমন আশীর্ব্বাদ কর। আমার সমস্ত জীবনটাকে উপাসনার জীবন করিয়া দাও। আমি যেন ঘরে বাহিরে, সজনে নির্জ্জনে, জীবনব্যাপী উপাসনায় নিযুক্ত থাকিতে পারি।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

যোগতত্ত্ব।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

আমাদের মানসিক অবস্থা বা কার্য্য সকলকে বিশ্লিষ্ট করিলে তাহার মধ্যে তিনটী উপাদান (Elements) দেখিতে পাওয়া যায়;—(১) জ্ঞান (Knowing) (২) ভাব (Feeling) (৩) ইচ্ছা (Willing)। কার্য্যতঃ এই তিনটী উপাদানের কোন একটীকে স্বতন্ত্র অবস্থিতি করিতে দেখা যায় না।

প্রত্যেক মানসিক অবস্থা ও কার্য্যেই এই তিনটী উপাদান অল্প বা অধিক পরিমাণে উপস্থিত থাকে। জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা এই তিনের পরস্পরের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ট। জ্ঞান ব্যতীত ভাব হয় না, ভাব ব্যতীত ইচ্ছার উৎপত্তি অসম্ভব। তবে প্রত্যেকের পরিমাণের তারতম্য অনুসারে কোনও অবস্থাকে বা জ্ঞানপ্রধান, কোনও অবস্থাকে বা ভাবপ্রধান, আবার কোনও অবস্থাকে বা ইচ্ছাপ্রধান বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে। যদিও জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা আমাদের প্রত্যেক মানসিক কার্য্য বা অবস্থার মধ্যে অল্লাধিক পরিমাণে উপস্থিত থাকে, তথাপি চিন্তার সাহায্যের জন্য এই তিনটীর বিষয় স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে।

পূর্ব্বোল্লিখিত বিভাগ অনুসারে যোগের অবস্থাকেও তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে,—(১) জ্ঞানযোগ বা বিশ্বাস যোগ, (২) ভাবযোগ বা ভক্তিযোগ, (৩) ইচ্ছাযোগ বা কর্ম্মযোগ। কার্য্যতঃ এই তিনের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। যিনি জ্ঞানযোগ দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও প্রকৃতস্বরূপ উজ্জ্বলভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন, বিশ্বাস চক্ষে যিনি পরমেশ্বরকে সত্যরূপে দর্শন করিয়া তাঁহার অস্তিত্ব ও প্রকৃতি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়াছেন, প্রেম ভক্তির স্রোত স্বতঃই তাঁহার হৃদয়ে প্রবাহিত হয়। সৌন্দর্য্যের প্রতি অনুরাগ, মহত্বের প্রতি ভক্তি মানবাত্মার পক্ষে স্বাভাবিক। সৌন্দর্য্য দেখিয়া যাহার প্রাণ আকৃষ্ট হয় না, সে সৌন্দর্য্য দেখে নাই। মহত্ব দেখিয়াও যাহার ভক্তি না হয়, সে মানুষ নয়। ভালবাসা যদি সৌন্দর্য্যের অনুগামী হয়, তবে সেই অনন্ত সৌন্দর্য্যের আধার পরমেশ্বর অপেক্ষা অধিক প্রেমের পাত্র কে হইতে পারে? প্রেম যদি প্রেম আকর্ষণ করে, তবে সেই অনন্ত প্রেমসাগর অপেক্ষা অধিক আকর্ষণ আর কাহার হইতে পারে? সম্বন্ধের ঘনিষ্ঠতা যদি প্রেমের কারণ হয়, তবে সেই প্রাণের প্রাণ পরমেশ্বরকে অতিক্রম করিয়া আর কাহার দিকে হৃদয় আকৃষ্ট হইতে পারে? উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা যদি মানবাত্মার পক্ষে স্বাভাবিক হয়, তবে তাঁহার ন্যায় উপকারী বন্ধু অপেক্ষা অধিক কৃতজ্ঞতার পাত্র আর কে আছে? মহত্বের যদি ভক্তি আকর্ষণ করিবার ক্ষমতা থাকে, তবে সেই অনন্তস্বরূপের দিকে না গিয়া মানুষের ভক্তি আর কোন্ পথ অবলম্বন করিবে?

একদিকে যেমন প্রকৃত প্রেম ভক্তি প্রকৃত জ্ঞানের চির সহচর, অপরদিকে তেমনি প্রেমাস্পদের প্রিয় কার্য্য সাধন কর— আপনার ইচ্ছাকে তাঁহার ইচ্ছার অধীন করা, প্রকৃত প্রেম ভক্তির অবশ্যম্ভাবী ফল। এই সংসারেই দেখিতে পাওয়া যায়, যে যাহাকে অত্যন্ত ভাল বাসে বা ভক্তি করে, সে সাধ্যমত তাহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। এমন কি, প্রণয়ের অনুরোধে লোকে অনেক সময় প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। এই জন্যই দেখা যায় যাঁহারা পরমেশ্বরকে প্রাণের সহিত ভালবাসেন, তাঁহারা যতক্ষণ না আপনার ইচ্ছাকে সম্পূর্ণরূপে তাঁহার ইচ্ছার অধীন করিতে পারেন, যতক্ষণ না আপনাকে সকল বিষয়ে তাঁহার দাস করিয়া ফেলিতে পারেন, ততক্ষণ তাঁহাদের প্রাণ কিছুতেই পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় না। যেখানে দেখিবে জ্ঞান সত্বেও ভক্তির অভাব রহিয়াছে, অথবা ভক্তি সত্বেও সাধুতার বা দাস্য ভাবের অভাব রহিয়াছে, সেখানে নিশ্চয় জানিতে হইবে যে, সে জ্ঞানের সঙ্গে কল্পনা বা অজ্ঞানতা, সে ভক্তির সঙ্গে অন্ধ ভাবুকতা মিশ্রিত আছে। প্রকৃত জ্ঞান, প্রকৃত প্রেম ও প্রকৃত দাস্য পরস্পরের নিত্য সহচর। ইহার একটীর অভাব হইলে অপরগুলির মধ্যে কোনও প্রকার অসম্পূর্ণতা আছে বলিয়া জানিতে হইবে।

যদিও জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য পরস্পরকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, তথাপি চিন্তা ও সাধনের সহায়তার জন্য এই তিনটী বিষয়ের পৃথক্ পৃথক্ আলোচনা করা যাইতে পারে। এই জন্য আমরা আমাদের মানসিক অবস্থা ও কার্য্যের দার্শনিক বিভাগ অনুসারে যোগের অবস্থাকে জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্ম্মযোগ এই তিন ভাগে বিভক্ত করিলাম। পরমেশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ উজ্জ্বল ভাবে উপলব্ধি করা, বাহিরের প্রত্যেক বস্তুতে ও আত্মার মধ্যে সর্ব্বদা তাঁহার প্রত্যক্ষ আবির্ভাব দর্শন করা, তাঁহার সহিত আমাদের আত্মার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ পরিষ্কাররূপে হৃদয়ঙ্গম করা ইহাই জ্ঞানযোগের প্রধান লক্ষ্য। যে বিশ্বাস ব্যতীত আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবেশ করা অসম্ভব, জ্ঞানযোগ দ্বারা সেই বিশ্বাস সমুজ্জ্বল হয়। এই জন্য জ্ঞানযোগ হইতে সাধন আরম্ভ করিয়া ক্রমে যোগের উচ্চতর সোপানে উঠিতে হইবে। চিত্তের একাগ্রতা ভিন্ন জ্ঞানযোগ অসম্ভব। এই কারণে সাধনকালে যাহাতে অন্য কোনও চিন্তা আসিয়া সাধনের ব্যাঘাত না করে, তজ্জন্য বিশেষ উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। বাহিরের ব্যাঘাত দূর করিবার জন্য নির্জ্জন স্থান চাই। কিন্তু ইহা হইলেই যথেষ্ট হইল না। বাহিরের বিঘ্ন অপেক্ষা ভিতরের বিঘ্নই অনেক স্থলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শত্রুতা করে। এমন কি সৎকার্য্য সম্বন্ধীয় চিন্তা হইতেও সাধনের ব্যাঘাত উৎপাদিত হয়। ফলতঃ আমরা পরমেশ্বরকে ছাড়িয়া যে কিছু চিন্তা বা কার্য্য করি, তাহাই আমাদের মনঃসমাধানের পক্ষে বিষম অন্তরায় হইয়া উঠে। এই জন্য ভিতরের বিঘ্ন সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক। নির্জ্জনে বসিয়া ধীর ও শান্তভাবে এমন সকল বিষয় চিন্তা করিতে হইবে যাহাতে ঈশ্বরের সত্তা ও স্বরূপ চিন্তার সাহায্য হইতে পারে। প্রাকৃতিক শোভাসন্দর্শন, আধ্যাত্মিক ভাবোদ্দীপক গ্রন্থ পাঠ, ব্রহ্মসঙ্গীত গান বা শ্রবণ ইত্যাদি দ্বারা অনেক সময় চিত্ত সমাধানের সাহায্য হইয়া থাকে। প্রথম প্রথম যাঁহার যে স্বরূপটী চিন্তা করিতে অধিক ভাল লাগে, তিনি তাহা লইয়া সাধন আরম্ভ করিতে পারেন। কিন্তু ইহা মনে রাখা আবশ্যক যে, আমাদের চিন্তাকে কেবল সেই একটী স্বরূপে বদ্ধ করিয়া রাখিলে সাধন অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। ক্রমে ক্রমে মনকে অন্যান্য স্বরূপ চিন্তনে নিযুক্ত করা অত্যাবশ্যক। এইরূপে আত্মার মধ্যে যতই ব্রহ্মস্ফূর্ত্তি হইতে থাকিবে, ততই আমাদের প্রাণের অনুরাগ পরমেশ্বরের দিকে ধাবিত হইতে থাকিবে, ততই ভক্তি-যোগের পথ পরিষ্কার হইয়া আসিবে, ততই পরমেশ্বরের

প্রিয়কার্য্য সাধনের ইচ্ছা প্রাণের মধ্যে বলবতী হইয়া উঠিবে।

উপরে যাহা বলা হইল তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, চিন্তাই যোগসাধনের একমাত্র পথ। যে জ্ঞানযোগ আধ্যাত্মিক রাজ্যের প্রথম সোপান, চিন্তা ব্যতীত কিছুতেই তাহাতে আরোহণ করা যায় না। সংসার ও রিপুগণের কোলাহল হইতে অবসর লইয়া, ধীর, শান্ত, সংযত ও একাগ্রচিত্তে পরমেশ্বরর স্বরূপ ও তাঁহার সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের বিষয় চিন্তা করিতে হইবে; নানা কার্য্যের ব্যস্ততার মধ্যেও তাঁহার সত্তারূপ আলোকের মধ্যে বসিয়া কার্য্য করিতেছি, এই ভাবটী চিন্তাদ্বারা স্থায়িভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। উঠিতে বসিতে, চলিতে ফিরিতে, আহারে বিহারে, গৃহে কার্য্যালয়ে, পথে ঘাটে, ক্রমাগত পরমেশ্বরের সত্তা ও স্বরূপ চিন্তা করিতে করিতে তবে বিশ্বাস চক্ষু খুলিয়া যাইবে। এই চিন্তার স্রোত যাহাতে অব্যাহত ভাবে চলিতে পারে, তাহার চেষ্টা করা এবং যে প্রক্রিয়া দ্বারা সেই চিন্তার স্রোত অবরুদ্ধ হয়, তাহা সর্ব্ববিষয়ে পরিহার করা ঈশ্বরপিপাসু ব্যক্তি মাত্রেরই প্রধান কর্ত্তব্য।

ব্রহ্মস্বরূপ।*

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কেহ কেহ ঈশ্বরের একত্ব ও অসীমত্ব সপ্রমাণ করিতে গিয়া এইরূপ যুক্তি প্রণালী অবলম্বন করেন—সসীম আছে বলিলেই অসীমও আছে, ইহা বুঝায়। সসীম ও অসীম আপেক্ষিক (relative) শব্দ, একটা অন্যটাকে বুঝায়। আর, সসীম অসীমকে অবলম্বন না করিয়া থাকিতে পারে না; সসীম আছে বলিলে আধাররূপী অসীম আছে ইহাও বুঝায়। এই যুক্তি মূলে ঠিক্, কিন্তু লৌকিক জড়াত্মবাদের পক্ষপাতীর পক্ষে ইহার কোন মূল্যই থাকিতে পারে না। ইহা সংক্ষেপে দেখাইতেছি। সসীম আছে বলিলেই অসীম আছে বুঝায়, ইহা দেশ ও কাল সম্বন্ধে ঠিক, কেননা দেশ কালকে আমরা অসীম ব্যতীত অন্য রকমে ভাবিতে পারি না। সসীম দেশ এবং সসীম কাল ভাবিতে গেলেই ইহাদিগকে অসীম দেশ এবং অসীম কালের অন্তর্ভূত, অংশীভূত বলিয়া ভাবিতে হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু আত্মা সম্বন্ধে ইহা খাটে না। একটী পরিমিত আত্মা তাহার পরিমিত জ্ঞান শক্তি লইয়া বসিয়া আছে, তাহার জ্ঞানের বিষয়রূপী বস্তুসমূহের মধ্যে আবদ্ধ রহিয়াছে, অন্য কোন অপরিমিত আত্মার সহিত তাহার অবশ্যম্ভাবী সম্বন্ধ নাই, এই ভাবনায় দোষ কি? এরূপ পরিমিত জ্ঞানবান্ আত্মা আছে বলিলেই কিছু বুঝায় না যে ইহা একজন অপরিমিত জ্ঞানবান্ আত্মার আশ্রিত বা অন্তর্ভূত। দেশ কাল এবং দেশ কালে অবস্থিত জড় জগতের সহিত যখন আত্মার কোন অবশ্যম্ভাবী সম্বন্ধ নাই, যখন দেশ, কাল ও জড়জগৎ আত্মাকে ছাড়িয়াও থাকিতে পারে, তখন আমাদের কল্পিত পরিমিত আত্মার জ্ঞানের বাহিরে অনন্ত দেশ কাল, অনন্ত জগৎ থাকিতে পারে যাহা কোন জ্ঞানের বিষয়ীভূত নহে, অথবা অসংখ্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জ্ঞানের বিষয়ীভূত। জ্ঞান সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, শক্তি সম্বন্ধেও তাহা খাটে। একটী পরিমিত শক্তি-সম্পন্ন আত্মা আছে, অর্থাৎ এমন এক আত্মা আছে যে ইচ্ছানুরূপ সমস্ত কাজ করিতে পারে না, ইহা বলিলেই কিছু এমন বুঝায় না যে অনন্ত শক্তিশালী অর্থাৎ যিনি সমস্ত কাজই করিতে পারেন এরূপ একজন আত্মা আছেন এবং উক্ত পরিমিত শক্তিশালী আত্মা এই অনন্ত শক্তিশালী আত্মা হইতে উৎপন্ন। পরিমিত শক্তিশালী আত্মা সমূহ নিত্য, অসৃষ্ট হইতে পারে এবং তাহাদের শক্তি এক অনন্ত শক্তি দ্বারা সীমাবদ্ধ না হইয়া পরস্পরের শক্তি দ্বারা সীমাবদ্ধ হইতে পারে। এই আপত্তির উত্তর কোথায়?

এতক্ষণ কেবল ভাঙ্গিতেই গেল, কেবল ভ্রান্ত যুক্তির সমালোচনাতেই গেল। এই কার্য্যে এত সময় দিবার কারণ এই যে বিপদ-সঙ্কুল ভগ্ন গৃহে বাস করিতেছি ইহা বুঝিতে না পারিলে লোকে সুদৃঢ় নিরাপদ গৃহ অন্বেষণ করে না। প্রচলিত দর্শন ও ধর্ম্মবিজ্ঞান প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানের সুদৃঢ় ভিত্তি নহে, ইহা আজকাল ইউরোপে অনেকেই বুঝিতে পারিতেছেন, এবং বুঝিতে পারিয়া দর্শন ও ধর্ম্মবিজ্ঞানের পুনর্গঠনে নিযুক্ত হইয়াছেন এবং আস্তে আস্তে এই বিষয়ে অগ্রসর হইতেছেন। আমাদের উচিত এই কার্য্যে তাঁহাদের সহিত যোগ দিই। প্রকৃত দর্শন অপরীক্ষিত লৌকিক সংস্কার বজায় রাখিবার জন্য ব্যস্ত নহে, প্রকৃত ব্রহ্মবিদ্যা জানেন যে লৌকিক সহজ জ্ঞান অনেক স্থলে কেবল অজ্ঞানতা এবং চিন্তাহীনতার নামান্তর মাত্র। প্রকৃত ব্রহ্মবিদ্যা জগৎ ও মানবাত্মাকে এক দিকে রাখিয়া এই সমুদয় হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটী তৃতীয় বস্তুর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয় না। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু যদি কিছু থাকে, তাহাকে ঈশ্বর বল আর যাহাই বল, তাহা সসীম হইবেই হইবে। প্রকৃত ব্রহ্মবিদ্যা একটী সর্ব্বাধার মহাবস্তুর অন্বেষণ করে যাহার ভিতরে সমুদায় বস্তু, সমুদয় জগৎ অবস্থিত, যাহার সহিত সমস্ত বস্তু অচ্ছেদ্য যোগে আবদ্ধ। "ব্রহ্ম" শব্দের অর্থই এই মহাবস্তু। লোকে তাহা ভুলিয়া গিয়া বুদ্ধি-কল্পিত পরিমিত দেবতাকে ব্রহ্ম বলে। প্রকৃত ব্রহ্মবিদ্যার ভিত্তি দার্শনিক অধ্যাত্মবাদ (Idealism),—যাহা বলে যে দেশকাল এবং দেশকালে অবস্থিত জগৎ কেবল যে জ্ঞানের বিষয়ীভূত তাহা নহে, ইহা জ্ঞানের উপকরণে গঠিত (not only an object of intelligence, but constituted by intelligence.) দেশ, কাল, ইন্দ্রিয় বোধ, একত্ব বহুত্বের সম্বন্ধ, আধার আধেয়ের সম্বন্ধ, কার্য্যকারণের সম্বন্ধ, প্রভৃতি যে সকল উপকরণে জগৎ গঠিত, সেই সমস্তই জ্ঞান-সাপেক্ষ, জ্ঞানে গঠিত (constituted by intelligence) জগৎ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, জ্ঞান-বিচ্যুত হইলে কিছুই নহে। জ্ঞান জগতের কর্ত্তৃকারণ এবং উপাদান কারণ উভয়ই। চিন্তার সহিত চিন্তাকারীর যে সম্বন্ধ, ভাবের সহিত ভাবুকের যে সম্বন্ধ, জগতের সহিত ব্রহ্মের সেই সম্বন্ধ।

* "তত্ত্ববিদ্যা সভায়" শ্রীযুক্ত বাবু সীতানাথ দত্ত কর্ত্তৃক পঠিত প্রবন্ধ।

"জগৎ ও জীবাত্মা ঈশ্বরের আশ্রিত, ঈশ্বর-বিচ্যুত হইয়া থাকিতে পারে না", এই সত্য অধ্যাত্মবাদের নিকট কেবল কথার কথা মাত্র নহে, কেবল অন্ধ বিশ্বাস মাত্র নহে, ইহা আধ্যাত্মবাদের নিকট উজ্জ্বল জ্ঞানের বিষয়। যাহা হউক, অধ্যাত্মবাদ ব্যাখ্যা করা অদ্যকার উদ্দেশ্য নহে। অধ্যাত্মবাদরূপ ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া ব্রহ্মস্বরূপ সম্বন্ধে কতটুকু আলোক পাওয়া যায় দেখা যাউক। ব্রহ্মস্বরূপ সমূহকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়— দার্শনিক স্বরূপ ও নৈতিক স্বরূপ (metaphysical and moral attributes) একত্ব, অসীমতা, সর্ব্বজ্ঞতা, সর্ব্বশক্তিমত্তা প্রভৃতিকে দার্শনিক স্বরূপ এবং পূর্ণ পবিত্রতা প্রভৃতিকে নৈতিক স্বরূপ বলা হয়। প্রথমতঃ দার্শনিক স্বরূপ সমূহের আলোচনা করিব।

দেশ এক। ভিন্ন ভিন্ন দেশখণ্ড ভাবিতে পারি, কিন্তু সমুদায়কেই এক সর্ব্বগ্রাসী দেশের অংশ বলিয়া ভাবিতে হইবে। বিজ্ঞান দেশগত জগতের যতদূর জানিয়াছে তাহার বাহিরেও দেশ আছে, কিন্তু সেই অতি দূরতম দেশও এই জ্ঞাত দেশের সহিত সংযুক্ত; উভয়ই এক অনন্ত দেশের অংশীভূত। কিন্তু অধ্যাত্মবাদ মতে দেশ আত্মার আশ্রিত। দেশ বিষয়-জ্ঞানের মানসিক প্রকরণ (form)। এই অনন্ত দেশের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন অংশ সমূহের যে (synthesis) যোগ এই যোগের কর্ত্তা (unifying principle) কেবল আত্মাই হইতে পারে। সুতরাং বিচিত্র দ্রব্যজাত পূর্ণ এই এক অনন্ত দেশ, এক অনন্ত আত্মার উজ্জ্বল প্রমাণ। প্রমাণ অর্থে ইহা নহে যে ইহা হইতে আমরা তাঁহার অস্তিত্ব অনুমান করিতেছি। প্রমাণ অর্থে প্রকাশ। প্রত্যেক ক্ষুদ্র দেশখণ্ডকে জানিতে গিয়া আমরা পরমাত্মাকে জানি। জগৎ জ্ঞান-গঠিত, জ্ঞান জগতের উপাদান কারণ। আমাদের প্রত্যেক বিষয় জ্ঞানে আমরা বিষয়ের উপাদানরূপী জ্ঞান বস্তুকে জ্ঞাত হই। ক্ষুদ্র বিষয়কে জানিতে গিয়াও অনন্তকে জানি, কেন না বিষয় যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন, ইহাকে জানিতে গেলেই অনন্তের অন্তর্ভূত, অংশীভূত বলিয়া জানিতে হইবে। সুতরাং দেখিতে পাইতেছি এই প্রত্যক্ষীভূত এক অনন্ত দেশে এক অনন্ত জ্ঞান, এক অনন্ত পরমাত্মা প্রকাশিত হইতেছেন। নিকটস্থ, দূরস্থ, সকল বস্তুই তাঁহার অন্তর্ভূত, কিছুই তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না।

তৎপরে, দেশের ন্যায় কালও এক, অনন্ত। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, সমুদায় কাল এক অনন্ত সর্ব্বগ্রাসী কালের অংশীভূত। অতি প্রাচীনতম ভূত, সমগ্র বর্ত্তমান, এবং অতি দূরতম ভবিষ্যৎ, সমুদায়ই এই এক অনন্তকালের অন্তর্ভূত। কিন্তু দেশের ন্যায় কালও আত্মার আশ্রিত, কালও বিষয় জ্ঞানের মানসিক প্রকরণ। কালের ভিন্ন ভিন্ন অংশকে সংযুক্ত করিবার—এক সূত্রে গ্রথিত করিবার ক্ষমতা কেবল এক অদ্বিতীয় আত্মারই থাকিতে পারে। সুতরাং এই এক অনন্তকালের আধাররূপী এক অনন্ত আত্মা বর্ত্তমান আছেন। প্রত্যেক ঘটনার জ্ঞানে সেই পরমাত্মা প্রকাশিত। প্রবহমান ইন্দ্রিয় বোধ সমূহকে স্থায়ী জ্ঞানে পরিণত করিতে পারেন কেবল তিনিই যিনি ভূত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ সমুদায় কালে বর্ত্তমান, অথচ প্রবাহের অতীত, যিনি প্রবাহকে জানিতে পারেন, অথচ প্রবাহের সঙ্গে প্রবাহিত হন না।

এইরূপে আমরা দেখিতেছি এক অদ্বিতীয় অনন্ত পরমাত্মা অনন্ত দেশ কালকে পূর্ণ করিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছেন। জগতের যাহা কিছু, তাহা জড়ই হউক, জীবই হউক, আত্মাই হউক, সমুদায় এই বিরাট পুরুষের অভ্যন্তরে বর্ত্তমান। তাঁহাকে ছাড়িয়া, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে, কোন জড়শক্তি থাকিতে পারে না, কোন আত্মা থাকিতে পারে না। এই অনন্ত বিশ্বে এরূপ শক্তির এরূপ আত্মার স্থান নাই। পরমাত্মা সমুদয় শক্তি সমুদয় জীবাত্মার আধার। এই অনন্ত দেশ ও অনন্ত কালের ভিতরে, বিশেষ বিশেষ স্থানে, বিশেষ বিশেষ কালে যে সকল বস্তু, জীব বা আত্মা উৎপন্ন হয়, সে সমুদায়ই পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন হয়, পরমাত্মাতে অবস্থিতি করে এবং তাঁহার ইচ্ছানুসারে তাঁহাতেই অমর হয়, বা তাঁহাতেই বিলীন হয়। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্ম"। আমরা তাঁহারই জীবনে জীবিত, তাঁহারই জ্ঞানে জ্ঞানী, তাঁহারই ভাবে ভাবুক, তাঁহারই শক্তিতে শক্তিমান্‌। "In Him we live, move and have our being." ঈশ্বর এক অদ্বিতীয়, দেশে সর্ব্বব্যাপী, কালে নিত্য, সর্ব্বাধার, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্‌ এই সকল সত্যের যাহা কিছু আভাস পাইয়াছি, সংক্ষেপে তাহার ব্যাখ্যা করিলাম। এই ব্যাখ্যা যদি উপস্থিত মহোদয়গণের নিকট কোন স্থলে আপত্তিজনক বোধ হয়, ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ব্যাখ্যা দিলে তাহা সাদরে গ্রহণ করিব।

(ক্রমশঃ)

মাদাম গেঁয়োর জীবনী।

ফ্রান্সের অবস্থা।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে ফ্রান্সের অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল।* পুরাবৃত্তকারগণ ফরাসী বিপ্লবের যে সকল কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই সকল কারণ তখন পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। বাহিরের আড়ম্বর ও চাকচিক্যের কিছু অভাব ছিল না; কিন্তু ভিতরে কেবল অসারতা। রাজা ও রাজপারিষদবর্গ সকলেই বক ধার্ম্মিক ছিলেন; তাঁহাদের ধর্ম্মের গোঁড়ামি অতিরিক্ত, কিন্তু চরিত্র অত্যন্ত দূষিত ছিল। সম্ভ্রান্ত গণ্য মান্য লোকের সকলেই অপরিমিতব্যয়ী ও দুশ্চরিত্র, সাধারণ ইতর লোকেরা অজ্ঞানান্ধ ও প্রতারিত। ফ্রান্সের সেনাদল দেশ বিদেশে ফ্রান্সের জয়পতাকা উড্ডীন করিয়া স্বদেশস্থ দেশহিতৈষী স্বাধীনচেতা মহাত্মাগণের শোণিত পান করিত। প্রচারক ও প্রচারের অভাব ছিল না, প্রচারকেরা কিন্তু শ্রোতৃবর্গের প্রাণে অনুতাপাগ্নি প্রজ্জলিত করিতে সমর্থ হইতেন না। নীচাশয়তা ও দুর্দ্দমনীয় দুরাকাঙ্ক্ষা তখন সকলের প্রাণে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করিত। এই ঘোর প্রতিকূলতা, দুরাচার ও অন্তঃসারবিহীন, কপট, মৌখিক ধর্ম্মের রাজত্বকালে

জন্মগ্রহণ করিয়াও উন্নতহৃদয়া মাদাম গেঁয়ো কিরূপে পবিত্রতা ও ঈশ্বর প্রেমের কথা প্রচার করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, এই জীবনীতে আমরা তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব। দুরভিসন্ধি ও নীচতা যতদূর প্রতিবন্ধকতা ঘটাইতে পারে, তাহার কিছুরই ত্রুটি হয় নাই; রাজা ও রাজপুরোহিতবর্গ প্রাণপণে অত্যাচার করিয়াছিলেন; কিন্তু তথাপি এক দিনের জন্যও এই বীর রমণীর হৃদয়ের গভীর ঈশ্বর প্রেম ও কর্ত্তব্যপরায়ণতা বিচলিত বা শিথিল হয় নাই। ঈশ্বরপরায়ণ সাধু মহাত্মগণকে পৃথিবী কবে পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছে?

জন্ম।

১৬৪৮ খৃঃঅব্দের ২৪ মে ফ্রান্সের অন্তঃপাতী মন্তার্জিস গ্রামে এই পবিত্রহৃদয়া রমণী জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতা মেঃ মথ একজন সম্ভ্রান্ত ও গণ্য মান্য লোক ছিলেন। পিতা মাতা উভয়েই, বিশেষতঃ মাদাম গেঁয়োর পিতা ধর্ম্মপরায়ণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। জন্মিবার কিছুকাল পরে তাঁহাদের কন্যা এরূপ উৎকট পীড়ায় আক্রান্ত হয় যে, তাহার বাঁচিবার কোন আশাই ছিল না। কিন্তু ঈশ্বরের বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন পরলোকে গমন করিলে সে উদ্দেশ্য অপূর্ণ রহিবে বলিয়া, রোগের হস্ত হইতে তিনি মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। এই সময়ের উল্লেখ করিয়া তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন, "হে পরমেশ্বর, তোমারই কৃপায় আমার এখনও এই সুখটুকু আছে যে, আমি তোমাকে অনুসন্ধান করিয়াছি, তোমার অনুসরণ করিয়াছি, নির্ম্মল পবিত্র প্রেমের বলে আপনাকে বলিদান দিতে পারিয়াছি, তোমারই মহিমা প্রচার ও কার্য্যসাধনের জন্য পরিশ্রম করিতে সমর্থ হইয়াছি। আমার পার্থিব জীবনের আরম্ভে জীবন ও মৃত্যুতে বিষম সংগ্রাম উপস্থিত হয়, জীবনই জয়লাভ করে। আমি কি আশা করিতে পারি যে, ইহলীলা শেষ হইলে আমার জীবন মৃত্যুর উপরে অনন্ত কাল জয়লাভ করিবে? তুমি এখন আমার একমাত্র প্রাণ, একমাত্র প্রেমের বস্তু, তুমিই কেবল যদি আমার জীবনে বাস কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি কালের উপর আধিপত্য করিতে পারিব।"

বিদ্যাশিক্ষা।

মন্তার্জিস নগরে অর্স্লাইন কুমারীদিগের যে বিদ্যালয় ছিল, কুমারী মথ আড়াই বৎসর বয়সে তথায় প্রথম প্রেরিত হন। বালিকাগণকে শিক্ষাদান করা উক্ত কুমারীগণের জীবনের একটী প্রধান ব্রত ছিল। কোন কারণ বশতঃ ঐ বিদ্যালয়ে মাদাম গেঁয়ো অধিক দিন থাকিতে পারেন নাই; কিছুদিন পরেই তাঁহাকে পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। পিতামাতার অমনোযোগ ও বাল-স্বভাব-সুলভ চাপল্যবশতঃ গৃহে অবস্থান কালে তিনি বারম্বার বিপদে পড়েন, কিন্তু ঈশ্বরকৃপায় সে সকল বিঘ্নের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন।

১৬৫২ সালে তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা রীতিমত আরম্ভ হয়। যে ঈশ্বরপ্রেম তাঁহাকে পরে উন্মত্ত করিয়াছিল, তাহার প্রথমোন্মেষ ঐ সময়ে প্রকাশ পাইয়াছিল। কুমারী মথের বয়স তখন চারি বৎসর মাত্র। তাঁহার পিতার পরিচিত একজন সম্ভ্রান্ত ললনা এই সময়ে মন্তার্জিস নগরে আসিয়া বেনিডিক্টাইন্ কুমারীদিগের সহিত বাস করেন। তাঁহার অনুরোধে মেঃ মথ উক্ত কুমারীগণের নিকট আপন কন্যাকে রাখিয়া দিয়াছিলেন। মাদাম গেঁয়ো আপন জীবন বৃত্তান্তে বলিয়াছেন, এখানে আমি কেবল সদ্দৃষ্টান্তই দেখিতাম, স্বভাবতঃই আমার সেই সকল দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিতে ইচ্ছা হইত। বারণ করিবার কেহ ছিল না বলিয়া আমি অবাধে সেই ইচ্ছা চরিতার্থ করিতাম। যদিও শিশু ছিলাম, তথাপি ঈশ্বরের কথা শুনিতে, ধর্ম্মমন্দিরে থাকিতে, ও কুমারীর পরিচ্ছদ পরিতে, আমার খুব ভাল লাগিত।"

ক্রমশঃ

প্রেরিত পত্র।

১৮৭২ সালের ৩ আইনের সংশোধন।

মহাশয়,

অনুগ্রহ করিয়া এই পত্রিকাখানি "তত্ত্বকৌমুদী" পত্রিকাতে প্রকাশিত করিয়া বাধিত করিবেন।

১লা আষাঢ়ের তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকাতে ৩ আইনের সংশোধন সম্বন্ধে "জনৈক মফঃস্বলবাসী ব্রাহ্ম" যে প্রতিবাদ করিয়াছেন তাহা পাঠে অবগত হইলাম যে, উক্ত আইন সংশোধন করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টে শীঘ্র আবেদন পত্র পাঠান হইবে এবং উক্ত আবেদন পত্রে মেয়েদের বিবাহের ন্যূনতম বয়স ১৪ হইতে ১৬ বৎসরে বর্দ্ধিত করিবার বিষয় উল্লেখ করা হইবে এবং আরও অবগত হইলাম ব্রাহ্মদের মধ্যে অনেকেই উক্ত পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা অনুভব করিতেছেন। সুতরাং এ সম্বন্ধে আমার সামান্য বুদ্ধিতে যাহা ভাল বোধ হইতেছে তাহা ব্রাহ্ম সাধারণের গোচরার্থ লিখিতেছি।

"জনৈক মফঃস্বলবাসী ব্রাহ্ম" যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আমি সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করি। ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় মেয়েদের বিবাহের বয়স বাড়ান কোন মতেই যুক্তিসঙ্গত নহে। ব্রাহ্মের সংখ্যা নিতান্ত অল্প; মফঃস্বলবাসী ব্রাহ্মদের পুত্র কন্যাগণকে সুশিক্ষা দিবার জন্য, তাহাদিগকে জ্ঞানধর্ম্মে উন্নত করিবার জন্য যে কিরূপ অসুবিধা ও কষ্টভোগ করিতে হয়, তাহা যাঁহারা মফঃস্বলে বাস করিয়াছেন তাঁহারাই সহজে বুঝিতে পারিবেন, বিশেষতঃ ব্রাহ্মেরা সাধারণতঃ অর্থহীন ও দরিদ্র, তাঁহারা যে পুত্র কন্যাগণকে কলিকাতায় পাঠাইয়া উপযুক্তরূপে সুশিক্ষা দিবেন এমন সামর্থ্য অনেকেরই নাই। মফঃস্বলে কোন গ্রামে একটী ব্রাহ্ম একা বাস করিতেছেন, তিনি চতুর্দ্দিকে হিন্দুসমাজের লোকদিগের দ্বারা বেষ্টিত। হিন্দুসমাজের বালক বালিকাগণ সচরাচর অল্প বয়সে নানা প্রকার কুশিক্ষা প্রাপ্ত হয়। এরূপ অবস্থায় কন্যাগণকে অধিক বয়স অবধি অবিবাহিতা রাখিলে অনেক প্রকার বিপদের আশঙ্কা আছে। কলিকাতায় ব্রাহ্মগণ এ

সকল অসুবিধার কথা সহজে বুঝিতে পারিবেন না, কারণ কলিকাতার পুত্র কন্যাগণকে সুশিক্ষা দিবার নানা প্রকার সুবিধা আছে, তাঁহারা হয়ত মফঃস্বলবাসী ব্রাহ্মদের এইমত সঙ্কীর্ণ ও অনুদার বলিয়া মনে করিবেন। কিন্তু কার্য্যতঃ আমি যেরূপ অনুভব করিতেছি, তাহাতে দুই প্রকার বিপদের আশঙ্কা আছে, (১) বিবাহ দিবার অসুবিধায় অনেক মফঃস্বল-বাসী ব্রাহ্ম অন্য অন্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিবেন (২) বিবাহের যে সকল সুফল ও উচ্চ আদর্শ দেখাইবার জন্য বয়স বৃদ্ধি করা হইবে, তাহা না হইয়া তাহার বিপরীত ফল উৎপন্ন হইয়া ব্রাহ্মসমাজে নানা প্রকার কলঙ্ক আনয়ন করিবে।

আমার মতে মেয়েদের বিবাহের বয়স আইনের দ্বারা বাড়াইবার চেষ্টা করিবার পূর্ব্বে যাহাতে ব্রাহ্মদের পুত্র কন্যা-গণ উপযুক্তরূপে শিক্ষা প্রাপ্ত হয় এমন কোন উপায় করা উচিত। বিবাহের বয়স আইনের দ্বারা বৃদ্ধি করিবার আপা-ততঃ কোন প্রয়োজন নাই, ইহাতে কোন কার্য্যের ক্ষতি হইতেছে না। কারণ বর্ত্তমানে ১৪ বৎসর নিয়ম সত্ত্বেও অনেক বিবাহ ১৬ কিম্বা তদধিক বয়সে হইতেছে অর্থাৎ যাঁহারা কন্যা-গণকে উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করিতে পারিয়াছেন তাঁহারা অধিক বয়সে বিবাহ দিতেছেন, আর যাঁহাদের সে সুবিধা নাই, তাঁহারা নির্দ্ধারিত ১৪ বৎসর বয়সে দিতেছেন। আপাততঃ এই নিয়ম থাকাই ভাল, নচেৎ মফঃস্বলবাসীদিগকে অনেক অসুবিধায় পড়িতে হইবে।

রসাপাগলা } বশম্বদ
৯ই আষাঢ় ১২৯৪ সাল } শ্রীশ্রীশচন্দ্র বসু

(২)

মহাশয়,

আপনার ১লা আষাঢ়ের পত্রে "জনৈক মফঃস্বলবাসী ব্রাহ্ম" স্বাক্ষরিত পত্র সম্বন্ধে আমার দুই একটি কথা বক্তব্য আছে, আশা করি আমার পত্রখানিকে আপনার পত্রিকায় স্থান দান করিয়া বাধিত করিবেন।

আপনার পত্রপ্রেরক বালিকাদিগের বিবাহের ন্যূনতম বয়স ১৪ হইতে ১৬ বৎসরে আইনের সাহায্যে বৃদ্ধি করিবার বিরুদ্ধে যে কয়েকটি যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা নিতান্ত অযৌক্তিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। মফঃস্বলবাসী ব্রাহ্ম বালিকাদের সুশিক্ষার পথে যে বিষম বিঘ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু ব্রাহ্ম জীবনে কর্ত্তব্যের পথে কোথায় এরূপ বিঘ্ন না বিদ্যমান আছে? নিজের জীবন রক্ষার জন্য নিত্য নিয়মিত উপাসনা করা ব্রাহ্মের যেমন কর্ত্তব্য, পুত্র কন্যাকে সর্ব্বপ্রকার কুসঙ্গ হইতে দূরে রাখিয়া অন্তবিধ উৎকৃষ্টতর উপায়ের অবর্ত্তমানে নিজেই তাহাদের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করা ব্রাহ্মের পক্ষে তেমনই গুরুতর কর্ত্তব্য। কিন্তু আমি এস্থলে তাঁহার যুক্তিগুলির বিশেষ ভাবে আলোচনা করিব না। আমি একটি কথা ব্রাহ্ম সাধারণের নিকট এবং বিশেষ ভাবে আপনার পত্র-প্রেরকের নিকট বলিতে চাই। সেটি এই:—জীবনের অতি সামান্য সামান্য কার্য্যে, সূচ্যগ্র প্রমাণ জমীর দান বিক্রয়ে পর্য্যন্ত একজন নাবালকের (Minor) কোন অধিকার নাই; এরূপ কার্য্য আইন সঙ্গত বলিয়া গ্রাহ্য হয় না। যে যে কারণে সামান্য কার্য্যে, যে কার্য্যে একটু বিবেচনার ত্রুটি হইলেও বিশেষ কোন অমঙ্গলের সম্ভাবনা নাই, নাবালকের অধিকার দেওয়া যুক্তি-যুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয় না, বিবাহের মধ্যেও কি সেই সমস্ত কারণ বিদ্যমান নাই? বরং যে পরিমাণে বিবাহের দায়িত্ব অন্যান্য সমস্ত কার্য্যের দায়িত্ব অপেক্ষা গুরুতর, ঠিক্ সেই পরিমাণেই নাবালকত্বের যুক্তি এস্থলে অধিক প্রয়োজ্য। কোন নাবালকের বিবাহ কোন কারণেই আইন সঙ্গত হইতে পারে না। ব্রাহ্মেরা এ বিষয়টি সুন্দররূপ বিবেচনা করিয়া দেখেন এই আমার একান্ত প্রার্থনা।

৮৭ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট } অনুগত
১লা জুলাই, ৮৭। } শ্রীসীতানাথ নন্দী

(৩)

সন ১৮৭২ সনের ৩ আইন সংশোধন বিষয়ক আবেদন সম্বন্ধে মালওয়া প্রদেশবাসী জনৈক ব্রাহ্মভ্রাতা বিগত ২০এ মে, তারিখের প্রেরিত পত্র দ্বারা যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আমার বিবেচনায় সম্পূর্ণরূপে যুক্তিসঙ্গত বোধ হইয়াছে। অবস্থা বিশেষে অনেক ব্রাহ্ম ভ্রাতা স্বীয় স্বীয় কন্যাদিগকে ১৪ বৎসরের অধিকবয়স্কা করিয়া অবিবাহিতাবস্থায় রাখা উচিত ও নিরাপদ মনে করেন না। সুতরাং রাজকীয় ব্যবস্থা দ্বারা তাঁহাদিগকে বিপদগ্রস্ত করা ব্রাহ্মমণ্ডলীর কর্ত্তব্য নহে। উপরোক্ত আইনে কন্যার বিবাহ সম্বন্ধীয় বয়সের ন্যূন পরি-মাণ বিষয়ক যে ব্যবস্থা আছে সে বেশ আছে; যাঁহাদের ইচ্ছা ও সুবিধা বোধ হইবে, তাঁহারা অনায়াসে স্বীয় কন্যাদিগকে ১৬ বৎসর কি ততোধিক বয়স্কা করিয়া বিবাহ দিতে পারেন। রাজকীয় আইন সর্ব্বসাধারণের নিমিত্ত, কেবল কোন সম্প্র-দায় বিশেষের জন্য হইতে পারে না। অধিকন্তু কোন বিশেষ সামাজিক কারণ না ঘটিলে তাহার পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য মনে করিনা। যাহা হউক, উপরোক্ত আইন সংশোধনের আবেদন পত্র ব্যবস্থাপক সমাজে অর্পণের পূর্ব্বে আবেদনের পাণ্ডুলিপি ক্লুবিকল মেসেঞ্জার ও তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকায় প্রকাশ করত সমস্ত ব্রাহ্মমণ্ডলীর মত সংগ্রহ করিয়া দেখা আবশ্যক এবং যতদূর হইতে পারে এতৎ সম্বন্ধে তিন সমাজভুক্ত ব্রাহ্ম-ভ্রাতৃগণের মত লওয়ার চেষ্টা করা সভার কর্ত্তব্য। নিবেদন ইতি

ময়মনসিংহ } বশম্বদ
২৫এ জুন। ৮৭ } শ্রীকৃষ্ণদয়াল রায়

প্রদেশীয় ব্রাহ্মসমাজ।

বরিশাল।

বরিশাল ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু কামিনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় তথাকার উৎসবের যে বিবরণ প্রেরণ করিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১০ই আষাঢ় বরিশাল ব্রাহ্ম সমাজের জন্মদিন। নিম্নলিখিত প্রণালীতে ৯ই ও ১০ই আষাঢ় উক্ত সমাজের বার্ষিক জন্মোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। ভগবানের কৃপায় অনেকেই অল্লাধিক পরিমাণে উৎসবানন্দ সম্ভোগ করিয়াছেন।

৯ই আষাঢ় প্রাতে উপাসনা—স্থানীয় আচার্য্য শ্রীযুক্ত গিরিশ-চন্দ্র মজুমদার মহাশয় বেদীর কার্য্য করেন।

অপরাহ্ন সাত ঘটিকার সময় বক্তৃতা,—বক্তা স্থানীয় প্রচারক বাবু মনোরঞ্জন গুহ, বিষয় "ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সাধন কি?" বক্তৃতার সারাংশ এই—জাতিভেদ কি পৌত্তলিকতা বিনাশ, সমাজ সংস্কার কি অভ্রান্ত শাস্ত্র অস্বীকার ইহার কিছুই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের লক্ষ্য বা সাধন নহে। এমন কি, হিংসা দ্বেষ পরিহার, ন্যায়পরতা ও পরোপকার ব্রত অবলম্বন, জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চ্চা ইত্যাদি কিছুই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের লক্ষ্য এবং সাধন নহে। ঐ সমস্ত করিয়াও মানুষ সম্পূর্ণ অব্রাহ্ম থাকিতে পারেন। এমন কি কীর্ত্তনে নৃত্য এবং আবেশ আদিও ব্রাহ্ম ধর্ম্মের লক্ষ্য বা সাধন নহে। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের লক্ষ্য "মায়ের কোল" সাধন, "মায়ের কোলে যাওয়া।" এই মূলমন্ত্র বিস্মৃত হইয়া যিনি যাহা করিবেন তাহা ব্রাহ্ম ধর্ম্ম নহে। আমার মা আচণ্ডাল সকলকে কোলে করিয়া বসিয়া আছেন; তাঁহার কোলে যাইতে হইলে ঐ চণ্ডাল ভ্রাতার সঙ্গে গলা ধরিয়া বসিতে হইবে। তাহাকে যদি ঘৃণা করিতে যাই, মায়ের কোলে যাওয়ার আশা করা আমার বিড়ম্বনা, কেননা আমি উচ্চবংশ বলিয়া মা আমাকে কোলে করিবার জন্য তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন না। ব্রাহ্ম এই দায়ে ঠেকিয়া জাতিভেদ পরিত্যাগ করেন। জাতিনাশ তাঁহার সাধনের লক্ষ্য নহে, উহা মায়ের কোলে যাইবার পথে একটী তীক্ষ্ণ কণ্টক। এইরূপ পৌত্তলিকতা, অভ্রান্ত শাস্ত্র, হিংসা দ্বেষ ইত্যাদি সকলই মায়ের কোলে যাইবার পথের কণ্টক, তাহা পরিষ্কার রূপে বুঝাইয়া দেওয়া হয়। উপচিকীর্ষা, জ্ঞানচর্চ্চা, ন্যায়পরতা প্রভৃতি সেই পথের সাহায্যকারী। কিন্তু সাধনের লক্ষ্য মায়ের কোল। যিনি ব্রাহ্ম হন, তিনি মায়ের কোলে যাইতে যে সকল প্রতিবন্ধক আছে, তাহা প্রাণপণে দূর করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু মায়ের কোল যার লক্ষ্য নহে, তিনি পথের কণ্টক না তুলিয়াও ভাবাবেশে মগ্ন হইয়া কীর্ত্তন উপাসনাদিতে আনন্দ লাভ করিয়া আজীবন কাটাইতে পারেন, কিন্তু সেরূপ আবেশ ও আনন্দ ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সাধন নহে। ইত্যাদি।

১০ই আষাঢ় প্রাতে উপাসনা—স্থানীয় আচার্য্য শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বেদীর কার্য্য করেন।

মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্নে পাঠ ও কীর্ত্তন।

রাত্রিতে উপাসনা—স্থানীয় প্রচারক শ্রীযুক্ত কালীমোহন দাস মহাশয় বেদীর কার্য্য করেন।

১০ই আষাঢ় উৎসবের দিন কাঙ্গালীদিগকে পয়সা দান করার নিয়ম আছে, কিন্তু এ বৎসর কোন অসুবিধা বশতঃ সেই কার্য্যটী উক্ত তারিখে না হইয়া তাহার পর দিবস ১১ই আষাঢ় হইয়াছে।

কুষ্টিয়া।

শ্রীযুক্ত বাবু রাইচরণ দাস কুষ্টিয়া ব্রাহ্মসমাজের বাৎসরিক উৎসবের যে বিবরণ পাঠাইয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

গত ১৬ই আষাঢ় সন্ধ্যাকালে নিয়মিত উপাসনা হইয়া তৎপরদিন ১৭ই আষাঢ় হইতে ২১এ আষাঢ় পর্য্যন্ত উপর্য্যুপরি কয়েক দিবস কুষ্টিয়া ব্রাহ্মসমাজের বাৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে।

বৃহস্পতিবার অপরাহ্ন ৭½ ঘটিকার পর উৎসবের উদ্বোধন-সূচক প্রার্থনা হইয়া সাধুগণের আশীর্ব্বাদ যাচ্ঞা পূর্ব্বক চৈতন্য চরিত প্রণেতা বাবু জগদীশ্বর গুপ্ত বি, এল, মহাশয় সমাজ গৃহে শ্রীচৈতন্য দেবের জীবন চরিত সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করেন। পরম প্রেমিক চৈতন্যের জীবনী বলিয়া ও শুনিয়া আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় না। তাঁহার জন্ম, বাল্যলীলা, ও সংসারত্যাগ ভাগ সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছিল। শ্রোতৃগণ অভিনিবেশ পূর্ব্বক আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন।

শুক্রবার পূর্ব্বাহ্ন। বাবু জগদীশ্বর গুপ্ত উপাসনা ও উপদেশ প্রদান করেন। নদীর জল প্লাবনে পলি পড়িয়া ভূমি সকল যেরূপ উর্ব্বরা হয়, মানবের হৃদয়ও সেইরূপ ঈশ্বরের কৃপাস্রোত দ্বারা সরস ও কার্য্যকর হয়, ইত্যাদি সহজ কথায় ইনি অনেক উৎকৃষ্ট উপদেশ দিয়া উপস্থিত বন্ধুগণের প্রভূত উপকার করিয়াছেন।

শুক্রবার অপরাহ্ন ৫½ ঘটিকার পর ধর্ম্মালোচনা হয়; আলোচনার বিষয় ধর্ম্ম জীবন লাভের প্রয়োজনীয়তা। সন্ধ্যার পর বাবু জগদীশ্বর গুপ্ত কর্ত্তৃক উপাসনা ও নাম সাধন সম্বন্ধে উপদেশ প্রদত্ত হয়। নাম সাধন প্রকৃতরূপে হওয়া কর্ত্তব্য ও নামের শক্তি বুঝিয়া সাধন করিতে হয়; নতুবা নামাপরাধ হয়। বিনয় ও সহিষ্ণুতার সহিত নাম সাধন আবশ্যক। অজামীলের উপাখ্যান ও চৈতন্যের উক্তি প্রভৃতি অবলম্বন পূর্ব্বক তিনি সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিলেন যে, নাম সাধন নামের আভ্যন্তরীণ প্রকৃত শক্তি বুঝিয়া করিতে হয়; নতুবা শুক পক্ষীর ন্যায় শুষ্ক নাম সাধন করিলে ফল লাভের সম্ভাবনা নাই। এই দিন সমাজ গৃহ ও তৎসম্মুখস্থ পথ লোকে পূর্ণ হইয়াছিল।

শনিবার পূর্ব্বাহ্ন;—ক্রিসেন্ট হলে উৎসব। অতি প্রত্যূষে ভগবন্নামাঙ্কিত পতাকা হস্তে সাধক মণ্ডলী ব্রহ্ম নাম গান করিতে করিতে অত্রস্থ আমলাপাড়া হইতে বহির্গত হইয়া প্রায় এক মাইল দূরবর্ত্তী ক্রিসেন্ট হলে (বেঁকী কুঠীতে) গমন করত স্থানীয় হাকিম বাবুদের প্রবাস বাটীর দ্বারে প্রেম-

ভরে নাম কীর্ত্তন করিলেন; তৎপরে সকলে ঐ হলের অন্যতম প্রকোষ্ঠে শ্রীযুক্ত বাবু জগদীশ্বর গুপ্ত মহাশয়ের বাসায় সমাগত হইলে সংক্ষিপ্ত প্রার্থনার পর নাম সংকীর্ত্তন হইতে লাগিল।

শনিবার অপরাহ্ন ৬টার পর নগর সংকীর্ত্তন। আকাশ ক্রমে মেঘাচ্ছন্ন হইতে লাগিল; আশঙ্কা হইল পাছে পথে চলিয়া সংকীর্ত্তন করিতে প্রতিবন্ধকতা ঘটে, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছায় মেঘ সরিয়া গেল; চতুর্দ্দিক্ হইতে বন্ধুগণ আসিয়া সংকীর্ত্তনে যোগ দিলেন। সংক্ষিপ্ত প্রার্থনার পর ব্রহ্ম নামের জয় পতাকা উড়াইয়া বন্ধুগণ একতানে মধুর ব্রহ্ম নাম গান করিতে করিতে বাজার প্রদক্ষিণ করিলেন। বাজারে সমুপস্থিত বহুল লোকের সমক্ষে বাবু জগদীশ্বর গুপ্ত উচ্চৈঃস্বরে সহজ কথায় ঈশ্বর পিতা ও সকলেই তাঁহার পুত্র কন্যা এই বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন; শ্রোতৃগণ পুত্তলিকার ন্যায় নিঃশব্দে উপদেশ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে সমাজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের পর উপাসনা হয়। নিরাপদে বাস করিতে হইলে "ব্রহ্ম গিরিতেই বাস করা কর্ত্তব্য" এই বিষয়ে উপদেশ হইল। বাবু জগদীশ্বর গুপ্ত বেদীর কার্য্য করেন।

রবিবার উৎসব।—প্রত্যূষে কয়েকটী ব্রাহ্ম বন্ধু আমলা পাড়ায় ব্রহ্ম নাম গান করেন। তৎপরে উপাসনা হয়। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। পৃথিবীর লোকের সাধুদের প্রতি অত্যাচার বিষয়ে উপদেশ হয়। উপদেশ শ্রবণে অনেকে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই।

মধ্যাহ্নে শাস্ত্রপাঠ ও আলোচনা। বহুসংখ্যক স্থানীয় ভদ্রলোক আলোচনায় যোগ দিয়াছিলেন।

অপরাহ্নে বেলা ৪টার পর কুষ্টিয়া বাহাদুরখানী বাজারে শ্রীযুক্ত বাবু হরদেব দাস আগরওয়ালার ভবনে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় "সার ধর্ম্মের লক্ষণ" সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। প্রায় ৫০০ শত শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতার পর উপাসকমণ্ডলী ব্রহ্ম নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে সমাজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সায়ংকালীন উপাসনা হয়। শাস্ত্রী মহাশয় বেদীর কার্য্য করেন।

সোমবার পূর্ব্বাহ্ন।—বাবু জগদীশ্বর গুপ্ত মহাশয়ের বাটীতে পারিবারিক উপাসনা। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। সন্ধ্যার পর সমাজ গৃহে ধর্ম্মালোচনা হয়। ধর্ম্মজিজ্ঞাসু বন্ধুগণ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট নানাবিধ প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর পাইয়া তৃপ্ত হইয়াছেন।

পাবনা, কুমারখালী জগন্নাথপুর, খলিলপুর, চৌড়হাস, জগতী, ওসমানপুর, কলিকাতা, সৈদপুর, প্রভৃতি অনেক স্থান হইতে ব্রাহ্মবন্ধুগণ ও দুই একটী ভগিনী আগমন করত উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

নিতান্ত মর্ম্মপীড়িত চিত্তে আমরা পাঠকদিগকে ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগিরের পরলোক গমনের সম্বাদ দিতেছি। দুই মাসের অধিক কাল ইনি কঠিন রোগ ভোগ করিতেছিলেন। চিকিৎসা ও সেবা যতদূর হইবার হইয়াছিল, কিছুতে কিছু হইল না। বিগত ২২এ জুলাই বেলা তিন ঘটিকার সময়ে তিনি প্রিয় পত্নী, কন্যা ও পরিজন এবং বন্ধুবর্গকে শোক সাগরে ভাসাইয়া মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। চিকিৎসা শাস্ত্রে খাস্তগির মহাশয় একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। নববিধান পত্রিকা বলেন যে ইনিই সর্ব্বাগ্রে চিকিৎসা বিশেষের সাফল্য সম্বন্ধে কুসংস্কারের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করেন। ইনি সকল প্রকার চিকিৎসা শাস্ত্র ও প্রণালীর সামঞ্জস্য সাধনে সময়, শক্তি ও অর্থ অকাতরে ব্যয় করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজেও ইনি অপরিচিত ছিলেন না। ব্রাহ্মসমাজের জন্য ইনি এক সময় অনেক খাটিয়াছিলেন। যে মুষ্টিপ্রমাণ মহাত্মারা উচ্চ স্ত্রী শিক্ষার পক্ষ সমর্থনের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া ঘোর প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে অটল ভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন, ইনি তাঁহাদের একজন। স্ত্রীস্বাধীনতার আন্দোলনেও ইনি একজন প্রধান অধিনায়ক ছিলেন। সকল প্রকার মহৎ ও সাধারণের হিতকর অনুষ্ঠানেই ইনি যোগ দিতেন। ইনি স্বদেশাগত যুবকবৃন্দের আজীবন নিঃস্বার্থ বন্ধু ও উপদেষ্টা ছিলেন। ভদ্রতা, নিঃস্বার্থ দয়া, স্বাধীন ও উদার ব্যবহারের জন্য ডাক্তার খাস্তগির সকলেরই প্রিয় হইয়াছিলেন। তাঁহার পরলোকগত আত্মাকে পরমেশ্বর অনন্ত শান্তি ও অনন্ত উন্নতির পথে অগ্রসর করুন এবং তাঁহার শোকার্ত্ত পরিবারবর্গের প্রাণে শান্তি ও সান্ত্বনা প্রদান করুন।

কলিকাতার স্বাস্থ্য সমিতি কলিকাতার বেশ্যাদিগের স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্বন্ধীয় আইন পুনঃসংস্থাপনের জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইতেছেন। "লক্ষৌ উইটনেস" বলেন যে খৃষ্টীয় প্রচারক সভা ইহার বিরুদ্ধে যাহা করা উচিত তাহা করিতেছেন। আশা করি এই সংগ্রামে সকলেই প্রচারকদিগের সহায়তা করিবেন। মেসেঞ্জার তুমুল আন্দোলন ও টাউন হলে প্রকাশ্য সভা আহ্বান করার যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা আমরা সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করি। কি ভয়ানক কথা! যে সকল লোম হর্ষণ অত্যাচারের কথা লোকের স্মৃতিপথ হইতে ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইতেছে, আইনের নামে আবার সেই সকল ব্যাপার সংঘটিত হইবে? এখানকার উক্ত আইনের অনুরূপ আইন কিছুদিন পূর্ব্বে ইংলণ্ডের ব্যবস্থাবলীর অন্তর্গত ছিল। মিসেস বটলার প্রভৃতি কয়েক জন উন্নতমনা রমণীর আন্দোলনে গত বৎসর তাহা উঠিয়া গিয়াছে। এখানে আবার এ উৎপাত কেন?

অধ্যাপক মেঃ টিণ্ডেল রয়েল ইনস্টিটিউসনের অধ্যাপকত্ব হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাকে প্রকাশ্যভাবে বিদায় দিবার জন্য উইলিস রুমে একটী সভা আহুত হয়। তথায় টিণ্ডেল সাহেব একটি মধুর বক্তৃতা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে জুবিলি উপলক্ষে মহারাণী প্রজাবর্গের সহিত সুবর্ণ বিবাহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছেন। বিজ্ঞান তাঁহাকে এক বৈজ্ঞানিকমালা উপহার দিবেন। সে মালার প্রথম পুষ্প "মাধ্যাকর্ষণ", দ্বিতীয় পুষ্প "শক্তি সমন্বয়", তৃতীয় পুষ্প "আলোক-বিশ্লেষণ"। যে মাধ্যাকর্ষণে মহামতি নিউটন সমগ্র সৌরজগতকে

প্রাকৃতিক নিয়মের শৃঙ্খলায় বাঁধিয়াছিলেন, যে শক্তি সমন্বয় (Conservation of Energy) জড়জগতের যাবতীয় শক্তি নিচয়কে একাঙ্গীভূত করিয়াছে, যাহার বলে বিজ্ঞান ঈশ্বরের জীবন্ত বসনরূপিণী বিশ্বব্যাপিনী শক্তিরাশির ভ্রাম্যমান আবর্ত্ত সকল গণনা করিতে সমর্থ হইয়াছেন, যে আলোকবিশ্লেষণ দূরস্থিত নক্ষত্র জগতের পরমাণু সন্নিবেশের সংবাদ পৃথিবীতে আনিয়া দিতেছে, সেই মাধ্যাকর্ষণ, শক্তি সমন্বয় ও আলোক বিশ্লেষণ যে মহারাণীর উপযুক্ত জুবিলি উপহার হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরাও তাহাই বলি। কিন্তু টিণ্ডেল সাহেব বৈজ্ঞানিক পুষ্প সকল গাঁথিবার সূত্রের কথা কিছুই বলেন নাই। যদি সূত্রই না রহিল, তবে মালা হইবে কিরূপে? বৈজ্ঞানিক সত্য সকল ঈশ্বর বিশ্বাস ও প্রেমরূপ সূত্রে যদি গ্রথিত না হইল, তবে তাহাদের বিচ্ছিন্নতা কে দূর করিবে? শক্তিরূপী ঐশী মহাসত্যের অঙ্গীভূত বলিয়া যে সত্য বুঝিতে না পারিলাম, সে সত্যে মানবাত্মার কি উপকার হইবে? বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম বিসম্বাদী পদার্থ নহে, উভয়কে প্রভেদ করিতে গিয়া লোকে বিষম গোলযোগে ও স্ববিরোধিতায় পড়ে। বিজ্ঞান যখন জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মার প্রকাশ বই আর কিছুই নহে, তখন উহাকে ধর্ম্মের অন্তর্গত বলিব না তো কি বলিব?

একজন রমণী বলিয়াছেন যে নারীর কার্য্যক্ষেত্রের উত্তর সীমা পতি, দক্ষিণ সীমা শিশু, পূর্ব্ব সীমা শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী এবং পশ্চিম সীমা ননন্দা। আমরা বলি, কি পুরুষ কি রমণী সকলেরই কার্য্যক্ষেত্র সীমাবদ্ধ, কিন্তু সে সীমা মানব বা মানব সন্তান নহে। মানবের কার্য্যক্ষেত্রের সীমা অনন্ত পরমেশ্বর, অবিচলিত সত্য, অটল ন্যায় ও অপ্রতিহত বীর্য্য। যিনি আপন কার্য্যক্ষেত্রকে পার্থিব কল্পিত সীমায় আবদ্ধ করেন, তিনি সঙ্কীর্ণতার হস্ত হইতে রক্ষা পান না।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ।

গত ২৭এ আষাঢ় শনিবার অপরাহ্ণ ৪৷৷ টার সময় সিটি কলেজ গৃহে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অধ্যক্ষ সভার দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক অধিবেশন হয়।

উপস্থিত সভ্যগণের নাম;—শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় (সভাপতি), শ্রীযুক্ত মথুরামোহন গঙ্গোপাধ্যায়, কেদার নাথ মুখোপাধ্যায়, অঘোর নাথ মুখোপাধ্যায়, আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, হীরালাল হালদার, বিপিন চন্দ্র পাল, সাতকড়ি দেব, উমাপদ রায়, কেদার নাথ রায়, জয়কৃষ্ণ মিত্র, গুরুচরণ মহলানবিশ, দুকড়ি ঘোষ, হরকিশোর বিশ্বাস, সীতানাথ নন্দী, নীলরতন সরকার, রজনী নাথ রায়, হেরম্ব চন্দ্র মৈত্রে, কৃষ্ণকুমার মিত্র, কালীশঙ্কর শুকুল, উমেশ চন্দ্র দত্ত, শিবচন্দ্র দেব, ডাঃ মোহিনী মোহন বসু এবং শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বসু (সহকারী সম্পাদক)।

দর্শক;—শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, উমাচরণ সেন, ও সুরেশ চন্দ্র রায়।

বাবু কালী শঙ্কর শুকুল প্রস্তাব করেন যে বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে সভাপতি মনোনীত করা হয়। বাবু উমাপদ রায় এই প্রস্তাব অনুমোদন করেন।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর অধ্যক্ষ সভার প্রথম ত্রৈমাসিক কার্য্য বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল। তাহার পর কার্য্যনির্ব্বাহক সভার দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক কার্য্য বিবরণ এবং ঐ তিন মাসের হিসাব উপস্থিত সভ্যগণের গোচর করা হয়।

প্রস্তাবক বাবু রজনী নাথ রায়, সমর্থনকারী বাবু দুকড়ি ঘোষ; প্রস্তাব—ভবিষ্যতে দুর্ভিক্ষ ফণ্ড ও প্রচারক নিবাস ফণ্ডের হিসাব সমাজের অন্যান্য হিসাবের সঙ্গে দেওয়া হয়। এই প্রস্তাব সভায় গ্রাহ্য হইয়াছিল।

প্রস্তাবকারী বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, সমর্থনকারী বাবু উমাপদ রায়; প্রস্তাব—প্রচারকগণ কার্য্য নির্ব্বাহক সভার অনুমতি ব্যতীত নিজ নিজ কার্য্য ক্ষেত্রের বাহিরে প্রচার সম্বন্ধে যাহা কিছু করিয়াছেন তাহা প্রচার কার্য্যের বিবরণের মধ্য হইতে তুলিয়া দেওয়া হয়। এই প্রস্তাব সভায় গ্রাহ্য হইল না।

প্রস্তাবকারী বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, সমর্থনকারী বাবু উমাপদ রায়; প্রস্তাব—কলিকাতা উপাসক মণ্ডলীর কার্য্য বিবরণ হইতে "দুঃখের বিষয়......পারে।" এই কথা গুলি তুলিয়া দেওয়া হয়। প্রস্তাব গ্রাহ্য হইল।

প্রস্তাবকারী বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, সমর্থনকারী বাবু হীরালাল হালদার; প্রস্তাব—ত্রৈমাসিক কার্য্য বিবরণ মুদ্রিত হইবার পর প্রচারকগণ, সবকমিটী সমূহ ও ব্রাহ্মদিগের তত্ত্বাবধানাধীন ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ হইতে যে কিছু কার্য্য বিবরণ পাওয়া গিয়াছে তাহাও ঐ ত্রৈমাসিক কার্য্য বিবরণের অন্তর্ভূত বলিয়া গণ্য করা হয় এবং যে সকল বিভাগ হইতে কোন বিবরণ পাওয়া যায় নাই তাহাদের বিষয় উল্লেখ করিয়া তাহাদের কার্য্য বিবরণ না পাইবার বিশেষ কোন কারণ থাকিলে তাহা নির্দ্দেশ করা হয়। প্রস্তাব গ্রাহ্য হইল।

প্রস্তাবকারী বাবু রজনীনাথ রায়, সমর্থনকারী বাবু কেদার নাথ মুখোপাধ্যায়; প্রস্তাব—কার্য্য বিবরণ যে ভাবে সংশোধিত হইল সেই ভাবে সভায় গৃহীত হউক। প্রস্তাব গ্রাহ্য হইল।

প্রস্তাবকারী বাবু শ্রীশচন্দ্র দে, সমর্থনকারী বাবু হীরালাল হালদার; প্রস্তাব—সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের বার্ষিক অধিবেশনে রংপুরের শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বসু মহাশয়কে অধ্যক্ষ সভার সভ্য মনোনীত করা হইয়াছিল। কিন্তু তিনি তাহাতে অসম্মত হন। এক্ষণে তাঁহার স্থলে বাবু যদুনাথ চক্রবর্ত্তীকে অধ্যক্ষ সভার সভ্য নিযুক্ত করা হউক। প্রস্তাব গ্রাহ্য হইল।

বাবু বিপিনচন্দ্র পাল বাবু দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী সম্বন্ধে যে প্রস্তাব করিবেন বলিয়াছিলেন তাহা প্রত্যাহার করিলেন এবং প্রস্তাব করিলেন যে কার্য্য নির্ব্বাহক সভাকে অনুরোধ করা হয় যেন তাঁহারা এই বিষয় সম্বন্ধে তাঁহাদের অনুসন্ধানের ফল অধ্যক্ষ সভার আগামী অধিবেশনে সভ্যদিগের গোচর করেন।

বাবু কেদার নাথ মুখোপাধ্যায় এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। প্রস্তাব গ্রাহ্য হইল না।

বাবু হীরালাল হালদারের যে সকল প্রস্তাব করিবার কথা ছিল, তিনি তাহার প্রথমটী প্রত্যাহার করিলেন।

বাবু হীরালাল হালদার প্রস্তাব করিলেন যে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অধ্যক্ষ সভা গঠনার্থ বাই-রুল করিবার জন্য শ্রীযুক্ত মথুরামোহন গঙ্গোপাধ্যায়, সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বসু, শ্রীযুক্ত গগন চন্দ্র হোম, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও বিপিন চন্দ্র পালকে লইয়া একটী সবকমিটী নিয়োগ করা হউক এবং বাবু বিপিন চন্দ্র পাল তাহার সম্পাদক নিযুক্ত হউন; এবং আগামী আগষ্ট মাসের তৃতীয় সপ্তাহে অধ্যক্ষ সভার সভ্যদিগকে একটী বিশেষ অধিবেশনের জন্য আহ্বান করা হউক। ঐ অধিবেশনে যেন সবকমিটী তাঁহাদের প্রস্তুত নিয়মাবলী বিচারার্থ অর্পণ করেন।

বাবু মথুরামোহন গঙ্গোপাধ্যায় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে পর বাবু হরকিশোর বিশ্বাস প্রস্তাব করিলেন যে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত ও বাবু সীতানাথ দত্তকেও এই সবকমিটীর সভ্যশ্রেণীভুক্ত করা হউক। বাবু জয়কৃষ্ণ মিত্র এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। প্রস্তাব গ্রাহ্য হইল না।

তাহার পর বাবু বিপিন চন্দ্র পালের প্রস্তাবে ও বাবু উমাপদ রায়ের সমর্থন অনুসারে সভা ধার্য্য করিলেন যে বাবু হীরালাল হালদার ঐ সবকমিটীর সম্পাদক নিযুক্ত হউন এবং বাবু বিপিন চন্দ্র পাল কেবল সভ্য থাকুন।

তাহার পর এই সংশোধনের সহিত বাবু হীরালাল হালদারের উপরিলিখিত প্রস্তাব সভায় গৃহীত হইল।

প্রস্তাবকারী পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, সমর্থনকারী বাবু সীতানাথ নন্দী; প্রস্তাব—শ্রীমতী কাদম্বিনী সান্যালকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যশ্রেণীভুক্ত করা হয়। প্রস্তাব গ্রাহ্য হইল।

প্রস্তাবকারী বাবু হরকিশোর বিশ্বাস, সমর্থনকারী বাবু শশিভূষণ বসু (সহকারী সম্পাদক) প্রস্তাব—বাবু মনোরঞ্জন গুহকে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য শ্রেণীভুক্ত করা হউক। প্রস্তাব গ্রাহ্য হইল।

তাহার পর কলিকাতার বাবু শশিভূষণ সেন, সুরীর ডাঃ ডি, বসু, কাশীর বাবু মহেন্দ্র নাথ সরকার, বাঁকুড়ার বাবু বারাণসী চট্টোপাধ্যায় এবং রতলমের বাবু রাজচন্দ্র চৌধুরীর লিখিত পত্র পাঠ করা হয়, এবং ধার্য্য হয় যে ঐ সকল পত্রস্থ বিষয়ের মীমাংসার ভার কার্য্য নির্ব্বাহক সভার উপর দেওয়া হউক।

তৎপরে নিয়ম সংশোধনার্থ যে সবকমিটী নিযুক্ত হইয়াছে তাহার সম্পাদকের পত্র পাঠ করা হইল। তিনি আরও কিছু দিনের সময় চাহিয়াছেন।

প্রস্তাবকারী বাবু হীরালাল হালদার, সমর্থনকারী বাবু শশিভূষণ বসু; প্রস্তাব,—উক্ত সবকমিটীকে অনুরোধ করা হয় তাঁহারা যেন অধ্যক্ষ সভার আগামী আগষ্ট মাসের বিশেষ অধিবেশনে তাঁহাদের কার্য্য বিবরণ সভ্যদিগের গোচর করেন। প্রস্তাব গ্রাহ্য হইল।

সংবাদ।

ছাত্রসমাজ—গ্রীষ্মাবকাশের পর ১৩ই আষাঢ় হইতে উক্ত সমাজের কার্য্য পুনরারম্ভ হইয়াছে। প্রথমদিনের উপাসনায় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং "ছাত্র জীবনের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব" সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। উপদেশের সার মর্ম্ম এই যে শক্তি ও সুবিধা অনুসারে দায়িত্বের তারতম্য হয়। ছাত্রগণ যে শিক্ষা লাভ করিতেছেন তাহাতে তাঁহাদের সৎকার্য্য করিবার উপায় ও সুবিধা পরিবর্দ্ধিত হওয়াতে তৎসঙ্গে তাঁহাদের দায়িত্বও বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রকৃত শিক্ষার লক্ষণ তিনটী; (১) ইহা দ্বারা শিক্ষিত ব্যক্তির মানসিক শক্তি এরূপ বিকাশ প্রাপ্ত হইবে যে তাহা হইতে ব্যক্তিগত ও জাতিগত আত্ম-নির্ভরের ভাব স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে; (২) ইহা দ্বারা শিক্ষিত ব্যক্তিগণ অশিক্ষিত লোকদিগের অপেক্ষা অধিক সুনীতি পরায়ণ ও জিতেন্দ্রিয় হইবেন; (৩) তাঁহারা সমাজকে উন্নত করিতে সমর্থ হইবেন। এই লক্ষণ দ্বারা বিচার করিলে দেখা যায় যে গত পঞ্চাশৎ বৎসরে আমাদের দেশের লোক যে শিক্ষা পাইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ কার্য্যকর হয় নাই। বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগের দ্বারা এই পৃথিবীর অনেক মহৎ কার্য্যের প্রথম বীজ রোপিত হইয়াছিল। তাহার দুই চারিটী দৃষ্টান্ত দিয়া উপদেষ্টা বলিলেন, বঙ্গদেশের ছাত্রদিগের কর্ত্তব্য ও দায়িত্বের বিষয় তাঁহারা যেন একটু ভাল করিয়া চিন্তা করেন এবং চরিত্রের পবিত্রতা, মিতাচার, ব্যায়াম, জ্ঞানচর্চ্চা, পারিবারিক ও অন্যান্য প্রকার ভালবাসার সদ্ব্যবহার প্রভৃতি দ্বারা শরীর, মন ও হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধনে যত্নবান হন ও সর্ব্বোপরি ঈশ্বরকে প্রাণের সহিত ভালবাসেন। কলিকাতার নাট্যালয় ও অন্যান্য প্রলোভন হইতে তাঁহাদিগকে সর্ব্বপ্রযত্নে দূরে থাকিতে অনুরোধ করিয়া বক্তৃতা শেষ করা হয়।

শ্রাদ্ধ—১৫ই আষাঢ় মঙ্গলবার বাবু হরনাথ বসুর পরলোকগতা পত্নীর প্রথম বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে তাঁহার কোন আত্মীয়ের বাটীতে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। উপদেশের সময় শ্রদ্ধাস্পদ উমেশবাবু উক্ত পরলোকগতা ভগ্নীর ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস ও নির্ভর সম্বন্ধে দুই একটী বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করিয়াছিলেন।

২৯এ আষাঢ় মঙ্গলবার চন্দননগরে বাবু ভগবানচন্দ্র বসুর পরলোকগতা জননীর আদ্যশ্রাদ্ধ ক্রিয়া ব্রাহ্ম পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

নামকরণ—১০ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার কলিকাতায় ব্রাহ্মবন্ধু বাবু রাধারমণ সিংহের দ্বিতীয় পুত্রের নামকরণ হইয়া গিয়াছে। বালকের নাম সত্যরঞ্জন রাখা হইয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। রাধারমণ বাবু এই উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ ফণ্ডে ৫৲ পাঁচ টাকা, প্রচার ফণ্ডে ২৲ দুই টাকা, দাতব্য বিভাগে ২৲ দুই টাকা,

মধ্যবঙ্গ সম্মিলনী সভায় ১৲ এক টাকা ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ পুস্তকালয়ে ৪৲ চারি টাকা দান করিয়াছেন।

জাতকর্ম্ম—খলিলপুর ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক লিখিয়াছেন যে বিগত ৬ই বৈশাখ তত্রত্য ব্রাহ্মবন্ধু বাবু রজনীকান্ত সরকার মহাশয়ের প্রথম পুত্রের জাতকর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়াগিয়াছে। বাবু দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

বাল্য-বিবাহ—গত ২৫এ আষাঢ় শুক্রবার অপরাহ্ন ৫॥ টার সময় সিটি কলেজ ভবনে কলিকাতা ছাত্র সভার এক অধিবেশন হয়। তাহাতে আমাদের বন্ধু বাবু বিপিনচন্দ্র পাল "বাল্য-বিবাহ সম্বন্ধে সম্প্রতি যে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে" তদ্বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাটী বেশ সুযুক্তিপূর্ণ হইয়াছিল।

মাঙ্গালোর উপাসনা সমাজ—সুবোধ পত্রিকায় মাঙ্গালোর উপাসনা সমাজের ১৮৮৬।৮৭ সালের যে কার্য্য বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে প্রতি রবিবারে প্রাতঃসন্ধ্যা সমাজের উপাসনা মন্দিরে নিয়মিত উপাসনা হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন প্রতি বুধবার প্রাতে উপাসনা হয়। মন্দির নির্ম্মিত হইয়া অবধি ক্রমেই উপস্থিত লোক সংখ্যা বাড়িতেছে। উপকর্ম্ম, দীপাবলী ও নববর্ষের অবকাশের সময়ে বিশেষ উপাসনা হয়, এবং বিগত ৮ই জানুয়ারি বাবু কেশবচন্দ্র সেনের স্মরণার্থ মন্দিরে একটী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। মন্দিরে উপাসনা ও উপদেশ ভিন্ন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য অন্য কোন বিশেষ উপায় অবলম্বন করা হয় নাই। তবে বৎসরের মধ্যে একমাসকাল প্রত্যহ বাড়ী বাড়ী গিয়া উপাসনা করা হইয়াছিল। গত উৎসব উপলক্ষে সভ্যগণ চাঁদা তুলিয়া ৫৮৲ আটান্ন টাকার চাউল ও কাপড় দরিদ্রদিগের মধ্যে বিতরণ করেন। এতদ্ভিন্ন সমাজের ১৬ ষোল জন সভ্য প্রত্যেকে প্রত্যহ এক মুষ্টি করিয়া চাউল দেন। তাহা হইতে একজন অসমর্থ, দরিদ্র বৃদ্ধকে প্রত্যহ আগ্রসের চাউল দিয়া সাহায্য করা হয়। সমাজের অন্তর্ভূত একটী ব্রাহ্ম বিদ্যালয় আছে। তাহাতে গত বৎসর বাবু কেশবচন্দ্র সেন কৃত "প্রকৃত বিশ্বাস" (True Faith) নামক পুস্তক ও শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধ পঠিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রঘুনাথ কুণ্ডাপুরে বদলী হওয়াতে সমাজের সংসৃষ্ট সংগীত বিদ্যালয়ের কার্য্য বন্ধ করিতে হইয়াছে। গত বৎসর অনেক নূতন লোক সমাজের সভ্যশ্রেণী ভুক্ত হইয়াছেন

গতবারের পর হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তত্ত্বকৌমুদীর মুল্যপ্রাপ্তি স্বীকার।

শ্রীযুক্ত বাবু অনাথবন্ধু রায়	কাকিনীয়া	৫৲
,, ,, তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়	কলিকাতা	১৲
,, ,, কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য	রাণীগঞ্জ	৩৲
,, ,, মন্মথনাথ দত্ত	কলিকাতা	১৲
,, ,, জহরীলাল পাইন	ঐ	১৲
শ্রীযুক্ত বাবু নন্দলাল মিত্র	কলিকাতা	১৲
,, ,, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী	ঐ	১৲
,, ,, হরেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী	ঐ	২॥০
,, জানকীবল্লভ সেন	মাহিগঞ্জ	১৲
শ্রীমতী কালীসুন্দরী দেব	আসাম	৬৲
শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়	রাজারামপুর	৩৲
,, ,, কৈশিকীচরণ গুপ্ত	ডেব্রুগড়	৩৲
,, ,, দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী	চন্দননগর	২॥০
,, ,, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়	কলিকাতা	১৲
,, ,, অধরচন্দ্র দাস	ঢাকা	৩৲
,, অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়	বোলপুর	৩৲
সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজ	বরিশাল	৩৲
	নোয়াখালী	২৷০
শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনবিহারী বসু	লক্ষ্ণৌ	৩৲
,, ক্ষেত্রমোহন দত্ত	কলিকাতা	১৲
,, যজ্ঞেশ্বর সিংহ	ভাস্তাড়া	৩৲
,, রজনীকান্ত সরকার	খলিলপুর	৩৸০
,, মতিরাম মাইতি	কাঁথি	২॥০
,, কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ ব্রাঃ সঃ	রাঞ্চি	৭৷০
,, মহিমচন্দ্র রায়	নাটোর	৩৲
,, খগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	সৈয়দপুর	৩৲
,, গিরীশচন্দ্র কাঞ্জিলাল	নিলফামারী	৩৲
,, বিষ্ণুচরণ দাস	শিলিগুড়ী	৩৲
,, রাধানাথ রায়	ঐ	৩৲
,, হরসুন্দর মজুমদার	ঐ	৩৲
,, দামোদরপ্রসাদ সরকার	ঐ	৪॥০
,, নবদ্বীপচন্দ্র সরকার	জলপাইগুড়ী	
,, প্রতাপচন্দ্র খাসনবিশ	দিনাজপুর	২৲
,, কালীকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	সৈয়দপুর	৩৲
,, ললিতমোহন সিংহ	বাঁশবেড়ে	৬৲
,, কৃপানাথ মজুমদার	দ্বারভাঙ্গা	৩৲
,, যদুনাথ রায়	রামপুরহাট	৩৲
,, মহেন্দ্রলাল সরকার	বেনারস	২॥৶০
,, উদয়রাম দাস	কালীডেন	৩৲
,, শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী	কাঁথি	৪৲
,, রাজকুমার দত্ত	জৈনসর	১॥০
,, ,, শশিভূষণ ঘোষাল	সাহাজাদপুর	২৲
,, ,, রজনীকান্ত বসু	দিনাজপুর	[illegible]
,, ,, আনন্দচন্দ্র ঘোষ	মাহিগঞ্জ	৩৲
শ্রীমতী যোগমায়া ঘোষ	রঙ্গপুর	৩৲
বাবু ঈশানচন্দ্র গুপ্ত	ঐ	

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকার সম্পাদকের নামে, যাঁহারা প্রবন্ধ পত্রিকা বা পুস্তকাদি প্রেরণ করেন, তাঁহারা যেন এখন হইতে অনুগ্রহ পূর্ব্বক ঐ সকল প্রবন্ধ, পত্রিকা ও পুস্তক ৭৩নং মাণিকতলা ষ্ট্রীটে সম্পাদকের ঠিকানায় পাঠাইয়া দেন।

তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক।

১৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিসন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র দত্ত দ্বারা ১৪ই শ্রাবণ মুদ্রিত ও ২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১০ম ভাগ। ৯ম সংখ্যা।

১লা ভাদ্র বুধবার, ১৮০৯ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৮।

বাৎসারিক অগ্রিম মূল্য ২৷৹
মফস্বলে ৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵৹

পূজার আয়োজন।

তব আঁখি' পরি, মম আঁখি ধরি
নাহি গো সাহস হয়,
তব সন্নিধানে, কলঙ্কিত প্রাণে,
যেতে কাঁপে এ হৃদয়।
মম ক্ষুদ্র কর, যদি তুমি ধর,
তা হ'লে সাহস পাই,
মধুর আহ্বানে, আশা দিলে প্রাণে,
তব কাছে ছুটে যাই।
বিশ্ব মাঝে নাই, বিন্দু মাত্র ঠাঁই,
যথা প্রাণ হয় থির;
তব অঙ্ক ভিন্ন, নাহি স্থান অন্য,
রাখিতে পাপীর শির।
যেকোনা অন্তরে —ত্বরিত অন্তরে,
কর গৃহ বিরচন,—
বিরলে তথায়, তোমায় আমায়,
হবে প্রেম-আলাপন।

প্রস্তুত না হইলে যদি তোমার কাছে যাওয়া না যায়, তাহা হইলে তোমার কাছে আমার যাওয়া হইল না। আমি তো প্রস্তুত হইতে আজও আরম্ভ করিতে পারিলাম না। তোমার কৃপার সাহায্যে যদি একটী দোষ কোন মতে তাড়াইতে পারি, অমনি আর পাঁচটী দোষ চোখের কাছে প্রকাশ পায়। আত্মার বসন, অপরাধে পাপে এত ছিন্ন হইয়াছে যে, গ্রন্থি দিয়া আর তাহাকে বজায় রাখিতে পারি না। কত গ্রন্থি দিব, এই গ্রন্থি দি, আবার ছিঁড়িয়া যায়! তবে কি সংসারেই বাস করিতে হইবে? না প্রভু, তুমি সদাই বল, "সন্তান, তুমি যেমন অবস্থায় থাক না কেন, আমার কাছে আসিলেই আমি অঙ্কে ধারণ করিব।" তোমার কথায় আমার মৃত, কুণ্ঠিত, ভারাক্রান্ত প্রাণে আশার সঞ্চার হয়। মনস্থির করিতে বা প্রস্তুত হইতে অপেক্ষা করি না, উদ্বোধনের জন্য মনকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দিই না, একেবারে ছুটিয়া তোমার কাছে গিয়া পড়ি! তোমার সাধ আমাকে সতত পুণ্য ও প্রেমে সজ্জিত দেখ, কিন্তু সে সজ্জা আমার দ্বারা হবে না। সাজাতে সাধ থাকে, কাছে গেলে সাজায়ে দিও। তুমি যে সাজ ভাল বাস, পৃথিবীতে আমি তাহা কোথায় পাইব? আপন বলে আমি কেমন করিয়া তাহা আহরণ করিব।

হে নিত্য, অপরিবর্ত্তনীয়, অনন্ত পরমেশ্বর, চঞ্চলতা দূর কর। তুমি নিত্য, তোমার ছেলেকে অনিত্যে আবদ্ধ রাখা ভাল দেখায় না। লোকে বলিবে কি, প্রাণই বা কি বলিবে? নিত্য তোমার দর্শনরূপ হীরকের যোগ্য পাত্র আমি নহি বটে, কিন্তু তুমি কি যোগ্যতা দেখে স্বর্গের ধনরত্ন বিতরণ কর? আমি কিসের যোগ্য? আমাতে তো কোন উপযুক্ততা দেখিতে পাই না;—সহবাস দূরে থাকুক, আমি তোমার পরিচয়েরও উপযুক্ত নহি। নিত্য উপাসনা, নিত্য সহবাস, নিত্য যোগ আমার অতিশয় আবশ্যক হইয়াছে। তোমার নিকট হইতে দূরে গিয়া পড়িলে এখন ভয় করে; মনে হয় যে, প্রাণ বুঝি থাকিবে না। মেয়াদী বন্দোবস্ত করিয়া এতদিন কাটাইয়াছি বলিয়া হৃদয়-ভূমির বিশেষ কিছু উন্নতি করিতে পারি নাই। এখন একবার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কর, আমি নিশ্চিন্ত হইয়া তোমার মহলে প্রকৃত ধর্ম্মের আবাদ করি।

হে মন্ত্রিন, আমরা সকলে একটী গুপ্ত চক্রান্ত করিতেছি। পাপ মনে করিয়াছে, আমরা নিদ্রিত আছি ও পরিত্রাণে নিরাশ হইয়া সাংসারিকতার স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়েছি; তাই সে আপন বন্ধন একটু শিথিল করিয়াছে। এই শুভ অবসর পাইয়া আমরা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, পাপের বন্ধন ছিন্ন ও তাহার মস্তক চূর্ণ করিব। তোমার কাছে ভিক্ষা,—আশীর্ব্বাদ কর, মৃত প্রাণে বল সঞ্চার কর। "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন" কথা কি আমরা কখন বলিতে পারিব না? অমৃতের অধিকারী, স্বর্গের জীব হইয়া কি চিরকালই অধর্ম্ম ও পাপের দাস হয়ে থাকিব? আমাদের গুপ্ত ষড়যন্ত্র সফল কর। আমাদের উন্নতি দেখিয়া দুঃখী পাপী যে যেথানে আছে, সকলে আসিয়া তোমার ঘরে প্রবেশ করুক।

আমরা সবাই শিশু ও শিক্ষার্থী। আমাদের মধ্যে তবে অভিমান ও অহঙ্কার থাকিবে কেন? আমাদের সকলেরই বাসনা যে, তোমার কাছে গিয়া মনের ব্যথা জানাই, প্রাণের জ্বালা নিবারণ করি। পাপ-অহি আমাদের সকলকেই দংশন করিয়াছে, বিষে সকলেরই মর্ম্মস্থান জ্বলিতেছে। যন্ত্রণার সময় কি কেহ বড়-ছোটর বিচার করে? প্রভু, অসদ্ভাব-রাক্ষসের শিরে এমন আঘাত কর, যে সে একেবারে বিনষ্ট হউক। পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস ও ক্ষমা দাও। আমরা এত পাপ করি, তবু তুমি আমাদিগকে বিশ্বাস কর, তোমাকে এত আঘাত করি, তুমি অকাতরে সহ্য কর;—তোমার ছেলে মেয়েকে তবে কেন আমরা অবিশ্বাস করিব, কেন তাদের দুটা আঘাত হাস্যমুখে সহ্য করিতে পারিব না? আমরা কেবল কি কথায় তোমার পুত্র থাকিব, কোন বিষয়েই তোমার অনুকরণ করিতে পারিব না?

অনন্ত আকাশে উড়িয়া উড়িয়া মন পাখী শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, অনন্ত জ্ঞান দেখিয়া দেখিয়া চিত্ত অবাক্ হইয়া গিয়াছে, অনন্ত প্রেম ছুঁইয়া ছুঁইয়া হৃদয় অবশ হইয়া পড়িয়াছে। এখন আমার উপায় কি হবে প্রভু? মনের উপর কি আমাকে সকল অধিকার ছাড়িতে হইবে? তুমি বল, 'ছাড়িলেই বা, তাহাতে তোমার লাভ বই ক্ষতি তো নাই!"

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

যোগতত্ত্ব।

(তৃতীয় প্রস্তাব।)

প্রকৃত বিশ্বাসব্যতীত কখনই ভক্তি জন্মিতে পারে না। জ্ঞানযোগদ্বারা বিশ্বাস সমুজ্জ্বল হইলে, পরমেশ্বরের সৌন্দর্য্য উজ্জ্বল ও প্রত্যক্ষ ভাবে প্রাণের মধ্যে উপলব্ধি করিলে, ভক্তির উৎস আপনা আপনি খুলিয়া যায়। এই ভক্তি একবার জন্মিলে সাধনের কঠোরতা চলিয়া যায়, পাপ দূর করা সহজ হইয়া পড়ে, এবং পরমেশ্বরের সহিত আমাদের সম্বন্ধ আরও ঘনিষ্ঠতর হয়। ভক্তিই সংসারাসক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ। আমরা স্বীকার করি যে, শুদ্ধ জ্ঞানালোকদ্বারা সংসারের অনিত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া সংসারাসক্তির হস্ত অতিক্রম করা, শুদ্ধ ইচ্ছাশক্তির পরিচালনদ্বারা রিপু দমন করা, অসম্ভব নহে। কিন্তু এরূপ সাধন অত্যন্ত কঠিন এবং সাধারণের পক্ষে এ সাধনে কৃতকার্য্য হওয়া সম্ভব নহে। এ সংসারে প্রকৃত চিন্তাশীল লোক কয় জন পাওয়া যায়? আপনার উপর কয় জন লোকের তেমন কর্তৃত্ব আছে? যে দিকে চাও দেখিবে সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ নরনারী নদীবক্ষঃস্থ তৃণের ন্যায় নিশ্চেষ্টভাবে অনন্তস্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। কেবল তাহাই নহে—যাঁহারা শুদ্ধ চিন্তাদ্বারা সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন, যাঁহারা শুদ্ধ চিত্তের দৃঢ়তাদ্বারা রিপুগণকে আপনাদের ইচ্ছাশক্তির অধীন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারা যে সর্ব্বাবস্থায় ও সকল প্রকার প্রলোভনের মধ্যে অটল ভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে পারিবেন, কখনও কোনও কারণে যে তাঁহাদের হৃদয়স্থিত জ্ঞানসূর্য্য মেঘাচ্ছন্ন হইবে না, প্রবৃত্তির আকর্ষণ তাঁহাদের ইচ্ছাশক্তির উপর জয়লাভ করিবে না, এমন কথা সাহস করিয়া কে বলিতে পারে? পুরাকালের ঋষিগণের মধ্যে কেহ কেহ যে বহুবৎসরব্যাপী কঠোর তপশ্চর্য্যার পরেও প্রলোভনের হস্ত অতিক্রম করিতে পারিতেন না বলিয়া উল্লিখিত আছে, তাহার কি কোন অর্থ নাই? তাঁহাদের জীবন উজ্জ্বলভাবে সপ্রমাণ করিতেছে যে শুদ্ধ চিন্তা বা চিত্তের দৃঢ়তাদ্বারা মানুষ সকল সময়ে সংসারাসক্তির হস্ত অতিক্রম করিতে পারে না, প্রবৃত্তির উত্তেজনা হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে না।

জড় জগতে দেখা যায়, কোন একটী আকর্ষণের বলে যখন কোন পদার্থের একদিকে গতি হয়, তখন সেই পদার্থকে বিপরীত দিকে চালাইতে হইলে তদভিমুখে প্রথমোক্ত বল অপেক্ষা অধিক বল প্রয়োগ করা আবশ্যক। আধ্যাত্মিক জগতেও সেইরূপ। পশু ভাবের হস্ত অতিক্রম করিতে হইলে দেবভাব বর্দ্ধিত করা চাই; নীচ আসক্তি সমূহ দূর করিতে হইলে উচ্চতর বিষয়ে চিত্তকে নিবিষ্ট করা চাই; সংসারের প্রতি অনুরাগ দূর করিতে হইলে পরমেশ্বরের প্রতি অনুরাগ চাই। আমাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিনিচয়কে একেবারে বিনষ্ট করিয়া ফেলা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। কোন না কোন আকারে তাহারা প্রকাশিত হইয়া পড়িবেই। ভগবান্ শুকদেব সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়াও কৌপীনের মায়া ছাড়িতে পারেন নাই। কি পার্থিব, কি অপার্থিব সকল পদার্থের প্রতি অনুরাগশূন্য—এমন মনুষ্যের অস্তিত্ব সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না; এবং এরূপ জীবন সম্ভব হইলেও উহা কতদূর বাঞ্ছনীয় তাহা আমরা বলিতে পারি না। আমাদের বিবেচনায় মানুষ যতদিন বর্ত্তমানপ্রকৃতিবিশিষ্ট থাকিবে, ততদিন কোন না কোন বিষয়ের দিকে তাহার অনুরাগ ধাবিত হইবেই। যাহার উচ্চ বিষয়ে অনুরাগ নাই, তাহার চিত্ত নীচ বিষয়ের প্রতি আসক্ত হইয়া পড়ে। এই জন্য নীচ প্রকৃতি দমন করিতে হইলে, উচ্চ বিষয়ে অনুরাগ স্থাপন করা সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত উপায়।

এই অনুরাগ যখন পরমেশ্বরের দিকে ধাবিত হয় তখন ইহা ভক্তি বা প্রেম নামে অভিহিত হইয়া থাকে। মনুষ্য সম্বন্ধেও 'ভক্তি' ও 'প্রেম' কথার ব্যবহার আছে বটে, কিন্তু আমরা বর্ত্তমান প্রস্তাবে যে ভক্তিযোগের কথা বলিতেছি তাহা কেবল ঈশ্বরসম্বন্ধেই প্রযুজ্য। অনুরাগের যে সকল সাধারণ লক্ষণ আমরা সংসারে দেখিতে পাই, ভগবদ্ভক্তি বা প্রেমের মধ্যেও সেই সকল লক্ষণ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। সাংসারিক প্রেমের প্রধান লক্ষণ এই যে, যে যাহাকে ভাল বাসে সে সর্ব্বদা তাহার নিকটে থাকিতে

ও তাহার কথা শুনিতে ইচ্ছা করে, তাহার অদর্শনে সে অত্যন্ত কষ্ট পায়, প্রেমাস্পদের নাম এবং তাহার সহিত যে কোন পদার্থের অণুমাত্র সংস্রব আছে, তৎসমুদয় তাহার প্রিয় হয়। ঈশ্বর সম্বন্ধেও ঠিক্ তাহাই ঘটিয়া থাকে। প্রাণের মধ্যে ইষ্ট দেবতার দর্শন ও সহবাস লাভের ইচ্ছা, বিবেককর্ণে তাঁহার সুমধুর ও জীবন্ত বাক্য শ্রবণের বাসনা, এবং সমস্ত জগতের প্রতি প্রীতি ভগবদ্ভক্তির প্রধান লক্ষণ। পরমেশ্বরের সহিত এই ভক্তিযোগ সংস্থাপিত করিতে হইলে প্রথমতঃ বিশ্বাসচক্ষে তাঁহার সৌন্দর্য্য ও প্রেম এবং তাঁহার সহিত আমাদের আত্মার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ উজ্জ্বলরূপে অনুভব করিতে হইবে। জগতের প্রত্যেক পদার্থের মধ্যে তাঁহার প্রেম, পবিত্রতা ও সৌন্দর্য্য পরিষ্কাররূপে দর্শন করিতে হইবে; আমাদের প্রাণের সমস্ত অনুরাগ ক্রমে ক্রমে অন্য সকল পদার্থ হইতে পৃথক্ করিয়া তাঁহাতে অর্পণ করিতে হইবে। এইরূপে আমাদের প্রেম যখন পরমেশ্বরের মধ্য দিয়া বিশোধিত হইয়া আমাদের পরিবার, আত্মীয়স্বজন এবং পৃথিবীস্থ সকল নরনারী ও জীবজন্তুর উপর ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে, তখন সমস্ত জগৎ পরমেশ্বরের পবিত্র মন্দিররূপে, স্বর্গরূপে প্রতীয়মান হইবে। হৃদয় যখন এই অবস্থায় উপনীত হয়, তখন আর অপবিত্রতা,সংসারাসক্তি ও মায়ামোহ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। ভক্তিযোগ-সম্বন্ধে একটী কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে দীনাত্মা না হইলে ভক্তির উদ্রেক হয় না। যে হৃদয় অহঙ্কারে স্ফীত তাহাতে ভক্তির জল দাঁড়াইতে পারে না।

নামসাধন ভক্তিযোগ স্থাপনের একটী প্রধান উপায়। পরমেশ্বরের যে নামটী যাঁহার নিকট বিশেষ প্রিয় বলিয়া বোধ হয়, অনুরাগের সহিত সেই নামটী এমন ভাবে জপ করিতে হয়, যাহাতে নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে পরমেশ্বরের সৌন্দর্য্য ও প্রেম হৃদয়ে অনুভব করিতে পারা যায়। এইরূপে অভ্যাস করিতে করিতে ক্রমে মনের অবস্থা এমন হয় যে, সেই নামটী মনে হইবামাত্র অথবা শুনিবামাত্র প্রাণ ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া যায়। কিন্তু নামসাধন সম্বন্ধে একটী কথা মনে রাখা অত্যাবশ্যক যে, পরমেশ্বরের নাম যেন কখন বৃথা ও চিন্তাহীনভাবে উচ্চারণ করা না হয়। ইহাতে যে কেবল নাম সাধনের কোন ফল হয় না, তাহা নহে; পরন্তু হৃদয় অসাড় ও কঠিন হইয়া ভক্তি-রসাস্বাদনে অসমর্থ হইয়া পড়ে।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, মনন বা চিন্তাই ভক্তিযোগ সাধনের একমাত্র উপায়। পরমেশ্বরের সৌন্দর্য্য ও প্রেম উপলব্ধি করাই বল, তাঁহার সহিত জীবাত্মার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হৃদয়ঙ্গম করাই বল, আর নামের সহিত ঈশ্বরের স্বরূপের যোগ স্থাপনের জন্য নাম সাধন করাই বল—সমস্তই চিন্তাসাপেক্ষ। সুতরাং যাহাতে এই চিন্তার কার্য্য অক্ষুণ্ণভাবে চলিতে পারে, তদ্বিষয়ে মনোযোগী হওয়া প্রত্যেক ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তির সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। কোন শারীরিক প্রক্রিয়াদ্বারা এই সকল মানসিক ব্যাপার কিরূপে সাধিত হইতে পারে, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

ব্রহ্মস্বরূপ

তৎপরে,ঈশ্বরের নৈতিক স্বরূপ সমূহের (moral attributes) —তাঁহার পূর্ণ মঙ্গল ও পূর্ণ পবিত্রতা স্বরূপের আলোচনা করা যাউক। ঈশ্বর যে পূর্ণ মঙ্গল ও পূর্ণ পবিত্র স্বরূপ ইহা জানিবার জন্য বাহিরে যাইতে হয় না। অন্তরে তাঁহার পূর্ণ মঙ্গল ভাব ও পূর্ণ পবিত্রতার উজ্জ্বল প্রমাণ বর্ত্তমান। যে সকল ধর্ম্মবিজ্ঞানবিৎ অন্তরের আলোকের দিকে না চাহিয়া বহির্জগতের ঘটনাবলী দৃষ্টে ঈশ্বরের পূর্ণ মঙ্গলস্বরূপ ও পূর্ণ পবিত্রতা সপ্রমাণ করিতে প্রয়াস পান তাঁহারা নিতান্তই স্থূলদর্শী। পূর্ব্বেই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে জগতের ঘটনাবলী হইতে ঈশ্বরের পূর্ণ মঙ্গল স্বরূপ সপ্রমাণ করা অসম্ভব। যদি কেবল জগতের সুখ দেখিয়া 'সৃষ্টিকর্ত্তা দয়াময়' ইহা সিদ্ধান্ত করিতে হয়, তবে জগতের দুঃখ দেখিয়া বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। জগতের পুণ্য পবিত্রতা দেখিয়া যদি সৃষ্টিকর্ত্তার পূর্ণ পবিত্রতা সিদ্ধান্ত করিতে হয়, তবে জগতের পাপ অপবিত্রতা দেখিয়া বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। বিশ্বাসী যে শত শত দুঃখ ভুগিয়া, ও দেখিয়াও বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বর দয়াময়,—নিজেকে এবং নিকটস্থ লোকদিগকে শত শত পাপে পাপী দেখিয়াও বিশ্বাস করেন ঈশ্বর পুণ্যবান, তাহা বাহিরের ঘটনা দেখিয়া নহে; তাঁহার বিশ্বাসের ভিত্তি অন্তরের আলোক। ভক্তিভাজন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যথার্থই বলিয়াছেন, বহির্জগতে ঈশ্বরের প্রতিরূপ, ও আত্মাতে তাঁহার রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, সেই আন্তরিক প্রমাণ কিরূপ দেখা যাউক। আমি যতই অপ্রেমের কার্য্য, পাপ কার্য্য করি না কেন, আমার মধ্যে এমন কিছু আছে যাহা সর্ব্বদাই প্রেমিক থাকে, পবিত্র থাকে। উহা সর্ব্বদা প্রেমিক এবং পবিত্র থাকে বলিয়াই আমি আমার এবং অন্যের অপ্রেমকে অপ্রেম বলি, পাপকে পাপ বলি। ইহাই সমুদায় প্রেম অপ্রেমের, সমুদায় পুণ্য পাপের বিচারক। ইহাই মানুষকে প্রেমিক বলে, অপ্রেমিক বলে; পাপী বলে, পুণ্যবান বলে; এবং ইহাই এক পূর্ণ প্রেম ও পূর্ণ পবিত্র স্বরূপ পুরুষে বিশ্বাস করিতে বাধ্য করে। এই বিশ্বাস ইহার প্রকৃতিনিহিত, কারণ ইহার নিজস্বরূপ নিরবচ্ছিন্ন প্রেম পবিত্রতাতে গঠিত। ইহাই মানবাত্মাতে ঈশ্বরের প্রকাশ, ঈশ্বরের আবির্ভাব। ইহাকেই উদার খ্রীষ্টানগণ মানবরূপে অবতীর্ণ নরদেব ঈশ্বর-পুত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করেন (the Word of God; the Light that lighteth every man that cometh into the world,) এবং ইহাকেই বৈদান্তিকেরা মায়া মোহ ও মলিনতাবর্জ্জিত সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মের সহিত একীভূত বলিয়া বিশ্বাস করেন। ব্রাহ্মসাহিত্যে ইহাই "বিবেকবাণী," "বিবেকে ঈশ্বরবাণী," "the Voice of God Conscience" বলিয়া বর্ণিত হয়। যাহা হউক, এই যে "উচ্চতর আমি," (Higher Self) ইহা মানুষ মাত্রেই বর্ত্তমান আছে।

* তত্ত্ববিদ্যা সভায় বাবু সীতানাথদত্ত কর্ত্তৃক পঠিত প্রবন্ধ

সাধু অসাধু, জ্ঞানী অজ্ঞানী, সভ্য অসভ্য সকলের মধ্যেই ইহা বর্ত্তমান। প্রশান্ত সময়ে, যে সময়ে পাশব প্রবৃত্তির উত্তেজনায় বিবেকচক্ষু মলিন হয় না, সেই সময়ে যদি অতি নৃশংস-স্বভাব অত্যাচারীকে, অতি হীনস্বভাব পাপাত্মাকেও জিজ্ঞাসা করা যায়, বল দেখি প্রেম ভাল কি অপ্রেম ভাল, বল দেখি পুণ্য শ্রেষ্ঠ কি পাপ শ্রেষ্ঠ, বল দেখি তুমি যে সমস্ত বস্তুর জন্য অত্যাচার কর, পাপ কর,—অন্ন, বস্ত্র, অর্থ, সুখ, যশ, মান, প্রভুত্ব, এই সমস্ত যদি অত্যাচার না করিয়া, পাপ না করিয়া পাও তবে অত্যাচার কর কিনা, আমার বিশ্বাস যে সে অসঙ্কোচে বলিবে "প্রেমই শ্রেষ্ঠ, পুণ্যই শ্রেষ্ঠ, বিনা অত্যাচারে অভিলষিত সমুদায় বস্তু পাইলে অত্যাচার করি না, পাপ করি না।" এই যে প্রেম পুণ্যের প্রতি স্বাভাবিক শ্রদ্ধা,স্বাভাবিক আকর্ষণ, ইহা মানব মাত্রেরই অন্তরে বর্ত্তমান। সকলের মধ্যে ইহা সমান উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত নহে। কাহারও কাহারও মধ্যে ইহার প্রকাশ অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল, কাহারও কাহারও মধ্যে অপেক্ষাকৃত মলিন। কিন্তু সকলের মধ্যেই অল্লাধিক পরিমাণে পূর্ণ মঙ্গল ও পূর্ণ পবিত্রতার আদর্শ বর্ত্তমান। যাহার মধ্যে যে পরিমাণে ইহা প্রকাশিত, তাহার নৈতিক দায়িত্ব তত, তাহার মধ্যে পাপ পুণ্যের সংগ্রাম তত অধিক। যাহা হউক, এই যে আত্মাতে ঈশ্বরের প্রকাশ, ইহাই তাঁহার পূর্ণ মঙ্গল ও পূর্ণ পবিত্রতা স্বরূপের উজ্জ্বল প্রমাণ। তিনি আত্মার ভিতরে স্পষ্টরূপে বলিতেছেন, 'আমি পূর্ণ মঙ্গলস্বরূপ, আমি পূর্ণ পবিত্র স্বরূপ'। আমরা তাঁহার এই স্পষ্ট বাক্য শুনিয়া তাঁহার স্বরূপ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতেছি। আমরা যে কখনও এই বাক্যে সন্দেহ করি না তাহা নহে, সময়ে সময়ে সন্দেহ করি, কিন্তু সে সন্দেহ আত্মঘাতী, সে সন্দেহ নিজেই নিজেকে কর্ত্তন করে।

সময়ে সময়ে আমাদের মনে এরূপ সন্দেহ আসিতে পারে, এবং আসে যে ঈশ্বর মানুষের মনে এই পূর্ণ মঙ্গল ও পূর্ণ পবিত্রতার আদর্শ দিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি প্রকৃত পক্ষে পূর্ণ মঙ্গল ও পূর্ণ পবিত্র স্বরূপ না হইতেও পারেন। এই সন্দেহাত্মক বাক্য স্ববিরোধী (self-contradictory), সুতরাং আত্মঘাতী। স্পষ্টভাবে বলিতে গেলে ইহাকে এই বুঝায় যে ঈশ্বর পূর্ণ না হইয়াও পূর্ণ রূপে প্রকাশিত হইতেছেন, অর্থাৎ পূর্ণ না হইয়াও মানব বিবেকে পূর্ণ হইয়াছেন; যাহা নহেন তাহাই হইয়াছেন। আর ইহাতে এই বলা হয় যে, স্রষ্টা নিজে যত বড় তাহা অপেক্ষা বড় একটা আত্মা সৃষ্টি করিয়াছেন,—নিজের যাহা নাই, সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে তাহাই দিয়াছেন। ইহাতে এই বলা হয় যে কেবল বিশ্বপ্রেমিক বুদ্ধদেব, ঈশা প্রভৃতি মহাত্মারা নহেন, আমাদের মত দীন হীন ক্ষুদ্র কীটও স্রষ্টা অপেক্ষা প্রেমপুণ্যে শ্রেষ্ঠতর, কেননা আমরাও সময়ে সময়ে সমগ্র জগৎকে আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা করি, আমরাও সময়ে সময়ে পুণ্যের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হই, এবং যে মুহূর্ত্তে এরূপ হয়, সে মুহূর্ত্তে বাস্তবিকই নির্ম্মল প্রেম পুণ্যে ভূষিত হই। আর উক্ত বাক্যে ইহাই বলা হয় যে ঈশ্বর স্বয়ং অপ্রেমিক, অপবিত্র হইয়াও মানুষকে এমন ভাবে গড়িয়াছেন যে মানুষ পূর্ণ প্রেম, পূর্ণ পবিত্রতাকেই ভাল বাসে, এবং অপ্রেম অপবিত্রতাকে ঘৃণা করে; অর্থাৎ পিতা সন্তানকে এমন ভাবে গড়িয়াছেন যাহাতে সন্তান যতই বাড়িবে ততই পিতাকে অধিকতর ঘৃণা করিবে ও গালাগালি দিবে এবং যাহা পিতার মনোমত নহে (অর্থাৎ প্রেম ও পবিত্রতা) ক্রমাগত সে দিকেই ঝুঁকিবে, এবং অবশেষে তাঁহার বিরুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে বিদ্রোহী হইয়া তাঁহার ঘৃণিত প্রেম পবিত্রতার রাজ্য সংস্থাপনেই ব্যস্ত হইবে। তাই তো! জগৎপিতা এতই নির্ব্বোধ! তাঁর সৃষ্ট নিতান্ত নির্ব্বোধ মানুষও তাঁহা অপেক্ষা সুবোধ! মানুষও নিজ সন্তানকে পিতৃবিদ্বেষ ও পিতৃদ্রোহিতা শিক্ষা দেয় না।

সুতরাং দেখিতেছি ঈশ্বরের পূর্ণ প্রেম ও পূর্ণ পবিত্রতা-বিষয়ক সন্দেহ সমূহ, আপত্তি সমূহ কি অসার, আর যাহারা এই সকল অসার সন্দেহ, অসার আপত্তি দ্বারা পুস্তক পূর্ণ করিয়া অসার পাঠকদের কাছে বুদ্ধিমান দার্শনিক বলিয়া প্রশংসা লাভ করে, তাহারা কি স্থূলদর্শী! আত্মজ্ঞান ও আত্ম-দৃষ্টিবিহীন হইয়া, অন্তরের উজ্জ্বল আলোকের প্রতি অন্ধ হইয়া, কেবল বহুমুখী হইয়া বাহিরের ব্যাপার লইয়া ব্যস্ত থাকিলে মানুষের এইরূপ দুর্দ্দশাই ঘটে।

ঈশ্বরের নৈতিক পূর্ণতা সম্বন্ধে উপরোক্ত উজ্জ্বল প্রমাণ পাইয়াই আমরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি। জগতের বিচিত্র নিয়ম শৃঙ্খলা ও ঘটনাবলী সাধারণ ভাবে এই প্রমাণকে সমর্থন করে, কিন্তু জগতের এমন প্রহেলিকাপূর্ণ ঘটনা অনেক আছে যাহা আপাততঃ ঈশ্বরের পূর্ণতা সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করে। বিশ্বাসকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান করাইবার জন্য এই সমুদয় ঘটনার বিচার অবশ্যম্ভাবী নহে। বিশ্বাসের প্রকৃত ভিত্তি আন্তরিক প্রমাণ। এই আন্তরিক প্রমাণ যতদিন উজ্জ্বলরূপে না পাওয়া যায় ততদিন মানুষ বাহ্যিক ঘটনার বিচারে ব্যতিব্যস্ত থাকে। আন্তরিক প্রমাণ উজ্জ্বল হইলে যে এই বিচারের আবশ্যকতা থাকে না, তাহা নহে; আবশ্যকতা থাকে, কিন্তু এই বিচার মীমাংসার উপর আধ্যাত্মিক বিশ্বাস, নির্ভর, আশা ও শান্তি নির্ভর করে না। যেখানে বুদ্ধি বুঝিতে পারে না, মীমাংসা করিতে পারে না, সেখানে আত্মা প্রজ্ঞাঘটিত উজ্জ্বল আলোকের দিকে চাহিয়া নিশ্চিন্ত হয়, এবং ক্রমে জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অবুদ্ধ বিষয় বোধগম্য হইবে এই আশা করে। জগতের প্রহেলিকাপূর্ণ ঘটনাসমূহ এবং ইহাদের সহিত ঈশ্বরের পূর্ণস্বরূপের সম্বন্ধ বিষয়ে কিছুকাল পূর্ব্বে আমি সঙ্গতসভাতে যাহা বলিয়াছিলাম, এবং স্থানান্তরে তাহার যে বিবরণ দিয়াছিলাম এস্থলে তাহা পাঠ করিব। (ক্রমশঃ)

ধর্ম্মজীবনে অধ্যবসায়।

সংসারের সকল বিষয়েই লোকে পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের আবশ্যকতা স্বীকার করিয়া থাকে। পরিশ্রম ভিন্ন মানুষ কোন কার্য্যেই সফলকাম হইতে পারে না। অধ্যবসায় ভিন্ন কোন গুরুতর বিষয়ই সম্পন্ন হয় না। ধর্ম্মজীবন লাভ করা অপেক্ষা

মনুষ্যের পক্ষে গুরুতর কার্য্য আর কি হইতে পারে? ইহা অপেক্ষা অধিকতর দুর্ল্লভ বস্তু জগতে আর কি আছে? অথচ আমাদের ব্যবহার দেখিয়া বোধ হয় যে, ধর্ম্মজীবন অতি সহজলভ্য পদার্থ। আমরা ইহার জন্য বিশেষ পরিশ্রম করা আবশ্যক বলিয়া বোধ করি না। অন্ততঃ আমাদের কার্য্য দেখিয়া ত সেরূপ মনে হয় না। বোধ হয় ব্রাহ্ম সমাজের অন্তর্ভূত অনেকেই দৈনিক উপাসনা ব্যতীত ধর্ম্মলাভের জন্য আর কোন বিশেষ উপায় অবলম্বন করেন না। তাহাও আবার হয় ত অনেক সময় শুদ্ধ নিয়ম রক্ষাতেই পর্য্যবসিত হয়। এই সকল লোক যে একেবারে ধর্ম্মপিপাসু নহেন তাহা নহে। ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে তাঁহাদের মনে মনে সাধ আছে। তাঁহাদের জীবনের বর্ত্তমান অবস্থায় যে তাঁহারা বিশেষ সুখী বা সন্তুষ্ট নহেন তাহাও আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু এরূপ সাধে কোন কাজ হয় না। সুখশয্যায় শয়ন করিয়া স্বর্গে যাওয়া যায় না। আজি আমার অবস্থা মন্দ আছে, কল্য নিদ্রাভঙ্গের পর দেখিব আমার অবস্থা একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, এরূপ ঘটনা অসম্ভব। রাতারাতি কেহ ধনী বা বিদ্বান্ হইতে পারে না। তবে রাতারাতি ধার্ম্মিক হওয়া সম্ভব মনে করিবে কেন? ধর্ম্ম কি ধন ও বিদ্যা অপেক্ষা সুলভ পদার্থ? আপনার উপর জয় লাভ করা কি সহজ কথা? পরমেশ্বরের সহবাস কি পার্থিব সুখ সম্পদ অপেক্ষা সহজলভ্য?

মানবজীবনে অনেক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনের কথা শুনা যায় বটে, মুহূর্ত্তের মধ্যে পাপীর মন ফিরিয়া যাইবার কথা শুনা যায় বটে, কিন্তু তাহার অর্থ কি? তাহার অর্থ ইহা নহে যে দস্যু রত্নাকর এক মুহূর্ত্তের মধ্যে মহর্ষি বাল্মীকি হইয়া যায়, তাহার অর্থ ইহা নহে যে ঘোর পাতকী এক মুহূর্ত্তের মধ্যে সাধুদিগের সমকক্ষ হয়। এইরূপ আকস্মিক পরিবর্ত্তনের অর্থ এই যে, কখন কখন শুভ মুহূর্ত্তে মানুষের জীবনের গতি হঠাৎ ফিরিয়া যায়; এই একজন লোক বর্দ্ধমান গতিতে পাপের পথে চলিতেছিল, হঠাৎ কাহারও উপদেশ শুনিয়া বা অন্য কোন কারণে তাহার চৈতন্য হইল, সে নিজের বিপদ্ বুঝিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল,ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া বিপরীত পথে চলিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু ইহা তাহার ধর্ম্ম জীবনের প্রারম্ভ মাত্র; এই সময় হইতে তাহার হৃদয়ে ধর্ম্মের জন্য সংগ্রাম আরম্ভ হইল মাত্র। সাধুদিগের সমকক্ষ হইতে, দেবভাব লাভ করিতে তাহার এখনও অনেক দিন লাগিবে। অনেক চেষ্টা, অনেক সংগ্রাম, অনেক সাধনার পর তবে সে ঐ উচ্চ পদবী লাভ করিতে সমর্থ হইবে। রত্নাকরের জীবনের গতি এক মুহূর্ত্তে ফিরিয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু মহর্ষি বাল্মীকি হইবার পূর্ব্বে তাহাকে বহু কাল আহার নিদ্রা বিস্মৃত হইয়া রাম নাম সাধন করিতে হইয়াছিল। বাল্মীকির জীবনের আখ্যায়িকা হইতে উপন্যাসের ভাগ ছাড়িয়া দিলে ধর্ম্ম-জীবন সম্বন্ধে এই উপদেশ পাওয়া যায় যে, পরিশ্রম না করিলে, সাধন না করিলে ধর্ম্ম পথে অগ্রসর হওয়া যায় না, ধর্ম্ম-জীবনে উন্নতি লাভ করা যায় না। সকল বিষয়েই আগ্রহ চাই, পরিশ্রম চাই, চেষ্টা চাই, অধ্যবসায় চাই। নতুবা কখনই কিছুতে কৃতকার্য্য হওয়া যায় না। পরিশ্রম বিনা কেহ কখনও কোন গুরুতর বিষয়ে কৃতকার্য্য হন নাই। বলপ্রয়োগব্যতীত কার্য্য হয় না। ইহা জড় জগতেও যেমন সত্য, আধ্যাত্মিক জগতেও তেমনি সত্য। ইহাই জগতের নিয়ম। ব্রাহ্মগণ কি জগতের বহির্ভূত যে তাঁহাদিগকে এই নিয়মের অধীন হইতে হইবে না?

আগ্রহ ও অধ্যবসায় থাকিলে কি না হয়? অধ্যবসায়ের নিকট সকল প্রকার বাধা বিঘ্ন মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হয়। অধ্যবসায়হীন ব্যক্তি প্রতিভাশালী হইলেও পরিণামে সামান্য বুদ্ধি সম্পন্ন অধ্যবসায়শীল লোকের নিকট তাঁহাকে পরাভব স্বীকার করিতে হয়। অন্য বিষয়ে যেরূপ, ধর্ম্ম-জীবনেও সেইরূপ। অধ্যবসায় ও পরিশ্রমই স্থায়ী উন্নতি লাভের এক মাত্র উপায়। "সাধন বিনা সে ধন মিলে না"—ইহা একটী অভ্রান্ত সত্য। অধ্যবসায় থাকিলে নরকের মধ্যে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করা যায়, মরুভূমিকে নন্দন কাননে পরিণত করা যায়। অধ্যবসায়ের বলে মহাপাতকীও পবিত্রস্বরূপ পরমেশ্বরের দর্শন লাভ করিয়া পাপমুক্ত হইতে পারে। আমরা মুখে অনেক বড় বড় কথা বলি, কিন্তু পরিশ্রমের নাম শুনিলেই পশ্চাৎপদ হই। তাই আমাদের দুর্দ্দশা ঘুচে না। আমরা মুখে বলি নিরাকার পরমেশ্বরের দর্শন পাওয়া যায়, অথচ আমাদের মধ্যে কয়জন লোক প্রাণ খুলিয়া বলিতে পারেন যে, তাঁহারা প্রত্যহ উপাসনার সময় তাঁহাদের ইষ্টদেবতার দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হন? কিন্তু আমাদের যদি তেমন অধ্যবসায় থাকিত তবে নিশ্চয়ই আমরা পরমেশ্বরকে দেখিয়া ধন্য হইতে পারিতাম। জীবন্ত ঈশ্বরের উপাসক হইয়া আমাদের আজি এ মৃত ভাব কেন? রসস্বরূপের উপাসক হইয়া আমাদের আজি এ শুষ্কভাব কেন? প্রেমময়ের উপাসক হইয়া আমাদের মধ্যে এত অপ্রেম কেন? আনন্দ স্বরূপের উপাসক হইয়া আমাদের আজি এ নিরানন্দ কেন? পরমেশ্বরের দর্শন পাইলে সকল নির্জ্জীবতা, অনুৎসাহ, শুষ্কতা, অপ্রেম ও নিরানন্দ চলিয়া যায়,পরমেশ্বরের দর্শন পাইলে কঠিন প্রাণ বিগলিত হয়, নীরস প্রাণে ভক্তিরসের সঞ্চার হয়, পৃথিবীতে থাকিয়াও স্বর্গরাজ্যের অধিকারী হওয়া যায়, একথা যদি সত্য হয়—তবে আর ভাবনা কি? পরমেশ্বরের দ্বারে হত্যা দিয়া পড়িয়া থাক দেখি, কেমন তাঁহার দর্শন পাওয়া না যায়? আমাকে তাঁহার দেখা পাইতেই হইবে, এই ভাবে তাঁহার চরণে পড়িয়া থাক দেখি কেমন তোমার উপর দিয়া তাঁহার কৃপাস্রোত প্রবাহিত না হয়? অধ্যবসায়শীল সাধকের নিকট পরমেশ্বর আত্মস্বরূপ প্রকাশিত করেন। আগ্রহের বলে, অধ্যবসায়ের বলে, পরিশ্রমের বলে ভগবানকেও বশীভূত করা যায় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। একথায় একটুও ভুল নাই। অবিশ্রান্ত প্রার্থনা কর দেখি, দিন রাত্রির মধ্যে যখনই অবসর পাইবে তখনই প্রাণ খুলিয়া পরমেশ্বরের কৃপার উপর নির্ভর করিয়া বল দেখি—

"তুমি তো কৃপা কল্পতরু। দেখা দিতে যে হবে হে, আমি অধম বলে দেখা দিতে যে হবে হে।"

আশার সহিত, অধ্যবসায়ের সহিত একথা বলিতে পারিলে নিশ্চয়ই আমাদের দুঃখ ঘুচিবে, নিশ্চয়ই আমাদের মৃত প্রাণে জীবন সঞ্চার হইবে, আমাদের মলিন মুখ উজ্জ্বল হইবে, আমাদের অবনত মস্তক উন্নত হইবে, ব্রাহ্ম সমাজের দুর্দ্দিন ঘুচিয়া যাইবে।

কিন্তু এ সকলের মূলে বিশ্বাস চাই। পরমেশ্বরের দয়ায় বিশ্বাস চাই, প্রার্থনার সফলতায় বিশ্বাস চাই। আমাদের সে বিশ্বাস আছে কি?

মাদাম গেঁয়োর জীবনী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অনুতাপবিহীন পাপীকে পরিশেষে কি ভয়ানক যন্ত্রণা পাইতে হয়, সেই বিষয়ে তিনি এই সময়ে একটী স্বপ্ন দেখেন ও স্বপ্ন দেখা অবধি তাঁহার চিন্তাশীলতা ও ধর্ম্মানুরাগ বৃদ্ধি হয়। তখনও তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে আপনার সম্বন্ধের গুরুত্ব সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারেন নাই, কিন্তু ইহা বুঝিতেন যে, ঈশ্বর তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত প্রেম ও ভক্তির অধিকারী। সেই জন্যই তখন হইতে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালনে তাঁহার নিষ্ঠা দৃষ্ট হয়। এই সময় তিনি কুমারী ব্রত গ্রহণ করিতে ও ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিতে কৃতসঙ্কল্প হন। একদিন তাঁহার সহপাঠীদিগকে ফুটিয়া ঐ কথা বলায় তাহারা তাঁহাকে বিষম গোলযোগে ফেলিয়াছিল। ঈশ্বর তাঁহাকে ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিতে আদেশ করিয়াছেন বলিয়া তাহারা তাঁহাকে এক ঘরে লইয়া গেল, একজন বালিকা কৃপাণ হস্তে ঘাতুক বেশে সজ্জিত হইয়া উপস্থিত হইল, ঘরের মেজেতে রক্ত লাগিবে বলিয়া একখানি বস্ত্র বিছাইয়া তাহারা তাঁহাকে প্রস্তুত হইতে বলিল। কুমারী মথের বিশ্বাস তখনও প্রাণের মমতা ত্যাগ করিতে পারে নাই, প্রাণ ভয়ে ব্যাকুল হইয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন যে, তাঁহার অনুমতি ভিন্ন তিনি মরিতে প্রস্তুত নহেন। বালিকারা তখন তাঁহাকে অবিশ্বাসী বলিয়া অপমানপূর্ব্বক বিদায় করিয়া দিল। এই ঘটনার পরে তিনি পীড়িত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন।

সাত বৎসর বয়সে মাদাম গেঁয়ো অস্‌ল্লাইনকন্‌ভেণ্টে পুনঃপ্রেরিত হন। এইখানে তাঁহার ভগিনী তখন বাস করিতেন। মাদাম গেঁয়ো বলেন যে, ইনি তাঁহার জীবন-গঠনে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। এই রমণী অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন বলিয়া ইঁহার নিকট হইতে মাদাম গেঁয়োর ধর্ম্ম শিক্ষার বিশেষ সুযোগ হইয়াছিল। ইংলণ্ডের নরপতি প্রথম চার্লসের রাণী হেনেরিয়েটা ঐ সময়ে মন্তার্জিস নগরে কিছুদিন মেঃ মথের গৃহে অবস্থান করেন। রাজ্ঞীর চিত্ত-বিনোদনের জন্য মাদাম গেঁয়োকে তাঁহার পিতা বিদ্যালয় হইতে সর্ব্বদাই আনাইতেন। রাজ্ঞী কুমারী মথের বিদ্যা-বুদ্ধি ও প্রকৃতিতে এতই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে উদ্যত হন। বিশেষরূপে অনুরুদ্ধ হইয়াও মেঃ মথ আপন কন্যাকে রাণীর সঙ্গে পাঠাইতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন। মাদাম গেঁয়ো বলেন যে, তাঁহার পিতা যে রাণীর প্রস্তাবে অসম্মত হন তাহাতে নিশ্চয়ই ঈশ্বরের হস্ত ছিল। আমি তখন যে দুর্ব্বল ছিলাম, রাণীর সঙ্গে গেলে আমার যাহা কিছু ধর্ম্মভাব ছিল সমূলে লোপ পাইত।

যদিও তাঁহার ভগিনী বিশেষরূপে কুমারী মথের তত্ত্বাবধান করিতেন, বিদ্যালয়ের অন্যান্য ছাত্রীরা তাঁহার বশীভূত ছিল না। তাহাদের কুসংসর্গে পড়িয়া মাদাম গেঁয়ো কিছুকালের জন্য তাঁহার স্বাভাবিক সত্যপরায়ণতা ও ধর্ম্মভাব হারাইয়া ফেলেন—শেষে তাঁহার এতদূর দুর্দ্দশা হইয়াছিল যে দিনের পর দিন চলিয়া যাইত, অথচ তিনি একবারও ঈশ্বর চিন্তা করিতেন না। বহুকষ্টে তাঁহার ভগিনী তাঁহাকে এই অবস্থা হইতে উদ্ধার করেন। দশ বৎসর বয়সে মাদাম গেঁয়ো ডোমিনিকান-দিগের কনভেণ্টে প্রেরিত হন। এখানে তিনি আট মাস অবস্থিতি করেন। এখানে অবস্থিতির সময় তিনি অনেক বার পীড়িত হয়েন বলিয়া শিক্ষার বিশেষ উন্নতি করিতে পারেন নাই। কিন্তু এই বিদ্যালয়ে এমন একটী ঘটনা ঘটে, যাহাতে বোধ হয় তাঁহার জীবনের গতি অলক্ষিতভাবে ঈশ্বরের দিকে ফিরাইয়া দেয়। এখানকার ছাত্রীরা বাইবেল পড়িতে পাইত না। গোপনে উক্ত পুস্তক অধ্যয়ন করিত। মাদাম গেঁয়ো যে ঘরে থাকিতেন, হঠাৎ তথায় একদিন একখানি বাইবেল দেখিতে পান। ঈশ্বরপ্রেরিত এই মহাদানের তিনি অপব্যবহার করেন নাই। অন্য পুস্তক ফেলিয়া তিনি দিবারাত্রি বাইবেল পড়িতেন, এবং স্মরণ শক্তি প্রবল ছিল বলিয়া উক্ত পুস্তকের ঐতিহাসিক অংশগুলি কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এই নির্জ্জনে ধর্ম্ম পুস্তক পাঠ যে তাঁহাকে পরে ঈশ্বরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপন ও গভীর ধর্ম্মভাবের আদর্শ গঠন করিতে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কুমারী মথের বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা এইখানে সমাপ্ত হইল।

বিবাহ

বাইবেল পাঠে মিস মথ যতটুকু অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলেন তাহা স্থায়ী হয় নাই। বিষণ্ণতা ও নৈরাশ্য শীঘ্র আসিয়া তাঁহার মনকে ঘেরিয়া ফেলিল। বিরক্ত হইয়া তিনি ধর্ম্মসাধন ও চিন্তা কিছুদিনের জন্য একেবারে ছাড়িয়া দিলেন। এই সময়ে পিতার অনুরোধে তাঁহাকে “লর্ডস সপার” নামক খৃষ্টীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হয়। মিসমথ মনে করিলেন যে, এইবার ঈশ্বরের হস্তে আত্ম সমর্পণ করিবেন। অনুষ্ঠানের দিবস আত্ম পাপ স্বীকার করিয়া আনন্দের সহিত অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন। সে আনন্দ কিন্তু স্থায়ী হয় নাই। ক্রমে তিনি যৌবন সীমায় পদার্পণ করিলেন, যে সৌন্দর্য্যের জন্য তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন সেই দৈহিক সৌন্দর্য্য তাঁহার অঙ্গযষ্টিকে মনোহর ভূষণে সুসজ্জিত করিল। রূপগুণ দেখিয়া পরিণয় বাসনায় যুবকবৃন্দ তাঁহার সহিত আলাপ করিতে আসিল। যুবতী আবার ঈশ্বরকে বিস্মৃত হইলেন, কিন্তু ঈশ্বর তাঁহাকে বিস্মৃত হন নাই। তৎকালে রোমান কাথলিক সম্প্রদায় দেশ বিদেশে খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচারের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন। টইসি নামক মেঃ মথের একজন ধর্ম্মপরায়ণ ভ্রাতু-

পুত্র ছিলেন, তিনি প্রচার কার্য্যে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া বহির্গত হয়েন। যাত্রাকালে তিনি যে সকল উচ্চ ভাবের কথা কহিয়া গিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া কুমারী মথের মনে নিদারুণ যন্ত্রণা উপস্থিত হইল। তিনি মনে মনে আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিলেন "প্রভু আমার পরিবারের সকলেই পরিত্রাণ পাইল, আমিই কেবল বিনষ্ট হইলাম, আমাকে রক্ষা কর, প্রভু! দুর্দ্দিনে আমাকে রক্ষা কর। তোমাকে আঘাত করিয়া কি যন্ত্রণাই পাইতেছি!" তাঁহার সুপ্ত ও মৃতপ্রায় আত্মা ঈশ্বর কৃপায় পুনরায় উত্থিত হইয়া নব উদ্যম ও বলের সহিত পরিত্রাণ সাধনে সচেষ্ট হইল। আপনার চঞ্চল মনকে তিনি শীঘ্রই বশীভূত করিয়া ফেলিলেন, দরিদ্রদিগকে অন্ন,বস্ত্র ও জ্ঞান বিতরণ করিতে লাগিলেন, উপাসনায় ও মাদাম চাঁতলের জীবনী এবং সেন্ট সেলনের গ্রন্থাবলী প্রভৃতি ধর্ম্মপুস্তক পাঠে দিনপাত করিতে লাগিলেন। এক খণ্ড কাগজে ঈশ্বরের নাম লিখিয়া আপনার বক্ষে এরূপে সংসক্ত করিয়া রাখিলেন যে, সর্ব্বদাই সে নাম স্মরণ করিতে পারেন। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে ইচ্ছুক হইয়া আপন শরীরকে কঠিন সাধনায় পিষিয়া ফেলিলেন। মাদাম চাঁতলের অনুকরণে সকল কর্ম্মে ঈশ্বরের ইচ্ছা ও পূর্ণ পবিত্রতার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। শেষে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, কুমারী ব্রত গ্রহণ পূর্ব্বক কনভেণ্টে প্রবেশ করিবেন। কিন্তু পিতা সম্মত না হওয়ায় তাঁহার সে ব্রত গ্রহণ করা হইল না। দুঃখের বিষয় এই যে, এমন প্রবল সাধনার উৎসাহ ও ঈশ্বরানুরাগও স্থায়ী হইল না। ঈশ্বর কি সাধারণ বস্তু? কত চেষ্টা, কত উত্থান পতন, কত সংগ্রামের পর, সে দুর্লভ বস্তু পাওয়া যায়। বাল্যাবধি ঈশ্বরানুরাগিণী হইয়া এই ঈশ্বরপ্রাণা রমণীকে ইষ্টদেবতা লাভের জন্য কত কষ্টই পাইতে হইয়াছিল, কতবার উঠিতে পড়িতে হইয়াছিল। ক্রমশঃ

মিলনে।

(প্রাপ্ত)

তোমায় কাতরে ডাকি মা যখন
"আছি আছি" বলে দাও দরশন
কোলে লও তুলে, দুর্ব্বল কন্যারে
"ভয় কি মা ভয়কি" বলে।
সে মুখের পানে আমি অনাথিনী
চাহি মা কত না ব্যাকুলে—
নিজ পাপ সব হয় মা স্মরণ
তব মুখ পানে তাকায়ে;
তিতে বক্ষঃস্থল, ঝরে অশ্রুজল
মা—মা ব'লে উঠি কাঁদিয়ে—
কত দয়া তব অধম সন্তানে
নাহি পারি তাহা বুঝিতে
দয়াময়ী নামে কত সুধা তাই
লেখ মা পাপীর হৃদিতে।
এত করুণার মাখামাখি প্রাণ
অগতির তুমি গতি;
তব প্রেম পথে এসেছি নূতন
আমি যে বালিকা অতি।
দু'টী হাত তুমি ধরো মা আমার
অচল হইলে চরণ;
তোমাতে আমাতে, মায়েতে মেয়েতে
বিরহ না রবে কখন।

শ্রীমতী সা—

প্রেরিত পত্র।

প্রচারক নিয়োগ।

মহাশয়,

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারক নিয়োগ সম্বন্ধে ব্রাহ্ম সমাজের মত এ সময়ে জানা আবশ্যক বিবেচনায় অদ্য অতি সংক্ষেপে এই বিষয়টীর অবতারণা করিতেছি। আশা করি- ব্রাহ্ম মহোদয়গণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক এ বিষয়ে তাঁহাদের মত প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন। পূর্ব্বে পূর্ব্বে যে প্রণালী অনুসারে, যেরূপ যোগ্যতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া প্রচারক নিয়োগ করা হইত, মনে করিয়াছিলাম, সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সে প্রণালী পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রচারক মনোনয়ন আরও উচ্চতর পরীক্ষার উপর সংস্থাপিত হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখনও আমাদের লক্ষ্য অতি সংকীর্ণ। যাঁহারা উপযুক্ত উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া জ্ঞান ও ধর্ম্মে সমুন্নত হইয়ার ছেন, আমি মনে করি কেবল তাঁহারাই আমাদিগের প্রচারক পদে অধিষ্ঠিত হইবার যোগ্য পাত্র। একজন লোক ভাল কিম্বা দশ জায়গায় ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রসঙ্গ করিয়া সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন বলিয়াই যে ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারক হইবেন ইহা কোনও মতেই যুক্তি যুক্ত নয়। প্রচারক হইতে হইলে আরও কতকগুলি মহৎ গুণ থাকা আবশ্যক। জন সমাজ দিন দিন সংস্কৃত ও আলোকিত হইতেছে; এ অবস্থায় ধর্ম্ম জীবনে সমুন্নত,জ্ঞানে সমুচ্চ লোক না হইলে কি রূপে চলিবে? এইরূপ লোক বিরল হইতে পারেন। কিন্তু অপর দিকে এইরূপ লোক না পাইলে আর প্রচারক না করাই বরং ভাল। ঈশ্বরের নাম প্রচারকে জীবনের ব্রত ভাবিয়া—যিনি এই মহৎ উদ্দেশ্য সংসাধন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন, তিনি অবাধে তাঁহার নাম প্রচার করিতে পারেন। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারক উপাধি লাভ না করিলে কি তাঁহার চলে না?

সাধারণ লোকের মধ্যে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার হওয়া আবশ্যক— সাধারণ লোকের ভিতর প্রচার করিতে না পারিলে সুফল লাভের প্রত্যাশা অতি অল্প—এই মনে করিয়া অনেকে একদল প্রচারক প্রস্তুত করিতে চান। সাধারণ লোকদিগের মধ্যে এ পর্য্যন্ত কিরূপ প্রচার হইয়াছে ও হইতেছে তাহা ব্রাহ্ম সাধারণ বিশেষ রূপে অবগত আছেন—তবে আর সেই সুফল, কল্পনার চিত্রে অঙ্কিত করিয়া ফল কি? Mass-preaching কেবল কথাতেই পর্য্যবসিত হয়। আসাম প্রদেশে খাসিয়াদের মধ্যে প্রচারের জন্য একজন লোক আবশ্যক হইয়াছিল।

কোথায়?—একটী লোকও এ পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

ব্রাহ্ম সমাজের ফণ্ডের অবস্থা অতি শোচনীয়। সাধারণ সমাজের বার্ষিক সভায় যখন মফস্বলস্থ বন্ধুগণ প্রচারকদিগের কার্য্য প্রণালীর আলোচনা করেন তখন দেখিয়াছি অনেকেই উপযুক্ত অর্থের অভাবে প্রচারকগণের খাওয়া পরা চলে না বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া থাকেন। এমত অবস্থায় যে কেহ সমাজের স্কন্ধে নিজ ভার অর্পণ না করেন, সে বিষয়ে সমাজের বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত।

আজ অতি সংক্ষেপেই এই বিষয়ের অবতারণা করা গেল। ভবিষ্যতে আরও লিখিতে বাসনা রহিল। ইতি।

১৮ই শ্রাবণ } নিবেদক
১২৯৪ সাল। } শ্রী হ——

ব্রাহ্ম বিবাহবিধি সংশোধন।

১

বিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদনম্।—

১৮৭২ সালের ৩ আইনের সংশোধনের যে কি প্রয়োজনীয়তা হঠাৎ ব্রাহ্ম সমাজে উপস্থিত হইয়াছে, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দেশটাকে আইনের জালে এত বদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছেন যে, আইন নাম শুনিলেই হৃদয়ে বড় আতঙ্ক উপস্থিত হয়। যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, আর এখন নিজে গলা বাড়াইয়া আইনের ফাঁদে পড়ার আবশ্যকতা কি?

আইনের জোরে সমাজ সংশোধন করা সহজসাধ্য নহে। ভারতবর্ষ কালের স্রোতে সকল বিষয়েই অনেকটা উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে; আরো হইবে। ভগবান সহায়, সহস্র চেষ্টা করিলেও সত্যের জয় ডঙ্কা না বাজিয়া নীরব থাকিবে না। তবে আর আইনের সাহায্য—তুচ্ছ মানবীয় বলের সাহায্যের জন্য আমাদের এত ব্যগ্রতা কেন? ব্রাহ্ম সমাজ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত—ইহার প্রত্যেক অস্থি মজ্জা—প্রত্যেক শোণিত বিন্দু স্বয়ং ভগবানের হস্তনির্ম্মিত। যেমন সত্যের উপর ইহার প্রতিষ্ঠা, তেমনি ইহার সত্যের উপর একান্ত নির্ভর থাকা দরকার। সত্যের উপর যাঁহার নির্ভর—তাহার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের শ্রদ্ধেয় সভ্যগণ কোন্ কোন্ যুক্তির বলে ৩ আইনের সংশোধনের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, আমি তৎসমুদয় সম্যক্‌রূপে অবগত নহি—তাঁহাদের যুক্তির অসারতাও আমি প্রতিপাদন করিতে সাহসী নহি; সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অধিকাংশ সভ্য মহোদয়গণের প্রতি আমার অচলা ভক্তি—আমার বিশ্বাস এ ক্ষেত্রে একটুকু স্বতন্ত্র।

যখন দেখিতেছি ঘোর সংস্কারবিরোধী হিন্দু সমাজই আজি কালি আর 'গৌরীদানের' কথা স্বীকার করেন না—প্রাচীন তন্ত্রের হিন্দুগণও ১৩।১৪ বৎসরের কমে স্ব স্ব কন্যা ভগ্নীর বিবাহ দিতেছেন না—অগত্যা দিতেছেন না তাহা নহে, ৯।১০ বৎসর বয়স্কা কন্যার পদে বিবাহ শৃঙ্খল পরাইতে আর তাঁহারা সম্মত নহেন—ইটি কালের সুলক্ষণ—সংস্কারবিরোধী হিন্দু সমাজই যখন এতদূর বিনা আইনে অগ্রসর হইতেছেন, তখন ব্রাহ্ম সমাজ যে কেন আইনের জন্য ব্যস্ত হয়েন বলিতে পারি না। আমি মফঃস্বলবাসী ব্রাহ্ম ভ্রাতাদের সুবিধা অসুবিধার কথা তুলিতে ইচ্ছা করি না; আমার কথা আইনের দ্বারা সত্য প্রতিষ্ঠা না করিয়া সত্যের উপর নির্ভর করিয়া সত্যের জয় ঘোষণা করাই ব্রাহ্ম সমাজের একান্ত কর্ত্তব্য। স্বত্ব সংস্থাপনাদি যে যে বিষয় স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতিরেকে হইতে পারে না, ততটুকু বিষয়েই গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী হওয়া ভাল, বিবাহাদি আধ্যাত্মিক ব্যাপারে মানবীয় শক্তির সাহায্যের উপর বল করিয়া দণ্ডায়মান হওয়া একেবারেই অকর্ত্তব্য। আর এক কথা, একেই তো আমরা সকল বিষয়েই বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের অধীন হইয়া পড়িয়াছি—ধর্ম্ম, সমাজ সংস্কার ও পবিত্র বিবাহ ব্যাপারেও গবর্ণমেণ্টের অধীনতা স্বীকার করি কেন? ইহা ঈশ্বরের চক্ষে ও লৌকিক চক্ষে উভয় দিকেই ভাল নহে। সুশিক্ষা ও ধর্ম্ম জীবনই সমাজ সংস্কারের প্রাণ হওয়া কর্ত্তব্য; যদি তাহা না হয়, তবে সহস্র আইনেও কিছু হইবে না।

আরও একটি আপত্তি এই যে, যখন দেখা যাইতেছে যে, নব-বিধান সমাজ বা আদি সমাজের কথা দূরে থাকুক, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত অনেকে এ সম্বন্ধে নারাজ, তখন সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্য নির্ব্বাহক সভার কতকগুলি সভ্যের অনুমোদনে এত বড় একটা আধ্যাত্মিক ব্যাপারে আইনের বল খাটান সঙ্গত মনে করি না।

আমার আর একটি শেষ কথা এই যে, হিন্দু সমাজেই বাল্যবিবাহ শিক্ষার ও কালের স্রোতে ক্রমে নিবারিত হইয়া আসিতেছে। ব্রাহ্মসমাজে তো বয়সের কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে এখন কার্য্যই হইতেছে না, অভিভাবক বা বর কন্যার ইচ্ছা ও সুবিধামতে ১৪ হইতে ২০ বৎসর বয়সেও বিবাহ হইতেছে,তবে আর একটা আইন করিয়া সমাজের মধ্যে ঘাত প্রতিঘাত তোলার আবশ্যকতা কি? আমার ১৫ পনের বৎসর বয়েসের কন্যার যদি সুপাত্র ও সুসময় দেখিয়া বিবাহ দিতে প্রস্তুত হই, আর আইন যদি অমনি বলে, তুমি যে ব্রাহ্ম তোমার কন্যার তুমি ১৬ বৎসর বয়ঃক্রম না হইলে বিবাহ দিতে পার না,' তবে হৃদয়ে কত দূর বাজে! আর ১৪ কি ১৫ বৎসর বয়ঃক্রম আমাদের এ দেশের পক্ষে যে একেবারেই বাল্যবিবাহ তাহাও অনেকে বলেন না। আজি কালি ১৩ বৎসর বয়ঃক্রমের কমে বিবাহ হিন্দু সমাজেই একপ্রকার রহিত হইয়াছে; এরূপ বিবাহ কেহ ভাল মনে করেন না। তখন ব্রাহ্মগণ যে তাহা করিবেন, তাহা কখনই মনে করা যায় না। অবস্থাবিশেষে শারীরিক গঠনাদি দেখিয়া শিক্ষিত ব্রাহ্ম পিতা যদি তাঁহার কন্যার বিবাহ ১৪ বৎসরে দেন, তাহাতে কেন যে দোষ হইবে, তাহা বুঝি না।

উপসংহারে এ সম্বন্ধে আমার সানুনয় নিবেদন, আইন সংস্কারের পক্ষপাতী মহোদয়গণ যেন তাড়াতাড়ি কোন কার্য্য

না করেন; চারি দিকে কঠিন নিগড়ে বদ্ধ করিলে ব্রাহ্ম সমাজের উন্নতির পক্ষে বাধা পড়িবে; কারণ আমরা ঈশ্বরের দাসত্ব যতটুকু স্বীকার করি, সমাজের দাসত্বও তাহা হইতে ন্যূন নহে। ব্রাহ্ম হইলেই সে যে একেবারে পার্থিব সংস্রববিরহিত হয়, তাহা মনে করি না। অবশ্যই ঈশ্বর লাভের জন্য লোকে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করে সত্য; যে তাহা না করে, তাহার তো পদস্খলন অনিবার্য্য—কিন্তু ইহাও বলি,যে ব্যক্তি হিন্দু সমাজের নিগ্রহ ভোগ করিয়া হাতে হাতে জ্বলিয়া উদার ব্রাহ্ম সমাজে প্রবেশ করে, তাহাকে যদি সেখানেও সমাজের নিগ্রহ দূরে থাকুক, রাজকীয় আইনের নিগ্রহ ভুগিতে হয়, তাহা হইলে বিড়ম্বনার একশেষ বলিতে হইবে। ব্রাহ্ম হইলেই যে তাহার সমস্ত ভাব স্বর্গীয় হইবে, সকল কার্য্যে প্রথমেই ঈশ্বরে নির্ভর জন্মিবে, তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হউক বলিয়া বসিয়া থাকিবে, আমি এমন মনে করি না। ঐ সব হওয়া অনেক সাধনাসাপেক্ষ। সম্যক্ প্রকারে সুনীতি বজায় রাখিয়া সামাজিক স্বাধীনতা থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়। ব্রাহ্মসমাজ আইনের দ্বারা চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারিবেন না। অথচ সমাজের প্রধান লক্ষ্যই তাহা। স্বার্থপরতা পরনিন্দা প্রভৃতি ভয়ানক পাপ; আইন তাহা নিবারণ করিতে পারে না, কেবল সুশিক্ষা ও ঈশ্বর-প্রেম তাহা দূর করে। এত বড় ভয়ানক পাপের যদি আইনে কিছু না করিতে পারে, কেবল সুশিক্ষা ও ঈশ্বর প্রেমে দূর হয়, তবে বিবাহে তাহা অবশ্যই হইবে। বয়স চৌদ্দ হইতে পনর করার জন্য আইনের কিছুই দরকার হইবে না। অলমতি বিস্তরেণ।

কাকিনীয়া
১৯এ শ্রাবণ

ভবদীয়
শ্রীঅনাথবন্ধু রায়

মহাশয়,

শ্রীযুক্ত বাবু সীতানাথ নন্দী লিখিয়াছেন যে, যখন নাবালক বা নাবালিকা কোন সম্পত্তি হস্তান্তর বা ডিক্রী করিতে পারে না, অথবা সম্পত্তি সম্বন্ধীয় কোন প্রকার প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইতে পারে না, তখন তাহারা কি প্রকারে বিবাহ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইতে পারিবে?

এ যুক্তি অসার। পিতা মাতা বর্ত্তমানে নাবালক অথবা নাবালিকার কোন প্রকার সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার অধিকার জন্মে না, তাহার কারণ এই যে সম্পত্তিতে তাহার অধিকার জন্মে নাই।

পিতা মাতার অবর্ত্তমানে অপ্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় কোন বালক বা বালিকা সম্পত্তিসম্বন্ধীয় কোন কোন প্রকার প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইতে পারে না সত্য, কিন্তু বিবাহ সম্বন্ধীয় তিন আইনে ত নিয়ম রহিয়াছে পিতা মাতার অভাবে বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন বালক বালিকা ২০ বৎসরের পূর্ব্বে বিবাহ নিয়মে বদ্ধ হইতে পারিবে না।

যখন অভিভাবকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অপ্রাপ্ত বয়সে কেহ বিবাহ করিতে পারে না, তখন আইনের সংশোধনের কোন আবশ্যক নাই। সীতানাথ বাবু বিবাহ সম্বন্ধীয় আইনের ধারাগুলি বিস্মৃত হইয়া এই কথাটা বলিয়া ফেলিয়াছেন। বস্তুতঃ বিবাহ সম্বন্ধীয় ৩ আইন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। যাঁহারা বিবাহ ভঙ্গ বা বিবাহ যোগ্য বয়সের বৃদ্ধি করিতে চাহেন, তাঁহারা সংস্কার না করিয়া সমাজে বিকার উপস্থিত করিবেন। ইতি।

চিরবশংবদ
জনৈক গ্রাম্য ব্রাহ্ম

সঙ্গত সভা।

ইদানীং সঙ্গত সভা শুদ্ধ ধর্ম্মমত আলোচনার স্থান হইয়া পড়িয়াছিল। সাধনাদি সম্বন্ধে যে ইহাতে আলোচনা হইত না তাহা নহে, কিন্তু সেই সকল আলোচনায় যাহা স্থির হইত তাহা কার্য্যে পরিণত করা সম্বন্ধে কোন প্রকার বাধ্য বাধকতা ছিল না। সাধারণতঃ তাহা আলোচনা মাত্রেই পর্য্যবসিত হইত। এইরূপ আলোচনা সভাদ্বারা ধর্ম্ম-জীবনসম্বন্ধে স্থায়ী কোন ফল লাভের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া গত ২৫এ শ্রাবণ, মঙ্গলবার, সঙ্গত সভার যে অধিবেশন হয় তাহাতে সঙ্গতের কার্য্য-প্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া যাহাতে ইহাদ্বারা ধর্ম্ম-জীবন গঠনের সাহায্য হয়, তদনুযায়ী উপায় অবলম্বন করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। তদনুসারে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি স্থিরীকৃত হয়;—

(১) প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭॥টার সময় নিয়মিত উপাসনার পর সঙ্গতের কার্য্য আরম্ভ হইবে।

(২) যাহাতে আলোচনার কোনরূপ বিশৃঙ্খলা না ঘটে এই জন্য প্রতিবারে একজন সভাপতি মনোনীত হইবেন।

(৩) নিত্য উপাসনাশীল যে সকল ব্রাহ্ম সঙ্গতের নির্দ্ধারণ অনুযায়ী কার্য্য করিবার জন্য চেষ্টা করিতে প্রস্তুত, তাঁহারাই ইহার সভ্য হইতে পারিবেন। কিন্তু ভবিষ্যতে নূতন কোন লোক ইহার সভ্য হইতে ইচ্ছা করিলে, যাঁহারা ইহার সভ্য আছেন, এমন কোন ব্যক্তি তাঁহাকে সভ্য মনোনীত করিবার প্রস্তাব করিবেন এবং যদি অন্য কোনও সভ্যের আপত্তি না থাকে তবে তিনি সভ্য হইতে পারিবেন।

(৪) কোন সভ্য তাঁহার পরিচিত কোন ধর্ম্ম-পিপাসু ব্রাহ্ম-বন্ধুকে সঙ্গতে আনিতে ইচ্ছা করিলে আনিতে পারিবেন। অপর কোন বাহিরের লোক ইহাতে আসিতে পারিবেন না। আগন্তুকগণ সভাপতির অনুমতি ভিন্ন আলোচনায় যোগ দিতে পারিবেন না।

(৫) সঙ্গতের প্রত্যেক অধিবেশনে উপাসনার কার্য্য করিবার জন্য তাহার পূর্ব্ব অধিবেশনে দুইজন লোক মনোনীত হইবেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে দ্বিতীয় ব্যক্তি উপাসনার কার্য্য করিবেন।

(৬) যে বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা হইবে তাহার অবতারণা করিবার জন্য সঙ্গতের পূর্ব্ব অধিবেশনে একজন বা দুইজনের উপর ভার দেওয়া হইবে।

সঙ্গতে আপাততঃ কি কি বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে তাহা স্থির করিবার জন্য শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, সীতানাথ দত্ত, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, মোহিনীমোহন রায়, ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় ও আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়ের উপর ভার দেওয়া হইল।

আগামীবারে বাবু ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় ও রজনীকান্ত নিয়োগী এই দুইজনের মধ্যে একজন উপাসনা করিবেন।

আগামী বারের আলোচ্য বিষয় "বিশ্বাস সাধন"। বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় ও রজনীকান্ত নিয়োগী আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা করিবেন।

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সঙ্গতের সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন;——

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, বাবু গুরুচরণ মহলানবিশ, (সম্পাদক) বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বাবু কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়, বাবু চণ্ডীকিশোর কুশারী, বাবু মথুরামোহন গঙ্গোপাধ্যায়, বাবু কুঞ্জবিহারী সেন, বাবু বিপিনচন্দ্র পাল, বাবু উমাচরণ সেন, বাবু হরকিশোর বিশ্বাস, বাবু হরনাথ বসু, বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু বাণীকান্ত রায়চৌধুরী, বাবু বৈকুণ্ঠনারায়ণ দাস, বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়, বাবু কালীশঙ্কর শুকুল, বাবু রজনীকান্ত নিয়োগী, বাবু সীতানাথ দত্ত, বাবু মোহিনীমোহন রায়, বাবু ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়, বাবু আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় (সহকারী সম্পাদক)।

কলিকাতা
৩২এ শ্রাবণ
১২৯৪ সাল

শ্রীআদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়
(সহকারী সম্পাদক)

ব্রাহ্মবন্ধু সভা।

৬ই শ্রাবণ ব্রাহ্মবন্ধু সভার এক নিয়মিত অধিবেশন হয়। বাবু ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় "ব্রাহ্মবন্ধু সভার উদ্দেশ্য ও তৎসাধনের উপায়" এই বিষয়ের অবতারণা করিলে, বাবু বিপিনচন্দ্র পাল, বাবু হীরালাল হালদার, বাবু কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়, বাবু শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী, বাবু মোহিনী মোহন রায় আলোচনাতে যোগদান করেন। তৎপরে সভাপতি মহাশয় নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিলে সভা ভঙ্গ হয়।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের বক্তৃতার সারাংশ—

কলিকাতায় আমরা অল্পসংখ্যক লোক, তাহাতে আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল হওয়াতে পরস্পরের সংঘর্ষণে শক্তি ক্ষয় করিতে হয়। ব্রাহ্মসমাজের শক্তি যে ক্ষয় হইয়াছে তাহা বলিতে দূরে যাইতে হইবে না। রঘুনাথ রাও বলেন, ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা দিন দিন অবনত হইয়া পড়িতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল গুলির শক্তি ঈশ্বরের নাম প্রচারে, সত্য প্রচারে নিয়োজিত হইতে পারিতেছে না; ইহার প্রধান কারণ ধর্ম্মসাধনের অভাব, বিনয়ের অভাব, অধিক গরিমা, এবং ব্যক্তিগত অহঙ্কারের প্রবল প্রভাব। ব্রাহ্মসমাজের ব্যক্তিগত চিন্তা প্রস্ফুটিত হওয়া অতি বাঞ্ছনীয়, কিন্তু আমাদিগের মধ্যে অহঙ্কার ও অবিনয়ের ভাব আসিয়া পড়িয়াছে। উপাসনাশীলতা, ও ঈশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাসের অভাবে নিজেদের অন্তর্দৃষ্টি নাই, পরের দোষ বর্ণন ও সমালোচনাতেই আমাদের আনন্দ হয়।

আর একটী কথা—পরস্পরের সহিত দূরে থাকিলে আত্মীয়তা হওয়া কঠিন। ব্রাহ্মবন্ধু সভা এমন একটী স্থান, যেখানে ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির জন্য যে সকল প্রশ্ন আসে তাহার সমালোচনা হইতে পারে। যাহাতে পরস্পরের প্রতি সদ্ভাব বৃদ্ধি পায় ইহাও ইহার একটী লক্ষ্য ছিল। ব্রাহ্মসমাজের প্রতি কর্ত্তব্য ভুলিয়া গিয়া অনেকে সংসারে লিপ্ত হইয়া যান। ব্রাহ্মসমাজের ইষ্ট কিসে হয় এই সকল চিন্তা ও আলোচনা স্বার্থপরতা হইতে কিয়ৎ পরিমাণে বাঁচাইয়া রাখিতে পারে। সমাজের কার্য্যে অনেক সময় অনেকের অসন্তোষ থাকে; এই অসন্তোষাগ্নি ক্রমেই প্রধূমিত হইতে থাকে। প্রধূমিত অসন্তোষ প্রকাশিত হইবার স্থান থাকিলে বিদ্বেষবহ্নিরূপে পরিণত হইতে পারে না। যে সব অন্যায় দেখি ব্রাহ্মবন্ধু সভায় মন খুলিয়া তাহা বলিলে প্রাণে আরাম পাইতে পারি।

ব্রাহ্মবন্ধু সভা এবং উপাসকমণ্ডলী উভয়ে এক কার্য্য সাধন করিতেছেন। আমাদের উপাসকমণ্ডলী ব্রাহ্ম পরিবারে ধর্ম্মসাধন, নানা প্রকারে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের উপায়, নবাগত ব্যক্তিদের অন্তরে ধর্ম্মভাব স্থায়ী করার জন্য সাহায্য, সামাজিক অবস্থা ও নীতির উন্নতিসাধন ইত্যাদির জন্য কিছুই করিতে পারিতেছেন না। উপাসকমণ্ডলী ইহার প্রতি মনোযোগ দিতেছেন না। ব্রাহ্মবন্ধু সভা এ সব কার্য্য যাহাতে হয় তাহার চেষ্টা করিবেন।

পুরুষ ও স্ত্রীলোক যাহাতে পরস্পরের সঙ্গে মিশিতে পারেন এমন সভা সমিতি সকল যেরূপে করা যাইতে পারে, ব্রাহ্মবন্ধু সভা হইতে সেই সব উপায় অবলম্বন করা উচিত।

ব্রাহ্মবন্ধু সভা সামাজিক প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া যাহা স্থির করেন, সেই সব নিয়ম কার্য্যে যাহাতে পরিণত হয় এবং সেই ভাব যাহাতে দৃঢ়রূপে মুদ্রিত করিয়া দিতে পারেন সেই উপায় অবলম্বন করা উচিত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের মধ্যে যাহাতে ধর্ম্মভাব বর্দ্ধিত করিতে পারেন, কার্য্যতঃ তাহার কোন উপায় করা উচিত।

বাবু বিপিনচন্দ্র পাল—অদ্যকার বক্তৃতার প্রধান কথা কিরূপে ব্রাহ্মসমাজে পরস্পরের মধ্যে একতা স্থাপিত হয়। এই সম্বন্ধে প্রথমে আলোচনা করা উচিত। আমরা বেশী স্বানুবর্ত্তিতা শিখিতেছি। এক হইয়া কাজ করার ভাব একেবারেই নাই, বিন্দু বিন্দু শক্তি জড় করিতে হইবে এটী প্রাণে জাগ্রৎ করা চাই।

বাবু হীরালাল হালদার—একতা স্থাপনের কয়েকটী উপায় সংক্ষেপে বলিতে পারা যায়—(১) যাহাতে তিনটী সমী-

জের লোকের মধ্যে মিল হয় তাহার চেষ্টা করা উচিত। পরস্পরের মতভেদ সত্ত্বেও কতকগুলি সাধারণ মতে সকলের মিল থাকিতে পারে। (২) সমাজের মধ্যে যাহাতে লোক প্রস্তুত হইতে পারেন তাহার চেষ্টা করা উচিত।

বাবু কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়—ব্রাহ্মসমাজের দুর্গতির প্রধান কারণ এই, যে ভাব লইয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছিলাম সেইভাব হইতে অনেক দূরে পড়িয়াছি—সে ভাব স্বার্থত্যাগ। ব্রাহ্মসমাজে সুখেচ্ছা আসিয়া যখন প্রবেশাধিকার পাইয়াছে, তখন আর উন্নতির আশা নাই। সকলে একত্রিত হইয়া এক প্রাণে কার্য্য করিলে ব্রাহ্মবন্ধু সভার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

বাবু শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী—একতা সম্বন্ধে দুটী কথা আছে;—প্রত্যেক সমাজে দুই দল লোক থাকেন, একদল নেতার কার্য্য করেন, আর একদল তাঁহাদের কথা কার্য্যে পরিণত করেন। একতার এই একটী অন্তরায় আছে যে, সব বিষয়ে নেতা হইতে পারেন এমন লোক আমাদের মধ্যে নাই। সমাজে অনেকে আছেন যাঁহাদের কোন কোন বিষয়ে বিশেষ ক্ষমতা আছে। তাঁহাদের মিশিবার কোন উপায় করা হয় না। তাঁহারা উদ্দীপনা পাইবার কোন কারণ পান না। পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি না জন্মিলে সমাজের কোনও উন্নতির আশা নাই।

বাবু মোহিনীমোহন রায়—আমাদের প্রতি লোকের বিদ্বেষ ভাব জন্মিয়াছে। ব্রাহ্ম সমাজের একতাই ধর্ম্ম ভাবের একতা। উপাসক মণ্ডলী প্রকৃত ভাবে গঠিত হইতেছে না ইহাই সমস্ত দোষের আকর। আমাদের মধ্যে স্বার্থপরতা, আলস্য, বিদ্বেষ আসিয়াছে। যাহাতে উপাসক মণ্ডলী গঠিত হয়, সেই বিষয় আলোচনা করা উচিত।

বাবু ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় (সভাপতি)—ব্রাহ্ম সমাজের অবনতি হইতেছে এই বিষয়টী গুরুতররূপে চিন্তা করা উচিত। আপনার জিনিস কেন এইরূপ হইল? ইহা (১) আলস্যের ফল—নিত্য সরস উপাসনার অভাবের ফল। যখন, অবনতি স্থির, তখন ব্যক্তিগত জীবনের অবনতি হইতেই আমরা ঈশ্বর হইতে দূরে পড়িয়াছি। সেই জন্য ব্রাহ্ম সমাজ হইতেও দূরে পড়িয়াছি; (২) পরস্পর হইতে পৃথক হওয়ার আর একটী কারণ স্বানুবর্ত্তিতা। ইহা আমাদিগকে ঈশ্বর হইতেও দূরে ফেলিয়াছে। সেবকের ভাব জীবনে গ্রহণ করা উচিত। (৩) স্বার্থত্যাগের অভাব—স্বার্থত্যাগ করিতে না পারিলে কিছুতেই কিছু হইবে না। স্বার্থত্যাগ, বিনয়, নিত্য সরস উপাসনা এই কয়টী প্রথমে সাধনা করিতে হইবে। তৎপরে একতা যাহাতে হয় তাহার চেষ্টা করা উচিত।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

বাল্য বিবাহ সমর্থনের জন্য বিগত সপ্তাহে শোভাবাজার [illegible] হইয়াছিল। ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল [illegible] সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। বাবু জয়গোবিন্দ সোম প্রধান বক্তা ছিলেন, তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইবার পর শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ বসু, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহন বসু, অক্ষয় কুমার সরকার, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি সাহিত্য সংসারে সুপরিচিত লেখকগণ বাল্য বিবাহ সমর্থন করিয়া বক্তৃতা করেন। সভার কার্য্যবিবরণ এখনও প্রকাশিত হয় নাই, শুনিয়াছি শীঘ্রই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে। অন্যান্য দেশে ও সমাজে শিক্ষিত লোকেরা উন্নতিশীল দলের অধিনায়ক হইয়া সকল প্রকার উন্নতিসাধক অনুষ্ঠানে অগ্রসর হন; এখানে কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। এখানকার শিক্ষিত লেখক বৃন্দ রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠ-পোষক,ইহাঁদের মত যে দেশের রীতি নীতি ভাল হউক বা না হউক, ঋষিরা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন বলিয়া তাহার উপর হস্তক্ষেপ করা হইবে না; এমন কি, সমালোচন পর্য্যন্ত করিতে পারিবে না। এই সকল লোকের ভ্রান্ত সংস্কারই আমাদের জাতীয় উন্নতির পথে প্রধান অন্তরায় হইয়া উঠিয়াছে। সভাতে বাল্য বিবাহের বিপক্ষগণকে কিছু বলিতে দেওয়া হয় নাই। আমাদের কোন বন্ধু বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে যে সকল যুক্তি আছে তাহা দেখাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সভাআহ্বানকারী কুমার বাহাদুরেরা তাঁহাকে বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধ মত সমর্থন করিতে দেন নাই—সভা সুতরাং নিরপেক্ষ হয় নাই, সবই একতরফা হইয়াছিল। বক্তৃগণ যে সকল অভিনব সার যুক্তি বাল্য বিবাহের সপক্ষে দেখাইয়াছেন তাহা অন্যান্য সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা তাহার দুই একটীর মাত্র উল্লেখ করিব। সোম মহাশয় বলিয়াছেন, যে ৭।৮ বৎসরের বালিকাও যে বিবাহের দায়িত্ব বুঝিতে পারে ও ইচ্ছাপূর্ব্বক সম্মতি দেয় তাহার প্রমাণ এই যে, বালিকা স্ত্রীরা বালক স্বামীকে দেখিয়া ঘোমটা দেয়। অল্প বয়সে পুত্র প্রসব করায় বালিকা মাতার যে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় সে আপত্তি খণ্ডন করিতে গিয়া জয়গোবিন্দ বাবু বলিয়াছেন যে, যদিও বালিকা মাতার অল্প বয়সে সন্তান প্রসব করিয়া প্রাণ নষ্ট হয় তাহাতে ক্ষতি কি? কুলীরক মাতা যদি কুলীরক প্রসব করিয়া মরিতে পারে, আমাদের রমণীরাই বা কেন সন্তান প্রসব করিয়া অল্প বয়সে ও অকালে প্রাণত্যাগ না করিবেন? প্রসিদ্ধ লেখক মনোমোহন বসু বিশুদ্ধ ভাষায় বক্তাদিগকে বুঝাইয়া দেন যে, "হর্তুকি খেগো বাকল পরা বুড়োরা যা ক'রে গেছে, তার ভিতরে ভিতরে তাৎপর্য্য আছে; খপ্‌করে তা মন্দ বলা, আর তার বদল করা বড় ভুল। যে সব সংশোধন ও পরিবর্ত্তন প্রয়োজন তাহা কালে আপনা হতেই হবে।" "বাল্মীকির জয়" প্রণেতা পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন যে, পূর্ব্বে ঋষিগণের সম্মতি গ্রহণপূর্ব্বক বিবাহ প্রথা প্রচলিত করিতে গিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছেন, এরূপ স্থলে সে প্রথা পুনরায় প্রচলিত করিতে গেলে অনেক ভাবনা চিন্তার প্রয়োজন। বৈদিকের কথা শুনিয়া চির প্রচলিত দেশাচার সম্মত বাল্য বিবাহ প্রথা উঠাইয়া দেওয়া উচিত নহে। অসারতা ও মিথ্যা এইরূপ যুক্তি ও সামঞ্জস্য দ্বারাই সংস্থাপিত হইয়া থাকে। ১৮৭২ সালের তিন আইন (যাহা ব্রাহ্ম বিবাহ বিধি বলিয়া প্রসিদ্ধ) পাস হইবার পূর্ব্বে

যে আন্দোলন হয় তাহা যাঁহারা জানেন, তাঁহারা বর্ত্তমান আন্দোলনে কোন নূতন কথাই দেখিতে পাইবেন না। বাল্য বিবাহ রহিত হইলে ব্যভিচার প্রবল হইবে প্রভৃতি যে সকল অসার কথা বাল্য বিবাহবাদীরা আবার প্রতিধ্বনিত করিতেছেন, তখনও সেই সকল কথা উত্থাপিত হয়। ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার ঐ সকল যুক্তি খণ্ডন করিয়া ১৮৭১ সালের মেডিক্যাল জার্ণেলে যে প্রবন্ধ লেখেন মেসেঞ্জার তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। ডাক্তার সরকার উক্ত প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, যাঁহারা বলেন যে, দ্বাদশ বর্ষে বালিকারা রজস্বলা হয় এবং সেই সময়ে বিবাহ না দিলে ব্যভিচার আসিতে পারে, তাঁহাদের কথার আমরা এই উত্তর দিই যে, আমাদের ও দেশহিতৈষী মহোদয় মাত্রেরই উদ্দেশ্য এই যে,বালিকারা যাহাতে অল্প বয়সে রজস্বলা না হয় তাহার উপায় বিধান করা—অল্প বয়সে সন্তান উৎপাদন শোচনীয় জাতীয় অবনতি আনয়ন করিয়া থাকে। বাল্য ঋতু বাল্য বিবাহেরই ফল। বাল্য বিবাহ নিবারণ করিলে বাল্য ঋতুও নিবারিত হইবে, বাল্য বিবাহ রূপ বৃক্ষের মূলে আঘাত করিলে বাল্য ঋতুরূপ ফল ফলা অসম্ভব হইবে। সুতরাং বাল্য বিবাহ উঠাইয়া দিলে যে ব্যভিচার বৃদ্ধি হইবে একথা নিতান্ত অমূলক।

নদীয়া, জগন্নাথপুর হইতে কৃষ্ণচন্দ্র দে জানিতে চাহিয়াছেন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কেন সিটি কলেজে নিয়মিতরূপে পড়াইবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন? তাঁহার মতে ইহাতে প্রচার কার্য্যের ক্ষতি হইবে। অনেকের বিশ্বাস যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহিত সিটি কলেজের কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু প্রকৃত কথা তাহা নহে। সিটি কলেজ ও ব্রাহ্মসমাজ সম্প্রতি বিশেষ যোগে আবদ্ধ। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহক সভা এখন কালেজ কৌন্সিলের তিন জন করিয়া সভ্য মনোনীত করেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এবৎসর কলিকাতায় ও তাহার সন্নিকটস্থ স্থানে প্রচার করিবেন ইহা পূর্ব্ব হইতে স্থির হইয়াছিল বলিয়া, কালেজে কয়েক ঘণ্টা করিয়া পড়াইবার ভার তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছে। এই কার্য্যের জন্য তাঁহার প্রচার কার্য্যের কোনই ক্ষতি হইবে না। আর সিটি কালেজের ছাত্রদিগকে নীতি বিজ্ঞান শিক্ষা ও নীতিবিষয়ক উপদেশ দেওয়া যে একেবারে প্রচার কার্য্যের বহির্ভূত তাহাই বা কিরূপে বলি? এই কার্য্যের জন্য শাস্ত্রী মহাশয়কে অধিক সময় দিতেও হইবে না। এতদ্ভিন্ন সিটি কালেজে পড়াইতে হউক আর নাই হউক, নীতি বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় দার্শনিক মতাদি ধর্ম্ম প্রচারকের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের অন্তর্ভূত। সুতরাং ইহার জন্য যদি তাঁহাকে গৃহে পরিশ্রম করিতে হয় তাহাও প্রচারকের অনুপযুক্ত কার্য্য হইবে না। যদি সহসা মফস্বলে কোথাও তাঁহার যাওয়া আবশ্যক হয় তাহা হইলে যে তিনি একেবারে যাইতে পারিবেন না এমনও নহে। এরূপ স্থলে শাস্ত্রী মহাশয়ের সিটি কালেজের ছাত্রদিগকে পড়াইবার ভার লওয়া আমাদের কাছে বিশেষ আপত্তিজনক বলিয়া বোধ হয় না।

সংবাদ।

ছাত্র সমাজ।—৯ই শ্রাবণ ছাত্র সমাজে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী "বিবাহ ঈশ্বরাদিষ্ট সংস্কার" সম্বন্ধে উপদেশ দেন। উপদেশের মর্ম্ম এই যে স্বয়ং ঈশ্বর গূঢ় ভাবে মানব জীবন রক্ষা করেন। তাঁহারই কৃপায় পক্ষী শাবকগণ আহার পায়, তাঁহারই দয়া মানব সমাজের ভিত্তি স্বরূপ। ক্ষুদ্র মানব পরমাণু সংযোজন পূর্ব্বক পরিবার গঠনে তাঁহার কৃপার যেমন প্রকাশ, এমন আর কিছুতেই দেখা যায় না। কবিরা যে নিগূঢ় পদার্থকে প্রণয় বলেন, তাহা ঈশ্বরেরই বিধান; পূর্ণ আত্ম সমর্পণ ও অনুবর্ত্তিতা উহার প্রধান লক্ষণ, এই দুইটীর একটী দূরকর, স্বর্গের অমৃত চলিয়া যাইবে, স্বার্থ গণনার উপর বিবাহকে স্থাপিত করিলে উহার স্বর্গীয়ত্ব থাকিবে না। সম্মান বা অনুবর্ত্তিতার উপর না রাখিয়া নীচ ইন্দ্রিয় সেবার উপর যদি বিবাহ প্রতিষ্ঠিত কর তাহা হইলেও উহার স্বর্গীয় ভাব থাকিবে না। প্রকৃত পরিণয় চুক্তি নহে, উহা প্রতিদান, আশাশূন্য দান, সুতরাং উহাতে চুক্তির প্রধান লক্ষণের অভাব। আমরা জীবনের সম্বন্ধী বর্গীর মধ্যে ঈশ্বরের কৃপা দেখি না ও দৈনিক জীবন হইতে ঈশ্বরকে আমরা বিদায় করিয়াছি বলিয়াই আমাদের জীবন এত নীচ ও ঘৃণার পাত্র।

বেজওয়াদা ব্রাহ্মসমাজ—বেজওয়াদা দক্ষিণ ভারতবর্ষে কৃষ্ণা ডিষ্ট্রিক্টের অন্তর্গত। মেঃ প্রকাশরাও লিখিয়াছেন যে, সেখানকার স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজ ১৮৮৪ সালে স্থাপিত হয়, কিন্তু কেহ কেহ বদলি ও কাহারও কাহারও মৃত্যু হওয়ায় স্থাপনের পর অবধি সমাজের অবস্থা ক্রমশই হীন হইয়া আসিতে ছিল। তাঁহার চেষ্টায় উহা পুনর্গঠিত হইয়াছে। সমাজের অধীনে এক বিদ্যালয় আছে তাহার ছাত্র সংখ্যা ৮০ জন, প্রকাশরাও সেখানে প্রচারক পাঠাইতে কিম্বা স্থায়ী প্রচারক রাখিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

ব্রাহ্মবন্ধু সভা।—১৩ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭॥ টার সময় ১৩ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে ব্রাহ্মবন্ধু সভার এক অধিবেশন হয়। তাহাতে "ব্রাহ্মসমাজের দায়িত্ব" সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বাবু সীতানাথ নন্দী মহাশয় আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা করেন। আলোচনায় অনেকেই যোগ দিয়াছিলেন। ব্রাহ্ম সমাজে স্ত্রীলোকদিগের বর্ত্তমান অবস্থা ও তৎসম্বন্ধে ব্রাহ্ম সমাজের কর্ত্তব্য কি ইহা বলাই বক্তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। আলোচনার বিশেষ বিবরণ পরে দেওয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকার সম্পাদকের নামে, যাঁহারা প্রবন্ধ পত্রিকা বা পুস্তকাদি প্রেরণ করেন, তাঁহারা যেন এখন হইতে অনুগ্রহ পূর্ব্বক ঐ সকল প্রবন্ধ, পত্রিকা ও পুস্তক ৭৩নং মাণিকতলা ষ্ট্রীটে সম্পাদকের ঠিকানায় পাঠাইয়া [illegible]

তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক।

১৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিসন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র দত্ত দ্বারা ১লা ভাদ্র মুদ্রিত ও ২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১০ম ভাগ।
১০ম সংখ্যা।

১৬ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার, ১৮০৯ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৮।

বাৎসরিক অগ্রিমমূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩্
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

পূজার আয়োজন।

অতি সুচতুর আমি, বাহিরে বেড়াই ঘুরে,
কাছে এলে পাছে ধরা পড়ি, তাই থাকি দূরে,
দূরে থাকি কিন্তু প্রাণে, অসুখের নাহি পার,
শুনিলে আহ্বান তব ছুটোছুটি হয় সার।
চিরদিন এমন(ই) কি যাইবে বিফলে, হায়!
ঘুরিব অমৃত পাশে, নারিব ছুঁইতে তায়,—
ইচ্ছা করে ছিন্ন করি, এ ভববন্ধন যত,
ছুটে পড়ি কোলে তব, প্রমত্ত পতঙ্গ মত।
তোমায় আমায় যদি, প্রভু মিল নাহি হল,
জীবন ধারণ ক্লেশ সহিয়া কি ফল বল।
স্নেহময়ি! মায়া যদি থাকে তনয়ের পর,
বিলম্ব কোরোনা শীঘ্র মুক্ত করি' কোলে কর।—
বারেক রাখগো বুকে পবিত্র চরণ তব,
যায় কি না যায় দেখি নিমেষেতে পাপ সব;
আশায় আশায় প্রাণকমল হয়েছে ম্লান;
ফুটাও তাহার দল, প্রেম-কর করি দান।
যা(ও)য়া আসা করে শ্রান্ত দুরবল ক্ষীণকায়,
ঘর কবে বেঁধে দেবে থাকিবারে তব পায়;
তোমার তনয় হ'য়ে ভরমিব আর কত,
পথে পথে কেঁদে কেঁদে দীন ভিখারীর মত?

প্রভু, আমি কোথায় দাঁড়াইয়া আছি? আমার উপর, না তোমার উপর? তোমার উপরেই যদি দাঁড়াইয়া থাকিব তবে মধ্যে মধ্যে নামিয়া ডুবিয়া যাই কেন? এতদিন ধরিয়া জীবন নদীতে যাওয়া আসা করিতেছি, এখনও চোরাবালি চিনিতে পারিলাম না। থাকি থাকি, এমনই ডুব মারি যে, আমার বন্ধুবর্গ কেহই আমাকে খুঁজিয়া পান না। দু পাঁচ দিন সাধন ভজন করিলাম, তার পর একটু শুষ্কতা আসিল, অমনি দেখি জীবন একেবারে নিরীশ্বর হইয়া গিয়াছে। জীবন আজিও সাধনসাপেক্ষ রহিয়াছে। আমি চাই যে, তুমি আমার চাওয়া নিরপেক্ষ হইয়া আমার জীবনমন্দিরে উঁকি মারিবে। তোমার সত্তার গাম্ভীর্য্য ও বাস্তবিকতা এত প্রবলরূপে আমাকে আঘাত করিবে যে, সে শব্দ আমার অন্তরের আর সকল শব্দকে থামাইয়া দিবে। আমি ইচ্ছা করিয়া মানিব না, তুমি জোর করিয়া মানাইবে। আমি যত বলিব 'না', 'না', তুমি তত বলিবে, 'হাঁ আমি আছি', 'হাঁ আমি আছি'। অবশেষে আমার কথা বন্ধ হইয়া যাইবে, তোমার কথা অবিশ্রান্ত স্ফূর্ত্তি পাইবে। আদান চাও তো অবাক্ আদান হইলে, প্রদানের ভাগটা অতিরিক্ত চলিবে। কবে আমার জীবন তোমার উপরে প্রতিষ্ঠিত হইবে? স্থান ও কাল যেমন তোমার আসন, মানবাত্মাও তেমনই তোমার আর এক আসন। ইষ্টদেবতা তোমাকে যেন আমার সেই অমর ও অচঞ্চল আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি।

হে সহচর! তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে বেড়াও। আমি যতই নির্জ্জন হইতে চাই, ততই তুমি আমাকে সজন করিয়া ফেল! আমি যতই কবাট বন্ধ করিতে চাই, তুমি ততই কবাট খুলিয়া দাও! আমি যতই 'ইতি' 'ইতি' বলিয়া সংসারে ডুবিবার চেষ্টা করি, তুমি ততই 'নেতি' 'নেতি' বলিয়া আমার সংসারাসক্তি ভাঙ্গিয়া দাও; আমি যতই "অহং" "অহং" বলিয়া অহঙ্কার পোষণ করিতে চাই, তুমি ততই "অহং" "অহং" বলিয়া আমার "অহং"কে চাপিয়া রাখ। একি তোমার সহচরত্বের অত্যাচার নহে? কোথায় পাপী একটু নির্জ্জন স্থান দেখিয়া গোপনে দুষ্কর্ম্ম করিবে, তুমি তাহা করিতে দিবে না। চারিদিকে তোমার শত শত চক্ষু দূত রূপে উপস্থিত। দশদিক্ হইতে তোমার দৃষ্টিকিরণপুঞ্জ পাপীর পাপ হৃদয়ের উপর পড়িতেছে। পাপ হৃদয় যে জলিয়া উঠিল। তোমার জলন্ত সহচরত্বের তেজ কে সহ্য করিবে? তোমার সর্ব্বব্যাপিত্ব ও সর্ব্বজ্ঞত্বের উৎপীড়ন পাপীর পাপ বিনাশ করিতে উদ্যত। অথচ আমাকে তোমার সঙ্গে ঘর করিতে হইবে। তুমি অগ্নি আমি তৃণ, তুমি উত্তাপ আমি জল। কেমন করিয়া আমি তোমার সঙ্গে থাকিব? সঙ্গে থাকিতে গেলেইতো তোমার দিকে চাহিতে হইবে, তোমার সঙ্গে কথা কহিতে হইবে, অথচ তোমার উত্তাপে প্রাণে এমন অনুতাপের জ্বালা

ধরিয়াছে যে, অস্থির হইয়া বেড়াইতেছি। হে বন্ধু, তুমি যখন অনুতপ্ত করিয়াছ, তখন কি পরিত্রাণ ও শান্তি দিয়া প্রাণকে সুস্থির করিবে না?

অজ্ঞান পশুরা পর্য্যন্তও প্রভুর প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়া থাকে। জ্ঞানবান্ হইয়া আমার প্রভুর প্রতি আমি এমন অকৃতজ্ঞ কেন? কঠিন হৃদয়ের উৎপাতে বড়ই জ্বালাতন হইয়াছি। অনেক বলিয়াছি, বুঝাইয়াছি, কিছুই করিতে পারি নাই। ধিক্কারের ত্রুটি করি নাই, সময়ে সময়ে অকৃতজ্ঞতা অনুভব করিয়া অনুতাপের অশ্রু ফেলিয়াছি। কিন্তু আজিও মৃত-সঞ্জীবনী ভক্তির উদয় হইল না। ভক্তবৎসল কাছে, ভক্তি হইতেছে না বলিয়া ব্যাকুল হইতেছি, কিন্তু চক্ষে ভক্তির অশ্রু আসিতেছে না। মনে হইতেছে, বক্ষের উপরে কে যেন পাষাণ চাপাইয়া আমাকে উঠিতে দিতেছে না। বাতাস কাণে কাণে বলিয়া গেল, "ভ্রান্ত জীব! কি করিতেছ? এখনও প্রভুকে ভক্তি করিতে পারিতেছ না?" বিহঙ্গ গাহিয়া গেল "হতভাগ্য মানব! এখনও পরম দেবতার পদ প্রেম-শিশির দিয়া ধৌত করিতে পারিতেছ না?" যে যেখানে আছে সবাই আমাকে নিন্দা করিতেছে, চক্ষু শুষ্ক রহিয়াছে, কি করি? সকলই সহিতে হইতেছে। তুমি নিজে অনুযোগ করিতেছ, আমার জীবনের ইতিহাস পত্র খুলিয়া দেখাইতেছ, কবে কি প্রেমলিপি লিখিয়াছিলে। আমি তবুও আত্ম সম্বরণ করিতে পারিতেছি। হে স্বর্গীয় প্রেমিক, তোমার প্রেমের মোহন অস্ত্র নিক্ষেপ কর কহিলে পাষাণ প্রাণ বিগলিত হইবে না।

ন্যায়পর বলিয়া আপনাকে লোকের কাছে পরিচিত করি, গায়ে কাহারও দাবী রাখিতে চাই না, কাহারও ঋণ ফেলিয়া রাখিতে ইচ্ছা করি না। তুমি আমার ন্যায়পরতার অভিমান চূর্ণ কর। সত্যসত্যই তুমি দর্পহারী, নহিলে যখনই মাথা তুলি, তখনই এমনই আঘাত পাই যে, আর মাথা তুলিতে পারি না। লোকের দাওয়া গায়ে রাখিতে চাই না। তোমার দাওয়ার কথা মনে হইলে যে মুখ শুকাইয়া যায়, সকল প্রগল্‌ভতা বাক্‌চাতুরী তিরোহিত হয়। তোমার উপর আমার যাহা দাওয়া ছিল, আপন দোষে সব হারাইয়াছি, তার উপর অযাচিত দয়া রাশি রাশি অম্লান বদনে গ্রহণ ও সম্ভোগ করিতেছি। তোমার অনন্ত প্রেম লইতেছি, কিন্তু প্রাণ দিবার সময় আমার কার্পণ্যের সীমা কি? কত ওজর আপত্তি করি, কতবার ফিরাইয়া দিই, কতবার তোমার কথার উত্তর পর্য্যন্ত দিই না। ন্যায়পরতার ভাব তোমার প্রতি এই নিদারুণ ব্যবহারে ক্রমশঃই নিষ্প্রভ হইয়া যাইতেছে। তোমার কৃপার ঋণ যেন শুধিতে নাই পারিলাম, তোমার স্নেহের অনুরূপ প্রতিদান যেন নাই দিতে পারিলাম, কিন্তু প্রাণটাতো তোমার হাতে আপত্তি না করিয়া দিতে পারি। তাহা করি না কেন? তোমার আমার উপর অগণ্য অধিকার, সে অধিকারের পরিবর্ত্তে তুমি আমার তুচ্ছ প্রাণটা চাও আমি কবে তোমাকে আমার প্রাণ দিয়া নিশ্চিন্ত হইব?

হে মহান্ আমার ক্ষুদ্রত্ব মোচন কর। আমি দেখিতে পাই আমার মন অনেক সময় নীচ বিষয়ের অনুসরণ করে। এমন বৃহৎ ও মহৎ পিতার সন্তান হইয়া, অনন্ত আকাশ ও বিস্তৃত সমুদ্রের মধ্যে বাস করিয়াও আমার নীচ বিষয়ের প্রতি অনুরাগ ঘুচিল না। কোথায় মহৎ কার্য্য, মহৎ চিন্তা করিয়া নির্ভয়ে তোমার চোখের উপর চোখ রাখিয়া বিচরণ করিব, না নীচ কার্য্য, নীচ চিন্তা করিয়া তস্করের ন্যায় সঙ্কুচিত ও অন্ধকারপ্রিয় হইয়া পড়িতেছি। আমিরূপ কারাগারে বন্দী হইয়া রহিয়াছি, কিরূপে মুক্ত হইব? যে যথেষ্ট পরিমাণে অপরের জন্য শুভ কামনা মনে স্থান দিতে না পারে, তার মন কখনই বড় হইবে না, চিরকালই ছোট থাকিবে। প্রভু সঙ্কীর্ণ প্রাণে উদারতা দাও, প্রশস্ততা দাও। অপরের স্বার্থ ও আমার স্বার্থ তো একই, আমরা সবাই পরিত্রাণের কাঙ্গাল। তবে কেন আমি কেবল আমার আপনার পরিত্রাণ ভাবিব? 'আপনারে ভুলে, পরের মঙ্গলে' উদ্যোগী না হইতে পারি, কিন্তু আপনার ও পরের উভয়ের মঙ্গলে যেন উদ্যোগী থাকি।

যে যত পায় সে তত চায়, ইহা সত্য কথা। যখন মনে করি কোথায় ছিলাম আর তুমি কোথায় আনিয়াছ, তখন চুপ করিয়া থাকিতে হয়। আবার যখন মনে করি যে, কোথায় উঠিতে হইবে আর কোথায় পড়িয়া আছি, তখন আর আপনার অবস্থায় তৃপ্ত হইতে পারি না, বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয় না। প্রভু দেখিতেছি, প্রাণ আজও সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিতে পারে নাই। কেমন করিয়া পারিবে? মধ্যে মধ্যে যে স্বাস্থ্যের স্বপ্ন, সে কেবল ঘুড়ি উড়ান। ঘুড়ি খুব উচ্চ আকাশে উড়ে বটে কিন্তু উহা তথাপি মুক্তভাবে বিচরণ করিতে পারে না। সূত্র ধরিয়া টানিলেই যে কাগজ সেই কাগজ হয়। এই যে বাতাসের সাহায্যে পাখীকে জিনিয়া মেঘের উপর মুক্তপক্ষে ঘুড়ি উড়িতেছিল, নিমেষে তার উড্ডয়ন বিনষ্ট হইল, ঘুড়ি তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারে, কিন্তু আমার প্রাণ ঘুড়ির মত ব্রহ্ম আকাশে উড়িয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। আসক্তি রজ্জু যদি বাঁধাই রহিল, তবে আর মুক্তভাবে উড়িবার সম্ভাবনা কোথায়? আসক্তি বন্ধন ছিন্ন করিয়া প্রাণের মমতা না রাখিয়া তোমার সত্তা আকাশে আত্মাকে উড়াইয়া দিতে চাহি যে, চেষ্টা করিলেও আর সে কখনও পথ চিনিয়া ধরায় ফিরিয়া আসিতে না পারে।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

যোগতত্ত্ব।

(চতুর্থ প্রস্তাব।)

ভক্তিযোগপ্রভাবে যখন আমাদের প্রাণের অনুরাগ পরমেশ্বরের দিকে প্রবাহিত হয়, যখন আমাদের আত্মা তাঁহাকেই হৃদয়ের প্রিয়তম বস্তু বলিয়া উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়, যখন সেই প্রেমাস্পদকে দর্শন করা, তাঁহার বিষয় আলোচনা করা, তাঁহার নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন করাই আমাদের একমাত্র আনন্দের বিষয় হয়, তখন স্বভাবতঃই আমাদের ইচ্ছা তাঁহার ইচ্ছার অধীন হইয়া পড়ে। এরূপ অবস্থায় পাপ করা একেবারে অসম্ভব হয়। পরমেশ্বরকে প্রীতি করা ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তখন সাধকের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। যাহা কিছু ইহার বিরোধী, তাহা করিতে কখনই তাঁহার প্রবৃত্তি হয় না। মৎস্য যেমন জল বিনা জীবন ধারণ করিতে পারে না, ঈশ্বরের প্রকৃত ভক্ত সন্তানও সেইরূপ সেই প্রাণাধার হইতে বিচ্যুত হইয়া এক মুহূর্ত্ত জীবন ধারণ করিতে পারেন না। সুতরাং যে কার্য্য ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরোধী, যাহাতে সাধককে তাঁহার ইষ্টদেবতা হইতে বিচ্যুত করে, এরূপ কার্য্য করিবার ইচ্ছা স্বপ্নেও তাঁহার মনে আসে না। তিনি যতদিন সংসারে বাস করেন, ততদিন কেবল ঈশ্বরের ইচ্ছার দিকে চাহিয়া, তাঁহারই অধীন হইয়া জীবনের সকল কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন। সকল কার্য্যে সম্পূর্ণরূপে তাঁহার দাস হইয়া জীবনব্যাপী উপাসনায় নিযুক্ত থাকেন, তাঁহার চিন্তা, বাক্য ও কার্য্য নিমেষের জন্যও পরমেশ্বরকে অতিক্রম করে না। নিজের সুখ সম্পদ্, মান অভিমান প্রভৃতি কিছুরই দিকে তাঁহার দৃষ্টি থাকে না। ধর্ম্মপ্রচার হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনের দৈনিক সামান্য কর্ত্তব্য পর্য্যন্ত সকলই তাঁহার চক্ষে পবিত্র ; কারণ, প্রত্যেক বিষয়েই ঈশ্বরের আদেশপালন ভিন্ন তাঁহার অন্য কোন লক্ষ্য নাই। ইহারই নাম কর্ম্মযোগ। মানুষ যে মুহূর্ত্ত হইতে সকল বিষয়ে আপনার ইচ্ছাকে পরমেশ্বরের ইচ্ছার অধীন করিতে চেষ্টা করে, সেই মুহূর্ত্ত হইতে তাহার কর্ম্মযোগসাধন আরম্ভ হয়।

এই যে কর্ম্মযোগ, এই যে সকল কার্য্যে ঈশ্বরের অধীনতা, ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন। এইখানেই জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। যেমন ভক্তিযোগ ব্যতীত জ্ঞানযোগের পূর্ণতা হয় না,সেইরূপ কর্ম্মযোগ ভিন্ন জ্ঞান ও ভক্তি এতদুভয়ের একটীরও পূর্ণতা হয় না। যেথানে দেখা যায়, জ্ঞান ও ভক্তির সঙ্গে অসাধুতা একত্র অবস্থিতি করিতেছে, সেখানে বুঝিতে হইবে, সে জ্ঞান প্রকৃত জ্ঞান নহে, সে ভক্তির মূলে কুসংস্কার ও অন্ধ ভাবুকতা বর্ত্তমান আছে। যিনি প্রকৃত জ্ঞান ও ভক্তিলাভে সমর্থ হইয়াছেন, তিনি কখনই ঈশ্বরের ইচ্ছাকে অতিক্রম করিয়া প্রবৃত্তির অধীনতা অবলম্বন করিতে পারেন না। এই জন্যই উপরে বলা হইয়াছে যে, কর্ম্মযোগ ব্যতীত সাধনের পূর্ণতা হয় না। সংসারে থাকিয়া পরমেশ্বরের আদেশ পালন করাই যখন ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ,তখন কর্ম্মযোগ সাধন যে আমাদের জীবনের একটী প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। সংসারে আমাদিগকে যেরূপ নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতে হয়, বিশেষতঃ মনুষ্য সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় জীবনের বহুবিধ কর্ত্তব্য পালন করিতে অনেকেরই যেরূপ অধিক সময় যায়, তাহাতে যে আমরা পরমেশ্বরকে বিস্মৃত হইয়া কেবল কার্য্যের স্রোতে, অবস্থার স্রোতে ভাসিয়া যাইব, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এই জন্য সকল কার্য্যের মধ্যে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলা অত্যাবশ্যক। এমন কি, ইহার অভাবে যে সকল কার্য্যকে আমরা সাধুকার্য্য বলিয়া মনে করি, তাহাও আমাদিগকে পরমেশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আত্মার সর্ব্বনাশের পথ উন্মুক্ত করে ; প্রেমভক্তির পরিবর্ত্তে অপ্রেম শুষ্কতা আনিয়া দেয় ; এবং ক্রমে ক্রমে আমাদের বিশ্বাসের উজ্জ্বলতা নষ্ট করিয়া আমাদিগকে অবিশ্বাসের পথে লইয়া যায়।

আলোচনার সুবিধার জন্য জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্ম্মযোগের বিষয় স্বতন্ত্রভাবে বিবৃত হইল বটে, কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, কার্য্যতঃ জ্ঞান, ভক্তি ও ঈশ্বরাধীনতা স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত করে না। আমাদের জীবনে এই তিন সাধনের কার্য্যই একেবারে চলিতে থাকে, এবং ইহার প্রত্যেক সাধন অপর সাধনের সহায়তা করে। কোন এক সময়ে ইহার মধ্যে একটী বা অপরটী প্রাধান্য লাভ করিতে পারে, এবং করিয়াও থাকে ; কিন্তু সে সময়ে যে অবশিষ্টগুলির কার্য্য একেবারে বন্ধ হইয়া যায়, তাহা নহে। একদিকে যেমন ঈশ্বর-সম্বন্ধে প্রকৃতজ্ঞান লব্ধ হইলে ভক্তিভাব প্রস্ফুটিত হয় এবং ভক্তি উন্নত হইলে আমাদের ইচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন হয়, অপর দিকে তেমনি প্রাণপণে ঈশ্বরের আদেশ পালনের চেষ্টা করিলে সেই সঙ্গে জ্ঞান ও ভক্তি বিকাশ প্রাপ্ত হইতে থাকে।

কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, উহা সাধন করিতে হইলে প্রার্থনাশীল চিত্তে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া প্রত্যেক বিষয়ে তাঁহার ইচ্ছা যত দূর বুঝিতে পারা যায়, তাহার অনুযায়ী হইয়া চলিতে চেষ্টা করিতে হইবে। সুতরাং এই সাধনে কৃতকার্য্য হইতে হইলে চিন্তা ও সরল প্রার্থনার প্রয়োজন। প্রার্থনা প্রকৃতভাবে করিতে হইলে নিজের অভাব কি তাহা জানা এবং সেই অভাব দূর করিবার জন্য ব্যাকুল হওয়া আবশ্যক। এতদুভয়ই চিন্তাসাপেক্ষ। অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, কর্ম্মযোগ প্রকৃতরূপে সাধন করিতে হইলে চিন্তাকে সম্পূর্ণরূপে অক্ষুণ্ণভাবে কার্য্য করিতে দেওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। শ্বাস প্রশ্বাস নিয়মিত করিয়া অথবা অন্য কোন রূপ শারীরিক প্রক্রিয়াদ্বারা কিরূপে তাহা সম্ভব হইতে পারে? বিশেষতঃ হঠযোগদ্বারা যে সমাধির অবস্থায় উপনীত হওয়া যায়, তাহাতে ত সমুদায় চিত্তবৃত্তির নিরোধবশতঃ চিন্তাশক্তির কার্য্য

স্থগিত হইয়া যায়। এ অবস্থায় কি জ্ঞানযোগ, কি ভক্তিযোগ, কি কর্ম্মযোগ, কোন যোগই সাধন করা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। আর এই জ্ঞান ভক্তি কর্ম্মযোগ ভিন্ন যোগের যদি অন্য কোন অর্থ থাকে, ধর্ম্মসাধনের সঙ্গে তাহার বিশেষ কোন অর্থ আছে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে উজ্জ্বল বিশ্বাস, তাঁহার প্রতি প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়-কার্য্য সাধন করাই প্রকৃত যোগসাধনের একমাত্র উদ্দেশ্য। এ সমস্তই আধ্যাত্মিক ব্যাপার। শরীরের সঙ্গে ইহার কোনরূপ প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নাই। তবে মনঃসংযমের জন্য, চিত্ত সমাধানের জন্য যদি কোন প্রকার শারীরিক ক্রিয়ার আবশ্যকতা থাকে, সে স্বতন্ত্র কথা। তাহা যোগসাধনের একটী গৌণ উপায় হইতে পারে। কিন্তু তাহাকেই যোগ মনে করিলে, তাহাকেই উদ্দেশ্য বলিয়া ধরিলে প্রকৃত চিন্তাশীলতার পরিচয় দেওয়া হয় না।

সজীব বিশ্বাস।

যখনই আমরা আমাদের কোন বিশেষ আধ্যাত্মিক অবনতির মূল অনুসন্ধান করি, তখনই দেখি সেখানে অবিশ্বাস বর্ত্তমান। উপাসনা ভাল লাগিতেছে না, মন নীরস হইয়া গিয়াছে, ভাই ভগিনীকে কর্কশ কথা বলিতে আর সংকোচ বোধ করি না, কারণ খুঁজিতে গিয়া দেখি যে, সরস ঈশ্বরে বিশ্বাসের অভাব রহিয়াছে। কার্য্যে মনোযোগ নাই, অবাধে পরনিন্দা করিতেছি, অন্যের বিরুদ্ধে অমঙ্গল চিন্তা পোষণ করিতে প্রতিবন্ধক অনুভব করিতে পারিতেছি না, কারণ অন্বেষণ করিতে গিয়া দেখি যে, প্রেমময় পিতায় বিশ্বাস নাই। প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তি আপনার মন পরীক্ষা করিতে গিয়া দেখিতে পাইবেন, যে বিশ্বাস চক্ষুর অভাবে তিনি সূর্য্যালোকের মধ্যে বাস করিয়াও অন্ধকার দেখিতেছেন। বিশ্বাসী যেখানে জীবন্ত ঈশ্বরকে দেখিয়া কৃতার্থ হন, অবিশ্বাসী তথায় অন্ধকার ও কল্পনা অনুমান করিয়া বিষাদে নিমগ্ন হয়। অতি সামান্য কার্য্য করিয়া তাহা কার্য্যের নেতা ঈশ্বরকে সমর্পণ করিয়া ভক্ত আনন্দে আপ্লুত হন, অতি মহৎ কার্য্য করিয়াও অবিশ্বাসী আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। বিশ্বাস বাস্তবিকই ধর্ম্মরাজ্যে চক্ষুঃস্বরূপ। যাঁহার বিশ্বাস নাই তিনি পণ্ডিত বা পরোপকারী হইতে পারেন, কিন্তু অধ্যাত্মরাজ্যে তাঁহার স্থান নাই।

অল্পাধিক পরিমাণে আমাদের সকলেরই বিশ্বাস আছে, কিন্তু অধিকাংশ লোকের পক্ষেই বিশ্বাস সংস্কার মাত্র। আমরা কেন ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি, এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে সকলেই উত্তর দিবেন, "আত্মপ্রত্যয়ের প্ররোচনায়।" 'ঈশ্বরকে দেখিয়াছি, তাঁহাকে অবিশ্বাস করিব কিরূপে', একথা কয় জন লোক বলিতে পারেন? যদি বিশেষ ভাবে বিশ্লেষণ করা যায়, তাহা হইলে আমাদের বিশ্বাসে অপরের মুখে শুনিয়া বা পুস্তকে পড়িয়া যে সংস্কার হয়, তাহার অতিরিক্ত আর কিছু বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। পরোক্ষ বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস নির্জ্জীব ও অকার্য্যকর। শুনা কথায় জীবনের গতি কি ফিরিয়া থাকে? যে ঈশ্বরের চক্ষুর তেজ স্বয়ং অনুভব না করিয়াছে, সে কি লোকের মুখের কথায় সতর্ক ও পাপ হইতে বিরত হইতে পারে? আমাদের বিশ্বাস বাহিরের কথায় বদ্ধ হইয়া আছে, মুক্ত হইয়া কার্য্যপ্রবৃত্তির মূলে পঁহুছিতে পারে নাই। সেই জন্য আমাদের জীবনে বিষম বিরোধিতা। আমরা বলি এক, করি এক, আমরা মুখে আস্তিক, প্রাণে নাস্তিক। ব্যক্তিগত জীবনের এই বিশ্বাসহীনতা আমাদের সমাজের বর্ত্তমান হীনাবস্থার যে প্রকৃত কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই।

জীবনে সরলতার আলোক আনয়নের জন্য সজীব বিশ্বাসের অবতারণা আবশ্যক। আমাদের যে সংস্কার বা জ্ঞানগত সিদ্ধান্ত আছে, উপলব্ধিরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা সেই সিদ্ধান্তরূপ হীন বিশ্বাসকে উজ্জ্বল করিতে হইবে। ঈশ্বর আছেন বলিলে হইবে না, "এই তুমি আমার কাছে রহিয়াছ" সমস্ত হৃদয়ের সহিত এই কথা বলিতে হইবে। অজ্ঞেয়তাবাদী ও কৌশলবাদী দূরস্থিত ঈশ্বর লইয়া সন্তুষ্ট হইতে পারেন কিন্তু ব্রাহ্মের ঈশ্বর দূরে থাকিলে চলিবে না। আমার প্রাণ প্রিয়তমকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, আমি কি তখন বিস্তীর্ণ ব্যবধানের অপর পারস্থিত ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া সুখী হইতে পারি? পার্থিব জননীকে দেখিবার জন্য যখন পুত্রের প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখন কি সে দূরস্থিত জননীর অস্তিত্ব স্মরণ করিয়া সুখী হইতে পারে, দূরস্থ ঈশ্বরকে স্মরণ করা যাইতে পারে, কিন্তু জীবন্তভাবে উপলব্ধি করিবার জন্য নিকট ঈশ্বরের প্রয়োজন। তাঁহার নৈকট্য এমন ভাবে অনুভব করিতে হইবে, যে নিশ্বাস বা হৃদয় তাঁহা অপেক্ষা নিকটতর বোধ হইবে না। কোন প্রকার ব্যবধান থাকিলে হইবে না, আপনার আত্মা পর্য্যন্ত ব্যবধান থাকিবে না। যখন জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে সকল ব্যবধান বিলুপ্ত হয়, তখনই উভয়ের সেই মহা মিলন হয়, যাহার জন্য সাধুরা চিরকালই লালায়িত। তখনই প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মদর্শন আরম্ভ হয়।

নিকট ঈশ্বরকে দুই প্রকারে উপলব্ধি করা যাইতে পারে। বিশ্বাসের শৈশবাবস্থায় সাধক জগতে ব্রহ্ম দর্শন করিয়া থাকেন। স্থান ও কাল সমুদ্রে ভাসমান, বিচিত্র কৌশলময় ও বিবিধরূপিণীশক্তি দ্বারা সঞ্চালিত, এই বিশাল বিশ্বের মূলে সাধক আপন ইষ্টদেবতাকে দেখিয়া কৃতার্থ হন; ঋতু পরিবর্ত্তন, তাড়িত সঞ্চরণ, গগনবিহারী জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতি ও আলোক প্রবাহ সকলেরই মধ্যে জগদাতীত কারণরূপী পরমেশ্বরকে সুস্পষ্ট বর্ত্তমান দেখিতে পান। এই যে ধরণীবক্ষঃস্থিত বিস্তীর্ণ বায়ু সমুদ্র যাহা অদৃশ্য, অথচ ভারবিশিষ্ট, ইহার প্রত্যেক পরমাণু-কম্পনে সাধক প্রভুর পরিচয় প্রাপ্ত হন। প্রত্যেক সৃষ্ট পদার্থে প্রাণরূপী ঈশ্বর শক্তি সঞ্চার করিয়া তাহার অস্তিত্ববিধান করিতেছেন, ইহা সাধন করিতে করিতে পরিশেষে অন্তরে ভক্তের দৃষ্টি পড়ে। তিনি সেখানে দেখেন, যে যে প্রভু স্রষ্টা ও কৌশলীরূপে বাহিরে বিদ্যমান, ভিতরে তিনি তাঁহার প্রাণের প্রাণ হইয়া রহিয়াছেন। তখন জীবাত্মা বুঝিতে পারে যে সে

অসার ও পরমাত্মা সার, সে অকর্ম্মণ্য, পরমাত্মা পরিচালক, সে শূন্য, পরমাত্মা পূর্ণতা বিধায়ক। যে অভিমান বা আত্ম-বোধকে পাপের জননী বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না, তাহা ক্রমে তিরোহিত হয় ও সাধক শেষে ঈশ্বর চরণে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া জন্মের মত তাঁহার শরণাপন্ন হয়েন। এই অবস্থায় ভক্ত সম্বন্ধ সাধন করেন, যাঁহার সঙ্গে জীবাত্মার অলৌকিক সম্বন্ধ মানব-ভাষায় সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা যায় না, তাঁহার সঙ্গে ভক্ত ব্যক্তিগত সম্বন্ধ সংস্থাপন করেন। ঈশ্বর দয়াময় পিতা, হিতকারী মিত্র, অদ্বিতীয় পরিত্রাতারূপে হৃদয়াকাশে প্রকাশিত হইয়া ভক্তের প্রাণ কাড়িয়া লয়েন। সাধক যে কেবল ঈশ্বরকে প্রাণরূপে অন্তরে দেখেন, তাহা নহে, তাঁহার প্রাণে ঈশ্বরের উপর অটল বিশ্বাস আবির্ভূত হয়। আর তাঁহার দয়ায় অবিশ্বাস আসিতে পারে না। সাধক সহস্র নির্যাতন, যন্ত্রণা ও বিপদের মধ্যে অটলভাবে দাঁড়াইয়া প্রভুর মুখের দিকে তাকাইয়া থাকেন ও অন্য সকল আহ্বানের প্রতি বধির হইয়া প্রভুর আদেশ প্রাণপণে প্রতিপালন করেন। রোগ, শোক, মৃত্যু, কোন অবস্থাতেই তিনি ম্রিয়মান হন না, এবং আশ্চর্য্য দেবভাবে পরিচালিত হইয়া বিনীতভাবে অলৌকিক কার্য্য সকল সম্পাদন করেন। জগৎ সম্বন্ধে তিনি মৃত হন, কিন্তু ঈশ্বরানুপ্রাণিত তাঁহার প্রাণ হইতে এমন এক অগ্নিস্রোত নিঃসৃত হয়, যাহা জগতের পাপ, কপটতা, অবিশ্বাস ও অসত্য দগ্ধ করিয়া ঈশ্বর-কৃপা যোগে নবজীবন সৃষ্টি করে।

বিশ্বাস কিন্তু যতদিন সাধন সাপেক্ষ থাকে, ততদিন আত্মা নিরাপদ হয় না। সাধন ভজন করিলাম বিশ্বাস উজ্জ্বল রহিল, সাধন ভজনে শৈথিল্য আসিল বিশ্বাসও হীনপ্রভ হইয়া গেল, ইহা বিশ্বাসের মধ্য অবস্থা। ইহার উপরে আর এক স্থান আছে, যেখানে বিশ্বাস সাধন সাপেক্ষ না হইয়া কেবল ঈশ্বর সাপেক্ষ হইয়া থাকে। তখন ঈশ্বরের দর্শন বিশ্বাসের উজ্জ্বলতা বা নিষ্প্রভত্বের উপর নির্ভর করে না, আত্মা সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরাধীন হওয়ায় ঈশ্বর আপনার শক্তি প্রকাশ করেন। ভক্ত ঈশ্বরের হাত ছাড়িয়া দেন, কিন্তু ঈশ্বর তাঁহার হাত ধরেন। ভক্ত ঈশ্বরকে দেখেন না, কিন্তু ঈশ্বর বলপূর্ব্বক ভক্তকে আপনার সৌন্দর্য্য দেখান। ঈশ্বরের সত্তা ও অস্তিত্বের তখন উৎপীড়ন আরম্ভ হয়; ভাবিবার পূর্ব্বে প্রকাশ ও ভাবিবার পূর্ব্বে উপলব্ধি হইয়া থাকে। ভক্তক প্রভু ক্রমাগত আত্ম পরিচয় দেন। ভক্ত ঈশ্বরের সঙ্গে বিশ্বাস রাজ্যের নানা স্থান পরিভ্রমণ করেন। অবিশ্বাসের সম্ভাবনা পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয়, ভক্ত উন্মত্ত ও অধীর হইয়া ইষ্টদেবতাতে ডুবিয়া যান।

অনন্যপরায়ণ হইয়া সাধু মহাজনদিগের পদচিহ্ন অনুসরণ পূর্ব্বক যদি আমরা প্রভুকে অন্বেষণ করি, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই উক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারি। যিনি প্রভুকে বিশ্বাস করেন, তিনি কখনও প্রতারিত হন না, যিনি সংসার লইয়া প্রতারিত হন, তিনি মৃত্যুমুখে গমন করেন।

ব্রহ্মস্বরূপ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

সন্দেহবাদিগণ জগতের দৃশ্যমান অমঙ্গলের দুইটী কারণ দর্শাইয়া থাকেন—(১) হয় ঈশ্বর পূর্ণমঙ্গল স্বরূপ নহেন, তাঁহার দয়ার সীমা আছে, (২) অথবা তিনি পূর্ণ দয়াবান হইলেও জগতের অমঙ্গল দূরীকরণে অসমর্থ; তাঁহার শক্তি সীমাবদ্ধ। কোন সন্দেহবাদী অনুমান করেন যে, জগতের উপকরণরূপী আদিম অস্পষ্ট জড়কে ঈশ্বর সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করিতে পারেন নাই, তাহাতেই জগতে এত অমঙ্গল ঘটনা ঘটে। এই দুইটী কারণের কোনটাই যে ঠিক্ হইতে পারে না, পূর্ব্বে তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। জগতে এক অনন্ত শক্তির অধিক শক্তি থাকিতে পারে না, আর সমুদয় সসীম শক্তি তাঁহা হইতে নিঃসৃত হইয়াছে এবং তাঁহারই অধীনে কার্য্য করিতেছে। এবং ঈশ্বর মানব-বিবেকে পূর্ণ মঙ্গল ও পূর্ণ পবিত্র স্বরূপরূপে উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হইতেছেন ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। তাঁহার পূর্ণ মঙ্গলস্বরূপ ও পূর্ণ শক্তির এই অকাট্য প্রমাণ পাইয়া যদি আমরা জগতের দৃশ্যমান অমঙ্গলের কোন কারণ না দর্শাইতে পারি, তাহাতেও আমাদের বিশ্বাসের ভিত্তি টলিতেছে না। কতিপয় বৎসরের সাধুতা ও বন্ধুতাতে মানব-বন্ধুর প্রতি আমাদের এরূপ বিশ্বাস জন্মে যে, তাঁহার কৃত কতিপয় রহস্য পূর্ণ এবং আপাততঃ অন্যায় কার্য্য দেখিলেও আমরা সে সমুদয়কে হঠাৎ অন্যায় না ভাবিয়া এই বিশ্বাস করি যে সময়ে এই সমুদয় কার্য্যের যুক্তিযুক্ততা বুঝিতে পারিব। এরূপ বিশ্বাস যাহার নাই, তাহাকে আমরা স্বভাবতঃই অযথা সন্দিগ্ধতা ও ক্ষুদ্র-চিত্ততা দোষে দূষিত মনে করি। ক্ষুদ্র, অপূর্ণ মানব-বন্ধুর সম্বন্ধে যদি এরূপ বিশ্বাস যুক্তিযুক্ত হয়, তবে সেই পূর্ণস্বরূপ পরম বন্ধুর সম্বন্ধে এরূপ বিশ্বাস কত অধিক গুণে যুক্তিযুক্ত। আমরা ক্ষুদ্র কীট হইয়া অনন্ত স্বরূপের সমুদয় কার্য্যের রহস্যভেদ করিতে পারিব ইহা অসম্ভব। সুতরাং জগতের দৃশ্যমান অমঙ্গলের কোন যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা না দিতে পারিলেও তাহাতে আমাদের আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ বিশ্বাসের ভিত্তি টলিতেছে না।

কেহ কেহ মনে করেন যে, এই রহস্যভেদ সম্পূর্ণরূপেই অসম্ভব। কিন্তু অপর কেহ কেহ মনে করেন যে, সম্পূর্ণরূপে না হউক, কিয়ৎ পরিমাণে এই রহস্যভেদ করা সম্ভব, এবং উন্নতিশীল মানব জ্ঞান ক্রমশঃই অধিকতররূপে এই রহস্যভেদে সক্ষম হইবে। এই শেষোক্ত মতের সঙ্গেই আমার সহানুভূতি। এই বিষয়ে কয়েকটী বক্তব্য এই :—প্রথমতঃ অনেক প্রাকৃতিক ঘটনা যাহাদিগকে আপাততঃ অমঙ্গলকর বলিয়া বোধ হয়, তাহারা ছদ্মবেশী মঙ্গল মাত্র। মানব-জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অনেক আপাত-অমঙ্গলকর প্রাকৃতিক ঘটনা ও বস্তু মঙ্গলকর বলিয়া সপ্রমাণ হইয়াছে। ঝড় ও অগ্নিকাণ্ডের বায়ু-শোধনকারিণী শক্তি, লোক সংখ্যার অত্যাধিক্য নিবারণে এবং [illegible] ও সহানুভূতি বর্দ্ধনে, মারীভয় ও দরিদ্রতার [illegible], অনেক বিষাক্ত প্রাণী ও বস্তুর বিবিধ উপযোগিতা, ততঃ ভীষণ প্রকৃতি বিদ্যুতের আশ্চর্য্য উপকারিণী শক্তি

—এই সমুদয় এখন আর অজ্ঞাত নাই। সাংসারিক অনেক দুঃখ কষ্ট ও পরীক্ষায় যে হৃদয় কোমল ও বিনীত হয়, বুদ্ধি অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতা লাভ করে, ইচ্ছাবৃত্তি সকল তেজস্বী হয়, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই দেখিয়া থাকিবেন। যথেষ্ট সময় পাইলে এই বিষয়ে অনেক বলা যাইত। আশা করা যায় মানব জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এইরূপে অনেক আপাত-অমঙ্গলকর বস্তুর প্রকৃত স্বভাব প্রকাশিত হইবে।

দ্বিতীয়তঃ দৃশ্যতঃ অমঙ্গলকর অনেক ঘটনা ও বস্তু প্রকৃত পক্ষে মঙ্গলকর বটে, কিন্তু ইহা অস্বীকার করা যায় না যে, এই সকল ঘটনা ও বস্তু কিয়ৎপরিমাণে বা অনেক পরিমাণে কষ্টদায়ক। প্রশ্ন হইতে পারে যে, ঈশ্বর কি কষ্ট না দিয়া মঙ্গল করিতে পারেন না? অধিকন্তু অনেক কষ্টের কোন উপযোগিতাই দেখিতে পাওয়া যায় না। এই আপত্তির সম্পূর্ণ সন্তোষকর উত্তর কোথাও পাই নাই। আমার নিকট যে উত্তর অনেক পরিমাণে সন্তোষকর বলিয়া বোধ হয় তাহা এই:—আমি মনে করি কিয়ৎ পরিমাণে বা অনেক পরিমাণে কষ্ট না দিয়া মানবের ন্যায় সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র জীবকে উন্নত করা সর্ব্বশক্তিমানের পক্ষেও অসম্ভব। ইহাতে তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তাতে কিছুই আঘাত পড়ে না। দুই আর দুইয়ে পাঁচ করা যেমন সর্ব্বশক্তিমানের পক্ষেও অসম্ভব, ইহাও তেমনি সর্ব্বশক্তিমানের পক্ষেও অসম্ভব। যাহা বস্তুতঃ অসম্ভব, তাহাকে সম্ভব করিতে না পারায় সর্ব্বশক্তিমত্তার কোন হানি হয় না। মানব কোমল মাংসল শরীর পাইয়া সংসারে সুখ ভোগ করিবে, অথচ তাহার জ্ঞান ও শক্তির অবশ্যম্ভাবী ক্ষুদ্রতা বশতঃ শরীরে কখনও কোন আঘাত পাইবে না, ইহা আমার নিকট অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। পরিমিত জীবকে জ্ঞান পুণ্য বল লাভ করিতে হইলে তাহাকে আপাততঃ অনেক কষ্ট ও পরীক্ষার ভিতর দিয়া যাইতে হইবে ইহা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক এই বিষয়ক যুক্তিটী পরিষ্কাররূপে উল্লেখ করিতে চেষ্টা করিতেছি।

ঈশ্বর এক মাত্র অনন্ত ও পূর্ণ বস্তু। তিনি আর একটী অনন্ত ও পূর্ণ বস্তু সৃষ্টি করিতে পারেন না। অসীম ও পূর্ণবস্তু একটীর অধিক হইতে পারে না। ঈশ্বরের অসীমতা ও পূর্ণতা অন্য কাহারও প্রদত্ত হইতে পারে না। সৃষ্ট বস্তুর পক্ষে সসীম ও অপূর্ণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। যাহার অস্তিত্ব কালে আরব্ধ হয় তাহার প্রকৃতিই এই যে, তাহা ক্রমশঃ উন্নতিশীল হইতে পারে, কিন্তু কখন পূর্ণ হইবে না। অপূর্ণতা ইহার প্রকৃতিগত; এই প্রকৃতিগত অপূর্ণতা ইহার পক্ষে অনতিক্রমণীয়। ইহা যতই উন্নত হউক না কেন, যতই পূর্ণতার দিকে যাউক না কেন, কিয়ৎ পরিমাণ অপূর্ণতা ইহাতে থাকিবেই থাকিবে। এই সত্যের আলোকে জগৎ ও মানবের দিকে তাকাইলে অনেক পরিমাণে ইহার রহস্য ভেদ হয়। জগতের আরম্ভ আছে। এমন এক সময় ছিল কি না যখন ঈশ্বর সৃষ্টি কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই, ইহা স্থির করা অসম্ভব বা কঠিন হইতে পারে, কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে জগতের বিশেষ বস্তুর অস্তিত্বের আরম্ভ আছে; এবং উহাদের আছে বলিয়াই উহারা উন্নতিশীল ও অপূর্ণ। যে সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনাকে অমঙ্গলকর বলা হয় সে সমস্ত জগতের প্রকৃতিগত অপূর্ণতার রূপান্তর মাত্র। এই অপূর্ণতা অস্থায়ী; উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইহা চলিয়া যাইতেছে। জগৎ যে অপূর্ণতা হইতে ক্রমশঃ পূর্ণতার দিকে যাইতেছে, বিজ্ঞান তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। জগতের সম্বন্ধে যাহা বলা হইল মানুষের সম্বন্ধে তাহা আরও স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। অনন্ত শক্তি, জ্ঞান, প্রেম, শান্তি ও পবিত্রতা কেবল ঈশ্বরেরই থাকিতে পারে। সৃষ্ট জীব মাত্রকেই শক্তি জ্ঞান, প্রেম, শান্তি ও পবিত্রতায় সীমাবদ্ধ হইতে হইবে। মঙ্গলময় ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব উন্নতিশীল হইবে বটে, কিন্তু জীব মাত্রেরই অপূর্ণতা অবশ্যম্ভাবী। এই অপূর্ণতাকে এক অর্থে অমঙ্গল বলা যাইতে পারে, কিন্তু এই অমঙ্গল অর্থাৎ পূর্ণ মঙ্গলের অভাব সৃষ্ট জীবের পক্ষে অনিবার্য্য। সৃষ্ট জীবের পক্ষে এই অমঙ্গল ছাড়া মঙ্গলের কোন অর্থ নাই। জীবের সৃষ্ট ভাবই এই এবং সে সর্ব্বশক্তিমান্ ও মঙ্গলময় স্রষ্টা হইতে এই পর্য্যন্তই প্রত্যাশা করিতে পারে যে, সে অমঙ্গল অর্থাৎ অপূর্ণতা হইতে ক্রমশঃ পূর্ণ মঙ্গল অর্থাৎ পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইবে। এই উন্নতিই তাহার প্রকৃত মঙ্গল। মানবের অবস্থাও আমরা তাহাই দেখিতেছি। সে বিধাতার বিধানে ক্রমশঃই শক্তি, জ্ঞান, সভ্যতা, সুখ, প্রেম ও পুণ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছে। মানব জীবনে যাহা কিছু অমঙ্গল দেখিতে পাওয়া যায় তাহা তাহার সৃষ্টি-জনিত, প্রকৃতিগত অপূর্ণতার ভিন্ন ভিন্ন আকার মাত্র। জ্ঞান, শক্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে যে অপূর্ণতা ইহা স্বয়ংই এক অর্থে অমঙ্গল। তাহার পর এই অপূর্ণতার ফল স্বরূপ কতক পরিমাণে দুঃখও অবশ্যম্ভাবী। মানবের দুঃখ যন্ত্রণার শেষ ব্যাখ্যা এই প্রকৃতিগত অপূর্ণতা। অনেক বিশেষ বিশেষ দুঃখকর ঘটনার কারণ অন্বেষণ করিতে গিয়া উহাদের মূলে এই প্রকৃতিগত অপূর্ণতা—শক্তি জ্ঞান প্রভৃতির অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। যে স্থলে এরূপ স্পষ্টরূপে কোন দুঃখকর ঘটনার কারণ আবিষ্কার করা যায় না, সে স্থলে এরূপ বিশ্বাস করা উচিত যে, উহা অবশ্যই এইরূপ কোন অনিবার্য্য কারণ সম্ভূত হইবে।

সুতরাং এই বিষয়ে মূল কথা এই:—ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্তা ও পূর্ণ প্রেমের সহিত সৃষ্ট জীবের অপূর্ণতা ও তজ্জনিত দুঃখের কোন বিরোধ নাই। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ ও পূর্ণ প্রেমময় হওয়া সত্ত্বেও সৃষ্ট জীবের অপূর্ণতা ও তজ্জনিত কিয়ৎ পরিমাণ দুঃখ অনিবার্য্য। কিন্তু এই দুঃখ অনেক স্থলেই উচ্চতর সুখ বা আধ্যাত্মিকতার কারণ মাত্র! এবং দুঃখ মাত্রেই অস্থায়ী। মানবীয় উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃই জগৎ হইতে দুঃখ চলিয়া যাইতেছে। সুতরাং ঈশ্বরের পূর্ণ স্বরূপে যে আমাদের আত্মপ্রত্যয় নিহিত বিশ্বাস আছে, জগতের দৃশ্যমান অমঙ্গল সে বিশ্বাসের কিছুই খর্ব্বতা করিতেছে না। কিন্তু জ্ঞানের এই উজ্জ্বল মীমাংসা সত্ত্বেও দারুণ পরীক্ষায় পড়িয়া অনেক সময়ই আমাদের দুর্ব্বল বিশ্বাস টলিয়া যায়। উপাসনা যোগে গভীর ভাবে ঈশ্বরের সহবাস ও প্রেমাস্বাদন

ব্যতীত বিশ্বাসের এই দুর্ব্বলতা আর কিছুতে দূর করিতে পারে না।

মাদাম গেঁয়োর জীবনী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এই সময়ে মাদাম গেঁয়ো একজন যুবকের সহিত পরিচিত হন। ইনি নানাবিধ সদ্‌গুণভূষিত ও বিশেষ ধর্ম্মভাব পূর্ণ ছিলেন। যুবক যুবতী পরস্পরের প্রতি অনুরাগী হন এবং পরিশেষে যুবক তাঁহার পাণিগ্রহণের প্রস্তাব করেন। নিকট সম্বন্ধ বলিয়া মেঃ মথ সে প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। মাদাম গেঁয়ো আপনার তৎকালীন অবস্থার বিষয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় যে, পার্থিব প্রণয় প্রবল হওয়াতেই তাঁহার ঈশ্বরানুরাগ হ্রাস হইয়াছিল। তিনি ক্রমে প্রার্থনা ছাড়িয়া দিলেন, প্রার্থনা পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে সত্যানুরাগ বিলুপ্ত হইল। সৌন্দর্য্যগরিমা মনকে অধিকার করিল এবং তিনি অহোরাত্র যৌবনের শত্রু উপন্যাস পড়িয়া জীবন কাটাইতে লাগিলেন; বুঝিতে পারিলেন না যে, যে অসার শারীরিক সৌন্দর্য্যে মত্ত হইয়া তিনি ঈশ্বরকে বিস্মৃত হইলেন, সেই বাহ্য সৌন্দর্য্য তাঁহার কলুষিত ও পতিত আত্মার কেবল আবরণ হইয়াছিল। কিয়দ্দিবস পরে মেঃ মথ সপরিবারে পারিসে গেলেন। পারিসের অন্তঃসারহীন সভ্যতা ও চাক্‌চিক্য, অসার আমোদ ও চিত্তহারী বিলাস কুমারী মথের মনকে আরও অধঃপাতিত করিল। রূপ গুণ দেখিয়া অনেকেই তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাহিলেন, কিন্তু তাঁহার পিতা মেঃ গেঁয়োকে মনোনীত করিলেন। ইনি একজন সম্ভ্রান্ত ও সম্পন্ন ব্যক্তি, কিন্তু কুমারী মথ অপেক্ষা বয়সে দ্বিগুণ বড় ছিলেন। ১৮৬৪ সালে ২১শে মার্চ্চ ইঁহাদের পরিণয় কার্য্য সমাহিত হয়। যদিও মে গেঁয়োর সহিত মিস্ মথের একরূপ পরিচয় হয় নাই বলিতে হইবে, এবং যদিও যতটুকু পরিচয় হইয়াছিল, তাহাতে তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার সহিত বিবাহে সুখী হইবেন না, তথাপি পিতার অনুরোধে তিনি এই পরিণয়ে স্বীকৃত হইয়াছিলেন।

নবজীবন লাভ।

পতিগৃহে আসিয়া মাদাম গেঁয়োর দুর্দ্দশার একশেষ হইল। গৃহকর্ত্রী তাঁহার শ্বশ্রূ একজন অশিক্ষিতা ও কৃপণ স্বভাবের স্ত্রীলোক ছিলেন। নববধূর রূপ ও গুণ তাঁহার চক্ষুঃশূল হইয়া উঠিল! সুতরাং তিনি বধূর মন হইতে পিতৃবিরহের কষ্ট দূর করিতে চেষ্টা না করিয়া উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন। দিবারাত্রি তিনি তাঁহাকে যে স্বয়ং তিরস্কার করিতেন এমন নহে, দাস দাসীকেও বধূকে অপমান করিতে উৎসাহ প্রদান করিতেন। মেঃ গেঁয়ো রুগ্ন ছিলেন বলিয়া তাঁহার সেবার জন্য একজন ধাত্রী নিযুক্ত ছিল, শ্বশ্রূর প্ররোচনায় এই ব্যক্তি মাদাম গেঁয়োকে অপমান করিতে ত্রুটি করিত না। যে কথা শুনিলে তিনি ব্যথিত হইতেন, তাঁহার শ্বশ্রূ তাঁহাকে সেই কথাই বলিতেন, যে কাজ করিতে তাঁহার অপমান বোধ হইত, সেই কাজ তাঁহাকেই করিতে হইত। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের গৃহে দাস দাসীতে যে সকল কাজ করিয়া থাকে, শ্বশ্রূ তাঁহাকে বলপূর্ব্বক সেই সকল কার্য্য করাইতেন। পিতামাতার প্রতি তাঁহার আন্তরিক মমতা ছিল বলিয়া, পিতৃগৃহে যাইতে পাইতেন না, যাইলে প্রত্যাগমনের পর লাঞ্ছনার সীমা থাকিত না; শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী বধূকে মর্ম্মপীড়া দিবার জন্য সর্ব্বদাই তাঁহার কাছে তাঁহার পিতা মাতার নিন্দা করিতেন। বাটীর বাহিরে গেলে সঙ্গে সঙ্গে গুপ্ত চর গমন করিত। সুতরাং পতি গৃহে তাঁহাকে একরূপ বন্দিভাবেই কাটাইতে হইয়াছিল। এই অত্যাচারের সময় যদি মনোমত পতির প্রণয় ও সহানুভূতি পাইতেন তাহা হইলেও শ্বশ্রূ দত্ত যন্ত্রণার অনেক লাঘব হইত, কিন্তু পতি মাতৃপক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া মাতারই পোষকতা করিতেন। চৌদ্দ পনর বৎসরের বালিকা এরূপ অত্যাচার ও উৎপীড়নে যে নিরাশ ও উন্মত্ত প্রায় হইবে ইহাতে বিচিত্র কি? ঈশ্বর তাঁহাকে স্বর্গীয় জীবন দিতে, প্রেমের পথে লইয়া যাইতেছিলেন, তিনি সংসারে সুখ অন্বেষণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া ঈশ্বরের কার্য্যে প্রতিবন্ধকতাচরণ করেন; ঈশ্বর তাঁহাকে দেখাইলেন যে, শ্রেয়ের পথ পরিত্যাগ করিয়া প্রেয়ের পথ অবলম্বন করে তাহার কি দুর্গতি হয়! নিরুপায় অনন্যগতি হইয়া, নিরাশ হইয়া যখন তিনি চারিদিক্ আঁধার দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার মন তখন স্বভাবতঃ অনাথের নাথ, অগতির গতি দীনবন্ধুর দিকে সতৃষ্ণ ভাবে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। এই সময়ে তাঁহার একটী পুত্র হয়। নবীনা জননীর মনে যখন স্বর্গীয় মাতৃভাব প্রবেশ করিল, তখন নূতন জগৎ আবিষ্কৃত হইল। তিনি নূতন ভাব ও নূতন দায়িত্ব অনুভব করিতে লাগিলেন, তাঁহার মনে হইতে লাগিল যে, যদিও আপনার জন্য—ঈশ্বর তাঁহার আবশ্যক না হয়, কিন্তু পুত্রের মঙ্গলের জন্য সেই দীনশরণের আশ্রয়, তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইবে। কিছু দিন পরে কোন কারণবশতঃ মেঃ গেঁয়োর বিশেষ অর্থহানি হইয়াছিল। এই অর্থ হানি ঘটায় কৃপণ স্বভাব শ্বশ্রূর বধূর উপর ক্রোধের আর ইয়ত্তা রহিল না। ভর্ৎসনা ও গালাগালি অবিশ্রান্ত চলিতে লাগিল। তিনি স্পষ্টই বধূকে তাঁহার সংসারের কাল ও অমঙ্গলরূপিণী বিবেচনা করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"এই সোণার সংসারে তো কোনই গোলযোগ ছিল না, বিপদরূপিণী এই কাল বধূ আসা অবধি নানা বিপদ ঘটিতেছে।" মাদাম গেঁয়ো তখন অত্যন্ত পীড়িত, পীড়া এমন উৎকট হইয়াছিল যে, তিনি পরলোকে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হন। এই সময়েই আবার তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ও অনুরাগের পাত্রী এক ভগ্নী মানবলীলা সম্বরণ করেন। ইনি বাল্য কালে মাদাম গেঁয়োর মনে ধর্ম্মভাব সঞ্চারের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। ইহার মরণে মাদাম গেঁয়ো অতিশয় ব্যথিত হন ও তাঁহার মনে বৈরাগ্যোদয় হয়। মঙ্গলময়ের মঙ্গল হস্ত বিহিত এই সকল সোপানাবলী দিয়া আমাদের এই জীবনীর নায়িকা দুর্লভ নবজীবন শৈলের পাদদেশে উপস্থিত হইলেন। এবার মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, হয় প্রভুকে লাভ করিব

নয় প্রাণত্যাগ করিব। এই প্রতিজ্ঞা করিয়া তিনি প্রথমে সৌন্দর্য্য গর্ব্বকে খর্ব্ব করিলেন। পরে তীক্ষ্ণ আত্ম চিন্তার অস্ত্রে আপন জীবনকে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিয়া গুপ্ত দোষ সকল অনুসন্ধান ও সংশোধন করিতে লাগিলেন। প্রতিদিন সপ্তাহের পর সপ্তাহ নিয়মিতরূপে আপন দোষ লিখিয়া রাখিতেন ও ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ইতিবৃত্ত তুলনা করিয়া উন্নতি ও অবনতি অবধারণ করিতেন। তিনি ইদানীং ধর্ম্ম মন্দিরে বড় একটা যাই-তেন না, কিন্তু এখন হইতে নিয়মিত রূপে ভজনালয়ে যাইতে এবং গিয়া বিশেষ ফল পাইতে লাগিলেন। মনের বর্ত্তমান অবস্থার অনুপযোগী পুস্তকাবলী পরিহার করিয়া ধর্ম্মভাব পূর্ণ সদ্‌গ্রন্থ অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিলেন। পূর্ব্বে উপন্যাস পড়িয়া দিন কাটাইতেন এখন "এ কেম্পিসের ইমিটেসন অব্‌ ক্রাইষ্ট," ফ্রান্সিস্‌ সেলের গ্রন্থাবলী প্রভৃতি সরস ধর্ম্মভাবো-দ্দীপক পুস্তক পাঠে নিযুক্ত হইলেন। যিনি জল বিন্দু বাসী ক্ষুদ্রতম কীটানুরও আহার বিধান করিয়া থাকেন, সেই দয়াময় দীনবৎসল প্রভু দীন সেবিকার অবস্থা দেখিয়া সাধুসঙ্গও জুটাইয়া দিলেন। এই সময়ে মাতার মৃত্যু হওয়ায় তাঁহাকে পিতৃ গৃহে যাইতে হইয়াছিল, সেখানে তাঁহার একটী ঈশ্বর-পরায়ণা উন্নতহৃদয়া নির্ব্বাসিতা রমণীর সঙ্গে আলাপ হয়। ইনি সংসারের নানা পরীক্ষা অতিক্রম করিয়া শেষে ধর্ম্ম ও ঈশ্বরের শান্তি ও আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবন ঈশ্বরময় ছিল। অন্তর্জীবনের পবিত্র মধুরতা তাঁহার মুখে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। ইঁহার নিকট মাদাম গেঁয়ো প্রথম ঈশ্বরবিহীন কর্ম্মের অসারতা ও বিশ্বাসের সারবত্তা শিক্ষা করেন। তিনি বলিয়াছেন যে, যদিও তখন তাঁহার সময় আসে নাই বলিয়া সকল কথা বুঝিতে পারেন নাই, কিন্তু উক্ত রমণীর জলন্ত বিশ্বাসপূর্ণ জীবন ও ঈশ্বরপরায়ণতা দেখিয়া অনুকরণের ইচ্ছা তাঁহার মনে বলবতী হইয়াছিল। তিনি তাঁহার মত পবিত্রতা ও শান্তি লাভ করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস ও নির্ভর ছিল না বলিয়া কোন মতেই সফল হইতে পারেন নাই।

সঙ্গত সভা।

সঙ্গত সভা নূতন ভাবে গঠিত হইবার পর গত ৩২এ শ্রাবণ মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭॥ টার সময় সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনা মন্দিরে উহার প্রথম অধিবেশন হয়। বাবু ক্ষেত্রমোহন মুখো-পাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করেন; বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত সভাপতি ছিলেন, এবং বাবু রজনীকান্ত নিয়োগী আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা করেন। এবারের আলোচ্য বিষয় "বিশ্বাস"। আলোচনার সারাংশ নিম্নে দেওয়া হইল। *

* যাঁহারা আলোচনায় যোগ দিয়াছিলেন তাঁহাদের প্রত্যেকের নামো-ল্লেখ অনাবশ্যক বিবেচনায় তৎপরিবর্তে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির এক একবারের কথার সারাংশের পূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যা দেওয়া হইল। যিনি যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি নিজেই তাহার জন্য দায়ী। সুতরাং উহার প্রত্যেক মত যেন কেহ সর্ব্ববাদিসম্মত মনে না করেন।

১। কেবল যুক্তিদ্বারা "ঈশ্বর আছেন" বুঝিলেই ঈশ্বরে বিশ্বাস করা হয় না; বিশ্বাস অর্থে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করা। বুদ্ধি ও বিবেক এই দুই পথ দিয়া আমরা বিশ্বাস লাভ করি। বুদ্ধি আমাদিগকে দেখাইয়া দেয় যে, কি ভৌতিক, কি আধ্যাত্মিক, প্রত্যেক পদার্থই ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া আছে এবং পার্থিব বস্তু সমূহ অনিত্য ও অকিঞ্চিৎকর ও পরমেশ্বরই একমাত্র নিত্য পদার্থ। বিবেক আমাদিগের হৃদয়ে এমন সকল উচ্চ আদর্শ ও ভাব প্রকাশিত করে, যাহা আমাদের অপেক্ষা উন্নততর আত্মা হইতে প্রসূত এবং ইহা পাপের সহিত সংগ্রাম উৎপাদন করিয়া, আমরা যে কত দুর্ব্বল ও অপদার্থ তাহা দেখাইয়া দেয় এবং আমাদিগকে ঈশ্বরের দয়ার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে শিখায়। বিশ্বাস সাধনের দুইটী উপায় আছে, (১) মনন—প্রত্যেক পদার্থের প্রকৃতি ও স্বরূপ সম্বন্ধে গভীর ও প্রার্থনাশীল ভাবে চিন্তা করিলে ঐ সকল পদার্থের মধ্যে ঈশ্বরের সত্তা উপলব্ধি করা যায়; (২) তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি ও সতর্কতা—খুব সামান্য সামান্য পাপ সম্বন্ধেও সাবধান হইতে হইবে।

২। বিশ্বাস দুই প্রকার, জীবন্ত ও মৃত। মৃত বিশ্বাস জীবনকে উন্নতির পথে লইয়া যাইতে পারে না; কিন্তু জীবন্ত বিশ্বাস পাপের মূল কর্ত্তন করিয়া আত্মাকে সজীব ও সবল করে।

৩। সাধারণতঃ দেখা যায় অনেকের মতে বিশ্বাসের সহিত বুদ্ধিবৃত্তির কোনও সংস্রব নাই। কিন্তু উহা প্রকৃত বিশ্বাস নহে, উহা অন্ধ বিশ্বাস। প্রকৃত বিশ্বাস সহজ জ্ঞান (intuition) হইতে সমুদ্ভূত—ইহার লক্ষণ এই যে, ইহার বিপরীত বিষয় চিন্তা বা কল্পনাদ্বারা উপলব্ধি করা যায় না। বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনাদ্বারা এই বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়। কেবল সংস্কারগত বিশ্বাসের সঙ্গে পাপাসক্তি থাকিতে পারে। বিবেকের উপর ইহার কোন প্রভাব নাই। কিন্তু প্রকৃত বিশ্বাস,—যাহা জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং যাহা আধ্যাত্মিক সাধনাদিদ্বারা দৃঢ়ীভূত হইয়াছে, তাহা পাপ পুণ্যবোধকে তীক্ষ্ণ করে, বিবেককে সবল করে এবং আত্মার ঈশ্বর লাভেচ্ছা পরিবর্দ্ধিত করিয়া দেয়।

৪। পরমেশ্বরকে জানিতে হইলে বহির্বিষয় (phenomenon) হইতে মনকে পৃথক্‌ করিয়া সেই মহান্‌ (Noumenon) সত্তার বিষয় একাগ্রমনে চিন্তা করিতে হইবে। নাম সাধন দ্বারা ইহার বিশেষ সাহায্য হয়। নাম সাধনের পথে অনেক বিঘ্ন আছে বটে, কিন্তু ইহা চিত্তসাধনের ও ঈশ্বরের সত্তা স্মরণের অনেক সহায়তা করে।

৫। আমরা যাহাকে বিশ্বাস বলি, তাহার অধিকাংশই সংস্কার বা অন্ধ-বিশ্বাস মাত্র। অনেকে ইহাকেই সহজ জ্ঞান (intuition) বলেন। কিন্তু যথার্থ সহজ জ্ঞান যাহা তাহা সন্দেহের অতীত। যে বিশ্বাস সর্ব্বদা অথবা মধ্যে মধ্যে সন্দেহের অন্ধকারে আবৃত হয়, তাহা সহজ জ্ঞান হইতে সমুদ্ভূত নহে। যথার্থ সহজ জ্ঞান যাহা তাহাকে কোন মতেই বাধা দেওয়া যায় না এবং তাহা লাভ করিলে সন্দেহ ও অবিশ্বাস অসম্ভব হয়। এই যে সহজ জ্ঞান, এই যে

আধ্যাত্মিক চক্ষে ঈশ্বরকে দর্শন করা—ইহাই বিশ্বাসের নিরাপদ ভিত্তি ভূমি। শুদ্ধ সংস্কারের উপর আধ্যাত্মিক জীবন নির্ম্মাণ করা ভয়ানক ভ্রম। এই জন্যই অনেকের জীবনে অনেক সময় গভীর ভাবোচ্ছ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ঘোর সন্দেহ বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। এ অবস্থায় প্রকৃত উন্নতি অসম্ভব। যখন জীবনগত অভিজ্ঞতার উপর, আধ্যাত্মিক চক্ষুঃ-দ্বারা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট সত্যের উপর বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই আত্মা প্রকৃত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে। মনন,—অর্থাৎ বহির্জগৎ ও আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে গভীর আলোচনা, এই সকল বিষয় সম্বন্ধীয় গ্রন্থ পাঠ ও যাঁহাদের আধ্যাত্মিক ব্যাপার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে এরূপ লোকের সহবাস, এই বিশ্বাস সাধনের উপায়। "ঈশ্বর" শব্দে আমরা ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক জগতের প্রাণস্বরূপ ও আশ্রয়ভূত সেই পরমাত্মাকেই বুঝি। সুতরাং জড় জগৎ ও আত্মার প্রকৃতি ও স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা প্রকৃত বিশ্বাস সাধনের জন্য অত্যাবশ্যক। বিশ্বাসের দুইটী অবস্থা আছে। প্রথমাবস্থায় বহির্জগতে পরমেশ্বরের প্রকাশ যত পরিষ্কাররূপে দেখিতে পাওয়া যায়, আত্মার মধ্যে তত পরিষ্কাররূপে দেখা যায় না। বহির্জগতে ঈশ্বর দর্শন প্রকৃত বিশ্বাসের পক্ষে অত্যাবশ্যক বটে, কিন্তু শুদ্ধ ইহাতে প্রাণ পরিতৃপ্ত হয় না এবং ইহা বিশ্বাসের চরমাবস্থা নহে। দ্বিতীয়াবস্থায় পরমেশ্বরকে আত্মার মধ্যে প্রাণের প্রাণরূপে—আমাদের সমুদয় চিন্তা, ভাব ও শক্তির উৎসরূপে উপলব্ধি করা যায়। এ অবস্থায় আত্মার প্রত্যেক কার্য্যে পরমেশ্বরের প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়—"আমি আছি" ও "তিনি আমাতে আছেন" এই দুইটী ভাব এক সময়ে ও সমান উজ্জ্বলরূপে অনুভব করা যায়। এই যে আত্মাতে ঈশ্বর দর্শন—আত্মজ্ঞানের ভিতর দিয়া ঈশ্বরজ্ঞান—ইহাই বিশ্বাসের চরমাবস্থা—ইহাই বিশ্বাসের নিরাপদ ও অক্ষয় ভিত্তিভূমি।

৬। চিন্তা, অধ্যয়ন, বা আত্মজ্ঞান বিশেষ উপকারী বটে, কিন্তু ইহা ভিন্ন বিশ্বাস সাধনের আর একটী প্রধান সহায় আছে—সে সহায় ব্যাকুল প্রার্থনা।

৭। ধর্ম্ম জীবনে প্রার্থনার উপকারিতা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। কিন্তু প্রার্থনা কোথায় খাটে, কোথায় খাটে না, তৎসম্বন্ধে আমাদের সচরাচর একটু ভ্রম হইয়া থাকে। এমন অনেক জিনিস আছে যাহা প্রার্থনা দ্বারা পাওয়া যায় না। ইহা না জানাতে আমরা আধ্যাত্মিক জীবনের প্রত্যেক বিষয়ের জন্য প্রার্থনার উপর নির্ভর করি এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের অন্য উপায় অবহেলা করিয়া থাকি। আমাদের পার্থিব জীবনের জন্য যাহা কিছু আবশ্যক তাহা পরমেশ্বরই দেন, অথচ তাহা প্রার্থনা দ্বারা পাওয়া যায়, তাহা পাইতে হইলে ভৌতিক নিয়মের অধীন হইতে হয়। আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য যাহা কিছু আবশ্যক তাহার কতকগুলি প্রার্থনা দ্বারা পাওয়া যায়—সে গুলি পাইবার পক্ষে প্রার্থনা একমাত্র উপায়। কিন্তু এমন অনেক বিষয় আছে যাহা কেবল প্রার্থনা দ্বারা পাওয়া যায় না। বিশ্বাস তাহার মধ্যে একটী। এখানেও যে প্রার্থনার কার্য্যকারিতা নাই তাহা নহে। প্রার্থনা দ্বারা হৃদয় বিগলিত হয় ও আগ্রহ বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু যাহার হৃদয়ে অবিশ্বাস প্রবেশ করিয়াছে সে শুদ্ধ প্রার্থনা দ্বারা বিশ্বাস লাভ করিতে পারে না। তাহার পক্ষে চিন্তা, অধ্যয়ন ও সাধুসঙ্গ অত্যাবশ্যক। এ সকল ব্যতীত কেবল প্রার্থনা দ্বারা সে ব্যক্তি বিশ্বাস লাভ করিতে পারে না।

৮। যদি আত্মজ্ঞান দ্বারা পরমেশ্বরকে পাওয়া যায়, তবে যাঁহারা এই বিষয় আলোচনা করেন তাঁহাদের মধ্যে সকলে পরমেশ্বরকে লাভ করিতে পারেন না কেন?

৯। ইহার কারণ এই যে, তাঁহাদের প্রকৃত আত্মজ্ঞান জন্মে নাই। তাঁহারা ইহার ভিতরে ডুবিতে পারেন নাই, কেবল উপরে ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছেন। আত্মার গভীরতম প্রদেশে না ডুবিলে পরমেশ্বরকে পাওয়া যায় না। যাঁহারা আত্মতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত তাঁহাদের মধ্যে সকলেই পরমেশ্বরকে লাভ করিতে পারেন না ইহা যেমন সত্য, তেমনই ইহাও নিশ্চিত সত্য যে, আত্মজ্ঞান ভিন্ন পরমেশ্বরকে পাওয়া যায় না।

১০। অনেকে ত দেখা যায় জ্ঞানমার্গ অবলম্বন না করিয়াও কেবল প্রার্থনা দ্বারা ঈশ্বরকে জানিতে পারিয়াছেন।

১১। প্রার্থনা করিতে হইলেই তাঁহার পূর্ব্বে ঈশ্বরের সত্তা ও তাঁহার দয়া ও শক্তি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কিন্তু সে জ্ঞান কোথা হইতে আসে? কেহ কেহ বলেন সে জ্ঞান নৈতিক অভিজ্ঞতা (moral experience) হইতে উৎপন্ন, কিন্তু নৈতিক অভিজ্ঞতা আত্মজ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ নহে।

১২। জ্ঞানালোচনা ব্যতীত যে ঈশ্বরকে একেবারে জানা যায় না তাহা নহে। ঈশ্বর স্বপ্রকাশ; তিনি কোন্ পথ দিয়া কাহার হৃদয়ে প্রকাশিত হন কিছুই বলা যায় না।

১৩। ঈশ্বরের পক্ষে সকলই সম্ভব। তিনি চিন্তা ও জ্ঞানালোচনা ব্যতীত অন্য উপায়েও মানুষের হৃদয়ে প্রকাশিত হইতে পারেন।

১৪। আমরা উপাসনার সময় অল্পাধিক পরিমাণে ঈশ্বরের সত্তা উপলব্ধি করিতে পারি বটে, কিন্তু সংসারের কার্য্যস্রোতে পড়িয়া তাঁহাকে ভুলিয়া যাই। সংসারের কার্য্যের মধ্যে তাঁহার সত্তা উপলব্ধি করিতে হইলে তিনি যে আমাদের প্রভু ও সকল শক্তির মূলশক্তি ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে। ইহার একমাত্র উপায় তাঁহাকে জীবনের উদ্দেশ্য বা মধ্যবিন্দু বলিয়া ধরিতে চেষ্টা করা।

১৫। বিশ্বাস মনুষ্যের পক্ষে স্বাভাবিক। এই স্বাভাবিক বিশ্বাসই উন্নত বিশ্বাসের বীজ। এই স্বাভাবিক বিশ্বাসকে পরিবর্দ্ধিত করিবার এক উপায় নিজের চেষ্টা ও সাধন। এ সম্বন্ধে এতক্ষণ আলোচনা হইল। এই চেষ্টা ও সাধনের পূর্ব্বে আত্মজ্ঞান বা চৈতন্যের উদয় হওয়া আবশ্যক। আত্মজ্ঞান আমাদিগকে পশুভাব হইতে উর্দ্ধে উত্থাপিত করে। এই অবস্থায় জড় জগতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে আমরা সেখানে পরমেশ্বরের প্রকাশ দেখিতে পাই। কিন্তু বিশ্বাসের বীজ অন্তরে। জড় জগতে ঈশ্বরের প্রকাশ দর্শনকে বিশ্বাসের

বৈদিক অবস্থা বলিলে মন্দ হয় না। দ্বিতীয়তঃ,জীবনের প্রত্যেক ঘটনায় ঈশ্বরের হস্ত দর্শনকে বিশ্বাসের পৌরাণিক অবস্থা বলা যাইতে পারে। তৃতীয়তঃ, আত্মচিন্তা দ্বারা আমাদের জ্ঞান, ভাব ও শক্তির মধ্যে তাঁহার প্রকাশ দর্শন করাকে বিশ্বাসের বৈদান্তিক অবস্থা বলা যায়। প্রথমোক্ত দুই অবস্থায় যে জ্ঞান লাভ করা যায়,তাহা এই শেষোক্ত অবস্থায় দৃঢ়ীভূত হয়। কিন্তু কতকগুলি আধ্যাত্মিক ব্যাপার আছে, যাহা সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত। এমন কোন কোন লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহাদের হৃদয়ে বিশ্বাস ও সাধুভাব অত্যন্ত উজ্জ্বল, এমন কি যাঁহারা তাঁহাদের সঙ্গে থাকেন, তাঁহারাও তাঁহাদের নিকট হইতে উজ্জ্বল বিশ্বাসালোক লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহারা এই অলোকসাধারণ অধিকার কিরূপে পাইলেন, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না, তাঁহারা নিজেও তাহা বুঝিতে পারেন না। নিজের চেষ্টা ও সাধনকে ইহার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। অনেকস্থলে নিজের সকল চেষ্টা যখন পরাভূত হইয়া যায়, তখনই এই স্বর্গীয় আলোক হৃদয়ে প্রকাশিত হয়,—এ চেষ্টার মধ্যে যে ঈশ্বরের কৃপার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর চাই,তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাও কখন কখন দেখা যায় যে, একজন নিজের চেষ্টা ও সাধনদ্বারা যে পরিমাণে বিশ্বাস ও সাধুতা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, অপর একজন সামান্য বিদ্যা-বুদ্ধিসম্পন্ন সাধুলোকের সংসর্গে থাকিয়া তদপেক্ষা অধিক বিশ্বাস ও সাধুতা লাভ করিতে পারিয়াছেন। সাধুসঙ্গে অত্যন্ত উপকার হয়। ইহা আশ্চর্য্যরূপে আমাদের হৃদয়ে আধ্যাত্মিকতা বিকশিত করিয়া দেয়। কেমন করিয়া যে ইহা হয়, তাহা বলা যায় না। নিজের চেষ্টা ও সাধনও যে অত্যাবশ্যক, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের একটী প্রধান অভাব এই যে, আমাদের একাগ্রতা নাই। ধ্যানদ্বারা একাগ্রতা বর্দ্ধিত করিতে হইবে। একাগ্রতা সাধনের আরও অনেক উপায় আছে ;—(১) প্রাণায়াম। চিত্ত সমাধান ভিন্ন ইহার অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। আমরা যদি প্রতি নিশ্বাসের সহিত ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিতে পারি, তাহা অপেক্ষা অধিক সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে? (২) চিত্ত সমাধানের দ্বিতীয় উপায়, দিবসের নানা কার্য্যের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রার্থনা। (৩) ঈশ্বর যে সর্ব্বদা আমাদিগকে দেখিতেছেন, তাহা কোন উপায়ে স্মরণ রাখা। আমাদের কোন একটী বন্ধু তাঁহার গৃহের প্রাচীরে একটী বৃহৎ চক্ষু অঙ্কিত করাইয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্মত্ততা বা ‘নেশা উন্নতির মূল মন্ত্র। উপাসনার সময় কখন কখন এই উন্মত্ততা আসে। ইহা যাহাতে সমস্ত জীবনে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, তাহার চেষ্টা করা আবশ্যক। তাহার উপায় (১) ভক্তির সহিত নামসাধন ; (২) নিজের অযোগ্যতা উপলব্ধি করা। অহঙ্কার ভক্তিকে বিনাশ করে ; দীনতা থাকিলে, আপনার জঘন্যতা অনুভব করিতে পারিলে হৃদয় বিগলিত হয়, এবং ব্যাকুলতা ও নির্ভরের ভাব পরিবর্দ্ধিত হইয়া ভক্তি-বিকাশের সহায়তা করে।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

মিসেস বটলার একজন পাদরীর স্ত্রী। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার একমাত্র প্রিয় কন্যার মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় তিনি শোকার্ত্ত হইয়া সান্ত্বনা লাভের আশায় একজন কোয়েকার রমণীর নিকট যান। উক্ত রমণী তাঁহাকে কোন এক পতিত আবাসে যাইতে অনুরোধ করেন। তথায় গিয়া তত্রস্থ নিরাশ্রয় মহিলাদিগকে কন্যাস্থানীয় করাই তাঁহার পক্ষে ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া তাঁহার দৃঢ় প্রতীতি হয়। তদবধি ঈশ্বরে নির্ভর করিয়া মিসেস বটলার সেই কার্য্যে ব্রতী হন। ক্রমশঃ তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত হইতে লাগিল। ১৮৬৯ সালে যখন ইংলণ্ডে সংক্রামক রোগ সম্বন্ধীয় আইন জারী হইল, তিনি তখন তাহার বিরুদ্ধে বিশেষ রূপে আন্দোলন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। মহিলা জাতির সমিতি নামক একটী সভা সংস্থাপিত হইল, তিনি তাহার সম্পাদক হইলেন। মিস কার্পেণ্টার, মিস নাইটিঙ্গেল, মিস মার্টিনো প্রভৃতি উন্নতহৃদয়া মহিলাগণ এই সভার সভ্য হন। ইঁহারা সকলে উক্ত আইনের বিপক্ষে এক আবেদন স্বাক্ষর করিয়া গবর্ণমেণ্টে পাঠাইয়া দিলেন,গবর্ণমেণ্ট কিছুই করিলেন না। কিন্তু মহিলারা কিছুতেই হঠিবার নন! তাঁহারা আপনাদের মত বিবিধ উপায়ে প্রচার করিয়া আপনাদের পক্ষ ক্রমশঃই পরিপুষ্ট করিতে লাগিলেন। মিসেস বটলার এই আন্দোলনের অধিনেত্রী ছিলেন। ভদ্র-বংশোদ্ভব হইয়াও তিনি অনেক সময়ে অভদ্রের ন্যায় নিগৃহীত হইয়াছিলেন; নিন্দা ও অপবাদ রটনা করিতে তাঁহার বিপক্ষেরা ক্রটি করেনাই! সময়ে সময়ে প্রাণ রক্ষা করা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়াছিল। কিন্তু কিছুতেই তিনি ঈশ্বরাদেশ পালনে পরাঙ্মুখ হন নাই। তাঁহার চেষ্টা অবশেষে সফল হইল; সংক্রামক রোগ সম্বন্ধীয় আইন উঠিয়া গেল। "জয়ন্ত পাণ্ডুপুত্রাণাং যেষাং পক্ষে জনার্দ্দনঃ" ঈশ্বর, ন্যায় ও সত্য যাহার পক্ষে বিপক্ষে তাহার কি করিবে? কেবল সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায় আবশ্যক।

মহর্ষি জেমস্ তাঁহার সাধারণ পত্রের প্রথম অধ্যায়ে প্রথমে বলিয়াছেন, "ভ্রাতৃগণ! যখন নানা প্রলোভন আসিয়া ঘেরিবে, তখন আনন্দিত হইও, কেন না বিশ্বাসের পরীক্ষা কেবল সহিষ্ণুতা শিক্ষার জন্য; সহিষ্ণুতাকে পূর্ণ পরিমাণে স্ফূর্ত্তি পাইতে দাও, পূর্ণতা লাভ করিবে, কোন অভাব থাকিবে না" বর্ত্তমান সময়ে এই মহাবাক্য সাধন করা আমাদের বিশেষ আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে, চারিদিক্ হইতে নানা শত্রু আমাদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিয়াছে। খৃষ্টান অখৃষ্টান, হিন্দু অহিন্দু, নাস্তিক ও আস্তিক প্রতিকূলতা করিতে কেহই ক্রটি করিতেছেন না। দেখিয়া শুনিয়া অনেক ধীর ও বিচক্ষণ ব্যক্তি আমাদের সমাজের অধঃপতন আশঙ্কা করিতেছেন। সেদিন ভারতবাসী একখানি রুচিবিরুদ্ধ প্রহসনের সমালোচনা করিতে গিয়া বলিলেন, যে ব্রাহ্ম সম্প্রদায় এখন হীনপ্রভ হইয়াছেন, এখন আর ইঁহাদের উপর পীড়াপীড়ি করা ভাল

দেখায় না। কিন্তু আমাদের ভীত হইবার প্রয়োজন নাই। আমাদের আশা ও ভরসা মানব প্রতিভার উপরে স্থাপিত নহে, মহাশক্তিরূপী ভুবনেশ্বর আমাদের বল। ব্রাহ্মধর্ম্ম মনুষ্য কল্পিত মত নহে। অবিনাশী মানব প্রকৃতি যে ধর্ম্মের ভিত্তি, অমর ঈশ্বর যাহার প্রাণ, পাঁচজন মানুষে সে ধর্ম্মকে সংক্ষুব্ধ করিবে, ইহা উপহাসের কথা। বর্ত্তমান প্রতিকূলতায় আমাদের উৎসাহ ও সাধন চতুর্গুণ বর্দ্ধিত হউক। পণ্ডিত ফষ্টর চরিত্রের দৃঢ়তা সম্বন্ধীয় তাঁহার বিখ্যাত প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে প্রতিকূলতাই চরিত্রের দৃঢ়তা সমাধান করে। প্রতিকূলতা আমাদের সম্মুখে যথেষ্ট, এখন ঈশ্বর দেখিতে চান, যে তাঁর সেবকবৃন্দ তাঁহার সন্তান না কাপুরুষ।

সংবাদ।

শ্রাদ্ধ—পরলোকগত ৺ ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি মহাশয়ের আত্মার কল্যাণার্থে তাঁহার জামাতা বাবু যাত্রামোহন সেনের গৃহে দুই দিন বিশেষ উপাসনাদি সম্পন্ন হয়। প্রথম দিন শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীমোহন চৌধুরী মহাশয় এবং দ্বিতীয় দিন শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপ চন্দ্র দাস মহাশয় উপাসনার কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এই দিনে অন্যান্য ভদ্রলোকগণও প্রার্থনাদি করেন।

বাঙ্গালোর—একজন বন্ধু লিখিয়াছেন যে, বিগত ৩রা জুলাই ভিক্টোরিয়া প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীমান্ নারায়ণ স্বামী আচারীর গৃহে, তাঁহার পুত্রের নামকরণ ব্রাহ্ম পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। বালকের নাম বিশ্বনাথ আচারী রাখা হইয়াছে। আর গোপাল স্বামী আচারী আচার্য্যের কার্য্য করেন। পঞ্জাবের হরিচরণ নামক একজন যোগী তীর্থ ভ্রমণোপলক্ষে আসিয়াছিলেন, তিনি হিন্দিতে "পিতা পুত্রের প্রেম" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা দেন।

২০এ জুন ব্রহ্মমন্দিরে বিশেষ ব্রহ্মোপাসনা হয়। শ্রীমান্ এ এম টিরুভানগাদা স্বামী মুদালিয়ার উপাসনা করেন। পঞ্জাবের যোগী হরিচরণ ব্রহ্মযোগ বিষয়ে উপদেশ দেন। প্রায় ১৫০ জন ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন।

গত মে মাস হইতে সুগজীবনী নামক এক খানি নূতন সংবাদ পত্র তামিল ভাষায় বাহির হইতেছে। উহাতে ধর্ম্ম সমাজ ও রাজনীতি সম্বন্ধীয় বিষয়ের প্রসঙ্গ থাকে। উক্ত পত্রিকার সম্পাদক সাধারণের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। পত্রিকার আকার শীঘ্রই বর্দ্ধিত করা হইবে ও উহাতে ইংরাজি প্রবন্ধ লিখিত হইবে। যদি কেহ কিছু চাঁদা পাঠাইতে বা দান করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সুগজীবনী ৪ স্বামী মুদালিয়ার ষ্ট্রীট সি ও এম ষ্টেসন বাঙ্গালোরএ শ্রীমান সি সমাসুন্দরা মুদালিয়ার কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইবেন।

ধুবড়ী—বাবু অক্ষরকুমার সেন পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্নের ধুবড়ীতে প্রচার কার্য্যের বিবরণ লিখিয়াছেন। পণ্ডিত মহাশয় তথায় বিগত ১৪ই জুন উপস্থিত হন।

১৫ই জুন—স্থানীয় ব্রাহ্মদের সহিত যুক্তি করিয়া প্রচার কার্য্যের প্রণালী ঠিক্ করা। বৈকালে ধর্ম্ম বিষয়ে কথোপকথন, সায়ংকালে মন্দিরে কীর্ত্তন, পাঠ ও উপাসনা।

১৬ই ঐ—প্রাতঃকালে একজন বন্ধুর গৃহে উপাসনা, বৈকালে কথোপকথন, সায়ংকালে কীর্ত্তন ও বক্তৃতা।

১৭ই ঐ—প্রাতঃকালে জনৈক ব্রাহ্ম বন্ধুর গৃহে উপাসনা, বৈকালে কথোপকথন, সায়ংকালে উপাসনা ও উপনিষৎ পাঠ।

১৮ই জুন ঐ—প্রাতঃকালে এক বন্ধুর বাড়ী উপাসনা, বৈকালে স্থানীয় স্কুল গৃহে বক্তৃতা, সন্ধ্যার সময় বিজনী হলে বক্তৃতা।

১৯এ ঐ—প্রাতঃকালে ছাত্রসমাজ প্রতিষ্ঠা, সন্ধ্যার সময় উপাসনা ও কীর্ত্তন।

২০এ ঐ—মধ্যাহ্নে উপদেশ, সায়াহ্নে এক জন বন্ধুর গৃহে পাঠ উপাসনা ও কীর্ত্তন।

২১এ ঐ—প্রাতে একটী হিন্দু পরিবারে উপাসনা সম্বন্ধে কথোপকথন, মধ্যাহ্নে ভগবদ্গীতা পাঠ, সায়াহ্নে কথোপকথন।

২২এ ঐ—টুরায় যাওয়া, সেখানে কিয়দ্দিবস অবস্থানের পর ৮ই জুলাই প্রত্যাগমন, সন্ধ্যার সময়ে কথোপকথন।

৯ই জুলাই—স্থানীয় কয়েকজন ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ; সায়াহ্নে মন্দিরে বক্তৃতা।

১০ই জুলাই—প্রাতেঃ ও সায়াহ্নে মন্দিরে উপাসনা।

১১ই জুলাই—গৌহাটী যাত্রা।

চাঁদা আদায়—বেহার ও পশ্চিমাঞ্চলে মেসেঞ্জার ও তত্ত্বকৌমুদীর বাকী চাঁদা আদায় করিবার ভার বাবু জয়কৃষ্ণ মিত্রের উপর দেওয়া হইয়াছে। গ্রাহকগণ অনুগ্রহ করিয়া আপন আপন দেয় যেন তাঁহাকে দেন।

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের পুস্তকালয়—পুস্তকালয় সবকমিটি নিম্নলিখিত আবেদন প্রকাশ করিয়াছেন।

এই পুস্তকালয় আট বৎসরের উপর হইল সংস্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আজও পর্য্যন্ত উহার পুস্তক সকল আশানুরূপ ব্যবহৃত হইল না।

যে সকল লোক ও ব্রাহ্ম ছাত্রদের অবস্থা ভাল নহে, উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম পুস্তকালয়ের সুবিধা লাভ করা তাঁহাদের সাধ্যাতীত। ধর্ম্ম সমাজের ধর্ম্মোন্নতি সাধনে যে এরূপ পুস্তকালয় নিতান্ত আবশ্যক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আশা করা যায় যাঁহারা ধর্ম্ম পুস্তকের অভাব বোধ করেন, ভবিষ্যতে তাঁহারা এই পুস্তকালয়ের পুস্তক সকল অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিবেন। চাঁদার হার এত অল্প যে, নিতান্ত দরিদ্র ভিন্ন কাহারও তাহা দিতে কষ্ট বোধ হইবে না।

যাঁহারা পুস্তকালয় হইতে পুস্তক লইতে চান, তাঁহারা আপন আপন নাম সম্পাদক অথবা সহকারী সম্পাদক বাবু উমাচরণ সেন বি এর নিকট পাঠাইয়া দিবেন। যাঁহাদের এই পুস্তকালয়ের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সহানুভূতি আছে, তাঁহাদের কাছে প্রার্থনা যে তাঁহারা যেন সাধ্যমত অর্থ, পুস্তক বা পত্রিকা দিয়া সাহায্য করেন। পুস্তকালয় সম্প্রতি ১৩ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ভবনে আনীত হইয়াছে।

পণ্ডিতা রমাবাই—ভারত রমণীগণের প্রতি আমেরিকা বাসীদিগের সহানুভূতি উৎপাদনের জন্য পণ্ডিতা রমাবাই আমেরিকার স্থানে স্থানে বক্তৃতা করিতেছেন। সম্প্রতি ইয়াকা নগরে তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া তত্রত্য লোকেরা ভারত রমণীদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য এক সমিতি গঠন করিয়াছেন। তথাকার সূর্য্য নামক সংবাদ পত্র বলেন যে, পণ্ডিতা রমাবাইর জন্য যে সকল সভা হইয়াছে তাহাতে বহুসংখ্যক লোক যোগ দিয়াছিলেন। গত শনিবারে এত লোক হইয়াছিল যে, তিলার্দ্ধ স্থান ছিল না। শুক্রবার রাত্রে পণ্ডিতা ভারত মহিলার দুর্দ্দশার কথা সমাগত ব্যক্তিদিগকে পরিষ্কার ভাবে বুঝাইয়া দেন এবং বলেন যে, বাল্যবিবাহ তাঁহার দেশস্থ রমণীগণের কার্য্য ও চিন্তা-সম্বন্ধীয় স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়া ফেলে। শনিবার রাত্রে পণ্ডিতা খ্রীষ্টীয় প্রচারকদিগের দ্বারা ভারত রমণীদিগের শিক্ষা দিবার পথে কি কি অন্তরায় আছে তাহা উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, অসাম্প্রদায়িক বিদ্যালয় দ্বারা উহাদের শিক্ষা-কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে। রবিবারে পণ্ডিতা সকল কথা খুলিয়া বলিলেন এবং আমেরিকা হইতে তিনি এবিষয়ে কেন সাহায্য প্রত্যাশা করেন, তাহাও ব্যক্ত করিলেন। তাঁহার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তখনই সকলের মত লইয়া ভারত মহিলা উন্নতিবিধায়িনী রমাবাই সমিতি বলিয়া একটী সভা সংস্থাপিত হইল, ও তাহার নিয়মাবলী স্থিরীকৃত হইল।

অন্য ধর্ম্ম সমাজ—মেঃ ডি এল মুডি ভারতবর্ষে প্রচার করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছেন। অনুরোধকারী তাঁহার খরচ পত্রের জন্য ৫০০০ পাউণ্ডের এক খান চেক পাঠাইয়া দিয়াছেন।

তত্ত্বকৌমুদীর মূল্যপ্রাপ্তি স্বীকার।

(জানুয়ারি ১৮৮৭)

শ্রীযুক্ত বাবু জগদীশচন্দ্র রায়	কলিকাতা	৩৲
শ্রীমতী স্বর্ণময়ী রায়	সদ্যপুষ্করিণী	৩৲
শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ গুপ্ত	হাজারিবাগ	৩৲
„ „ ভোলানাথ সরকার	মানভূম	১৷৹
„ „ পরেশনাথ সেন	কলিকাতা	১৷৹
„ „ শরচ্চন্দ্র রায়	ময়মনসিংহ	৪৲
সম্পাদক রামপুরহাট ব্রাহ্মসমাজ		৩৲
শ্রীযুক্ত বাবু দলু সিংহ	কলিকাতা	৩৲
„ „ শ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায়	বগুড়া	৩৲
„ „ গিরিগোপাল রায়	ঐ	৩৲
„ „ খগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	সৈয়দপুর	৩৲
„ „ ক্ষেত্রনাথ ঘোষ	ঐ	২৲
„ „ হরিবিলাস আগরওয়ালা	তেজপুর	৩৲
শ্রীমতী গিরিবালা বিশ্বাস	ডিব্রুগড়	৩৲
শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গামোহন দাস	কলিকাতা	৩৲
„ অন্নদাচরণ খাস্তগিরি	ঐ	১৲
শ্রীমতী অবলা দাস	কলিকাতা	৩৲
	স্বর্ণগ্রাম	৩৲
শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মীকান্ত বড়কাকুতি	তেজপুর	৩৲
শ্রীমতী বিরাজমোহিনী মুখোপাধ্যায়		৩৷৹
শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ মিত্র	কলিকাতা	১৷৹
„ „ বেণীমাধব মল্লিক	ঢাকা	৬৲
„ „ জগদ্বন্ধু লাহা	ঐ	৩৲
„ „ অযোধ্যানাথ চৌধুরী	ঐ	৩৲
„ „ কালীচরণ গুপ্ত	ঐ	৩৲
„ „ গোবিন্দচন্দ্র দাস	ঐ	৩৲
„ „ অভয়চন্দ্র নাগ	ময়মনসিংহ	৪৲
„ „ শশিকুমার বসু	ঐ	৩৲
„ „ চন্দ্রমোহন বিশ্বাস	ঐ	৯৲
„ „ কালীপদ মুখোপাধ্যায়	পাঙ্কা	৩৲
„ „ রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	মুরশিদাবাদ	১০৲
„ „ রূপচাঁদ মল্লিক	বাগআঁচড়া	৩৲
„ „ রামগোপাল ভট্টাচার্য্য	মজিলপুর	৭৷৹
„ „ জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	বরাহনগর	২৲
শ্রীমতী চঞ্চলা ঘোষ	কোন্নগর	১৲
শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন সিংহ রায়	বাঁশবেড়ে	২৲
সম্পাদক নওগাঁ ব্রাহ্মসমাজ		১০৲
শ্রীযুক্ত বাবু হারাণচন্দ্র মিত্র	হরিনাভি	২৲
„ „ হরনাথ বসু	কলিকাতা	১৲
„ „ রামগোপাল বিশ্বাস	মাণিকদহ	৩৷৶৹
„ „ শশিভূষণ তালুকদার	টাঙ্গাইল	২৲
„ „ বিপিনবিহারী রায়	মাণিকদহ	৩৲

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকার সম্পাদকের নামে, যাঁহারা প্রবন্ধ পত্রিকা বা পুস্তকাদি প্রেরণ করেন, তাঁহারা যেন এখন হইতে অনুগ্রহ পূর্ব্বক ঐ সকল প্রবন্ধ, পত্রিকা ও পুস্তক ১৩নং মাণিকতলা ষ্ট্রীটে সম্পাদকের ঠিকানায় পাঠাইয়া দেন।

তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক।

১৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিসন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র দত্ত দ্বারা ১৮ই ভাদ্র মুদ্রিত ও ২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

১

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১০ম ভাগ।
১১শসংখ্যা।

১লা আশ্বিন শনিবার, ১৮০৯ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৮।

বাৎসরিক অগ্রিমমূল্য ২৷৷০
মফস্বলে ৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

পূজার আয়োজন।

'তবু প্রাণ ঘুরে মরে এর দ্বারে তার দ্বারে'
প্রাণের দুয়ার পাশে দাঁড়া'য়ে, ডাকিলে ধীরে,
শুনিয়া শুনিল নাহি বিষয়-বধির কাণ;
ডেকে দেখা নাহি পেয়ে, অন্য ঠাঁই গেলে ফিরে;
দেখিয়া দেখিল নাহি, সংসার-মোহিত প্রাণ।
না পার থাকিতে, নাহি করি' তব কৃপা দান,
আবার ফিরিয়া আসি', ডাক প্রাণে বারে বার;
অবাধে ফিরাই আঁখি মতিছন্ন দুরাচার;
নিঠুর তনয় হাতে ঘোর পিতৃ অপমান।
তবু আজ (ও) বেঁচে আছি, লয়ে সেই ছার প্রাণ—
যে প্রাণে বিদায় আমি করিয়াছি তোমা ধনে;
আজিও সে চোখ আছে, আছে সেই পাপ কাণ,
ত্যজেছে তোমায় যারা অনাদরে অযতনে।
ধিক্ ধিক্ শতধিক্ হেন অকৃতজ্ঞ চিতে
তোমাতে সংসারে আজ (ও) প্রভেদ করিতে নারে;—
করেছ স্বীকার নিজে অধমে আপনা দিতে,
তবু প্রাণ ঘুরে মরে, এর দ্বারে তার দ্বারে।

হে ইষ্টদেবতা আমি তোমাকে প্রাণের নির্জ্জন গৃহে প্রতিষ্ঠিত করিব। বাহিরে বড় কোলাহল, বড় অশান্তি, সেই জন্য আমার এত নির্জ্জনে থাকিবার স্পৃহা। অমুন্নত আত্মাকে স্থির রাখিতে পারি না, সামান্য কোলাহলেই বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, আবার সংগ্রহ করিয়া একীভূত করিতে অনেক পরিশ্রম লাগে। মন স্থির না হইলে তোমার সত্তা উজ্জ্বলভাবে স্ফূর্ত্তি পায় না। সংগ্রাম করিতেই যদি চির দিন যাইবে, তবে সম্ভোগ করিব কবে? অন্য অসার চিন্তা নিবিয়া যাউক, তোমার চিন্তা উজ্জ্বল হউক। তোমার চিন্তা ভিন্ন যদি আর একটীও চিন্তা না থাকে, তাহা হইলেই আমি পূর্ণ নির্জ্জনতা অনুভব করিতে পারিব। মন সম্পূর্ণরূপে অন্যচিন্তাহীন না হইলে, নিশ্চিন্ত হয়ে তোমার সহবাস সম্ভোগ করিতে পারিব না। মনকে তবে তোমার চিন্তায় ডুবাও, আমি নির্জ্জনতার রাজ্যের মধুরতা অনুভব করি। মন যদি প্রকৃতরূপে নির্জ্জন হয়, তাহা হইলে অনেক দিন হইতে যে দু একটী সাধ আছে, তাহা পূর্ণ করিতে পারি। নির্জ্জনতার রাজ্যে তোমার সঙ্গে অজ্ঞাত সহবাস করিবার বাসনা চরিতার্থ কর।

প্রিয়তম! তুমি যাহা ভালবাস, এমন কোন সামগ্রী আনিতে পারি নাই। লোকে প্রিয়জনের জন্য প্রিয়জনোচিত কতই বস্তু আহরণ করে। আমার ক্ষমতায় কিন্তু তাহা হইল না। আমি তো অন্যের সম্পত্তি ঋণ করিয়া তোমাকে দিতে পারি না। এত দিন ঘষিয়া মাজিয়াও আপনার মন তোমার মনোমত করিতে পারিলাম না। আমি এখন কি করিব? থাকিব না চলিয়া যাইব? অন্তরে উত্তর পাইলাম, "আমার মন্দিরে সাধু অসাধু সকলেরই স্থান আছে, কিন্তু কপটীর স্থান নাই। তুমি যেমন আছ, তেমনই আপনাকে উপহার দেও, আমি সমাদরে গ্রহণ করিব।" উত্তর শুনিয়া আমি স্তম্ভিত; আমি যেমন আছি, তেমনি ভাবে গেলেও আমাকে গ্রহণ করিবেন। তবে মন আর বৃথা বিলম্ব করিতেছ কেন? দোকান পাট বন্ধ করিয়া সত্বর ঈশ্বর চরণে শরণাপন্ন হও।

বিশ্বপতি! তুমি বড় না আমি বড়, এ কথা যদি আমি জিজ্ঞাসা করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই লোকে আমাকে উপহাস করিবে। জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রেম, পবিত্রতা কিসে আমি তোমার সঙ্গে লাগিতে পারি? অস্তিত্বেও আমি তোমার চেয়ে বড় নই, কেন না, তুমি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র, আমি তোমার নিতান্ত অধীন ও পরতন্ত্র। তবে কাজে আমি তোমাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া বড় হইতে চাই কেন? আমি যদি বাস্তবিকই তোমার অধীন, তবে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার ইচ্ছা পরিচালিত করিতে কেন সাহসী হই? তোমার চিন্তা ভিন্ন অন্য চিন্তাকে মনে কোন্ সাহসে স্থান দিই? সূক্ষ্মরূপে ভাবিয়া দেখি যে, "আমি বড়" ভাব মূলে আছে বলিয়া আমি পাপ করিতে পারিতেছি। এই দূষিত অহং উৎপাটন করিয়া আমার জীবনের মূল পরিশুদ্ধ করিয়া দাও যে আমার কথায় ও কাজে মিল হউক।

প্রভু, কাজ করিতে করিতে আমি অনেক সময়ে কাজে ডুবিয়া যাই, সে সময়ে তোমার সর্ব্বদর্শী চক্ষের কথা ভুলিয়া যাই। প্রভাতের মত রমণীয় ও পবিত্র মন লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে নামিলাম, কার্য্য শেষ হইল, দেখি, না আছে সে প্রভাতের

রমণীয়তা, না আছে সে পবিত্রতা, না আছে সে যোগ ও গুরুত্ব, আত্মায় উপাসনার আগে যে অসারতা ও লঘুতা ছিল, সেই অসারত্ব ও লঘুত্ব আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। এ রোগের উপায় কি? কাজে মনোযোগ দিতে গিয়া মত্ততা আসিবে কেন? পৃথিবীর সঙ্গে কি ধর্ম্মের চিরকালই বিবাদ চলিবে? প্রভু কাজও তোমার, ধর্ম্মও তোমার, দুজনেই মহাবলী; উঁহাদের বিবাদে আমি ক্ষুদ্র প্রাণী মারা যাইতেছি। কার্য্য-প্রমত্ততা হতে যাহাতে নিস্তার পাই, তাহার সদুপায় বলিয়া দাও। আমার ধর্ম্মপ্রমত্ততা এমন বলবতী হউক যে অন্য কোন প্রমত্ততা আসিয়া মনকে না অধিকার করিতে পারে। উপাসনার নেশার মাত্রা এমনই চড়াইয়া দেও যে, সহস্র কাজের ভিড়েও সে নেশার তিলার্দ্ধ না হ্রাস হয়।

সৎস্বরূপ, তুমি দেশ কালে নিবদ্ধ নহ, তবে আমি তোমার উপলব্ধির সঙ্গে দেশ কাল বোধ মিশ্রিত করিব কেন? দেশ কাল বোধ উজ্জ্বল থাকায় তোমার সত্তার উপলব্ধি ঘনীভূত হইতে পারে না। তোমাকে উপলব্ধি করিব, অথচ মন একেবারে বসিয়া যাইবে না, রোমাঞ্চ হইবে না, সে কি প্রকার উপলব্ধি? তুমি আছ বলিতেছি, অথচ না থাকিলে যেমন নির্ভয়ে থাকিতাম, তেমনই নির্ভয়ে কাজ করিতেছি! তোমার উপলব্ধি ঘনীভূত ও প্রগাঢ়তর করিয়া দাও। সংসারের আলো একেবারে নির্ব্বাণ হউক্, দেশ কালের বোধ চলিয়া যাক্। পরমাত্মন্! মহা সত্য, মহা জ্ঞান, মহা প্রাণ, মহা প্রেম ও মহা-পুণ্য বলিয়া তোমাকে উপলব্ধি করিতে করিতে আমার চিত্ত অধ্যাত্মসাগরে নিমগ্ন হউক। তুমি সকলপ্রকার ভ্রম বিনাশ কর। তুমি প্রকৃত যাহা, আমি তাহা উপলব্ধি করিয়া ধন্য হই।

তোমার কাছে শুধু বসিয়া তৃপ্ত হইতে পারি না। কেননা তোমার কাছে অনেকবার বসিয়াছি, আবার উঠিয়া আসিয়াছি। তোমার কাছে থাকিয়া শরণাপন্ন হইতে চাই; একবার বসা, একবার উঠা এ সকল চঞ্চলতা আর ভাল লাগে না। বাল-কের মত কি বৃদ্ধ বয়সে তোমার সঙ্গে ক্রীড়া করিব? মনের আধ্যাত্মিক শির তোমার পাদপদ্মে চিরকালের জন্য প্রণত হইয়া থাকুক। মৌখিক উপাসনায় যে ভুলিতে চায়, সে ভুলুক, আমি তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারি না। যে অবস্থায় এক আত্মা আর এক আত্মাকে পূজা করে, আমাকে সেই অবস্থায় লইয়া চল। পূজা স্থায়ী হউক, পূজাকে আমার প্রকৃতি করিয়া ফেল। হে অদ্বিতীয় পূজার পাত্র, তুমি কি উপকার করিতে কিছু কি বাকী রাখিয়াছ? ভিখারীকে ধনী করিয়াছ, গৃহহীনের গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছ, উদ্দেশ্যহীন জীবনে উদ্দেশ্য আবিষ্কার করিয়াছ, পাপের কলঙ্ক মুছিয়াছ, এখনও মুছিতেছ। তবু কি প্রাণ জাগিবে না? সুপ্ত পূজার প্রবৃত্তি জাগ্রত হইবে না? পরমারাধ্য! পূজার ভাব প্রাণে সত্বর বিকাশিত কর যে আমি প্রকৃত উপাসনা করিতে শিখি।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

ব্রাহ্মের সংসার পূজা।

সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মসাধন করা যে অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। প্রলোভনের বস্তু সম্মুখে থাকিতে রক্তমাংসের শরীর লইয়া তাহার আকর্ষণ অতিক্রম করা, নানাপ্রকার সুখ ও বিলাসের সামগ্রী ভোগ করিবার সুবিধা সত্ত্বেও সুখলালসা ও বিলাসিতা পরিত্যাগ করা, সংসারের ধন, মান, যশ ও প্রভুত্ব হস্তগত করিবার উপায় সত্ত্বেও তৎসম্বন্ধে উদাসীন থাকা যে মানুষের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন, এ কথা কে অস্বীকার করিতে পারে? অথচ ব্রাহ্মধর্ম্মের একটী সর্ব্বপ্রধান উপদেশ এই যে, সংসারে থাকিয়াই ধর্ম্মসাধন করিতে হইবে, এবং যথার্থ ধার্ম্মিক হইতে হইলে পরমেশ্বরের প্রকৃত উপাসক হইতে হইলে, প্রবৃত্তি সকলকে বশীভূত করিতে হইবে, প্রলো-ভনের বস্তু সকলকে পবিত্র চক্ষে দেখিতে হইবে, সর্ব্বপ্রকার স্বার্থপরতা, সুখলালসা ও বিলাসিতা পরিত্যাগ করিতে হইবে ও সংসারের ধন মান প্রভৃতির প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া ঈশ্বরের সেবায় জীবন সমর্পণ করিতে হইবে। একমাত্র নিত্য সত্য পরমেশ্বরকে লাভ করা যাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য, তিনি কখনই সংসারের অনিত্য সুখ সম্ভ্রমে ভুলিয়া জীবন কাটাইতে পারেন না। হৃদয়ের অবিভক্ত অনুরাগ না দিলে কখনই সেই দেবদুর্লভ অধিকার লাভ করা যায় না। ধর্ম্ম-রাজ্যে দুই দিক্ বজায় রাখিয়া চলা অসম্ভব। ঈশ্বরসেবা ও সংসারসেবা কখনই একত্র চলিতে পারে না। জীবনের অধি-কাংশ সময় পরমেশ্বরকে ভুলিয়া সংসারে মগ্ন থাকিব, কেবল অবসর ও সুবিধা অনুসারে এক আধবার তাঁহাকে ডাকিব, এরূপ করিলে জনসমাজে ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হওয়া যাইতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিবার অধিকারী হওয়া যায় না। এমন কেহ বোধ হয় আমাদের মধ্যে নাই, যিনি অন্ততঃ মুখে এ সকল কথা স্বীকার করেন না। কিন্তু আমাদের ব্যবহার দেখিয়া মনে হয় না যে, আমরা কার্য্যতঃ ব্রাহ্মধর্ম্মের উক্ত উপদেশ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি। আমরা যেভাবে জীবন কাটাইতেছি, তৎসম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, আমরা সমস্ত হৃদয়ের সহিত পরমেশ্বরকে চাই না। আমরা সংসারও চাই ঈশ্বরকেও চাই। সাংসারিক সুখের মায়া আমরা আজিও ভুলিতে পারি নাই। ধার্ম্মিক হইতে যে আমাদের সাধ যায় না, তাহা নহে; কিন্তু আমরা ধর্ম্মের জন্য, ঈশ্বরের জন্য সাংসারিক সুখ সুবিধা বিসর্জ্জন দিতে, আজিও প্রস্তুত নহি। এ ভাবে ধর্ম্মসাধন অসম্ভব। সংসার পূজা ও ঈশ্বর পূজা একত্র চলিতে পারে না। সমস্ত হৃদয় না দিলে কি কখন সেই দেবদুর্ল্লভ ধন লাভ করা যায়? আমরা আমাদের হৃদয় ভাগ করিয়া তাহার অধিকাংশ সংসারকে দিতে চাই, অবশিষ্ট কিয়দংশ মাত্র ঈশ্বরকে দিতে চাই। বাহিরের গৃহ নির্ম্মাণের জন্য আমাদের যত ব্যস্ততা, প্রাণের মধ্যে ঈশ্বরের গৃহ নির্ম্মাণের জন্য তত

ব্যস্ততা কৈ? বাহিরের গৃহ সাজাইতে আমাদের যত আগ্রহ, আত্মার গৃহ সাজাইতে তত আগ্রহ কৈ? এই ক্ষণভঙ্গুর দেহ যাহাতে লোকের চক্ষে সুন্দর দেখায়, তাহার জন্য আমাদের যত ব্যগ্রতা, আমাদের অবিনাশী আত্মা যাহাতে ঈশ্বরের চক্ষে সুন্দর দেখায়, তাহার জন্য আমাদের তত ব্যগ্রতা কৈ? ঈশ্বর আমাদের নিত্যসঙ্গী, না সংসার আমাদের নিত্যসঙ্গী?

ধর্ম্মের কতকগুলি বাহ্য অনুষ্ঠান ও আড়ম্বর বজায় রাখিয়া সুবিধা ও অবসর অনুসারে একটু একটু ধর্ম্মসাধন, উৎসব প্রভৃতি বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে একটু ভাবের উচ্ছ্বাস, আর অবশিষ্ট সমুদয় সময় আশ মিটাইয়া, প্রাণ ভরিয়া সংসার পূজা—ইহাই যেন আমাদের জীবনের স্থায়ী ভাব হইয়া উঠিতেছে। এ ভাবে যদি আর কিছুদিন চলে, তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজ শীঘ্রই জীবনহীন ক্ষুদ্র সম্প্রদায় মাত্রে পরিণত হইবে। জীবন্ত বিশ্বাস ভক্তি ভিন্ন, পূর্ণমাত্রায় আত্মোৎসর্গ ভিন্ন কখনই কোনও ধর্ম্মসমাজ আধ্যাত্মিক মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে পারে না। সংসার পূজা দ্বারা সাংসারিক উন্নতি হইতে পারে, কিন্তু অপর দিকে ইহা আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ একেবারে বন্ধ করিয়া দেয়।

ব্রাহ্মধর্ম্মের একটী বিশেষ ভাব ও উপদেশ এই যে, জীবন্ত পরমেশ্বরের সহিত আমাদের আত্মার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে, প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে তাঁহাকে হৃদয় সিংহাসনে বসাইতে হইবে, তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে আপনার বলিয়া বিশ্বাস করিয়া, সুখে দুঃখে, পাপ তাপে, রোগে শোকে, সকল অবস্থায় ও সকল সময়ে তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া থাকিতে হইবে, তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম বস্তু বলিয়া জানিয়া প্রাণ ভরিয়া তাঁহাকে ভাল বাসিতে হইবে, প্রাণের অবিভক্ত অনুরাগ ভক্তি তাঁহার চরণে উপহার দিতে হইবে, তাঁহাকে আমাদের নিত্য সহচর ও অবলম্বন বলিয়া উজ্জ্বলভাবে অনুভব করিতে হইবে। যিনি তাহা পারিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্ম নামের অধিকারী। নতুবা তোমার আমার ন্যায় ধর্ম্মাভিমানে বক্ষঃস্থল স্ফীত করিয়া, কেবল মুখে উচ্চ উচ্চ ধর্ম্মের কথা বলিলে, শূন্য হৃদয় লইয়া ফাঁকা বক্তৃতা বা সঙ্কীর্ত্তনের ধ্বনিতে গগন পূর্ণ করিলে, সভা সমিতিতে গিয়া প্রতিপক্ষের সহিত বাগ্‌যুদ্ধে নিপুণতা দেখাইতে পারিলে, প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে অপরের চরিত্র বা মত লইয়া সমালোচনা করিতে পারিলেই ব্রাহ্ম হওয়া যায় না।

ব্রাহ্ম ভাই! ব্রাহ্মিকা ভগিনি! আমরা ধর্ম্মের সার কি পাইয়াছি? পরমেশ্বরকে আপনার করিতে কি পারিয়াছি? তাঁহার সহিত আত্মার নিত্য ও প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে কি পারিয়াছি? তাহা যদি পারিতাম, তাহা হইলে আজি আমাদের মুখ এত মলিন কেন? তাহা যদি পারিতাম, তাহা হইলে আজি আমরা নিদ্রাভিভূতের ন্যায় অচেতনভাবে জীবন কাটাইব কেন? তাহা যদি পারিতাম, তাহা হইলে আজি আমরা তুচ্ছ শারীরিক সুখ লইয়া, সাংসারিক সুবিধা লইয়া, বাহিরের আড়ম্বর ও সাজ সজ্জা লইয়া এত ব্যস্ত থাকিব কেন? আর তাহাই যদি না পারিলাম, তবে আর আমাদের ব্রাহ্ম নামে অধিকার কি? যিনি যথার্থ ব্রাহ্ম, তিনি কি কখন ঈশ্বরকে বিস্মৃত হইয়া, তাঁহার কার্য্যে অবহেলা করিয়া মানবজীবনের উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া ধন মান প্রভুত্ব বা বস্ত্রালঙ্কার প্রভৃতির ন্যায় তুচ্ছ সামগ্রী লইয়া ভুলিয়া থাকিতে পারেন? অথচ যখন নিজের দিকে চাহিয়া দেখি, তখন কি দেখিতে পাই? তখন দেখিতে পাই, আমাদের মধ্যে অনেকেই কোন না কোন আকারে সংসারকে হৃদয় সিংহাসনে বসাইয়া তাহারই পূজা করিতেছি; তখন দেখিতে পাই, আমরা সিংহ শাবক হইয়া শৃগালের দাসত্ব করিতেছি; তখন দেখিতে পাই, আমরা নানারাগরঞ্জিত একখণ্ড কাচের লোভে বহুমূল্য হীরককে অবহেলা করিতেছি; তখন দেখিতে পাই, আমরা দেবদুর্ল্লভ অধিকার লাভ করিয়া, স্বর্গরাজ্য হাতে পাইয়া নিজের বুদ্ধির দোষে তাহা হারাইতে বসিয়াছি। যদি আমরা ব্রাহ্ম নামের অধিকারী হইতে চাই, ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ জীবনে পরিণত করাই যদি আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়, ব্রাহ্ম সমাজের উচ্চ আদর্শ অক্ষুন্ন রাখা যদি আমাদের যথার্থ অভিপ্রেত ও কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে সংসারপূজা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া, সুখ-লালসা ও বিলাসিতায় জলাঞ্জলি দিয়া, মান অভিমানের মস্তকে পদাঘাত করিয়া, স্বার্থপরতার সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ছিন্ন করিয়া হৃদয়ের সমস্ত অনুরাগ ঈশ্বরের চরণে উপহার দিতে হইবে; প্রাণের সিংহাসনে সেই প্রাণের দেবতাকে বসাইয়া ভক্তির সহিত নিত্য তাঁহার পূজা অর্চ্চনা করিতে হইবে; তাঁহার সহিত প্রত্যক্ষ ও নিত্য সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তাঁহাকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য জানিয়া তাঁহার সেবায় সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে। ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম, ইহাই পরিত্রাণ, ইহাই স্বর্গ। যিনি ইহা জীবনে সাধন করিতে পারিয়াছেন, তিনিই যথার্থ ব্রাহ্ম। দুঃখের বিষয় এই যে, ব্রাহ্ম সমাজে এরূপ লোকের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। নতুবা তোমার আমার ন্যায় সংসারপূজক ব্রাহ্ম অনুসন্ধান করিলে অনেক পাওয়া যায়। কিন্তু তাহাতে জগতের কোন লাভ নাই।

উপাসনাতত্ত্ব

১

প্রস্তুত হওয়া।

উপাসনা সাধনে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। অপ্রস্তুত মনে যে কখন উপাসনা সরস হয় না, এমন নহে। অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে, সাধ্যমত চেষ্টা করা গেল, অথচ প্রস্তুত হওয়ার কোন লক্ষণই স্ফূর্ত্তি পাইল না, অথবা আলস্য, জড়তা, শুষ্কতা বা অন্য কোন কারণে কোন চেষ্টাই করা হইল না; তথাপি বসিবামাত্র প্রাণ বিগলিত হইল, প্রণাম করিবামাত্র সুপ্ত সত্তাস্মৃতি জাগ্রত হইয়া প্রাণকে আকুল করিয়া তুলিল; কিন্তু এরূপ সর্ব্বদা ঘটে না। সরস উপাসনার ভাব না লইয়াও সংসারের সংগ্রামক্ষেত্রে যাইতে সাহস হয় না। এরূপ স্থলে উপাসনাসাধকেরা যখন প্রস্তুত হওয়ার কার্য্যকারিতা একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন, তখন

প্রস্তুত হওয়া অনাবশ্যক, এ কথা বলিতে বোধ হয় কেহ সাহস করিবেন না। কৃপাবাদীরা ধর্ম্মসাধন মাত্রকেই হীন স্থান দেন, তাঁহাদের মত খণ্ডন করিবার যুক্তি এখানে অবতারণা করিবার আবশ্যক নাই। এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, তাঁহারা চেষ্টাকে নিম্নস্থান দিতে গিয়া মানবপ্রকৃতির একটী মৌলিক সত্য বিস্মৃত হন। সে সত্য এই যে, ঈশ্বর প্রাণের প্রাণ। ঈশ্বর যদি প্রাণের প্রাণ, তবে আত্মা যখন তাঁহাকে লাভ করিতে চেষ্টা করিবে, তখন কি সেই চেষ্টায় ঐশী অধ্যাত্ম বল স্ফূর্ত্তি পাইবে না? যে মনে করে, আমার চেষ্টায় আমি স্বর্গরাজ্য অধিকার করিব, সে যেমন অচিরে পতিত হয়, যে মনে করে যে ঈশ্বর কৃপা আমাকে স্বর্গধামে লইয়া যাইবে, আমি কেবল বসিয়া থাকিব, তাহারও কল্পনা তেমনই ব্যর্থ হয়। আদর্শ হইতে আদর্শান্তরে যাইবার চেষ্টাই আমাদের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রকৃতি, আমাদের বসিয়া থাকিলে চলিবে কেন? সকল দেশের যোগী ও সাধকেরা সেই জন্য আলস্যকে ধর্ম্মজীবনের মহাশত্রু বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। আর একটী কথা এখানে বলা অত্যাবশ্যক। আমাদের আধ্যাত্মিক প্রকৃতি অভ্যাসের মহানিয়মসাপেক্ষ। আমাদের মনের গঠন এরূপ যে, কোন চিন্তাকে দুই তিন বার মনে স্থান দিলে চতুর্থবার সে চিন্তা আপনা হইতেই মনে উপস্থিত হইবে। সম্ভাব কি অসদ্ভাব উভয় ভাব সম্বন্ধেই এই নিয়ম খাটে। সমস্ত দিন সংসার চিন্তা করিয়া উপাসনার সময় উপস্থিত হইল বলিয়া উপাসনায় বসিলেই অভ্যাসের অপ্রতিহত শক্তিপ্রভাবে সেই সংসারচিন্তা আসিয়া পুনঃপুনঃ মনকে বিরক্ত করিবে। এই বিঘ্ন নিবারণের জন্য উপাসনার অনুকূল ভাব ও চিন্তা মনে আনিবার চেষ্টা করা আবশ্যক। যাঁহারা ধর্ম্মশৈলের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছেন, যাঁহাদের প্রত্যেক বিশ্বাস ও প্রত্যেক চিন্তা উপাসনা হইয়াছে, তাঁহারা ভিন্ন আমাদের মত ব্রাহ্ম সাধারণ মাত্রেরই উপাসনার পূর্ব্বে প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। যে যাহাকে জীবনের সম্বল ও প্রাণের প্রিয়তম সম্পত্তি বলিয়া মনে করে, সে তাহার জন্য কি অসাধ্য না সাধন করিয়া থাকে! আমরা যদি উপাসনাকে আমাদের ধর্ম্মজীবন গঠনের সর্ব্বপ্রধান ও প্রিয় উপায় মনে করি, তাহা হইলে যেরূপ চেষ্টা করিলে সেই উপায় বিশেষ রূপে কার্য্যকারী হইতে পারে, সেরূপ চেষ্টার আমাদের অণুমাত্র ত্রুটি করা উচিত নহে।

যে প্রস্তুত হওয়ার আবশ্যকতা সম্বন্ধে এত কথা বলা গেল, সে প্রস্তুত হওয়া কি, এখন তাহা আলোচনা করা যাউক। আমরা প্রথমেই বলিব, যে সে প্রস্তুত হওয়া কোন শারীরিক ক্রিয়া নহে। আসনবিশেষ বা প্রাণায়ামে মনঃস্থির হয় কিনা, যাঁহারা ঐ সকল ক্রিয়াতে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই বলিবেন। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস এই যে, কোন আধ্যাত্মিক অবস্থা কোন শারীরিক ক্রিয়াসাপেক্ষ নহে। মনে কর আমি দুর্ব্বল, অথবা ক্ষয়কাশ বা হৃদ্‌রোগগ্রস্ত। আমার পক্ষে তখন কোন শারীরিক ব্যায়াম বা ক্রিয়া অবলম্বন একেবারেই অসম্ভব। আমি সে অবস্থায় কি ধর্ম্মসাধন পরিত্যাগ করিব না পরিত্রাণের দ্বার তখন আমার সম্বন্ধে রুদ্ধ হইবে? আমরা স্বাভাবিক সাধনের পক্ষপাতী। যে সাধন মানবপ্রকৃতির অঙ্গুলি নির্দ্দেশ অনুসরণ করে, আমাদের মতে তাহাই অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। যে সাধক স্বাভাবিক সাধন অনুসরণ করেন, তিনি বিকৃত সাধনজাত সাধন-গর্ব্বের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। আধ্যাত্মিক অবস্থাবিশেষ লাভ করিবার জন্য আধ্যাত্মিক উপায় সকল গ্রহণ করাই বিধেয়। মনঃস্থির করিবার সহজ ও স্বাভাবিক উপায় থাকিতে আমি কেন হঠযোগ সাধন করিতে যাইব? আমাদের দেশের প্রাচীন ঋষিরা ও অন্যান্য দেশের সাধু মহাজনেরা কেহই বলেন নাই যে, বীরাসন বা পদ্মাসনের দ্বারা পরিত্রাণ লাভ করা যায়। পরিত্রাণ অধ্যাত্মরাজ্যের ব্যাপার; আসন বা নিশ্বাস রোধের সঙ্গে তাহার সম্পর্ক কি? যাঁহারা উহাতে উপকার পাইয়াছেন, তাঁহারা উহার উপকারিতা সম্বন্ধে বিশ্বাস নিজ নিজ মনে পোষণ করিতে পারেন, কিন্তু সাধারণের জন্য স্বাভাবিক, সহজ ও প্রকৃতি-অনুসারী সাধনই যথেষ্ট। আমাদের দ্বিতীয় কথা এই যে, প্রস্তুত হওয়া একটী মানসিক অবস্থা মাত্র। নানাবিধ অসার সংসার-চিন্তায় আমাদের মন সদাই সংক্ষুব্ধ; বাসনার শত সহস্র প্রলোভন আমাদিগকে ক্রীড়ার বস্তুর মত ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে; অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, বিনষ্ট জীবনের জন্য অনুশোচনা প্রভৃতি শত শত ভাব মনকে অনুক্ষণ বিপর্য্যস্ত করিতেছে। এরূপ মন লইয়া উপাসনা করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। চিত্ত যতক্ষণ নির্ম্মল ও স্থির না হয়, ব্রহ্মরূপ ততক্ষণ তাহাতে পরিষ্কাররূপে প্রতিফলিত হয় না। যখন বিক্ষিপ্ত মনকে আমরা সংগ্রহ করিয়া ব্রহ্মসত্তা উপলব্ধিতে সমাধান করি, সংসারের বাসনা ও আকাঙ্ক্ষা যখন বৈরাগ্য ও বিচারের সুতীক্ষ্ণ খড়্গে খণ্ড খণ্ড করি, এবং বারম্বার পতন-জাত নিরাশাকে ব্রহ্মকৃপা-বিশ্বাস দ্বারা যখন বিনষ্ট করি, তখন আমরা উপাসনার জন্য প্রস্তুত হই।—প্রস্তুত হওয়া অর্থে যে কেবল উদ্বোধন, মনঃস্থির ও বিষয় হইতে চিত্তকে আকর্ষণ করা বুঝিতে হইবে এমন নহে। উপাসনার ভাবের আভাসকে প্রস্তুত হওয়ার অন্তর্গত মনে করিতে হইবে। উপাসনার প্রধান ভাব অনুগত বা শরণাপন্ন হওয়া ও অদ্বিতীয় অনন্ত গুণশালী প্রভু পরমেশ্বরকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরমারাধ্য জানিয়া তাঁহাকে ভক্তি ও আত্ম সমর্পণ করা। উপাসনার জন্য প্রস্তুত হইতে গেলে, প্রাণের আনুগত্য অনুভব করা চাই, মনকে তখনই উপাসনার জন্য প্রস্তুত বলি, যখন বসিবামাত্র তাহাকে মস্তকের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্ম চরণে লুণ্ঠিত হইতে দেখি। মন নীরস ও শুষ্ক হইয়া থাকিলে ব্রহ্ম স্বরূপের প্রতিক্রিয়া তত সুন্দর রূপে হইতে পারে না। সুতরাং স্বরূপ উপলব্ধির পূর্ব্বে মনের নীরসতা দূর করা চাই। পূর্ণ জাগ্রত চৈতন্য, শান্ত সমাহিত মন, ও প্রেমরোমাঞ্চিত ও বিনয়াবনত হৃদয় লইয়া যদি কেহ উপাসনা করেন, তবে দেখিতে পাইবেন, যে আরাধনা ও ধ্যানের জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইতে হইবে না। ব্রহ্ম তাঁহাকে আপনার মহান্ অথচ মধুর সত্তাতে এমনই ডুবাই দিবেন, যে সংসারের কোলাহল তাঁহাকে অন্বেষণ করিয়াও প্রাপ্ত হইবে না।

এই প্রস্তুত হওয়ার উপায় ত্রিবিধ। প্রথমতঃ আত্ম চিন্তা.

দ্বারা আপনার অসারত্ব অনুভব করিতে হইবে। আমি কিছুই না, আমি অতি অসার, কলঙ্কিত ও হীন ইহা তো প্রকৃত কথা, তবে আমি ইহা চিন্তা করিব না কেন? আমি কিছু নই যেমন উপলব্ধি করিবে, জগৎ কিছুই নহে, ইহাও তেমনি অনুভব করিতে হইবে। আমি ও জগৎ অসৎ অর্থে, মায়াবাদ বা অদ্বৈতবাদের অসৎ বলা হইতেছে এরূপ যেন কেহ অনুমান না করেন? সদসতের প্রকৃত তত্ত্বের কথা মনোবিজ্ঞানের অন্তর্গত, আমরা তাহার আলোচনায় এখন প্রবৃত্ত হইব না। আমাকে ও জগৎকে যখন অসৎ বলিয়া মনে করিব তখন উপলব্ধি করিতে হইবে যে, উহাদের কেহই নিরপেক্ষ ভাবে নাই। উভয়েই ঐশীশক্তিসাপেক্ষ ও ঈশ্বরাধীন। এই মত কবিত্ব বা হৃদয়োত্থিত সাময়িক উচ্ছ্বাসের কথা নহে, বিজ্ঞানানুমোদিত সিদ্ধ সত্য। ইহা অপেক্ষা অধিকতর সত্য আর কিছুই নাই। ঈশ্বর সৎ, নিরপেক্ষ ও স্বতন্ত্র, আমরা অসৎ, কেননা আমরা সাপেক্ষ ও পরতন্ত্র। আমি কিছুই নই, জগৎ কিছুই নহে, "নেতি নেতি" উপাসনা রাজ্যে প্রবেশ করিবার প্রধান মন্ত্র। অস্তিত্ব সম্বন্ধে যেমন আমি অসৎ ভাবিতে হইবে, ধর্ম্মজীবনের আদর্শ সম্বন্ধে আত্মহীনতা তেমনি অনুভব করিতে হইবে। আমি তৃণ, প্রভুর জ্বলন্ত বর্ত্তমানতার কাছে কেমন করে অগ্রসর হইব? আমি কৃতঘ্ন অপরাজিত প্রেমের নিকটে কিরূপে দাঁড়াইব? কুটিল কুচিন্তার আলয় হইয়া স্বর্গীয় সরলতার জ্যোতির দিকে কিরূপে চাহিব? প্রাণ যখনি এই কথা বলিবে তখনই উপাসনার ও ঈশ্বর সহবাসের জন্য প্রাণ প্রস্তুত হইবে। উপাসনার দ্বারে উন্নত-শিরের চিরকালই লাঞ্ছনা; অবনত, লজ্জিত ও কুণ্ঠিত আত্মার চিরকালই সম্মান। অহঙ্কারী প্রাণপণে অশেষ বল প্রয়োগে সে দ্বার অণুমাত্র সঞ্চালিত করিতে পারে না, কিন্তু, এ কবাটে আমার হাত দিবার অধিকার আছে কি না, মনে করিয়া যে দুই পদ অগ্রসর হয়, সহস্র পাদ পশ্চাৎ গমন করে, হৃদয়ে শ্রুত ঈশ্বরবাণীর উৎপীড়নে নাচার হইয়া যে পরিশেষে কাঁপিতে কাঁপিতে দ্বারে হাত দেয়, তাহার ক্ষীণকর স্পর্শমাত্রে সেই দ্বার আপনা হইতেই খুলিয়া যায়।

(ক্রমশঃ)

শ্লোক সংগ্রহ।

(শ্রীমদ্ভাগবত)

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥ ১স্ক। ২অ। ৬।

যতস্তু ধর্ম্মাচ্ছ্রবণাদরাদি লক্ষণা ভক্তির্ভবতি স পরোধর্ম্মঃ। স এবৈকান্তিকং শ্রেয় ইতি। কথম্ভূতা? অহৈতুকী,—হেতুঃ ফলাভিসন্ধানং তদ্রহিতা। অপ্রতিহতা বিঘ্নৈরনভিভূতা।

যে ধর্ম্ম হইতে ভগবানের প্রতি কামনাবর্জ্জিত ও অবিচলিত ভক্তি উদিত হইয়া আত্মাকে সুপ্রসন্ন (নির্ম্মল) করে, তাহাই পরম ধর্ম্ম।

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্ ॥ ১স্ক। ২অ। ৭।

[ভগবতি বাসুদেবে প্রয়োজিতো ভক্তিযোগ আশু বৈরাগ্যং জনয়তি, যৎ অহৈতুকং জ্ঞানং তচ্চ জনয়তি।] অহৈতুকং শুষ্কতর্কাদ্যগোচরম্, ঔপনিষদমিত্যর্থঃ।

ভগবানের প্রতি ভক্তি প্রয়োজিত হইলে শীঘ্রই বৈরাগ্য ও দিব্য জ্ঞানের সঞ্চার হয়।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥ ১স্ক। ২অ। ৮।

যো ধর্ম্ম ইতি প্রসিদ্ধঃ, স যদি বিষ্বক্সেনস্য কথাসু রতিং নোৎপাদয়েৎ তর্হি স্বনুষ্ঠিতোঽপি সন্ শ্রমো জ্ঞেয়ঃ। ননু মোক্ষার্থস্যাপি ধর্ম্মস্য শ্রমত্বমস্ত্যেব অত আহ কেবলং বিফলঃ শ্রম ইত্যর্থঃ। নন্বস্তি তত্রাপি স্বর্গাদিফলমিত্যাশঙ্ক্য এবকারেণ নিরাকরোতি, ক্ষয়িষ্ণুত্বান্ন তৎ ফলমিত্যর্থঃ।

যে ধর্ম্ম ভগবৎ কথায় অনুরাগ উৎপাদন করে না, তাহা সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠিত হইলেও পণ্ডশ্রম মাত্র।

ধর্ম্মস্য হ্যাপবর্গ্যস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্পতে।
নার্থস্য ধর্ম্মৈকান্তস্য কমোলাভায় হি স্মৃতঃ ॥ ১স্ক। ২অ। ৯।
কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা।
জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্ম্মভিঃ ॥ ১স্ক। ২অ। ১০

তদেবং হরিভক্তিদ্বারা তদিতরবৈরাগ্যাত্মজ্ঞানপর্য্যন্তঃ পরো ধর্ম্ম ইত্যুক্তঃ, অন্যেতু মন্যন্তে, ধর্ম্মস্যার্থঃ ফলং; তস্য চ কামঃ ফলং, তস্য চেন্দ্রিয়প্রীতিঃ। তৎপ্রীতেশ্চ পুনরপি ধর্ম্মার্থাদি পরম্পরেতি। যথাহুঃ "ধর্ম্মাদর্থশ্চ কামশ্চ সকিমর্থং নসেব্যতে" ইত্যাদি। তন্নিরাকরোতি ধর্ম্মস্যেতি দ্বাভ্যাম্। আপবর্গস্য উক্তন্যায়েনাপবর্গপর্য্যন্তস্য। অর্থায় ফলত্বায়। অর্থোনোপকল্পতে যোগ্যো ন ভবতি। তথা অর্থস্যাপ্যেবম্ভূত ধর্ম্মাব্যভিচারিণঃ কামো লাভায় ফলত্বায় নহিস্মৃতো মুনিভিঃ।৯।

কামস্য বিষয়ভোগস্য ইন্দ্রিয়প্রীতির্লাভঃ ফলং ন ভবতি, কিন্তু যাবতা জীবেত তাবানেব কামস্যলাভঃ। জীবনপর্য্যন্ত এব কামঃ সেব্য ইত্যর্থঃ। জীবস্য জীবনস্য চ পুনর্ধর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা কর্ম্মভির্য ইহ প্রসিদ্ধঃ স্বর্গাদিঃ সোঽর্থো ন ভবতি, কিন্তু তত্ত্বজিজ্ঞাসৈব। ১০।

কেহ কেহ মনে করেন ধর্ম্মের ফল অর্থ, অর্থের ফল বিষয়ভোগ, এবং বিষয়ভোগের ফল ইন্দ্রিয়প্রীতি। কিন্তু ইহা সঙ্গত কথা নহে। কারণ, মুক্তিলাভ যে ধর্ম্মের উদ্দেশ্য, অর্থ কখনই তাহার উপযুক্ত ফল হইতে পারে না; এবং যে অর্থ উক্ত ধর্ম্মের অবিরোধী, বিষয়ভোগ কখনই তাহার প্রকৃত ফল হইতে পারে না। সেইরূপ ইন্দ্রিয়প্রীতিও বিষয়ভোগের উপযুক্ত ফল নহে। শুদ্ধ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যে পরিমাণ বিষয়ভোগ প্রয়োজনীয়, তাহাই কামের উপযুক্ত ফল। কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা স্বর্গাদিলাভ জীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য নহে। কেবল তত্ত্বজিজ্ঞাসাই জীবনের উদ্দেশ্য।

সঙ্গত সভা।

দ্বিতীয় অধিবেশন।

বিগত ৭ই ভাদ্র মঙ্গলবার সঙ্গত সভার দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। তাহাতে বাবু রজনীকান্ত নিয়োগী উপাসনার কার্য্য করেন; বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত সভাপতি ছিলেন। এবারেও বিশ্বাস সম্বন্ধে আলোচনা হয়। কথাবার্ত্তার সারাংশ নিম্নে দেওয়া হইল;—

ক। নাম জপ করিলে এবং আমাদের জীবনে ঈশ্বরের করুণার যে সকল বিশেষ কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা স্মরণ করিলে বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হয়।

খ। বিশ্বাস বর্দ্ধনের দুইটী উপায় আছে;—(১) সাধন ভজন, (২) আমাদের জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনায় ঈশ্বরের হস্ত দর্শন। সচরাচর যে সকল বস্তু দেখিতে শুনিতে পাওয়া যায়, তাহার সহিত ঐশ্বরিক ভাবের যোগ স্থাপন করিতে পারিলে বিশ্বাসের একটু আভাস পাওয়া যায়। আবার সময় বিশেষে দেখা যায় যে, আমাদের নিজের শক্তি ও চেষ্টায় যাহা করা অসম্ভব এমন কার্য্যও যেন অন্য এক শক্তি ও ইচ্ছার প্রভাবে আমাদের দ্বারা সাধিত হইয়া যায়। এই সকল ঘটনায় বিশ্বাস পরিবর্দ্ধিত হয়। বিশ্বাস বর্দ্ধিত করিতে হইলে প্রথমাবস্থায় তাহার যে সকল ব্যাঘাত আছে তাহা হইতে দূরে থাকা আবশ্যক। কেবল জ্ঞানেই যে বিশ্বাসের পরিসমাপ্তি তাহাতে কোন উপকার হয় না। বিশ্বাস কার্য্যে পরিণত করা চাই।

গ। আত্মজ্ঞানব্যতীত, চিন্তাব্যতীত প্রার্থনাই হয় না। ঈশ্বরের স্বরূপ, আমাদের মনের অবস্থা ও ঈশ্বরের সহিত আমাদের সম্বন্ধ না বুঝিলে প্রার্থনা করা যায় না। কিন্তু পুস্তকলব্ধ বিশ্বাস যতদিন না সাধন ভজন দ্বারা দৃঢ়ীভূত হয়, ততদিন তাহা সাধনলব্ধ বিশ্বাসের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের মনে কতকগুলি সত্যের বীজ নিহিত আছে। চিন্তা ও অধ্যয়নাদি দ্বারা তাহা অঙ্কুরিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়। ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইলে পুস্তক পাঠাদি যে কোন উপায়ে তাঁহাকে জানা যায়, আপনা আপনিই আমাদের চেষ্টা সে দিকে ধাবিত হয়। ঈশা খৃষ্ট পুস্তক পড়েন নাই, অথচ চিন্তা ও সাধন দ্বারা তিনি ঈশ্বর লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিশ্বাস লাভের জন্য আরাধনা, সাধন ও দিবসের নানা কার্য্যের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রার্থনা করা ভাল। 'আরাধনা দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ-সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান পরিষ্কার হয়, এবং সেই ভাবকে আদর্শ করিয়া চলিতে চেষ্টা করিলে আমাদের জীবনের কার্য্যে বিশ্বাসের ভাব স্ফূর্ত্তি পায়।

ঘ। প্রার্থনা করিবার পূর্ব্বে ঈশ্বরের অস্তিত্ব, এবং তাঁহার দয়া ও শক্তিতে বিশ্বাস চাই। এই বিশ্বাস লাভ করিতে হইলে চিন্তা ব্যতীত অন্য উপায় নাই। পুস্তক পাঠের এক মাত্র উদ্দেশ্য এই যে, ইহা দ্বারা চিন্তার সাহায্য হয়। যে অধ্যয়ন দ্বারা আমাদের নিজ নিজ চিন্তাশক্তির স্ফূর্ত্তি হয় না, সে অধ্যয়ন কোন কাজেরই নহে।

ঙ। বিশ্বাসের বীজ আমাদের প্রকৃতিনিহিত; বিশ্বাস আত্মার চক্ষুস্বরূপ। জীবন্ত বিশ্বাস ভিন্ন পাপ যায় না। কেবল শুষ্ক তর্ক দ্বারা যে বিশ্বাসে উপনীত হওয়া যায়, সে বিশ্বাসে কোন উপকার হয় না।

চ। যাঁহারা কথার ভাবে প্রকাশ করেন যে, পুস্তকলব্ধ জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান, তাঁহাদের মনোগত অভিপ্রায় বোধ হয় এই যে, তাঁহারা পুস্তক পাঠ দ্বারা উপকার পাইয়াছেন, চিন্তা সম্বন্ধে সাহায্য পাইয়াছেন। আত্মজ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। ইহা ব্যতীত সহস্র পুস্তক পাঠও বৃথা; আবার পুস্তক পাঠ ব্যতীতও আত্মজ্ঞান সম্ভব। পুস্তক পাঠ দ্বারা নিজের চিন্তার সাহায্য হয়। ইহাকে একপ্রকারের সাধুসঙ্গ বলিতে পারা যায়। অনেক সময় নিজের চিন্তায় দশ বৎসরে যে বিষয়ের মীমাংসা করা যায় না, অপরের অভিজ্ঞতার সাহায্যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাহা বুঝিতে পারা যায়।

ছ। চিন্তা, ধর্ম্মগ্রন্থপাঠ, উপাসনা, প্রার্থনা, নাম সাধন ও সাধুসঙ্গ দ্বারা বিশ্বাস বর্দ্ধিত হয়। উপাসনা ভাল হইলে বিশ্বাস বাড়ে, আবার বিশ্বাস বাড়িলে উপাসনা ভাল হয়।

জ। বিশ্বাস আত্মার চক্ষুঃস্বরূপ। শারীরিক চক্ষুর ন্যায় ইহারও দৃষ্টি অবস্থাবিশেষে ক্ষীণ হয়, আবার অবস্থাবিশেষে উজ্জ্বল হয়। উপরিউক্ত সকল উপায় হইতেই বিশ্বাস সম্বন্ধে উপকার পাইয়াছি। কিন্তু বিশ্বাসী লোকের সহবাস আমার বিবেচনায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপকারী বলিয়া বোধ হয়। অনুরাগের সহিত নাম সাধন করিলেও যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়। আমি নিজের জীবনে এই দুইটীরই উপকারিতা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। নাম সাধনের একটী বিশেষ সুবিধা এই যে, সকল সময় ইহা করা যায়, এবং ইহা দ্বারা পাপের পথ বন্ধ হয়। ঈশ্বরকে জানিব বলিয়া ভাল ভাবে দর্শন শাস্ত্র পাঠ করিলেও উপকার পাওয়া যায়। দর্শনশাস্ত্র আমি যতটুকু পড়িয়াছি, তাহাতে আমার ধর্ম্মজীবনের অনেক সাহায্য হইয়াছে। ঈশ্বর কখন কোন্ পথ দিয়া কাহার হৃদয়ে আসেন, কিছুই বলা যায় না। ভাল মনে গ্রহণ করিলে সকল বিষয় হইতেই ঈশ্বর জ্ঞান লাভ করা যায়। একজন হয় ত তর্কদ্বারা ঈশ্বরকে দয়াময় বলিয়া প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াও নিজের জীবনে উক্ত সত্যের প্রভাব অনুভব না করিতে পারে। আবার আর একজন হয় ত দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা করিয়া স্বর্গরাজ্যের অধিকারী হইতে পারে। শুদ্ধ তর্কের মীমাংসা দ্বারা ধর্ম্ম জীবনের সাহায্য হয় না; অপর দিকে তর্ক যুক্তি সম্বন্ধে বৈষ্ণবদিগের ন্যায় অযথা আশঙ্কাও অসঙ্গত। জ্ঞানালোচনা ও আধ্যাত্মিক সাধন এই দুইয়ের সামঞ্জস্য চাই। দেখিতে হইবে চক্ষু ফুটিতেছে কি না। কার্য্যতঃ অবিশ্বাসের ভাব (practical atheism) যতদিন থাকে, মন যতদিন অপবিত্র, সাংসারিক, ক্ষুদ্র ভাবাপন্ন থাকে, তত দিন ঈশ্বরকে ভাল করিয়া দেখা যায় না।

ঝ। আমি নিজে দেখিয়াছি, সকল প্রকার জ্বালা যন্ত্রণার মধ্যে ঈশ্বরকে স্মরণ করিতে, তাঁহার নাম করিতে চেষ্টা করিলে উপকার হয়। কথার ভিতর যে ভাব আছে, তাহা

হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করাই নাম সাধনের উদ্দেশ্য। সর্ব্বদা ঈশ্বরের দিকে মন ফিরাইয়া রাখিবার প্রধান উপায় সর্ব্বদা, সর্ব্বত্র নাম সাধন। ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠেও আমি উপকার পাইয়াছি।

জ। নাম সাধন যাঁহাদের নীরস বোধ হয় তাঁহারা জীবনের প্রধান অভাব সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট প্রার্থনা করিলে উপকার পাইতে পারেন।

ঞ। একটী সাধন আমরা সকলেই করিয়া থাকি—সেটী উপাসনা। তাহা হইতে যে আমরা উপকার পাই না তাহার কারণ, বেশ সাত্ত্বিক ভাবে, নিষ্ঠার সহিত উপাসনা করা হয় না। সঙ্গতের সভ্যদিগের (১) প্রথমতঃ এই একটী বিষয়ে বাঁধাবাঁধি থাকা উচিত যে সকলেই যেন প্রতিদিন অন্ততঃ একবার নিষ্ঠার সহিত উপাসনা করিবার চেষ্টা করেন। (২) দ্বিতীয়তঃ সমস্ত দিন যাহাতে উপাসনার ভাব থাকে তাহার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। ইহা আদর্শ; ইহা কার্য্যে পরিণত করিতে অনেক দিন লাগিবে। ঈশ্বরকে স্মরণ রাখিবার নানা উপায়ের মধ্যে নাম সাধন, ছোট ছোট প্রার্থনা প্রভৃতি যাহাতে যিনি উপকার বোধ করেন তিনি তাহা অবলম্বন করিতে পারেন। (৩) তৃতীয়তঃ প্রতিদিন সাধুসঙ্গ করা আবশ্যক। একজন বিশ্বাসীর সহবাসে যে উপকার পাওয়া যায় অনেক সাধন ভজনেও তাহা পাওয়া যায় না। সাধুসঙ্গের অভাবে সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করিলেও চলিতে পারে। (৪) চতুর্থতঃ বিশ্বাস কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। (৫) পঞ্চমতঃ আত্মচিন্তা, পাপস্মরণ, জ্ঞানালোচনা ইত্যাদি উপায় অবলম্বনেও অনেক উপকার পাওয়া যায়।

অবশেষে স্থির হইল যে সকলে নিম্নলিখিত কয়েকটী সাধন অবলম্বন করিবেন;—

(১) নিষ্ঠার সহিত উপাসনা।

(২) ঈশ্বকে সমস্ত দিন স্মরণ রাখিবার চেষ্টা।

(৩) সাধুসঙ্গ অথবা সদ্‌গ্রন্থ পাঠ।

(৪) আত্মচিন্তা অর্থাৎ আত্মার সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ চিন্তা।

স্থির হইল যে আগামী বারে উপাসনা ভাল করিবার উপায় সম্বন্ধে আলোচনা হইবে।

তৃতীয় অধিবেশন।

গত ১৪ই ভাদ্র মঙ্গলবার সঙ্গত সভার তৃতীয় অধিবেশন হয়। বাবু মথুরামোহন গঙ্গোপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করেন। বাবু উমেশ চন্দ্র দত্ত সভাপতি ছিলেন। এবারের আলোচ্য বিষয়, উপাসনা ভাল করিবার উপায় কি? বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা করেন। আলোচনার সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল;—

ক। উপাসনা ভাল করিতে হইলে প্রথমে তাহার জন্য ভালরূপে প্রস্তুত হইতে হইবে। (১) ইহার প্রথম উপায় সাধু লোকের সঙ্গে সদালাপ। (২) সে সুবিধা না থাকিলে সদ্‌গ্রন্থ হইতে ভাল ভাল অংশ বাছিয়া পাঠ করিতে হইবে। কেবল ভাসা ভাসা পড়িলে হইবে না; তাহার ভাবের মধ্যে ডুবিতে চেষ্টা করিতে হইবে। (৩) উপরি উক্ত দুই উপায়ের অভাবে নিজের অবস্থা ও অভাব সম্বন্ধে চিন্তা করা ভাল। ইহাতে প্রাণে ব্যাকুলতা আসিয়া আমাদিগকে উপাসনার জন্য প্রস্তুত করে। ঈশ্বর বিষয়ক চিন্তাতেও উপকার হয়; কিন্তু নিজের বিষয় ভাবা যত সহজ ইহা তত সহজ নহে। ঈশ্বরের পবিত্রতা প্রভৃতি হৃদয়ঙ্গম করিবার সহজ উপায় সাধুলোকের সাধুতা চিন্তা বা তদ্বিষয় সম্বন্ধে অপরের সহিত আলোচনা। ঈশ্বরের অনন্ত মাহাত্ম্য সহজে ধরা যায় না। কিন্তু সাধুজীবনে তাহার যে কণা প্রকাশ পায় তাহা আমরা ধরিতে পারি, এবং এই উপায়ে মন প্রস্তুত হইলে সেই অনন্ত স্বরূপকে ধরা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। এই সকল উপায়ে উপাসনার দিকে যখন আকর্ষণ হয় তখন উপাসনা করিলে ভাল হয়। ঈশ্বরকে আমরা প্রায়ই 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকি। এ সম্বন্ধে বিশেষ সাবধানতা আবশ্যক। 'ঈশ্বর আমার নিকটে, আমি বলিতেছি, তিনি শুনিতেছেন' এই ভাবটী যদি উপলব্ধি করিতে না পারা যায় তাহা হইলে 'তুমি' না বলিয়া 'তিনি' বলাই ভাল। ঈশ্বরকে সর্ব্বব্যাপী ভাবা অপেক্ষা, তিনি আমার সম্মুখে এইটী ভাবা সহজ। উপাসনা করিতে হইলে ঈশ্বরের স্বরূপ ভাল করিয়া অনুভব করা চাই। স্বরূপ চিন্তন দ্বারা আমাদের মনে যে ভাবের উদয় হয় তাহাই আরাধনা। সত্যস্বরূপ বলিতে এই বুঝি যে ঈশ্বরই একমাত্র সত্য; আর সকল বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা নাই; ঈশ্বরের জ্ঞান ও শক্তি ভিন্ন জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। সেই এক সত্তায় সকলই সত্তাবান্। সংসারাসক্তি প্রবল থাকিলে সত্যস্বরূপের ধারণা হয় না। বৈরাগ্যের ভাব প্রবল হওয়া চাই। নতুবা সত্যস্বরূপ মুখের কথা মাত্র। তাহার পর জ্ঞানস্বরূপ;—একজন কাছে আছেন ও তাঁহার চক্ষু আমার উপর রহিয়াছে এ ভাব না থাকিলে উপাসনা হয় না। অনন্তস্বরূপ ভাবা যায় না, তবে সেই সঙ্গে আমাদের নিজের ক্ষুদ্রতা ভাবা যায়। আনন্দ ও শান্তি স্বরূপ চিন্তা করা সকলের পক্ষে সহজ নহে। যিনি আনন্দ শান্তি পাইয়াছেন তিনিই ইহা বুঝিতে পারেন। ইহা উপসনার পরিপক্ক অবস্থার কথা। এই জন্য এবিষয় সম্বন্ধে এখন কিছু বলিব না। ঈশ্বরের দয়া ভাবিলে কৃতজ্ঞতা আপনা আপনি আসিবে। আমার উপর ঈশ্বরের দয়া চিন্তা করা ও তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া একই। ঈশ্বরের অদ্বিতীয় ভাব ও সত্যস্বরূপ আমার নিকটে একই বলিয়া বোধ হয়। পবিত্র স্বরূপের চিন্তা আমাদের মধ্যে কমিয়া গিয়াছে। আনন্দময়, দয়াময় বলিতে সুখ হয়; পবিত্র স্বরূপ বলিতে ভয় হয়, ইহাতে সুখ বা ভাবের উচ্ছ্বাস হয় না। তুলনায় নিজের পাপ দেখিয়া প্রাণে যন্ত্রণা হয়। কিন্তু পবিত্র স্বরূপ না ভাবিলে নিজের জঘন্যতা বুঝা যায় না, প্রাণে অনুতাপের ভাব আসে না। পবিত্রতার ভাব না বুঝিলে পবিত্র হইতে ইচ্ছা হইবে কিরূপে? আরাধনায় আমরা ঈশ্বরের এক একটী স্বরূপ পৃথক্ পৃথক্ ভাবি, ধ্যানে সেই সমস্ত স্বরূপবিশিষ্ট ঈশ্বরকে ভাবি। তাহার পর প্রার্থনা। প্রকৃত প্রার্থনার জন্য তিনটী বিষয় আবশ্যক—(১) অভাববোধ, (২) ব্যাকুলতা, (৩) ঈশ্বরের উপর নির্ভর। নিজের অভাব, দুর্দশা, আধ্যাত্মিক বিপদ, জীবনের ক্ষণভঙ্গুরত্ব ইত্যাদি চিন্তা করিলে প্রাণ আপনা আপনি ব্যাকুল হইয়া উঠিবে, প্রার্থনার

ভাব আসিবে। প্রকৃত প্রার্থনা কেহ পূর্ব্ব হইতে ভাবিয়া চিন্তিয়া করিতে পারে না। প্রার্থনা করার পরে জানা যায় যে প্রার্থনা হইল। আত্মচিন্তা ইহার এক মাত্র উপায়। উপরে যে উপাসনার কথা হইল ইহার জন্য যথেষ্ট সময় আবশ্যক। তাড়াতাড়ি সারিতে গেলে এ উপাসনা হয় না।

খ। সাধুজীবন চিন্তা দ্বারা আমি উপকার পাইয়াছি। মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকিলে ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা করা যায় না। কারণ, মানুষের মধ্যে যে সাধুতা তাহা ঈশ্বরেরই প্রকাশ। কেবল উদ্বোধনের সময় নয়, আরাধনার মধ্যেও সাধুজীবনে ঈশ্বরের লীলা দেখিলে অত্যন্ত উপকার হয়। নিজের জীবনে ঈশ্বরের লীলা দেখিলে যে উপকার হয় সাধুজীবনে তাহা ভাবিলে তদপেক্ষা অধিক উপকার হয়। ব্যাকুলতার পরিমাণ অনুসারেই প্রার্থনা পূর্ণ হয়। আত্মচিন্তা দ্বারা ব্যাকুলতা বাড়াইতে হইবে। যে বস্তু চাহিলে নিশ্চয় পাইব বলিয়া বিশ্বাস তাহাই চাওয়া উচিত।

ক। উপাসনা যাহাতে ফাঁকা ফাঁকা না হয় তাহার জন্য ঈশ্বরকে প্রাণের মধ্যে আনিয়া, আমার ঈশ্বর বলিয়া, নিজের জীবনের ঘটনার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ বুঝিয়া উপাসনা করিতে হইবে। সেইরূপ আপনাকে সাধারণ ভাবে মহাপাতকী বলিয়া ভাবিলে চলিবে না। জীবনের বিশেষ বিশেষ পাপ, কুচিন্তা ও কুকার্য্য ভাবা আবশ্যক; নতুবা প্রকৃত অনুতাপ ও প্রার্থনার ভাব আসে না এবং ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের বিশেষ সম্বন্ধ অনুভব করা যায় না।, অহঙ্কার দূর করিবার পক্ষেও ইহা বিশেষ উপকারী।

গ। উদ্বোধন বা চৈতন্যোদয়ের অর্থ জড় জগতের নিয়মের উপর আত্মার প্রভুত্ব স্থাপন। ইহার উপায় প্রথমতঃ চিন্তা। চিন্তা দ্বারা আত্মার শক্তি বৃদ্ধি পায়। তখন জড়জগৎ আত্মাকে বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। চিন্তা দ্বারা আত্মার শক্তি বৃদ্ধি পাইলে আত্মাকে ঈশ্বরের দিকে লইয়া যাওয়া যায়। যাঁহারা ধর্ম্মরাজ্যে প্রথম প্রবেশ করিতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে সাধু জীবন চিন্তায় একটু বিপদ্ আছে। ইহা হইতে নরপূজা আসিতে পারে। সাধুদিগের মতের মধ্যে যদি কোন অসত্য বা ভ্রম থাকে, প্রথম শিক্ষার্থিগণ তাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া কুসংস্কারের হস্তে পড়িতে পারেন। আর যাঁহারা ধর্ম্মজীবনে উন্নতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের সাধুজীবন চিন্তার কোন প্রয়োজন নাই। এই জন্য আমার বিবেচনায় ইহা পরিত্যাগ করাই ভাল।

খ। ব্রাহ্ম সমাজে দ্বৈতভাব যেরূপ প্রবল, তাহাতে সে আশঙ্কার কারণ দেখা যায় না।

গ। ব্রাহ্ম সমাজের ইতিহাস হইতেই পূর্ব্বোক্ত বিপদ্ যে সম্ভব, তাহার প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। মানুষকে ভক্তি না করিলেও ঈশ্বরকে ভক্তি করা যায়। মানুষের সম্বন্ধে 'ভক্তি' (reverence) শব্দটী প্রয়োগ না করিয়া 'গুণের প্রশংসা' (admiration) শব্দটী ব্যবহার করিলে ভাল হয়। ফুলের মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ দেখিয়া ফুলের প্রতি যে ভাব হয়, তাহাকে 'ভক্তি' বলা যায় না। এ স্থলেও সেইরূপ।

খ। আমরা তিন প্রকারে ঈশ্বরের প্রকাশ দেখিতে পাই;—(১) জড় জগতে, (২) আত্মায়, (৩) সাধু জীবনে। সাধু জীবনের আলোচনা ছাড়িয়া দিলে এই তিনটীর এক দিক্ একেবারে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এ ভাবে দেখিতে গেলে যখন আমার নিজের মধ্যেও অপূর্ণতা, ভ্রম ইত্যাদি আছে, তখন সাধুজীবনে ঈশ্বরের প্রকাশ অপূর্ণ বলিয়া সে দিক্ ছাড়িয়া দিতে হইলে নিজের জীবনেও ঈশ্বরের প্রকাশ উপলব্ধি করা ছাড়িয়া দিতে হয়।

ক। সাধুজীবনে ঈশ্বরের প্রকাশ দেখিব না, ব্রাহ্ম এ কথা বলিতে পারেন না। যেখানে যা কিছু সাধুতা আছে, আমি ব্রাহ্ম হইয়া তাহা ঈশ্বরের প্রকাশ ভিন্ন আর কিছু বলিতে পারি না। আমি যদি ভাবি, ঐ সকল সাধু ভাব মানুষের নিজের তবে আমি ততটুকু নাস্তিক। বুদ্ধের বৈরাগ্য, স্বার্থত্যাগ, দয়া, হাউয়ার্ডের বিশ্বব্যাপী পরোপকারিতা, মাতার স্নেহ, পিতার পিতৃভাব, যাহার যে টুকু ভাল, সেটুকু পরমেশ্বরেরই। এখন কথা এই, এই সকল লোককে আমরা ভক্তি করিব কি না? মহত্ত্ব দেখিলেই ভক্তি হইবে। মানুষ মিষ্টান্নের আধারস্বরূপ নহে যে, মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিয়া আধারটী ফেলিয়া দিব। মানুষ ছাড়া সাধুতা বলিয়া কোন স্বতন্ত্র (abstract) পদার্থ নাই। ঈশ্বরের ভাব সাধুদের মধ্যে আসিয়া তাঁহাদের জীবনকে উন্নত করে। মার স্নেহ ঈশ্বরদত্ত, অতএব মাকে ভক্তি করিব কেন? এরূপ যুক্তি যে নিতান্ত অসঙ্গত, তাহা কে অস্বীকার করিবে? তবে সাধু জীবন ভিন্ন ঈশ্বরকে দেখিবার যে অন্য উপায় নাই, তাহা নহে। জড় জগতে ও আত্মাতেও ঈশ্বরের প্রকাশ দেখিতে হইবে।

ঘ। সাধু জীবনের আলোচনা আমরা কোন ক্রমেই ছাড়িয়া দিতে পারি না। যে কিছু সদৃষ্টান্ত, যে কিছু সাধু ভাব, যে কিছু সদুপদেশ আমার জ্ঞানগোচর হইয়াছে, সে সমস্তই আমার পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বর নির্দিষ্ট বিধান। ইহা যদি সত্য হয়, তবে প্রকৃত বিশ্বাসী ব্যক্তি কখনই উহার কোনটীকে উপেক্ষা করিতে পারেন না।

গ। আত্মজ্ঞান হইতে ঈশ্বর জ্ঞান। তাহার জন্য সাধু জীবন চিন্তার প্রয়োজন কি? তবে ঈশ্বর জ্ঞান হইলে ইহা দ্বারা বিশ্বাসের সাহায্য হইতে পারে।

ঙ। মনকে প্রস্তুত করিবার জন্য সাধুজীবন চিন্তা আবশ্যক। তবে এ সম্বন্ধে একটু সতর্কতা চাই যে, মানুষের সাধুতা ভাবিবার সময় মানুষের অপূর্ণতা যেন স্মরণ থাকে। ঈশ্বরকে পাইবার জন্য প্রকৃত ব্যাকুলতা থাকিলে অন্য সকল বাধা বিপদ্ কাটিয়া যায়।

ঈশ্বরকে 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করিবার সঙ্গে সঙ্গে যদি তদনুযায়ী ভাব উপলব্ধি করিবার জন্য সরল চেষ্টা থাকে, তবে তাহাতে কপটতা হয় কি না?

খ। না। তবে 'তুমি' বলিবার সময় বিশেষ সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

প্রদেশীয় ব্রাহ্মসমাজ।

চট্টগ্রাম প্রার্থনা সমাজ—উক্ত সমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন খাস্তগিরি লিখিয়াছেন;—মঙ্গলময় ঈশ্বরের ইচ্ছাতে বিগত ১৪ই আগষ্ট রবিবার এখানকার প্রার্থনা সমাজের গৃহ-প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

উক্ত রবিবার প্রাতে বাবু যাত্রামোহন সেন মহাশয়ের গৃহ হইতে (যেখানে এপর্য্যন্ত চট্টগ্রাম প্রার্থনা সমাজের প্রত্যেক বুধবার ও রবিবার উপাসনাদির কার্য্য সম্পন্ন হইত সেই স্থান হইতে) সঙ্গীত ও প্রার্থনানন্তর একটী সংকীর্ত্তন করিতে করিতে নূতন গৃহের দ্বার পর্য্যন্ত গিয়া শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারক বাবু নবদ্বীপ চন্দ্র দাস মহাশয় আর একটী প্রার্থনা করিয়া সাধারণ লোক-দিগকে এই গৃহের উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দেন, পরে কীর্ত্তন করিতে করিতে গৃহে প্রবেশ করা হয়। শ্রদ্ধাস্পদ নবদ্বীপ বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন ও 'ব্রাহ্ম মন্দির কেন' এই বিষয়ে উপদেশ দেন।

অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকার পর বালক বালিকাগণ শ্রদ্ধেয় যাত্রা-মোহন বাবুর গৃহ হইতে প্রেম, প্রীতি, দয়া, ক্ষমা ইত্যাদি ছোট ছোট নিশান হাতে করিয়া বালক বালিকার উপযোগী একটী সঙ্গীত করিতে করিতে নূতন গৃহের দ্বার পর্য্যন্ত গেলে, নবদ্বীপ বাবু ও যাত্রামোহন বাবু বালক বালিকাগণকে সাদরে গ্রহণ করিলেন; এই দৃশ্য অত্যন্ত মনোহর ও প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল।

তৎপরে নবদ্বীপ বাবু ধর্ম্ম বিষয়ক কয়েকটী শ্লোক পাঠ করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করেন; তৎপরে ৩।৪টী সঙ্গীতের পর ব্যক্তিগত প্রার্থনা হয়; বাবু দুর্গাদাস দত্ত, বাবু বিপিন বিহারী গুপ্ত, বাবু ষোড়শীমোহন মজুমদার, বাবু জগবন্ধু দত্ত ও বাবু দ্বারকানাথ গুপ্ত মহাশয় প্রার্থনা করেন। কিছুকাল বিশ্রামের পর সন্ধ্যার সময় উপাসনার কার্য্য আরম্ভ হয়, এবেলাও নবদ্বীপ বাবু উপাসনার কার্য্য করেন। "বিধাতার কল" এই বিষয়ে উপদেশ হয়। উপাসনান্তে সংকীর্ত্তন হইয়া গৃহ প্রতিষ্ঠার কার্য্য শেষ হয়।

তৎপরে যাত্রামোহন বাবু উপাসকগণকে আপনার গৃহে লইয়া গিয়া মিষ্টান্ন দ্বারা প্রীতি ভোজন করাইয়াছিলেন।

উপাসকগণ এখন একটী স্থায়ী স্থান পাইয়াছেন বলিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না। আপাততঃ মনোমত স্থান না পাওয়াতে এবং প্রার্থনা সমাজের কার্য্যের অসুবিধা দূরী-করণের জন্ত শ্রদ্ধেয় যাত্রামোহন বাবু আপনার বাড়ীর কিছু স্থান যাহা সদর রাস্তার ধারে তাহা প্রদান করিয়াছেন তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকট চিরঋণী থাকিলাম; উপাসকগণ যত শীঘ্র পারেন একটী প্রকাণ্ড ভাল স্থান নির্ব্বাচন করুন।

শ্রদ্ধাস্পদ নবদ্বীপ বাবুর কার্য্য বিবরণ এপ্রিল মাসের তত্ত্বকৌমুদীতে কতকটা পর্য্যন্ত বাহির হইয়াছিল, তৎপরেও তিনি পূর্ব্বের ন্যায় প্রার্থনা সমাজের কার্য্যাদি করিয়াছেন এবং অন্যান্য প্রকারেও ব্রাহ্মধর্ম্ম যাহাতে প্রচারিত হয় তাহা করিয়াছেন। তিনি সহরে প্রকাশ্য বক্তৃতাদি করিয়াছেন এবং ছেলে-দের সভায় গিয়া সময়োপযোগী উপদেশাদি দিয়াছেন, ইহা ব্যতীত শ্রীপুর ও বড়ুমা নামক দুইটী গ্রামে যান। শ্রীপুরে শ্রদ্ধেয় বাবু বৃন্দাবন দত্ত উকীল মহাশয়ের গৃহে ও বড়মাতে যাত্রামোহন বাবুর বাড়ীতে উপাসনা করেন ও উপদেশ দেন; এবং এই দুই স্থানের অনেকানেক ভদ্র লোকের সহিত আলো-চনাদি করেন। বিগত ২৪শে আগষ্ট শ্রদ্ধাস্পদ নবদ্বীপ বাবুর বিদায় উপলক্ষে সামাজিক উপাসনার পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বিশেষ ভাবে প্রার্থনা করেন—বাবু যাত্রামোহন সেন উকীল, বাবু দুর্গাদাস দত্ত ডাক্তার, বাবু দ্বারকানাথ গুপ্ত, বাবু বিপিন বিহারী গুপ্ত, বাবু প্রাণহরি রক্ষিত ও ডাক্তার দক্ষিণারঞ্জন খাস্তগিরি। নবদ্বীপ বাবু বিগত ২৫এ আগষ্ট বৃহস্পতিবার কুমিল্লা যাত্রা করিয়াছেন। তিনি সীতাকুণ্ড ও ফেনি সব-ডিভিসনে ২।১ দিন করিয়া থাকিয়া কুমিল্লা যাইবেন। আমরা তাঁহার বিদায় অন্তরের সহিত অনুভব করিতেছি। তাঁহার কাছে চট্টগ্রাম প্রার্থনা সমাজ চিরঋণী রহিল। আমরা তাঁহাকে আমাদের হৃদয়ের প্রীতি, ভক্তি ও প্রশংসা অর্পণ করিতেছি। তাঁহার জীবনে ঈশ্বরের কার্য্য জয়যুক্ত হউক!!

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

বিগত ১৯এ ভাদ্র রবিবার অপরাহ্ণ চারি ঘটিকার সময় ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভার গৃহে বহুসংখ্যক ভদ্রলোকের সমক্ষে বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দুবিবাহ সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার সভাপতির আসন পরি-গ্রহ করেন। এই সভায় হিন্দুবিবাহ প্রথার অনুকূল ও প্রতিকূল উভয় মতাবলম্বী লোকই উপস্থিত ছিলেন। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের অনুবাদক বাবু চন্দ্রনাথ বসু এম, এ, হিন্দুপত্নী সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখেন সেই প্রবন্ধ উপলক্ষ করিয়া রবীন্দ্র বাবুর প্রস্তাব লিখিত হয়। রবীন্দ্র বাবু এরূপ গবেষণা, ধীরতা, সদ্যুক্তি ও চিন্তা-শীলতার সহিত প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন যে তাঁহার প্রতিপক্ষ চন্দ্র নাথ বাবু পর্য্যন্ত মুক্তকণ্ঠে তাঁহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই এবং সভাস্থ গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিয়া ছিলেন যে হিন্দুবিবাহে কোনও কালে আধ্যা-ত্মিক ভাব ছিল না। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই বিষয় সম্বন্ধে বিশেষভাবে রবীন্দ্র বাবুর পক্ষ সমর্থন করেন, এবং চন্দ্রনাথ বাবু পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন প্রভৃতি সকলেই বাল্যবিবাহের দূষণীয়তা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সভাপতি বলিয়াছিলেন যে যাঁহার কিছুমাত্র বুদ্ধি আছে তিনি কখনই বাল্যবিবাহের পক্ষ সমর্থন করিতে পারেন না। তিনি বাল্য-বিবাহের বিরুদ্ধে বহুকাল পূর্ব্বে যে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার লেশমাত্র পরিবর্ত্তন করিবার কোন কারণ দেখিতে পান নাই। নিতান্ত বুদ্ধিভ্রংশ না হইলে এ সম্বন্ধে তাঁহার মত পরি-বর্ত্তিত হওয়া অসম্ভব।

বাল্যবিবাহের পক্ষ সমর্থনের জন্য শোভাবাজার রাজ বাটীতে যে সকল যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছিল তাহা শুনিয়া বাল্যবিবাহের অনুকূল মতাবলম্বী ব্যক্তিগণের মধ্যেও অনেকে বুঝিয়াছেন যে বাল্যবিবাহের সপক্ষে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। আর যাঁহারা এসম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই তাঁহারা ঐ সকল যুক্তির অসারতা বিশেষ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ফলতঃ উক্ত সভাদ্বারা বাল্যবিবাহের প্রতিকূল পক্ষেরই এক প্রকার জয় হইয়াছে বলিতে হইবে। সেই অবধি বিবেচক লোকদিগের মত অনেক পরিমাণে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধ দিকে ধাবিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তাহার উপর গত ১৮ই ভাদ্র শনিবার অপরাহ্নে সিটী কলেজ ভবনে বাবু নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় বাল্যবিবাহের অনুকূল যুক্তির অসারতা ও বাল্যবিবাহের অপকারিতা প্রদর্শন করিয়া একটী অতি সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। তাহার পর দিবস বিজ্ঞান সভার গৃহে রবীন্দ্র বাবুর বক্তৃতা হয়। বাল্যবিবাহের অপকারিতা সম্বন্ধে বিবেচক লোকদিগের মনে যে কিছু সন্দেহ ছিল তাহা শোভাবাজারের সভা ও এই দুইটী বক্তৃতা দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নিরাকৃত হইয়াছে। বাল্যবিবাহ যে একটী অতি দূষণীয় প্রথা তাহা বহুকাল পূর্ব্বে সপ্রমাণ হইয়া গিয়াছিল। হিন্দু সমাজও ইহার দোষ বুঝিয়া এসম্বন্ধে অল্পে অল্পে উন্নত মতের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, হঠাৎ রুক্মাবাইয়ের মোকর্দ্দমা উপলক্ষে এই প্রশ্ন দানবপ্রাপ্ত শবের ন্যায় উঠিয়া বসিয়াছিল। কিন্তু ঈশ্বরের রাজ্যে অসত্যে কখনই চিরস্থায়ী হইতে পারে না। বাল্যবিবাহের অনুকূল মত দুই চারি দিনের জন্য নিজের নির্জ্জীবতা ও অন্তঃসারবিহীনতা প্রদর্শন করিয়া আবার অন্তর্হিত হইবে। সেজন্য কাহাকেও বড় ব্যস্ত হইতে হইবে না।

অনেক দিন হইল আমাদের কোন বন্ধু আমাদের নিকট কোচবিহার মিউচুয়াল প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের প্রস্তাবনা পত্র ও নিয়মাবলী এবং মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত নিশ্চিন্তপুর নামক স্থানের 'ভবিষ্যৎধনরক্ষিণী সভা'র নিয়মাবলী প্রেরণ করিয়া দরিদ্র ব্রাহ্মদিগের জন্য যাহাতে ঐরূপ কোন উপায় অবলম্বন করা হয় তাহার জন্য চেষ্টা করিতে আমাদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "সময়ে সময়ে এই গুরুতর বিষয়ের অনেক আলোচনা হইয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এপর্য্যন্ত বিশেষ কোন উপায় অবলম্বিত হয় নাই। এই উপায়টী অতি সহজ বলিয়া বোধ হয়, এবং ব্রাহ্ম সাধারণ কেবল পরদুঃখ মোচনকেই ফণ্ডের ভিত্তিস্বরূপ করিয়া ইহা সংস্থাপন করিলে এবং আন্তরিক চেষ্টা ও যত্ন সহকারে ইহার কার্য্য করিলে, নিশ্চয়ই ইহা দ্বারা দরিদ্র ব্রাহ্মগণের বিশেষ উপকার হইবে।" তিনি এতৎসম্বন্ধে একটী প্রস্তাব লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। স্থানাভাব বশতঃ তাহা এবার প্রকাশিত হইল না। আগামী বারে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যাধ্যক্ষ সভা যদি এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন তাহা হইলে ভাল হয়।

১লা ভাদ্রের তত্ত্বকৌমুদীতে প্রচারক নিয়োগ সম্বন্ধে একখানি প্রেরিত পত্র প্রকাশিত হয়। তাহার পর আমরা এই সম্বন্ধে আর একখানি পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। স্থানাভাবশতঃ আমরা অদ্যাপি তাহা প্রকাশ করিতে পারি নাই। ব্রাহ্মবন্ধু সভাতেও এই বিষয়ের আলোচনা হইতেছে। বিষয়টী অতি গুরুতর; এবং আমরা আশা করি আমাদের বন্ধুগণ বিশেষ ধীরতার সহিত ইহার বিচার করিবেন। যদি একটী মাত্র লক্ষণ দেখিয়া প্রচারক নিয়োগ করিতে হয়, তাহা হইলে আমাদের মতে জলন্ত বিশ্বাস, উন্নত চরিত্র, ঈশ্বরেরও মানুষের প্রতি গভীর ভালবাসা এবং উদারতা, নিঃস্বার্থভাব ও বিনয়—এক কথায় উন্নত ধর্ম্ম জীবন সেই লক্ষণ। ইহা যাঁহার আছে তাঁহার তেমন বিদ্যা বুদ্ধি বা বক্তৃতাশক্তি না থাকিলেও তিনি যে ঈশ্বরের দিকে লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রকৃত ধর্ম্মপ্রচার কথা দ্বারা হয় না। উন্নত জীবনই প্রচার কার্য্যের প্রধান সহায়। কিন্তু আজি কালি যেরূপ সময় পড়িয়াছে তাহাতে প্রচারকদিগের অনেক সময় দার্শনিক সন্দেহবাদ প্রভৃতির সহিত সংগ্রাম করিতে হয়। এরূপ অবস্থায় শিক্ষিত লোকের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার করিতে হইলে আধুনিক দর্শন বিজ্ঞানাদি সম্বন্ধে ভালরূপ জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক। যাঁহারা অপরের পথপ্রদর্শক ও শিক্ষক হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের শ্রোতৃবর্গের অধিকাংশের অপেক্ষা তাঁহাদের যে অধিক বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া আবশ্যক তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। দিন দিন শিক্ষার যেরূপ উন্নতি হইতেছে তাহাতে ব্রাহ্মসমাজ প্রচারকদিগের শিক্ষার দিকে দৃষ্টি না রাখিলে কখনই শিক্ষিত লোকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবেন না। প্রচারকদিগের বয়স সম্বন্ধেও একটা সাধারণ নিয়ম থাকা আবশ্যক। আমাদের মতে সাধারণতঃ ত্রিশ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক কোন ব্যক্তিকে প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত না করাই ভাল। তবে যদি সকলে একবাক্যে কাহাকেও তদপেক্ষা অল্প বয়সেই এ কার্য্যের উপযুক্ত বলিয়া স্থির করেন, তাঁহার সম্বন্ধে এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম করা কিছুই কঠিন নহে। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য হইতে হইলে যখন বয়সের একটী নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে, তখন প্রচারকার্য্য কি এতই সহজ ব্যাপার যে, তাহার জন্য বয়সের সীমা নির্দ্দেশের প্রয়োজন নাই? স্থানাভাবশতঃ প্রচারক নিয়োগ সম্বন্ধে আমাদের মত অতি সংক্ষেপে ব্যক্ত হইল। আবশ্যক হইলে ভবিষ্যতে আরও বিস্তারিতরূপে এ বিষয়ের আলোচনা করা যাইবে।

সংবাদ।

দান—সামো দ্বীপ পুঞ্জের দেশীয় খ্রীষ্টানেরা আপন ধর্ম্মের জন্য সাহায্য করিতে এত ব্যগ্র যে, তাহাদের মধ্যে অর্থ প্রার্থনা করা প্রচলিত নাই। ব্রাহ্মেরা কবে সামোবাসীদিগের মত দাতা ও পিপাসু হইবেন?

মৃত সার্ ব্যারো এলিস্ তাঁহার উইলে রত্নগিরি দরিদ্র লোকদিগের উপকারার্থ ২৫০০০ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন এই মহাত্মা সিভিলিয়ান হইয়াও ভারতবাসীর হিতৈষী বন্ধু ছিলেন। রত্নগিরি ডিষ্ট্রিক্টে তিনি প্রথম কাজ করেন বলিয়া যতদিন বাঁচিয়াছিলেন, ততদিন উহার অধিবাসীদিগকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন।

আমেরিকার ব্রাহ্মসমাজ—বিগত মে মাসের শেষে আমেরিকার একেশ্বরবাদী সমিতির যে কার্য্য বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় ১৮৮৪।৫ সালে ৮টী, ১৮৮৫।৬ সালে আরও আটটী, এবং ১৮৮৬।৭ সালে একুশটী নূতন সমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। সমাজ সংখ্যা যদি এইরূপে বৃদ্ধি পায়,তাহা হইলে আগামী ষোল বৎসরের মধ্যে সমাজ সংখ্যা দ্বিগুণ হইবে। সমিতি বলেন যে, উহার পুনর্গঠন, স্থানীয় প্রচারকদিগের কার্য্য, মন্দির নির্ম্মাণ, লোন ফণ্ড এবং উপাসকদিগের বিশ্বাস ও উৎসাহই সমাজ সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ।

খ্রীষ্টীয় সমাজে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার—বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক বাবু কামিনী কান্ত গুপ্ত লিখিয়াছেন, বরিশাল ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারক বাবু কালী মোহন দাস এবং বাবু মনোরঞ্জন গুহ তত্রত্য খৃষ্টান মণ্ডলীর মধ্যে প্রচার করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহারা গ্রামে গ্রামে, বাড়ী বাড়ী যাইয়া স্ত্রী পুরুষ সকলকে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সত্য সকল বুঝাইয়াছেন এবং অনেকেই তাহা বুঝিতে পারিয়াছে। ২৬এ শ্রাবণ আস্কর গ্রামের শ্রীকালীচরণ (রায়) খ্রীষ্টান্ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার নিজ বাড়ীতে অন্যান্য খৃষ্টান স্ত্রীপুরুষগণের সাক্ষাতে দীক্ষা কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। প্রচারকদ্বয় দীক্ষা কালে উপাসনা,প্রার্থনা এবং উপদেশ দান করিয়াছেন। এপ্রদেশে নিম্ন শ্রেণাস্থ লোকদিগের মধ্যে যাহারা খৃষ্টান হইয়াছে, তাহাদের নামের পশ্চাতে কোন উপাধি নাই। খৃষ্টান্ এই শব্দটী উপাধির ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই জন্য ইহাদের মধ্যে যাহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিবে তাহাদিগকে "রায়" এই উপাধি প্রদান করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। কেননা "রায়" কথাটী কোন বংশ বিশেষের উপাধি নহে, সকল শ্রেণীস্থ লোকের মধ্যেই এই উপাধির ব্যবহার আছে।

অসবর্ণ ব্রাহ্মবিবাহ—গত ২৫এ আগষ্ট বৃহস্পতিবার বোম্বাই প্রদেশস্থ ক্ষেতোয়াদি নামক স্থানে তত্রত্য ব্রাহ্ম সমাজের সভাপতি আর, কে, তরখদ্‌কারের বাটীতে ব্রাহ্ম পদ্ধতি অনুসারে একটী অসবর্ণ ব্রাহ্ম বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্রীর নাম গঙ্গাবাই, ইনি মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণবংশীয়া বিধবা, ইহার বয়স ১৮ বৎসর; পাত্রের নাম বনমালী লামামোদি, ইনি গুজরাটী কপোল বেণিয়া জাতীয়; ইহার বয়স ২৪ বৎসর। এই বিবাহে তত্রত্য ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক বি, বি, নগরকর মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। নবসংহিতা নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে এই বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। গঙ্গাবাই ১১ বৎসর বয়সে বিধবা হইয়া যে সামাজিক নিগ্রহ ভোগ করেন, তাহা বর্ণনা করিয়া আমাদের এক মহারাষ্ট্রীয় ভ্রাতা বাঙ্গালা ভাষায় আমাদিগকে এক পত্র লিখিয়াছেন, স্থানাভাববশতঃ তাহা প্রকাশিত হইল না। এই মহারাষ্ট্রীয় ভ্রাতার বঙ্গভাষার প্রতি অনুরাগ দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছি।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১৫ই অক্টোবর ১৮৮৭, শনিবার অপরাহ্ণ ৪টার সময়ে সিটী কলেজ ভবনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের এক বিশেষ অধিবেশন হইবে। তথায় নিম্নলিখিত কার্য্যসকল বিচারার্থ উপস্থিত করা হইবে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য মহাশয়গণ যথা সময়ে উপস্থিত হইয়া এই সকল কার্য্য সম্পাদন করিবেন। উপস্থিত হইতে না পারিলে, পত্রদ্বারা মতামত জানাইবেন।

(১) অধ্যক্ষ সভার সভ্য মনোনয়র্থ নিয়মাবলীর বিচার। *

(২) কলিকাতাস্থ উপাসকমণ্ডলীর নিম্নলিখিত নিয়ম পরিবর্ত্তনের বিচার:—"কলিকাতাস্থ উপাসক মণ্ডলীর কার্য্য নির্ব্বাহক সভায় কোনও নূতন সভার নাম কেহ প্রস্তাব করিলে এবং আর এক জন পোষকতা করিলে, অন্ততঃপক্ষে এক মাস পরে উপাসক মণ্ডলীর এক সাধারণ সভায় তিনি সভ্য মনোনীত হইবেন।"

সাঃ ব্রাঃ সমাজ কার্য্যালয়
১২ই সেপ্টেম্বর ৮৭

শ্রীশশিভূষণ বসু
সহঃ সম্পাদক
সাঃ ব্রাঃ সমাজ।

* সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার সভ্য মনোনয়নার্থ নিয়মাবলীর পাণ্ডুলিপি।

১। ভোটীং পত্রদ্বারা সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অধ্যক্ষ সভার সভ্য মনোনীত হইবেন।

২। অধ্যক্ষ সভার সভ্য মনোনয়ন তারিখের (date of election) অর্থাৎ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশন তারিখের অন্যূন তিন মাস কাল পূর্ব্বে সমাজের পত্রিকা সমূহে প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন দ্বারা সমাজের সম্পাদক মহাশয় সাঃ ব্রাঃ সমাজের সভ্যগণের মধ্যে যাঁহারা অধ্যক্ষ সভার সভ্য হইতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে তাঁহার নিকট স্ব স্ব নাম, ঠিকানা, আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক প্রভৃতি বিবরণ প্রেরণ করিবার জন্য অনুরোধ করিবেন।

৩। সাঃ ব্রাঃ সমাজের কার্য্য নির্ব্বাহক সভা আবশ্যক বোধ করিলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপযুক্ত সংখ্যক সভ্যের নাম তাঁহাদের মত জানিয়া অধ্যক্ষ সভার সভ্য মনোনয়নার্থ প্রেরণ করিতে পারিবেন। কিন্তু অধ্যক্ষ সভার পদপ্রার্থী সভ্যগণের নামের তালিকায় কার্য্য নির্ব্বাহক সভা কর্ত্তৃক প্রেরিত সভ্যগণের ও অপরাপর সভ্যগণের মধ্যে কোনও ইতর বিশেষ করা হইবে না।

৪। অধ্যক্ষ সভার সভ্যপদপ্রার্থী সভ্যগণের নাম অধ্যক্ষ সভার সভ্য মনোনয়ন তারিখের (date of election) অন্যূন ছুই মাস পূর্ব্বে সাঃ ব্রাঃ সম্পাদকের হস্তগত হওয়া আবশ্যক।

৫। অধ্যক্ষ সভার সভ্যপদপ্রার্থী সভ্যগণের নামাদি সম্বলিত "ক" তপসিলের অনুযায়ী মুদ্রিত ভোটীং-পত্র, অধ্যক্ষ সভার সভ্য মনোনয়ন তারিখের (date of election) অন্যূন পাঁচ সপ্তাহ পূর্ব্বে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সভ্যগণের নিকট প্রেরিত হইবে। তৎসঙ্গে সঙ্গে সমাজের পত্রিকাসমূহে "ভোটীং পত্র সভ্যদিগের নিকট প্রেরিত হইয়াছে" বলিয়া প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হইবে। কোনও সভ্য কোনও কারণ বশতঃ ভোটীং পত্র প্রাপ্ত না হইলে, সম্পাদকের নিকট তাহা চাহিয়া পাঠাইতে পারিবেন।

৬। সাঃ ব্রাঃ সমাজের সভ্যগণ ভোটীং পত্র যথাবিধি পূর্ণ ও স্বাক্ষর করিয়া এরূপ সময়ে প্রেরণ করিবেন যেন তাহা সভ্য মনোনয়ন তারিখের অন্যূন এক পক্ষ কাল পূর্ব্বে সাঃ ব্রাঃ সমাজের কার্য্যালয়ে পৌঁছিতে পারে। অতঃপর কোনও ভোটীং পত্র গৃহীত হইবে না।

৭। সাঃ ব্রাঃ সমাজের অধ্যক্ষ সভা তাঁহাদের ৪র্থ ত্রৈমাসিক অধিবেশনে, সাঃ ব্রাঃ সমাজের ৭ জন সভ্য লইয়া ভোট গণনার্থ একটী সব কমিটী গঠন করিবেন। ঐ ৭ জনের মধ্যে সাঃ ব্রাঃ সমাজের সম্পাদক বা সহঃ সম্পাদক একজন থাকিবেন এবং তিনি এই সব কমিটীর সম্পাদকের কার্য্য করিবেন।

৮। ভোটীং পত্র গ্রহণের সময় অতিক্রান্ত হইলে সাঃ ব্রাঃ সমাজের সম্পাদক কিম্বা সহঃ সম্পাদক মহাশয় সভ্যগণ কর্ত্তৃক প্রেরিত সমুদায় ভোটীং পত্র মনোনয়ন তারিখের (date of election) বার দিন পূর্ব্বে অনুন্মুক্তাবস্থায় ভোটগণনাকারী সব কমিটীর অধিবেশনে অর্পণ করিবেন।

৯। ভোটীং পত্র সমূহ পরীক্ষা করিয়া গণনাকারী সব-কমিটী, যিনি যত সংখ্যক ভোট পাইবেন তৎসহ সভ্য পদপ্রার্থী-গণের নামের একটী তালিকা প্রস্তুত করিয়া সভ্য মনো-নয়ন তারিখের অন্যূন পাঁচ দিবস পূর্ব্বে সমাজের কার্য্যালয়ে প্রেরণ করিবেন। এই পাঁচ দিবস কাল মধ্যে সমাজের যে কোন সভ্য সমাজের কার্য্যালয়ে যাইয়া এই তালিকা পরিদর্শন ও পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

১০। সভ্য মনোনয়ন সভার অধিবেশনে ভোট গণনা-কারী সব কমিটীর সম্পাদক কিম্বা তাঁহার অবর্ত্তমানে উক্ত সব কমিটীর কোন সভ্য, ভোট গণনার ফলাফল সভার সমক্ষে উপস্থিত করিবার জন্য সেই সভার সভাপতির হস্তে দিবেন। অতঃপর সভাপতি নির্ব্বাচিত সভ্যগণের নাম ঘোষণা করিবেন।

১১। ভোট গণনা নির্ভুল হয় নাই এই কারণ প্রদর্শন করিয়া সাঃ ব্রাঃ সমাজের কোন সভ্য সাঃ ব্রাঃ সমাজের বার্ষিক অধিবেশনে নির্ব্বাচিত সভ্যগণের নাম ঘোষিত হইবার পূর্ব্বে ভোট পুনর্গণনার প্রার্থী হইতে পারিবেন। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ তাহার কারণ সঙ্গত বোধ করিলে ভোট পুনর্গণনার ব্যবস্থা করিবেন। এই পুনর্গণনাই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

ভোটীং পত্র।

ব্রাঃ সমাজের সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

মহাশয়,

আমি নিম্ন খিত সভ্যগণকে আগামী বৎসরের অ সভার সভ্য মনোনীত করিলাম

তারিখ নিবেদক,

শ্রী

ঠিকান

সহরবাসী		মফঃস্বলবাসী	
নাম	ঠিকানা		ঠিকান
স্বাক্ষর		স্বাক্ষর	

তপসিল ক।

পদ প্রার্থিগণের নামের তালিক।

আগামী বৎসরের অধ্যক্ষ সভার সভ্যপদপ্রার্থী সাঃ ব্র জর নিম্ন খিত সভ ণের ন পনার নিকট হইল। এতন্মধ্যে আপ ন অনুগ্রহ রিয় অনধিক ৩০ জন সহরবাসী সভ ও জন মফঃস্বলবাসী নীত করিয়া আগামী পূর্ব্বে আমার নিকট প্রেরণ করিবেন। অতঃপর আপনার পত্র প্রাপ্ত হইলে, তাহা গৃহীত হইতে রিবে না। আপনার অবিদিত নাই যে, অধ সভার সভ্যগণের মধ্যে অন্যূন ২০ জন নিক থাকা প্রা নীয়

২১১ কর্ণওয়া ষ্ট নিবেদক

সাঃ ব্রাঃ সঃ লয়।

তারিখ- সম্পাদক

সভ্যের তালিকা

নং	ঠিকান	আনুষ্ঠানিক বা অনা নিক	মন্তব্য

১৭ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রী কার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা ১লা আশ্বিন মুদ্রিত ও ২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১০ম ভাগ।
১২শসংখ্যা।

১৬ই আশ্বিন রবিবার, ১৮০৯ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৮।

বাৎসরিক অগ্রিমমূল্য ২৷৷০
মফস্বলে ৩
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

পূজার আয়োজন।

আরও কাছে এস।

কাছে এস—আর (ও) কাছে—প্রাণের সঙ্গেতে
মিশে যাও একেবারে হৃদয় রতন!
পারি না থাকিতে আর দূরে তোমা হ'তে।
তোমা সনে কি যে আছে প্রাণের বন্ধন,
কিছুতে কাটিতে নারি। ক্ষুদ্র এই মন
অনন্তে ধরিতে চায়! চায় হেরিবারে
পবিত্র স্বরূপে, মম মলিন নয়ন!
পিতা মাতা বন্ধু বলি' সম্বোধি' তোমারে
তিরপিত নহে প্রাণ; মনে হয় যেন
আর(ও) কিছু আছে বাকি, তোমাতে আমাতে
যে সম্বন্ধ, ভালরূপে তাহা প্রকাশিতে
পার্থিব ভাষায় কিবা শব্দ আছে হেন?
তাই নাথ! যত তুমি কাছে এসে বস,
তত ইচ্ছা হয় বলি—আর(ও) কাছে এস।

প্রভু! এতদিন ভবের বাজারে ঘুরিলাম, আজিও ত ব্যবসায় করিতে শিখিলাম না! এ বাজারে ত দেখি লোকে অল্প মূল্যে জিনিষ কিনিয়া অধিক মূল্যে তাহা বিক্রয় করে। যে যত অধিক লাভে জিনিষ কাটাইতে পারে সে তত শীঘ্র সঙ্গতিপন্ন হইয়া উঠে। কোন মূল্যবান্ পদার্থ অল্প মূল্যে কিনিবার সুবিধা পাইলে চতুর বণিক্‌গণ সর্ব্বস্ব পণ করিয়াও তাহা ক্রয় করে। এ সকল দেখিয়া শুনিয়াও ত আমার চৈতন্য হইল না! তুমি আমার হৃদয়-দ্বারে আসিয়া বলিতেছ, 'নির্ব্বোধ সন্তান! তোর ঐ মলিন, ভগ্ন প্রাণটা আমাকে দে, উহার মূল্যস্বরূপ তুই আমাকে পাইবি।' আমি কিন্তু সাহস করিয়া তাহা দিতে পারি না! আজিও এই ছার প্রাণের মায়া ত্যাগ করিতে পারিলাম না। ছি! ছি! আমি বহুমূল্য মণি হাতে পাইয়াও এক খণ্ড ভগ্ন কাচের লোভে তাহা হারাইতে বসিয়াছি। আমি নিতান্ত মূর্খ ও অবিশ্বাসী। আমি তোমার মূল্য বুঝি না; আমার ভয় হয় পাছে প্রাণটা তোমাকে দিতে গিয়া সর্ব্বস্ব হারাইয়া বসি। তুমি আমার এই অন্ধতা দূর করিয়া আমাকে সুবুদ্ধি দাও। তুমি আমাকে প্রকৃত ব্যবসায় কেমন করিয়া করিতে হয় তাহা শিখাও।

হে সৌন্দর্য্যের সার! তোমার দিকে প্রাণ আজিও আকৃষ্ট হইল না কেন? এই আকর্ষণ ভিন্ন ত পরিত্রাণ হইবে না। তুমি যে কাছে আছ আমি তাহা দেখিয়াও দেখি না; তোমার সৌন্দর্য্য আমি ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতে পারি না; প্রতি নিশ্বাসে তোমার দয়া উপভোগ করিতেছি, তথাপি আমি তোমার দয়াতে বিশ্বাস করি না। এই অবিশ্বাসই আমার সর্ব্বনাশ করিল। তুমি আমাকে এই অবিশ্বাসের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া আমার চিত্ত তোমার দিকে আকর্ষণ কর। নতুবা কিসের বলে আমি পাপের আকর্ষণ অতিক্রম করিতে সমর্থ হইব? তোমাকে ছাড়িয়া সাধন ভজন কিসের? ধর্ম্ম কিসের? সৎকার্য্য কিসের? তুমিই স্বর্গ, তুমিই পরিত্রাণ। তোমার প্রকাশে নরকের মধ্যেও স্বর্গের পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়। তুমি স্পর্শমণি; তোমার স্পর্শে নরকের কীটও স্বর্গের দেবতা হইয়া যায়। তুমি আমার প্রাণটাকে স্পর্শ করিয়া আমার মোহ নিদ্রা ভাঙ্গিয়া দাও। আমি বিশ্বাস চক্ষে তোমাকে দেখিয়া কৃতার্থ হই।

প্রিয় দর্শন! তোমাকে না দেখিলে আমি যে কিছুতে সুখ পাই না। তোমার প্রসন্ন মুখ দেখিলে আমি কৃতার্থ হই; তোমার অপ্রসন্ন মুখ দেখিলেও আমি দুঃখের মধ্যে সুখ পাই। কিন্তু তুমি মুখ লুকাইলে আমি যে চারিদিক্ অন্ধকার দেখি। তুমি যে আমার আঁধার ঘরের আলো। তুমি আমাকে ছাড়িবে না, জানি। তুমি যে মুখ লুকাও সেও আমার মঙ্গলের জন্য, তাহাও জানি। তথাপি তোমাকে না দেখিলে আমার জীবন একেবারে অন্ধকারময় ও বিশৃঙ্খল হইয়া যায়। প্রিয় দর্শন! আমাকে আর যে শাস্তি দিতে হয় দিও, কিন্তু তোমার অদর্শন যন্ত্রণা হইতে আমাকে রক্ষা কর।

প্রভু! তুমি এই ক্ষুদ্র কীটকে তোমার সৌন্দর্য্য দেখাইলে কেন? আমি পৃথিবীর ধূলিতে পড়িয়াছিলাম, তুমি আমাকে

সেখান হইতে উঠাইয়া তোমার স্বর্গের আভাস দেখাইলে কেন? তোমাকে দেখিব, প্রাণের মধ্যে তোমার বাণী শ্রবণ করিব—এ উচ্চ আশা প্রাণে সঞ্চারিত করিলে কেন? তুমি যে নিজ মুখে বলিয়াছ পরিত্রাণ দিবে। তবে আর বিলম্ব করিতেছ কেন? প্রভু! আর বিলম্ব করিও না। এ দুর্ব্বল প্রাণে ক্ষীণ বিশ্বাস সূত্র অবলম্বন করিয়া আর কতদিন দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিব? আমি জানি আমি তোমার ভৃত্য হইবার উপযুক্ত নহি। কিন্তু তুমিও ত তাহা জান, এবং তাঁহা জানিয়াও ত তুমি আমার প্রাণে উচ্চ আশার সঞ্চার করিয়া দিয়াছ। আমি পাপী ও ক্ষুদ্র হইয়াও যে, হে বিশ্বপতি! তোমাকে দেখিব, তোমাকে ভাল বাসিব, তোমার সেবা করিব বলিয়া আশান্বিত হইয়াছি, সে কাহার কৃপায়?—আর তুমি ভিন্ন কেই বা সে আশা পূর্ণ করিতে পারে? তবে এস, পাপীকে দেখা দাও। আমি যদি এ জীবনে অন্ততঃ একবারও তোমাকে ভাল করিয়া দেখিয়া এবং সমস্ত প্রাণের সহিত তোমাকে ভাল বাসিয়া ও তোমার সেবা করিয়া মরিতে পারি তাহা হইলেই আমার পৃথিবীতে আসা সার্থক মনে করিব।

আমি মনে করিয়াছিলাম তোমার জন্য আমার প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে। তুমি কিন্তু আমার অহঙ্কার চূর্ণ করিলে। তুমি চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিলে যে আজিও আমার প্রকৃত ব্যাকুলতা জন্মে নাই। নতুবা আমি সমস্ত দিন তোমাকে ছাড়িয়া থাকি কিরূপে? কার্য্যের স্রোতে পড়িয়া যখন আমি তোমাকে ভুলিয়া যাই, তখন কেমন করিয়া বলিব আমার প্রাণ তোমাকে চায়? তুমি কতদিন উপাসনার সময় আমাকে বলিয়াছ যে, সমস্ত দিন প্রাণের মধ্যে তোমাকে ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিলে উপাসনা ভাল হইবে, তোমার দর্শন পাইব। কিন্তু আমি কি তাহার জন্য চেষ্টা করিয়াছি? আমার প্রাণ যদি তোমার জন্য বাস্তবিক ব্যাকুল হইত, তাহা হইলে কি আমি এই একটা বিষয়ের জন্যও চেষ্টা করিতাম না? আশার অনুরোধে ত লোকে কত বিষয়ের জন্য কত পরিশ্রম করে। আর তোমার মুখে তোমাকে পাইবার উপায় শুনিয়াও ত আমি তাহা গ্রহণ করিলাম না! প্রভু! বাস্তবিকই আমার তেমন ব্যাকুলতা নাই। তুমি আমাকে ব্যাকুলতা দাও। তুমি আমাকে তোমার জন্য কাঁদাও। তোমার জন্য বাস্তবিকই যাহার প্রাণ কাঁদে, তাহার ক্রন্দন কখন নিষ্ফল হয় না। তুমি কখনই তাহাকে দেখা না দিয়া থাকিতে পার না।

আমার হীনতা যেন আমি কখন বিস্মৃত না হই। আমার হীনতাবোধ যখন উজ্জ্বল থাকে, তোমার পূর্ণতা তখন বিকাশিত হয়। যখনই আমি আমাতে সন্তুষ্ট হই, তখনই আমার বিপদ্ ঘটে। আমি যেন কখনই আপন অবস্থায় তৃপ্ত না হই, তাহা হইলে উচ্চ হইতে উচ্চতর আদর্শ চিত্তপটে প্রতিবিম্বিত হইবে। যেখানে তোমার মঙ্গলভাব, যেখানে তোমার প্রেম, যেখানে তোমার জ্ঞান দেখিব, সেই খানেই মন যেন অবনত হয়। আমি দীন দুঃখী দরিদ্র লোক, সাধুতার বিচারে যেন আমার অন্যায় প্রবৃত্তি না হয়। জীবে তোমায় দেখিবামাত্র যেন চিনিতে পারি ও চিনিয়া যথোচিত সম্মান করিতে পারি। সাধুতা দেখিয়া ভক্তি, মহত্ত্ব দেখিয়া সম্মান করা যেন আমার প্রকৃতি হইয়া যায়। তোমার ও তুমি যাঁহাদের প্রিয়তম, তাঁহাদের কাছে আমি সদাই যেন অবনত মস্তকে অবস্থান করি।

হে স্বর্গীয় উদ্যানপাল! প্রাণের ভাবতরুগুলি আবার শুকাইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। কৃপাবারি সিঞ্চন কর, বৃক্ষগুলি সতেজ হইয়া উঠুক। ভাল করিয়া মালীর কার্য্য শিখি নাই, তাই আমার হাতে গাছের তেমন যত্ন হয় না। বহুমূল্য চারা পাইলাম, আনন্দে রোপণ করিলাম, কিন্তু যত্নের অভাবে গাছ গুলি শুকাইয়া গেল। তাহার উপর পাপ কীট ও শুষ্কতা পক্ষীর উৎপাত, কত দিকে চক্ষু রাখিব? বড় বড় ফুল হইবে, সেই ফুল দিয়া তোড়া প্রস্তুত করিয়া তোমার হাতে দিব, দেখিতেছি সে সাধ পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা লুপ্ত হইতেছে। কেমন করিয়া মনের বাগানের যত্ন করিতে হয়, তাহা আমাকে শিখাইয়া দেও, কোন্ সময়ে কোন্ গাছ রোপণ করিতে হয়, কখন কোন্ গাছের ডাল ছাঁটিতে হয়, কখন জল, কখন মাটী দিতে হয়, এ সকল তত্ত্ব আমার কাছে প্রকাশিত কর। আমি একটী বাগান প্রস্তুত করি। বাগান প্রস্তুত হইলে, তোমায় আমায় দুজনে পরমানন্দে তথায় ভ্রমণ করিব। তুমি জিজ্ঞাসা করিলে আনন্দে বৃক্ষের পরিচয় দিব, ইচ্ছামত পুষ্পচয়ন করিয়া তোমাকে উপহার দিব, তুমি সাদরে গ্রহণ করিবে, দেখিয়া আমার নয়ন তৃপ্ত হইবে।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ ও আমাদের জীবন।

আদর্শ উচ্চ না হইলে জীবন কখনই উন্নত হইতে পারে না। যাহার আদর্শ যেরূপ, তাহার জীবনও অনেক অংশে তদনুযায়ী হইয়া থাকে। অপরদিকে আদর্শ উচ্চ হইলেই যে জীবন উন্নত হইবে, এমন কোনও কথা নাই। আদর্শে বিশ্বাস থাকা চাই। শুদ্ধ কবিকল্পনায় স্বর্গে যাওয়া যায় না। সুখশয্যায় শয়ন করিয়া লক্ষমুদ্রার স্বপ্ন দেখিলে ধনী হওয়া যায় না। আমি যে অবস্থাকে আমার জীবনের আদর্শ বলিয়া সম্মুখে স্থাপন করিয়াছি, চেষ্টা করিলেই ঈশ্বরপ্রসাদে আমি সেই অবস্থা পাইতে পারি এবং সেই অবস্থায় উপনীত হওয়াই আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, একমাত্র লক্ষ্য, এই বিশ্বাসটুকু তাহার সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল থাকা চাই। নতুবা বুদ্ধ, ঈশা বা চৈতন্যের ন্যায় উন্নতজীবন কল্পনার তুলিকায় মানসপটে চিত্রিত করিতে পারিলেই যদি তাঁহাদের মত জীবন লাভ করা যাইত, তাহা হইলে আর ভাবনা ছিল কি? তাহা হইলে ত যাহার একটু কল্পনাশক্তি প্রবল, সেই স্বর্গরাজ্য অধিকার করিয়া বসিত। যাহার আদর্শে বিশ্বাস আছে, সে তাহা লাভ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে। যাহার আদর্শে বিশ্বাস নাই, সে মুখে যত বড় বড় কথাই বলুক না কেন, সে কখনই

তাহার নিকটবর্ত্তী হইবার জন্য প্রাণ দিয়া খাটিতে পারিবে না। অপরদিকে যাহার যাহা লক্ষ্য, তাহা অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইবার চেষ্টা তাহার মনেই আসে না। যাহার দৃষ্টি ক্ষুদ্র বিষয়ে বদ্ধ, সে কেমন করিয়া মহৎ বিষয় ধারণা করিতে সমর্থ হইবে? এই জন্যই দেখা যায় যে, আদর্শ উচ্চ না হইলে জীবন উন্নত হয় না। উচ্চ বিষয়ের দিকে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া বিশ্বাসের সহিত সেই দিকে অগ্রসর হইতে চেষ্টা না করিলে ক্ষুদ্র বিষয়ের প্রভাব কখনই অতিক্রম করিতে পারা যায় না। একটা উচ্চ লক্ষ্য প্রাণপণে ধরিয়া থাকিতে পারিলে জীবন-পথের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিঘ্ন সকল আপনা আপনি খসিয়া পড়ে। কিন্তু ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া ব্যস্ত থাকিলে কখনই উন্নতির উচ্চ সোপানে আরোহণ করা যায় না।

ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শ যে অত্যন্ত উচ্চ একথা বোধ হয় আমাদের মধ্যে কেহ অস্বীকার করেন না। আত্মাতে নিত্য ঈশ্বর দর্শন, প্রাণের মধ্যে তাঁহার পরিত্রাণপ্রদ বাণী শ্রবণ, জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার প্রত্যক্ষ ও নিত্য সম্বন্ধ স্থাপন, তাঁহাতে সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ, নিজের জীবনে ও পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করা—মানব জীবনে ইহা অপেক্ষা উচ্চতর, মহত্তর লক্ষ্য আর কি হইতে পারে? কিন্তু এই উচ্চ ও স্বর্গীয় আদর্শ হইতে চক্ষু ফিরাইয়া যখন আমরা আপনাদের জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখন কি দেখিতে পাই?—তখন দেখিতে পাই যে এই আদর্শের দিকে অগ্রসর হইবার জন্য আমাদের কিছু মাত্র চেষ্টা নাই, সংগ্রাম নাই। আমরা যে কেবল ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া, বাহিরের ব্যাপার লইয়া ব্যস্ত রহিয়াছি তাহা নহে। সহস্র অপরাধ ও অভাবের মধ্যেও যদি আমাদের উচ্চ আদর্শের কথা মনে হইয়া প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত, এবং আমরা মনে মনে অত্যন্ত অতৃপ্তি অনুভব করিতাম, তাহা হইলেও আশা করা যাইতে পারিত যে, একদিন না একদিন আমাদের মোহ নিদ্রা ভঙ্গ হইবে, একদিন না একদিন ব্রাহ্মগণ আবার আলস্য ও সাংসারিকতার শৃঙ্খল ভগ্ন করিয়া সুপ্তোত্থিত সিংহের ন্যায় ভীমপরাক্রমে ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শের দিকে অগ্রসর হইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইবে। কিন্তু একটী ভাব দেখিয়া আমাদের মনে অত্যন্ত ক্ষোভ ও আশঙ্কার উদয় হইয়াছে। আমরা আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় বেশ সন্তুষ্ট চিত্তে কালযাপন করিতেছি। ব্রাহ্ম সমাজ যে প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে দিন দিন অবনতির পথে যাইতেছে, আমরা যে বাহিরের ব্যস্ততা ও আড়ম্বরের মধ্যে পড়িয়া প্রকৃত বস্তু হারাইতে বসিয়াছি, পরমেশ্বর হইতে ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছি, আমাদের জীবনের উচ্চ আদর্শ হইতে দিন দিন দূরে গিয়া পড়িতেছি, এ কথা আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। এই অন্ধতা, এই আধ্যাত্মিক সন্তোষের ভাবই আমাদের সর্ব্বনাশের মূল। ধর্ম্মসম্বন্ধে অনেক বড় বড় কথা শুনিয়া ও বলিয়া আমাদের মন অসাড় ও অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে। আমরা মনে করি আমাদের মত ধার্ম্মিক বুঝি আর জগতে নাই; আমরা যেমন উন্নত হইয়াছি, এমন উন্নত বুঝি আর কেহ কখন হয় নাই, হইতে পারে না; আমাদের জীবন ত বেশ চলিয়াছে; ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমাদের জানিবার, শিখিবার বা করিবার আর কিছু নাই; আমরা একেবারে স্বর্গরাজ্যের চাবি পাইয়াছি—দ্বার খুলিয়া প্রবেশ করিলেই হয়।

এই আধ্যাত্মিক অবনতির কারণ কি? ইহার প্রধান কারণ ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শে আমাদের বিশ্বাস নাই। আমরা মুখে অনেক বড় বড় কথা বলি বটে, কিন্তু বাস্তবিক সে সকল কথায় বিশ্বাস করি না। আমাকে যদি কেহ ধর্ম্ম জীবনের উচ্চ আদর্শের কথা জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে আমি ঈশা, চৈতন্য প্রভৃতি সাধুগণের জীবনের উচ্চ ভাব সমূহের সামঞ্জস্য করিয়া এমন একটী সুন্দর কবিত্ব পূর্ণ চিত্র কল্পনার সাহায্যে চিত্রিত করিয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিতে পারিব যে, তিনি দেখিয়া অবাক্ হইয়া যাইবেন, এবং মনে করিবেন,—'ওঃ! এই লোকটার জীবন না জানি কত উন্নত!' কিন্তু আমার হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে প্রবেশ করিয়া তিনি যদি দেখিতে পারিতেন বাস্তবিক ঐ আদর্শে আমার বিশ্বাস আছে কি না, ঐ আদর্শ লক্ষ্য করিয়া আমি উহার দিকে অগ্রসর হইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছি কি না, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি আমাকে কপট অথবা অসার কল্পনার সেবক বলিয়া ঘৃণা বা অশ্রদ্ধার সহিত পরিত্যাগ করিয়া যাইতেন। না—ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শে আমাদের বিশ্বাস নাই। আমরা মুখে যাহাই বলি না কেন আমরা বাস্তবিক বিশ্বাস করি না যে আত্মার মধ্যে নিরাকার পরমেশ্বরের দর্শন পাওয়া যায়, তাঁহার জীবনপ্রদ বাণী শ্রবণ করা যায়; আমরা বিশ্বাস করি না যে মানুষ—ক্ষুদ্র, পাপী, দুর্ব্বল মানুষ—সেই অনাদি অনন্ত, পূর্ণ পবিত্র স্বরূপ, সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরকে নিজের ক্ষুদ্র হৃদয়ে বসাইয়া তাঁহাকে 'আমার ইষ্ট দেবতা', 'আমার পিতামাতা' 'আমার বন্ধু' বলিয়া সম্বোধন করিতে পারে; আমরা বিশ্বাস করি না যে ইহজীবনে ঈশ্বরের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া আমাদের ইচ্ছাকে তাঁহার ইচ্ছার সম্পূর্ণ অধীন করা যাইতে পারে; আমরা বিশ্বাস করি না যে মানুষের জীবনে এমন অবস্থা আসিতে পারে যখন সে ঐশ্বরিক ভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া প্রত্যেক কার্য্যে তাঁহার অঙ্গুলি নির্দ্দেশ অনুসরণ করিয়া চলিতে পারে। যদি সে বিশ্বাস আমাদের থাকিত তাহা হইলে আজি আমরা কখনই আমাদের বর্ত্তমান অবস্থাকে উন্নতির চরম-সীমা মনে করিয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকিতে পারিতাম না। যদি সে বিশ্বাস আমাদের থাকিত তাহা হইলে আমরা পূর্ব্বোক্ত উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা না করিয়া কখনই থাকিতে পারিতাম না। যাহার যে বিষয়ের জন্য ব্যাকুলতা নাই সে তাহা পাইবার নিমিত্ত প্রাণ খুলিয়া চেষ্টা করিবে কেন? আর যাহার বিশ্বাস নাই তাহার ব্যাকুলতা আসিবে কোথা হইতে? নতুবা ইহা কি সামান্য সৌভাগ্যের কথা, সামান্য আশার কথা যে পবিত্র স্বরূপ, সর্ব্বশক্তিমান্ স্বর্গের দেবতা পাপী মনুষ্যের হৃদয়ে আত্মস্বরূপ প্রকাশিত করেন, তাহার সহিত কথা কহেন, তাহাকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করেন, তাহাকে আপনার শক্তিদ্বারা অনুপ্রাণিত করেন, স্বয়ং তাহার হাত ধরিয়া পরিত্রাণের পথে লইয়া যান,

তাহাকে ইহজীবনেই স্বর্গের শোভা দেখাইয়া মোহিত করেন? একি সামান্য ব্যাপার?—ইহার তাৎপর্য্য যে উপলব্ধি করিয়াছে, ইহা সত্য বলিয়া যে বিশ্বাস করে, সে কি ঘুমাইয়া থাকিতে পারে? সে কি মৃতের ন্যায় পড়িয়া থাকিতে পারে? সে কি পরমেশ্বরকে দেখিবার জন্য চেষ্টা না করিয়া থাকিতে পারে? তাহার মৃতপ্রাণে জীবন সঞ্চার হইবে না? তাহার শিরায় শিরায় তাড়িত প্রবাহ ছুটিবে না? তাহার কথায় পাপাসক্ত প্রাণের মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইবে না? অবিশ্বাসীর প্রাণের অন্ধকার বিদূরিত হইবে না? কপটী নাস্তিকের হৃদয় স্তম্ভিত হইবে না?—তবে আর বিশ্বাস কিসের? কাতরপ্রাণে ডাকিলে পরমেশ্বর দেখা দেন, এ কথায় বিশ্বাস করিতে পারিলে কি আর ঈশ্বরের দর্শনলাভ করিতে বিলম্ব হয়? না পুরাতন পাপের জন্য চিরদিন ধরিয়া আক্ষেপ করিতে হয়? আসল কথা এই যে আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শে বিশ্বাস করি না—অন্ততঃ ইহজীবনে আমরা উহার নিকটবর্ত্তী হইতে পারিব বলিয়া মনে করি না। তাহা যদি করিতাম তাহা হইলে আজি আমাদের জীবনের গতি অন্যরূপ হইত।

শ্লোক সংগ্রহ।

(শ্রীমদ্ভাগবত)

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥ ১স্ক ২অ, ১১॥

নমু তত্ত্ব জিজ্ঞাসা নাম ধর্ম্ম জিজ্ঞাসৈব ধর্ম্ম এব হি তত্ত্বমিতি কেচিৎ, তত্রাহ বদন্তীতি। তত্ত্ববিদস্তু তদেব তত্ত্বংবদন্তি। কিং তৎ? যৎ জ্ঞানং নাম। * * *। নমু তত্ত্ববিদোঽপি বিগীতবচনা এব;—নৈবং,—তস্যৈব তত্ত্বস্য নামান্তরৈরভিধানাদিত্যাহ,—ঔপনিষদৈঃ ব্রহ্মেতি হিরণ্যগর্ভৈঃ পরমাত্মেতি সাত্বতৈর্ভগবানিতি শব্দ্যতে অভিধীয়তে।

তত্ত্ববিদ্‌গণ অদ্বিতীয় জ্ঞানস্বরূপ যিনি তাঁহাকেই তত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সম্প্রদায়ভেদে এই তত্ত্ব ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান্ প্রভৃতি বিবিধ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

তস্মাদেকেন মনসা ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যদা॥ ১স্ক, ২অ, ১৪॥

যস্মাচ্চ ভক্তিহীনো ধর্ম্মঃ কেবলং শ্রম এব তস্মাদ্ ভক্তি প্রধান এব ধর্ম্মোঽনুষ্ঠেয় ইত্যাহ, তস্মাদিতি। [তস্মাৎ কারণাৎ ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ নিত্যদা সর্ব্বদা] একেন একাগ্রেণ মনসা [শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ, তথা ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ।]

অতএব সর্ব্বদা একাগ্রচিত্তে ভগবানের নামশ্রবণ ও কীর্ত্তন এবং তাঁহার ধ্যান ও পূজা করা কর্ত্তব্য।

যদনুধ্যাসিনা যুক্তাঃ কর্ম্মগ্রন্থি নিবন্ধনম্।
ছিন্দন্তি কোবিদাস্তস্য কোন কুর্য্যাৎ কথারতিম্॥ ১স্ক, ২অ, ১৫॥

ভক্তিহীনো ধর্ম্মঃ কেবলং শ্রম ইত্যুক্তং, ইদানীন্তু ভক্তের্মুক্তি ফলত্বং প্রপঞ্চয়তি, যদিতি। যস্য অনুধ্যা, অনুধ্যানং, সৈব অসিঃ খড়্গঃ তেন যুক্তা বিবেকিনঃ গ্রন্থিমহঙ্কারং নিবধ্নাতি যৎকর্ম্ম তৎ ছিন্দন্তি তস্য কথায়াং রতিং কোন কুর্য্যাৎ।

যাঁহার অনুধ্যানরূপ অসির সাহায্যে বিবেকী পুরুষগণ অহঙ্কারের কারণস্বরূপ কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন করেন, সেই ভগবানের কথায় কাহার না অনুরাগ হইবে?

শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থোহ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্॥ ১স্ক, ২অ, ১৭॥

পুণ্যে শ্রবণ কীর্ত্তনে যস্য সঃ—সতাং সুহৃৎ হিতকারী; হৃদি যাঞ্যভদ্রাণি কামাদি বাসনাঃ তানি; অন্তঃস্থঃ হৃদয়স্থঃ সন্।

যাঁহার নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তনে পুণ্য সঞ্চার হয় সাধুজন-হিতকারী সেই ভগবান্, যাঁহারা তাঁহার কথা শ্রবণ করেন তাঁহাদের অন্তরে থাকিয়া তাঁহাদের হৃদয়স্থ কামাদি বাসনারূপ অমঙ্গল সকল বিদূরিত করেন।

তদা রজস্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে।
চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতি॥ ১স্ক, ২অ, ১৯॥

রজশ্চ তমশ্চ। যেচ তৎপ্রভাবাঃ ভাবাঃ কামাদয়ঃ এতৈরনাবিদ্ধম্ অনভিভূতম্। প্রসীদতি উপশাম্যতি।

তখন আর চিত্ত রজঃ ও তমোভাবসমুৎপন্ন কামলোভাদি প্রবৃত্তি দ্বারা অভিভূত হয় না; কিন্তু সত্ত্বগুণে অবস্থিত হইয়া শান্ত ভাব লাভ করে।

এবং প্রসন্নমনসো ভগবদ্ভক্তিযোগতঃ।
ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানং মুক্তসঙ্গস্য জায়তে॥ ১ম, ২অ, ২০॥

ভগবদ্ভক্তিযোগতঃ প্রসন্ন মনসঃ—অতএব মুক্তসঙ্গস্য।

এইরূপে ভগবদ্ভক্তিযোগদ্বারা যাঁহার চিত্ত নির্ম্মল ও আসক্তিশূন্য হইয়াছে তাঁহার হৃদয়ে ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞান সমুৎপন্ন হয়।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে॥ ১স্ক, ২অ, ২১॥

জ্ঞানফলমাহ,—ভিদ্যত ইতি। হৃদয়মেব গ্রন্থিঃ চিজ্জড়-গ্রন্থনরূপোঽহঙ্কারঃ অতএব সর্ব্বে সংশয়া অসম্ভাবনাদিরূপাঃ। কর্ম্মাণ্যনারব্ধফলানি। আত্মস্বরূপভূতে ঈশ্বরে দৃষ্টে। এবকারেণ জ্ঞানান্তরমেবেতি দর্শয়তি।

আত্মস্বরূপ ঈশ্বরের দর্শন লাভ মাত্র অহঙ্কাররূপ হৃদয়গ্রন্থি বিদীর্ণ হয়, সমস্ত সংশয় ছিন্ন হয় এবং সকামকর্ম্ম সমুদায় বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

অতো বৈ কবয়ো নিত্যং ভক্তিং পরময়া মুদা।
বাসুদেবে ভগবতি কুর্ব্বন্ত্যাত্মপ্রসাদনীম্॥ ১স্ক, ২অ, ২২॥

অত্র সদাচারং দর্শয়ন্নুপসংহরতি অত ইতি। আত্মপ্রসাদনীং মনঃশোধনীম্।

এই জন্যই মনীষিগণ সর্ব্বদা অত্যন্ত আনন্দ সহকারে ভগবানের প্রতি আত্মপ্রসাদজনক ভক্তি করিয়া থাকেন।

মাদাম গেঁয়োর জীবনী।

দ্বিতীয়তঃ মেঃ টম্‌সী এই সময়ে মাদাম গেঁয়োর পিতৃগৃহে উপস্থিত হন। ইনি ধর্ম্মপ্রচার উপলক্ষে কোচিনচীনে গিয়াছিলেন, এবং চারি বৎসর প্রচারের পর তখন স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। মাদাম গেঁয়ো ইহাকে দেখিয়া অতিশয়

প্রীত হন। মেঃ টয়সীও তাঁহাকে সাধ্যমত ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হইতে উৎসাহিত করেন। মাদাম গেঁয়ো বলেন যে এই সাধু ব্যক্তির সাধন ও কথোপকথনে তিনি অনেক উপকার পাইয়াছিলেন। মেঃ টয়সীর ধর্ম্ম জীবনের এই একটী বিশেষ ভাব ছিল যে,তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে নিত্য মানস যোগ স্থাপনে সিদ্ধ হইয়াছিলেন। এই নিত্য যোগের ভাবে মাদাম গেঁয়ো মোহিত হন, এবং উহা সাধনের জন্য মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত কখন সবাক কখন বা মানস প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তথাপি প্রাণের মর্ম্মস্থানে ঈশ্বরানুরাগ প্রবেশ করিল না। দয়াময় পরমেশ্বর তৃতীয় দূত পাঠাইলেন। সেণ্টফ্রান্সিস সম্প্রদায় ভুক্ত একজন সাধু লোক এই সময়ে মাদাম গেঁয়োর পিতার সহিত পরিচিত হন। পিতার অনুমতি লইয়া একজন আত্মীয়ের সঙ্গে মাদাম গেঁয়ো উক্ত সাধুর নিকট গিয়া আপনার দুঃখের কাহিনী-বিবৃত করিলেন। সে সকল কথা শুনিয়া তিনি কিছুকাল নীরব থাকিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, পরে বলিলেন "আপনি যাহা কেবল অন্তরে লাভ করিতে পারেন, বাহিরে অন্বেষণ করিয়াছেন বলিয়াই এতদিন কোন ফল পান নাই ঈশ্বরকে অন্তরে অন্বেষণ করিতে অভ্যাস করুন, নিশ্চয়ই তাঁহাকে লাভ করিবেন"। এই কথা শুনিবামাত্র মাদাম গেঁয়োর মন পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তিনি যে পূর্ব্বে কখন এরূপ ভাবের কথা শুনেন নাই এমন নহে কিন্তু সে কথা প্রাণের মর্ম্মে আঘাত করে নাই। অধ্যাত্ম জগতের সত্য যতক্ষণ পর্য্যন্ত স্বয়ং ঈশ্বর কর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত না হয় ততক্ষণ কোনই ফল হয় না, কিন্তু একটী সামান্য অধ্যাত্ম সত্য যদি ঈশ্বর-বলে প্রক্ষিপ্ত হয় তবে সপ্ত পাতাল ভেদ করিয়া ভক্তি গঙ্গা প্রবাহিত করে। জ্ঞান যোগে বহির্জগতে একজন দূরবর্ত্তী ঈশ্বর অনুভব করা যাইতে পারে। দূরস্থিত স্থানকে তিনি পূর্ণ করিয়া আছেন ইহা সত্য কথা, কিন্তু যতক্ষণ ঈশ্বরকে আত্মাতে উপলব্ধি না করা যায় এবং যতক্ষণ তাঁহাকে বিশ্বাস ও প্রেম যোগে প্রাণ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত না করা যায় ততক্ষণ আমাদের ঈশ্বর বলিয়া জানা যায় না। মাদাম গেঁয়ো আপনার এই পরিবর্ত্তনের কথা এরূপ সুন্দর ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে আমরা তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত না করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিলাম না। তিনি লিখিয়াছেন, "উক্ত সাধু ঐ কয়েকটী মাত্র কথা বলিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার কথা কিন্তু বাণের ন্যায় আমার প্রাণকে ভেদ করিয়া ফেলিল। ঈশ্বর প্রেমে আমি গভীর রূপে আহত হইলাম; সে আঘাতে এত আনন্দ হইল যে আরোগ্য লাভ করিবার বাসনা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিলাম। এতদিন যাহা খুঁজিতেছিলাম, কিন্তু পাই নাই, সাধুর কথায় তাহা পাইলাম, অথবা অজ্ঞান বশতঃ যাহা এতদিন দেখিতে পাই নাই অদ্য তাহা দেখিলাম। প্রভু তুমি আমার প্রাণে ছিলে কেবল তোমার দিকে চোখ ফিরাইবার অপেক্ষা ছিল। অনন্ত মঙ্গল, তুমি এত নিকটে ছিলে আর আমি এখানে সেখানে ছুটাছুটি করিয়া তোমাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলাম, অথচ লাভ করিতে পারি নাই। আমার সুখ আমার অন্তরে ছিল, অথচ আমার জীবন ভারবহ হইয়াছিল। সম্পদে। ম [illegible] আমি দরিদ্রতা অনুভব করিতেছিলাম, অন্নের [illegible] খাইয়া অনশনে মরিতেছিলাম। হে সুন্দর [illegible] কেন তোমাকে জানিতে পারিলাম। হায়! [illegible] যেখানে তুমি নাই সেখানে আমি তোমাকে অন্বেষণ করিয়াছি, আর যেখানে [illegible] অন্বেষণ করি নাই—'স্বর্গরাজ্য এখানে নয় সেখানে নয় তোমার অন্তরে' এই মহাবাক্যের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া আমি এত দিন এত যন্ত্রণা পাইয়াছি এখন তুমি আমার রাজা, প্রাণ তোমার রাজ্য,তুমি তথায় আধিপত্য করিবে তোমার ইচ্ছা জয় লাভ করিবে।" মাদাম গেঁয়ো যে দিন ঐ কথা শুনেন সে রাত্রে ঘুমাইতে পারেন নাই। ঈশ্বর প্রেমাগ্নি তাঁহার আমিত্বের যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল সকলই ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল। তিনি ঈশ্বরকে প্রাণে যে কেবল জ্ঞানযোগে অনুভব করিলেন তাহা নহে ঈশ্বরকে অন্তরে প্রত্যক্ষ ভাবে উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার জীবনের গতি এমন পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল যে তিনি স্বয়ং ও অপরে বিস্ময়াপন্ন হইলেন। চরিত্রের যে সকল দোষ দূর করিবার জন্য তিনি এত কাল কষ্ট পাইয়াও সফল হন নাই, সে সকল দোষ ও কর্ত্তব্য পালনে নিরুৎসাহ নিমেষে বিলুপ্ত হইল। উপাসনা এত সহজ হইল, যে কিছু দিন উপাসনা ভিন্ন তিনি আর কিছুই করিতে পারিতেন না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঈশ্বর সহবাসে মুহূর্ত্তের মত কাটিতে লাগিল। যে সাধু মহাত্মা ঈশ্বরপ্রেরিত দূতের ন্যায় হইয়া এইরূপে মাদাম গেঁয়োর ধর্ম্ম জীবন পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন,মাদাম তাঁহাকে গুরু পদে বরণ করিতে অভিলাষী হন। তিনি প্রথমে ইহাতে স্বীকার পান নাই, কিন্তু ঈশ্বরের কাছে উক্ত বিষয় নিবেদন করিয়া যখন প্রত্যাদেশ পাইলেন "সন্তান! আশঙ্কা করিও না, তোমার শিষ্যাকে আমি সেবিকা বলিয়া মনোনীত করিয়াছি" তখন আর তিনি আপত্তি করিতে পারিলেন না। মাদাম গেঁয়ো এই প্রত্যাদেশের কথা শুনিয়া একেবারে বিগলিত হইয়া গেলেন। মনে করিলেন,"কি! যে ঈশ্বরকে আঘাত ও তাঁহার দানের অপব্যবহার করিতে ত্রুটি করিল না, যে তাঁহার অনন্ত প্রেমের পরিবর্ত্তে কেবল কৃতঘ্নতাই প্রত্যর্পণ করিল, সেই নারকী পিশাচীরে প্রভু সেবিকা ও দাসী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন?" এমন প্রেমের সংবাদ শুনিয়া কে আত্মবশে থাকিতে পারে? মাদাম গেঁয়ো পরমেশ্বর চরণে আত্ম সমর্পণ করিলেন। এই পবিত্র রমণীর জীবনীর প্রথম খণ্ড আমরা এই খানেই সমাপ্ত করিলাম।

যাঁহারা এত দূর আসিয়াছেন তাঁহাদিগের প্রতি আমাদের এই বিনীত নিবেদন, যে তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখুন, এই পবিত্র রমণীর জীবনের প্রথম অংশ কি সুন্দর ও আশাপ্রদ চিত্র। লালারুখে কবি মুর অনুতপ্ত অশ্রুর মনোহারিত্ব দেখাইয়াছেন! কিন্তু আমাদের মনে হয় যে ঈশ্বরাভিমুখী, সংগ্রামশীল আত্মার ন্যায় সুন্দর বস্তু জগতে অতি অল্পই আছে। মাদাম গেঁয়োর প্রাণ সংসারে সুখ লাভের জন্য কতই চেষ্টা করিল,কিন্তু কিছুতেই সফল হইতে পারিল না! কেমন বিচিত্র লীলা প্রকাশ করিয়া লীলাময় প্রভু ধীরে ধীরে তাঁহার প্রাণ আকর্ষণ করিতে লাগি-

লেন। সে গুপ্ত অথচ প্রবল আকর্ষণ ছেদন করিবার জন্য অজ্ঞানচিত্ত কতই প্রয়াস পাইল, কিন্তু অবশেষে প্রভু পরমেশ্বরেরই জয় হইল। যে রূপ, গুণ, যৌবন ও বিদ্যার সংসারে এত আদর, মাদাম গেঁয়োর তাহার কিছুরই অভাব ছিল না, কিন্তু ঈশ্বরের রূপ ও গুণের মধুর আকর্ষণের হস্ত হইতে তিনি কিছুতেই আত্মরক্ষা করিতে পারিলেন না। কতবার কাঁদিতে কাঁদিতে পড়িলেন আবার কতবার হাসিতে হাসিতে পৃথিবীর ধূলি অঙ্গ হইতে ঝাড়িয়া উঠিলেন। কত যন্ত্রণা পাইলেন, অশ্রুপাত করিয়া নয়নের জল শুকাইয়া গেল। দেব দুর্লভ ঈশ্বর লাভ কি পরিহাসের ব্যাপার? যত প্রকার সাধনের কথা তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন, মাদাম গেঁয়ো তত প্রকার সাধনই কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু যতদিন না অন্তরে প্রভুকে প্রত্যক্ষ করিতে পারিলেন, ততদিন কিছুতেই কিছু হইল না। যাই অন্তরে তিনি পরমাত্মাকে দর্শন করিলেন, অমনি দিব্যচক্ষুলাভ হইল; প্রাণে ঈশ্বর-প্রেমের প্রবল বন্যা প্রবাহিত হইয়া আমিত্বকে ডুবাইয়া দিল; চিত্ত অধীর ও অবশ হইয়া চিত্তহারীর চরণে প্রণত হইল। প্রাণ প্রাণেশ্বর-পদে অর্পিত হইবার জন্যইতো সৃষ্ট হইয়াছে। প্রভু পাদপদ্মেই উহার থাকিবার প্রকৃত স্থান। সংসারের পায়ে টানাটানি করিয়া তাহাকে ফেল কোন মতেই সে থাকিতে পারিবে না। কে কবে সংসারে সুখী হইয়াছে? ষ্টিফেন ও লুথারের ন্যায় জড়বাদী, অভিমানী পণ্ডিতগণের অপ্রতুল পৃথিবীতে কোন কালেই ছিল না। ইন্দ্রিয় সুখ ও জ্ঞান চর্চ্চার আমোদ মানবাত্মার পিপাসা নিবারণের জন্য যে যথেষ্ট এই মত নূতন প্রচারিত হইতেছে না। কিন্তু মানবাত্মা পণ্ডিতের কথা শুনিয়া তৃপ্ত থাকিতে পারে না; তাহার প্রাণের মর্ম্ম স্থানে দিবানিশি এমন মধুর আহ্বান শ্রুত হইতেছে যে সে বাণী শুনিয়া মোহিত সাধকবৃন্দ চিরকালই পরমেশ্বরের চরণে সর্ব্বস্ব বলিদান দিতে বাধ্য হন। সে আহ্বান না শুনিয়া আত্মা কতদিন থাকিতে পারিবে? হায়! কবে আমরা ঈশ্বর প্রেমে এমন সুতীক্ষ্ণ রূপে আহত হইব যে সংসারে আর আমাদের আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না? কবে নীচ বাসনা ও অসার কামনা পরিহার পূর্ব্বক মহাজন অনুগত পন্থা অবলম্বন করিয়া প্রেমময়ের চরণে শরণাপন্ন হইব? কবে স্বার্থত্যাগ পূর্ব্বক একপ্রাণ হওত পরমাত্মাতে অখণ্ড যোগে মিলিত হইয়া স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিব? ঈশ্বর করুণ ব্রাহ্ম সমাজে সেই শুভদিন শীঘ্রই আবির্ভূত হউক। পৃথিবীতে প্রত্যেক উপাসক উপাস্য দেবতার চরণে চিরদাসত্বের অঙ্গীকার পত্র লিখিয়া দিন।

পূর্ণাঙ্গ উপাসনা।

আমরা ইতিপূর্ব্বে উপাসনা বিষয়ক একটী প্রবন্ধে বলিয়াছিলাম:—"জ্ঞান, প্রীতি, পবিত্রতাই যদি ধর্ম্মজীবনের লক্ষ্য হয়,—জ্ঞান, প্রীতি, পবিত্রতার সমষ্টিই যদি ধর্ম্মজীবন হয়, আর উপাসনাই যদি ধর্ম্মজীবনের প্রস্রবণ হয়, তবে তাহাকেই প্রকৃত উপাসনা বলি, যে উপাসনাতে প্রভূত পরিমাণে জ্ঞান, প্রীতি, পবিত্রতা অনুভূত হয়। কারণে যাহা নাই, কার্য্যে তাহা কোথা হইতে আসিবে? যে উপাসনাতে উজ্জ্বল ঈশ্বর দর্শন হয় না, হৃদয় প্রেমানন্দে উচ্ছ্বসিত হয় না, প্রাণে প্রবল পবিত্র আকাঙ্ক্ষার উদয় হয় না, সে উপাসনা প্রকৃত ধর্ম্মজীবন কিরূপে আনয়ন করিবে? জীবন্ত ঈশ্বর-বিশ্বাস, সুমধুর প্রেম-ভক্তি, উজ্জ্বল পবিত্রতা যদি জীবনে লাভ করিতে হয় তবে উপাসনাকালে এই সমুদায় ভাব গাঢ়রূপে অনুভব করা আবশ্যক, প্রভূত পরিমাণে লাভ করা আবশ্যক। উপাসনাকালে যত অধিক পরিমাণে বিশ্বাস, ভক্তি ও পবিত্রতা অনুভূত হইবে, কার্য্যগত জীবনে এই সমুদায় ভাব ততই বিস্তৃতরূপে ব্যাপ্ত হইবে। সুতরাং প্রকৃত উপাসনা তাহাকেই বলা যায় যাহাতে বিশ্বাস, ভক্তি ও পবিত্রতা প্রভূতরূপে উপলব্ধি হয়।" দেশ, কাল ও অবস্থাভেদে উপাসনার প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু যে প্রণালী জ্ঞানপ্রীতিপবিত্রতাসমন্বিত পূর্ণাঙ্গ ধর্ম্মজীবনকে লক্ষ্যস্থলে রাখে না, অথবা পূর্ণাঙ্গ ধর্ম্মজীবন লাভের পক্ষে যে প্রণালী উপযোগী নহে, সে প্রণালী প্রকৃত উপাসনা প্রণালী নামের উপযুক্ত নহে, এবং যে সাধক এরূপ অঙ্গহীন উপাসনা লইয়া পরিতৃপ্ত হন, তিনি নিশ্চয়ই ধর্ম্মজীবনের আনন্দ বুঝিতে পারেন নাই। উপাসনা প্রণালী যতই ভিন্ন ভিন্ন হউক না কেন, ইহার গঠন অন্ততঃ এরূপ হওয়া উচিত যে তাহা অবলম্বন করিলে উপাসনাকালে প্রভূতরূপে বিশ্বাস, ভক্তি ও পবিত্রতা অনুভূত হইতে পারে।

ব্রাহ্মসমাজে প্রচলিত আরাধনা-ধ্যান-প্রার্থনাসমন্বিত উপাসনা প্রণালী গভীর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার ফল। ইহা পূর্ণাঙ্গ ধর্ম্মজীবন লাভের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী। এই জন্যই আমরা ইহার বিশেষ পক্ষপাতী। আরাধনা, ধ্যান ও প্রার্থনা এই তিন অঙ্গের প্রত্যেকেই সাক্ষাৎ বা অসাক্ষাৎ ভাবে, অল্প বা অধিক পরিমাণে বিশ্বাস, প্রীতি ও পবিত্রতা লাভের সাহায্য করে। কিন্তু এক একটী অঙ্গ সাক্ষাৎভাবে এবং বিশেষ ভাবে ধর্ম্ম জীবনের এক একটী বিশেষ উপকরণ লাভে সাহায্য করে। আরাধনা বিশ্বাস, ভক্তি ও পবিত্রতা সমুদায় লাভেরই সাহায্য করে, কিন্তু ইহা বিশেষ ভাবে ভক্তিসাধনের উপায়। ধ্যান অল্পাধিক পরিমাণে বিশ্বাস, ভক্তি ও পবিত্রতা সমুদায়েরই সাধন, কিন্তু ইহা বিশেষভাবে জ্ঞান বা বিশ্বাসের সাধন। প্রার্থনা সাক্ষাৎ বা অসাক্ষাৎ ভাবে বিশ্বাস, ভক্তি ও পবিত্রতা সমুদায়ই আনয়ন করে, কিন্তু সাক্ষাৎভাবে ইহা পবিত্রতার আকর পবিত্র স্বরূপের সহিত ইচ্ছাযোগ সাধনের উপায়। অন্য কথায় বলিতে গেলে জ্ঞান-ভক্তি-পবিত্রতা-সমন্বিত পূর্ণাঙ্গ উপাসনার সম্বন্ধে ধ্যান জ্ঞানের দিক, আরাধনা ভক্তির দিক, আর প্রার্থনা পবিত্রতার দিক্। ধ্যানের সার উজ্জ্বল উপলব্ধি, আরাধনার সার উচ্ছ্বসিত ভক্তি, প্রার্থনার সার পবিত্র ইচ্ছাযোগ, ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ। প্রকৃত উপাসনাতে এই তিনটী ভাবই স্পষ্টরূপে এবং গভীর ভাবে থাকা আবশ্যক। কেহ কেহ বলিতে পারেন, এক প্রার্থনার ভিতরে তো বিশ্বাস, ভক্তি ও পবিত্রতার আকাঙ্ক্ষা তিনই আছে; ঈশ্বরে বিশ্বাস না

থাকিলে কেহ প্রার্থনা করে না, কিয়ৎপরিমাণে অনুরাগ বা প্রীতি না থাকিলেও প্রার্থনা হয় না, এবং পবিত্রতার আকাঙ্ক্ষা তো আছেই, তবে আর স্বতন্ত্রভাবে ধ্যান ও আরাধনা করিবার প্রয়োজন কি? এই কথার উত্তর এই যে, কেবল প্রার্থনাতে পবিত্রতার আকাঙ্ক্ষাই সাক্ষাৎ এবং বিশেষভাবে বর্ত্তমান, বিশ্বাস ও ভক্তির দিক্ কেবল অসাক্ষাৎ বা অস্পষ্টরূপে বর্ত্তমান; সুতরাং উজ্জ্বল বিশ্বাস ও উচ্ছ্বসিত ভক্তিলাভ করিতে হইলে ইহাদের সাক্ষাৎ-সাধনরূপী ধ্যান ও আরাধনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। সাধক জীবনের অভিজ্ঞতা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, যে জীবনে বা সম্প্রদায়ে একমাত্র ধ্যান সাধনেরই প্রবলতা, সে জীবনে বা সম্প্রদায়ে বিশেষভাবে জ্ঞানের উন্নতি হইয়াছে বটে কিন্তু ভক্তি ও ইচ্ছার দিক্ তাদৃশ উন্নত হয় নাই। যে জীবনে বা সম্প্রদায়ে কেবলমাত্র আরাধনা বা তৎস্থানীয় নাম সাধন ও গুণ কীর্ত্তণের প্রবলতা, সে জীবন বা সম্প্রদায়ে বিশেষ ভাবে ভক্তির উন্নতি হইয়াছে বটে কিন্তু জ্ঞান ও ইচ্ছার দিক্ তাদৃশ উন্নত হয় নাই। সেইরূপ, যে জীবন বা সম্প্রদায়ে কেবল প্রার্থনা সাধনেরই প্রবলতা, সে জীবন বা সম্প্রদায় ইচ্ছার পবিত্রতা ও কার্য্যকারিতায় বিশেষভাবে উন্নত হইয়াছে বটে, কিন্তু গভীর উপলব্ধি ও মধুর ভক্তিভাবে তাদৃশ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত ছাড়িয়া দিয়া, সাধারণভাবে বলিতে গেলে প্রাচীন বৈদান্তিকগণ প্রথম উক্তির, বৈষ্ণব সম্প্রদায় দ্বিতীয় উক্তির এবং খ্রীষ্ট শিষ্যগণ তৃতীয় উক্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থল। পূর্ণাঙ্গ ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে হইলে পূর্ণাঙ্গ উপাসনা সাধন করা আবশ্যক। উদার ব্রাহ্মধর্ম্মের উদার উপাসনা প্রণালীতে উপরোক্ত তিনটী বিধানের বিশেষ বিশেষ ভাবের সমন্বয় হইয়াছে। বৈদান্তিক যোগীর গভীর সমাধি, বৈষ্ণব ভক্তের মধুর গুণকীর্ত্তন, এবং খ্রীষ্টীয় সেবকের ব্যাকুল প্রার্থনা এই তিন সাধনাঙ্গই আমাদিগকে যত্নপূর্ব্বক সাধন করিতে হইবে।

সঙ্গতসভা।

চতুর্থ অধিবেশন।

গত ২১এ ভাদ্র মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭॥টার সময় সঙ্গতসভার চতুর্থ অধিবেশন হয়। বাবু আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করেন; বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সভাপতি ছিলেন। এবারেও উপাসনা সম্বন্ধে আলোচনা হয়। বাবু রজনীকান্ত নিয়োগী কথা আরম্ভ করেন। আলোচনার সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল;—

ক। উপাসনা ভাল করিবার জন্য গতবারে যে সকল উপায় গ্রহণের কথা হয়, 'সাধুজীবনে ঈশ্বরের প্রকাশ দর্শন' তাহার মধ্যে একটী উপায় বলিয়া উক্ত হইয়াছিল। যাঁহারা পরমেশ্বরকে অল্লাধিক পরিমাণে জানিয়াছেন তাঁহাদের এই উপায় দ্বারা যে উপকার হইবার সম্ভাবনা আছে তাহা স্বীকার করি। কিন্তু যাঁহারা ধর্ম্মজীবনে প্রথম প্রবেশ করিতেছেন তাঁহাদের পক্ষে এই উপায় গ্রহণে একটু বিপদের আশঙ্কা আছে। তাঁহারা মানবীয় ভাবকে ঐশ্বরিক ভাব মনে করিয়া নরপূজারূপ ভ্রমে পতিত হইতে পারেন। গতবারে যে সকল উপায়ের কথা বলা হইয়াছে তাহার মধ্যে অধিকাংশই শিক্ষিত লোকের পক্ষে উপযোগী। অশিক্ষিত লোকের পক্ষে উহার সমুদায়গুলি গ্রহণ করা সম্ভব নহে। তবে কি তাহাদের উপাসনা হইবে না? এতদ্ভিন্ন শিক্ষিত লোকেরও অনেক সময় ঐ সমস্ত উপায় অবলম্বন করিবার সুবিধা না হইতে পারে। পূর্ব্ববারের অলোচিত অধিকাংশ উপায়ই বাহিরের। পুস্তক পাঠ বা সাধুসঙ্গ দ্বারা যে সকল ভাব পাওয়া যায় তাহা ধার করা ভাব। তাহার সাহায্যে উপাসনা ভাল হইতে পারে বটে, কিন্তু সে উপাসনায় জীবনের স্থায়ী উপকার না হইতেও পারে। কেবল পরমেশ্বরের নিকট বসাই উপাসনা নহে, তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনও উপাসনার একটী অঙ্গ। এই দুইটী পরস্পরের সহায়তা করে। মন সংসারাসক্ত থাকিলে, বিষয় কামনা প্রবল থাকিলে, ঈশ্বর ভিন্ন অন্য লক্ষ্য থাকিলে উপাসনা ভাল হয় না। যে আকাঙ্ক্ষা প্রবল, মন সেই দিকেই যায়। তখন যেন ঈশ্বর চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দেন কি জন্য উপাসনার ব্যাঘাত হইতেছে। সত্যের দিকে মন আকৃষ্ট হইলে সত্যের সত্য পরমেশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা বৃদ্ধি পায়। সে অবস্থায় উপাসনা আপনা আপনি ভাল হয়। এই জন্য যে কারণে উপাসনার ব্যাঘাত হইতেছে বলিয়া জানিতে পারা যায় তাহা সর্ব্বাগ্রে দূর করা কর্ত্তব্য। ঈশা যেমন বলিয়াছেন, "ভ্রাতার প্রাণে যদি আঘাত করিয়া থাক, তবে অগ্রে তাহার সহিত বিবাদ মিটাইয়া তবে পরমেশ্বরের নিকট আসিও" অন্য ব্যাঘাত সম্বন্ধেও ঠিক্ সেইরূপ। মন কঠোর থাকিলে উপাসনা ভাল হয় না। মন কোমল ও সরল এবং নর নারীও জীবের প্রতি প্রীতিপ্রবণ থাকিলে উপাসনা ভাল হয়। কর্ত্তব্যে অবহেলা করিলে উপাসনা ভাল হয় না। প্রাণপণে কর্ত্তব্য পালনের চেষ্টা করিলে অনেক সময় যেখানে কর্ত্তব্যের পথ বুঝিতে পারিতেছি না সেখানে তাহা বুঝিবার জন্য মন ব্যাকুল হয়; বাধা বিঘ্নের মধ্যে পড়িয়া নিজের দুর্ব্বলতা বুঝিতে পারা যায় ও বল লাভের জন্য মন ব্যাকুল হয়; ভাল কাজ করিয়া আনন্দ হয় ও সেই আনন্দ বিধাতার সহবাসের ইচ্ছা বাড়ে। এইরূপে আপনা আপনি মন উপাসনার জন্য প্রস্তুত হয়। প্রকৃত উদ্বোধন সমস্ত জীবনব্যাপী। সমস্ত জীবন ভালভাবে চলিলে তবে উপাসনা ভাল হয়। নতুবা সাময়িকভাবের উত্তেজনায় কখন কখন উপাসনা ভাল হইতে পারে, কিন্তু তাহা জীবনের উপর কোন স্থায়ী চিহ্ন রাখিয়া যাইতে পারে না। উপাসনার দিকে যখন মন যাইতেছে না, তখন ঈশ্বরের সহিত আমার কি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহা চিন্তা করিলে মন উপাসনার জন্য ব্যাকুল হয় ও উপাসনা ভাল হয়। উপাসনার সময় আমরা যে প্রণাম করি তাহার মধ্যে একটী উচ্চভাব আছে। প্রণামের অর্থ কেবল মস্তক অবনত করা নহে। ইহার প্রকৃত অর্থ ঈশ্বরের চরণে আত্ম-সমর্পণ করা।

খ। যেমন আহারের জন্য ক্ষুধার প্রয়োজন তেমনি

উপাসনার জন্য ব্যাকুলতা অবশ্য প্রয়োজনীয়। নিজের পাপ অনুভব করিলে এবং সেই সঙ্গে ঈশ্বরের পবিত্রতা ও দয়া চিন্তা করিলে মনে অনুতাপের ভাব আসে ও উপাসনা ভাল হয়। নিজের জীবনের ঘটনাবলীর মধ্যে ঈশ্বরের দয়া উপলব্ধি করিলে ও তাহা স্মরণ করিয়া রাখিলে অনেক উপকার হয়। আর একদিকে উপাসনা ভাল করিতে হইলে জীবন ভাল করা চাই, আত্মশাসন চাই। এসম্বন্ধে কখন কি ভাবে ঈশ্বরের কৃপার সাহায্য পাই ভাবিয়া দেখিলে প্রত্যহ কিছু না কিছু সত্য পাওয়া যায় এবং ঐ সকল সত্য নিজের জীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া ধরিয়া থাকিতে পারিলে সমস্ত দিন উপাসনার ভাব, প্রার্থনার ভাব, যোগের ভাব অনুভব করা যায়। এইভাবে জীবন চালাইতে হইলে বিশেষ চিন্তাশীলতা প্রয়োজনীয় এবং যাহা সত্য বুঝিব প্রাণপণে তাহা পালন করিবার চেষ্টা করা আবশ্যক।

গ। প্রাকৃতিক শোভা দেখিলে ও তদ্বিষয় চিন্তা করিলে উপাসনা সম্বন্ধে বিশেষ সাহায্য হয়। যাহাদের বিদ্যা নাই তাহারাও ইহা হইতে সাহায্য লাভ করিতে পারে। প্রাকৃতিক শোভা দর্শন করিয়া অনেক সময় যে উপকার পাওয়া যায় এমন কি পুস্তক পাঠদ্বারাও তাহা পাওয়া যায় না।

ঘ। সাবধানে চলিলে সাধুজীবন আলোচনাদ্বারা সকলেই উপকার পাইতে পারেন। ধর্ম্মপুস্তকপাঠ, সাধুসঙ্গ ইত্যাদি হইতে পরের ভাব যাহা পাওয়া যায় তাহা সাময়িক হইলেও যে উহাতে স্থায়ী উপকার পাওয়া যায় না তাহা নহে। ঐ সকল উপায়দ্বারা মন কোমল হয় ও উপাসনার সাহায্য হয়। পরের ভাব আমাদের নিজের ভাবের উৎস খুলিয়া দেয়। এইত গেল উপাসনার জন্য প্রস্তুত হইবার সাময়িক উপায়। তাহার পর আর এক প্রকার প্রস্তুত হওয়া আছে যাহা দিবসব্যাপী। ইহার জন্য কর্ত্তব্যপালন, ঈশ্বরের সহিত যোগরক্ষা, ভালভাবে জীবন কাটাইতে না পারিলে উপাসনার ব্যাঘাত হইবে এইভাব সর্ব্বদা হৃদয়ে জাগ্রত রাখা ইত্যাদি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। গতবারে ঈশ্বরকে 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করা সম্বন্ধে কথা উঠিয়াছিল। আমার মনে হয় ঈশ্বরকে স্থানে 'তুমি' বলাও যায়, আবার প্রাণে 'তুমি' বলাও যায়। এই শেষভাব হৃদয়ঙ্গম করিলে উপলব্ধি উজ্জ্বলতর হয়। ঈশ্বরের কাছে নির্জ্জনে বসা উপাসনার একদিক্ বটে। কিন্তু প্রকৃত উপাসনার আদর্শ যাহা তাহা প্রেমের চরম অবস্থা—যে অবস্থায় মানুষ ঈশ্বরকে সমস্ত শক্তি ও প্রেমদিয়া পূজাকরে, যে অবস্থায় ঈশ্বরভক্তি ও ঈশ্বরসেবা প্রাণের স্থায়ী ভাব হইয়া দাঁড়ায়। ঈশ্বর সর্ব্বদা আমার চিন্তা ও কার্য্য পরিদর্শন করিতেছেন ইহা উজ্জ্বলভাবে উপলব্ধি করিতে পারিলে জীবন ভাল করিবার দিকে দৃষ্টি থাকে এবং উপাসনাও ভাল হয়।

ঙ। ভক্তির উদয় না হইলে ঈশ্বরকে স্পষ্ট কাছে বলিয়া মনে করা যায় না। আবার কাছে ভাবিতে ভাবিতে ভক্তির উদয় হয়। উপাসনা সংক্রান্ত যাহা কিছু সব পরস্পরের সাহায্যসাপেক্ষ। যেমন ভিজা কাঠ আগুণে দিলে যতই আগুণ তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে থাকে ততই কাঠ শুকাইয়া [illegible] আগুনের মত কাঠ শুকাইতে থাকে ততই আগুণ উহার ভিতর [illegible] প্রবেশ করিতে থাকে। ধর্ম্মজীবনের প্রারম্ভাবস্থায় আধ্যাত্মিক সত্তা উপলব্ধি করা কঠিন। ঈশ্বরকে স্থানে ধরিতেই হইবে পরমাত্মা আত্মাতে ইহা উন্নত অবস্থার কথা। কেশব বাবু তাঁহার একটী উপদেশে বলিয়া গিয়াছেন যে, উপাসনার সময় ঈশ্বরকে সম্মুখে উপস্থিত বলিয়া ভাবিতে হইবে।

চ। যাঁহার উপাসনা করিতেছি তাঁহার প্রকৃতস্বরূপ ভাবিলে মনের জড়তা চলিয়া যায়। যখন কোন বস্তু বা ব্যক্তি বিশেষের চিন্তা প্রযুক্ত মন বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, তখন মনে করিতে হইবে যে ঐ সকলেরও আধার পরমেশ্বর। ব্যাঘাতের মধ্যেও ঈশ্বরকে দেখিতে হইবে। ইহাই উদ্বোধন। এইরূপে ক্রমে যখন মন পরমেশ্বরে ডুবিয়া যায়, তখন দেশকালবোধ বিলুপ্ত হয় এবং তখনই ঈশ্বরকে 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করা যায়। এইভাব আরও গভীর হইলে সাধক একেবারে তন্ময় হইয়া যান। এই অবস্থায় সাধুদিগের বিষয় আলোচনা করিলে মনে হয় যেন তাঁহাদের মধ্যদিয়া ঈশ্বরের প্রেম আমার উপর আসিয়া পড়িতেছে।

ছ। আত্মাতে ঈশ্বরের আবির্ভাব একবিন্দু দেখিলে জীবন পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। 'আমি' বস্তুটা কি বুঝিলে ও তাহার মধ্যে ঈশ্বরের লীলা দেখিলে ঈশ্বরদর্শন কি ঠিক্ বুঝাযায়। তখন ঈশ্বরের প্রেম প্রত্যক্ষ অনুভব না করিয়াও শুদ্ধ তিনি আছেন ভাবিলেই প্রাণ ভাবস্রোতে ভাসিয়া যায়। উপাসনার তিনটী দিক্ আছে;—(১) জগতে হউক বা আত্মাতে হউক ঈশ্বরের আবির্ভাব উজ্জ্বলরূপে অনুভব করা চাই। কিন্তু আত্মাতে তাঁহাকে উপলব্ধি করাই প্রত্যক্ষ অনুভূতি। আমরা অনেক সময় ঈশ্বরকে না দেখিয়া প্রেম চাই। উজ্জ্বল বিশ্বাসের আলোকে যতদিন না ঈশ্বরকে দেখা যায় ততদিন সাময়িক মধুর ভাব আসিতে পারে, কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় না। ঈশ্বর দর্শন উপাসনার প্রধান উপকরণ, যতদিন ইহা না হয় ততদিন অন্য বিষয়ে না যাওয়াই ভাল। কেবল 'তুমি আছ', 'তুমি আছ' করিয়া ভাবিলে হইবে না। ঈশ্বরের আলোক মনন প্রভৃতি অনেকদ্বার দিয়া আমাদের হৃদয়ে আসে। সেই সকল দ্বার খুলিয়া দিতে হইবে। অনুভূতি এরূপ উজ্জ্বল হওয়া আবশ্যক যে আমি বিশ্বাস করিব না মনে করিলেও তাঁহার সত্তা আসিয়া আমাকে ধরিবে। (২) উপাসনার দ্বিতীয় উপকরণ প্রেম। ঈশ্বরের প্রেমের বিশেষ ঘটনা চিন্তা করা ভাল বটে, কিন্তু স্মৃতি সকল সময় তেমন উজ্জ্বল থাকে না। এইজন্য বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে আমার জীবনে তাঁহার প্রেম কিভাবে কার্য্য করিতেছে তাহা চিন্তা করাই অপেক্ষাকৃত প্রত্যক্ষতর উপায়। এইরূপ করিলে সংসারের প্রত্যেক বস্তু তাঁহার মূর্ত্তিমান্ প্রেম বলিয়া বুঝা যায়। পরে পূর্ব্ব ঘটনায় স্মৃতি আনা যাইতে পারে। (৩) তৃতীয়তঃ এই প্রেমের ভাব অনেকক্ষণ হৃদয়ে থাকা আবশ্যক। আমরা প্রায়ই অল্পসময় হাতে রাখিয়া উপাসনায় বসি। তাই ঈশ্বর আমাদিগকে আর একটু অপেক্ষা করিতে

বলিলেও আমরা চলিয়া আসি। এইজন্ত যথেষ্ট সময় হাতে রাখিয়া উপাসনায় বসা কর্ত্তব্য, এবং নিজের ইচ্ছামত উঠিয়া না আসিয়া ঈশ্বর স্বয়ং উঠিতে বলিলে তবে উঠা উচিত। ঈশ্বরের প্রেম ভাবিতে ভাবিতে অনেক সময় প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু যতক্ষণ প্রাণ সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত না হয়, যতক্ষণ না প্রাণ আরাধনা ও ধ্যানে ডুবিয়া যায়, ততক্ষণ প্রার্থনা করা উচিত নহে। প্রার্থনা সাধারণভাবে না করিয়া প্রাত্যহিক সমস্তপাপ ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত করা কর্ত্তব্য। আমাদের অনেক পুরাতন পাপ আছে; সে সমস্ত যে একদিনে যায় তাহা নহে। প্রত্যহ ঈশ্বরের নিকট পাপ স্বীকার ও বল ভিক্ষা করিতে করিতে উহাদের পরাক্রম কমিয়া যায়।

জ। বদ্ধ ঘরের মধ্যে বসিয়া থাকিলে তাহার বায়ু দূষিত হইয়াছে কি না বুঝা যায় না। কিন্তু বাহিরের পরিষ্কার বায়ু সেবন করিয়া আসিয়া বদ্ধ ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র উহার বায়ুর অপকৃষ্টতা বেশ বুঝিতে পারা যায়। সেইরূপ যে অবস্থায় পবিত্রতার বায়ু সেবন করা যায় সেই অবস্থায় আপনাকে না ফেলিলে নিজের জঘন্যতা বুঝা যায় না। আমরা তাহা না করিয়া কেবল তর্কযুক্তি করিয়া মরি। উপাসনা সাময়িক ভাব নহে। ইহা সমস্ত আত্মার ঈশ্বরপ্রবণতা। বাজিকর যেমন কলসী মাথায় করিয়া দড়ির উপর নানাবিধ ক্রীড়া করে, কিন্তু তাহার মনের সমস্ত একাগ্রতা সেই কলসীর দিকে থাকে। এমন অবস্থায় আপনাকে ফেলিতে হইবে যাহাতে পবিত্রতার প্রতি আকর্ষণ ও অপবিত্রতার প্রতি ঘৃণা হইতে পারে। বাহিরের উপায়েও যে স্থায়ী উপকার হয়না তাহা নহে। বাহিরের জিনিসকে আধ্যাত্মিক চক্ষে দেখিলে তাহাদ্বারা যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়। বাহিরের উপায় ধরিয়া সাধন করিতে করিতে তাহাতে সিদ্ধ হইলে সে উপায় ছাড়িয়া দিলেই হয়।

ঙ। মহাত্মা চৈতন্যও বিশ্বাস করিতেন যে যাহা পাইবার জন্ত সাধন, তাহা পাইলেই সাধন ছাড়িয়া দেওয়া যায়। এই জন্তই তিনি নীলাচলে অবস্থিতিকালে হরিদাসকে হরিনাম ছাড়িয়া দিতে বলিয়াছিলেন। বাহিরের উপায়েও স্থায়ী ফল পাওয়া যায়। যেমন অট্টালিকা প্রস্তুত করিবার জন্ত লোকে ভারা বাঁধে, পরে উহা প্রস্তুত হইলে ভারা খুলিয়া ফেলে, সেই রূপ সিদ্ধ হইলে বাহিরের উপায়ের আর প্রয়োজন থাকে না।

ঝ। উপাসনার অর্থ ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন। প্রীতি সাধন করিলে প্রিয়কার্য্য সাধনে মতি হয়, আবার প্রিয়কার্য্য সাধন করিলে প্রীতি হয়। আমরা কোন উপায়ই ভাল করিয়া গ্রহণ করি না বলিয়া, আমাদের উপাসনা ভাল হয় না। অধ্যবসায়ের সহিত একটা উপায় ধরিয়া থাকিতে পারিলেই যথেষ্ট। আমরা 'ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং' এই বাক্যের তাৎপর্য্য ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। নতুবা ইহা ধরিয়া থাকিতে পারিলে আর কিছুরই প্রয়োজন নাই। অন্তের সাহায্যের উপর নির্ভর না করিয়া নিজের নির্দ্ধারিত উপায়ের উপর নির্ভর করা উচিত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্ন উপাসনা হয় না এবং ব্রহ্মচিন্তাই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের একমাত্র উপায়। অবিশ্রান্ত প্রার্থনা ধরিয়া থাকিতে পারিলে সব ঠিক্ হইয়া যায়। আমি আছি, তিনি আছেন এবং তিনি ডাকিলে শুনেন, এই বিশ্বাস থাকিলেই যথেষ্ট।

প্রেরিত পত্র।

পত্রপ্রেরকদিগের প্রতি নিবেদন।

আমরা মধ্যে মধ্যে দুই একখানি স্বাক্ষরবিহীন পত্র পাইয়া থাকি। এরূপ পত্র যে সকল সময়ে প্রকাশিত হইবে তাহা আমরা বলিতে পারি না। পত্র প্রেরকগণের ইচ্ছা ব্যতীত তাঁহাদের নাম প্রকাশ করা হয় না। যদি কেহ নিজের নাম অপ্রকাশিত রাখিতে ইচ্ছা করেন, আমাদিগকে তাহা জানাইলেই হইতে পারে।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—কাশী।—আমাদের পত্রিকার সহিত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কোন সংস্রব নাই।

শ্রীশশিভূষণ মিত্র—ভান্ডাড়া।—ইনি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক বাবু নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভান্ডাড়ায় ধর্ম্মপ্রচার বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া উপসংহারে বলিয়াছেন, "হরিসভাগুলিকে প্রচারক্ষেত্র করা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একটী বিবেচ্য বিষয় হওয়া উচিত।" * * * "বিনা বিবাদে হিন্দু ও ব্রাহ্মধর্ম্মের মধ্যে সাধারণ ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতে পারিলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন প্রচারক অনেক কাজ করিতে সমর্থ হইতে পারেন।"

শ্রীগুরুচরণ সমাদার—ঢাকা।—আপনার পত্র যথাসময়ে আমাদের হস্তগত হয় নাই। আরও পূর্ব্বে পাইলে ১লা ভাদ্রের তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশ করিতে পারিতাম।

শ্রীউমানাথ মজুমদার—মৃজাফরপুর।—ব্রাহ্মবিবাহবিধি সংশোধনের প্রতিবাদ পত্র। ঠিক্ এইভাবের আর একখানি পত্র তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে।

শ্রী—ইটালি।—এ পত্রখানিও বিবাহবিধি সংশোধনের বিরুদ্ধে লিখিত। পত্রলেখক ব্রাহ্মবিবাহ সম্বন্ধীয় মূল বিধিরই বিরোধী। ইনি সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের উপরেও একটু কটাক্ষ করিয়াছেন। ইহাঁর বোধ হয় স্মরণ নাই যে, যখন ১৮৭২ সালের ৩ আইন প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়, তখন সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের জন্মও হয় নাই। সে যাহা হউক, ইনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন 'আইন না হইলে কি বিবাহ হয় না?' হইবে না কেন? কিন্তু যিনি ব্রাহ্মমতে বিবাহ করিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সন্তানদিগকে বঞ্চিত করিয়া তদীয় ত্যক্ত সম্পত্তি লাভ করিবার জন্য তাঁহার নিকট সম্পর্কীয় কোনও হিন্দু আত্মীয় যদি আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করে, তবে কোন্ আইনের বলে মৃত ব্যক্তির সন্তানগণ বিষয় রক্ষা করিবে, পত্রপ্রেরক কি তাহা বলিতে পারেন? আইন আবার ধর্ম্মের নামে পরিচিত হইবে কি? এক এক সম্প্রদায়ের জন্য এক একটী স্বতন্ত্র আইন করিতে হইলে রাজকর্ম্মচারীদিগকে সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ব্যবস্থা প্রণয়ন লইয়াই থাকিতে হয়। এই জন্তই গবর্ণমেণ্টকে এরূপ সাধারণ ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান

হইয়া আইন প্রস্তুত করিতে হয় যাহাতে উহা সর্ব্বসাধারণের উপযোগী হইতে পারে।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ সেন—সেরাজগঞ্জ।—আপনার প্রশ্নের উত্তর স্বতন্ত্র ডাকযোগে পাঠাইব।

ব্রাহ্ম সমাজের আশ্রিতা কোন মহিলা—ফরিদপুর।—আপনার কবিতা লেখার প্রণালীতে এখনও অনেক দোষ আছে, সেগুলি অগ্রে সংশোধন করিতে চেষ্টা করুন।

শ্রীধর ঘোষ—সদরদী।—জাতিভেদ প্রভৃতি সম্বন্ধে ব্রাহ্মধর্ম্মের মত যেরূপ তাহাতে যে অনেক স্থলে আমাদিগকে হিন্দু সমাজের বিরাগভাজন হইতে হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? সকল বিষয়েই যে আমরা সকলকে সন্তুষ্ট করিতে পারিব, এরূপ আশা করা বৃথা। তবে প্রচারদ্বারা ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে লোকের ভ্রান্ত সংস্কার দূর করিবার চেষ্টা করা উচিত বটে। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারকসংখ্যা যেরূপ অল্প, তাহাতে ব্রাহ্ম সাধারণ এ সম্বন্ধে কতক ভার গ্রহণ না করিলে বর্ত্তমান অবস্থায় উপায়ান্তর নাই। আপনি যে বিবাহঘটিত মোকদ্দমার কথা লিখিয়াছেন, তাহার সহিত ১৮৭২ সালের ৩ আইনের কি সম্পর্ক আছে, বুঝিলাম না।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জনৈক সভ্য—ফরিদপুর।—"নব্যভারত" পত্রিকার "যৌবনবিবাহ ও ব্রাহ্মসমাজ" শীর্ষক প্রস্তাবের লেখক যেরূপ অবিবেচনা, একদেশদর্শিতা, কুৎসাপ্রিয়তা ও বালকত্বের পরিচয় দিতেছেন, তাহাতে তাঁহার লেখনীনিঃসৃত প্রলাপবাক্যের প্রতিবাদ করা সদ্বিবেচনার কার্য্য নহে। এই জন্য আপনার পত্র প্রকাশ করা উচিত বোধ হইল না।

দরিদ্র ব্রাহ্মগণের ভবিষ্যৎ দুঃখ কথঞ্চিৎ নিবারণের একটী সহজ উপায়।

পিতামাতা বা আত্মীয় স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত দরিদ্র ব্রাহ্মের মৃত্যুতে তাঁহার অনুপায় স্ত্রী পুত্রাদিকে যে কি ভয়ানক দুঃখে পতিত হইতে হয় তাহা কাহারও অবিদিত নাই। হয় সেই দুঃখিনী বিধবা উপায় অভাবে তদীয় ধর্ম্মমতবিরোধী আত্মীয় স্বজনের আশ্রয় লইয়া ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য হন, অথবা সেরূপ আত্মীয় স্বজন না থাকিলে কিম্বা ধর্ম্মকে রক্ষা করিবার অন্তরিক ইচ্ছা থাকিলে, কোন সঙ্গতিপন্ন ব্রাহ্মের দয়ার পাত্রী হইয়া, অতিকষ্টে সন্তানাদি লইয়া দিন যাপন করেন। সুতরাং দরিদ্র ব্রাহ্মসন্তানেরা যথোপযুক্ত শিক্ষার অভাবে হীন হইয়া পড়িতেছে, এবং এইরূপ অবস্থায় আর কিছুকাল থাকিলে তাহাদের অবস্থা আরও শোচনীয় হইবে তাহা নিশ্চয়। ব্রহ্মসমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ যে এ বিষয়ে উদাসীন তাহা নহে। কিন্তু এ সম্বন্ধে অদ্যাপি বিশেষ কোনও উপায় অবলম্বিত হয় নাই।

ব্রাহ্মসমাজে ধনবানের সংখ্যা অতি অল্প; দরিদ্রের সংখ্যাই অধিক। এইজন্য সকলেরই চিন্তা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য যে, তাঁহাদের অভাবে তাঁহাদের স্ত্রীপুত্রাদির কি উপায় হইবে? এ বিষয় সম্বন্ধে যেমন প্রতি পিতামাতার চিন্তা করা কর্ত্তব্য, সেইরূপ ব্রাহ্মসমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণের এবং ব্রাহ্মসমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী প্রতিজনেরই চিন্তা করা উচিত। এই গুরুতর বিষয়ে উদাসীন হইলে, ব্রাহ্ম সন্তানগণের জ্ঞান ধর্ম্ম ও সাংসারিক উন্নতির পথ অবরোধ করিয়া রাখা হইবে। ব্রাহ্ম সন্তানগণ অসহ্য দারিদ্র্যদুঃখনিবন্ধন দুর্নীতিপরায়ণ হইবে এবং ব্রাহ্মসমাজও ইহাদিগের দ্বারা কলঙ্কিত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে। এইজন্য অভিভাবকহীন দরিদ্র ব্রাহ্ম পরিবারের ভবিষ্যৎ উপায় সম্বন্ধে চিন্তা করা ব্রাহ্ম মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

দরিদ্রের পক্ষে অর্থ সঞ্চয় সামান্য কথা নহে। যাঁহাদের উপার্জ্জিত অর্থে অতি কষ্টে দিন অতিবাহিত করিতে হয়, তাঁহাদের পক্ষে অর্থ সঞ্চয় বড় সহজ ব্যাপার নহে। তথাচ ভবিষ্যতের জন্য কোন সহজ উপায় অবলম্বন না করিলে অধিকতর দুঃখ ভোগ করিতে এবং প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে।

যদি ধনী ব্রাহ্মগণ দুঃখী ভাই ভগ্নীগণের দুঃখ দূর করিবার জন্য আন্তরিক যত্ন করেন, এবং দরিদ্র ভ্রাতৃগণ পরস্পরের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি প্রদর্শন পূর্ব্বক নিম্নলিখিত উপায়টী অবলম্বন করেন, তাহা হইলে দরিদ্রগণের ভবিষ্যৎ দুঃখের কথঞ্চিৎ লাঘব হইতে পারে। সেই সহজ উপায়টী এই :—

ব্রাহ্ম সাধারণে ভবিষ্যতের নিমিত্ত এইরূপ নিয়ম করিয়া একটী ফণ্ড সংস্থাপন করিতে পারেন যে, যিনি এই ফণ্ডের চাঁদাদাতৃশ্রেণী-ভুক্ত হইতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহাকে প্রবেশ ফি স্বরূপ ন্যূনাধিক একটাকা এবং ইহার বিবিধ ব্যয় নির্ব্বাহার্থও ভবিষ্যৎ দুর্ঘটনা নিবারণার্থ চাঁদাদাতৃগণের বয়ঃক্রমানুসারে নির্দ্ধারিত মাসিক চাঁদা যাবজ্জীবন দিতে হইবে এবং চাঁদাদাতৃগণের মধ্যে যখন কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইবে, তখন জীবিত চাঁদাদাতৃগণের প্রত্যেককে ন্যূনাধিক এক টাকা হারে প্রদান করিতে হইবে। এই সংগৃহীত অর্থ মৃত চাঁদাদাতার পূর্ব্ব নির্দ্দেশ অনুসারে তাঁহার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, বা তাঁহার পরিবারস্থ কোন গুরুজন কিম্বা স্নেহভাজন ব্যক্তিকে এককালে বা মাসিক কিছু কিছু করিয়া দেওয়া হইবে। যদি এই চাঁদাদাতার জীবদ্দশায় তাঁহার নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তিনি ক্রমান্বয়ে একের অভাবে পরিবারস্থ অপর ব্যক্তির নাম নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন। অথবা তাঁহার ঐরূপ কোন অতি নিকট-সম্পর্কীয় ব্যক্তি না থাকিলে, তিনি কেবল ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতিকল্পে ব্রাহ্মসমাজে, প্রচার বিভাগে কিম্বা এই ফণ্ডের উন্নতির জন্যই ঐ টাকা দান করিতে পারিবেন। এবম্বিধ নিয়ম করিলে কাহাকেও নিরাশ হইতে হইবে না। এই সহজসাধ্য উপায়টী অবলম্বন করিলে, ব্রাহ্ম সাধারণের পরিবারবর্গের ভবিষ্যৎ দুঃখ নিবারণের কথঞ্চিৎ উপায় করিয়া রাখা হইবে, অথচ দরিদ্রগণের ইহাতে বিশেষ অসুবিধা হইবে না।

যদি কলিকাতা এই ফণ্ডের প্রধান কার্য্য স্থান হয়, এবং ব্রাহ্মসাধারণের ইচ্ছা ও কার্য্যের সুবিধার নিমিত্ত তিনটী ব্রাহ্মসমাজে তিনটী বা সভ্যদের মতানুসারে চালিত একটী

অথবা তিনটী সমাজের মধ্যে কোন একটীর সংস্রবে একটী ফণ্ড সংস্থাপিত হয়, এবং প্রদেশীয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক বা উপাচার্য্যগণ এজেণ্ট নিযুক্ত হইয়া, সভ্যগণের নিকট হইতে মাসিক চাঁদা ও সাময়িক দান (death call) আন্তরিক যত্নের সহিত আদায় করিয়া যথা সময়ে প্রেরণ করিবার ভার গ্রহণ করেন, তাহা হইলে ফণ্ডটী যে সুনিয়মে এবং সুশৃঙ্খলার সহিত চলিবে তাহা নিশ্চয়। এই ফণ্ড যে ব্রাহ্ম সাধারণের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা, প্রেম, সহানুভূতি ও নিঃস্বার্থতা বৃদ্ধির অন্যতম উপায় স্বরূপ হইবে, তাহা বলা বাহুল্য।

ব্রাহ্ম সাধারণের নিকট বিনীত নিবেদন যে, তাঁহারা অনুগ্রপূর্ব্বক সত্বর এ বিষয় চিন্তা করিয়া আপনাদের মতামত পত্রদ্বারা তত্ত্বকৌমুদী-সম্পাদক মহাশয়কে জ্ঞাত করিয়া, ফণ্ড সংস্থাপনে বিশেষ উদ্যোগী হন।

শেষ নিবেদন এই যে, "পরদুঃখ-কাতরতা" যদি ইহার ভিত্তি হয়, এবং "পরদুঃখ মোচন" রূপ সাধু ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত হইয়া যদি সকলে এই ফণ্ড সংস্থাপন করেন, এবং কিছুকাল কার্য্যের পর দৈব দুর্ঘটনায়—এককালে বহুজনের মৃত্যুতে যদি ফণ্ডটী উঠিয়াও যায়, তাহাতেও বিশেষ ক্ষোভের বিষয় কিছু নাই। অন্ততঃ কয়েকজন ভ্রাতাভগ্নীর উপকার হইয়াছে, ইহা স্মরণ করিলেও ত মন সুখী হইবে। সে যাহা হউক এ সম্বন্ধে একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে ক্ষতি কি?

এই ফণ্ডের বিশেষ বিবরণ যাঁহারা জানিতে চাহেন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক ১২৯৩ সালের ২৪এ মাঘ তারিখের ৪১শ সংখ্যক এবং ৮ই ফাল্গুণের ৪৩শ সংখ্যক সঞ্জীবনীতে "ভবিষ্যৎ চিন্তা কথঞ্চিৎ লাঘবের একটী সহজ উপায়" ও "দুঃখী পরিবারের সম্বল" নামক প্রবন্ধ দুইটী দেখিবেন। নিবেদন ইতি।

কোচবিহার। একজন দরিদ্র।

[পত্রখানি অত্যন্ত দীর্ঘ বলিয়া আমরা ইহার কোন কোন অনাবশ্যক অংশ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলাম।—ত, কৌ, স।]

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকের পক্ষে বিদ্বান হওয়া, জ্ঞানী হওয়া অত্যাবশ্যক কি না এ সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হইতেছে। "বিদ্যা" বা "জ্ঞান" শব্দটীর ভিন্ন ভিন্ন অর্থ এই মতভেদের আংশিক কারণ। উপস্থিত বিষয়ে কোন্ "বিদ্যা" কোন্ "জ্ঞানের" কথা হইতেছে? অবশ্য ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় জ্ঞানেরই কথা হইতেছে। ব্রহ্মবিদ্যা বা পরাবিদ্যার কথাই হইতেছে। যে বিদ্যা বা জ্ঞানের সহিত ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই সে বিদ্যা, সে জ্ঞান ধর্ম্ম প্রচারকের থাকা না থাকাতে বিশেষ ক্ষতি লাভ নাই। কিন্তু পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যা সাধারণতঃ ভিন্ন ভিন্ন হইলেও কোন কোনও অপরাবিদ্যার সহিত পরাবিদ্যার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। পরাবিদ্যা কিয়ৎপরিমাণে অপরাবিদ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। 'ঈশ্বর' বলিলে আমরা জড় ও জীবের আধার পরমাত্মাকে বুঝি; সুতরাং জড় ও জীবের আধারকে জানিতে হইলে [illegible] জড় ও জীব সম্বন্ধীয় মূলতত্ত্ব অবগত হওয়া একান্ত আবশ্যক। সুতরাং কিয়ৎপরিমাণে পদার্থ-জ্ঞান ধর্ম্ম জ্ঞানেরই অন্তর্গত। ধর্ম্ম-জ্ঞান আবার দুইপ্রকার—(১) ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে সূক্ষ্মদৃষ্টি (insight)—ধর্ম্মতত্ত্বের সত্যতা গাঢ়রূপে উপলব্ধি করা,—পরিষ্কাররূপে বুঝা; (২) ধর্ম্মসম্বন্ধে সংবাদ জানা (information),—ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মমত ও প্রণালী অবগত হওয়া। এই দুটী বস্তু এক নহে, এবং ইহাদের মূল্যেরও তারতম্য আছে। প্রথমোক্ত বস্তুটী—ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে সূক্ষ্মদৃষ্টি—ধর্ম্মপ্রচারকের পক্ষে থাকা একান্ত আবশ্যক,—না থাকিলেই নয়। যিনি নিজে সত্য দেখেন নাই, বুঝেন নাই, তিনি অন্যকে কিরূপে সত্য দেখাইবেন, বুঝাইবেন? যাঁহার নিজের সন্দেহ দূর হয় নাই, তিনি কিরূপে অন্যের সন্দেহ ভঞ্জন করিবেন? দ্বিতীয় বস্তুটীর মূল্য প্রথমটী অপেক্ষা অল্প হইলেও ইহার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। প্রথমতঃ ধর্ম্মসম্বন্ধে সূক্ষ্ম দৃষ্টি অনেক পরিমাণে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সংবাদ জানার উপর নির্ভর করে। বিবিধ মতের সংঘর্ষণেই বিশেষরূপে চিন্তাশক্তি জাগ্রত হয়। দ্বিতীয়তঃ, ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী লোকদিগের পূর্ব্বসংস্কার দূর করিয়া তাহাদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাসী করিতে হইলে ধর্ম্মপ্রচারকের পক্ষে তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন মত জানা আবশ্যক, সেই সকল মতের জটিলতার ভিতর প্রবেশ করা আবশ্যক। ধর্ম্মপ্রচারক একজন অতি পারদর্শী পদার্থবিজ্ঞানবিৎ বা মনোবিজ্ঞানবিৎ না হইতে পারেন, কিন্তু পদার্থবিজ্ঞান বা মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহার এতটুকু জ্ঞান থাকা আবশ্যক যাহাতে তিনি আধুনিক শিক্ষা ও বিজ্ঞানাভিমানী সন্দেহবাদীদিগের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় আপত্তি সকল বুঝিতে পারেন এবং খণ্ডন করিতে পারেন। ইহা না করিতে পারিলে তাঁহাকে এই শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে হইবে।

কেহ কেহ বলেন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকের পক্ষে জ্ঞান তাদৃশ আবশ্যক নহে; দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলেই যথেষ্ট। এই কথার ভিতরে একটী গুরুতর ভ্রম আছে, এই ভ্রম অনেক অনিষ্টের মূল। "বিশ্বাস থাকিলেই যথেষ্ট?" কিরূপ বিশ্বাস? না জানিয়া, না দেখিয়া পরীক্ষা না করিয়া যে বিশ্বাস, সেই বিশ্বাস? এই বিশ্বাসের মূল কি? এই বিশ্বাস আর কুসংস্কারে প্রভেদ কি? না জানিয়া, না দেখিয়, কেবল শাস্ত্র, বা মহাপুরুষের বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া একপ্রকার বিশ্বাস হয়; অন্য ধর্ম্মে এই বিশ্বাসের মূল্য আছে, ব্রাহ্মধর্ম্মে ইহার কোন মূল্যই নাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে বিশ্বাসকে মূল্যবান্ মনে করেন, সে বিশ্বাস বিশুদ্ধ জ্ঞানগত বিশ্বাস—আধ্যাত্মিক সূক্ষ্মদৃষ্টি ও অভিজ্ঞতা-জাত বিশ্বাস। ব্রাহ্মধর্ম্মের চক্ষে জ্ঞান ও বিশ্বাসে কোন প্রভেদ নাই। প্রকৃত বিশ্বাস লাভ করিতে হইলে প্রকৃত জ্ঞান চাই, আর প্রকৃত জ্ঞান পাইলে বিশ্বাস হইবেই হইবে। অনেকে হয়ত বলিবেন সহজজ্ঞানগত একপ্রকার স্বাভাবিক বিশ্বাস আছে যাহা উচ্চতর জ্ঞানের অপেক্ষা রাখে না। হাঁ, আছে, কিন্তু সে বিশ্বাস তো ব্রাহ্ম, হিন্দু,

মুসলমান, খ্রীষ্টান, এমন কি অসভ্য প্রেতোপাসক এণ্ডামানবাসীরও আছে। এই সম্বন্ধে ইহাদের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। সহজজ্ঞানগত বিশ্বাস যেমন সভ্য শিক্ষিত ব্রাহ্মের আছে, তেমনি অশিক্ষিত অসভ্য এণ্ডামানবাসীরও আছে। কেহ কি বলিতে চান যে এণ্ডামানবাসীর সহজজ্ঞানগত স্বাভাবিক বিশ্বাসই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকের পক্ষে যথেষ্ট ? এরূপ বোধ হয় কেহই বলিবেন না। কিন্তু সহজজ্ঞানগত বিশ্বাসে তাহাতে আর ব্রাহ্মেতে কোন প্রভেদ নাই,—প্রভেদ যত তাহা উচ্চতর জ্ঞানগত বিশ্বাসে। সহজজ্ঞানগত নৈজিক বিশ্বাস সকল ধর্ম্মেই আছে; ব্রাহ্মধর্ম্মের পার্থক্যও শ্রেষ্ঠতা সেস্থলে নহে। ব্রাহ্মধর্ম্মের পার্থক্য ও শ্রেষ্ঠতা উচ্চতর জ্ঞানগত বিশ্বাসে। যিনি ব্রাহ্মধর্ম্মকে জ্ঞান দ্বারা লাভ না করিয়া কেবল অন্ধভাবে বিশ্বাস করেন, তিনি ব্রাহ্মনামধারী হইয়াও কুসংস্কারাপন্ন ধর্ম্মের পক্ষপাতী, তিনি নামে স্বাধীন হইয়াও কার্য্যে শাস্ত্র ও লোকবাক্যের উপর নির্ভর করেন। কেবল আত্মপ্রত্যয়ের দোহাই দিলে চলিবে না, প্রত্যেক ব্রাহ্মকে পরীক্ষা দ্বারা দেখিতে হইবে যে ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য সমূহ আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ, অনতিক্রমণীয়, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়। প্রত্যেক ব্রাহ্মের পক্ষেই যখন এতটুকু জ্ঞানের প্রয়োজন, তখন প্রচারকের পক্ষে আরো কত অধিক জ্ঞান আবশ্যক। প্রচারককে কেবল বিশ্বাসী হইলে চলিবে না, তাঁহাকে অন্যের মনে বিশ্বাস জন্মাইতে হইবে। অন্যের মনে বিশ্বাস জন্মাইতে না পারিলে তাঁহার বিশ্বাস অন্য লোকের পক্ষে বিশেষ কার্য্যকর হইবে না। অন্যের বিশ্বাস দেখিয়া বিশ্বাস করিবার দিন ক্রমেই চলিয়া যাইতেছে। না বুঝিয়া বুদ্ধিমান লোক এখন আর বিশ্বাস করে না। এখন বিশ্বাস জন্মাইতে গেলে নিজে জ্ঞানী হওয়া চাই এবং অন্যের জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত করা চাই। এই জ্ঞান গভীর চিন্তা-সাপেক্ষ। গভীর চিন্তা ব্যতীত ধর্ম্মের সত্য সমূহ কুসংস্কারমুক্ত হইয়া উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হয় না। চিন্তার সাহায্যের জন্য প্রাচীন ও আধুনিক জ্ঞানী সাধকদিগের অর্জ্জিত অভিজ্ঞতা জানাও আবশ্যক। অন্ধভাবে তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস করিব না, কিন্তু তাঁহাদের বহুকালব্যাপী সাধন ও অভিজ্ঞতার সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। এরূপ সাহায্য না পাইলে মানবের ধর্ম্মোন্নতি যে কত অল্প ও মন্দগতি হইত তাহা কল্পনাও করা যায় না। কিন্তু এরূপ সাহায্য বঙ্গীয় সাহিত্যে অতি অল্পই আছে। বঙ্গভাষা ব্রহ্মজ্ঞান এবং ব্রহ্মসাধন বিষয়ক গ্রন্থ বিষয়ে নিতান্তই দরিদ্র। এই বিষয়ে সংস্কৃত সাহিত্য, এবং (আধুনিক জার্ম্মাণ ও প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যের ফলভাগী বলিয়া) ইংরেজি সাহিত্য মহাধনী। ধর্ম্মপ্রচারকের পক্ষে এই দুই ভাষা, বিশেষতঃ উন্নতিশীল ইংরেজি ভাষা শিক্ষা করা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

সংবাদ।

ঢাকা ছাত্রসমাজ ;—বিগত ১১ই ও ১২ই সেপ্টেম্বর রবিবার ও সোমবার ঢাকা ছাত্রসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। রবিবার প্রাতঃকালে পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন আচার্য্যের কার্য্য করেন ও 'ব্রহ্মপূজা' সম্বন্ধে উপদেশ দেন। অপরাহ্নে সঙ্কীর্ত্তন হয়। বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস সায়ংকালীন উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। সোমবার সায়ংকালে পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন 'জড়বাদ ও আধ্যাত্মিকতা' সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন।

কুমারখালী ব্রাহ্ম সমাজ ;—কুমারখালী ব্রাহ্ম সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে ;—

১৪ই আশ্বিন, শুক্রবার,—প্রাতঃকালে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত হরিনাথ মজুমদার। অপরাহ্ন ৪টার সময় নগর সঙ্কীর্ত্তন। সায়ংকালে উপাসনা; আচার্য্য পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন; উপদেশের বিষয় 'ঈশ্বর দর্শন'।

১৫ই আশ্বিন, শনিবার,—প্রাতে সম্পাদকের গৃহে পারিবারিক উপাসনা। সায়ংকালে সমাজে উপাসনা; উপদেশের বিষয়,—'সংসার অসার, ঈশ্বর সার।' উভয়ত্রই পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন আচার্য্যের কার্য্য করেন।

১৬ই আশ্বিন, রবিবার,—মৃত রামধন মজুমদার মহাশয়ের গৃহে উপাসনা। 'ঈশ্বরে মিলিত হইলে সে মিলন ইহপরকালে বিচ্ছিন্ন হয় না'—এই মর্ম্মে উপদেশ প্রদত্ত হয়। সায়ংকালে সমাজে উপাসনা। উপদেশের বিষয়,—'নিজের নিরাশ্রয়ত্ব অনুভব করিয়া ঈশ্বরের আশ্রয় না লইলে ধর্ম্ম হইতে পারে না।' উভয়স্থলেই পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন আচার্য্যের কার্য্য করেন।

উপাসনা উপদেশাদি ভিন্ন নিত্য ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনা হইয়াছিল।

সঙ্গত সভা ,—ইহার কার্য্য আপাততঃ বন্ধ আছে। কার্ত্তিক মাসের প্রথম মঙ্গলবার পুনরায় ইহার কার্য্যারম্ভ হইবে।

ভ্রম সংশোধন।—তত্ত্বকৌমুদীর গত ১৬ই ভাদ্রের সংখ্যায় সঙ্গত সভার যে কার্য্যবিবরণ বাহির হইয়াছিল, সেটী "মেসেঞ্জারে" প্রকাশিত ইংরেজি কার্য্যবিবরণের ভাব গ্রহণে লিখিত হইয়াছিল। একটী বন্ধু আমাদিগকে দেখাইয়া দিয়াছেন যে আমাদের প্রকাশিত বিবরণটী সকল স্থানে ইংরেজির অনুরূপ হয় নাই, কোন কোন স্থলে কিঞ্চিৎ ভাবের ব্যত্যয় হইয়াছে। উক্ত কার্য্যবিবরণের ৭ম সংখ্যক পেরাগ্রাফে এই কয়েকটী ভ্রম হইয়াছে :—১ম ও ২য় পংক্তি—"ধর্ম্মজীবনে প্রার্থনার উপকারিতা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না" ইহার স্থলে এইরূপ হইবে—"প্রার্থনার প্রকৃত ক্ষেত্র যাহা, সেখানে প্রার্থনার আবশ্যকতা এত অধিক যে তৎসম্বন্ধে অত্যুক্তি অসম্ভব।" ১০ম পংক্তির পর এই বাক্যটী বসিবে :—"তেমনি আধ্যাত্মিক জগতেও নিয়ম আছে; সমস্ত আধ্যাত্মিক মঙ্গল ঈশ্বর হইতে আসে, কিন্তু সমস্ত প্রার্থনা দ্বারা লাভ করা যায় না।" ১১শ—১৩শ পংক্তির স্থলে এইরূপ হইবে:—"কোন কোন বিষয় লাভের পক্ষে প্রার্থনাই একমাত্র উপায়; প্রার্থনাই সে স্থলে নিয়ম।" ১৩শ পংক্তি :—"এমন অনেক বিষয় আছে" ইহার স্থলে—"এমন কোন কোন বিষয় আছে" এইরূপ হইবে। ১৯শ পংক্তিতে "সাধুসঙ্গ" স্থলে "আধ্যাত্মিক বিষয়ে অভিজ্ঞ লোকদিগের সহিত প্রসঙ্গ" হইবে।

ক্ষমা প্রার্থনা ;—কতকগুলি ব্যাঘাত নিবন্ধন এবার তত্ত্বকৌমুদী মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতে অযথা বিলম্ব হইয়াছে। তজ্জন্য আমরা গ্রাহকগণের নিকট সানুনয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

১৩ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিসন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র দত্ত দ্বারা ২১শে আশ্বিন মুদ্রিত ও ২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১০ম ভাগ।
১৩শ সংখ্যা।

১লা কার্ত্তিক সোমবার, ১৮০৯ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৮

বাৎসরিক অগ্রিমমূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

পূজার আয়োজন।

বিভাস ঝাঁপতাল।
('হৃদয় কুটীর মম'—সুর)

কোথা হে করুণাময়, মঙ্গলের প্রস্রবণ,
অনাথ তনয়ে নাথ! দাও দাও দরশন।
হৃদয়ের রাজা তুমি আমি হে তোমার,
সুখশান্তিদাতা তুমি, তুমি প্রাণাধার;
(আমি) তোমারি কারণে নাথ! ধরি এ জীবন।
(তুমি) দয়াকরি' দিয়ে মোরে দেহ প্রাণমন,
নিয়ত করি'ছ কত সুখের আয়োজন;
কে আছে জগতে আর তোমার সমান?
স্মরিলে তোমার প্রেম গলে হে পাষাণ;
(আমি) কি দিব তোমারে নাথ! আছে হেন কিবা ধন?
(আমি) চারিদিকে যাহা কিছু করি দরশন,
অশন বসন কিম্বা প্রিয় পরিজন——
পুত্র কন্যা বন্ধু সব—তোমার প্রসাদ;
কি যাচিব তব ঠাঁই? কর আশীর্ব্বাদ——
যেন সঁপিতে পারিহে আমি তব পদে প্রাণ মন।

তুমি কেন আমাকে ডাকিলে? আমি বেশ তো সংসারের কোলাহলে বধির হইয়া বসিয়াছিলাম, অসার চিন্তার উৎপীড়নে তোমাকে বিস্মৃত হইয়া ইন্দ্রিয়সুখে মগ্ন হইতেছিলাম। তুমি ডাকিয়াই তো আমার সংসারের সকল সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিলে। আমি কি পুণ্য করিয়াছি, যে পুণ্য ফলে আজ তোমার আহ্বান তোমার মন্দিরে আমাকে বন্দী করিয়া লইয়া গেল? এমনই অতর্কিত ভাবে লইয়া গেল যে, আমি জানিতে পর্য্যন্ত পারিলাম না। এই সংসারের ভাবনায় দগ্ধ হইতেছিলাম, এই দেখি যে একেবারে তোমার চরণের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইতেছি; বিরক্তির সমুদ্রে মগ্ন প্রায় আত্মাকে নিমেষে অত্যুচ্চ প্রাসাদের শিখরে আনয়ন করিলে! প্রভু এমনই করিয়া কি পাপীর প্রাণ মজাইতে হয়? একেবারেই পণ করিয়াছ যে, আমাকে মুক্ত করিবে, নহিলে বারে বারে তোমার সহবাসের অপূর্ব্ব মধুরতা সম্ভোগ করিতে দিতেছ কেন? তোমার আহ্বান শুনাইয়া যদি কৃতকৃতার্থই করিলে, তবে আমার কাণের এমনই সংস্কার কর যে, এখন অবধি তোমার আহ্বান ভিন্ন অন্য ধ্বনি যেন শুনিতে না পাই! যে মধুরতা আস্বাদন করাইয়া পরিতৃপ্ত ও গৌরবান্বিত করিলে, সে মধুরতা ভিন্ন অন্য সুখের প্রতি মন যেন এখন হইতে চির উদাসী হয়।

নিত্য সহচর! তুমি একাকী থাকিতে দাও না; কাছে কাছে, পিছে পিছে, কখন বা আগে আগে ফিরিতে থাক। তোমার পশ্চাদ্ধাবন হইতে আমি কখনই আপনাকে রক্ষা করিতে পারি না। দেশ ছাড়িয়া দুরারোহ শৈলে উঠিয়াও তোমার কাছে পার পাই না। দেশের মত বিদেশেও তুমি ধরিয়া থাক। বিদেশে যদি তোমাকে প্রাণের অতি নিকটে উপলব্ধি করিতে না পারিতাম, তবে ঘোর নির্জ্জনতা অনুভব করিয়া প্রাণ হাঁফাইয়া উঠিত। তুমি সহায় বলিয়া আজিও এ জীবনসংগ্রামে ভঙ্গ দেই নাই, নহিলে সংসারের প্রতিকূলতা ও আপন দৌর্ব্বল্য দেখিয়া কি অগ্রসর হইতে পারিতাম? প্রাণের মর্ম্ম স্থানে আসিয়া আঘাত করিতেছ, আর কি আমি নির্জনতা অনুভব করিতে পারি? অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়া কিরূপে এই দুর্ব্বল দরিদ্র আত্মার সহচরত্ব করিতে পার, তুমিই জান। সংসারের প্রিয়জন কাছে নাই বলিয়া আর দুঃখ করিতে দিলে না,—তোমা অপেক্ষা অধিকতর প্রিয়জন আমার আর কে আছে? অদ্বিতীয় বন্ধু, তোমার বন্ধুতা প্রাণে জাগ্রত কর, আমার অনাথত্ব চিরকালের জন্য বিনষ্ট হউক। তুমি যখন আমার বন্ধু হইতে সঙ্কুচিত না হইলে, তখন আমি তোমার শত্রুতা করিতে যেন অগ্রসর না হই। তুমিও যেমন আমার সহচর ও মিত্র হইয়াছ, তোমার কৃপায় আমিও যেন তোমার সহচর ও মিত্র হইতে পারি।

তোমায় আমায় কি সম্বন্ধ আজ বলিতেই হইবে। কেন এমন করিয়া দিন দিন প্রাণকে এত অস্থির করিতেছ? তোমার অভিপ্রায় কি? আমার পরিত্রাণ হউক বা না হউক তোমার তাতে কি? তুমি এমন করিয়া অযাচিত করুণা ঢালিলে আমি প্রাণকে কত দিন আর আত্মবশে রাখিতে সমর্থ হইব? কিসের জন্য তুমি এত করিতেছ? মায়েও এমন যত্ন আদর করে না;

বাপেও এমন করিয়া প্রতিপালন করিয়া না। মার মা, পিতার পিতা, হে অনির্ব্বচনীয় পরম পুরুষ! তুমি আমার কে হও, তাই বল। আমি তোমার ব্যবহার দেখিয়া অবাক্ হইয়াছি! মানুষের কাছে ভিক্ষা চাহিলে পাওয়া যায়, আবার সব সময়ে পাওয়াও যায় না; তুমিই কেবল চাহিবার আগে আশাতিরিক্ত অমূল্য রত্ন দান কর, আবার এমনই লোককে দাও যে, তোমার দান পাইয়াও শত শত বার তার অপব্যবহার করিয়াছে। আমি ছাই মাটী গায়ে মাখিয়া বসিয়া থাকিব, তুমি শুভ্র হইতে শুভ্রতর বসনে আমাকে ভূষিত করিবে, আমি কোন মতে প্রাণটাকে পাথরের মত করিয়া রাখিব, তুমি এসে ক্রমাগত সেই পাথরকে গলাইয়া দিবে। কে তুমি প্রভু? তোমাকে প্রভু বলিতেছি কি? পৃথিবীর কোন সম্বন্ধের কথা বলিয়া তোমার সহিত যে অবর্ণনীয় সম্বন্ধ তার তুলনা কি দিব? তুমি আমার সেই, যাহা আর কেহ নহে।

উপরে আর কতদিন ভাসিব? পুরাতন কথা, পুরাতন ভাব লইয়া মানুষ কয়দিন সচ্ছন্দে কাটাইতে পারে? অনন্ত সমুদ্র, তোমার সন্তান হইয়া কি কেবল উপরের তরঙ্গভঙ্গ গণনা করিয়া জীবন কাটাইব? ভিতরে নামিতে পারিব না? সৌখীন ধর্ম্ম করিয়া লোককে প্রবঞ্চিত করিব, আর আপনাকে প্রবঞ্চনা করিতে চেষ্টা করিব? অল্পজলে বেড়াইয়া বেড়াইয়া প্রাণ হাঁফাইয়া উঠিয়াছে। একবার গভীর জলে নামাইয়া দাও, দেখি, আর উঠিতে পারি কি না পারি। সংসার সম্বন্ধে আমি মরিতে চাই; সংসারে আমার নাম ও নিশান চিরকালের জন্য লুপ্ত হউক! তোমার রাজ্যের গভীর স্থানে লইয়া তুমি আমার নূতন ও প্রকৃত নামকরণ কর। এমন স্থানে আমাকে লইয়া ফেল যে, সেখান হইতে চেষ্টা করিলেও পড়িব না। প্রলোভন কুটাগাছটীর ভর সহিতে পারে না, প্রতিকূলতার হিল্লোলটীর ভার বহিতে পারে না, এমন ধর্ম্মজীবন লইয়া আমার কি হইবে? আর এমন জীবন দেখিয়া তুমিইবা কেন সন্তুষ্ট হইবে? যে উপাসনার সজীবত্ব একঘণ্টা কাজের ঘর্ষণে ক্ষয় হয়, সেরূপ উপাসনায় আমার চলিবে কেন? তাই তোমার কাছে মিনতি করিতেছি যে, আমার অল্পজলে ঘোরা ঘুচাইয়া, আমাকে অতলস্পর্শ তোমার গভীর প্রেমসাগরে নামাইয়া দেও।

আমি অতি ছোটলোক, তাই সদাই ছোট আদর্শ লইয়া সন্তুষ্ট থাকি। তোমার মত অনন্ত মহিমাবান্ বাপের ছেলে আমি, কিন্তু আমাকে দেখিলে কে তাহা বলিবে? তুমি বল তোমার সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাত্মরাজ্যের অন্তরে প্রবেশ করিতে, আমি খানিক দূর গিয়া তোমার হাত ছাড়িয়া দিই! মনে সদাই ভয় হয় পাছে এমন কিছু অপূর্ব্ব আদর্শ দেখিয়া ফেলি যে, আত্মগভীর ভিতরে আর ফিরিয়া না আসিতে পারি। শৈলারোহী পথিক যেমন আরোহণ করিতে করিতে উচ্চ হইতে উচ্চতর শৃঙ্গমালা দেখিয়া বিস্মিত ও তৃপ্ত হয়, তুমি আমাকে তেমনই বিস্মিত ও তৃপ্ত করিতে চাও। কিন্তু আমার মন অতি নীচ ও অতি ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া ব্যস্ত থাকে বলিয়া উচ্চ আদর্শ দেখিতে চায় না। উচ্চ আদর্শ প্রতিভাত হইয়া পাছে প্রাণ আকর্ষণ করে সেই ভয়ে সদাই চক্ষু মুদিয়া আছি। আদর্শের আদর্শ! আদর্শতত্ব প্রকাশ কর, প্রাণ নিম্ন আদর্শ ছাড়িয়া উচ্চতর আদর্শের অনুরাগী হউক। তোমার অঙ্গুলী সঙ্কেতের প্রতি যেন কেবল উদাসীন না হই,—তুমি যে শৃঙ্গ দেখাইয়া দিবে তাহা দুর্গম অরণ্যে পরিবেষ্টিত বা প্রাণবিনাশী তুষারস্তূপে মণ্ডিত থাকুক, আমি যেন প্রাণপণে তাহাতে উঠিতে চেষ্টা করি।

প্রভু, এতদিন ধরিয়া পরের চাকরী করিতেছি, কিন্তু আজিও তোমার চাকরীর নিগূঢ় মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম না। তোমার কর্ম্ম বলিয়া কর্ম্ম করি, অথচ কর্ম্ম করিয়া পরিশ্রান্ত ও বিরক্ত হই। তোমার দাসত্ব করিতে পাইতেছি বলিয়া আপনাকে তো গৌরবান্বিত মনে করি না। তুমি যখন কাজ করিতে ডাক, আমিতো ছুটিয়া গিয়া প্রফুল্ল মনে তোমার কাজে প্রবৃত্ত হইনা, তোমার কাজে যেতে আমার কতই বিলম্ব হয়, আমি কতই নিরুৎসাহ বোধ করি। কোথা একটী কাজ করিতে গিয়া আর দশটী কাজ করিবার স্ফূর্ত্তি ও শক্তি হইবে, না একটী কাজ করিয়া দশদিন বিশ্রাম করিতে ইচ্ছা হয়। তুমি দিবানিশি কাজে ব্যস্ত, একথা মনে করিয়াও প্রাণে বল সঞ্চার হয় না। আমার আলস্য ও জড়তা বিনাশ করিয়া শ্রমমাহাত্ম্য প্রাণে বিকাশ কর। তোমার জন্য সাধু মহাজনেরা যেমন প্রাণপণ করিয়া খাটেন, তেমনই করিয়া আমাকে খাটিতে সমর্থ কর। তোমার জন্য কাজ করিয়া যদি তোমার উপর আমার অনুরাগ বর্দ্ধিত না হইল ও তোমার কাজ করিবার শক্তি চতুর্গুণ না হইল, তবে সে কাজ করার অর্থ কি? ব্যস্ত ঈশ্বর! আমার জন্য তুমি যেমন বাস্তবিক সদাই ব্যস্ত, তোমার জন্য তেমনই সত্য সত্য আমাকে ব্যস্ত কর।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ ও আমাদের জীবন।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

আপনার সহিত বিবাদ করিয়া মানুষ কতদিন থাকিতে পারে? পদে পদে বিবেকের তিরস্কার সহ্য করিয়া চলিতে হইলে জীবন ভারবহ হইয়া পড়ে। চিরদিনই আপনাকে অপরাধী বলিয়া মনে করা অত্যন্ত কষ্টকর ব্যাপার। কাজেই মানুষ যখন বিবেকের প্রদর্শিত পথে চলিতে না পারে, তখন সে বিবেককে কোনও মতে বুঝাইয়া তাহার মুখ বন্ধ করিতে চেষ্টা করে। আমাদেরও সেই দশা হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শ খুব উচ্চ বটে, কিন্তু আমাদের সেই আদর্শে বিশ্বাস নাই; আমরা যে চেষ্টা করিলে ঈশ্বরপ্রসাদে সেই উন্নত অবস্থায় উপনীত হইতে পারি, তাহা বিশ্বাস করি না। আমরা মুখে ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ অস্বীকার করি না, অথচ কার্য্যতঃ সেদিকে অগ্রসর হইবার জন্য আমাদের অণুমাত্র

চেষ্টা নাই। কাজেই বিবেককে বুঝাইয়া ক্ষান্ত করা ভিন্ন আমাদের উপায়ান্তর নাই। সেই জন্য আমরা মনে মনে আমাদের আধ্যাত্মিক আদর্শকে একটু খাট করিয়া লইবার চেষ্টায় আছি। আমরা বিবেককে এই বলিয়া বুঝাইতে আরম্ভ করিয়াছি যে, ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শ আমাদের বর্ত্তমান জীবনের পক্ষে অত্যন্ত উচ্চ, বিশেষধর্ম্মভাবসম্পন্ন দুই চারিজন লোক সেই উন্নত অবস্থায় উপনীত হইলেও হইতে পারেন, কিন্তু আমাদের মত সাংসারিক লোকের পক্ষে সে আশা বৃথা; আমাদের মত লোকের পক্ষে প্রতিদিন এক আধবার চক্ষু বুজিয়া ঈশ্বরের নিকট বসিতে চেষ্টা করা, উৎসবাদি বিশেষ ঘটনায় একটু ভাবের উচ্ছ্বাস উপভোগ করা, আর কোনও মতে চরিত্রটা ভাল রাখিয়া ভাই ভগ্নীর একটু আধটু উপকার করা এবং সামাজিক কুপ্রথা সকল বিদূরিত করিতে সাধ্যমত যত্ন করা—এই হইলেই যথেষ্ট হইল। মুখে সকলে স্পষ্টতঃ এরূপ ভাষা ব্যবহার করুন আর না করুন, আমাদের মধ্যে অনেকেই যে আমাদের জীবনের আদর্শকে এইরূপ ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে বদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছি তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা আমাদের আদর্শকেও অবনত করিয়া ফেলিতেছি। এরূপ স্থলে আমরা যে আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় বেশ সন্তুষ্টভাবে কাল যাপন করিব তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? যাঁহার গন্তব্য স্থান অধিক দূরবর্ত্তী নহে, তিনি অল্প পথ চলিয়াই মনে করেন, 'আমি অনেক দূর আসিয়াছি।' গণ্ডশৈলের শিখরদেশে আরোহণ করা যাঁহার লক্ষ্য তিনি অল্পক্ষণ চলিবার পরই দেখেন যে তাঁহার গম্যস্থান অতি নিকটে, কিন্তু যিনি হিমালয়ের অভ্রভেদী চূড়ায় আরোহণ করিতে চান, তিনি যতই উঠেন ততই উচ্চ হইতে উচ্চতর শৃঙ্গ সকল তাঁহার নয়নপথবর্ত্তী হইতে থাকে, এবং তিনি কখনই অল্পদূর উঠিয়া—যথেষ্ট হইয়াছে মনে করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না। সেইরূপ যাঁহার আদর্শ ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে বদ্ধ তিনি অল্প উন্নতিতেই সন্তুষ্ট চিত্তে কালযাপন করেন, কিন্তু যাঁহার আদর্শ উচ্চ তিনি যতই উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতে থাকেন, ততই উচ্চ হইতে উচ্চতর আদর্শ তাঁহার হৃদয়ে প্রকাশিত হইতে থাকে, কাজেই তিনি নিজের অবস্থায় কখনই সন্তুষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে পারেন না।

আমরা যে উপাসনা করি না তাহা নহে, আমরা যে সৎকার্য্য করি না তাহা নহে, আমাদের যে চরিত্র একেবারে জঘন্য ও হেয় হইয়া পড়িয়াছে তাহাও নহে। আমাদের সকলই আছে, অথচ কিছুই নাই। আমাদের উপাসনা আছে, কিন্তু উপাসনার সে গভীরতা নাই। পরোপকার, সমাজসংস্কার প্রভৃতি সাধুকার্য্যে আমাদের উৎসাহ আছে, কিন্তু আমাদের সৎকার্য্যের মধ্যে সে প্রেম নাই, সেবার ভাব নাই। আমাদের সচ্চরিত্র হইবার চেষ্টা আছে—কিন্তু সে চেষ্টার মধ্যে ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন হইয়া চলিবার দিকে লক্ষ্য নাই। আমরা ধর্ম্মসমাজ গঠন করিতে বসিয়াছি, অথচ আপনাদের প্রাণে ঈশ্বরের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিবার দিকে আমাদের দৃষ্টি নাই! আমরা চতুর্দ্দিকে ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য সকল প্রচার করিবার চেষ্টা করিতেছি, অথচ আপনাদের জীবনে ঈশ্বরের সহিত নিত্য ও প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য আমরা তেমন ব্যাকুল নহি! আমরা উপাসনা ও আধ্যাত্মিকতার আদর্শ খাট করিয়া ফেলিয়াছি, আমরা প্রকৃত সাধুতা ও উন্নত চরিত্রের আদর্শ খাট করিয়া ফেলিয়াছি। যিনি মনে করেন যে ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শকে এইরূপ অবনত করিয়া ফেলিয়া তদ্দ্বারা জগতের পরিত্রাণ সাধন করিবেন, তাঁহার ন্যায় নির্ব্বোধ ও বাতুল সংসারে নাই। আমাদের দৃঢ় ধারণা এই যে, যদি আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শে বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক সেইদিকে অগ্রসর হইতে চেষ্টা না করি, তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজ অচিরে আমাদের দেশের অন্যান্য নির্জ্জীব ধর্ম্মসম্প্রদায়ের শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়িবে। যিনি ঐ উচ্চ আদর্শকে রেখামাত্র অবনত করিতে চান, তিনি ব্রাহ্মসমাজের শত্রু, তিনি সমস্ত মানবজাতির শত্রু। নিয়ম রক্ষার মত একটু আধটু উপাসনা, উৎসবের সময় একটু সাময়িক ভাবোচ্ছ্বাস, চলনসই সাধুতা, আর দুই পাঁচটা শুষ্ক সৎকার্য্যের বাহ্য আড়ম্বর লইয়া ব্যস্ত থাকা—এই কি ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শ? এই কি উন্নতির চরম সীমা? এই লইয়া কি আমরা বিবেকের নিকট, ঈশ্বরের নিকট খাটি হইতে পারিব? যদি ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম হয়, যদি ইহাই জীবনের লক্ষ্যস্থান হয়, যদি ইহাই মানবাত্মার উন্নতির পরাকাষ্ঠা হয়, তবে চাই না সে ব্রাহ্মধর্ম্ম, চাই না সে লক্ষ্যস্থান, চাই না সে উন্নতি। প্রাণেশ্বরকে প্রাণের মধ্যে উজ্জ্বলভাবে দেখা তাঁহার পরিত্রাণপ্রদ বাণী শ্রবণ করা, তাঁহার সহিত প্রাণের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপন, ঈশ্বরে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ, তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসা ও আমার ইচ্ছাকে তাঁহার ইচ্ছার অধীন করা ভিন্ন যদি ধর্ম্ম বলিয়া বাহিরের আর একটা কিছু জিনিষ থাকে, তবে সে ধর্ম্ম লইয়া আমার কি হইবে? জগতেরই বা কি হইবে? সে পোষাকি ধর্ম্মে তোমারও পরিত্রাণ হইবে না, আমারও পরিত্রাণ হইবে না, জগতেরও পরিত্রাণ হইবে না।

ক্ষুদ্র আদর্শ লইয়া এরূপ সন্তুষ্টভাবে দিন কাটাইলে আর চলিবে না। আমাদের বর্ত্তমান জীবন লইয়া আমরা জগতের নিকট দুই পাঁচদিনের জন্য ধার্ম্মিক বা ধর্ম্মপিপাসু বলিয়া পরিচিত হইতে পারি বটে, কিন্তু তাহাই কি আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য? তাহাতে লাভ কি? এদিকে যে আমরা ঈশ্বরের নিকট ঘোর অপরাধে অপরাধী হইতেছি। তাঁহার অন্তর্ভেদী দৃষ্টির নিকট আমাদের বর্ত্তমান জীবনের অসারতা ও সঙ্কীর্ণতা যে পদে পদে প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে। তিনি আমাদিগকে যে মহোচ্চ অধিকার প্রদান করিয়াছেন আমরা যে নিজের দোষে তাহা হারাইতে বসিয়াছি। ব্রাহ্ম ভাই! ব্রাহ্মিকা ভগিনি! আমরা কি বাস্তবিক বিশ্বাস করি যে, পরমেশ্বর ডাকিলে দেখা দেন? তাঁহাকে লাভ করা,

তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসা, তাঁহার হস্তে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করাই যে মানবজীবনের একমাত্র লক্ষ্য তাহা কি আমরা বিশ্বাস করি? ইহা যদি আমরা বিশ্বাস না করি তাহা হইলে আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শ হইতে অনেক দূরে পড়িয়া আছি। আর ঈশ্বরদর্শন, ঈশ্বরের শক্তিদ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়া, প্রাণের মধ্যে তাঁহার বাণী শ্রবণ করা, তাঁহার সহিত নিত্যযোগ স্থাপন করা, এ সকল যদি বাস্তবিক আধ্যাত্মিক জগতের সত্য হয়, তবে বল ভাই! বল ভগ্নি! এই সকল সত্য জীবনে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিবার জন্য আমরা কি করিতেছি? তোমার আমার জীবনে চেষ্টা নাই, অধ্যবসায় নাই, বিশ্বাস নাই বলিয়া কি ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শকে খাট করিতে হইবে? কখনই না। ঈশ্বর দর্শন পুর্ব্বেও যেমন সম্ভব ছিল এখনও তেমনি সম্ভব আছে। এই ঊনবিংশ শতাব্দীতেও ঈশ্বর ডাকিলে দেখা দেন; এই বর্ত্তমান কালের সভ্যতা ও সাংসারিকতার কোলাহলের মধ্যেও দীনাত্মা হইলে হৃদয়ের নিভৃতনিলয়ে তাঁহার পরিত্রাণপ্রদ সুধাময় বাণী শ্রবণ করা যায়; আপনার দুর্ব্বলতা ও হীনতা অনুভব করিয়া তাঁহার উপর নির্ভর করিলে তিনি মৃতপ্রাণে শক্তি সঞ্চার করেন। তবে আমরা এমন নির্জ্জীবভাবে পড়িয়া থাকিব কেন? ঈশ্বরদর্শন কি একটা তুচ্ছ ঘটনা? তাঁহার কথা শ্রবণ করা কি সামান্য ব্যাপার? সর্ব্বশক্তিমানের শক্তিদ্বারা অনুপ্রাণিত হইলে কি আর কিছুর অভাব থাকে? কেবল আমাদের এই সকল আধ্যাত্মিক সত্যে বিশ্বাস নাই বলিয়াই আমরা রাজার সন্তান হইয়াও আজি পথের ভিখারী।

এভাবে আর অধিক দিন চলিবে না। ক্ষুদ্র আদর্শ লইয়া কখনই আমরা উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিব না। আমাদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে; নতুবা আমাদের এত যত্নের ব্রাহ্মসমাজ জলবিম্ববৎ কোথায় অদৃশ্য হইয়া যাইবে, অথবা একটী ক্ষুদ্র জীবনবিহীন সম্প্রদায়ে পরিণত হইবে। প্রকৃত ধর্ম্মপিপাসু কে কোথায় আছ? ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত হিতৈষী কে কোথায় আছ?—প্রস্তুত হও, আর বিলম্ব করিলে চলিবে না। আর ক্ষুদ্র আদর্শ লইয়া কল্পিত আত্মপ্রসাদের সুখশয্যায় শয়ন করিয়া থাকিলে চলিবে না। এস—গভীর উপাসনারূপ বর্ম্মে সজ্জিত হইয়া, বিশ্বাস অসি হস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শের দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করি। এস—নিজ নিজ জীবনে দেখাই যে পরমেশ্বর ডাকিলে দেখা দেন, পাপীর সঙ্গে কথা কন, তাহার প্রাণে শক্তি সঞ্চার করেন। নতুবা শুধু মুখে দুইটা ধর্ম্মের কথা বলিলে জগৎ শুনিবে কেন? ঈশ্বরের সাক্ষাৎ দর্শন ভিন্ন শুধু ফাঁকা কথায় কে নিদ্রিত মানবাত্মাকে জাগাইতে পারে?

উপাসনা তত্ত্ব।

২

আমরা গতবারে দেখাইয়াছি যে উপাসনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক, এবং সে প্রস্তুত হওয়া কোন শারীরিক ক্রিয়া সাপেক্ষ নহে। আমরা আরও লিয়াছি, যে, প্রস্তুত হওয়ার উপায় ত্রিবিধ ও তাহার মধ্যে প্রথম উপায়, আত্মচিন্তা দ্বারা আপনার অসারত্ব অনুভব করা। অদ্য আমরা উপাসনার জন্য প্রস্তুত হওয়ার অবশিষ্ট দুইটী উপায়ের আলোচনা করিব।

উপাসনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে একদিকে যেমন নিজের অসারত্ব অনুভব করিতে হইবে, তেমনি অপর দিকে ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্তা ও কৃপা উপলব্ধি করা আবশ্যক। ঈশ্বরের মহত্ত্ব অনুভব করি না বলিয়াই আমাদের উপাসনা অধিকাংশ সময় বিশেষ কার্য্যকারী হয় না। ঐ জন্যই আমাদের মধ্যে অনেকের জীবনে উপাসনার প্রতি সম্ভ্রমের ভাব আদৌ নাই। উপাসনা অতি গুরুতর ব্যাপার আমাদের মরণ বাঁচন মুক্তি তাহার উপর নির্ভর করে, উপাসনাকালে আকাশব্যাপী অনন্তমহিমাময়ী বিশ্ব জননীর পবিত্র সন্নিধানে বসিতে হয়, এ সকল কথা যদি মনে থাকে তাহা হইলে উপাসনা করিয়া কি কেহ লঘু হৃদয় লইয়া ফিরিতে পারে? অনন্ত মহিমার নিকটে গেলাম, প্রাণ গম্ভীর হইল না, ইহা কি কখন হইতে পারে? উপাসনান্তে যখন দেখিলাম যে আত্মার মুখ গম্ভীর হয় নাই, তখনই সন্দেহ হয় উপাসনা হইয়াছে কি না? ঈশ্বরের সত্তার মধ্যে বসিয়া আসিলাম অথচ তাহার কোন নিদর্শন আনিলাম না ইহা অসম্ভব কথা। ঈশ্বরের এই মহত্ত্ব অনুভব ঈশ্বরোপলব্ধির বিশেষ সহায়তা করে। ঈশ্বর সন্নিধানে উপবেশন করা, ঈশ্বর-নয়নজ্যোতি সহ্য করা যে সহজ নহে ইহা হৃদয়ে সুস্পষ্ট প্রতিভাত না হইলে উপাসনার গৌরব ক্রমশঃই ম্লান হইয়া যায়। এবং শেষে উহা একটী মৌখিক ব্যাপারে অথবা একটী অভ্যস্ত মানসিক ক্রিয়াতে পরিণত হয়। উপাসনার গুরুত্ব ও ঈশ্বরের মহত্ত্ব যেমন উপলব্ধি করিতে হইবে, তাঁহার কৃপার উপর তেমনি বিশ্বাস করা চাই। মনে যদি অণুমাত্র সন্দেহ থাকে, যে যাহা চাওয়া যায় হয়তো সব তিনি দেন না, তাহা হইলে আরাধনা প্রার্থনা সমস্তই নষ্ট হইবে। তাঁহার কৃপায় অসম্ভব সম্ভব হয়, রজনীতে সূর্য্যোদয় হয়, পাষাণ বিগলিত ও তাহাতে বীজ অঙ্কুরিত হয়, পঙ্গুতে গিরি লঙ্ঘন করে ও বামন হাতে চন্দ্র পায়। এ সকল কবি কল্পনাপ্রসূত অলীক কথা নহে, ভক্তজীবনের প্রকৃত ঘটনা। বাস্তবিকই ঈশ্বর অলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদনে সমর্থ, তিনি ভিন্ন আর কেহ পতনোন্মুখে পাপীকে রক্ষা করিতে পারে না। যদিও আত্মচেষ্টার বিরাম কোথাও নাই, তথাপি কেবল আত্মচেষ্টায় কিছুই হয় না, আত্মচেষ্টার পূর্ণ ফূর্ত্তি ঈশ্বরকৃপা অবতরণের কেবল একটী অত্যাবশ্যক পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা মাত্র। মনে করিতে হইবে এই যে আমি আমার অনন্ত অপরাধের দগ্ধমুখ ও ভগ্ন হৃদয় লইয়া প্রভুর নিকটে আসিয়াছি, প্রভুর কৃপায় আমি নিমেষে পুণ্যসুন্দর হইতে পারি। ঈশ্বরের

অবিচলিত ও অসীম প্রেমে বিশ্বাস এবং তাঁহার মহত্ত্ব ও আপনার নীচতা অনুভব করিয়া অনুশোচনা এই দুইটি পরস্পর পরস্পরকে বৃদ্ধি করিয়া থাকে। সাধক নিজের অসারত্ব যত বুঝিতে থাকেন, প্রভুর সারবত্তা তাঁহার প্রাণে ততই প্রকাশিত হয়; নিজের নিরাশ্রয়তা ও কৃপাপাত্রতা যতই হৃদয়ঙ্গম করেন, পরমেশ্বরের আশ্রয়দাতৃত্ব ও প্রেম ততই তাঁহার প্রাণে উচ্চতর হইয়া উঠে।

উপাসনার জন্য প্রস্তুত হওয়ার তৃতীয় উপায় ঈশ্বরের নিকট বর্ত্তমানতা উপলব্ধি। ঈশ্বর আছেন, এই জ্ঞানগত বিশ্বাসে উপাসনাসাধক তৃপ্ত হন না। নবীন সাধকের এক অনন্ত প্রসারিত অস্তিত্ব অনুভব করিয়া সন্তুষ্ট থাকেন, কিন্তু উপাসনাসাধকের আরও উচ্চতর স্থানে যাওয়া আবশ্যক, হে অনন্ত তুমি আমার সংকীর্ণপ্রাণে, হে মহান্ ভূমা তুমি আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ে, যতক্ষণ প্রাণ একথা না বলে ততক্ষণ তিনি উপাসনায় বসিতে পারেন না। ঈশ্বর দূরে আছেন ইহাও যেমন সত্য, তিনি দেহ অপেক্ষা আমাদের নিকটে আছেন ইহাও তেমনি সত্য। উপাস্য দেবতাকে সম্মুখে না দেখিলে প্রকৃত উপাসনা অসম্ভব। উদ্দেশে অন্য সব হইতে পারে কিন্তু উপাসনা হইতে পারে না। পৌত্তলিক যেমন পুত্তলিকার সম্মুখে বসিয়া প্রত্যক্ষ পৌত্তলিক উপাসনা করেন, ব্রহ্মোপাসক প্রাণের পুতলী, নয়নের তারা, প্রিয় পরমেশ্বরকে তেমনি উজ্জ্বলভাবে সম্মুখে দেখিয়া উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়েন। তাঁহার অভিধানে "তিনি", "সে" এ সকল কথা থাকে না। কাছে যাঁহাকে দেখা যাইতেছে তাঁহাকে উপাসক কি বলিয়া তিনি বলিবেন? ঈশ্বর স্মরণে 'তিনি' শব্দ চলিতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরোপলব্ধিতে 'তুমি' শব্দ থাকা চাই। আবার এই নিকট উপলব্ধি অস্পষ্ট হইলে চলিবে না, বাহ্যবস্তু যেমন পরিষ্কার রূপে দেখা যায় ঐ উপলব্ধি সেইরূপ জীবন্ত ও পরিষ্কার হওয়া আবশ্যক। নিকট উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবন্ত ভাব আসিয়া পড়ে, কিন্তু কিছুদিনের পর সে ভাব ম্লান হইবার আশঙ্কা আছে। সাধককে সুতরাং এ বিষয়ে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে।

এইরূপে আপনার অসারতা, পরমেশ্বরের সারবত্তা ও কৃপা এবং তাঁহার নিকট বর্ত্তমানতা চিন্তাদ্বারা যখন সাধক অসৎ সংসার চিন্তা নির্ব্বাণ পূর্ব্বক শান্ত সমাহিত হইয়া সম্মুখোপস্থিত উপাস্য দেবতার চরণে প্রণত হইবার জন্য ব্যগ্র হয়েন তখন তাঁহার আরাধনায় প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। যে ব্যক্তি উক্ত অবস্থায় আসিতে পারেন নাই, তাঁহার আরাধনা মৌখিক হইবে ও ভাবের উচ্ছ্বাস তাঁহার হৃদয়কে উদ্বেলিত করিবে না। উপরে যাহা বলা হইল, তাহাতে পাঠক দেখিবেন যে উপাসনার জন্য প্রকৃতরূপে প্রস্তুত হওয়া নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। কিন্তু আমাদের পরমেশ্বরের এমনই করুণা, যে এই দুর্লভ অবস্থাও বিনীত, বিশ্বাসী ও সরল সাধককে তিনি সহজেই লাভ করাইয়া দেন। একবার এই অবস্থা পাইলে, দ্বিতীয়বার উহা লাভ করিবার জন্য সহজেই প্রাণ সচেষ্ট হয়। অভ্যাসযোগে শেষে মনের এরূপ অবস্থা হয় যে, উপাসনার জন্য আসনে বসিবামাত্র, চিত্ত নিমেষের মধ্যে প্রস্তুত হইয়া যায় ও অনিবার্য্য ঈশ্বরের ভাবে পরিচালিত হইয়া তাঁহার চরণে আপনা হতেই ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া গভীর আরাধনার সমুদ্রে নিমগ্ন হয়।

"নব জলধর তুমি, তৃষিত চাতক আমি,
বিষয় বারি পানে বাঁচিব কেমনে
ওহে হৃদয়ের স্বামী?"

ভক্তেরা ভগবানকে অনেক সময়ে নবজলধরের সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। কেন তাঁহারা এরূপ তুলনা করেন, তাহার তৎপর্য্য আমরা এই প্রস্তাবে কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিব।

যখন মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড উত্তাপে ধরণীর পৃষ্ঠ দগ্ধ ও প্রান্তরের বক্ষ বিদীর্ণ হয়, তখন সবাই জলধরের জন্য ব্যাকুল অন্তরে প্রতীক্ষা করে। ধরণী প্রতীক্ষা করে শান্ত ও শীতল হইবে বলিয়া, প্রান্তর অপেক্ষা করে কোমল ও সুস্থ হইবে বলিয়া, কৃষক প্রতীক্ষা করে চাষ দিবার সময় পাইবে বলিয়া, নরনারী অপেক্ষা করে দীপ্ত শিরের অভিষেক করিবে বলিয়া। রবিকিরণোদ্ভাসিত আকাশও বোধ হয় যেন জলদের প্রতীক্ষা করে। এইরূপে যখন দীপ্ত পৃথিবী ও উত্তাপক্লিষ্ট জীব খর রবিকরে জর জর হইয়া ব্যাকুল অন্তরে বারিধারা কামনা করে, তখন জলধরের উদয় হয়। উৎকণ্ঠিত ও ব্যাকুল চরাচরের পক্ষে সদ্যোজাত সেই জলধর সেইরূপ মধুর ও তৃপ্তিকর বোধ হয়—

"যথা দুঃখী দেখে দ্রবিণ প্রবীণচিত হয়,
যথা হরষিত তৃষিত সুশীত পেয়ে পয়,
যথা চতকিনী কুতকিনী ঘন দরশনে,
যথা কুমুদিনী প্রমোদিনী হিমাংশু মিলনে,
যথা কমলিনী মলিনী যামিনী যোগে থেকে,
শেষে দিবসে বিকাশে পাশে দিবাকরে দেখে।"

আধ্যাত্মিক জগতেও এইরূপ। যখন প্রাণ অনুশোচনায় দগ্ধ হইতেছে, ও পূর্ব্ব পাপের স্মৃতি হৃদয়কে বিদীর্ণ করিতেছে, তখন আত্মার নিকট প্রিয়তম আনন্দস্বরূপ নব জলধরের তুল্য প্রতীয়মান হন। দীপ্ত চরাচর সদ্যোজাত জলদের নীল কান্তি দেখিয়া যেমন প্রফুল্ল হয় ও আত্মযন্ত্রণা ভুলিয়া যায়, তপ্ত হৃদয় নব প্রকাশিত চিদঘনের অনন্ত আনন্দপূর্ণ লাবণ্য দেখিয়া তেমনই বিকশিত ও শীতল হয়। তপ্ত জগৎ যেমন সতৃষ্ণ নয়নে নবোদিত জলদের দিকে তাকাইয়া থাকে, বার বার দেখিয়াও তৃপ্ত হয় না, সন্তপ্ত প্রাণও তেমনই আশাপূর্ণ জ্ঞাননেত্রে সদ্যঃপ্রকাশিত চিৎস্বরূপের দিকে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া থাকে, সহস্রবার দেখিয়াও তৃপ্ত হয় না।

কিন্তু জলধরের নবীনত্বই যে কেবল চরাচরের অনুরাগোৎপত্তির একমাত্র কারণ তাহা নহে। উহার নীলিমা ও সরসত্বও চরাচরের প্রাণ আকর্ষণ করে। নূতন মেঘ যিনি একবার

নিরীক্ষণ করিয়াছেন, তিনিই জানেন, তাহার কোমল নীল শোভা কেমন নয়নানন্দকর। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের রূপ যে একবার বিশ্বাস চক্ষে দেখিয়াছে, সেই জানে যে তাঁহার সৌন্দর্য্যের নিকট আর সকল সৌন্দর্য্য তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর। জলদের নীলিমা যেমন জগতের প্রাণ হরণ করে, ভক্তবৎসলের সৌন্দর্য্য তেমনই ভক্তের প্রাণ আকর্ষণ ও তাঁহার অনুরাগ উদ্দীপন করে। নূতন মেঘেরশুধু যে নীলরূপ তাহা নহে, গুণও বিস্তর। সেই নীলরূপের প্রত্যেক বিন্দুতে বারিবিন্দু প্রচ্ছন্ন আছে। যে বারি-বিন্দুতে জগত শীতল হয়, কৃষক জীবিত হয়, চরাচরের জীবিকার উপায় হয়, সেই বারিবিন্দু বহন করিয়া জলদ আকাশে প্রকাশিত হয়। চিৎস্বরূপেরও গুণের অভাব নাই, তিনি অনন্ত গুণাধার। তাঁহার সত্তার প্রত্যেক অংশে অনন্ত শান্তি ও মঙ্গল ভাব প্রচ্ছন্ন। যে প্রেমবিন্দুতে কোটি পাপীর মুক্তি হয়, সেই প্রেমের সিন্ধু লইয়া সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম চিদাকাশে বিভাসিত হন। তাঁহার পূর্ণতা দেখিয়া ভক্ত যেমন বিমোহিত হন, তাঁহার অপার প্রেমের সম্বাদ লাভ করিয়া তেমনই তাঁহার শরণাপন্ন হন।

জলধরের সঙ্গে চরাচরের সম্বন্ধ আছে সত্য, কিন্তু চাতকের সঙ্গে তাহার বিশেষ সম্বন্ধ। জলধর জল বর্ষণ না করিলে কৃত্রিম উপায়ে জগৎ প্রয়োজনীয় বারি সঞ্চয় করিতে পারে, কিন্তু চাতকের জলধর ভিন্ন অন্য গতি নাই, সে অন্য কাহারও নিকট বারি ভিক্ষা করে না, অন্যদত্ত বারিতে তাহার পিপাসা শান্ত হয় না। অন্যলোকে ঈশ্বরকে ছাড়িয়া তৃপ্ত থাকিতে পারে, কিন্তু ভক্তের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ সম্বন্ধ, তিনি ভিন্ন ভক্তের অন্য গতি নাই। অন্য কাহারও প্রসাদে তাঁহার কিছু হয় না, আত্মারাম স্বয়ং আসিয়া আত্মাকে যতক্ষণ আপন লীলাভূমি না করেন, ততক্ষণ তিনি কিছুতেই তৃপ্ত হন না। ধন, মান, সৌন্দর্য্য ও সংসার তাঁহার প্রাণের সন্তাপ দূর করিতে পারে না। চিদঘনের কৃপা-বারিধারা বর্ষিত না হইলে সে জ্বালা নিবারিত হয় না। তাঁহার আত্মাকে অন্যদত্ত বারি গ্রহণ করিতে যতই কেন অনুরোধ কর না কেন, কিছুতেই সে স্বীকৃত হইবে না, জোর করিয়া তাহাকে অন্য বারি পান করাও সে প্রাণত্যাগ করিবে। সংসার ও ধনমান সেবা করিয়া কোন্ সাধু আত্মা বাঁচিতে পারে? তাই ভক্তজনে বলিয়াছেন—

"নবজলধর তুমি, তৃষিত চাতক আমি;
বিষয় বারি পানে, বাঁচিব কেমনে,
ওহে হৃদয়ের স্বামী?"

হৃদয় চাতক! এখন যদি মঙ্গল চাও তবে সেই নবজলধরের শরণাপন্ন হও। বৃথা হেথা সেথা জলের চেষ্টায় কেন ফিরিতেছ? তোমার তৃষ্ণা তিনি ভিন্ন আর কেহ শান্ত করিতে পারিবে না। লোকের কথায়, সংসারের প্রবঞ্চনায় প্রতারিত হইয়া সুধাভ্রমে বিষপান করিও না। প্রভুর প্রেমবারি ভিন্ন তোমার অন্তরের অনন্ত, অতৃপ্ত তৃষ্ণা কি শান্ত হইবে? তবে আর কেন সময় নষ্ট কর? তৃষ্ণার জল দিতে পারিবে বলিয়া এতদিন যাহারা আশা দিয়া রাখিয়াছিল, তাহারা কি সে আশা পূর্ণ করিতে পারিল? তাহারা তাহাদের ক্ষমতার অতিরিক্ত কাজ করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল, পারিবে কেন? সংসারের কি সাধ্য আত্মার অধ্যাত্ম তৃষ্ণা ইন্দ্রিয়সুখে নিবারণ করে?

যতদিন না আমরা সকলে চাতকের ন্যায় ব্যাকুল অন্তরে চিদঘন পরমেশ্বরের কৃপাবারির জন্য অপেক্ষা করিতে শিক্ষা করি, ততদিন আর আমাদের মঙ্গল নাই। ব্যাকুলতার যেখানে অভাব সেখানে সফলত্ব লাভের সম্ভাবনা কোথায়? এতদিন ধর্ম্মরাজ্যে চলিয়া এখন দেখিতেছি, যে মূলে অভাব রহিয়াছে। চাতকের মত যতদিন আমরা সেই সচ্চিদানন্দ-পরায়ণ হইতে না পারিতেছি, ততদিন আমাদের যে বিশেষ কিছু উন্নতি হইবে এমন আশা করিতে পারি না। আমরা এখন সকল দ্বারেই বেড়াই, সকল স্থানে যখন অর্দ্ধচন্দ্র লাভ করি—তখনই সেই অগতির গতির অবারিত দ্বার প্রান্তে আশ্রয় গ্রহণ করি। যখন আমাদের অন্য দ্বারে যাওয়া ঘুচিবে, তখন প্রকৃত ধর্ম্মজীবনের দীপ্তি প্রাণে নিশ্চয়ই প্রকাশ পাইবে। নবঘননিঃসৃত নূতন বারিধারা পান করিয়া আমাদের ক্লিষ্ট ও কুৎসিত আত্মা আনন্দে বিহ্বল, উৎসাহে পূর্ণ ও নূতন রূপ-লাবণ্যে বিভূষিত হইবে। দয়াময়ের কৃপায় সেইদিন শীঘ্র আগমন করুক, সেই চিদঘনের একাধিপত্য আত্মারূপ চাতক-কুলের উপর সত্বর প্রতিষ্ঠিত হউক।

সঙ্গত সভা।

৫ম অধিবেশন।

গত ২৮এ ভাদ্র মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭॥ টার সময় সঙ্গত সভার যে অধিবেশন হয় তাহাতে বাবু মোহিনী মোহন রায় উপাসনার কার্য্য করেন। বাবু রজনীকান্ত নিয়োগী সভাপতি ছিলেন। এবারেরও আলোচ্য বিষয় 'উপাসনা'। প্রথমে বাবু বলাই চাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় এ সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাহার পর আলোচনা হয়। উক্ত প্রবন্ধেরও আলোচনার সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল;—

ক। প্রকৃত উপাসনা জীবনব্যাপী; ইহাতে প্রবৃত্ত হইতে হইলে আমাদের সমস্ত শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি গুলির সমঞ্জসীভূত উন্নতি ও বিকাশ আবশ্যক। আমরা যে জড় প্রকৃতি ও মানব প্রকৃতির মধ্যে অবস্থিতি করিতেছি, তাহা সেই উন্নতি ও বিকাশের সাহায্য করে। এই জন্য বহির্জগতের ও অন্তর্জগতের প্রকৃতি আমাদের জানা আবশ্যক। এই জ্ঞানকে তত্ত্বজ্ঞান কহে। ইহাই ধর্ম্মের মূল। পাশ্চাত্য পণ্ডিত সীলি বলিয়াছেন যে, উপাসনার বাহিরের দিক্ ছাড়িয়া দিলে তাহার মূলে যে ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে নিত্য অভ্যস্ত ও স্থায়ী অনুরাগ ("habitual and permanent admiration") বলিয়া বর্ণন করা যাইতে পারে। ইহাকেই ভক্তি বলা যায়। যাঁহার এই ভক্তি নাই, তিনি উপাসক হইতে পারেন না। যখন মানুষের সমস্ত বৃত্তি গুলি ঈশ্বরাভিমুখী হয় তখন স্বতঃই ভক্তির উদয় হয়। এই ভক্তির স্ফূর্ত্তি হইলে আমাদের অন্যান্য বৃত্তির বিকাশের কোন ব্যাঘাত ঘটে না। কেবল জ্ঞান দ্বারা উপাসনা সম্ভব হইলেও উহাকে আন্তরিক উপাসনা বলা যায়

না; উহা শিক্ষার অবস্থা মাত্র। যিনি জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া, তাঁহার আত্মশক্তিকে জগতের শক্তিসমষ্টির সহিত একতানে মিলাইতে পারিয়াছেন, তিনিই যথার্থ ব্রহ্ম কি তাহা বুঝিয়াছেন। অনিত্য সুখের কামনা প্রবল থাকিলে নিত্য সুখদাতা, নিত্য আনন্দময়, প্রেমময় ঈশ্বরকে ধারণা করিতে পারা যায় না। এই জন্য প্রকৃত ভাবে উপাসনা করিতে হইলে প্রথমতঃ কামনা ত্যাগ করিতে হইবে। যিনি সকাম হইয়া ঈশ্বরোপাসনা করিতে যান, তিনি ভ্রান্ত পথের পথিক হন। নিষ্কাম কর্ম্মই যথার্থ ঈশ্বরোপাসনা। উপাসনা দ্বারা যখন শম দম প্রভৃতি গুণের বিকাশ হইতে থাকিবে তখনই বুঝিতে হইবে যে, ঈশ্বরোপাসনার পথে ঠিক্ চলা হইতেছে।

খ। কি উপায় অবলম্বন করিলে উপাসনার সাহায্য হয় সে বিষয়ের অনেক আলোচনা হইয়াছে। এক্ষণে উপাসনার প্রধান প্রধান প্রতিবন্ধক কি তাহার আলোচনা করিলেও উপাসনা ভাল করিবার উপায় পাওয়া যাইতে পারে, এই জন্য তৎসম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক বলিয়া বোধ হইতেছে। উপাসনার প্রতিবন্ধকের মধ্যে এই গুলি প্রধান; (১) অহঙ্কার। আমি খুব ধার্ম্মিক হইয়াছি; অপরের কাছে আমার কিছু জানিবার বা শিখিবার নাই, এই ভাব হইতে আমাদের অত্যন্ত অনিষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে। যেমন উচ্চ স্থানে জল দাঁড়াইতে পারে না, সেইরূপ অহঙ্কার-স্ফীত হৃদয়ে ভক্তি স্থান পায় না। (২) গাম্ভীর্য্যের অভাব ও অসার আমোদপ্রিয়তা। সমস্ত দিন যে মুখ ভার করিয়া না থাকিলে উপাসনা [illegible] তাহা নহে। প্রফুল্লতার সঙ্গেও মনের গাম্ভীর্য্য রক্ষা করা যাইতে পারে। ইহা জীবনে স্পষ্ট দেখা গিয়াছে যে, মন কোনও কারণে হাল্কা হইয়া পড়িলে, অসার আমোদে মত্ত হইলে, অনর্থক অনেক কথা কহিলে, উপাসনার ভাব চলিয়া যায় এবং তাহার পর যখন উপাসনা করিতে বসা যায় তখন মনকে বশীভূত করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে। হাল্কামি পরিত্যাগ না করিলে কিছুতেই উপাসনার ভাব রক্ষা করা যায় না। (৩) আলস্য উপাসনার আর একটী ভয়ানক প্রতিবন্ধক। সমস্ত দিন বৃথা কাটাইলে, অথবা যখনকার যাহা কর্ত্তব্য তাহাতে অবহেলা করিয়া 'পরে করিব' বলিয়া ফেলিয়া রাখিলে উপাসনা ভাল হয় না। আলস্যনিবন্ধন হাতে অনেক কাজ জমিয়া পড়িলে উপাসনার সময় মন অত্যন্ত চঞ্চল হয়। (৪) পাপ ও (৫) সংসারাসক্তি যে উপাসনার প্রবল শত্রু সে বিষয়ে অধিক কথা বলা অনাবশ্যক। (৬) আমরা ঈশ্বরকে ছাড়িয়া যাহা করি তাহা সৎকার্য্য হইলেও তদ্দ্বারা উপাসনার ব্যাঘাত হয়।

গ। অনেক সময় ব্যাকুলতাসত্ত্বেও অন্য চিন্তা আসে। সংসার ও ঈশ্বর দুই দিক্ বজায় রাখিতে গিয়া আমাদের অনেক সময় সংসারচিন্তা প্রবল হয়। পার্থিব চিন্তা দূর করিয়া মনকে খালি করিয়া ফেলিতে না পারিলে, ব্যাকুলতাসত্ত্বেও বিফল হইবার সম্ভাবনা। সমস্ত দিন প্রার্থনার ভাব রক্ষা করিয়া চলাই হাল্কামির হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায়।

ঘ। কোনও দরবেশ একদা বলিয়াছিলেন, 'ধর্ম্ম বলিবারও নয়, শুনিবারও নয়, করিবার জিনিস।' কার্য্যে পরিণত না করিলে সহস্র উপায়েও কিছু হয় না। আলোক ভিন্ন অন্ধকার যায় না। বড় বিষয় না ধরিলে ছোট বিষয়ের প্রভাব অতিক্রম করা যায় না। ঈশ্বরের বিষয় ভাবিতে চেষ্টা করিলে অন্য বিষয় মন হইতে চলিয়া যায়। আত্মচিন্তা দ্বারা নিজের অভাববোধ উজ্জ্বল করিতে হইবে এবং যিনি সেই অভাব দূর করিতে পারেন তাঁহার কাছে যাইতে হইবে।

ঙ। অজ্ঞানতাই অহঙ্কারের মূল। ঈশ্বরকে যখন একটু বুঝিতে পারি, তখনই দেখিতে পাই অহঙ্কার কি। ঈশ্বরকে দর্শন করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষাই উন্নতির মূল। এই মূল মন্ত্র ধরিয়া চলিয়া একটু আলোকের আভাস ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটু আশা পাইতেছি এবং সন্দেহের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার উপায় পাইয়াছি। সে উপায় গভীর আত্মচিন্তা ও সাধুলোকের সহিত আলাপ। ঈশ্বরকে দেখিতে হইবে এই মূল মন্ত্র ধরিয়া থাকিতে পারিলে নিশ্চয়ই আলোক পাওয়া যায়, বাহিরের প্রতিবন্ধক চলিয়া যায় এবং কর্ত্তব্যশীলতা বৃদ্ধি পায়।

চ। উপাসনা সমস্তদিনব্যাপী এবং ক্রমে সমস্তজীবনব্যাপী হইবে। ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করা এ দুইটীই উপাসনার অঙ্গীভূত। উপাসনার সময় প্রীতির অঙ্গ স্ফূর্ত্তি পায়; কিন্তু সমস্ত দিন ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন করিতে না পারিলে প্রকৃত ও পূর্ণ উপাসনা হয় না। প্রাতঃকালে নির্জ্জনে উপাসনা আরম্ভ হইয়া সংসারের কার্য্যের মধ্যে উহা গাঢ়তর হইবে। ইহারই নাম প্রকৃত উপাসনা।

ছ। মৃত্যুচিন্তা সংসারাসক্তি দূর করিবার একটী প্রকৃষ্ট উপায়। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে চেষ্টা করিলে হাল্কামিও দূর হয় এবং দিবসব্যাপী ও জীবনব্যাপী উপাসনার পথ প্রস্তুত হয়। 'সুখও চাই না, দুঃখও চাই না, কেবল তোমাকে চাই'—এ ভাবটী যখনই মনে হইয়াছে, তখনই অত্যন্ত অশান্তি ও যন্ত্রণার মধ্যেও শান্তি পাইয়াছি।

খ। পথ চলিবার সময় একটা লক্ষ্য স্থির রাখিয়া চলিলে পথের কথা মনেই হয় না। আমাকে ঈশ্বরের দর্শন লাভ করিতেই হইবে, এই লক্ষ্য স্থির রাখিয়া চলিলে, বাহিরের বাধা বিঘ্ন ক্রমে চলিয়া যায়, এবং যখন যে উপায়ের প্রয়োজন তাহাও পাওয়া যায়। ইহা জীবনের পরীক্ষিত সত্য। ব্রাহ্মসমাজে প্রথম প্রবেশকালে প্রার্থনা করিতাম, 'প্রভু! দেখা দাও।' এখনও অধিকাংশ দিন সেই এক প্রার্থনাই করি। ইহার মধ্যে যে কখনও লক্ষ্য ভ্রষ্ট হই নাই তাহা নহে। কিন্তু মন ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার সেই লক্ষ্যের দিকেই আসিয়াছে। সরল ভাবে পরমেশ্বরের দিকে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিলে, সেই বিঘ্ন বিনাশন নিজেই সমস্ত বিঘ্নবাধা দূর করেন।

চ। অহঙ্কার হইতে যে কেবল উপাসনার ব্যাঘাত হয় তাহা নহে, অন্য বিষয়েরও অনেক ক্ষতি হয়।

ছ। অজ্ঞানতাই অহঙ্কারের প্রসূতি। ঈশ্বর হইতেই আমাদের সকল—এই সত্য বুঝিলে অহঙ্কার থাকে না।

জ। দীনতা থাকিলে উপাসনা সম্বন্ধে বিশেষ উপকার হয়। কিন্তু অন্য চিন্তা দূর করিবার উপায় কি ?

খ। অন্য চিন্তা দূর করিতে হইলে উপাসনার গুরুত্ব স্মরণ করিয়া ধীর ভাবে মনকে সেই দিকে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতে হইবে। নতুবা ক্রমাগত অন্য চিন্তা চলিয়া যাউক বলিয়া ব্যস্ত হইলে উহা আবার ফিরিয়া আসিবে। ঈশ্বরকে পাইতেই হইবে, এই লক্ষ্য স্থির রাখিয়া চলিলে ক্রমে মনের চঞ্চলতা চলিয়া যায়। ঈশ্বর দর্শনের জন্য আর একটু আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা আবশ্যক। অন্য চিন্তা দূর করিবার পক্ষে উপাসনার মধ্যে ইহার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রার্থনা করিলে উপকার হয়।

ক। আত্মস্বরূপ না জানিলে ঈশ্বরের স্বরূপ ভাল বুঝা যায় না। আত্মজ্ঞানের মূলে ব্রহ্মজ্ঞান নিহিত রহিয়াছে।

আলোচনান্তে সহকারী সম্পাদককে ভার দেওয়া হইল যে, গত কয়েকবারে উপাসনা ভাল করিবার জন্য যে যে উপায়ের কথা হইয়াছে, তিনি আগামী বারে তাহার একটী সংক্ষিপ্ত তালিকা করিয়া আনিবেন।

৬ষ্ঠ অধিবেশন।

গত ৫ঠা আশ্বিন সঙ্গত সভার যে অধিবেশন হয় তাহাতে বাবু অঘোর নাথ মুখোপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করেন ; বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সভাপতি ছিলেন। প্রথমে সহকারী সম্পাদক উপাসনা ভাল করিবার উপায়ের একটী সংক্ষিপ্ত তালিকা পাঠ করেন। তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল ;—

(১) সাধুলোকের সঙ্গে সৎপ্রসঙ্গ ; (২) সদ্গ্রন্থ পাঠ ; (৩) নিজের অবস্থা ও অভাব সম্বন্ধে চিন্তা ; (৪) ঈশ্বরের স্বরূপ চিন্তা ; (৫) সাধুলোকের সাধুতা চিন্তা ; (৬) নিজের জীবনে ঈশ্বরের লীলাদর্শন ; (৭) সংসারাসক্তি ও অন্য চিন্তা দূর করা ; (৮) মন প্রীতিপূর্ণ রাখা ; (৯) প্রাণপণে ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধনের চেষ্টা করা ; (১০) সমস্ত দিন জীবন ভালভাবে কাটাইতে চেষ্টা করা; (১১) ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ চিন্তা করা। (১২) নিজের পাপ এবং ঈশ্বরের দয়া ও পবিত্রতা চিন্তা করা ; (১৩) যাহা সত্য বুঝিব কার্য্যে তাহা করা। (১৪) প্রাকৃতিক শোভা দর্শন ও তৎসম্বন্ধে চিন্তা। (১৫) সমস্তদিন ঈশ্বরের সহিত যোগ রক্ষা করা এবং ভালভাবে জীবন কাটাইতে না পারিলে উপাসনার ব্যাঘাত হইবে ইহা মনে রাখা ; (১৬) ঈশ্বরের চক্ষু সর্ব্বদা আমার উপর রহিয়াছে ইহা উপলব্ধি করা। (১৭) যে সকল বস্তু উপাসনার ব্যাঘাত করে তাহার মধ্যে ঈশ্বরকে দর্শন করিবার চেষ্টা করা। (১৮) আত্মাতে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করা; (১৯) প্রতিমুহূর্ত্তে আমরা ঈশ্বরের যে দয়া উপভোগ করিতেছি তাহা উপলব্ধি করা ; (২০) যথেষ্ট সময় হাতে রাখিয়া উপাসনায় বসা। (২১) অবিশ্রান্ত প্রার্থনার ভাব। (২২) দীনতা ; (২৩) হৃদয়ের গাম্ভীর্য্য রক্ষা করা; (২৪) পাপদমন; (২৫) আলস্য দূর করিয়া যখনকার যে কাজ তখনই তাহা করিয়া ফেলা ; (২৬) ঈশ্বরের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সকল কার্য্য করিতে চেষ্টা করা ; (২৭) সমস্ত দিন উপাসনার ভাব রক্ষা করিতে চেষ্টা করা ও মধ্যে মধ্যে পরীক্ষা করিয়া দেখা আমরা সেইভাব হারাইয়াছি কি না। (২৮) ঈশ্বরকে দেখিবার জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা।

এই তালিকাপাঠের পর ঈশ্বরের সত্যস্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা হয়। তাহার সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল ;—

ক। আমরা চতুর্দ্দিকে অনিত্য বস্তুদ্বারা বেষ্টিত হইয়া বাস করিতেছি। কিন্তু এই পরিবর্ত্তনশীল জগতের মূলে, আমাদের প্রাণের মূলে, সকল শক্তির মূল শক্তিরূপে, প্রাণের প্রাণরূপে, আশ্রয়রূপে সেই নিত্য সত্য পরমেশ্বর অধিষ্ঠান করিতেছেন। তাঁহাকে ছাড়িয়া কিছুই থাকিতে পারে না। জড় জগতে, আমাদের আত্মাতে ও ইতিহাসে (অর্থাৎ মানবাত্মার বিকাশের মধ্যে) তাঁহার প্রকাশ দেখিতে হইবে। জগতে তাঁহার প্রকাশ দেখিলে সমস্ত জগৎ একটী প্রকাণ্ড তীর্থস্থান বলিয়া বোধ হয়। তখন বুঝিতে পারা যায় যে, আমরা কোথাও গিয়া তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারি না। জগৎ যেমন তাঁহার মন্দির, সেইরূপ আত্মার মধ্যেও তাঁহার মন্দির প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে এবং সমস্ত ঘটনাচক্রের মূলে তিনি চক্রী হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন। চিন্তাদ্বারা এইভাব কিয়ৎপরিমাণে আয়ত্ত করা যায় বটে, কিন্তু যখন উপাসনার মধ্য দিয়া ঈশ্বর স্বয়ং আত্মস্বরূপ প্রকাশিত করেন তখনই প্রকৃতভাবে ইহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

খ। দেখিতেছি এ জগতে কিছুই স্থায়ী নহে, সকলই পরিবর্ত্তনশীল। এই পরিবর্ত্তনের মূলে সত্য, অপরিবর্ত্তনীয় কি আছে ভাবিতে ভাবিতে মন এমন এক সত্তায় উপনীত হয় যাহার পরিবর্ত্তন নাই। এই অবস্থায় দেশকালবোধ চলিয়া যায়—কেবল এক গম্ভীর, অনির্ব্বচনীয় সত্তাসাগরে মন একেবারে মগ্ন হইয়া যায়।

গ। আর্য্যঋষিদের ও ঈশার মত যিনি 'সোঽহং' বলিতে পারেন তিনিই ব্রহ্মজ্ঞান উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। ইহার অর্থ 'আমি ব্রহ্ম' নহে। মহাসমুদ্রে ও একবিন্দু জলেতে যেরূপ তুলনা করা যাইতে পারে, ঈশ্বরেতে ও আমাতেও সেইরূপ। সমস্ত বস্তুতে সেই সত্তা রহিয়াছে। সেক্সপীয়রের সেক্সপীয়রত্ব হ্যাম্‌লেটেও আছে, আবার সেক্সপীয়রেও আছে। সেইরূপ ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব আমাতেও আছে, তাঁহাতেও আছে। হ্যাম্‌লেট্ যদি চেতন পদার্থ হইত তাহা হইলে বলিতে পারিত আমাতে সেক্সপীয়রত্ব আছে। এই বিষয়টী বড় গুরুতর। ইহা উপলব্ধি করিতে হইলে বিশেষ চিন্তা ও সূক্ষ্মদৃষ্টি আবশ্যক।

ঘ। সত্যস্বরূপের মধ্যে ঈশ্বরের সকল স্বরূপই নিহিত রহিয়াছে। যখন ঈশ্বরের প্রকাশ হৃদয়ে খুব উজ্জ্বল হয় তখন 'আমিত্ববোধ' ক্ষীণ হইয়া আসে। জড় চক্ষুদ্বারা যেমন বাহিরের বস্তু দেখিতেছি, সেইরূপ আধ্যাত্মিক চক্ষুদ্বারা ঈশ্বরকে দেখা যায়, কেবল অভ্যাসের অভাবে তাহা পারি না—এই ভাবে চিন্তা করিতে করিতে ঈশ্বরের সত্তা উজ্জ্বল হইয়া উঠে এবং বাহ্যজ্ঞান কমিয়া আসে। জড় জগতের উদাহরণ

দিয়া বলিতে গেলে, জড় পদার্থ সম্বন্ধে আকাশ (Space) যেরূপ আত্মার সম্বন্ধে ঈশ্বরের সত্তাও সেইরূপ। ঈশ্বরের অন্যান্য স্বরূপ উপলব্ধি যে পরিমাণে উজ্জ্বল হয়, সত্য স্বরূপের অনুভূতিও সেই পরিমাণে উজ্জ্বল হইতে থাকে।

ঙ। আপনাকে ও বহির্বস্তুকে যতই অসার বলিয়া উপলব্ধি করা যায় ততই মন ঈশ্বরের সত্তায় ডুবিয়া যায়।

চ। ঈশ্বরকে দেখিবার স্থান তিনটী (১) জড় জগৎ, (২) ইতিহাস, (৩) আত্মা। কিন্তু এই তিন স্থানে তিনটী প্রতিবন্ধক আছে। আমরা জড় জগৎকে মুখে অসার বলি কিন্তু কার্য্যতঃ সার বলিয়া বিশ্বাস করি। জড় জগৎ যে একেবারে মায়া তাহা নহে, কিন্তু পরিবর্ত্তনশীল। জড়কে অসার ভাবিলে ঈশ্বরকে শক্তিরূপে দেখা যায় এবং বিশ্বাসের সঞ্চার হয়। যতদিন জড় জগতের শক্তিকে অন্ধশক্তি বলিয়া মনে হয় তত দিন বিশ্বাস ক্ষীণ থাকে। কিন্তু ঈশ্বরকে কেবল শক্তিরূপে ভাবিলেই যথেষ্ট হইল না। শক্তিরূপে উপলব্ধির মধ্যে একটু পরোক্ষ ভাব আছে। কিন্তু সমস্ত বস্তুকে তাঁহার আবির্ভাব বলিয়া অনুভব করিলে উহারা আর আমাদের দৃষ্টিকে আবরণ করিতে পারে না। তখন জড়ের জড়ত্ব চলিয়া যায় এবং ঈশ্বর স্বয়ং বিশ্বরূপ স্বরূপে প্রকাশিত হন। এইরূপে জড়কে জয় করা যায়। আত্মার মধ্যে ঈশ্বর দর্শনের প্রতিবন্ধক আমিত্বের ভাব। আমরা 'আমার চিন্তা' 'আমার ভাব', 'আমার ইচ্ছা' বলি ও ভাবি। ইহার মূলে ঈশ্বরের শক্তি আছে ভাবিলেও আমিত্ব একটু থাকে। কিন্তু যদি ভাবা যায় যে তাঁহাকে ছাড়িয়া আমি কিছুই নহি, তাহা হইলে আমাকে দেখিতে গিয়া তাঁহাকে দেখা যায়। তিনি অসীম, আমি সসীম; আমাতে ও তাঁহাতে প্রভেদ ত আছেই, কিন্তু আমার তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র একটা সত্তা নাই। এইভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে যে আমিত্ব ঈশ্বর দর্শনের পথে প্রথমে বাধা দিয়াছিল, তাহাই পরে ঈশ্বরকে প্রকাশ করে। এ অবস্থায় আত্মবোধ অনেক সময় চলিয়া যায় বটে, কিন্তু থাকিলেও কোন বাধা হয় না। নিজের আত্মায় ঈশ্বর দর্শনের বাধা যে প্রণালীতে দূর হয়, সাধু জীবনে ঈশ্বর দর্শনের বাধাও সেই প্রণালীতে দূর হয়। তখন সাধুর সাধুতা ঈশ্বরেরই প্রকাশ বলিয়া মনে হয়।

ছ। সত্য স্বরূপের মধ্যে যে সকল ভাব নিহিত আছে তাহার মধ্যে একটী ভাব এই যে, সকলই অনিত্য, পরিবর্ত্তনশীল, কেবল ঈশ্বর চিরস্থায়ী। উপাসনার সময় এই ভাবে চিন্তা করিলে অনেক সাহায্য হয়। আর একটী ভাব এই যে,—সৎপদার্থ এক ভিন্ন দুই নহে। সত্য অর্থে যাহা আছে। সকলই ত আছে? গাছ আছে, গাছ তবে সত্য নহে কেন? গাছ নিজে নিজে থাকিতে পারে না। আমার মনের ভাব সকল আমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। আমার জ্ঞান ও শক্তিকে অতিক্রম করিয়া তাহাদের স্বতন্ত্র সত্তা অসম্ভব। সেইরূপ ঈশ্বরকে ছাড়িয়া কোন পদার্থের স্বতন্ত্র সত্তা নাই। (Absolute existence) নিরবলম্ব সত্তা, অর্থাৎ যে সত্তা অপর কাহারও উপর নির্ভর করে না তাহা ঈশ্বরের। অন্য বস্তুর সত্তা আপেক্ষিক (relative)

আলোচনান্তে স্থির হইল যে যখন সঙ্গতের অধিকাংশ সভ্য পূজার ছুটী উপলক্ষে অন্যত্র গিয়াছেন তখন সঙ্গতের কার্য্য তিন সপ্তাহের জন্য বন্ধ রাখাই ভাল। তদনুসারে আগামী ২রা কার্ত্তিক মঙ্গলবার পুনরায় কার্য্যারম্ভ হইবে, এবং এখন হইতে সন্ধ্যা ৭॥ টার পরিবর্ত্তে ৬॥ টার সময় সঙ্গতের অধিবেশন হইবে।

প্রেরিত পত্র।

ব্রহ্মের ক্রিয়াশীলতা।

মহাশয়!

বর্ত্তমানে ব্রাহ্মসমাজে যে সাধন-প্রণালী প্রচলিত আছে, তাহাতে একটী অতি গুরুতর বিষয়ের অভাব আছে বলিয়া বোধ হয়। সে বিষয়টী এই যে, ঈশ্বরের ক্রিয়াশীলতার ভাব অর্থাৎ তিনি যেমন জ্ঞান, প্রেম ও পবিত্রতাতে পরিপূর্ণ রহিয়াছেন, তেমনি তিনি যে "অনন্ত ক্রিয়াশীল" এই ভাবটী বিশেষভাবে আমাদের সাধন-প্রণালীর মধ্যে সাধিত হইতেছে না। এই ক্রিয়াশীলতার ভাব বিশেষভাবে সাধন করিতেছি না বলিয়াই আমরা দিন দিন অলস ও জড়প্রায় হইয়া পড়িতেছি। আমাদের আদর্শ স্বয়ং ঈশ্বর; বর্ত্তমান সাধন-প্রণালীতে—আরাধনা প্রণালীতে—তাঁহার যে সমস্ত স্বরূপের আমরা সাধন করি, অর্থাৎ "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি শান্তং শিবমদ্বৈতম্। শুদ্ধমপাপবিদ্ধং" তাহার সহিত এই অনন্ত ক্রিয়াশীলতার ভাবও সাধন করা আবশ্যক। উক্ত প্রণালীতে যেমন বিশেষ ভাবে জ্ঞানের, প্রেমের ও পবিত্রতার সাধনের ভাব দেখাইয়া দিতেছে, সেইরূপ বিশেষভাবে তাঁহার ক্রিয়াশীলতার ভাব দেখাইয়া না দিলে সাধনপ্রণালীটী অপূর্ণ থাকে; সুতরাং আমার বিবেচনায় "শুদ্ধমপাপবিদ্ধং" এই শব্দটীর পরে "নিরলসং" বা "সক্রিয়ং" অথবা উক্ত ভাবপ্রকাশক অন্য কোন শব্দ যোগ করিয়া একত্রে চারি অঙ্গের সাধন করিলে ভাল হয়। এক্ষণে শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মভ্রাতাদিগের নিকট নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন এই বিষয় একটু মনোযোগপূর্ব্বক বিশেষভাবে বিবেচনা করেন।

কলিকাতা
২৭এ আশ্বিন। } শ্রীকুঞ্জবিহারী সেন।

প্রদেশীয় ব্রাহ্মসমাজ।

চট্টগ্রাম, পটিয়া শাখা প্রার্থনা সমাজ।

আমাদের পটিয়াস্থ কোন বন্ধু লিখিয়াছেন;—১২৯৩ বঙ্গাব্দের ১৮ই আশ্বিন (ইং ১৮৮৬ ৩রা অক্টোবর) তারিখে দুর্গোৎসবের বোধন পূজার দিন পটিয়া প্রার্থনা সমাজের উদ্বোধন করিয়া সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়; এবং ১৯এ, ২০এ, ২১এ ও ২২এ

আশ্বিন তদুপলক্ষে উৎসব হয়। পরে ১২৯৩ বঙ্গাব্দের ১৪ই চৈত্র "চট্টগ্রাম প্রার্থনা সমাজ" সংস্থাপিত হইলে ইহাকে তদন্তর্ভূত করিয়া সম্প্রতি "পটিয়া শাখা প্রার্থনা সমাজ" নামে অভিহিত করা হইয়াছে। বিগত দুর্গোৎসবের সময় ইহার জন্মোৎসব হইয়া গিয়াছে। নিম্নে তাহার কার্য্য বিবরণ প্রকাশ করা গেল।

৬ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার ডাক্তার দক্ষিণারঞ্জন খাস্তগির উৎসবের উদ্বোধন ও প্রার্থনা করেন, এবং উপাসকমণ্ডলীকে তৎসময়োচিত উৎসাহ প্রদান করেন।

৭ই আশ্বিন শুক্রবার প্রাতে ডাক্তার দক্ষিণারঞ্জন খাস্তগির উপাসনার কার্য্য করেন ও শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের "ধর্ম্ম কি?" এই বক্তৃতাটী অবলম্বন করিয়া তৎসম্বন্ধে উপদেশ দেন। মধ্যাহ্নে শাস্ত্রপাঠ ও আলোচনাদি হয়; সায়ংকালে বাবু সত্যরঞ্জন খাস্তগির উপাসনা করেন ও "পৌত্তলিকতা অসার" এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

৮ই আশ্বিন শনিবার প্রাতে বাবু হরিশ্চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের উপাসনা করিবার কথা ছিল। কিন্তু তাঁহার অনুপস্থিতিতে ডাক্তার দক্ষিণারঞ্জন খাস্তগির উপাসনা করেন ও "সমাজ কেন?" এই বিষয় উপদেশ দেন। মধ্যাহ্নে পূর্ব্ববৎ শাস্ত্রপাঠ ও আলোচনাদি হয়। সায়ংকালেও তিনি উপাসনা করেন, এবং "বিশ্বাসের ফল" এই বিষয়ে উপদেশ দেন। তাহাতে প্রকৃত ঈশ্বর বিশ্বাসী কেমন সুন্দররূপে সাংসারিক বাধা বিপত্তি হইতে রক্ষা পাইয়া ধর্ম্মজীবন লাভ করেন, তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। কথাগুলি বেশ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

৯ই আশ্বিন রবিবার প্রাতে বাবু সত্যরঞ্জন খাস্তগির উপাসনা করেন, এবং উপাসকমণ্ডলীকে তৎসময়োচিত উৎসাহ প্রদান করেন। মধ্যাহ্নে বালক বালিকাদের উৎসব হয়। বালক বালিকাগণ অন্দর মহল হইতে প্রেম, প্রীতি, দয়া, ভক্তি পবিত্রতা ইত্যাদি শব্দাঙ্কিত ছোট ছোট নিশান হাতে করিয়া গান করিতে করিতে সারি সারি হইয়া মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করে। বালক বালিকাগণের কপালে একটী করিয়া চন্দনের ফোঁটা ও গলায় উলের মালা দেওয়াতে বেশ সুন্দর দেখাইয়াছিল। তাহারা মন্দিরে প্রবেশ করিলে আর একটী সঙ্গীতের পর বাবু সত্যরঞ্জন খাস্তগির উপাসনা ও প্রার্থনা করেন।

আহা! কি হৃদয়বিদারক কথা! ধর্ম্মবিরোধীদিগের অত্যাচার আর প্রাণে সহ্য হয় না। পরমেশ্বর তাঁহাদের হৃদয়ে আলোক প্রদান করুন! সেই দিন আমাদের এই সকল কার্য্যাদি দেখিয়া দেশের পৌত্তলিক বৃদ্ধগণ ঈর্ষায় ও রাগে দগ্ধ হইতেছিলেন। আমাদের উপর তাঁহাদের বিশেষ হাত না থাকাতে তাঁহারা আমাদিগকে কিছু বলিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহারা পেন্সন-প্রাপ্ত সব জজ ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু উমাচরণ খাস্তগির মহাশয়ের কাছে গিয়া আমোদের জন্য মিছামিছি আমরা পৌত্তলিকদিগকে কাফের ইত্যাদি কুৎসিত ভাবে নিন্দা করিতেছি বলিয়া বলেন। যদিও পূর্ব্বে তাঁহার আমাদের প্রতি তত দৃষ্টি ছিল না, কিন্তু ইহাতে তিনি আমাদের উপর নিতান্ত বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন এবং সেই দিন আমাদের যেমন বালক বালিকাদের উৎসব আরম্ভ হইয়াছে, তিনি আসিয়া তথায় উপস্থিত হন। আমরা তাহা জানিতে পারি নাই। তিনি আসিয়া এক একটী ছেলেকে ও উপাসকমণ্ডলীকে নাম করিয়া ডাকিয়া লইয়া যান ও নানাপ্রকার ভৎসনা ও তিরস্কার করিয়া তাড়াইয়া দেন; অবশেষে মন্দিরের মধ্যে কেবল ডাক্তার দক্ষিণারঞ্জন খাস্তগির, বাবু সত্যরঞ্জন খাস্তগির ও বাবু চৈতন্যচরণ দাস এই তিন জন মাত্রই উপাসনা করিতেছিলেন। তাঁহারা উপাসনা ভঙ্গ করিয়া তাঁহার গালাগালির দিকে মনোযোগও করেন নাই,এবং তিনিও তাঁহাদিগকে যদিও অনেক গালাগালি দিলেন, কিন্তু তাঁহারা তাঁহার কথা রক্ষা করিবেন না মনে করিয়া তাঁহাদের কাহাকেও ডাকেন নাই। এইরূপে ত বালক বালিকাদের উৎসব শেষ হইয়া গেল। সায়ংকালীন উপাসনাতেও অন্য আর কেহ যোগ না দেওয়াতে কেবল নিয়মিত উপাসনা ব্যতীত আর কোন কার্য্য হইতে পারে নাই;—এইরূপে ত নানা প্রকার গোলযোগ হইয়া সায়ংকালীন উপাসনার পর উৎসবের কার্য্য শেষ হইয়া যায়। পর দিন ১১ই আশ্বিন মঙ্গলবার ভক্তি ভাজন উমাচরণ বাবু কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গেলে পর উপাসক মণ্ডলী ও ছেলেগণ আসিয়া অনুরোধ করাতে অপরাহ্ন ৬ ঘটিকার সময় সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা করিয়া নগর সংকীর্ত্তনে বাহির হওয়া গেল। নগর সংকীর্ত্তন হইতে ফিরিয়া আসিয়া উপাসক মণ্ডলী ও বালক বালিকাদিগকে মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

যদি সোঝাসুঝি প্রশ্ন করা যায়, লেখা পড়া জানা মানুষের পক্ষে কর্ত্তব্য কি না? তাহা হইলে বোধ হয় চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই একবাক্যে উত্তর দিবেন যে বিদ্যাশিক্ষা করা মনুষ্য মাত্রেই কর্ত্তব্য। অথচ ধর্ম্ম প্রচারকদিগের সম্বন্ধে এ বিষয়ে যে কোন মত ভেদ হইবে তাহা বুঝিতে পারা যায় না। সংসারের অন্যান্য কর্ত্তব্য সুচারু রূপে সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত যদি জ্ঞানালোকের আবশ্যকতা থাকে, তবে ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যটা কি এতই সহজ যে তাহার জন্য জ্ঞানালোচনার প্রয়োজন নাই? বিশেষতঃ সকল ধর্ম্ম হইতে সত্য গ্রহণ করা, সকল সাধুজীবন হইতে সদৃষ্টান্ত গ্রহণ করা, যখন ব্রাহ্ম ধর্ম্মের একটী শ্রেষ্ঠ উপদেশ তখন ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক অন্যান্য ধর্ম্ম বিধানের আলোচনা না করিয়া, পৃথিবীতে এপর্য্যন্ত যে সকল সাধু মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের জীবন সম্বন্ধে গভীর চিন্তা না করিয়া, কিরূপে নিজের কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করিতে পারেন? বিশেষতঃ যখন তিনি একটী নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিতে যাইতেছেন, তখন তিনি যে সমাজেই যাইবেন সেই সমাজের প্রচলিত ধর্ম্মমত অপেক্ষা তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম যে শ্রেষ্ঠ তাহা দেখাইতেই হইবে। কিন্তু ঐ সকল প্রচলিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান না থাকিলে কিরূপে ইহা সাধিত

হইতে পারে? সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকের পক্ষে উন্নত ধর্ম্ম জীবনের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ধর্ম্ম ও সাধু মহাত্মাদিগের জীবন সম্বন্ধে উপযুক্ত জ্ঞান থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। এবং লেখা পড়ার চর্চ্চা ব্যতীত, সংস্কৃত অথবা ইংরাজী ভাষায় কিয়ৎ পরিমাণ অভিজ্ঞতা ব্যতীত এই জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব। •

যেখানে এমন দুইদল প্রচারার্থী উপস্থিত যাঁহারা ধর্ম্ম জীবন সম্বন্ধে সমান উন্নত, অথচ যাঁহাদের মধ্যে একদল সুশিক্ষিত এবং অপর দল অশিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত, এরূপ স্থলে যে সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণকেই প্রচার কার্য্যে নিয়োগ করা উচিত এ বিষয়ে বোধ হয় কোন প্রকার মতভেদ হওয়া সম্ভব নহে। এক্ষণে কথা হইতেছে যেস্থলে শিক্ষিত লোক প্রচারার্থী নাই, কেবল অশিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত লোক প্রচারার্থী, সে স্থলে কর্ত্তব্য কি? আমাদের বিবেচনায় এরূপ-স্থলে তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের শিক্ষার বন্দোবস্ত করা কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ প্রবেশোপযোগী সামান্যরূপ পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাহার পরীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক, ক্রমে উচ্চতর পাঠ্য নির্দ্দেশ ও উচ্চতর পরীক্ষার বন্দোবস্ত করা বাঞ্ছনীয়। বিদ্যা পরীক্ষা সম্বন্ধে প্রতিযোগী পরীক্ষাই একমাত্র উপায়। ইহা অপেক্ষা সহজে কাহারও বিদ্যা বুদ্ধির পরিমাণ করা যায় না। প্রচারকদিগকে সকল শাস্ত্রেই পণ্ডিত হইতে হইবে এমন কোন কথা নাই। যাঁহাদের উপর পাঠ্য নির্দ্দেশের ভার থাকিবে তাঁহারা উপযুক্ত গ্রন্থ নির্ব্বাচন করিয়া দিবেন। এ সম্বন্ধে কতক পরিমাণে শ্রমবিভাগও চলিতে পারে। প্রধান প্রধান ধর্ম্ম সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান লাভের পর এক এক জন প্রচারক নিজ নিজ রুচি ও শক্তি অনুসারে এক একটী বিশেষ ধর্ম্মশাস্ত্র বা সাধুজীবন বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিয়া সে সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান লাভ পূর্ব্বক সমাজের যথেষ্ট উপকার করিতে পারেন। আমরা আশা করি ব্রাহ্ম সাধারণ এই বিষয়টী এবং প্রচারকদিগের বয়সের সীমা নির্দ্দেশ সম্বন্ধে আমরা গতপূর্ব্ববারে যাহা বলিয়াছি তাহা একটু ধীরভাবে আলোচনা করিয়া দেখিবেন। ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে কোন প্রকার বাচনিক বা লিখিত পরীক্ষা সম্ভব নহে। এস্থলে সমাজের মধ্যে যাঁহাদের উপর সাধারণের শ্রদ্ধা আছে এরূপ ব্যক্তিগণ অনল্পকাল একজনের ব্যবহার ও ধর্ম্মজীবন পর্য্যালোচনা করিয়া যদি তাঁহাকে প্রচার ব্রতে ব্রতী হইবার সম্যক্ উপযুক্ত বিবেচনা করেন তবে সমাজ তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারেন। এ সম্বন্ধে অন্য কোন প্রকার উপায় সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু এই পর্য্যালোচনার কাল একটু অধিক হওয়া আবশ্যক। এ সম্বন্ধে তাড়াতাড়ি করিলে অত্যন্ত অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা।

আমরা যদি যথেষ্ট পরিমাণে সাধন ভজন করিতাম, অথচ আমাদের ধর্ম্ম জীবনের বিশেষ উন্নতি না হইত, তাহা হইলে ব্রহ্ম কৃপার উপর নির্ভর করিয়া থাকা শোভা পাইত। কিন্তু যখন আত্মচেষ্টা সম্বন্ধে বিলক্ষণ ত্রুটি রহিয়াছে, তখন আমাদের আর নিশ্চিন্ত থাকা কোন রূপেই কর্ত্তব্য নহে। সুবিধা ও অনুকূল অবস্থার জন্য এতদিন অপেক্ষা করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিয়াছি। কি অনুকূল, কি প্রতিকূল সকল অবস্থাতেই যখন পরমেশ্বর আমাদিগকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত, তখন আমরা প্রতিকূলতার সময় আলস্যে কাল কাটাইয়া, অথবা অর্দ্ধেক হৃদয়ের সহিত চেষ্টা করিয়া, কিরূপে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি? আমাদের দৈনিক জীবন দেখিয়া কে বলিবে, যে আমরা পিপাসু লোক, ও প্রভু পরমেশ্বরকে লাভ করিবার জন্য সাধন ভজন করিয়া থাকি? লোক দেখান সাধন কপটতা ও আত্মার বিনাশের হেতু, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু সংসারের সকল কাজ উৎসাহের সহিত পূর্ণ মাত্রায় করিয়া বাকী সময় টুকু দয়া করিয়া ধর্ম্ম সাধনে নিরুৎসাহ ভাবে ব্যয় করিলেও যে বিশেষ ফল হয় না, ইহাও নিশ্চয় কথা। ব্রাহ্ম ভাই, তুমি যে প্রভুর জন্য ব্যগ্র বলিয়া আপনাকে প্রচার করিতেছ, বল দেখি, প্রভুর জন্য তুমি কি কি ত্যাগ স্বীকার করিয়াছ? চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কতটুকু সময় তুমি প্রভুর নিকটে থাক? শুধু বাক্যের শ্রাদ্ধ, তর্ক বিতর্ক ও বাহিরের কার্য্য প্রণালীর বিশুদ্ধতায় কি হইবে? যিনি মূলাধার, যিনি সর্ব্বস্ব, যিনি বাঁচাইলে বাঁচি, মারিলে মরি, তাঁহাকে প্রাণের এক কোণে ঠেলিয়া, কল্পনা ও নিয়মের সূক্ষ্মতা লইয়া থাকাই যদি ব্রাহ্ম ধর্ম্ম হয় তবে সে ধর্ম্ম শীঘ্র অন্তর্হিত হওয়াই মঙ্গলের বিষয়। নিরাকার ব্রহ্ম লাভ কি সাধারণ কথা? "সহজে বল কে কোন কালে পেয়েছে সেই ব্রহ্মধন ?" বিশেষ চেষ্টা ভিন্ন সংসারে এক কড়া কড়ি পাওয়া যায় না, আর অবশিষ্ট সময়ের চেষ্টা দিয়া আমরা অমূল্য ব্রহ্ম রত্ন পাইবার আশা করি! বিদ্যা লাভ করিতে লোকে কতই শ্রম স্বীকার করে, বিদ্যা যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছে, তাঁহাকে কি অমনি বিনা আয়াসে লাভ করিব? আধ্যাত্মিকতার অভাবে আমরা যে এত কষ্ট পাইতেছি, সে কেবল সাধনাভাবের জন্য। সাধন ভজনের স্রোত পূর্ব্বের মত পুনঃপ্রবাহিত না হইলে, সমাজ অচিরে একটী সঙ্কীর্ণ সম্প্রদায়ে পরিণত হইবে।

নির্জ্জনে বিদ্যার উপাসনা না করিলে বিদ্যা আসেন না; নির্জ্জন সাধন ভিন্ন বিশুদ্ধ প্রণয় নীরস ও জীবনবিহীন হইয়া যায়। নির্জ্জন উপাসনা ভিন্ন যে আমাদের ধর্ম্মজীবন ম্লান হইয়া যাইবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি? নির্জ্জন সাধন ভক্তের প্রাণ। ঈশ্বরের সঙ্গে যত অধিক সময় আমরা নির্জ্জনে থাকি, তত আমাদের জীবন সবল ও কার্য্যকারী হয়। তাঁহার সহিত এই নির্জ্জন সহবাসে যে কেবল তাঁহার সঙ্গেই পরিচিত হওয়া যায় এমন নহে, আপনার পরিচয়ও সঙ্গে সঙ্গে লব্ধ হয়। আত্ম জ্ঞান যেমন ব্রহ্মজ্ঞানলাভের সহায়তা করে, ব্রহ্মজ্ঞানও তেমনি আত্মজ্ঞান উজ্জ্বল ও পরিষ্কার করিয়া দেয়। নির্জ্জন উপাসনা সম্বন্ধে আমাদের জীবনে যে কত ত্রুটি আছে, তাহা মনে করিলে লজ্জিত হইতে হয়। প্রথমতঃ অতি অল্প লোকই নিষ্ঠা সহকারে প্রতিদিন নির্জ্জন উপাসনা করিয়া

থাকেন। দ্বিতীয়তঃ যে অল্প সংখ্যক লোক প্রত্যহ নির্জ্জন উপাসনা করেন, তাঁহারা সকলে আবার পূর্ণাঙ্গ উপাসনা করেন না। কেহ বা একটী প্রার্থনা করিয়া উপাসনা শেষ করেন, কেহ বা সত্যজ্ঞান প্রভৃতি স্বরূপ গুলি আবৃত্তি করিয়া তৃপ্ত হন। যাঁহারা আবার পূর্ণাঙ্গ উপাসনা করেন, তাঁহারা হয় ত সমস্ত দিনে একবার ঐরূপ উপাসনা করিয়াই সন্তুষ্ট হন। সকল বিষয়েরই আদর্শ উত্তরোত্তর উন্নত হওয়া চাই, নহিলে জীবন সমভাবে থাকিবে, অথবা অবনতির দিকে যাইবে। নির্জ্জন উপাসনা সম্বন্ধে আমাদের আদর্শ উন্নত হওয়া দূরে থাকুক, কতক পরিমাণে যে অবনত হইয়াছে, এ কথা পর্য্যন্ত সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে। কাজেই আমরা বিশ্বাসহীন, প্রীতিহীন, নীরস ও নিষ্ফল ধর্ম্ম জীবন লইয়া প্রভুর স্বর্গরাজ্য সংস্থাপনের পথে কণ্টক রোপণ করিতেছি।

প্রাপ্তি স্বীকার।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি। সময়াভাবে আজিও উহাদের কোন প্রকার সমালোচনা করিতে পারি নাই। লেখকগণ তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন;—

(১) হরি সঙ্কীর্ত্তন;—শ্রীযুক্ত উমানাথ মিশ্র দ্বারা রচিত। (২) উপাসনাই ধর্ম্মের প্রাণ—পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রহ্ম মন্দিরে শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ, কর্ত্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতা। (৩) পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্ম সমাজের ১২৯২ সনের বার্ষিক কার্য্য বিবরণ। (৪) লর্ড মেট্‌কাফের সংক্ষিপ্ত জীবনী—শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ সেন প্রণীত। (৫) শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রস্তাব (ইংরাজী) A Treatise on Education—শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ সেন প্রণীত। (৬) জন হাউয়ার্ড—শ্রীযুক্ত শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। (৭) অঞ্জলী—শ্রীইন্দুভূষণ রায় প্রণীত।

সংবাদ।

পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্ম সমাজ;—"গত বৃহস্পতিবার হইতে শনিবার পর্য্যন্ত পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্ম সমাজের শারদীয় উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে প্রসিদ্ধ বক্তা শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ, বৃহস্পতিবার রাত্রে 'ব্রাহ্মধর্ম্মের শিক্ষা ও সাধন' এবং শুক্রবার রাত্রে 'ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃত শত্রু' বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।"—ঢাকা গেজেট।

ঢাকা নীতিরক্ষিণী সভা;—ঢাকায় ষ্টার থিয়েটার কোম্পানিকে লইয়া যে গোলযোগ হয়, তদুপলক্ষে সকল সম্প্রদায়ের ছাত্র মিলিয়া 'নীতিরক্ষিণী সভা' নামে একটী সভা সংস্থাপন করিয়াছেন। আমরা হৃদয়ের সহিত এই সভার উন্নতি কামনা করি।

বজরং বিহারী;—আমাদের শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা বজরং বিহারী নিজের ও পরিবারের শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন কলিকাতায় অবস্থিতি করিতেছেন।

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন;—ইনি সম্প্রতি কলিকাতায় অবস্থিতি করিতেছেন। ইনি কয়েক রবিবার কলিকাতার মন্দিরে উপাসনা করেন ও উপদেশ দেন, এবং কুমারখালি ব্রাহ্ম সমাজের উৎসব সম্পন্ন করিয়া আবার কলিকাতায় আসিয়াছেন।

বাবু নবদ্বীপ চন্দ্র দাস;—ইনি কয়েক দিবস হইল চট্টগ্রাম হইতে ফিরিয়া আসিয়া কলিকাতায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। সম্প্রতি উত্তর বাঙ্গালা ব্রাহ্ম সমাজের উৎসব উপলক্ষে সৈয়দপুর গিয়াছিলেন, সেখান হইতে প্রত্যাগমনের পর বৈদ্যনাথ গিয়াছেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী;—ইনি শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ কলিকাতার বাহিরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ইহার মধ্যেও কোন কোন রবিবার মন্দিরে সায়ংকালীন উপাসনার কার্য্য করিয়াছেন। ১৬ই আশ্বিন রবিবার ইনি কলিকাতা ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা করেন এবং 'জীবন্ত ও মৃত ধর্ম্ম' সম্বন্ধে উপদেশ দেন। ইনি এক্ষণে কলিকাতায় আছেন।

তত্ত্বকৌমুদীর মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার।

(ফেব্রুয়ারি, মার্চ্চ, ১৮৮৭)

নাম	স্থান	মূল্য
বাবু তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়	কলিকাতা	১৲
,, অন্নদা চরণ খাস্তগিরি	ঐ	॥০
,, ক্ষেত্র মোহন ধর	ঐ	॥০
,, রজনী নাথ রায়	ঐ	২॥০
শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী	কাসিমবাজার	৩৲
বাবু নন্দলাল মিত্র	কলিকাতা	১৲
,, দ্বারকা নাথ ঘোষ	ঐ	১৲
,, তারকনাথ ঘোষ	মেদিনীপুর	১॥৵০
,, বেণীমাধব পান	কলিকাতা	২॥০
,, রামচরণ পাল	বেতালসুদ	১॥৵০
,, কেদারনাথ মিত্র	কলিকাতা	২॥০
,, উমেশচন্দ্র ঘোষ	ঐ	২॥০
,, দুকড়ি ঘোষ	ঐ	২॥০
,, শ্যাম লাল ঘোষ	ঐ	২॥০
,, মোহিনী মোহন বসু	ঐ	২৲
শ্রীমতী চঞ্চলা বোস	মাকালপুর	৩৲
বাবু হেমচন্দ্র সুর	ছাপরা	৪৲
,, শম্ভু চন্দ্র নাগ	সিউড়ি	২॥৵০
,, প্রসন্ন কুমার রায়	মিরপুর	৫৲
,, পরেশনাথ সেন	কলিকাতা	১॥০
,, দ্বারকানাথ মল্লিক	ঐ	২॥০
,, গগন চন্দ্র সেন	জামালপুর	৩৲
,, নিবারণ চন্দ্র দাস	মানিকদহ	২॥০
,, লালন চন্দ্র দাস	চকগরোপুর	২।৵০
,, নীলমণি ধর	মেদিনীপুর	৩৲
বাবু আশুতোষ ঘোষ	কলিকাতা	২॥০
,, ভগবান চন্দ্র দাস	কটক	১৸০
,, হেমচন্দ্র দাস	কলিকাতা	১॥০
ম্যানেজার মজুমদার কোম্পানি	ঐ	২॥০
বাবু চাঁদ মোহন মৈত্র	হিজলাবট	৩৲
,, গুরুচরণ মহালনবিশ	কলিকাতা	২॥০
মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজ সম্পাদক		৩৲
শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর		২॥০

ক্রমশঃ

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার সভ্য নির্ব্বাচন সম্বন্ধীয় ২য় নিয়মানুসারে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের অবগতির জন্যে নিবেদন করা যাইতেছে যে, আগামী ১৮৮৮ সালের জন্য যাঁহারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার সভ্য হইতে ইচ্ছুক আছেন, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপন আপন নাম আগামী ২১এ নবেম্বরের মধ্যে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ কার্য্যালয়ে প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

সাঃ ব্রাঃ সমাজ, ১৮ই অক্টোবর ১৮৮৭ — শশিভূষণ বসু। সহঃ সম্পাদক।

১৩ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ব্রাহ্ম মিসন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা ৩রা কার্ত্তিক মুদ্রিত ও ২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১০ম ভাগ।
১৪শ সংখ্যা।

১৬ই কার্তিক মঙ্গলবার, ১৮০৯ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৮

বাৎসরিক অগ্রিমমূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

পূজার আয়োজন।

থাক কিছুক্ষণ।

বহু দিন পরে, যদি কৃপা ক'রে,
এলে ঘরে, তবে থাক কিছুক্ষণ;
বিরলে বসিয়া তোমারে লইয়া
ভুঞ্জি সহবাসসুখ অতুলন।
ছিনু এতকাল বঞ্চিত তোমায়
পেয়েছি, কদিন পরাণ ভরিয়া,
তাই আজি প্রাণ ছাড়িতে না চায়,
চায়, পড়ে থাকে চরণে মজিয়া।
হেরি' অপরূপ তব ব্যবহার,
হয়েছি অবাক্, নাহি সরে ভাষ,
নিলে নিলে বুঝি, পরাণ আমার,
জনমের মত, মিটাইলে আশ।
ধর হাত মম, ধর দৃঢ় ক'রে,
যেন নাহি পারি পলা'তে আবার,
যে পথে চালা'বে, প্রফুল্ল অন্তরে,
চলিব সে পথে না করি' বিচার।

প্রভু, সত্যই তোমার কাছে যাইবার পথ শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায়। একটু উনিশ বিশে স্বর্গ নরক তফাত হয়। যেই যোগের সূক্ষ্ম সূত্রটুকু ছিঁড়িয়া গেল, অমনই আঁধার দেখিলাম, আবার যেই তোমার সঙ্গে যোগ স্থাপন করিলাম, অমনি শান্তির বিমল জ্যোৎস্না প্রাণে প্রকাশ পাইল। যে বলে উনিশ বিশ বইতো নয়, উনিশই থাকুক, সে নামিয়া যায়। যে বলে পূর্ণ বিশ্বাসে প্রয়োজন কি? পনর আনা বিশ্বাসে চলিবে, তাহার বিশ্বাস কমিয়া ক্রমে শূন্যে দাঁড়ায়। প্রথম তোমার পথে যাইতে বড়ই ভয় করে। যে সেই পথের প্রথম ভাগের বিপদ্ দেখিয়া পলায়, সে হতভাগ্য পদে পদে মৃত্যুমুখে পড়ে। জীবনের জীবন, তোমাকে ছাড়িয়া অন্য কাহার কাছে মৃত আত্মা জীবন লাভ করিবে? যদি ধার্ম্মিক হইতে চাই, তবে যেন ষোল আনা ধর্ম্ম না পাইয়া সন্তুষ্ট না হই। কোন দিকে না চাহিয়া, সোজা পথে দৌড়িব, পথের বিপদ্ দেখিব না, মানিব না; উন্মুখ প্রাণ অবশ হইয়া কেবল তোমার দিকে ছুটিবে। এই গুরুতর ব্যাপার কি আমা দ্বারা সাধিত হইতে পারে? কুটাগাছটী তুলিবার ক্ষমতা আমার নাই, আর আমি আপন বলে শাণিত ক্ষুরধারের উপর দিয়া চলিব? অসম্ভব কথা। স্বর্গের দেবতা, স্বর্গীয় বলবিধানে আমাকে বলী ও উৎসাহিত কর যে, আমি নিরাপদে [illegible] উত্তীর্ণ হইয়া তোমার কাছে পৌছিতে পারি। পঞ্চমবর্ষীয় [illegible] ধ্রুব পথের বিপদ দেখিয়া নিরস্ত হয় নাই, আর আমরা বৃদ্ধ ও জ্ঞানবান্ হইয়াও বিপদের নাম শুনিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়ি! তুমি আমাকে ধ্রুবের মত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও তোমাতে একপরায়ণ করিয়া দাও।

আমার চক্ষুর দোষে আমি সব হারাইলাম। ভক্ত বৎসল, তোমার প্রেমে অনুরঞ্জিত চক্ষু লইয়া তোমার ভক্ত যখন সংসারে অবতরণ করেন, তখন সংসার, তাঁহার মনকে কলুষিত করিবে কি, নিজে পবিত্র হইয়া যায়। ভক্ত তাঁহার প্রসন্ন নয়ন মেলিয়া যে দিকে চান, সে দিক্‌টা নির্ম্মল ও শান্ত হইয়া যায়। সকল জিনিসেই তিনি তোমাকে দেখেন, বিশ্বে তাঁহার ব্রহ্মদর্শন লাভ হয়। আমি তোমাকে ভাল বাসিতে পারি না, আমার সেরূপ চক্ষুও নাই। বিশ্বে ব্রহ্ম দেখিতে আমাকে প্রচুর পরিশ্রম করিতে হয়। সহজ তো হয় নাই, কাজেই কষ্ট কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মজীবন চালাইতে হয়। ভক্তও সংসারে থাকেন, কাজ করেন, পরিবার প্রতি-পালন করেন ও লেখাপড়া করেন। আমি সংসারে থাকিয়া সংসার ধর্ম্ম পালন করি। কিন্তু তাঁহাতে আমাতে "আসমান জমীন" তফাত। তিনি তোমাকে সর্ব্ব কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া অনাসক্তভাবে অবস্থানপূর্ব্বক আনন্দ, সিদ্ধি ও শান্তিলাভ করেন, আমি আপনাতে সকল কর্ম্ম আরোপ করিয়া আসক্তির সমুদ্রে মগ্ন হইয়া অসুখ, বিফলতা ও অশান্তি সংগ্রহ করি। তিনি যে ভাবে সংসারকে দেখেন, তাহাতে তাঁহার অনাবিল মনের উপর বিন্দুমাত্র দাগ পড়ে না; আমি সহস্র উপাসনার ভাবে সজ্জিত হইয়া সংসারে নামি না কেন, আমার মন নামিবামাত্র কলুষিত হয়। তোমার পরিবার, তোমার সংসার, তোমার অর্থ জানিয়া শুনিয়াও অহংজ্ঞান পোষণ করি। হে জ্ঞান ও শান্তি চক্ষু, আমার দূষিত চক্ষু উৎপাটন করিয়া দিব্য

চক্ষু দাও যে, তুমি যে ভাবে চাও, সেই ভাবে সংসারকে দেখিয়া আমি ধন্য হই।

প্রভু, প্রণামমাহাত্ম্য প্রাণে প্রকাশ কর। কেবল কি মাথাই নোয়াইব,আর প্রাণটা সোজা ও কঠিন হইয়া থাকিবে? মাথা হইয়াছে কেন, তোমার চরণে প্রণত হইবে বলিয়া ত? প্রাণ হইয়াছে কেন, তোমার শরণ গ্রহণ করিবে বলিয়া ত? প্রাণ যখন তোমার পায়ে নুইয়া পড়ে, তখনই সে সুখী ও শীতল হয়। তোমার পূজার জন্য যে সৃষ্ট, তার জীবনের উদ্দেশ্য যেখানে সংসিদ্ধ হয়, কাজেই সেখানে সে যাইতে চায়। আমি মাঝে হতে কেন বাদ সাধি? আমি কেন প্রণামের পথে প্রতিবন্ধক হই? এত লোক মুক্ত হইয়া গেল, আর আমার এই দুষ্ট বুদ্ধিটা বিনষ্ট হবে না যে, একবার সাধ মিটাইয়া নমস্কার করি! মন যে কিসের অহঙ্কার করে জানি না;—তার আছে কি?—আমি তো কিছু দেখিতে পাই না—না আছে বৈরাগ্য, না আছে ভক্তি; তবে কিসের গর্ব্ব করিবে? তুমি তো ইহা নিশ্চয়ই জান। তুমি কেন জোর করিয়া প্রাণের মাথাটা নামাইয়া দাও না। ভক্ত লোকে তোমার নাম দর্পহারী রাখিয়াছেন, যদি আমার দর্প হইয়া থাকে, সে দর্প চূর্ণ করিয়া দাও। তোমা অপেক্ষা আমার দর্প আমার তো অধিক প্রিয় নহে। আমার প্রাণের মস্তকের উপর দাঁড়াও, আমি উদ্ধার হই। তোমার চরণই তাহার উপযুক্ত স্থান। সে চরণরেণু স্পর্শেই পাপীর পাপ নষ্ট হয়।

কেমন যে বৈদান্তিক ভাব প্রাণের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়া আছে, সহস্র সাবধানতাসত্ত্বেও মাঝে মাঝে নিষ্ক্রিয়শান্তি লাভের ইচ্ছা করিয়া বসি। গূঢ়ভাবে কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পাই যে, কাজের সময় তোমাকে আশানুরূপ পাই না বলিয়াই আমার ওরূপ ইচ্ছা হয়। তোমাকে পাওয়া আমার সকল সুখের হেতু, তোমার অভাব আমার সকল দুঃখের নিদান। আমি তো কখন কার্য্য করিতে নারাজ নহি, সংসারের জন্য অনেক খাটিয়া থাকি; কিন্তু তোমাকে ছাড়িয়া কি কাজ করিতে ভাল লাগে? কাজ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে তোমাকে স্মরণ করিলেও কিছু হয় না। অনুরাগী ভৃত্যের অনুরাগী হস্তকৃত কাজ এক রকম, আর বেগারের কাজ আর একপ্রকার। তোমার যে প্রেমিক, সে কেমন সন্তর্পণে, ভয়ে ভয়ে, প্রাণপণে তোমার কাজ করে! সদাই আতঙ্ক, পাছে তুমি সন্তুষ্ট না হও। এ দিকে তোমার মধুর বর্ত্তমানতাতে তাহার প্রাণ ক্রমাগত শান্তির ভিতর নামিয়া যাইতে থাকে। আর আমি এমন আত্মবিস্মৃত বা কার্য্যবিস্মৃত হইয়া কাজ করি যে আমার কাজকে কাজ বলাই যায়না; আমার কাজ কেবল সময় কাটান ও বেগার শোধ। তাই যদি না হবে, তবে আজ আমার এমন দশা কেন? আমি তোমাকে পাইয়াও পাইতেছি না, ধরিয়াও ধরিতে পারিতেছি না। প্রাণ কেবল উড়িয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে, স্থির হইয়া বসিতে পারিতেছে না। কঠিন কর্ম্মযোগ লাভ কি প্রভু আমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিবে না?

ঊষা কালে যখন তোমার কাছে বসি, তখন তোমার প্রকাশের কোমলতা, কি ঊষার নবীনত্ব, কিসে প্রাণ কণ্টকিত হইয়া উঠে বলিতে পারি না। সৌন্দর্য্যময় নির্ম্মল ঊষার পবিত্রতা যখন হৃদয়কে পূর্ণ করে, তখন আর অশ্রু সম্বরণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। প্রভু, এমনই করিয়া তুমিও আমার মন ঊষার মত পবিত্র করিয়া গড়িয়াছিলে, আমি তাহার উপর দিন রাত্রি কাদা মাটী লেপিয়া বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছি। আর কি তেমন হওয়া যায় না? প্রণষ্ট সৌন্দর্য্য আর কি ফিরিয়া আসে না? আর কি সুধাংশুনিন্দিত তুষারোপম পবিত্র শুভ্রতা লাভ করা যায় না? আত্মতত্ত্ববিৎ! তুমি বলিতে পার। আমি এই বুঝি যখন তোমার কাছে বসি, তখন আমার প্রাণের বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া শুভ্র হইয়া যায়। এতদিন পবিত্রতা কি বুঝিতে পারি নাই, এক রকম ছিলাম ভাল। এখন পবিত্রতার আলোক একটু একটু প্রকাশ করিতেছ, আর আমি বসিয়া যাইতেছি। প্রভাতের মত পবিত্রাত্মারা, হে পুণ্য রবি! তোমাকে দেখিয়া কৃতার্থ হন। আমি মহাপাপী, অমানিশার ঘন অন্ধকারে আমি আচ্ছন্ন, আমি কিনা তোমাকে দেখিতে চাই! আমি কেন আপনার হাতে আপনার সর্ব্বনাশ করিয়াছিলাম? কোথায় এতদিনে তোমার কোলে চড়িয়া স্বর্গে যাইতাম, না এখন তোমার কাছে অগ্রসর হইতে পারি না! আমার মলিনতাই তো তোমার প্রসন্ন মুখকে আমার প্রাণে এতদিন ফুটিতে দেয় নাই। সংসারের প্রণয়, ধন, মান কি আমার এ মলিনতা দূর করিতে পারে? তবে আমি তাদের বশীভূত থাকি কেন? সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার শরণাপন্ন হইতে বিলম্ব করি কেন? হে সুন্দর তুমিই রূপ গুণ বিধানের কর্ত্তা, তোমার অধীন হইলে আমার কুরূপ দূর হইবে। সুন্দর হইতে কাহার না ইচ্ছা হয়? কুৎসিৎ যে তাহার এই ইচ্ছা আরও প্রবল। তুমি এই কুৎসিতকে সুন্দর করিবে না কি?

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

ধর্ম্মজীবনে মৌলিকতা।

যে দেশের ধর্ম্ম ও জীবন গুরুবাদ ও অভ্রান্ত শাস্ত্রবাদের উপর ন্যস্ত সেখানে অনুকরণ ভিন্ন আর কি আশা করিতে পারা যায়? তাই আমাদের রীতি, নীতি, সাহিত্য কেবল পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ হইয়া উঠিয়াছে। মৌলিক চিন্তাশীল লোক পাওয়া আজ কাল সুকঠিন। এই মৌলিকতার অভাব ব্রাহ্মসমাজে, বিশেষতঃ আমাদের ধর্ম্মজীবনে প্রবেশ করিয়াছে। আমরা অন্যের কথায় উপাসনা করি, অন্যের ভাব লইয়া ভাবুকতার পরিচয় দিই, ও অন্যের উৎসাহ ঋণ করিয়া কার্য্য করি, এমন কি অন্যের সজীবত্ব লইয়া জীবিত থাকি! আপনার নিজস্ব কিছুই নাই। আমাদের মত কৃপাপাত্র দরিদ্র আর কোথায় পাওয়া যাইবে? সংসারে সুখ পাই না, সে পথে আপনি কণ্টক রোপণ করিয়াছি, অথচ আপনার কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আমাদের সমস্ত ধর্ম্ম ভাব পরাধীন ও সমাজসাপেক্ষ। আমাদের ভিতরে

এমন কিছু জন্মে নাই যাহা লইয়া আমরা ব্রাহ্ম সমাজ ও সাধুসঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াও দাঁড়াইয়া থাকিতে পারি। ভিত্তির অভাবে, আমরা শূন্যে ধর্ম্মের ক্রীড়াগৃহ নির্ম্মাণ করিতেছি। দশদিন ভাল অবস্থায় আছি, ভাল কথা শুনিতেছি, ভাল সঙ্গ সম্ভোগ করিতেছি, সে দশদিন বেশ উপাসনাদি চলিল; যেই অবস্থান্তর আসিল, অমনি এমন হইল যে আর উপাসনা করিতে পারি না। আমাদের হৃদয় ক্ষুদ্র মৎস্যের ন্যায় অল্প জলে খেলা করিতেছে, অধিক জলে মগ্ন হইতে পারে নাই। দশ বৎসর পূর্ব্বে যে কথা শুনিয়াছি বা কহিয়াছি, আজিও সেই কথা শুনিতেছি, শুনাইতেছি, যে ভাবে সেই কথা কহিয়াছি, আজিও সেই ভাবে কহিতেছি। ব্রাহ্ম ভাই, আপন বক্ষে হাত দিয়া, বল দেখি পাঁচবৎসর পূর্ব্বে সত্যস্বরূপ বলিলে ব্রহ্মের যে ভাব স্ফূর্ত্তি পাইত, আজিও কি ঠিক তাহাই হয়, না তাহার অপেক্ষা অল্প বা অধিক হয়? সঙ্গতেও পুরাতন কথার আলোচনা। সকল বিষয়েই আমরা কেবল চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিতেছি! নিজের কিছু নাই বলিয়া জীবনে মৌলিকতা প্রকাশ পাইতেছে না। এতদিন যে আমরা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ হইতে পৃথক্ ভাবে কার্য্য করিতেছি, ইহার মধ্যে আমরা বিশেষ কি করিতে পারিয়াছি? অধ্যাত্ম রাজ্যের কি নূতন সংবাদ প্রচার করিয়াছি? ঈশ্বর কি এখন নীরব থাকেন যে, অধ্যাত্মরাজ্যের সংবাদ পাওয়া যায় না? তাঁহার সহিত এখন আর কি জীবন্ত যোগ হয় না, যে জীবন সমভাবে রহিয়াছে? ব্রাহ্ম, তুমি যদি মৌলিক জীবন, মৌলিক ভাব ও জ্ঞান প্রভুর নিকট লাভ করিতে না পারিয়া থাক, তবে ব্রহ্মরাজ্যে বাস করিতে পারিবে না। যিনি নিত্যই নূতন, তাঁহার কাছে কেবল পুরাতন কথা! ব্রহ্মের উপাসক বলিয়া ভাণ কর, অথচ প্রত্যহ একই পাপ হইতে মুক্তি লাভের জন্য প্রার্থনা করিয়া থাক! ফুল্লারবিন্দনিন্দিত প্রফুল্ল বিভুপাদপদ্মে কোন্ প্রাণে কেবল শুষ্ক ও ম্লান কুসুমোপহার বিকীর্ণ কর?

কেহ কেহ বলেন ধর্ম্মের আবার নূতন কথা কি? সকল কথাই পুরাতনের পুনরাবৃত্তি মাত্র। কিন্তু ইহা কি সত্য কথা? আমাদের ধর্ম্মজীবনের অভিজ্ঞতা কি অন্যরূপ সাক্ষ্য দেয় না? কে না জানে যে শ্রুত বা অধীত সত্য অপেক্ষা সিদ্ধ সত্যই জীবনের সহায় হইয়া থাকে? অধ্যয়ন বা শ্রবণ দ্বারা সত্য আহরণ করা যায় সত্য, কিন্তু ঐ সত্য অধ্যয়ন ও শ্রবণে ততদিন নিবদ্ধ থাকে, যতদিন না উহা কার্য্যে পরিণত ও সিদ্ধ হইয়া মৌলিকতা প্রাপ্ত ও সাধকের নিজস্ব হয়। মনে কর, আমি শুনিলাম "ঈশ্বর পাপীর উদ্ধার সাধনের জন্য বড়ই ব্যস্ত," বাক্যার্থ আমার হৃদয়ঙ্গম হইল, কিন্তু জিনিসটা কি, প্রাণে প্রবেশ করিল না। পরিশেষে অনেক দিন পরে যখন জীবন বেদে ঈশ্বরের অঙ্গুলি চালনার নিদর্শন দেখিলাম, যখন যথার্থই উপলব্ধি করিতে পারিলাম যে প্রভু আমাকে ধরিবার জন্য ক্রমাগত কৌশল বিস্তার করিতেছেন ও যতক্ষণ ধরা না পড়িতেছি ততক্ষণ উৎকণ্ঠিত হইয়া ব্যস্তভাবে আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, তখন "ব্যস্ত ঈশ্বর" মহাবাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য আমার মনে প্রভাসিত হইল, তখন বুঝিতে পারিলাম যে "ব্যস্ত ঈশ্বর" বলিতে বলিতে ভক্ত কেন প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিয়া থাকেন। সকল ভক্তই তাই বলিয়া থাকেন, "হে সাধক আপন বাক্য সংযত কর, উপাসনা করিবার ও ধর্ম্ম পুস্তক পড়িবার ও শুনিবার সময় উপাসনার ও ধর্ম্মপুস্তকের কথার ভাবের প্রতি বিশেষরূপে মনোযোগ দাও।" বিজ্ঞানের সত্য শুনিয়া শিখা যায়। পণ্ডিত শিরোমণি নিউটন্ সমস্ত জীবন কঠিন মানসিক পরিশ্রম করিয়া যে বৈজ্ঞানিক সত্য সকল আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এখন এক জন তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র তাহা অনায়াসে কণ্ঠস্থ করিতে পারিবে, এবং তিনি যে উপায়ে সেই সত্য আবিষ্কার করেন তাহা একজন বি, এ হয় তো অক্লেশে বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু ধর্ম্মজগতে শুনিয়া শিক্ষা হয় না। শুনিয়া যা শিক্ষা হয়, তাহা থাকে না, সুখস্বপ্ন ঈষৎ-ক্ষণকাল প্রাণ চমকিত করিয়া অনন্তে পলাইয়া যায়। সাধনারূপ উপায়েই তাহা পুনঃ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ব্রাহ্মসমাজে মৌলিকতাহীন জীবন দেখিয়া কাহার প্রাণ না ব্যথিত হয়? আমাদের বাক্য নীরস, কার্য্য শুষ্ক, প্রাণ অস্থির, কিছুই ভাল লাগে না। কোথাও সুখ পাই না। যেখানে যাই, সেখানে বাজে কথা, যদি বা ধর্ম্মের কথা হয়, তবে সে কেবল চর্ব্বিত চর্ব্বণ, শুষ্ক পুরাতন কথা। নব নব ভাব আর হৃদি-কাননে বিকসিত হয় না, নিত্যনূতন দেবতার অর্চ্চনা আমরা বাসি শুষ্ক ফুলে সারিয়া থাকি। আমাদের মৌলিকতার এতই অভাব যে, আজিও আমাদের ধর্ম্ম বিজ্ঞান স্থির হইল না। নানা মুনি নানা বাদ প্রচার করেন, কেহ অদ্বৈতবাদ, কেহ মায়াবাদ, কেহ দ্বৈতবাদ সত্য বলেন. কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলে যে সত্যবাদ তাহার বিষয় কয়জন মৌলিক চিন্তাশীল ব্যক্তি চিন্তা করিয়া থাকেন? এই মৌলিকতা লাভের একমাত্র উপায় সর্ব্বগ্রাসী উপাসনা; যে উপাসনায় ভিতর ও বাহিরের প্রভেদ থাকে না, যে উপাসনায় ও উপাসকের জীবনে বিরোধিতা দেখা যায় না, এবং যে উপাসনার মধ্যে সমগ্র কার্য্যক্ষেত্র প্রবিষ্ট, সেই উপাসনা যাঁর অভ্যস্ত, সেই সাধকই মৌলিক চিন্তাশীল হইতে পারেন। যিনি সত্য শুনিয়া তৃপ্ত হন না, সত্য শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে তৎসাধনের বাধ্যতা অনুভব করেন, যিনি ভগবৎ কথা শুনিয়া তৃপ্ত হন না, ভগবৎ কথা শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে ইষ্টদেবতার অদ্বিতীয় পূর্ণাদর্শ অনুকরণের আবশ্যকতা বোধ করেন, মৌলিকতার রাজ্যে তাঁহারই প্রবেশের অধিকার। নিত্য নূতন কুসুমে ভগবদর্চ্চনা কেবল তাঁহারই পক্ষে সম্ভব। উহা তোমার আমার কর্ম্ম নহে। পরিত্রাণ রাজ্যের নিগূঢ় মর্ম্ম সকলের রহস্য যাঁহার কাছে প্রকাশিত, তিনিই প্রকৃত সাধু। তাঁহার সঙ্গ ক্ষণমাত্র লাভ করিলে জীবনের একটা পরিষ্কার বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া যাইতে পারে। মৌলিকতা লাভের যদি কোন সমাজ উপযোগী থাকে, তবে সে আমাদের সমাজ। আমরা ঈশ্বর বাণী ভিন্ন অভ্রান্ত শাস্ত্র মানি না, এবং ঈশ্বর ভিন্ন অন্য শক্তি-সঞ্চারী গুরু ও অন্য প্রতিভূ বা মধ্যবর্ত্তী পরিত্রাতা স্বীকার করি না। অনন্তকাল, অনন্ত আকাশ, সমগ্র ইতিহাস, অতীত ও বর্ত্তমান আমাদের সত্যাহরণ ক্ষেত্র। প্রমুক্ত আত্মা

কত উড়িতে পারে উড়ুক না কেন? কোন নির্দ্দিষ্ট গণ্ডী নাই যে আত্মাকে তাহাতে কারাবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইবে। এরূপ অনুকূল জল বায়ুতে যদি মৌলিকতার বীজ অঙ্কুরিত না হয়, আর কিছুতেই হইবে না। কেবল আমাদের চেষ্টার অপেক্ষা। কিন্তু যদি আমরা নিম্ন আদর্শ লইয়া সন্তুষ্ট থাকি, তাহা হইলে চেষ্টায় কিছু হইবে না। মৌলিকতার মূলাধার পরমেশ্বর আমাদিগকে শুভ বুদ্ধি দিন, আমাদের পুরাতন শুষ্ক ভাব বিনষ্ট হউক, আমরা নিত্য নুতন ভাবে তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া কৃতার্থ হই।

উপাসনা তত্ত্ব।

(৩)

উপাসনা কাহাকে বলে?

উপাসনা শব্দের সচরাচর দুই প্রকার অর্থ করা হয়। প্রথম ধাত্বর্থ; উপ এই উপসর্গপূর্ব্বক আস ধাতুর উত্তর অন ও আপ্ প্রত্যয় করিয়া উপাসনা পদ সিদ্ধ। উপ উপসর্গের অর্থ সামীপ্য, আস ধাতুর অর্থ উপবেশন করা। উপাসনার ধাত্বর্থ 'নিকটে উপবেশন করা'। সুতরাং উপাসনা শব্দ যখন ধাত্বর্থে ব্যবহৃত হয়, তখন দুইটী জিনিষ বুঝায়; প্রথম উপবেশন, দ্বিতীয় নৈকট্য। জীবাত্মার সঙ্গে ভ্রমরের অনেক সাদৃশ্য আছে। গুণ্ গুণ্ করিয়া অলি এ ফুল হইতে ও ফুলে উড়িয়া বেড়ায় কোথাও বসে না। কোন পুষ্পে মধুর সন্ধান পাইলে অমনই সেই পুষ্পে বসে। জীবাত্মারূপ ভৃঙ্গ সেইরূপ প্রথমে ধন, মান, সাংসারিক সুখ প্রভৃতি নানাবিধ পুষ্পে উড়িয়া বেড়ায়, শেষে ব্রহ্ম পুষ্পে স্বর্গীয় মধুর অনুসন্ধান পাইয়া তদুপরি উপবেশন করে। তখন উপাসনা আরম্ভ হয়। যতক্ষণ প্রাণ সংসার কামনা হইতে বিমুক্ত না হয় ততক্ষণ উপাসনা আরম্ভই হয় না। তাই উপনিষদে উক্ত হইয়াছে:—

নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ।

অর্থাৎ, যে দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হয় নাই, যাহার ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য শান্ত হয় নাই, যে অসমাহিত ও বিক্ষিপ্ত চিত্ত, সে কেবল জ্ঞানদ্বারা ইহাঁকে (ব্রহ্মকে) প্রাপ্ত হয় না।

আমাদের দৈনিক উপাসনার অভিজ্ঞতা এ বিষয়ে পরিষ্কার সাক্ষ্য দেয়। আমরা উপাসনা করিবার সময় দেখিতে পাই, যে যতক্ষণ সংসার চিন্তা আমাদের চিত্তকে উদ্বেজিত করে, ততক্ষণ ব্রহ্ম-উপলব্ধি স্ফূর্ত্তি পায় না। পাপ করিয়া অননুতপ্ত হৃদয়ে কেহ উপাসনায় বসিতে পারে না। তাই মহর্ষি ঈশা বলিয়াছেন, মন্দিরস্থ বেদীর জন্য উপহার আনিয়া যদি স্মরণ হয় যে, তোমার বিরুদ্ধে তোমার ভ্রাতার অভিযোগ আছে, উপহার রাখিয়া যাও, প্রথমে ভ্রাতার সঙ্গে মিলিত হও, পরে আসিয়া উপহার দিও। সেই জন্য মহম্মদীয় ধর্ম্মে বিক্ষিপ্ত ভাব ও বিশৃঙ্খল চিন্তার প্রতীকারের জন্য, যে কার্য্যের প্রতি মন লিপ্ত থাকে, সেই কর্ম্ম শেষ করিয়া উপাসনা করা ও নমাজের সময় কোরাণ পাঠ ও নাম-উচ্চারণের ভাবে মনঃসংযোগ করা প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যতক্ষণ মন এখানে সেখানে, এ কথা সে কথা ভাবিয়া ঘুরিয়া মরিবে, ততক্ষণ উপাসনা হয় না। সংসার চিন্তা নিরোধ করিয়া যখন মন উপাসনা করিতে বসে, তখন ব্রহ্ম সান্নিধ্য স্ফূর্ত্তি পায়। ক্রমে জীবাত্মা পরমাত্মাকে নিকট হইতে নিকটতর বলিয়া উপলব্ধি করে। যে ঈশ্বরকে দূরে রাখিল, সে উপাসনার মধুরতা হইতে বঞ্চিত হইল। উপাসনা তাহার জীবনে বদ্ধমূল হয় না; এবং উপাসনা যাহার জীবনে বদ্ধমূল হইল না, তাহার ধর্ম্মজীবন কয়দিন থাকিবে? ঈশ্বরকে নিকটে উপলব্ধি না করিয়া উপাসনা করিলে উপাসনা ক্রমে অসার ও অতৃপ্তিপ্রদ হইয়া পড়ে। যেমন যে বসিতে শিখে, সেই পরে দাঁড়াইতে ও ছুটিতে পারে, যে বসিতে শিখে না, সে মরিয়া যায় অথবা বিকলাঙ্গ ও জড় হইয়া যাবজ্জীবন কাটায়, তেমনই যে উপাসনা অর্থাৎ ব্রহ্মসমীপে উপবেশন করিতে শিখে, সেই পরে সাধন ভজন করিতে সমর্থ হয় ও পরিশেষে চিরউন্নতিশীল অমূল্য ধর্ম্মজীবন লাভ করে। যে ব্রহ্মের নিকট বসিতে পারিল না, সে ব্রহ্মাভিমুখে কিরূপে অগ্রসর হইবে?

উপাসনার দ্বিতীয় ও উচ্চতর অর্থ পূজা। যেভাবে সাধ্বী পতিকে, মাতৃবৎসল পুত্র জননীকে, ও কৃতজ্ঞ উপকৃত ব্যক্তি উপকারীকে দেখেন, সেইভাবের চরমোৎকর্ষ পূজা শব্দে বাচ্য। এই পূজা সহজ ব্যাপার নয়; ইহাতে অনন্যপরায়ণতা অথবা সতীত্বের শ্রদ্ধামিশ্রিত প্রেম অথবা ভক্তির ও অবিচলিত নির্ভর বা বিশ্বাসের প্রয়োজন। পরমাত্মার নিকট বসিতে বসিতে আত্মা তাঁহার রূপ গুণে আকৃষ্ট হয়, আকৃষ্ট হইতে হইতে তাঁহার বশীভূত ও পক্ষপাতী হয়, বশীভূত হইতে হইতে সেবক হয়, এবং সেবক হইতে হইতে ভগবদ্ভক্তি লাভ করে। এ উপাসনা সাধন ও সিদ্ধি দুইই। পূজা করিতে করিতে পূজ্যের অনুকরণের ইচ্ছা হয়, সেই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইলে, সর্ব্বজনবাঞ্ছিত যে ঈশ্বরভক্তি তাহা প্রকাশ পায়। তখন উপাসনা দেশকালে বদ্ধ থাকে না, যাঁহাকে পূজা করি, তাঁহাকে সকল সময়েই পূজা করিতে ইচ্ছা হয়। উপাস্যকে উপাসনা মন্দিরে পূজা করিব, জীবনে ধনমানের পূজা করিব, এরূপ ভেদজনক কুটিল বুদ্ধি আত্মাতে স্থান পায় না। বাক্য ও মন অথবা কার্য্যের পার্থক্য বিনষ্ট হয়। প্রকৃত পূজা সুতরাং ভাবগত ও কার্য্যগত দুইই হইয়া থাকে। উপাসনার বাহিরে আমরা কার্য্যক্ষেত্র রাখি সেই জন্য আমাদের কার্য্য নিরীশ্বর ও সকাম হয়। যিনি উপাসনার উচ্চতর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তিনি কার্য্যকে উপাসনার মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া নিরাপদ হন। ভাবও তাঁহার উপাস্য দেবতার, কার্য্যও তাঁহার ইষ্টদেবতার। তাঁহার দেবতা পূর্ণানন্দময়, ও পূর্ণ ব্যস্ততাবিশিষ্ট, আনন্দ স্বরূপ ও অপাপবিদ্ধ। কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ তখন ভক্তিযোগ হইতে পৃথক থাকে না, উহার অঙ্গীভূত হইয়া যায়। প্রগাঢ় উপাসনা করিয়া তিনি যেমন তৃপ্ত হন, ও আপন হৃদয়কে উন্নত ও কৃতার্থ মনে করেন, প্রিয় দেবতার জন্য ক্ষুদ্রতম কার্য্য করিয়াও আপনাকে তেমনই তৃপ্ত, উন্নত ও কৃতার্থ মনে করেন।

নবীন সাধক ধর্ম্মজীবনের বাল্যাবস্থায় উপাসনাকে প্রথম, অর্থাৎ ধাত্বর্থে গ্রহণ করেন। তাঁহার শিশু আত্মা প্রথমে পরম পিতার কাছে বসিতে আরম্ভ করে। যতই তাঁহার বয়স হয়, ততই তাঁহার জীবনে উপাসনার দ্বিতীয় ও উচ্চতর অর্থ স্ফূর্ত্তি পায়। তিনি কাছে বসিবার লোভে ক্রমশঃ কু অভ্যাস ও সংসারাসক্তি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। পবিত্রতা ও প্রকৃত বৈরাগ্যের স্বর্গীয় দীপ্তি তাঁহার জীবনে তখন প্রকাশ পায়। তাঁহার উপাস্য দেবতা যতই তাঁহাকে টানিতে থাকেন, ততই তিনি এক এক করিয়া সংসারের বন্ধন ছিন্ন করেন। নিজ জীবনের উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়ে; উপাস্য দেবতার প্রবল অনুকরণেচ্ছা সেখানেও তাঁহার কর্ত্তৃত্ব নাশ করে। দেবতা আপন ভক্তের চিন্তা ও কার্য্য একীভূত করিয়া ফেলেন। উপাসকের জীবন তখন উপাসনাময় হয়। দেশ কাল বোধ সেখানে আধিপত্য করিতে পারে না। যাঁহার প্রত্যেক চিন্তা উপাসনার সঙ্গীত ও প্রত্যেক জীবন-প্রবাহের স্ফুরণ পূজায় পরিণত হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে উপাসনার সংখ্যা কি নির্দ্দিষ্ট হইবে?

ব্রাহ্মধর্ম্ম ভিন্ন কোন ধর্ম্মই উপাসনার এত উচ্চ আদর্শ দেখাইতে পারে নাই। অন্যান্য সকল ধর্ম্মেই উপাসনা ধর্ম্ম জীবনের অনুষ্ঠান বা সাধন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, কেবল ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতেছেন, উপাসনা শুধু অনুষ্ঠান ও সাধন নহে, উপাসনা জীবন। উপাসনাকে অনুষ্ঠান ও সাধনের সঙ্কীর্ণতায় আবদ্ধ করিয়া অন্যান্য ধর্ম্মবিধান অধ্যাত্মজগতে জীবন ও ভাবের পার্থক্য আনিয়া ফেলিয়াছেন। সেই পার্থক্য বিনাশের জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয়। তাই ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন, যে যে পরিমাণে উপাসনা করে, সে সেই পরিমাণে জীবিত, যে যে পরিমাণে উপাসনা করে না, সে সে পরিমাণে মৃত। উপাসনা করি, অথচ আমার চরিত্র দিন দিন বিশুদ্ধ হইতেছে না, ইহা অসম্ভব। হয় বল উপাসনা করি না, নয় দেখাও যে তোমার জীবনে উপাসনা হইতেছে, তোমার সকল কার্য্য তোমার ইষ্টদেবতার পূজা করিতেছে। বাক্য, মন ও কায়গত এই মহোচ্চ উপাসনা আমারা যতটুকু করি, ততটুকু আমরা ব্রহ্মের উপাসক ও ব্রাহ্ম। দুর্ব্বলতাবশতঃ আমি উন্নত হইতে পারিতেছি না, এ কথা যিনি বলেন, তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ পবিত্র পরমেশ্বরের উপাসক নহেন। কদাচারী ব্রাহ্ম সোণার পাথরবাটীর মত স্ববিরোধী ও অসম্ভব।

ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ ও আমাদের জীবন।

তৃতীয় প্রস্তাব।

ধর্ম্মজীবনের অন্যান্য জিনিষের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের উপাসনার আদর্শও ক্রমে খাট হইয়া পড়িতেছে। ব্রাহ্মসমাজে যে উপাসনা প্রণালী প্রচলিত আছে, তাহার ন্যায় উৎকৃষ্ট ও সর্ব্বাঙ্গীন উপাসনা প্রণালী জগতে আর কুত্রাপি আছে বলিয়া আমরা জানি না। ইহার ভিতরে একবার প্রবেশ করিতে পারিলে, ইহার প্রকৃত রস একবার আস্বাদন করিতে পারিলে, স্বর্গের দ্বার খুলিয়া যায়, আত্মা এক নূতন রাজ্যে বিচরণ করিতে থাকে, জীবন সম্পূর্ণ নূতন ভাব ধারণ করে, জগতের সমস্ত ব্যাপার নূতন ভাবে আমাদের চক্ষের সম্মুখে প্রকাশিত হয়। এই উপাসনাই ব্রাহ্মজীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন। এই সাধন ভাল করিয়া আয়ত্ত করিতে পারিলে আর যাহা কিছু সমস্ত সহজ হইয়া আসে। ইহার ভিতর দিয়াই ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ আমাদের অন্তরে প্রকাশিত হয়, ইহার ভিতর দিয়াই জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার নিত্যযোগ সংস্থাপিত হয়, ইহার প্রভাবেই প্রাণে প্রেম ভক্তির উৎস খুলিয়া যায়, ইহার আলোকেই বিশ্বাস উজ্জ্বল হয়, পাপের অন্ধকার বিদূরিত হয়, ইহার আলোকেই আমরা আমাদের প্রকৃত হীনতা ও অভাব অনুভব করিয়া ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইতে সমর্থ হই, ইহার ভিতর দিয়াই সাধক ঈশ্বরের পরিত্রাণপ্রদ অভয়বাণী শ্রবণ করিয়া আশ্বস্ত ও উৎসাহিত হন। এই উপাসনার ভিতর ডুবিতে পারিলে মৃত প্রাণে জীবনসঞ্চার হয়, আত্মার দিব্য চক্ষু খুলিয়া যায়, সংসার বন্ধন, পাপের বন্ধন ছিন্ন হয়, প্রাণের মধ্যে তাড়িত প্রবাহ সঞ্চারিত হয়, জীবন মধুময় হয়। ইহা কোনও কালেই পুরাতন হয় না। অনন্ত স্বরূপের সাধনা কি কখন পুরাতন হইতে পারে? ইহার ভিতর যতই নিমগ্ন হওয়া যায় ততই নূতন হইতে নূতনতর সৌন্দর্য্য, গভীর হইতে গভীরতর সত্য প্রাণের মধ্যে প্রকাশিত হইতে থাকে।

কিন্তু ক্ষোভের বিষয় এই যে, আমরা এমন সুন্দর, এমন মধুর উপাসনার আদর্শ পাইয়াও ইহার ভিতরে ডুবিয়া যাইতে পারিতেছি না; কেবল উপরে ভাসিয়া বেড়াইতেছি। আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক উপাসনাদিতে আদর্শ উপাসনা পদ্ধতির অনুসরণ করা হয় বটে, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে আমরা এই উপাসনা সাধ্যানুসারে আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিতেছি না। আমাদের উপাসনা ক্রমে ভাবশূন্য মুখের কথায় পরিণত হইবার পথে চলিয়াছে। আমরা যতদূর জানি তাহাতে ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অনেকে, বিশেষতঃ যাঁহারা আজি কালি ব্রাহ্মসমাজে নূতন প্রবেশ করিতেছেন তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক, প্রার্থনাকেই উপাসনার সার বলিয়া মনে করেন। আরাধনা ও ধ্যান ভিন্ন যে উপাসনা পূর্ণ হয় না, ইহা তাঁহাদের চিন্তাতেও আসে না। অপরদিকে যাহারা আরাধনা ধ্যান প্রার্থনাসমন্বিত, পূর্ণাঙ্গ উপাসনা পদ্ধতির অনুসরণ করেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকে আবার কতকগুলি ভাসা ভাসা, অভ্যস্ত কথা বলিয়াই পরিতৃপ্ত থাকেন; উপাসনার ভিতর একেবারে ডুবিবার জন্য তাঁহাদের অণুমাত্র ব্যাকুলতা হয় না। আমাদের জীবন ক্রমে এত লঘু হইয়া পড়িয়াছে যে, ঈশ্বরের সৌন্দর্য্যের মধ্যে মগ্ন হইবার প্রবৃত্তি আমাদের নাই বলিলেও চলে। ব্রাহ্মের দৈনিক উপাসনা কেবল প্রাণের উপর দিয়া ভাসিয়া যায়, মর্ম্মস্থান স্পর্শ করিতে পারে না। কাজেই ব্রাহ্মের সামাজিক উপাসনা ও উৎসবাদিও ক্রমে সেইরূপ হইয়া পড়িতেছে "প্রাতঃকালের উপাসনার বলে যদি সমস্ত দিন ভাল না যায়,

সাপ্তাহিক সামাজিক উপাসনার বেগ যদি অন্ততঃ সপ্তাহের অর্দ্ধেক দিন পর্য্যন্ত কার্য্যকারী না হয়, এক একবারের উৎসবে যদি অন্ততঃ ছয় মাসের সম্বল লাভ করা না যায়, তবে আর উপাসনা কি হইল? দৈনিক জীবন যতই শুষ্ক ভাবে কাটুক না কেন, উৎসবের সময় আমরা আজিও পূর্ব্বস্মৃতি অথবা ক্ষণিক ভাবোচ্ছ্বাসের প্রভাবে এক আধ ফোঁটা চক্ষের জল ফেলিয়া থাকি। কিন্তু সত্য কথা বলিতে গেলে সে জলে আর প্রাণ ভিজে না; সে জলে প্রাণের গভীর পিপাসা নিবৃত্ত হয় না। উৎসবের দুই চারি দিন পরেই আমাদের জীবন যেরূপ হীন, নীরস ও লঘু হইয়া পড়ে তাহাই আমাদের কথার প্রত্যক্ষ প্রমাণ যদি এই ভাবে আর কিছুদিন যায় তাহা হইলে ব্রাহ্মের উপাসনা শুকমুখনিঃসৃত বচনাবলীর ন্যায় জীবনহীন হইয়া পড়িবে, ব্রাহ্মের চরিত্রের প্রভাব হীন হইতে হীনতর হইয়া পড়িবে, ব্রাহ্মের জীবন মরুভূমি হইয়া পড়িবে, ব্রাহ্মধর্ম্মের জীবন্ত ভাব চলিয়া যাইবে, বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজ চিরদিনের জন্য আধ্যাত্মিক মৃত্যুর মুখে পতিত হইবে। ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই।

ব্রাহ্ম জীবনের বর্ত্তমান দুর্গতির সর্ব্বপ্রধান কারণ-উপাসনাহীনতা। ব্রাহ্মগণ যে উপাসনা প্রার্থনার সম্পর্ক ছাড়িয়া একেবারে নিরীশ্বর হইয়া পড়িয়াছেন, এরূপ কথা বলা আমাদের অভিপ্রেত নহে। আমাদের বিবেচনায় আমরা প্রকৃত ব্রহ্মোপাসনার ভিতর এখনও ডুবিতে পারি নাই। যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে নূতন প্রবেশ করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই শুদ্ধ প্রার্থনা লইয়া সন্তুষ্ট আছেন। আরাধনা ও ধ্যান যে উপাসনার পূর্ণতার পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা তাঁহাদিগকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে না। অপরদিকে, যাঁহারা প্রাত্যহিক জীবনে পূর্ণাঙ্গ উপাসনা-পদ্ধতি ধরিয়া আছেন, তাঁহাদেরও উপাসনা ক্রমে অন্তঃসারবিহীন মৌখিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইতেছে। এক কথায় আমরা আমাদের উপাসনার আদর্শ ক্রমে খাট করিয়া ফেলিতেছি। এই জন্যই উহা আমাদের প্রাণের মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিতে পারিতেছে না। এই জন্যই অন্যান্য দিকেও আমাদের ধর্ম্মজীবনের আদর্শ দিন দিন হীনতা প্রাপ্ত হইতেছে। নতুবা আজি আমাদিগকে ব্রাহ্মজীবনের দুর্দ্দশা দেখিয়া আক্ষেপ করিতে হইবে কেন? নতুবা আজি আমাদিগকে এমন নিদারুণ কথা শুনিতে হইবে কেন যে, ঈশ্বরের আরাধনা, ধ্যান ও তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলে প্রাণ সরস হয় না, বিগলিত হয় না? ধিক্ আমাদের জীবনে! ঈশ্বরের উপাসক নাম গ্রহণ করিয়া এরূপ হৃদয়বিদারক অবিশ্বাসের কথা শ্রবণ করা অপেক্ষা যে আমাদের মরণ হওয়া ভাল ছিল! ঈশ্বরোপাসনায় যদি প্রাণ সরস না হয়, তাঁহার কৃপায় যদি পাষাণ দ্রবীভূত না হয়, চরিত্র উন্নত না হয়, তাঁহার প্রেমে যদি সমস্ত অপ্রেম, শুষ্কতা বিলুপ্ত না হয়, তবে হয় কিসে? ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার জন্য আমরা ভিন্ন আর কে দায়ী? আমরা যদি উপাসনার গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিতাম, আমাদের জীবনে যদি সেই প্রেমময়ের প্রকাশ ভাল করিয়া দেখিতে পারিতাম, তাহা হইলে কি আজি আমাদিগকে পূর্ব্বোক্তরূপ অবিশ্বাসের কথা শুনিতে হইত?

মুক্তিদাতা পরমেশ্বর আমাদের পরিত্রাণের জন্য বর্ত্তমান যুগে এই ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ বিধান প্রেরণ করিয়া পথের সম্বলের জন্য এই আরাধনাদিসমন্বিত উপাসনাপদ্ধতি রূপ মহারত্ন আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর উপাসনা-প্রণালী আর কোনও ধর্ম্মসমাজে নাই। এমন সুমিষ্ট সাধন আর কোথায় আছে? এই সাধন জীবনে আয়ত্ত করিতে না পারিলে আমাদের দুর্গতি দূর হইবে না, আমরা কখনই পরিত্রাণের পথে অগ্রসর হইতে পারিব না। উপাসনার দ্বার দিয়াই ঈশ্বরের কৃপা মনুষ্যহৃদয়ে প্রবেশ লাভ করে। ইহা স্বর্গরাজ্যের পথস্বরূপ। ইহার মধ্য দিয়াই পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার প্রাণপ্রদ, আধ্যাত্মিক সংস্পর্শ সংঘটিত হয়। কিন্তু কেবল মুখে এই পদ্ধতির অনুসরণ করিলে কিছু হইবে না। ইহার মধ্যে ডুবিতে হইবে। আরাধনার ভিতর দিয়া পরমেশ্বরের সত্তার মধ্যে ডুবিতে হইবে, তাঁহার অনন্ত ভাবের মধ্যে ডুবিয়া হারাইয়া যাইতে হইবে, তাঁহার আনন্দ শান্তির মধ্যে ডুবিয়া প্রাণ শীতল করিতে হইবে, তাঁহার গভীর প্রেমসাগরে ডুবিয়া আত্মবিস্মৃত হইতে হইবে, তাঁহার পবিত্রতা ও সৌন্দর্য্যের মধ্যে ডুবিয়া পবিত্র ও সুন্দর হইতে হইবে; গভীর ধ্যানের মধ্যে মগ্ন হইয়া প্রাণের সহিত তাঁহার প্রকৃত সম্বন্ধ বুঝিয়া লইতে হইবে; প্রার্থনার গভীরতা ও ঐকান্তিকতার মধ্যে ডুব দিয়া নিত্য উন্নতির উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতে হইবে। যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া বাস্তবিক ব্যথিত হইয়াছেন, আপনাদের হীনতা দেখিয়া যাঁহাদের প্রাণ বাস্তবিক কাঁদিয়াছে, পরমেশ্বরকে দর্শন করিয়া, প্রাণের মধ্যে তাঁহার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া যাঁহারা ধন্য ও কৃতার্থ হইতে চান, তাঁহারা সকলে একান্ত মনে সজনে, নির্জ্জনে এই উপাসনারূপ মহাসাধনের মধ্যে নিমগ্ন হইতে চেষ্টা করুন; সরল অন্তরে, প্রাণ খুলিয়া সেই ইষ্টদেবতার সুন্দর মধুর প্রকৃতির মধ্যে ডুবিতে চেষ্টা করুন,—দেখিবেন অতি অল্প দিনের মধ্যেই আমাদের দুর্দ্দশা ঘুচিয়া যাইবে, ব্রাহ্মসমাজের মলিন মুখ আবার উজ্জ্বল হইবে, আমাদের জীবনের গতি ফিরিয়া যাইবে, নিত্য উচ্চ হইতে উচ্চতর আদর্শ আমাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়া আমাদিগকে অনন্ত উন্নতির পথে লইয়া যাইবে।

"যে জন সাহসে ভর ক'রে, অগাধ প্রেমসিন্ধুনীরে, একবার ডুবিতে পারে;

সে আর চাহে না ফিরে আসিতে, মগ্ন হয়ে আনন্দেতে, করে রত্ন আহরণ, মহামূল্য ধন, ভোলে জন্মের মতন সংসার বাসনা।"

বিক্রমপুর প্রচার যাত্রা।

বিগত ১২ই আশ্বিন বুধবার রাত্রে বাবু চণ্ডীকিশোর কুশারি, বাবু হরকুমার গুহ, বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু হরিমোহন ঘোষাল এবং বাবু গুরুচরণ মহলানবিশ পশ্চিমপাড়া গ্রামে শ্রীযুক্ত বাবু নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে, উপস্থিত হয়েন। ১৩ই আশ্বিন প্রাতে নবকান্ত বাবুর বাটীতে উপাসনা ও কীর্ত্তন হয়; পশ্চিমপাড়া ও জৈনসর গ্রামের কয়েকটী যুবক উপাসনায় যোগ দান করিয়াছিলেন। অপরাহ্ণে বাবু রামধন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে সংকীর্ত্তন প্রার্থনা ও ধর্ম্মালোচনা হয়। ১৪ই আশ্বিন প্রাতে জৈনসর গ্রামে পরলোকগত অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের বাটীতে প্রচারযাত্রিগণ সকলে উপস্থিত হয়েন। তাঁহার পুত্র ও পশ্চিমপাড়া, ভরাকর, বালি গাঁ এবং সোণারঙ্গ গ্রাম হইতে কয়েকটী যুবক আসিয়া উৎসাহের সহিত তথায় মিলিত হন। বাবু মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মাধ্যাহ্নিক উপাসনা করেন; উপাসনা ও কীর্ত্তনাদি খুব হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। অপরাহ্ণে বাবু মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় "সনাতন সত্য ধর্ম্ম" সম্বন্ধে একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা স্থলে পশ্চিমপাড়া, মধ্যপাড়া, জৈনসর প্রভৃতি গ্রামের অনেক ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন।

১৫ই আশ্বিন প্রাতে যাত্রিগণ ভরাকর গ্রামে গমন করেন, এবং অপরাহ্ণে উক্ত গ্রামের পরলোকগত রামতনু দাস গুপ্ত মহাশয়ের বাটীতে (ভরাকর ব্রাহ্মসমাজে) উপস্থিত হয়েন; রাত্রিতে বাবু চণ্ডীকিশোর কুশারি উপাসনার কার্য্য করেন। ১৬ই আশ্বিন প্রাতে বাবু মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় উপাসনা করেন। উপাসনা ও কীর্ত্তনাদি বেশ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। অপরাহ্ণে বক্তৃতার কথা ছিল; কিন্তু অধিক লোকাভাবে বক্তৃতার পরিবর্ত্তে সঙ্কীর্ত্তনাদি করিয়া, ইহারা গাওপাড়া গ্রামে শ্রীযুক্ত বাবু বৈকুণ্ঠ নারায়ণ দাস মহাশয়ের বাটী যাত্রা করেন। রাত্রিতে তথায় উপাসনা ও কীর্ত্তনাদি হয়। তথায় বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও বাবু মহেন্দ্রনাথ মিত্র ইহাদের সহিত মিলিত হয়েন। সেই রাত্রে পদ্মা নদীতে নৌকায় অবস্থিতি করা হয়। ১৭ই আশ্বিন প্রাতে যাত্রিগণ নওগাঁ গ্রামে বাবু শ্রীনাথ হালদার মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হন। তিনি সাদরে ইহাদিগকে গ্রহণ করেন। তথায় সংকীর্ত্তন, বক্তৃতা এবং প্রার্থনাদি হইয়াছিল; রূপ্টা প্রভৃতি নিকটস্থ গ্রাম হইতে কয়েকটী ভদ্রলোক আসিয়া যোগ দান করিয়াছিলেন। আহারান্তে ইহারা তথা হইতে যাত্রা করিয়া অপরাহ্ণে স্বর্ণ গ্রামে বাবু গুরুপ্রসাদ সেন মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হয়েন; দুঃখের বিষয় যে ইহারা তথায় পৌঁছিবার দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে গুরুপ্রসাদ বাবু সপরিবারে বাকীপুরে গমন করিয়াছিলেন। বাবু দ্বারকানাথ গুপ্ত মহাশয় বাড়ীতে ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সমাদরে ইহাদিগকে গ্রহণ করেন। সেই রাত্রিতে এবং তৎপরদিবস (১৮ই আশ্বিন) মধ্যাহ্ণে তথায় উপাসনা ও সংকীর্ত্তন হইয়াছিল, এবং উপস্থিত প্রায় ৩০।৪০ জন শ্রমজীবী লোকের সহিত ধর্ম্ম বিষয়ে আলাপ করা হয়। আহারান্তে ইহারা তথা হইতে বজ্রযোগিনী গ্রামে যাত্রা করেন। রাত্রিতে নহোপাড়াস্থ বাবু গিরীশচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া যাত্রিগণ উপাসনা ও সংকীর্ত্তন করেন। পাইকপাড়া এবং নিকটস্থ অন্যান্য গ্রামের অনেক ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। ১৯এ আশ্বিন মধ্যাহ্ণে মন্মথ বাবু উপাসনা করেন, উপাসনা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। নিকটস্থ গ্রামের এবং পাইকপাড়ার অনেক ভদ্র মহোদয় উপাসনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন, অপরাহ্ণে বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় "বিশ্বাস ও কার্য্য" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন, পণ্ডিতবর প্রসন্নচন্দ্র তর্করত্ন মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বক্তৃতান্তে তর্করত্ন মহাশয় বক্তার প্রশংসা করিয়া ধন্যবাদ প্রদান করেন। সভাতে আরও অনেক প্রধান প্রধান পণ্ডিত এবং পাইকপাড়া ও কেওয়ার প্রভৃতি গ্রামের এবং বজ্রযোগিনীর অন্যান্য পাড়ার অনেক ভদ্র ও অন্যান্য শ্রেণীর লোক উপস্থিত ছিলেন। ২০এ আশ্বিন প্রাতে মন্মথ বাবু উপাসনা করেন। অপরাহ্ণে "সাকার ও নিরাকার উপাসনা" বিষয়ে নগেন্দ্র বাবু এক সুদীর্ঘ ও যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করেন। পণ্ডিত প্রসন্নচন্দ্র তর্করত্ন মহাশয়ই সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভাতে নিম্নলিখিত পণ্ডিত মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন,—পণ্ডিত কমলাকান্ত ন্যায়রত্ন, পণ্ডিত প্রসন্নচন্দ্র তর্কনিধি, পণ্ডিত গোবিন্দচন্দ্র বেদাধ্যায়ী, পণ্ডিত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন, পণ্ডিত রসিকচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ, পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ। এতদ্ভিন্ন অনেক ভদ্র ও অন্যান্য শ্রেণীর লোকও উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতা শেষ হইলে তর্করত্ন মহাশয় বলিলেন, "বক্তা যে সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণসহকারে বক্তৃতা করিলেন, তাহা সমস্ত সত্য এবং বক্তৃতা অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু আমরা এ বক্তৃতা অনুসারে কার্য্য করিতে পারি না। কারণ, বশিষ্ঠ, পরাশর প্রভৃতি ঋষিগণ, যাঁহারা ত্রিকালজ্ঞ ছিলেন, এবং কাকচরিত্র প্রভৃতি জানিতেন, তাঁহারা আমাদের জন্য যে সাকার উপাসনার বিধি করিয়া গিয়াছেন আমরা সেই বিধি অনুসারেই প্রথমে কার্য্য করা উচিত মনে করি। পরে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে নিরাকার উপাসনার অধিকারী হওয়া যায়। অদূরদর্শী আধুনিক ব্রাহ্মদিগের মতে আমরা কার্য্য করিতে পারি না।" তৎপরে পণ্ডিত কমলাকান্ত ন্যায়রত্ন মহাশয় প্রায় এক ঘণ্টার অধিক সময় পর্য্যন্ত শাস্ত্রোক্ত শ্লোক পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে সভাস্থ লোকে বসিতে বলাতে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠেন, অনেক চেষ্টায় তাঁহাকে শান্ত করা হয়। তৎপরে আবার পণ্ডিত প্রসন্নচন্দ্র তর্করত্ন মহাশয়ের সঙ্গে আলোচনা হয়, তাহাতে তিনি নূতন কথা কিছুই বলেন নাই। ২১এ আশ্বিন প্রাতে মধ্যপাড়া যাত্রা করিয়া রাত্রিতে উক্ত গ্রামের বাবু আনন্দচন্দ্র সেন মহাশয়ের ভবনে অবস্থিতি করা হয়। ২২এ আশ্বিন মধ্যাহ্ণে মন্মথ বাবু উপাসনা করেন, উপাসনা ও কীর্ত্তন বেশ হইয়াছিল। আনন্দ বাবু একজন সহৃদয় ও নিষ্ঠাবান্ লোক। তিনি যাত্রীদিগকে খুব যত্ন করিয়াছিলেন। অপরাহ্ণে উক্ত গ্রামের বাবু জগবন্ধু সেন মহাশয়ের বাটীতে "কোন্ শাস্ত্র মানিব?" এই বিষয়ে নগেন্দ্র বাবু একটী বক্তৃতা করেন।

এই স্থান হইতে নগেন্দ্র বাবু অন্যত্র চলিয়া যান। ২৩এ আশ্বিন প্রাতে যাত্রিগণ পুনর্ব্বার পশ্চিম পাড়া গ্রামে বাবু নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে যাইয়া উপাসনাদি করেন এবং তথা হইতে বেজগাঁ গ্রামে বাবু প্রসন্ন কুমার দাস বি, এ, মহাশয়ের বাড়ীতে উপস্থিত হন। তিনি মধ্যপাড়াতে গিয়া ইঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছিলেন। প্রসন্ন বাবু ইঁহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করেন। ২৪এ আশ্বিন প্রাতে মন্মথ বাবু উপাসনা করেন, অপরাহ্নে ত্রিপুরার মহারাজার দেওয়ান বাবু দুর্গাপ্রসাদ গুপ্ত মহাশয়ের ভবনে "ধর্ম্ম কি ?" এই সম্বন্ধে মন্মথ বাবু একটী হৃদয় গ্রাহী বক্তৃতা করেন। ২৫এ আশ্বিন প্রাতে ইঁহারা তথা হইতে যাত্রা করিয়া সায়ংকালে মুন্সীগঞ্জে উপস্থিত হন, তথায় নববিধান সমাজের সভ্য বাবু বিপিনবিহারি বসু এবং বাবু রজনীকান্ত সেন, ও নবদ্বীপ বাবু তত্রত্য সমাজ গৃহে ইঁহাদের উপাসনার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। রাত্রিতে তথায় উপাসনা ও সঙ্কীর্ত্তনাদি হইয়াছিল। ২৬এ আশ্বিন যাত্রিগণ পঞ্চসার গ্রামে বাবু গুরুচরণ মহলানবিশ মহাশয়ের বাটীতে যান। ইতিপূর্ব্বেই অনেকে স্ব স্ব বাটীতে চলিয়া গিয়াছিলেন; যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদেরও কাহারও কাহারও শরীর অসুস্থ হওয়াতে পঞ্চসারে কোন কার্য্য হয় নাই। সেই দিনই মুন্সীগঞ্জে আসিয়া অবশিষ্ট সকলে ঢাকা যাত্রা করেন এবং ২৭এ আশ্বিন ঢাকাতে উপস্থিত হন। এই ভ্রমণের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ বাবু গুরুপ্রসাদ সেন মহাশয় ৫৲ টাকা, শ্রীযুক্ত স্বর্ণপ্রভা বসু মহাশয়া ৫৲ টাকা, বাবু বীরেশ্বর সেন মহাশয় ৫৲ টাকা, ও নহোপাড়ার বাবু রামকুমার চাটাতি মহাশয় ৮৲ টাকা প্রদান করিয়াছেন এবং বাবু জগচ্চন্দ্র দাস মহাশয় ১০৲ টাকা দিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন। এখনও প্রায় ৫৬৲ টাকার অভাব রহিয়াছে। প্রচার যাত্রিগণ যাঁহার যাঁহার বাটীতে গিয়াছিলেন, সকলেই তাঁহাদের প্রতি অত্যন্ত সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন।

কার্য্য নির্ব্বাহক সভার ৩য় ত্রৈমাসিক কার্য্য বিবরণ।

এই তিন মাসের মধ্যে পূজার ছুটি উপলক্ষে কার্য্য নির্ব্বাহক সভার ১২ বার অধিবেশন হইতে পারে নাই। সর্ব্বশুদ্ধ ১০ বার অধিবেশন হইয়াছিল।

বিগত ২৭এ সেপ্টেম্বর রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুদিন উপলক্ষে কলিকাতাস্থ উপাসক মণ্ডলী উপাসনা মন্দিরে উপাসনাদি করেন এবং রাজার জীবন চরিত বিষয়ে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী একটী উপদেশ প্রদান করেন।

নিম্নলিখিত প্রণালীতে প্রচারক মহাশয়গণ বিগত তিন মাস প্রচার করিয়াছেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী—কুষ্টিয়া ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে গমন করেন। ছাত্র সমাজে বক্তৃতাদি করেন এবং ব্রাহ্ম বন্ধু সভায় একটী বক্তৃতা করেন। এতদ্ভিন্ন রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুদিন উপলক্ষে তাঁহার জীবন চরিত বিষয়ে একটী উপদেশ প্রদান করেন। মধ্যে মধ্যে উপাসক মণ্ডলীর সাপ্তাহিক উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং মেসেঞ্জার সম্পাদনের সাহায্য করেন। এই সময়ের মধ্যে ইনি শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন অবসর গ্রহণ করিয়া কিছু কাল বিশ্রাম করিয়াছিলেন।

বাবু নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়—

১৮ই আষাঢ়—বৰ্দ্ধমান ছাত্র সমাজের উৎসব উপলক্ষে প্রাতঃকালে এবং রাত্রিতে উপাসনা করেন ও উপদেশ দেন।

১৯এ আষাঢ়—বৰ্দ্ধমান সমাজ গৃহে প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন। বিষয় "কোন্ শাস্ত্র মানিব ?"

২০এ আষাঢ়—বৰ্দ্ধমান সমাজ গৃহে উপাসনা ও "বহির্জ্জগতে ঈশ্বর দর্শন" বিষয়ে উপদেশ। অপরাহ্নে আলোচনা। সন্ধ্যার পর সমাজ গৃহে উপাসনা ও সংকীর্ত্তন।

এতদ্ভিন্ন তিনি তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ক্ষেত্রের বাহিরেও কার্য্য করিয়াছেন কিন্তু অধ্যক্ষ সভার নির্দ্দেশ অনুসারে তাহা দেওয়া গেল না।

নবদ্বীপ চন্দ্র দাস—আগষ্ট মাসের প্রায় শেষ পর্য্যন্ত চট্টগ্রামেই বাস করেন। এই চট্টগ্রাম বাস কালে, তথাকার প্রার্থনা সমাজে নিয়মিত রূপে উপাসনার কার্য্য করিয়াছেন, ইহা ব্যতীত ভদ্র লোকদের গৃহে, পারিবারিক উপাসনা; আলোচনা ও উপদেশদান এবং প্রকাশ্য বক্তৃতাদি দ্বারাও ব্রাহ্ম ধৰ্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, ও স্কুলের বালকদের সভায় নানা বিষয়ে বক্তৃতাদি করিয়াছেন। ঈশ্বর কৃপায় তথায় অল্প সময়ের মধ্যে কয়েকটী লোক সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি অনুরাগান্বিত হইয়াছেন। তাঁহারা সমাজের জন্য একটী স্বতন্ত্র গৃহ করিয়াছেন, ভাল স্থান না পাওয়াতে এখন বাবু যাত্রামোহন সেন মহাশয়ের বাড়ীর যে অংশ সদর রাস্তার ধারে আছে তাহাতেই ঐ গৃহটী নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। এই গৃহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বিশেষ উপাসনাদি হয়। ইনি চট্টগ্রাম অবস্থান কালে মধ্যে দুই বার মাত্র মফস্বলে যান। প্রথমবার শ্রীপুর নামক গ্রামে যান। এখানে অনেক ভদ্রলোকের বাস। শ্রীযুক্ত বৃন্দাবন মুন্সী মহাশয়ের গৃহে উপাসনা ও উপদেশাদি হয়। ইহা ব্যতীত প্রাচীন ভদ্রলোকদের সঙ্গে অনেক আলোচনা হয়। ইহার পর একবার বড়মা নামক গ্রামে যান। এখানে যাত্রামোহন বাবুর বাড়ী। তাঁহার গৃহে উপাসনা ও উপদেশাদি হয়। নবদ্বীপবাবু চট্টগ্রাম হইতে যখন বিদায় গ্রহণ করেন, তখন পুনরায় তথায় যাইবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছেন।

চট্টগ্রাম হইতে কুমিল্লাভিমুখে যাত্রা করিয়া পথে সীতাকুণ্ডে ২ দিন অবস্থান করেন, এখানে কথাবার্ত্তা ভিন্ন প্রচারের কার্য্য আর কিছু হয় নাই। তৎপরে তথা হইতে চৌদ্দগ্রাম নামক স্থানে গিয়া ২ দিন অবস্থান করেন। এখানে দুইটী প্রকাশ্য বক্তৃতা ও উপাসনাদি হইয়াছিল। তৎপরে কুমিল্লায় প্রায় সপ্তাহ কাল বাস করেন, দুইটী প্রকাশ্য বক্তৃতা দেন। সমাজে ও ভদ্র লোকদের গৃহে উপাসনা, উপদেশ ও আলোচনাদি হইয়াছিল। ইনি এখানেও পুনরায় যাইতে অনুরুদ্ধ হইয়াছেন। কুমিল্লা হইতে ঢাকায় গমন করেন। ঢাকাতে ছাত্র সমাজের উৎসব উপলক্ষে উপাসনা, আলোচনা ও উপদেশাদি হয়; তৎপরে

ইনি তথা হইতে নিজের বিশেষ প্রয়োজনে কলিকাতা আগমন করেন। ইনি এখন দেওঘরে আছেন, শীঘ্র কার্য্য ক্ষেত্রে যাইবেন।

বাবু শশিভূষণ বসু—শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন ইনি আশানুরূপ কার্য্য করিতে পারেন নাই। মধ্যে মধ্যে ছাত্রোপাসক সমাজে উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, রবিবাসরীয় নৈতিক বিদ্যালয়ের অবস্থা কিছু মন্দ হইয়াছিল বলিয়া তাহার সুব্যবস্থার জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা করেন, এবং উক্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষা দান করেন। কোন ছাত্র নিবাসে কয়েক দিন ধর্ম্মালোচনা ও প্রার্থনাদি করেন।

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন—বিগত ২৩এ জুন গারো পর্ব্বতে যাত্রা করেন। নানা বিঘ্ন বিপদ্ অতিক্রম করিয়া ২৮এ জুন তুরা পর্ব্বতে উপস্থিত হন। এখানে ডাক্তার প্যারীমোহন গুপ্ত সপরিবারে বাস করেন। প্রায় অধিকাংশ সময় ইঁহাদের সঙ্গে ধর্ম্মালোচনা করিতেন এবং ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে নানা প্রকার কথাবার্ত্তা হইত। প্রতিদিন প্রাতঃকালে স্থানীয় ভদ্রলোকদিগের গৃহে গমন করিয়া ধর্ম্মালোচনা করিতেন এবং কোন কোন দিন প্রার্থনাদিও হইত। মধ্যে মধ্যে প্যারী বাবুর পরিবারে পারিবারিক উপাসনা করিতেন। এই স্থান হইতে পুনর্ব্বার ধুবড়ী আসেন, ধুবড়ী আসিবার সময় মাণিকারচর নামক স্থানে "ব্রাহ্মধর্ম্ম কি?" এই বিষয়ে আলোচনা করেন। এ যাত্রায় ধুবড়ীতে কেবল মাত্র তিন দিন ছিলেন। একদিন "শাস্ত্র ও ব্রাহ্মধর্ম্ম" এই বিষয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন। এক দিন ব্রাহ্মসমাজে দুইবেলা উপাসনা, উপদেশ, মধ্যাহ্নে আলোচনা, অপরদিন ব্রাহ্ম বন্ধুদের সঙ্গে সদালোচনা ও প্রার্থনাদি করিয়া ২৮এ আষাঢ় গৌহাটী যাত্রা করেন। ২৯এ আষাঢ় রাত্রিতে গৌহাটী আসিয়া উপস্থিত হন। গৌহাটীতে দশ দিন অবস্থান করেন। প্রতিদিন প্রাতঃকালে উপাসনান্তে স্থানীয় অধিবাসীদিগের গৃহে গৃহে গমন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য সকল বুঝাইতে চেষ্টা করেন। এখানে তিনটী প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন। উজানবাজার নামঘরে গীতা পাঠ ও তাহার ব্যাখ্যা করেন এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করেন। উজানবাজারের বন্ধুগণ মহাপুরুষীয় ধর্ম্মাবলম্বী। স্থানীয় ব্রাহ্মবন্ধু ও অপরাপর বন্ধুদিগের গৃহে যাইয়া গীতা, উপনিষৎ অথবা কবীরের গ্রন্থাবলী পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ব্রাহ্মবন্ধুদিগের সহিত ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে নানাবিধ আলোচনা করিয়াছেন। আসিবার সময় মৃত রাজা কন্দর্পেশ্বরের মাতা ও পত্নী কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তাঁহাদের গৃহে গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। একদিবস মাননীয় কমিসনার Mr. Lutman Johnson সাহেবের সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ও আসামের কুলীদিগের সম্বন্ধে নানা কথাবার্ত্তা হয়।

গৌহাটী হইতে শিলং যান। এখানে ২৫দিন অবস্থিতি করেন। এখানে প্রায় প্রতিদিনই অতি প্রত্যূষে কয়েকটী বন্ধুর সঙ্গে একত্র উপাসনা করিয়া স্থানীয় অধিবাসীদিগের গৃহে গৃহে গমন করিতেন এবং তথায় সাধারণতঃ ধর্ম্মের আবশ্যকতা বিষয়ে আলোচনাদি হইত। বৈকালে স্থানীয় অধিবাসীদিগের গৃহে গৃহে যাইয়া কোন দিন শাস্ত্রপাঠ, ব্যাখ্যা, ও প্রার্থনা, কোন দিন বা উপাসনা উপদেশাদি হইত। ইহার মধ্যে চারিদিন জ্বররোগে কাতর হইয়া শয্যাগত ছিলেন। আসামের শিক্ষা বিভাগ তাঁহাকে শিক্ষা সমিতির মেম্বর নিযুক্ত করেন। তাহার জন্য ২ রা জুলাই হইতে ১২ই জুলাই পর্য্যন্ত প্রতিদিন শিক্ষাসমিতিতে উপস্থিত থাকিয়া শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনাদি করিতে হইয়াছিল। ৩১এ জুলাই রবিবার এখনকার ব্রহ্ম মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে উৎসব হয়। এখানকার ব্রাহ্মবন্ধুরা একটী সুন্দর মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ২রা আগষ্ট শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজেন্দ্রচন্দ্র সেনের প্রথমা কন্যার নামকরণ হয়। এই অনুষ্ঠানে উপাসনার কার্য্য সম্পন্ন করেন। একদিন অনেকে মিলিয়া প্রস্রবণ দেখিতে যান। সেখানে বিশেষভাবে উপাসনা ও প্রার্থনাদি হইয়াছিল। ১৫ই আগষ্ট শিলং পরিত্যাগ করেন। ১৮ই আগষ্ট শ্রীহট্ট আগমন করেন। পথিমধ্যে চেরাপুঞ্জি পর্ব্বতের বাঙ্গালী বন্ধুদিগকে ডাকিয়া সমাধিক্ষেত্রে যাইয়া উপাসনা করেন। খসিয়া পর্ব্বত ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের প্রশস্ত ক্ষেত্র। কিন্তু প্রচারকের অভাবে আশানুরূপ কার্য্য হইতেছে না। স্থানীয় ব্রাহ্মবন্ধুরা বিশেষ মনোযোগের সহিত খসিয়াদের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের সময় নিতান্তই অল্প। সুতরাং আশানুরূপ ফল হইতেছে না। এই বিষয়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। শ্রীহট্টে তিনি ১১ দিবস অবস্থিতি করেন। এই সময়ের মধ্যে জাতীয় স্কুলগৃহে তিনটী বক্তৃতা করেন। একদিন সাধারণকে আহ্বান করিয়া গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ছাত্র সমাজের মেম্বর ও অপরাপর ছাত্রদিগকে লইয়া ব্রাহ্ম সমাজের ভিত্তি কি, এবং প্রার্থনা ও উপাসনা সম্বন্ধে আলোচনাদি করেন। প্রায় প্রতিদিনই ৪ টা হইতে ৫ টা পর্য্যন্ত ছাত্রদিগকে লইয়া আলোচনা, প্রার্থনা ও কীর্ত্তনাদি করিতেন। সন্ধ্যার পর শাস্ত্রপাঠ ও ব্যাখ্যা, উপাসনা ও কীর্ত্তনাদিতে সময় যাপন করিতেন। এই কার্য্য ব্রাহ্ম বন্ধুদিগের গৃহে অথবা অপরাপর ভদ্রলোকদের গৃহে সম্পন্ন হইত। প্রাতঃকালের উপাসনার পর প্রতিদিনই স্থানীয় অধিবাসীদিগের গৃহে ভগবানের নাম শুনাইবার জন্য গমন করিতেন। এখানকার ছাত্রসমাজের অবস্থা আশাপ্রদ। ২৮ এ আগষ্ট শ্রীহট্ট হইতে যাত্রা করিয় ৩০এ আগষ্ট কাছাড়ে উপস্থিত হন। এখানে তাঁহাকে ৯ দিবস বাস করিতে হইয়াছিল। প্রাতঃকালে উপাসনা ও আলোচনা, বৈকালে বক্তৃতা অথবা আলোচনা, সন্ধ্যার পর উপনিষৎ, গীতা অথবা কবীরের গ্রন্থাবলী পাঠ ও ব্যাখ্যা, উপাসনা, প্রার্থনা ও কীর্ত্তনাদি হইত। রবিবার সমস্তদিনই উৎসবের ন্যায় কার্য্য চলিত। রবিবার প্রাতে ও বৈকালে ব্রাহ্মসমাজ গৃহে উপাসনা ও উপদেশাদি, মধ্যাহ্নে আলোচনা, কীর্ত্তন, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি হইত। এইখানে তিনটী বক্তৃতা দেন। দুইটী ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগে ও একটী ছাত্রদিগের বিশেষ উদ্যোগে। এখানকার অধিবাসীরা ধর্ম্মপিপাসু, তবে প্রচারকের অভাবে

কার্য্য হইতেছে না। এখানে স্থানীয় প্রত্যেক ব্রাহ্মের বাড়ীতেই উপাসনা ও উপাসনার পূর্ব্বে ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন বিষয়ে আলোচনা হইত।

৮ই সেপ্টেম্বর প্রাতঃকালের উপাসনান্তে কাছাড় পরিত্যাগ করেন। ১০ই সেপ্টেম্বর ঢাকায় আসেন। ঢাকায় তখন ছাত্রসমাজের উৎসব চলিতেছিল। ছাত্রদিগের বিশেষ অনুরোধে একদিন উপাসনা করেন ও ছাত্র সমাজে একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়া ১৪ই সেপ্টেম্বর কলিকাতায় আসেন। কলিকাতায় আসিয়া মধ্যে মধ্যে সমাজ মন্দিরে উপাসনার কার্য্য করিয়াছেন। এখন কলিকাতায় অবস্থিতি করিতেছেন।

এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত লছমন প্রসাদ—জুলাই মাসে অযোধ্যা ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরে এবং আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে বাবু বিপিন বিহারী বসুর বাটীতে প্রতি বুধবার উপাসনাদি করেন। এতদ্ভিন্ন প্রতিদিন তাঁহার বাড়ীতে বন্ধুবান্ধব লইয়া উপাসনাদি করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত পুস্তকালয় ও প্রেস নিয়মিত ভাবে চলিতেছে। প্রেস হইতে অনেকগুলি ব্রাহ্ম ধর্ম্ম-বিষয়ক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। সুখসম্বাদ নামক পত্রিকা নিয়মিতভাবে চলিতেছে। রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুদিন উপলক্ষে উপাসনাদি করেন এবং তৎপরদিন একটী প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন। বিগত আগষ্ট মাসে তিনি তাঁহার জন্মভূমি সিহিলি নামক স্থানে গমন করিয়া উপাসনা ও বক্তৃতাদি করেন। সেপ্টেম্বর মাসে তিনি একবার এলাহাবাদে গমন করিয়া উপাসনা ও বক্তৃতাদি করেন। এক্ষণে তাঁহার দুইটী বন্ধু তাঁহার কার্য্যের বিশেষ সহায়তা করিতেছেন।

বাবু অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়—বিগত তিন মাস প্রতি রবিবার কোন্নগর উপাসনালয়ে সামাজিক উপাসনা করিয়াছিলেন। এবং একদিন কলিকাতা হইতে কয়েকজন ব্রাহ্মবন্ধু সহ তথায় যাইয়া তথাকার উপাসনালয় হইতে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সভাপতি ভক্তিভাজন বাবু শিবচন্দ্র দেব মহাশয়ের ভবনে যাইয়া তথায় সঙ্কীর্ত্তনে যোগ দিয়াছিলেন। এবং এক শনিবার হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজে গিয়া তথাকার উপাসনালয়ে সামাজিক উপাসনা করিয়াছিলেন; এবং কলিকাতায় ও তাহার বাহিরে কয়েকটি ব্রাহ্মানুষ্ঠানে উপাসনা অথবা সঙ্কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। কলিকাতায় একটি ছাত্র প্রবাসে মধ্যে মধ্যে সাপ্তাহিক উপাসনা করিয়াছিলেন এবং তথায় সঙ্কীর্ত্তনেও যোগ দিয়াছিলেন। কলিকাতা ও গড়পারের কতকগুলি ব্রাহ্ম পরিবারে কখন একাকী, কখন সবান্ধবে যাইয়া প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে এবং কোন কোন দিন প্রাতে উপাসনা, সঙ্গীত অথবা ধর্ম্মালাপ করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত বজরংবিহারী—আজও তাঁহার শরীর সুস্থ হয় নাই। অসুস্থতা নিবন্ধন তিনি কোন কার্য্য করিতে পারিতেছেন না।

নিম্নলিখিত স্থান হইতে প্রচারক মহাশয়দিগের নিমন্ত্রণ আসিয়াছিল।

বেজওয়াদা, কুমারখালী, পাবনা, চট্টগ্রাম ও লাহোর।

পুস্তক প্রচার—এই তিন মাসের মধ্যে ইহার কোনও কার্য্য হয় নাই।

স্থায়ী প্রচারফণ্ড—এই তিন মাসের মধ্যে এই ফণ্ডে ২৫৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে।

পুস্তকালয়—ইহার সুবন্দোবস্ত হইয়াছে। এখন ইহা ১৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে স্থানান্তরিত হইয়াছে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ইহার সম্পাদক ও বাবু উমাচরণ সেন, বি, এ ইহার সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। অনেকে এখন এই পুস্তকালয় হইতে পুস্তক লইয়া পাঠ করিতেছেন।

ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার—ইহার কার্য্য পূর্ব্বের ন্যায়ই চলিতেছে। বিশেষ পরিবর্ত্তন কিছুই হয় নাই। ইহার আর্থিক অবস্থা ভাল নহে।

তত্ত্বকৌমুদী—বাবু আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ইহার সম্পাদকের কার্য্য করিতেছেন। ইহা নিয়মিত ভাবে চলিতেছে এবং ইহার আর্থিক অবস্থাও ভাল।

কলিকাতাস্থ উপাসক মণ্ডলী—রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুদিন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয় এবং নিয়মিতরূপে সাপ্তাহিক উপাসনার কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, রামকুমার বিদ্যারত্ন, বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়গণ ইহার আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন।

কলিকাতাস্থ উপাসক মণ্ডলীর কার্য্য সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা এই প্রস্তাব স্থির করিয়াছেন যে সাঃ ব্রাঃ সমাজের কার্য্য নির্ব্বাহক সভার অনুমতি না লইয়া উপাসকমণ্ডলী (১) সমাজ মন্দিরের ব্যবস্থাকরণ (management) (২) উপাসনা পদ্ধতি স্থিরীকরণ (৩) উপাসনার দিন নির্দ্ধারণ (৪) আচার্য্য নিয়োগ এবং (৫) বেদী ও আসন সম্বন্ধে স্থায়ী বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন না।

অনুষ্ঠান—আমরা যতদূর সংবাদ পাইয়াছি তাহাতে জানিয়াছি যে এই তিন মাসের মধ্যে ৪টী জাতকর্ম্ম ও নামকরণ ৩টী শ্রাদ্ধ, ৫টী দীক্ষা ও ১টী বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

দাতব্য বিভাগ—এই তিন মাসের মধ্যে ৯খানি আবেদন সম্বন্ধে মীমাংসা হইয়াছে। তন্মধ্যে ৬ খানি গ্রাহ্য ও ৩ খানি অগ্রাহ্য হইয়াছে। সিটী কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয় দাতব্য বিভাগের দশটী ছাত্রকে উক্ত কলেজে অর্দ্ধ বেতনে ভর্ত্তি করিতে প্রস্তুত হওয়ায় সভার যথেষ্ট উপকার হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ৩১ জন ব্যক্তি রীতিমত ১৲, ২৲, ও ৩৲ টাকা করিয়া সাহায্য পাইতেছেন। ঢাকার ৫টী ছাত্র বৃত্তি পাওয়ায় তাঁহাদের সাহায্য বন্ধ হইয়াছে। কলিকাতায় ৩টী ছাত্রের সাহায্যের আর প্রয়োজন না থাকায় সাহায্য স্থগিত হইয়াছে। একটী ছাত্র ইচ্ছাপূর্ব্বক সাহায্য গ্রহণে অসম্মত হইয়াছেন। সভা তাঁহার আহারের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। আর একটী বালক ফণ্ডের কয়েক টাকা অযথা ব্যয় করিয়াছে।

ব্রাহ্মবন্ধু সভা—এই কয়েক মাস নিয়মিতরূপেই সভার কার্য্য চলিয়াছে। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হয়:—

(১) উপাসনা ও উপাসক মণ্ডলী।

(২) ব্রাহ্মবন্ধু সভার উদ্দেশ্য ও তৎসাধনের উপায়।

(৩) ব্রাহ্মসমাজের দায়িত্ব।

(৪) প্রচার ও প্রচারক নিয়োগ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।

জমা		খরচ	
প্রচার বার্ষিক	১১২।০	প্রচার	৩৭৬৲
প্রচার মাসিক	২২৪৸৵০	কর্ম্মচারীর বেতন	২২৫৸/০
প্রচার এককালীন	৪৭॥০	ডাকমাশুল	১০/০
ঐ চাউলের মূল্য	৩।০	মুদ্রাঙ্কণ	১৯৸০
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ		কমিসন	৵০
বার্ষিক	১৪১৵১৫	পাথেয়	৩৮৸৵০
মাসিক	৩৭৸০	অসমর্থ ব্রাহ্ম ছাত্রদিগের	
এককালীন	২৪॥/১০	স্কুলের বেতন	১৩০৲
পাথেয়	৬৯।৶১০	বিবিধ	২২॥৶২॥
সিটীকলেজ হইতে প্রাপ্ত		হাওলাত শোধ	৩৯/০
(ব্রাহ্ম ছাত্রদের বেতন)	১৩০৲	গচ্ছিত শোধ	১৪৬॥০
তত্ত্বকৌমুদী হইতে			
কর্ম্মচারীর বেতন			১০০৮৸৵২॥
হিসাবে প্রাপ্ত	২৪৲	স্থিত	৮৯৸৶১২॥
পুস্তক বিভাগ হইতে			
কর্ম্মচারীর বেতন		মোট	১০৯৮৸/১৫
হিসাবে প্রাপ্ত	৩৫৲		
বিবিধ	৶০		
হাওলাত	৫২।৶১৫		
গচ্ছিত	১৪৫৲		
	১০৪৭৸১০		
গত ত্রৈমাসিকের স্থিত	৫১/৫		
	১০৯৮৸/১৫		

পুস্তক বিক্রয়।

আয়		ব্যয়	
পুস্তক বিক্রয়ের বাকী		অপরের পুস্তক বিক্রয়ের	
মূল্য আদায়	৫২৸০	মূল্য শোধ	৫৭॥০
নগদ বিক্রয়	২৭১৲৫	কমিসন	৩৸/১৫
সমাজের ২১১৲৫		বিবিধ	১৬।৫
অপরের ৬০৲		পুস্তকের ডাকমাশুল	১০॥৵১০
		পত্রের ডাকমাশুল	।৵১৫
২৭১৲৫		কর্ম্মচারীর বেতন	৩৫৲
কমিসন	॥৶০	পুস্তক বাঁধাই	৫৲
পুস্তকের ডাকমাশুল	৬॥/১৫	পুস্তক খরিদ	৩॥০
গচ্ছিত	৬৫৸১০	কাগজ খরিদ	৪॥০
		মুদ্রাঙ্কণ	৬৲
	৩৯৬৸/১০	গচ্ছিত শোধ	১০০।/৭॥
গত ত্রৈমাসিকের			
স্থিত	১৬০৪৸৭॥		২৪৩৲১২॥
		হস্তে স্থিত	১৭৫৮॥/৫
	২০০১॥/১৭॥		২০০১॥/১৭॥

তত্ত্বকৌমুদী।

আয়		ব্যয়	
মূল্যপ্রাপ্তি	৩১১॥৵০	মুদ্রাঙ্কণ	৯৪/১৫
নগদ বিক্রয়	৩।০	কাগজ	৩৭৸/০
		কর্ম্মচারীর বেতন	২৭৲
	৩১৪৸৵০	ডাকমাশুল	৩৫৲
গত ত্রৈমাসিকের স্থিত	৭৪৩।৶৫	বিবিধ	১৪৸৵১৫
	১০৫৮।/৫		২০৮৸/১০
		স্থিত	৮৪৯।৶১৫
			১০৫৮।/৫

ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার।

আয়		ব্যয়	
মূল্যপ্রাপ্তি	৩০৭।/১৫	ডাকমাশুল	১৩০৸১৫
বিজ্ঞাপন হিসাবে	১″॥৵১০	বিবিধ	১৬৸৵১৫
বিবিধ	৪৸/১৫	কাগজ	৬৯৸০
হাওলাত আদায়	২০৲	কর্ম্মচারীর বেতন	৬৪॥০
নগদ বিক্রয়	/১০	মুদ্রাঙ্কণ	৭৯৶০
		কমিসন	৫/১০
	৩৪৮৸৶১০		
পূর্ব্ব স্থিত	১৭৬৶১০		৩৬৬।০
		হস্তে স্থিত	১৫৮৸৶০
	৫২৫৶০		৫২৫৶০

১৩৮৭॥০ দেনা, গ্রাহকদিগের নিকট পাওনা ১৩৪৩৲; ইহার মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেক টাকা আদায় হইবার সম্ভাবনা নাই।

স্থায়ী প্রচার ফণ্ড।

আয়		ব্যয়	
চাঁদা আদায়	২৫৲	ডাকমাশুল	৲৫
সুদ আদায়	১৫৸/৫	ইন্‌কমটেক্স	।৵১০
		কোম্পানির কাগজ	
	৪০৸/৫	বিক্রয়ের ডিস্‌কাউণ্ট	১১।০
পূর্ব্বস্থিত	১৯২০৶১০	রসীদ ষ্ট্যাম্প	/০
	১৯৬১৲১৫		১১॥৶১৫
		হস্তেস্থিত	১৯৪৯।/০
		মোট	১৯৬১৲১৫

দাতব্য বিভাগের আয় ব্যয়।

জমা		খরচ	
দান প্রাপ্তি		মাসিক দান হিসাবে	১৩৫॥০
এককালীন ও মাসিক	১৩৯।/১০	এককালীন দান	৬৲
পূর্ব্বকোয়াটারের স্থিত	১৩১॥১৫	মণিঅর্ডার ফি	১।৵০
		পোষ্টকার্ড ইত্যাদি	১৸০
	২৭০৸৵৫	পুস্তক ও বস্ত্র দান	১৸৵০
স্থিত	১২৪।৵৫		
			১৪৬॥০

সংবাদ।

ব্রাহ্ম বিবাহ ;—গত ১০ই আশ্বিন সোমবার উত্তর-বঙ্গ প্রদেশের নেলফামারি ষ্টেশনে শ্রীযুক্ত বাবু হরনাথ দাস মহাশয়ের বাড়ীতে একটী ব্রাহ্মবিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্রের নাম বাবু কুঞ্জলাল ঘোষ। ইঁহার নিবাস নদীয়া জেলার অন্তর্গত গজরা গ্রামে। বয়স ২৩ বৎসর। ইনি শিলিগুড়ি মাইনর স্কুলের হেড্ মাষ্টার। পাত্রীর নাম শ্রীমতী স্বর্ণময়ী ঘোষ ইঁহার নিবাস পাবনা জেলার অন্তর্গত সাহাজাদপুর। বয়স প্রায় ১৬ বৎসর। ইনি হাজারিবাগের ডাক্তার স্বর্গীয় রাধাচরণ ঘোষের কনিষ্ঠা ভগিনী। এই বিবাহে শ্রীযুক্ত বাবু হরনাথ দাস আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। হরনাথ বাবু বিবাহের এক সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতে নানা স্থান হইতে আগত বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনকে লইয়া দুই বেলা উপাসনা করিয়াছিলেন। এই উপাসনায় নেলফামারির কোন কোন ভদ্রলোক যোগ দিয়াছিলেন। নেলফামারির কোর্ট ইন্‌স্পেক্টর বাবু প্রসন্নচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় এই উপাসনায় যোগ দিয়া প্রকাশ্যরূপে ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দেওয়া উচিত মনে করেন। পূর্ব্ব হইতেই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল। তিনি এবার ব্রাহ্মদিগের দিগের সহিত আলোচনা করিয়া ও প্রতিদিন তাঁহাদের উপাসনায় যোগ দিয়া উপবীত পরিত্যাগ করিয়াছেন, এবং গত ৯ই আশ্বিন রবিবার নেলফামারি ব্রাহ্ম সমাজের রাত্রিকালীন উপাসনার পর প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। ইঁহার নিবাস পাবনা জেলার অন্তর্গত তাঁতিবন্ধ গ্রামে। ইঁহার দীক্ষার সময়ে অনেক হিন্দু ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন।

অধ্যক্ষ সভা—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার সভ্য নির্ব্বাচন সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী অধ্যক্ষ সভার বিশেষ অধিবেশনে স্থিরীকৃত হইয়া গত ১লা আশ্বিনের তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের গত বিশেষ অধিবেশনে সেই সকল নিয়ম গৃহীত হইয়া নিয়মরূপে পরিণত হইয়াছে। ১লা আশ্বিনের প্রকাশিত নিয়মসমূহের কোন পরিবর্ত্তন না হওয়ায় তাহা আর প্রকাশিত হইল না।

উক্ত নিয়মাবলীর ২য় নিয়মানুসারে গত ১লা কার্ত্তিক হইতে তত্ত্বকৌমুদীতে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সভ্যগণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হইতেছে। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের যত অধিকসংখ্যক সভ্যের মধ্য হইতে অধ্যক্ষ সভার সভ্য নির্ব্বাচন হইবে, ততই উপযুক্ত লোকের অধ্যক্ষ সভার সভ্য হইবার সম্ভাবনা। এ জন্য সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সভ্যগণের মধ্যে যাঁহারা অধ্যক্ষ সভার সভ্য হইতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, অতি সত্বর তাঁহারা আপন আপন নাম ঠিকানা প্রভৃতি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়ে প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন। আগামী ২১এ নবেম্বরের পূর্ব্বে তাঁহাদের নাম সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্যালয়ে আসা আবশ্যক। সভ্যগণের বিশেষ যত্ন ভিন্ন এই নূতন প্রণালী অনুসারে অধ্যক্ষ সভার সভ্য নির্ব্বাচনকার্য্য কখনই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। অতএব তাঁহারা এ বিষয়ে মনোযোগী হইয়া আপন আপন নাম শীঘ্র পাঠাইয়া দিবেন।

অর্থ সংগ্রহ ;—ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার ও ব্রাহ্মসমাজের অন্যান্য বিভাগ সংক্রান্ত পাওনা টাকা আদায় করিবার জন্য বাবু বাণীকণ্ঠ রায় চৌধুরী বেহার প্রদেশে ও বাবু হরিমোহন ঘোষাল উত্তরবঙ্গে যাত্রা করিয়াছেন। আমরা আশা করি উক্ত প্রদেশীয় বন্ধুগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক স্ব স্ব দেয় টাকা ইঁহাদের হস্তে দিবেন।

দান ;—পঞ্জাব ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক লিখিয়াছেন,—"আমাদের সমাজের একজন পুরাতন বন্ধু লালা শর্দ্ধারাম আমাদের উপাসনা মন্দিরে মহিলাগণের বসিবার স্থান নির্ম্মাণার্থ ১৫০৲ দেড় শত টাকা দান করিয়াছেন। এখানকার কার্য্যনির্ব্বাহক সভা বিশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত এই দান গ্রহণ করিয়াছেন। এই মাসের শেষ সপ্তাহে আমাদের উৎসব হইবে; উৎসব শেষ হইলে যে কার্য্যের জন্য এই অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা আরম্ভ করা যাইবে।"—ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার।

সঙ্গতসভা ;—গত ২রা ও ৯ই কার্ত্তিক সঙ্গত সভার নিয়মিত অধিবেশন ও উপাসনা হইয়াছিল। কিন্তু প্রথমবারে সভ্যগণের মধ্যে অনেকে অনুপস্থিত ছিলেন বলিয়া বিশেষ কোন কথাবার্ত্তা হয় নাই। দ্বিতীয় বারেও পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের আলোচনা হয় নাই, অন্য বিষয়ে কথা বার্ত্তা হইয়াছিল। এই জন্য তাহা তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশিত হইল না।

রাজা রামমোহন রায় ;—গত ২৯এ অক্টোবর শনিবার অপরাহ্নে রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সিটি কলেজ ভবনে এক সভা হয়। তাহাতে বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত মহাত্মার জীবন সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার সভ্য নির্ব্বাচন সম্বন্ধীয় ২য় নিয়মানুসারে * সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের অবগতির জন্য নিবেদন করা যাইতেছে যে, আগামী ১৮৮৮ সালের জন্য যাঁহারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার সভ্য হইতে ইচ্ছুক আছেন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক আপন আপন নাম আগামী ২১এ নবেম্বরের মধ্যে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ কার্য্যালয়ে প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

সাঃ ব্রাঃ সমাজ
১৮ই অক্টোবর ১৮৮৭।

শ্রীশশিভূষণ বসু।
সহঃ সম্পাদক।

* ২। অধ্যক্ষ সভার সভ্য মনোনয়ন তারিখের (date of election) অর্থাৎ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশন তারিখের অন্যূন তিন মাস কাল পূর্ব্বে সমাজের পত্রিকা সমূহে প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন দ্বারা সমাজের সম্পাদক মহাশয় সাঃ ব্রাঃ সমাজের সভ্যগণের মধ্যে যাঁহারা অধ্যক্ষ সভার সভ্য হইতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে তাঁহার নিকট স্ব স্ব নাম, ঠিকানা, আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক প্রভৃতি বিবরণ প্রেরণ করিবার জন্য অনুরোধ করিবেন।

১৩ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রিট ব্রাহ্ম মিসন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা ১৭ই কার্ত্তিক মুদ্রিত ও ২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রিট্‌হইতে প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১০ম ভাগ।
১৫শ সংখ্যা।

১লা অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৮০৯ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৮

বাংসরিক অগ্রিমমূল্য	২॥০
মফস্বলে	৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য	৶০

পূজার আয়োজন।

এস ডুবে যাই।

দুজনেতে হাত ধরাধরি করে,
চল ছুটে যাই প্রাণের ভিতরে,
এস নেবে যাই, এস ডুবে যাই,
ফিরে উঠে যেন না আসি আবার।
বিরলে দেখাও তোমাতে আমায়,
দেখাও আবার আমাতে তোমায় ;
আত্মতত্ত্ব রবি, মনোহর ছবি,
পরকাশি' নাশ অসত্য আঁধার।
নিরখি' তোমাতে অখিল জগত,
স্থূল দ্বৈতভাব হউক বিগত ;
সকল আকার হয়ে নিরাকার,
ভববন্ধ মোর করুক খণ্ডন।
তব মাঝে হেরি' তব ভক্তগণে,
উথলি' উঠুক প্রেম পাপমনে ;'
আমিত্ব ত্যজিয়া, তুমিত্বে মজিয়া,
ধরায় স্বরগ করি দরশন।

আমি আর তোমার সঙ্গে সংগ্রাম করিতে পারি না। তুমি একটী একটী করিয়া আমা জীবনের সকল দুর্গ অধিকার করিয়া ফেলিতেছ। ষোল আনা সংসার বজায় রাখিয়া আমি ধর্ম্ম করিতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি তাহা করিতে দিলে না। আমি 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' রকম ধর্ম্ম চাহিয়া-ছিলাম, তুমি আমার সে দুষ্ট কল্পনা ব্যর্থ করিলে। কোথায় লইয়া যাইতেছ? সঙ্গে যাব কি? যদি অভয় দাও, তবে যাই। কাজ কি আমার ঘর সংসারে? আমার আবার কিসের ঘর সংসার? সংসার পৃথিবী সকলই তোমার। তুমি সংসারেই রাখ আর বৈরাগীই কর, আমার তাতে কি? তোমার হাত তো আমার হাতে থাকিবে, তোমার সহবাসের অপূর্ব্ব সৌরভে আমার মস্তিষ্ক তো ভোর হইয়া থাকিবে? তা হলে আমি যেখানে থাকি না কেন, সেখানেই স্বর্গ পাইব। চলনসই ধর্ম্মে, পোষাকি রকম উপাসনায় তোমার কাছে কে পার পাইবে? জ্ঞানময় পরমেশ্বর, আমার চতুরতা তোমার কাছে আমি যদি ডালে ডালে ঘুরি, তুমি পাতায় পাতায় গিয়া আমাকে ধর। আমি নীচু আদর্শ লইয়া কষ্টে মনকে বুঝা-ইতে চেষ্টা করি, তুমি "না" বলিয়া আমার সব গোলমাল করিয়া দাও। তবে আর তোমার সঙ্গে আমার বৃথা যুদ্ধ, বৃথা চতুরালি কেন? যা করিবার কর, আমি যেন আর কথাটী না কহি। তোমার উপর কথা কহিতে গিয়াই আমার এত লাঞ্ছনা। তুমি যা ভাল বোঝ, তাই কর। আমি তোমার পায়ে দিনরাত পড়ে থাকি।

মাঝে মাঝে তোমায় ছেড়ে কোথায় মরিতে যাই? বার বার পতনের যাতনা সহ্য করেও চক্ষু ফুটিল না। লোকে প্রথমে শুনে শিখে, পরে না হয় দেখে শিখে, শেষে ঠেকে শিখে। আমার শোনা অনেক কাল হইয়া গিয়াছে, দেখা ঠেকা শত শত বার হইয়াছে, তবু চৈতন্য হয় না। চিন্ময়! তোমার ছেলে হইয়া আমি মাঝে মাঝে অজ্ঞান হইয়া যাই কেন? তোমাকে ছাড়িলে যে আমার নাকালের একশেষ হয়। জল ছেড়ে কি মাছ বাঁচিতে পারে, না ভূমি ছেড়ে আকাশে গাছ থাকিতে পারে? তুমি আমার চক্ষুর জ্যোতি, যেই তুমি সরে যাও অমনি আমি কাণা হয়ে যাই। তুমি আমার জীবনের সার, যেই তুমি সরে যাও, অমনি আমার বুক খালি হয়ে যায়। তোমাকে ছেড়ে যে আমার এক মুহূর্ত্তও চলে না। প্রভু, আমি নিতান্ত তোমার অধীন। তুমি কি আমার অধীনত্ব দেখিতে পাইতেছ না? আর আমি তোমাকে ছেড়ে যেতে পারব না, তা হলে আমি নিশ্চয়ই মারা যাব। আগে আমি আরো শক্ত হই, তার পরে আমাকে পরীক্ষা করিও। মোটে এই আমার ধর্ম্মজীবন আরম্ভ হই-য়াছে, আমি শিশু, আমি তোমার কাছ হতে দূরে থাকিতে পারিব কেন? তাই বলি এখন, অন্ততঃ দিন কতকের জন্য, অবিচ্ছিন্ন রূপে তোমার সহবাস ভোগ করিতে দেও, যে আমি নির্ভয়ে সংসারে বিচরণ করি।

আমি শুনিয়াছি, তুমি এমন এক গাছ সৃষ্টি করেছ, যার পাতায় জল ধরা থাকে। পিপাসার্ত্ত পথিক সেই পাতার নীচে ছিদ্র করিলেই শীতল জল পায়, ও পান করিয়া কৃতার্থ

হয়। আমি সেই পাতার মত হইতে চাই। দুএক ঘণ্টার জন্য সরস ও ভারি হওয়া আমার ভাল লাগে না। এমনই উপাসনা করাও যে প্রাণকে নিঙ্গড়াইবা মাত্র লোকে ভাব পাবে। বর্ষণোন্মুখ মেঘে যেমন জল ভরা থাকে, প্রাণে যদি তেমনি ভাব ভরা না হইল, তবে কি উপাসনা হইল? একবার কাঁদিয়াই যদি চক্ষু শুকাইয়া গেল, তবে কি হইল? সদাই প্রাণের চক্ষু ভাবের জলে ভরা থাকিবে, সদাই হৃদয় তোমাতে ভারি হইয়া থাকিবে, তবে তো তৃপ্তি পাব। সাধক ভক্ত আসিয়া আমাকে যেই টিপিবেন, অমনি তাঁর হাত ভাবে ভিজিয়া যাইবে। এখন আমার এমনই দুর্দ্দশা, যে উপাসনার দু ঘণ্টা পরে মনে হয় যেন কখন উপাসনা করি নাই বা কাঁদি নাই, চক্ষু খট্‌খটে, প্রাণ পাথরের মত শক্ত। প্রভু তোমার কৃপায় কি না হয়? তুমি নিজে যেমন সদাই দয়ায় ভিজা, আমাকে তেমনই সদাই উপাসনায়, তোমার প্রেমে ভিজাইয়া রাখ। যেই সংসারের উত্তাপে প্রাণটা শুকাইয়া উঠিবে, অমনি তোমার কৃপাবিন্দু দিয়া তাহাকে ভিজাইয়া সরস করিয়া দিবে, এমনই করিয়া ভিজাইবে যেন লোকে নিঙ্গড়াইয়া ভাব বাহির করিতে পারে। হে ভাব সমুদ্র! তোমার ভাবের তো অভাব নাই, আমাকে এক বিন্দু দিলে তোমার কিছুই ক্ষতি বৃদ্ধি হবে না, মাঝে থেকে আমি কৃতার্থ হয়ে যাব।

আমি কি কথা কহি, না তুমি কথা কহাও? আমি কি উপাসনা করি না তুমি উপাসনা করাও? এ কথার উত্তর দেবতা তুমিই দিতে পার। আমি এই দেখি, যে প্রাণের অনেক উপর দিয়া উপাসনা চলিয়া যায়। যাই উপাসনা জমিয়া গেল, অমনি আমার সব গোলমাল হইয়া যায়। আমি ইহার পর উহা ভাবিব, উহার পর আর একটা কিছু ভাবিব, ইত্যাদি যে সকল মতলব আঁটিয়া আসি, সে সব ব্যর্থ হয়ে যায়। তুমি যে কেমন করে আমার মন বিকল কর তুমিই জান। আমি টের পাই, তুমি আমাকে চিদাকাশে কেবল তুলিতে থাক। যত বলি সে কি প্রভু এর মধ্যে কোথায় নিয়া যাইতেছ, দাঁড়াও আমি সব স্বরূপ উপলব্ধি করি, ধ্যান করি—প্রার্থনা করি। তোমার মুখে কথাটী নাই, তুমি কেবল টানিতে থাক। আমি ক্রমে বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়ি, প্রাণ আর কোন মতে আত্মবশে রাখা যায় না। তুমি আকর্ষণ করিতে করিতে শেষে এমনই আবর্ত্তে ফেলিয়া দাও যে আমি আত্মহারা হইয়া যাই। কি বলি, কি ভাবি, কি গাই, বুঝিতে পারি না। সে সব তো আমার কথা, আমার ভাব, আমার গান নহে। স্বর্গের জিনিস আমাকে মজাতে আসে, তোমার আদেশে আমাকে তাহারা এক একবার ছুঁয়ে পলায়ন করে। আমি কি তাদের একটাকেও ধরিয়া কয়েদ করিয়া জীবনের ধন করিতে পারিব না? তুমি আমাতে তোমার প্রেমের এমনই আটা লাগাইয়া দেও, যেন সে সকল স্বর্গের পাখীর দু একটাকে ধরিয়া প্রাণের ভিতর বসাইয়া রাখিতে পারি।

শিশুর কোমল মুখে মধুর হাসি শিশুর না তোমার? পাখীর কলকণ্ঠ নিঃসৃত গীতের লালিত্য পাখীর না তোমার? চাঁদের মোহন শোভা চাঁদের না তোমার? আজীবন সৌন্দর্য্য খুঁজিলাম কোথাও পাইলাম না। যখন তোমার কাছে গেলাম, তুমি চক্ষে একটু খানি কি মাখাইয়া দিলে, আর দেখি যে চারিদিকে রাশি রাশি সৌন্দর্য্য ফুটিয়া রহিয়াছে, থাকিবারই তো কথা; তুমি সুন্দর, তোমার সৃষ্ট বিশ্ব কি বিশ্রী হইতে পারে? অন্ধকারেরও শোভা আছে; সে কিন্তু সবাই দেখিতে পায় না, কেবল বিশ্বাসী দেখিতে পান। তোমার দত্ত অঞ্জন যতক্ষণ চক্ষে থাকে, ততক্ষণ পৃথিবীকে স্বর্গ দেখি; নদীকে মন্দাকিনী ও অরণ্যকে নন্দন কানন দেখি। ক্রমে যখন সেই কাজল একটু একটু করে ক্ষয় পায়, তখন আগে যে মরুভূমি দেখিতেছিলাম তাহাই দেখি। ঠিক যেন ভোজ বাজী, নিমেষের মধ্যে কি পরিবর্ত্তন! যেখানে স্বর্গ দেখিতেছিলাম, সেখানে আর কিছুই নাই! প্রভু! বারমাস কি কাজল পরে থাকা যায় না? তা হলে সকল গোলযোগ চুকিয়া যায়। আমার অতৃপ্ত সৌন্দর্য্যতৃষ্ণা মিটে, তোমার ভক্ত সন্তানেরাও একটা মহাপাপীর অলৌকিক পরিবর্ত্তন দেখিয়া খুসী হন। যতক্ষণ আমি তৃণের মধ্যে তোমার সৌন্দর্য্য দেখিতে না পাইতেছি, ততক্ষণ আর তৃণ হতে কিরূপে সুনীচ হইতে পারিব? মা যে ছেলেকে সাজিয়ে দিয়ে দেখতে বড় ভাল বাসেন, তুমি কি আমাকে বিশ্বাস প্রেম ও পুণ্যে সজ্জিত দেখতে ভাল বাস না? তুমি যে আমাকে পুণ্যে রূপবান দেখিতে ভাল বাস, সেই ভরসায় নিরাশ হই নাই। এখন শীঘ্র শীঘ্র তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক, আমি বিশ্বাস কাজল পরে তোমাকে বিশ্বে দেখিয়া ধন্য হই।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

উপাসনা তত্ত্ব।

(৪)

উপাসনার উপকরণ।

সাকার দেবতার পূজায় সাকার উপকরণের প্রয়োজন হয়, নিরাকারের পূজার জন্য নিরাকার উপকরণ চাই। ফুল ও বিল্বদলে শক্তি ও শিবের উপাসনা হইতে পারে, কিন্তু যিনি ফুলের ফুল্লতা ও বিল্বদলের কোমলত্ব, এবং যিনি জগতের শিব ও শক্তির শক্তি, তাঁহার পূজার জন্য অন্যবিধ আয়োজনের প্রয়োজন। নিরাকার উপাসক তাই আত্মার উদ্যান হইতে উপাসনার জন্য নিরাকার পুষ্পাদি আহরণ করেন। মনের একাগ্রতা সাধনের পথে সহায় হয় বলিয়া নিরাকার উপাসনায় ও কেহ কেহ সাকার উপকরণ রাখিতে চান, কিন্তু আমরা ইহার পক্ষপাতী নহি। বাহ্য সাহায্য গ্রহণে কোন আপত্তি নাই সত্য বটে, কিন্তু আমাদের উপাসনা যখন দেশকালবোধের অতীত স্থানে আমাদিগকে লইয়া যায়, ও সম্পূর্ণরূপে আত্ম বিস্মৃত করে, তখন উহাকে বাহ্য উপকরণ সাপেক্ষ করা কখনই

যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। বিশেষতঃ আমরা যখন সাকার পূজার দেশে নিরাকার পূজা প্রচলিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি, তখন সাকার উপকরণ গ্রহণ বা পরিত্যাগ সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত। বাহ্য উপকরণে নিরাকার পূজা হয় না ইহা মনে মনে রাখিলে হইবে না, দৃষ্টান্ত দ্বারা সাধারণকে বুঝাইতে হইবে।

উপাসনার সর্ব্ব প্রধান উপকরণ সজীব বিশ্বাস। এই বিশ্বাস না থাকিলে প্রত্যক্ষ উপাসনা অসম্ভব, পরোক্ষ উপাসনায় আত্মার উপকার হয় না। জ্ঞানভক্তিযোগে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ জানিয়া উপাসনা আরম্ভ করিতে হইবে। নিরাকারের প্রত্যক্ষ কিরূপে হইবে? ব্রহ্মপুরাণ এই বিষয়ে বলিয়াছেন।

"অদৃশ্যে ভাবনা নাস্তি দৃশ্যমেতদ্বিনশ্যতি।
অবর্ণমীশ্বরং ব্রহ্ম কথং ধ্যায়ন্তি যোগিনঃ॥
ঊর্দ্ধ পূর্ণমধঃ পূর্ণং মধ্যপূর্ণং যদাত্মকং।
সর্ব্বপূর্ণং স আত্মেতি সমাধিস্তস্য লক্ষণং॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, অদৃশ্য বস্তুর ভাবনা হয় না, এই সকল দৃশ্য বস্তুও বিনাশ প্রাপ্ত হয়, যোগীরা তবে কিরূপে সেই বর্ণহীন ঈশ্বরের ধ্যান করেন? তাঁহারা দেখেন যে সেই পরমাত্মা চিৎরূপে ঊর্দ্ধ, অধঃ, মধ্য, সমস্তই পূর্ণ করিয়া আছেন; ইহাই সমাধির লক্ষণ। এই ব্যাপ্তি অনুভব করিলেও ঠিক্ প্রত্যক্ষ উপাসনা হয় না। যাহাতে পূর্ণ ব্রহ্মের ঘনীভূত চিদ্বিভূতি আমার অব্যবহিত সন্নিধানে স্ফূর্ত্তি পায়, উপাসকের এরূপ বিশ্বাস থাকা আবশ্যক। পৌত্তলিক আপন উপাস্য পুত্তলিকাকে সম্মুখে রাখিয়া পূজা করে, তাহার নৈকট্য ও বর্ত্তমানতাতে অনুমাত্র সন্দেহ করে না। ব্রহ্মোপাসক তাঁহার হৃদয়-পুত্তলি নিরাকার ব্রহ্মকে তেমনি করিয়া নিকটে ব্যক্তিরূপে দেখিয়া উপাসনায় প্রবৃত্ত হন। কিন্তু ইহাতেও হয় না, আরও গভীরতর বিশ্বাসের প্রয়োজন। তাহার সাহায্যে দেশের রাজ্য অতিক্রম করিয়া কালের রাজ্যে গমন করিতে হয়। সেখানে বিশ্বাস চক্ষে উপাসক দেখেন যে কালের কাল মহাকাল ব্রহ্ম কালের নিয়ন্তা হইয়া প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন, প্রত্যেক মুহূর্ত্তে প্রাণ সঞ্চার করিতেছেন, অমনি উহা জীবন্ত হইয়া কালস্রোতে ভাসিয়া উঠিতেছে। অথচ তিনি স্বয়ং কালের অতীত। কোটী বৎসর পূর্ব্বে তাঁহাকে যে ভাবে দেখিয়া ভক্তগণ কৃতার্থ হইয়াছিলেন, উপাসক তাঁহার সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দরূপ দেখিয়া এখনও ধন্য হইতেছেন। পূর্ণ ও প্রকৃত প্রত্যক্ষ উপাসনা কিন্তু তত্ক্ষণ আরম্ভ হয় না, যতক্ষণ না উপাসকের আত্মা বাহিরের চিন্তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্তরে প্রবেশ করে। যখন সে আত্মজ্ঞানের মূলে পরমাত্মাকে দেখে, যখন সে প্রবাহময় আত্মরাজ্যে স্থিতিশীল আত্মাকে জ্ঞানপ্রেমসমন্বিত পরমাত্মার চিৎস্বরূপের বিষয়ীভূত বলিয়া জানিতে পারে, তখন প্রাণ হইতে "সত্যং" এই মহাবাণী উত্থিত হয় এবং উপাসক উপাসনা আরম্ভ করেন.

উপাসনার আর একটী উপকরণ প্রেম। প্রকৃত বিশ্বাস থাকিলে প্রেম নিশ্চয়ই থাকিবে, কিন্তু এই দুইটী ভাবকে পৃথক্ করা যায়। উপাসনা অল্পাধিক পরিমাণে কেবল জ্ঞান ও বিশ্বাস মূলক হইলেই যে সরস হইবে তাহা নহে। বিশ্বাস ও উজ্জ্বল উপলব্ধি হেতু এক প্রকার আনন্দ অন্তরে অনুভব করা যায়, কিন্তু তাহা প্রেমানন্দ নহে। জ্ঞানানন্দ স্থায়ী হয় কি না বলিতে পারি না, কিন্তু ইহা বেশ পরিষ্কার বুঝা যায় যে উহাতে প্রাণ পরিতৃপ্ত হয় না। উপাসনায় প্রেম না থাকিলে সে উপাসনা হৃদয়স্পর্শী ও নবজীবনদায়ী হয় না। ব্রহ্মব্যাপিত্ব ও ব্রহ্মশক্তি বেশ স্ফূর্ত্তি পাইল, অথচ দেখিতে পাই যে প্রাণের ভিতরের একদিক্‌টা কেমন শুকাইয়া রহিয়াছে। প্রাণ সরস করিবার জন্য তাই প্রেমের আবশ্যকতা। প্রেম সম্বন্ধ-মূলক। ঈশ্বরের সঙ্গে আত্মার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ অনুভূত না হইলে প্রেম হওয়া কঠিন। ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ নানা প্রকার, সুতরাং প্রেমও এক প্রকার নহে। অবস্থাভেদে সাধক বিশেষ বিশেষ প্রেম ভাব সাধন করিবেন। এখানে ইহার বিস্তৃত আলোচনা অনাবশ্যক। এ বিষয়ের বিশেষ তত্ত্ব জানিতে পাঠকদিগের মধ্যে যদি কাহারও কৌতূহল হয় তাঁহাকে আমরা রামানন্দ রায় ও শ্রীচৈতন্যের ভগবৎপ্রসঙ্গ পাঠ করিতে অনুরোধ করি। এখানে সংক্ষেপে এই মাত্র বলিলেই হইবে, যে সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে আরম্ভ করিয়া জীব ঈশ্বরকে শেষে প্রেমাস্পদ বলিয়া উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়। জ্ঞান যোগের গভীরতা আছে সত্য, কিন্তু সেই গভীরতা যদি কেবল জ্ঞানমূলক হয়, তাহাতে প্রাণের অন্তরস্থ তৃষ্ণা নিবারিত হয় না। "জ্ঞান যোগে ভাব তাঁরে তিনি তোমার সঙ্গে" যিনি এই মন্ত্র সাধনা করেন তিনি শুষ্কতার হস্ত হইতে নিস্তার পান না। জ্ঞান মূলক উপাসনার তেজ স্থায়ী হইতে দেখা যায় না। জ্ঞানমিশ্রিত ভক্তিযোগ অবলম্বন দ্বারাই উপাসনা নিহিত অনন্ত ব্রহ্ম স্বরূপ সৌন্দর্য্যে মগ্ন হওয়া যায়। জ্ঞানমিশ্রিত প্রেমই উন্মত্ততা উৎপাদন করে এবং সেই উন্মত্ততা ক্রমশঃ স্থায়ী হইয়া যায়। সুতরাং কেবল উপাসনার বেদান্ত ও উপনিষদ কাছে রাখিলে হইবে না, ভাগবত ও গীতাকেও কাছে রাখিতে হইবে। যাঁহাদের কণ্ঠনিঃসৃত সাম, ঋক্ ও সূক্তে ভারতের প্রাচীন অরণ্যরাজি পূর্ণ ও প্রতিধ্বনিত হইত, সেই পূজ্যপাদ আর্য্য ঋষিগণকে যেমন এক দিকে রাখিতে হইবে, যাঁহারা হরিপ্রেমে মগ্ন হইয়া আচণ্ডাল ভক্তি বিতরণ করিয়াছিলেন, সেই চিরস্মরণীয় ভক্ত মণ্ডলীকেও তেমনি আত্ম প্রাণের ভিতর ধরিতে হইবে। উপাসকের প্রাণে যখন উপনিষদ ও গীতা মিলিত হয়, তখন সে সরস উপাসনার ভার বহিতে অসমর্থ হয়।

উপাসনার আর একটী প্রধান উপকরণ দীনতা। মহর্ষি ঈশা বলিয়াছেন, "দীনাত্মারাই ধন্য, কেন না স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই"। স্বর্গরাজ্যে তৃণের বড় আদর। শ্রীচৈতন্য বলিয়া গিয়াছেন যে "তৃণাদপি সুনীচেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।" মহর্ষি বায়েজিদকে ঈশ্বর বলিলেন, "বায়েজিদ, যদি আমাকে চাও এরূপ কিছু লইয়া এস যাহা আমার নাই।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু! তাহা কি যাহা তোমার নাই?"

ঈশ্বর বলিলেন, "দীনতা।" দীন হীন অকিঞ্চন না হইলে প্রভুর কাছে আসন পাওয়া যায় না। আপনার দিক্ যত নিবিয়া, যায়, প্রভুর আলো তত উজ্জ্বল হইয়া উঠে। আপনার অসারত্ব ও অপদার্থতার উপলব্ধি যত প্রগাঢ় হয়, ব্রহ্মের সারবত্তা ও সত্যভাব প্রাণে তত ফুটিয়া উঠে। যে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া বুঝিল যে তাহার কিছুই আয়োজন হইল না, সর্ব্বাপেক্ষা তাহারই উপাসনা সরস হয়। কত সময় দেখিয়াছি যে নানা কারণে শূন্য হস্তে উপাসনা মন্দিরে উপস্থিত হইয়াছি, প্রভুর জন্য কোন উপহারই আনিতে পারি নাই বলিয়া লজ্জায়, ঘৃণায় মরিয়া গিয়াছি, আপনার অসহায়তা, অযোগ্যতা ও অপরাধ স্মরণ করিয়া আপনাকে ধূলি অপেক্ষা হীন মনে হইয়াছে, উপাস্য দেবতা তখন বড় যত্ন করিয়া, বড় আদর করিয়া কাছে টানিয়া তাঁহার মধ্যে ডুবাইয়া দিয়াছেন। সংসারে যাহার অনেক আছে তাহারই প্রতিপত্তি, সেই ধনী বলিয়া গণ্য; ধর্ম্মরাজ্যে ঠিক্ ইহার বিপরীত। সেখানে যার কিছুই নাই, তাহারই বহুমান; যে নির্ধন, সে বড় মানুষ বলিয়া গণ্য। বায়েজিদ বলিয়াছেন, দাসের কিছুই না থাকা অপেক্ষা অন্য কিছুই শ্রেষ্ঠ নহে। যখন না সাধনা, না বিদ্যা, না কর্ম্ম কিছুই নাই, তখন সমুদয় আছে। এই দীনতাই প্রার্থনা ও অনুতাপের জননী। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে এই দীনতার একদিক বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। নিবেদন বলিয়া দীনতা বিষয়ক এক প্রকার সঙ্গীত তাঁহাদের মধ্যে আজও প্রচলিত রহিয়াছে। যিনি নিবেদন শুনিয়াছেন, তিনিই জানেন উহা কি পদার্থ। নিবেদন শুনিয়া অতি কঠোর পাষাণ হৃদয় ও বিগলিত হয়, অতি শুষ্ক মনেও অনুতাপ ও প্রার্থনার ভাব জাগ্রত হয়। বৈষ্ণবদিগের মধ্যে কিন্তু এই দীনতা ভাবুকতাতে বদ্ধ রহিয়াছে। পশ্চিমে মহর্ষি ঈশার শিষ্যগণের ভিতর দীনতার অপর দিক্ বিকাশিত হইয়াছে। অনুতাপ ও প্রার্থনা ইহাঁদের মধ্যে যথেষ্ট, কিন্তু ভাবুকতার অভাবে সকলি যেন নীরস ও শুষ্ক।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, ব্রহ্ম পূজার জন্য জগতের সকল ধর্ম্মের উপাসনার উপকরণের সার চাই। ইহাতে উপনিষদের আত্মতত্ত্ব, গীতার নিষ্কাম প্রীতি, খৃষ্টীয়ানের প্রার্থনা এবং বৈষ্ণবের দীনতা আবশ্যক। এ সকল স্বর্গীয় উপকরণ সংগ্রহ করা কি মানুষের সাধ্য? অথচ ইহা না হইলে হৃদয়স্পর্শী উপাসনা হয় না, আর হৃদয়স্পর্শী উপাসনা না হইলে দিন চলে না। এই স্বর্গীয় উপকরণ যে পথে গেলে পাওয়া যায়, সেই পথে চলিতে হইবে। আমাদের উপাস্য দেবতার এমনই মাহাত্ম্য যে আমরা যদি সাধ্যমত চেষ্টা করি ও তাঁহার উপর একান্ত মনে নির্ভর করি, তিনি আপন ঐশীশক্তি সঞ্চার করিয়া আমাদিগের মধ্যে ঐ সকল উপকরণ সংগ্রহ করাইয়া দেন। আপনার পূজার আয়োজন ব্রহ্ম আপনিই করিয়া থাকেন। কেবল আত্ম চেষ্টায় কে তাঁহার পূজার আয়োজন করিবে? বিশ্বাসী সাধক বৃন্দ উপাসনার পূর্ব্বে তাই গাইয়া থাকেন।

"হৃদয়ের প্রীতিফুলে, তুমি বিকাশিছ নাথ,
লও প্রভু তুলিয়ে সে ধন তোমারি।"

বিশ্বাসের বল।

"যদি তোমাদের এক সর্ষপ কণা মাত্র বিশ্বাস থাকে, তবে তোমরা পর্ব্বতকে বলিবে 'স্থানান্তরিত হও,' অমনি উহা স্থানান্তরিত হইবে"—মহর্ষি ঈশার এই মহাবাক্যের প্রকৃত অর্থ যিনি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তিনিই যথার্থ বিশ্বাস কি তাহা বুঝিয়াছেন। আমরা যাহাকে সচরাচর বিশ্বাস বলিয়া মনে করি তাহা বিশ্বাস নহে, বুদ্ধিগত সংস্কার মাত্র। আমি ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও স্বরূপে বিশ্বাস করি, অথচ আমার পাপ, সাংসারিকতা ও অপ্রেম দূর হয় না, এরূপ হইতেই পারে না; আমি পরলোকে বিশ্বাস করি অথচ আমি ঐহিক সুখের জন্য দিবানিশি ব্যস্ত রহিয়াছি ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব; আমি ন্যায়, পবিত্রতা ও প্রেমের জয় হইবে বলিয়া বিশ্বাস করি, অথচ আমার সৎকার্য্যে উৎসাহ নাই, একটু বাধা বিঘ্ন দেখিলেই আমি নিরাশ হইয়া পড়ি, সামান্য কারণে আমি অসহিষ্ণু ও বিরক্ত হইয়া উঠি, এ কথার কোনও অর্থ নাই। চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির পক্ষে অন্ধের ন্যায় আচরণ কখনই সম্ভব হইতে পারে না। সম্মুখে অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছে দেখিয়া, বাঁচিবার ইচ্ছা সত্ত্বে আমি কখনই তাহাতে ঝাঁপ দিতে পারি না। শরীরে আঘাত লাগান যদি বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে না করি, তবে আমি কখনই সম্মুখে দুর্ভেদ্য প্রাচীর দণ্ডায়মান দেখিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহার বিরুদ্ধে ধাবমান হইতে পারি না। ইহার কারণ এই যে, আমি বহির্জগতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি; উহা আমার নিকট সংস্কার বা কল্পনা মাত্র নহে; অগ্নিকুণ্ডের অস্তিত্বে ও অগ্নির দাহিকা শক্তিতে আমার অটল বিশ্বাস আছে; প্রাচীরের অস্তিত্বে ও উহার বাধা প্রদানের শক্তিতে আমার উজ্জ্বল বিশ্বাস আছে। যিনি আমা অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ এরূপ ব্যক্তি সম্মুখে রহিয়াছেন জানিয়া কোনও প্রকার অন্যায় বা অভদ্র ব্যবহার করা আমার পক্ষে অসম্ভব। ইহার কারণ এই যে, তাঁহার অস্তিত্বে ও তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। আমরা যাঁহাকে অত্যন্ত সম্মান করি এরূপ ব্যক্তি আমাদের গৃহে আসিলে আমরা উপযুক্তরূপে তাঁহার অভ্যর্থনা করিবার জন্য কতই না ব্যস্ত হই! ইহার কারণ এই যে, আমাদের সম্মানাস্পদ ব্যক্তি আমাদের গৃহে উপস্থিত ইহা সত্য বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। এক কথায় যাহার বিশ্বাস যেরূপ তাহার কার্য্যও তদনুযায়ী হইয়া থাকে।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, প্রকৃত বিশ্বাসই আমাদের জীবনের নিয়ামক। নিজের ও জগতের অস্তিত্বে মানুষের যে স্বাভাবিক বিশ্বাস আছে তাহারই উপর তাহার সমস্ত কার্য্যকলাপ প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃত বিশ্বাসের প্রভাব সমস্ত জীবনের উপর পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িবেই পড়িবে। ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। আমাদের নিজের ও বহির্জগতের অস্তিত্বে আমাদের বিশ্বাস যেরূপ উজ্জ্বল, আধ্যাত্মিক সত্য সমূহ সম্বন্ধে যদি আমাদের সেইরূপ উজ্জ্বল বিশ্বাস থাকিত, তাহা হইলে আমাদের জীবনের গতি সম্পূর্ণরূপে ফিরিয়া যাইত। তাহা হইলে আমাদের উপাসনা গাঢ়তর হইত, জীবন উৎসাহ উদ্যমে পূর্ণ হইত, পাপ আমাদের

পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িত, আমরা নিত্য উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিতাম। একটী সামান্য আধ্যাত্মিক সত্যে যাঁহার যথার্থ বিশ্বাস আছে, তিনি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় সমস্ত বাধা বিঘ্ন ভস্মীভূত করিয়া ফেলিতে পারেন। একজন প্রকৃত বিশ্বাসীর জীবনের প্রভাবে সমস্ত সমাজের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতে পারে। প্রত্যেক সত্যের মধ্যে সেই সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের শক্তি নিহিত রহিয়াছে। এই জন্যই মানুষ যখন প্রত্যক্ষভাবে কোন সত্য উপলব্ধি করে, তখন উহার প্রভাবে তাহার প্রাণে দুর্জ্জয় বলের আবির্ভাব হয়। আধ্যাত্মিকরাজ্যে বাস্তবিকই বিশ্বাসের প্রভাবে মৃতপ্রাণে জীবনসঞ্চার হয়, অন্ধ চক্ষু লাভ করে, মূক ব্যক্তি বাক্‌শক্তি লাভ করে, বধিরের বধিরতা দূর হয়। ইহা কবিকল্পনা নহে, আধ্যাত্মিক জীবনের পরীক্ষিত সত্য। ঈশ্বরের সরল উপাসকমাত্রেই নিজ নিজ জীবনে অল্প বা অধিক পরিমাণে ইহা অনুভব করিয়া থাকেন। উপাসনার মধ্য দিয়া যখনই সাধক ঈশ্বরের আলোকে কোন একটী আধ্যাত্মিক সত্য উজ্জ্বল ও প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন, তখনই তিনি বুঝিতে পারেন, বিশ্বাসের বলে মৃতপ্রাণে জীবনসঞ্চার হওয়ার অর্থ কি? কিন্তু সাধনের অভাবে ঐ সকল সত্য আমাদের জীবনে স্থায়ী হয় না বলিয়াই আমরা আজিও অটল বিশ্বাস লাভ করিতে পারিতেছি না, আমাদের জীবনের স্রোত স্থায়িভাবে পরিবর্ত্তিত হইতে পারিতেছে না, আমাদের প্রাণে ধর্ম্মভাব ভাল করিয়া বসিতে পারিতেছে না, আমাদের জীবনের চঞ্চলতা দূর হইতেছে না।

বিশ্বাসের অভাবেই আমরা প্রকৃত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। আমরা যে সকল উচ্চ সত্যের আলোচনা করি, আমরা মুখে যে সকল বড় বড় কথা বলি, যদি তাহার একটী সত্যেও আমাদের বিশ্বাস থাকিত, তাহা হইলে আমাদের জীবন অগ্নিময় হইত। আমরা মুখে বলি, আমাদের উপাস্য দেবতা সত্যশিবসুন্দর, কিন্তু বাস্তবিক যদি আমরা তাঁহাকে সত্যশিবসুন্দর বলিয়া জীবনে উজ্জ্বল ও প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিতাম, তাহা হইলে কি ঐ বিশ্বাসের প্রভাব আমাদের জীবনে পরিলক্ষিত হইত না? তাহা হইলে কি আমাদের জীবনে সত্যের মহিমা প্রকাশিত হইত না? আমাদের জীবন সুন্দর ও দেবভাবাপন্ন হইত না? কাতর প্রাণে ডাকিলে পরমেশ্বর পাপীর হৃদয়ে আত্মস্বরূপ প্রকাশিত করেন, কোন্ ব্রাহ্ম এ কথা না স্বীকার করেন? কিন্তু হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রকাশ উজ্জ্বলভাবে উপলব্ধি করিবার জন্য আমাদের মধ্যে কয়জন বিশেষ আগ্রহের সহিত চেষ্টা করিয়া থাকেন? পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ—ব্রাহ্মধর্ম্মের জীবনস্বরূপ এই মূল সত্যে কয়জনের যথার্থ বিশ্বাস আছে? কয়জন ব্রাহ্ম পরমেশ্বরকে আপনার ইষ্টদেবতারূপে হৃদয়ে বসাইতে সমর্থ হইয়াছেন? সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, সকল অবস্থায় তাঁহাকে একমাত্র গুরু, বন্ধু ও সহায়রূপে উপলব্ধি করিয়া তাঁহার উপর সকল আশা ভরসা স্থাপন করিতে পারিয়াছেন?—তাঁহার ইচ্ছার সহিত আপনার ইচ্ছাকে মিশাইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন? আমরা কি জীবন্ত ঈশ্বরের প্রকৃত উপাসক? আমরা কি পরমেশ্বরের প্রকৃত বিশ্বাসী সন্তান? তবে কৈ সে ব্রহ্মতেজ আমাদের হৃদয়ে যাহা বিশ্বাসের চিরসঙ্গী? কৈ সে চরিত্রের প্রভাব আমাদের জীবনে যাহা প্রকৃত উপাসনার নিত্য সহচর? কৈ সে জলন্ত অগ্নিময় ভাব আমাদের প্রাণে যাহা জীবন্ত ঈশ্বর দর্শনের অবশ্যম্ভাবী ফল? আর যদি তাহাই প্রাণে লাভ করিতে না পারিলাম, তবে আর আপনাদিগকে ব্রাহ্ম বলিয়া লাভ কি? একজন বিশ্বাসীর জীবনের প্রভাব সহস্র অল্পবিশ্বাসীর আকাশভেদী বক্তৃতা অপেক্ষা অধিক কার্য্যকারী। ভাই! তুমি কি ঈশ্বরের বিশ্বাসী সন্তান? তবে কথা কও, দুইটা স্বর্গের সংবাদ দিয়া তাপিত প্রাণকে শীতল কর। নতুবা চুপ করিয়া থাক; বক্তৃতা করিবার সাধ থাকে, রাজনৈতিক কার্য্যক্ষেত্রে অথবা অন্য যেখানে ইচ্ছা যাও। ধর্ম্মসমাজে তুমি কিছু করিতে পারিবে না। উপদেষ্টা! তুমি কিসের উপদেশ দিতেছ? ধার করা কথা শুনিতে চাই না; দুইটা প্রাণের কথা বল, বিশ্বাসের কথা বল। তাহা যদি না পার, তবে তোমার উপদেশে আমার শুষ্ক প্রাণ ভিজিবে কিরূপে? প্রচারক! তুমি কি প্রচার করিতে যাইতেছ? যদি প্রাণের মধ্যে ঈশ্বরের দর্শন পাইয়া থাক, যদি পরমেশ্বর কি পদার্থ চিনিয়া থাক, তাঁহাকে প্রাণের সিংহাসনে বসাইতে পারিয়া থাক, যদি দুইটা বিশ্বাসের কথা বলিতে পার, তবে এস আমার নির্জীব প্রাণে একটু আগুন জ্বালিয়া দাও। এ কি? তোমার হৃদয় এত শীতল কেন? তবে তুমি পরের প্রাণে আগুন জ্বালিবে কিরূপে? ব্রাহ্মসমাজে বিশ্বাসী লোকের অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়াছে। প্রকৃত বিশ্বাস ব্যতীত আমরা আধ্যাত্মিক রাজ্যে এক পদও অগ্রসর হইতে পারিব না; প্রকৃত বিশ্বাস ব্যতীত ব্রাহ্মসমাজ হইতে জগৎ কোনও স্থায়ী উপকার লাভ করিতে পারিবে না।

ধৈর্য্যশীলতা।

ধর্ম্মজীবনে ধৈর্য্যশীলতার অভাব আমাদের হীনতার একটী প্রধান কারণ। সাধক ও আমাদের মধ্যে এই প্রভেদ দেখিতে পাই, যে সাধক ব্রহ্মে লাগিয়া থাকেন, আমরা একবার আসিয়া লাগি, আবার চলিয়া যাই। মোহমুদ্গরের উক্তি—

"বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তঃ,
তরুণস্তাবৎ তরুণীরক্তঃ।
বৃদ্ধস্তাবৎ চিন্তামগ্নঃ,
পরমে ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ॥"

আমাদের সম্বন্ধেই প্রয়োজ্য। আমরা সাধনাও করি, অথচ ধনমানের সেবা পরিত্যাগ করি না। সংসারের প্রতি আমাদের কেমন উজ্জ্বল দৃষ্টি রহিয়াছে! সাধক কেবল সাধনা লইয়াই থাকেন। সাধনা তাঁহার ব্রত, সাধনা তাঁহার প্রাণ; সাধনা আমাদের সখ, সাধনা আমাদের খেয়াল। সাধক প্রাণপণে সাধনা ধরিয়া থাকেন, আমরা ততক্ষণ সাধন ভজন করি, যতক্ষণ আমাদের উহা ভাল লাগে। মন ভাল আছে,

উপাসনা, সঙ্কীর্ত্তন ও নাম জপের ঘটা পড়িয়া গেল, মন ভাল নাই, অমনি এমন হইয়া গেলাম, যেন পূর্ব্বে কখনও সাধন করি নাই; সব সাধন ভজন ছাড়িয়া দিলাম। সাধকের দৃষ্টি প্রভুর উপর। যদি তাঁহার জন্য তাঁহাকে অনন্তকাল অপেক্ষা করিতে হয়, তাহাতেও তিনি পশ্চাৎপদ নহেন। কথিত আছে, যে নারায়ণ একবার দুই জন মহাতপা ঋষির ধৈর্য্যশীলতা পরীক্ষা করিতে আসেন, উভয়েই বহু সহস্র বর্ষ ধরিয়া তাঁহার তপস্যা করিতেছিলেন, নারায়ণ তাঁহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা আরও ষাট হাজার বৎসর তপস্যা করিলে আমাকে পাইবে।" বিষ্ণুর মুখে এই সংবাদ শুনিয়া একজন দীর্ঘকালব্যাপী পূর্ব্বকৃত তপস্যার পর আরও ষাট হাজার বৎসর ভবিষ্যতে অপেক্ষা করিতে হইবে মনে করিয়া একেবারে নিরাশ হইলেন, এবং হা হতোঽস্মি বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। আর এক জন ঋষি ষাট হাজার বৎসর পরে নিশ্চয়ই দর্শন পাইবেন, দেবতার মুখে এই কথা শুনিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তিনি তখনই দর্শন পাইলেন, কিন্তু যিনি নিরাশ হইয়াছিলেন তিনি দেবতার দর্শন পাইলেন না।

"হরিসে লাগি রহরে ভাই,
তেরা বনত বনত বনি যাই।"

এই মহাবাক্যের নিগূঢ় মর্ম্ম কেবল সাধকই বুঝিতে পারেন। সেই জন্য তিনি প্রভুর মন্দির দ্বারে সদাই মস্তক রক্ষা করেন। সহস্র অবস্থা ও ভাবের পরিবর্ত্তনে সেথান হইতে ক্ষণকালের জন্য সে মস্তক উত্তোলন করেন না, সুতরাং প্রভু স্বয়ং আসিয়া বড় যত্ন করিয়া, বড় আদর করিয়া তাঁহার সন্তপ্ত মস্তক অনন্ত প্রেম ক্রোড়ে তুলিয়া লন ও আপন অলৌকিক রূপরাশি প্রকাশিত করিয়া তাঁহার সকল দুঃখ ও জ্বালা নিবারণ করেন। যিনি ব্রহ্মকে কখনও পরিত্যাগ করেন না, ব্রহ্ম তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন, ইহা কখন সম্ভব নহে। যিনি ধর্ম্মের সেতু, যিনি ধর্ম্মের আবহ তাঁহার ধৈর্য্যশীলতার ত্রুটি এপর্য্যন্ত কেহ দেখিতে পাইল না। আমরা তাঁহার কথা শুনিতেছি না, তাঁহার মতে চলিতেছি না, তাঁহার কোমল বক্ষে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতেছি, তথাপি ক্ষণকালের জন্য তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি হয় না। কতকাল ধরিয়া তাঁহাকে হৃদয়দ্বারে দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছি, তিনি দাঁড়াইয়াই আছেন, তবু তাঁহার সহিষ্ণুতা ভঙ্গ হয় না। আমরা আমাদের পরিত্রাণ সম্বন্ধে নিরাশ হই বটে, কিন্তু তিনি কখন নিরাশ হন না। তাঁহার প্রেম চক্ষুর পলক পড়িতে কেহ দেখে নাই, তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছার বিন্দু মাত্র পরিবর্ত্তন কেহ কল্পনাতেও ভাবিতে পারেন না। সাধক প্রাণপণে সাধ্য দেবতার অনুকরণ করেন; একবার যাহা জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিলেন, সহস্র বিঘ্ন বাধার মধ্যেও তাহা ভগ্ন করেন না। একবার যাহা করিব বলিলেন, পৃথিবীর সমস্ত রাজশক্তি একীভূত হইলেও তাঁহাকে সে কার্য্য হইতে বিরত করিতে পারে না। প্রলোভন তাঁহার কাছে পরাস্ত, এবং পাপ তাঁহার কাছে ভীত। সংসার তাঁহার কাছে অগ্রসর হইতে পারে না। তিনি যদি মনে করেন যে প্রত্যহ উপাসনা করিবেন, প্রাণপণ করিয়া সেই ব্রত পালন করেন। দুই দিন উপাসনা ভাল লাগিল না বলিয়া তিনি উপাসনা ছাড়িয়া দেন না, দুই দিন সাধনবিশেষ কঠোর বোধ হইতেছে বলিয়া তাহা পরিত্যাগ করেন না। সাধক সিদ্ধি অন্বেষণ করেন, অথচ সিদ্ধি তাঁর পায় পায় ফিরিয়া থাকে; আর আমরা হাতে হাতে সিদ্ধি ও রাতারাতি স্বর্গ লাভের ইচ্ছা করিয়াও যে দুর্ব্বৃত্ত ছিলাম সেই দুর্ব্বৃত্তই রহিয়াছি। যিনি পরমেশ্বরের সঙ্গে বন্ধুতা করেন তিনি পরমেশ্বরের মত ও পরমেশ্বরের কৃত সর্ব্বংসহা পৃথিবীর মত সহিষ্ণুতা শিক্ষা করেন। হাফেজ বলিয়াছেন, "হে হাফেজ যদি তোমার প্রতীক্ষা করার শক্তি থাকে একদিন সহবাস লাভ করিতে পারিবে"। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, তাঁহার ভক্তেরা তাঁহাতে নিত্যযুক্ত হইয়া তাঁহাকে উপাসনা করিয়া থাকেন। কি সংসারে, কি স্বর্গরাজ্যে চঞ্চলমতি অব্যবস্থিতচিত্ত লোকের উন্নতি হওয়া দুর্ঘট। সংসারের মানবে যখন চঞ্চলতা ভাল বাসে না, তখন কোন্ সাহসে আমরা সেই চঞ্চলতা লইয়া ধর্ম্মজগতে প্রবেশ করিবার দুরাশা করি? সত্যস্বরূপ, অপরিবর্ত্তনশীল পরমেশ্বরের সাধক হইতে গেলে ধর্ম্মজীবন হইতে অসত্য, চঞ্চলতা, পরিবর্ত্তন জন্মের মত বিদায় করিয়া দিতে হইবে। প্রভুতে সংলগ্ন হইয়া থাকিতে থাকিতে বনিয়া যাইবেই যাইবে। আমাদের প্রত্যেকের জীবন এই সত্যের যাথার্থ্য সম্বন্ধে উজ্জ্বল সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। সহস্র যন্ত্রণা, পরিবর্ত্তন ও হীনতার মধ্যেও যদি আমরা তাঁহার ঘরে পড়িয়া না থাকিতাম, তাহা হইলে ধর্ম্মজগতে আজ আমাদের কেশাগ্রও কেহ খুঁজিয়া পাইত না। তাই বলি ভাই সকল, এস, আমরা কালবিলম্ব না করিয়া আমাদের দুষ্ট মনকে বুঝাইয়া বলি, যেন মন প্রভুর কাছে ধৈর্য্যশীলতা ভিক্ষা করে। তাঁহার সঙ্গে, পরিত্রাণের সঙ্গে পরিহাস করিও না; যাহা করিতে হয়, প্রভুর কাছে শুনিয়া লও, শুনিয়া তাহাতে প্রাণ মন ভাল করিয়া বাঁধ। সংসারের লোক কি দৃঢ়তা ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে ধনোপার্জ্জন করে! হতভাগ্য! তুমি কি তোমার ইষ্টদেবতা লাভ করিবার জন্য তাহার চতুর্থাংশের একাংশ দৃঢ়তা অবলম্বন করিতে প্রস্তুত নহ? সত্য পরমেশ্বরের আস্বাদন একবার পাইয়া অসত্যের নিকট কিরূপে গমন করিবে? মস্তক অবনত কর, আরো নীচে, আরো নীচে অবনত কর, যেন প্রভুর মন্দিরের ভূমির সঙ্গে উহা সমান হইয়া যায়। তাহা হইলে প্রভু যখন মন্দির হইতে বাহির হইয়া আসিবেন, তাঁহার চরণরেণু তোমার মস্তকে নিশ্চয়ই লাগিয়া যাইবে। ধৈর্য্যশীলতার ফুলও তোমার মানসউদ্যানে ফুটিয়া উঠিবে। যদি প্রেমিক হইতে চাও, তবে বিরহ সহিবার উপযুক্ত সহিষ্ণুতা রজ্জুতে চঞ্চলচিত্তকে দৃঢ় করিয়া বাঁধ।

প্রেরিত পত্র।

মহাশয়,

বিগত সংখ্যক তত্ত্বকৌমুদীর প্রেরিত পত্র স্তম্ভে "ব্রহ্মের ক্রিয়াশীলতা" শীর্ষক পত্র খানি দেখিয়া বিস্ময়াম্বিত হইলাম। বস্তুতঃ, ব্রাহ্মসমাজ কি তবে এতদিন বিশেষ ভাবে ক্রিয়াশীল ঈশ্বরের আরাধনা করেন নাই? যাহারা ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ইতিহাস অল্পমাত্র অবগত আছেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন, ব্রাহ্মসমাজ নিষ্ক্রিয় ঈশ্বরের উপাসনা প্রচার করেন নাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ক পুস্তকে ও সঙ্গীতে তিনি যে "চির ক্রিয়াশীল" সে বিষয়ের বহুল প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সামাজিক উপাসনায়, আরাধনার মধ্যে "সত্যং জ্ঞানং" প্রভৃতির সহিত যদিও "সক্রিয়ং," অথবা "নিরলসং," এই রূপ কোন কথার উল্লেখ হয় না, তথাপি বর্ত্তমান আরাধনাতে "সক্রিয়" ব্যতীত পরমেশ্বরকে কখন "নিষ্ক্রিয়" অভিধানে অভিহিত করা হয় না। বাস্তবিক, যেখানে জ্ঞান, শক্তি ও প্রেমের পূর্ণ সমাবেশ সেখানে কিরূপে জড়তা অথবা ক্রিয়াহীনতা থাকিতে পারে, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কোন রূপেই উপলব্ধ হয় না। পরমেশ্বর স্বীয় অনন্ত জ্ঞানে আমাদের প্রত্যেকের অবস্থা বুঝিতে পারিতেছেন—কিরূপে আমাদের অভাব দূরীভূত হইবে—কিসে আমাদের পরম কল্যাণ সাধিত হইবে—সমস্তই জানিতেছেন। যখন আমাদের ব্যাধি—এবং ব্যাধির প্রতিকার—সমস্তই তাঁহার অনন্ত জ্ঞানে বিদিত,—তখন যদি তিনি উদাসীন থাকেন—নিষ্ক্রিয় থাকেন,—তবে জানি না তিনি কেমন প্রেমময়। যেখানে সত্য, জ্ঞান, প্রেম ও শক্তি পূর্ণ ভাবে বিরাজিত—সেখানে চির ক্রিয়াশীলতা অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং বর্ত্তমান প্রণালীতে যখন "বিশেষ ভাবে জ্ঞানের ও প্রেমের সাধনের ভাব" দেখাইয়া দিতেছে, তখনই যে তাহাতে ক্রিয়াশীলতার ভাবও বিশেষ ভাবে দেখাইতেছে ইহা বুঝিবার জন্য "একটু মনোযোগ পূর্ব্বক বিশেষ ভাবে বিবেচনার" আবশ্যকতা দেখিনা।

আর একটি কথা। যদি আরাধনা প্রণালীর কয়েকটি শব্দ ভিন্ন ঈশ্বর সাধন অসম্ভব হয়, তাহা হইলেই ত বিষম গোলযোগ। উক্ত প্রণালীর অন্তর্গত না করিয়া ব্রহ্ম স্বরূপ সাধন যে অন্য কোনরূপে হইতে পারে না, এ কথা নিতান্ত অসঙ্গত। আবার যদি বর্ত্তমান আরাধনা প্রণালীর "শুদ্ধমপাপবিদ্ধং" এই কথাগুলির পরে "নিরলসং" অথবা "সক্রিয়ং" শব্দ যোগ করা যায়, তাহা হইলেই কি পূর্ণাঙ্গ সাধন হইল? যদি এইরূপ ভাব প্রকাশক কোন শব্দযোগ করা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে "বিশ্বকারণং," "জগৎপালকং" "স্বপ্রকাশং," "নিরবয়বং," "সুন্দরং," প্রভৃতি শব্দ কেন না যুক্ত হইবে?

পত্র প্রেরক আর একটি বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। কোন একটি বিশেষ শব্দ যোগ করিলে কি হইবে? পুস্তকের কথা পুস্তকেই থাকিবে—মুখের বাক্য মহা শূন্যে মিলিত হইবে। অবশ্য অন্যের নিকট আপনাদের সাধন প্রণালীর শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে গর্ব্ব করা যাইতে পারে। কিন্তু, কার্য্যতঃ সাধন করে কে? যে "অপূর্ণ" সাধন প্রণালী প্রচলিত আছে, তাহাই কয়জন সাধন করিতেছেন? ব্রাহ্মসমাজে কয়জন জ্ঞানী, কয়জন প্রেমিক, কয়জন পবিত্রহৃদয় লোক আছেন? আমরা একাধারে জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতা দেখিবার আশা করি না। কিন্তু, ব্রাহ্মসমাজে জ্ঞানী, প্রেমিক, পবিত্রচেতা ব্রাহ্মের নিতান্ত অসদ্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মের মুখ দেখিলে ব্রহ্মের কথা মনে পড়ে না কেন? তাঁহাদের মুখে পবিত্রতার প্রভা দেখিতে পাওয়া যায় না কেন? তাঁহাদের হৃদয়ে প্রেমের অভাব কেন? তাঁহাদের জীবনে বিশ্বাসের অভাব কেন? তাঁহাদের ব্যবহারে লোকে উত্যক্ত ও মর্ম্মপীড়িত হয় কেন? ব্রাহ্মসমাজে গিয়া লোকে "দিন দিন অলস ও জড়প্রায়" হয় কেন? ব্রাহ্মসমাজের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা দিন দিন হ্রাস হইতেছে কেন? এই সমস্ত কি প্রচলিত সাধন প্রণালী "অপূর্ণ" বলিয়া, না ব্রাহ্ম সাধন ভজন বিহীন বলিয়া? আমরা অলস ও জড়প্রায় হইতেছি কেন? সংসারে, বিলাসে, অহঙ্কার অপবিত্রতায় ডুবিতেছি বলিয়া, আমাদের সাধন প্রণালীর দোষে নয়। অন্যান্য অপূর্ণ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যেও অনেক উদার, পবিত্রচেতা, কার্য্যশীল লোক দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদের ব্যবহারে প্রাণে গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তির উদয় হয়। ব্রাহ্ম জড়, ব্রাহ্ম অলস, ব্রাহ্ম নিষ্ক্রিয়, কেন না ব্রাহ্ম জ্ঞানের সাধন ও প্রেমের সাধন করেন না। ব্রাহ্ম ভালবাসিতে শিখেন নাই। ব্রাহ্ম পরের জন্য কাঁদিতে শিখেন নাই। ব্রাহ্ম ঘোর সংসারী হইয়াছেন। ব্রাহ্ম ঘোর বিলাসী হইয়াছেন। ব্রাহ্ম অহঙ্কারী ও দাম্ভিক হইয়াছেন। ব্রাহ্ম অপর ধর্ম্মাবলম্বী মানব অপেক্ষা আপনাকে সমধিক উন্নত জ্ঞানে বিজ্ঞতার চস্‌মা আঁটিয়া সকলকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিতে শিক্ষা করিয়াছেন। ব্রাহ্মের জীবনে প্রেম নাই। ব্রাহ্মের জীবনে উদারতা নাই। ব্রাহ্ম আপনার হৃদয়কে সংকীর্ণ—সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর মধ্যে সঙ্কুচিত করিয়াছেন। সাধারণ ব্রাহ্মজীবন প্রখররবিকরোত্তপ্ত, প্রচণ্ড বায়ুবেগসঞ্চালিত-বালুরাশি-পূর্ণ, জলসঞ্চারমাত্রপরিশূন্য, ভীষণ মরুস্থলী। তাহার নিশ্বাসে প্রাণ শুষ্ক হইয়া যায়। সে ভীষণ দৃশ্যে হৃদয়ের আশা হৃদয়েই মরিয়া যায়। সাধারণ ব্রাহ্মজীবন নিরীশ্বর বলিয়াই প্রতীয়মান হয়।

আমরা ব্রাহ্ম সাধারণের নিকট হইতে উক্ত পত্রের তীব্র প্রতিবাদ প্রত্যাশা করি। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আগামী বারের তত্ত্বকৌমুদীতে ইহা প্রকাশিত করিলে বিশেষ বাধিত হইব।

হাবড়া, চক্রবেড়,
তাং ৯ই কার্ত্তিক।

একান্ত বশম্বদ
শ্রীরামচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়,
উপাসক।
চক্রবেড় প্রার্থনা সমাজ।

পত্রপ্রেরকদিগের প্রতি নিবেদন।

শ্রীশ্যামাপ্রসন্ন রায়—হাজারিবাগ। আপনি সমাজের মধ্যে থাকিয়া সমাজ-সংস্কার করিবার কথা যাহা বলিয়াছেন, তাহা ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান উন্নত অবস্থার উপযোগী নহে। উহা ব্রাহ্মসমাজের বাল্যাবস্থার কথা। ধর্ম্ম যতদিন শুদ্ধ চিন্তায় আবদ্ধ থাকে, ততদিন উহা প্রকৃত ধর্ম্ম নামে অভিহিত হইতে পারে না। বিশ্বাস কার্য্যে পরিণত না করিলে জীবনে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হয় না, এবং তাহা করিতে গেলে কখনই পুরাতন সমাজে স্থান পাইবার আশা করা যায় না। কোন ব্যক্তি অল্পবয়স্ক বলিয়া যে সে তাহার বিশ্বাসানুযায়ী কার্য্য করিবার অনুপযুক্ত, এরূপ কথা বলা যায় না। তবে সম্যক্ বিবেচনা-শক্তিবিহীন বালকের কথা স্বতন্ত্র। আমরা এমন অনেক শ্রদ্ধেয় লোককে জানি যাঁহারা বিশ্বাসের অনুরোধে অল্পবয়সেই পৌত্তলিকতার সংস্রব ত্যাগ করিয়া হিন্দু সমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছেন। পৃথিবীতে যখন কোন ধর্ম্মবিপ্লব সংঘটিত হয়, তখনই একদল লোককে সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অগ্রগামী হইতে দেখা যায়, অপরে ক্রমে তাঁহাদের অনুসরণ করে। ব্রাহ্মসমাজের সভ্য নির্ব্বাচন সম্বন্ধে আপনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার গোচর করিলে অধিক উপকার হইবার সম্ভাবনা। তত্ত্বকৌমুদীতে তাহার আলোচনার প্রয়োজন নাই। আপনার শেষ পত্র প্রকাশ করা অনাবশ্যক।

শ্রীচারুচন্দ্র গোস্বামী—খরসান। আপনার প্রবন্ধের আরও কিয়দংশ না দেখিলে কোন মীমাংসায় উপনীত হইতে পারিতেছি না।

প্রদেশীয় ব্রাহ্মসমাজ।

পাবনা।

পাবনা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত দুর্গাকান্ত চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন ;—

গত ৬ই কার্ত্তিক শনিবার পাবনা ব্রাহ্মসমাজের একত্রিংশ সাম্বৎসরিক মহোৎসব আরম্ভ হয়। কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য সম্পাদনার্থ আগমন করেন। এবারে প্রচারক মহাশয় ও আগন্তুক ভদ্র মণ্ডলীর বাসস্থানের নিমিত্ত সমাজের কার্য্য নির্ব্বাহক সভা একটী আলয় নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। শনিবার বৈকালে উক্ত আলয়ে বিদ্যারত্ন মহাশয়, ভারত সভার প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঘোষ ও তাঁহার সহকারী এজেণ্ট এবং পাবনার সন্নিকটবর্ত্তী দুই একটী গ্রাম হইতে কতিপয় ব্রাহ্মবন্ধু সম্মিলিত হন। সন্ধ্যাকালে সমাজ মন্দিরে বিদ্যারত্ন মহাশয় "ধর্ম্মের ভিত্তি" বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন ; এবং উদ্বোধন, সংগীত ও সংকীর্ত্তনের পর সে দিবসের কার্য্য শেষ হয়।

৭ই কার্ত্তিক রবিবার প্রাতঃকালে উপাসনা, সংগীত ও সংকীর্ত্তন হয়। বেলা ২টা হইতে আলোচনা এবং ৪টার পর হইতে ভগবদ্গীতার পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। সন্ধ্যাকালে পুনর্ব্বার উপাসনা, সংগীত ও সংকীর্ত্তন হয়। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় এই দিবসের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। গীতার ব্যাখ্যা শ্রবণে সর্ব্ব সাধারণে সাতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করেন। এমন কি যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের ছিদ্র অন্বেষণের জন্য দুই এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও প্রাণস্পর্শী ব্যাখ্যা শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অবস্থিতি করেন।

৮ই কার্ত্তিক সোমবারে আফিসাদি বন্ধ না থাকায় সাধারণের উৎসবে যোগদানের বিশেষ অসুবিধা হয়। প্রাতঃকালে বিদ্যারত্ন মহাশয়ের শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন স্থানীয় আচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাস চন্দ্র বাগচী মহাশয় উপাসনার কার্য্য সম্পন্ন করেন। সন্ধ্যাকালে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় "ভক্তি" বিষয়ক উপদেশ প্রদান করেন, তৎপরে প্রার্থনা ও সংকীর্ত্তন হয়। ভক্তি সম্বন্ধে উপদেশ সাধারণের অতিশয় প্রাণস্পর্শী হইয়াছিল, এবং উৎসবালয় লোক সমাগমে সম্যক্ পরিপূর্ণ হইয়াছিল।

৯ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার মহোৎসবের বিশেষ দিন। এই দিবসে কুষ্টিয়া ও কুমার খালি হইতে কতিপয় ব্রাহ্মবন্ধু আগমন করত সমাজের নির্দ্ধারিত আলয়ে আতিথ্য গ্রহণ করেন। প্রাতঃকালে বিদ্যারত্ন মহাশয় উপাসনার কার্য্য সম্পন্ন করেন। প্রার্থনার পর নবপ্রস্তুত নিম্নলিখিত সংগীতটী গীত হয় :—

সুর—(কার কাছে যাব বল)

খুলে দে দুয়ার মাগো এসেছি বৎসর পরে।
দুষ্ট ছেলে বলে কি মা আমারে লবিনা ঘরে॥
বাড়ী ছেড়ে দেশে দেশে, ঘুরেছি মা কত ক্লেশে,
(তাই) ধূলা মাটি কাদা মেখে রয়েছি দাঁড়ায়ে দ্বারে।
বিদেশে বিদেশে ঘুরে পা দুটী গেছে মা ধ'রে,
ধুয়ায়ে দে কাদা ধূলি তুলে নে কোমল ক্রোড়ে।
বাড়ীর ভিতরে সবে ভাই বোনে কলরবে,
করিছে মা মহোৎসব আমি কি রব বাহিরে ?
অই তারা মোয়া মুড়ি করিতেছে কাড়াকাড়ি,
আমারে ভিতরে নে মা রহিয়াছি অনাহারে।
আর আমি বাড়ী ছেড়ে যাব না যাব না দূরে,
মা ব'লে মা ক্ষমা দেগো দয়াময়ি নে গো ক্রোড়ে।

তৎপরে অন্যান্য সংগীত ও সংকীর্ত্তন হয়। বেলা ২টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত আলোচনা হয়। তদনন্তর বিদ্যারত্ন মহাশয় ভক্ত কবীরের গ্রন্থাবলী পাঠ করেন। সন্ধ্যাকালে নগর সংকীর্ত্তন বহির্গত হয়। সংকীর্ত্তন বাজারের মধ্যে উপস্থিত হইলে কুষ্টিয়ার প্রথম মুন্সেফ শ্রীযুক্ত বাবু জগদীশ্বর গুপ্ত মহাশয় সমবেত লোক মণ্ডলীর নিকট ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বক্তৃতা করেন। তৎপরে পুনর্ব্বার সংকীর্ত্তন আরম্ভ হয়। সংকীর্ত্তনের পর সমাজ মন্দিরে বিদ্যারত্ন মহাশয় সংক্ষিপ্ত উপাসনা করেন।

১০ই কার্ত্তিক বুধবার প্রাতঃকালে উপাসক মণ্ডলী নৌকাযোগে সমাজ মন্দির হইতে এক মাইল দূরবর্ত্তী সালগাড়িয়া রথ খোলার উত্তরবর্ত্তী বাগানে গমন করেন। শ্রীযুক্ত বাবু

জগদীশ্বর গুপ্ত তপায় উপাসনার কার্য্য সম্পন্ন করেন। তৎপরে সংগীত ও সংকীর্ত্তন হয়। অনন্তর উপাসক মণ্ডলী পরমাহ্লাদে প্রীতিভোজন সমাপন পূর্ব্বক মন্দিরে প্রত্যাগমন করেন। বেলা ৫॥ ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত বাবু জগদীশ্বর গুপ্ত মহাশয় "যবন হরিদাস" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার সময় এত অধিক লোকের সমাগম হইয়াছিল যে, সমাজ মন্দিরে সকলের স্থানের সংকুলান না হওয়ায় অনেকে দুঃখিত হৃদয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বক্তৃতা সকল শ্রেণীর লোকের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। বক্তৃতান্তে সঙ্গীত হয়। তৎপরে বিদ্যারত্ন মহাশয় উপাসনা করিয়া উৎসব শেষ করেন।

সঙ্গত সভা।

১৬ই কার্ত্তিক।

১৬ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার সঙ্গত সভার যে অধিবেশন হয়, তাহাতেও সাধারণ ভাবে আলোচনা হইয়াছিল। সাধারণের বিশেষ কোন উপকারে আসিতে পারে এমন কোন কথা হয় নাই। এই জন্য উক্ত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণও প্রকাশিত হইল না।

২৩এ কার্ত্তিক।

২৩এ কার্ত্তিক মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টার সময় সঙ্গত সভার এক অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত সীতানাথ দত্ত সঙ্গীত ও প্রার্থনা * করিলে পর শ্রীযুক্ত অঘোর নাথ মুখোপাধ্যায় সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। ৭ই ভাদ্রের সঙ্গতে যে সকল সাধন লওয়া হইয়াছিল (১লা আশ্বিনের তত্ত্বকৌমুদীতে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে), সে সম্বন্ধে কে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন প্রথমে তাহারই আলোচনা হয়। উপস্থিত সভ্যগণ নিজ নিজ অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করিলে পর, নাম সাধন সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ কথাবার্ত্তা হয়;—

ক। ধর্ম্মজীবনের অভিজ্ঞতাতে দেখা যায় যে, উপাসনার ভিতর দিয়া মনের বিশেষ ভাব অনুসারে এক একদিন ঈশ্বরের এক একটী বিশেষ নাম হৃদয়ে উপস্থিত হয়। তখন সেই নামটী সাধন করিতে ভাল লাগে এবং তাহাতে উপকারও পাওয়া যায়। ক্রমে সে নামে আর তৃপ্তি পাওয়া যায় না, আর একটী নূতন নাম পূর্ব্বোক্ত ভাবে আসিয়া হৃদয় অধিকার করে। এইরূপ বিশেষ নাম যখন প্রাণের মধ্যে প্রকাশিত হয়, তখন যে নাম আমার জীবনের সাধনরূপে গ্রহণ করিয়াছি তাহার সাধন বন্ধ হইয়া নূতন নামের সাধনই প্রবল হইয়া উঠে। এক্ষণে প্রশ্ন এই একটী নাম দৃঢ়ভাবে ধরিয়া তাহার সাধন গাঢ় করিবার চেষ্টা করা ভাল, কি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় যে ভিন্ন ভিন্ন নাম আসে তাহারই সাধন করা উচিত?

খ। সর্ব্বদা নাম পরিবর্ত্তনে অপকার হয়, অথচ একটী নাম ক্রমাগত ধরিয়া থাকাও দুষ্কর। তবে যদি বুঝা যায় যে, এক নামে সিদ্ধি লাভ করিয়াছি, এখন অন্য নাম ধরা ভাল, তবে সে ভিন্ন কথা। কিন্তু নূতন নামের প্রলোভনে পূর্ব্ব অভ্যাস ভুলিয়া যাওয়া ঠিক্ নয়। সময়ে সময়ে অন্য নাম শান্তিপ্রদ বোধ হইলে তাহা হইতে যে উপকার পাওয়া যায় তাহা গ্রহণ করিয়া পূর্ব্ব নামে প্রত্যাবর্ত্তন করা ভাল।

গ। যদি এমন নাম লওয়া যায়, যাহার মধ্যে অন্য নামের ভাবও নিহিত আছে, তাহা হইলে এ গোলযোগের মীমাংসা হইয়া যাইতে পারে। সাধনের অর্থ দৃঢ় ভাবে একটা জিনিস ধরিয়া তাহার ভাবের মধ্যে প্রবেশ করা। সুতরাং পরিবর্ত্তন করিলে সাধন কিরূপে সম্ভব হইবে? নাম জপ করিলেই নাম সাধন করা হয় না। নামের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করা আবশ্যক। তাহা না করিয়া শুদ্ধ জপ করিলে কোনও ফল নাই।

ক। ভাবের সহিত নাম জপ করিতে চেষ্টা করিলেও উপকার হয়।

ঘ। অন্ন যেমন আমাদের নিত্য আহার্য্য, কিন্তু শরীরের বিশেষ কোন অভাব নিবন্ধন মধ্যে মধ্যে অন্য পদার্থে রুচি হয়, সেইরূপ সাধনের নাম আমাদের প্রতিদিনের সম্বল, কিন্তু বিশেষ ভাব হইতে যে নাম পাওয়া যায় তাহা তখনকার জন্য উপকারী। আর যতক্ষণ উহা ভাবের সহিত ধরিয়া থাকা যায় ততক্ষণ পুরাতন নামের কার্য্যও মনের ভিতর ভিতর চলিতে থাকে। যদি ভাব স্থায়ী জিনিস হইত, তাহা হইলে ভাবোৎপন্ন নাম হইতেই অধিক উপকার পাওয়া যাইত। কিন্তু ভাব স্থায়ী পদার্থ নহে বলিয়াই একটী বিশেষ নামের সহিত ভাবযোগ স্থাপনের চেষ্টা করিতে হয়। নতুবা বাস্তবিক দেখিতে গেলে ঈশ্বরের যখন কোন নামই নাই, তখন যে নামে শান্তি পাওয়া যায় তাহাই গ্রহণ করা যাইতে পারে।

ঙ। আমার ধারণা এই যে, মধ্যে মধ্যে অন্য নাম আসিলেও আমার সাধনের নামের সহিত তাহার যোগ আছে। আমি নূতন নামের সহিত পুরাতন নামের কোনও পার্থক্য দেখিতে পাই না।

চ। যে নাম সাধন করা হয় তাহা একেবারে আয়ত্ত করিয়া লওয়া আবশ্যক। অনেক লোকের মধ্যেও যেমন পরিচিত লোকের স্বর কর্ণকে অধিকার করে, সেইরূপ সাধনের নাম যাহা তাহা সমস্ত প্রাণকে অধিকার করিয়া বসিবে। নাম বাহিরের চিহ্ন মাত্র। নামের সঙ্গে যে সত্য থাকে তাহাই ধরিতে হইবে।

ছ। আমি একটী নামই অনেক দিন হইতে সাধন করিয়া আসিতেছি। মধ্যে মধ্যে বিশেষ ভাব হইতে অন্য নামও আসিয়াছে। প্রথম প্রথম আমি তাহাও সাধন করিতাম, আবার পুরাতন নামও সাধন করিতাম। পরে দুই একবার নূতন নাম গ্রহণ না করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছি। কিন্তু তাহাতে অপকার হইয়াছে। পুরাতন নামটী ভাল করিয়া আয়ত্ত না হওয়াই ইহার কারণ বলিয়া বোধ হয়। নূতন নামের ভিতরেও পুরাতন নাম সাধন করা আবশ্যক।

* বিগত ৯ই কার্ত্তিকের অধিবেশনে স্থির হয় যে প্রতি রবিবার প্রাতে সমবেত উপাসনা হইবে, এবং কেবল সঙ্গীত ও প্রার্থনা করিয়া সঙ্গতের কার্য্য আরম্ভ হইবে। সেই অবধি সঙ্গতে পূর্ব্বোক্ত উপাসনার পরিবর্ত্তে কেবল সঙ্গীত ও প্রার্থনা হইয়া থাকে।

এরূপ করিলে পুরাতন নামের সহিত নূতন ভাবের যোগ হইয়া যায়। কিন্তু পুরাতন নাম ছাড়িয়া দেওয়া কোন ক্রমেই ঠিক্ বলিয়া বোধ হয় না।

জ। মুক্তি দুই প্রকারে হয়, (১) ঈশ্বরের কৃপা দ্বারা ও (২) মানুষের চেষ্টা দ্বারা। যাঁহারা কৃপাসিদ্ধ তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র, তাঁহাদের পক্ষে কোনও ব্যবস্থা নাই। অনুকূল স্রোতো-বাহিত নৌকার ন্যায় তাঁহাদের জীবন চলিয়া যায়। যাঁহারা সাধনসিদ্ধ তাঁহারাও যে ঈশ্বরের কৃপা ব্যতিরেকে মুক্তি লাভ করেন তাহা নহে। চেষ্টা করিয়া মানুষ নিজের মুক্তি সাধন করিতে পারে না। পরিশ্রম দ্বারা মনকে প্রস্তুত করিয়া ঈশ্বরের দিকে চাহিয়া থাকিতে হয়। কৃষক পরিশ্রম দ্বারা ভূমি কর্ষণ ও বীজ বপন করিতে পারে, কিন্তু বৃষ্টির জন্য তাহাকে আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিতে হয়। ধর্ম্ম জগতেও সেইরূপ মানুষকে অনেক পরিশ্রম করিয়া আত্মার ভূমি প্রস্তুত করিতে হয়। তাহার পর আধ্যাত্মিক জগতের এমন নিয়ম আছে যে আত্মার উপর ঈশ্বরের কৃপাবারি বর্ষিত হয়। আমরা ঈশ্বরকে প্রায়ই ভুলিয়া যাই। সেই জন্য তাঁহাকে স্মরণ রাখিবার উপায় গ্রহণ করা আবশ্যক। এক নামে, এমন কি এক অক্ষরে (যেমন ওঙ্কার) ঈশ্বরের সমস্ত স্বরূপ দেখিতে চেষ্টা করিলে, ঐ নামে অথবা ঐ অক্ষরে হৃদয় ঐশ্বরিক ভাবে পূর্ণ হইয়া যায়। এরূপ করিতে পারিলে অনেক বিপদ্ প্রলোভনেও মানুষ নির্ভয়ে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে। সহজ বিষয়ে ঈশ্বরের ভাবের ভিতর দিয়া না গেলে, কঠিন বিষয়ে উহা ধরা যায় না। সামান্য সামান্য বিষয়ে সত্যের প্রতি যদি অনাস্থা থাকে, তবে পূর্ণ সত্য পরমেশ্বরকে কখনই ধরা যায় না। কথায় সত্য, ব্যবহারে সত্য, সকল বিষয়ে সত্য ধরা চাই। এক এক ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ঈশ্বরকে ধরিতে গেলে বিপদের সম্ভাবনা আছে। প্রেমসাধন করিতে গিয়া পবিত্রতার দিকে হয়ত দৃষ্টি থাকে না, অথবা পবিত্রতা সাধন করিতে গিয়া হৃদয় শুষ্ক ও কঠোর হইয়া পড়ে। আংশিক ভাবে ঈশ্বরের সাধন করা উচিত নহে। পূর্ণ ভাবে তাঁহাকে ধরিতে হইবে। নতুবা ব্রাহ্মসমাজের ঈশ্বরের সাধন করা হয় না। ঈশ্বরের সমস্ত স্বরূপের মূল সত্য স্বরূপ। ইহার মধ্যে অন্যান্য সকল স্বরূপ নিহিত আছে। এই সত্যস্বরূপ ভাল করিয়া সাধন করা আবশ্যক। আর একটী কথা। আমরা সাধনের প্রথমাবস্থাতেই অনেক সময় সিদ্ধির আনন্দ পাইব বলিয়া প্রত্যাশা করি কিন্তু, তাহা ঠিক নহে।

৩০এ কার্ত্তিক।

৩০এ কার্ত্তিক মঙ্গলবার সঙ্গত সভার যে অধিবেশন হয়, তাহাতে শ্রীযুক্ত আদিত্য কুমার চট্টোপাধ্যায় সংক্ষেপে উপাসনা করেন এবং শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় সভাপতির কার্য্য করেন। ৬॥টার সময় সকলের সুবিধা হয় না বলিয়া, আগামী বার হইতে ৭টার সময় সঙ্গতের কার্য্য আরম্ভ করা স্থিরীকৃত হইল। প্রথমে সঙ্গতের অবস্থা সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে আলোচনা হয়। তৎসম্পর্কে আমাদের কোন বিদেশাগত বন্ধু নিম্নলিখিত সারগর্ভ কয়েকটী কথা বলেন ;—

পরস্পরের সঙ্গে খোলাখুলি ভাবে কথাবার্ত্তার জন্য বিশেষ প্রেম চাই, ঘনিষ্ঠতা চাই। এভাব উপাসনার উচ্চ অবস্থার ভাব। ইহা একেবারে অনেকের মধ্যে আসিবে এরূপ আশা করা যায় না। ইহার কারণ এই যে আমাদের উপাসনা এখনও বহির্মুখ রহিয়াছে। উপাসনার গভীরতার মধ্যে ডুবিতে না পারিলে, উপাসনা সরস না হইলে প্রেম হয় না। যদিও ইহা ঈশ্বরের কৃপাসাপেক্ষ, তথাপি মনুষ্যের যত্নও চাই। যেখানে মানুষের চেষ্টার শেষ সেইখানে ঈশ্বর কৃপার আরম্ভ। আমরা যে উপায়ে কার্য্যসিদ্ধি হইবে বলিয়া মনে করি, সকল সময় তাহা সফল হয় না। ঈশ্বর হয়ত অন্য উপায়ে তাঁহার কার্য্য সাধন করাইয়া লন। আমরা ঈশ্বরের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আমাদের কর্ত্তব্য যাহা তাহা করিয়া যাইব, অন্য যাহা কিছু আবশ্যক তিনি দিবেন। তিনি এমন লোক জুটাইয়া দিবেন যাঁহারা আমাদের সাধনের সহায় হইবেন। শুদ্ধ ধর্ম্ম বিষয়ক তত্ত্বের আলোচনায় অনেককে যোগ দিতে দেখা যায়, কিন্তু সাধন করিবার লোক অতি অল্পই মিলে। তাঁহার কৃপায় যে কয়েকজনকে পাওয়া যায় তাহারই জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।

ইহার পর সজন আরাধনা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত রূপ

ক। সংসারে কাহারও নিকট কিছু চাহিতে হইলে তাঁহাকে জানা চাই, তাঁহার নিকট কি পাওয়া যায় তাহাও জানা চাই। এই জন্যই ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবার পূর্ব্বে আরাধনাদ্বারা তাঁহার স্বরূপ বুঝা আবশ্যক। নির্জ্জন উপাসনার আরাধনায় শব্দের ভাগ অল্প। তাহাতে সজন উপাসনার ন্যায় গুণ বর্ণনার ভাব নাই। নির্জ্জন উপাসনায় আমরা ঈশ্বরের নিকটেই কথা বলি। কিন্তু সজনে শব্দ দ্বারা আরাধনা করিতে গেলে অনেক সময় স্বরূপ উপলব্ধির ব্যাঘাত হয়, অনেক কথা ভাবশূন্য মুখের কথা মাত্র হইয়া পড়ে। আমার মনে হয় যে, এরূপ মৌখিক আরাধনায় আমাদিগকে ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইতে হয়। বিশেষ ভাবের স্রোত প্রাণে প্রবাহিত হইলে এরূপ গোলযোগ ঘটে না বটে, কিন্তু আমি অনেক সময় সজনে শব্দ দ্বারা আরাধনা করিতে গিয়া দেখিয়াছি অনেক ভাবশূন্য কথা বাহির হইয়া পড়ে। এরূপস্থলে আমার বোধ হয় নীরব থাকাই উচিত। এই কারণে অন্যের আরাধনাতে যোগ দেওয়াও সময় বিশেষে কঠিন হইয়া পড়ে। প্রত্যক্ষ ভাবে ঈশ্বরের আরাধনা করাই যখন আমাদের আদর্শ তখন কেবল ভাবশূন্য মুখের কথায় পরোক্ষভাবে আরাধনা করাতে আমার মতে অপরাধ হয়।

খ। শব্দ বা ভাষা ভিন্ন চিন্তা সম্ভব কিনা ইহা একটী গুরুতর প্রশ্ন। দার্শনিকদের মধ্যে এ সম্বন্ধে অত্যন্ত মত ভেদ দৃষ্ট হয়। অনেকের মতে মানবপ্রকৃতি যেভাবে ও যে অবস্থার ভিতর দিয়া বিকাশ লাভ করে, তাহাতে মানুষের পক্ষে ভাষা ব্যতীত চিন্তা অসম্ভব। নির্জ্জন আরাধনারও এক প্রকার নিঃশব্দ ভাষা আছে। নির্জ্জন আরাধনার এই ভাষাও

যে অনেক সময় ভাবশূন্য হয় না এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা নির্জ্জন আরাধনার চেষ্টা হইতে বিরত হই না। ঈশ্বরের স্বরূপ এখনও আমরা ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিনাই। তাঁহার স্বরূপের যেগুলি কিয়ৎ-পরিমাণে আমরা জানিতে পারিয়াছি সেই সমস্ত স্বরূপ-সমন্বিত ঈশ্বরকে আমরা একেবারে ধরিতে পারি না। এই জন্য আরাধনায় আমরা বিশ্লিষ্ট ভাবে সেইগুলি উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করি এবং তাহার পর ধ্যানযোগে ঐ সকল স্বরূপকে একীভূত করিয়া পরমেশ্বরকে তাহাদের আধাররূপে হৃদয়ে দর্শন করিতে চেষ্টা করি। এরূপস্থলে যদি একব্যক্তি সরলভাবে শব্দ দ্বারা আরাধনা করে এবং প্রত্যেক শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভাব উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করে, তবে তাহার সে চেষ্টা কিয়ৎপরিমাণে বিফল হইলেও তাহাকে অপরাধী বলা যায় না। শব্দ বা ভাষা ভিন্ন ভাব আসে না, অন্ততঃ ভাষা ভিন্ন ভাব আমাদের চিন্তা বা জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে পারে না। প্রত্যেক শব্দের সঙ্গে তাহার অনুযায়ী ভাব হৃদয়ে উদিত হওয়া আমাদের আদর্শ বটে, কিন্তু তাহা সাধনসাপেক্ষ। তবে যদি কেহ এ সম্বন্ধে আপনাকে নিতান্ত অপ্রস্তুত বলিয়া অনুভব করেন, তাঁহার পক্ষে সজনে উপাসনার কার্য্য করিবার ভার না লওয়াই ভাল। কারণ, তিনি আরাধনা করিতে করিতে হঠাৎ নীরব হইয়া গেলে, অথবা প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিলে, অপরের উপাসনার ব্যাঘাত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

গ। প্রাচীন কালের উপাসকেরা বলিয়াছেন, চিত্তবৃত্তির নিরোধই ঈশ্বরের সহিত যোগ। এস্থলে চিত্তবৃত্তির নিরোধ অর্থে বিষয়ান্তর হইতে মনকে নিবৃত্ত করিয়া ঈশ্বরে চিত্তসমাধান করা। উপাসনার সময় আমরাই কেবল কথা কহি, ঈশ্বরের কথা শুনি না। নিজের যাহা বলিবার আছে বলিয়া, ঈশ্বর কি বলেন তাহা শুনিবার জন্য ধীর ভাবে প্রতীক্ষা করা উচিত। নিজের চিন্তাস্রোত নিবৃত্ত না হইলে ঈশ্বরের কথা শুনা যায় না। এইরূপে চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইলে কেবল সেই চৈতন্যস্বরূপের বর্ত্তমানতাতে হৃদয় পূর্ণ হইয়া যাইবে। ইহাই সমাধির অবস্থা। সমাধি দুই প্রকারের,—সবিকল্প ও নির্বিকল্প। যোগের প্রথমাবস্থায় এই সমাধির ভাব তত স্থায়ী হয় না, মধ্যে মধ্যে ভঙ্গ হইয়া যায়। ইহাকেই বলে, সবিকল্প সমাধি। ক্রমে যখন অভ্যাস দ্বারা যোগ স্থায়ী হয়, তখন তাহাকে নির্বিকল্প সমাধি বলে। এই অবস্থায় ঈশ্বরের বাণী হৃদয়ে শ্রবণ করা যায়। ইহাই Inspiration. এই অবস্থায় নিজের মন হইতে ভাব উত্থিত হইতেছে, এরূপ আর বোধ হয় না; তখন উপলব্ধি হয় যেন অন্য কোথাও হইতে ভাব আসিয়া আমার হৃদয়কে অধিকার করিতেছে। আমরা যাহাকে আরাধনা বলি, যোগশাস্ত্রে তাহাকে ধারণা বলে। কথার অনুযায়ী ভাব উৎপন্ন করিতে চেষ্টা করা অপেক্ষা ভাবের অনুযায়ী কথা বলা ভাল। অনেকের মতে সজন উপাসনায় আচার্য্যের কথার অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। আমি উহা অন্যভাবে লই। আমার মনে হয়, অনেকে মিলিয়া যেখানে উপাসনা করিতে বসিয়াছেন, সেখানে যে পবিত্রতার ভাব বিরাজমান, আমি তাহারই মধ্যে বসিয়া স্বতন্ত্রভাবে ঈশ্বরকে ডাকিতে পারি।

ঘ। আমার মনে হয়, একভাবে দেখিতে গেলে সামাজিক উপাসনা (communion with saints) সাধুসঙ্গের সাধনা। এ দিক্ দিয়া ভাবিলে ভাই, ভগ্নী, আচার্য্য, উপাসকমণ্ডলী, উপস্থিত বা অনুপস্থিত, জীবিত বা পরলোকগত সাধু আত্মা সব আমার ভিতরে আসে। ইহাই সজন উপাসনার প্রকৃত ভাব। সকল সাধক, সকল সাধুর যোগের স্থান এই সামাজিক উপাসনা। এ ভাবে দেখিলে আচার্য্য উপাসনা করিতেছেন, আমি স্বতন্ত্রভাবে তাহা শুনিতেছি, এ প্রকার ভেদজ্ঞান থাকে না। এ অবস্থায় যদি আচার্য্য এমন কোন কথা বলেন যাহার সহিত আমার ভাবের মিল হয় না, তবে তাহা মনে প্রবেশই করিবে না, উপর দিয়া চলিয়া যাইবে।

ঙ। আমার বিশ্বাস ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা প্রণালী সার্ব্বজনীন এবং ইহা দ্বারা হৃদয়ের সমস্ত ভাব স্ফূর্ত্তি পায়। আমরা সকলেই সজনে নির্জ্জনে এই উপাসনা প্রণালীর সাধন করি; আচার্য্যও করেন। এ অবস্থায় আচার্য্যের সহিত আমার ভাবের ঐক্য হইবে এরূপ আশা করা স্বাভাবিক, এবং তাহা না হইলে আমার অত্যন্ত অপকার করা হয়।

চ। নির্জ্জন ও সজন উপাসনার প্রভেদ কেশব বাবু একবার একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দেন;—আমি একাকী মাতৃদত্ত খাদ্য ভক্ষণ করিতে পারি, আবার পাঁচজন ভাই ভগ্নী মিলিয়া মাকে ঘেরিয়া বসিয়া তাঁহার প্রদত্ত সামগ্রী আহার করিতে পারি। এই দুই প্রকার আহারেই তৃপ্তি পাওয়া যায়, অথচ এতদুভয়ের মধ্যে একটু বিভিন্নতা আছে। নির্জ্জন ও সজন উপাসনার প্রভেদও অনেকটা সেইরূপ।

সংবাদ।

অর্থ সংগ্রহ;—আমরা পূর্ব্ববারে সংবাদ স্তম্ভে লিখিয়াছিলাম যে, ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার ও ব্রাহ্মসমাজ সংক্রান্ত অন্য বিভাগের টাকা আদায় করিবার জন্য বাবু বাণীকণ্ঠ রায় চৌধুরী বেহার যাত্রা করিয়াছেন। তিনি পশ্চিম বাঙ্গালা ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলেও উক্ত কার্য্যের জন্য যাইতে অনুরুদ্ধ হইয়াছেন। আমরা আশা করি, তত্রস্থ বন্ধুগণ অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের দেয় টাকা তাঁহার হস্তে অর্পণ করিবেন।

প্রতারণা;—জ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক প্রবঞ্চক আমাদিগকে ও আমাদের মফস্বলস্থ কোন কোন স্থানের বন্ধুদিগকে ঠকাইয়া অর্থ সংগ্রহ করিতেছে। এই ব্যক্তি ব্রাহ্মসমাজের সকলকে জানে এবং বোধ হয় ব্রাহ্মসমাজের সুপরিচিত বলিয়া সহজে অনেককে প্রতারিত করিতে সমর্থ হইতেছে। সম্প্রতি এই ব্যক্তি এলাহাবাদ হইতে বাবু কেদারনাথ সরকারের নাম জাল করিয়া কয়েকখানা ব্রহ্মসঙ্গীত পুস্তক আমাদের নিকট হইতে লইয়াছে। মফ-

স্থলের বন্ধুগণ এই ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিয়া যেন প্রতারিত না হন।

ভ্রম সংশোধন ;—গতবারে কার্য্য নির্ব্বাহক সভার যে ত্রৈমাসিক কার্য্য বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে (১৬৬ পৃঃ,১ম স্তম্ভ,২৫শ পংক্তিতে) অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের স্থলে অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় হইবে ; এবং প্রচার কার্য্যের বিবরণের সঙ্গে নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি সংযুক্ত হইবে ;— "পণ্ডিত শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী; কোন বিশেষ কারণ বশতঃ ইঁহার কোন বিবরণ পাওয়া যায় নাই।"

এতদ্ভিন্ন "বিক্রমপুর প্রচার যাত্রা" শীর্ষক প্রবন্ধের প্রথম প্যারাগ্রাফের ১১শ পংক্তিতে "অক্ষয়কুমার দত্ত" এই নামের পরিবর্ত্তে "অভয়াকুমার দত্ত" হইবে।

ছাত্র সমাজ ;—গত পূর্ব্ব সপ্তাহ হইতে রবিবার প্রাতঃকালের পরিবর্ত্তে শনিবার সন্ধ্যাকালে ছাত্র সমাজের উপসনা ও বক্তৃতার সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। নূতন নিয়মানুসারে যেদিন ছাত্র সমাজের কার্য্য আরম্ভ হয়, সেই দিবস পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় "নবজীবন ও তাহার নূতন ব্রত" সম্বন্ধে উপদেশ দেন। রবিবার প্রাতঃকালে ব্রাহ্মবন্ধুগণ বিশেষভাবে উপাসনা করিবার জন্য মিলিত হইয়া থাকেন।

ব্রাহ্ম মিসন্ প্রেস ;—ইতিপূর্ব্বে ইহা ব্যক্তি বিশেষের হস্তে ছিল। এক্ষণে হইতে ইহা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিজস্ব হইল। ইহার তত্ত্বাবধানের জন্য একটী সবকমিটী নিযুক্ত হইয়াছে এবং বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় তাহার সম্পাদক মনোনীত হইয়াছেন। এই উপলক্ষে গতপূর্ব্ব মঙ্গলবারে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল।

ব্রহ্মবিদ্যালয় ;—গতপূর্ব্ব বুধবার হইতে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। প্রতি বুধবার ও শুক্রবার অপরাহ্ন ৫॥০ ঘটিকার সময় প্রথম শ্রেণীর কার্য্য হয় ; এবং প্রতি রবিবার ৪টার সময় দ্বিতীয় শ্রেণীর কার্য্য হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে।

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন ;—ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থ উত্তরবঙ্গ যাত্রা করিয়াছেন। আমরা অনেক সময় প্রচারকদের কার্য্য বিবরণ ও মফস্বল সমাজের সংবাদাদি পাই না। এই সেদিন উত্তর বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের উৎসব হইয়া গেল তাহার কোন বিশেষ বিবরণ আমরা তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশ করিতে পারিলাম না। মফস্বলস্থ বন্ধুগণ যদি এ সম্বন্ধে আমাদের সাহায্য করেন, তাহা হইলে আমরা বিশেষ অনুগৃহীত বোধ করিব।

তত্ত্বকৌমুদীর মূল্য প্রাপ্তি।

মার্চ্চ এপ্রিল ১৮৮৭।

বাবু ভুবনমোহন সেন,	ফরিদপুর	৬৲
,, যোগেশচন্দ্র ঘোষ,	রাধাবল্লভ	৩৲
বাবু হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়,	কলিকাতা	২৲
,, অদ্বৈতচরণ মল্লিক,	ঐ	১৲
,, কেদারনাথ কুলভি,	বাঁকুড়া	॥০
,, গোবিন্দচন্দ্র বসু,	কলিকাতা	১৲
,, ত্রিপুরাচরণ রায়,	রাঁচি	৩৲
,, আশুতোষ মিত্র,	কলিকাতা	২॥০
,, মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়,	ঐ	১॥০
,, সুরেশচন্দ্র দেব,	মোজাফরপুর	৩৲
,, কালীশঙ্কর সুকুল,	কলিকাতা	১॥০
,, জহরিলাল পাইন,	ঐ	১৲
,, কালীকৃষ্ণ দত্ত,	ঐ	২৲
,, শরচ্চন্দ্র সোম,	ঐ	২৲
,, শরচ্চন্দ্র রায়,	রঙ্গপুর	৪৵০
,, শিবপ্রসাদ ঘোষ,	মাথাভাঙ্গা	৩৲
,, নবীনচন্দ্র রায়,	রংলং	৬৲
,, মহেন্দ্রনাথ মিত্র	কলিকাতা	১৩৶১০
শ্রীমতী মুক্তকেশী ঘোষ	ঐ	২৲
বাবু শ্রীনাথ সিংহ	ঐ	১৲
,, মন্মথনাথ দত্ত	ঐ	১৲
,, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়	ঐ	২॥০
,, কেদারনাথ রায়	ঐ	১৲
,, দ্বারকানাথ ঘোষ	ঐ	॥০
,, বেণীমাধব রায়	বান্দা	১॥০
,, হরকান্ত সেন	বরিশাল	৩৲

(ক্রমশঃ)

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার সভ্যনির্ব্বাচন সম্বন্ধীয় ২য় নিয়মানুসারে * সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের অবগতির জন্য নিবেদন করা যাইতেছে যে, আগামী ১৮৮৮ সালের জন্য যাঁহারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার সভ্য হইতে ইচ্ছুক আছেন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক আপন আপন নামাদি আগামী ২১এ নবেম্বরের মধ্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়ে প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

সাঃ ব্রাঃ সমাজ
১৮ই অক্টোবর ১৮৮৭। } শ্রীশশিভূষণ বসু।
সহঃ সম্পাদক।

* ২। অধ্যক্ষ সভায় সভ্য মনোনয়ন তারিখের (date of election) অর্থাৎ সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের বার্ষিক অধিবেশন তারিখের অন্যূন তিন মাস কাল পূর্ব্বে সমাজের পত্রিকা সমূহে প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন দ্বারা সমাজের সম্পাদক মহাশয় সাঃ ব্রাঃ সমাজের সভ্যগণের মধ্যে যাঁহারা অধ্যক্ষ সভার সভ্য হইতে ইচ্ছুক তাঁহাদিগকে তাঁহার নিকট স্ব স্ব নাম, ঠিকানা, আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক প্রভৃতি বিবরণ প্রেরণ করিবার জন্য অনুরোধ করিবেন।

১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিসন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা ৫ই অগ্রহায়ণ মুদ্রিত ও ২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১০ম ভাগ।
১৬শ সংখ্যা।

১৬ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার, ১৮০৯ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৮।

বাৎসরিক অগ্রিমমূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

পূজার আয়োজন।

ইচ্ছা হয় ডুবে থাকি অনন্ত অতল
প্রেমসিন্ধুনীরে তব; হারাইয়া যাই
অসীম সে সত্তা মাঝে, মোহ কোলাহল
পশিতে না পারে যথা; বাসনা সদাই
লুকাইয়া থাকিবারে তোমার ভিতরে,
সংসার আমাকে যাতে খুঁজিয়া না পায়।
করিনু যতন কত কিছুতেই হায়!
ডুবিতে চাহে না মন সে মহাসাগরে;—
বায়ুপূর্ণ পাত্র যথা জলের উপর
ভাসিয়া বেড়ায়, নাহি পশে সতক্ষণ
বারিরাশি তার মাঝে, হে নাথ তেমনি!
অসার বাসনাপূর্ণ এ মম অন্তর
ডুবালেও ভেসে উঠে। তাই নিবেদন,
পরাণে পশিয়া মোরে কর নিমগন।

প্রেমসিন্ধু! আমার কল্যাণের জন্য, আমার পরিত্রাণের জন্য তুমি যত ব্যস্ত এত ব্যস্ত আর কে হইতে পারে? তুমি দিবানিশি আমার মঙ্গল চিন্তা করিতেছ। তবে কেন আমি তোমার উপর আমার জীবনের সমস্ত ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারি না? কেন নিজের পরিত্রাণের ভার নিজের স্কন্ধে লইতে গিয়া পদে পদে অশান্তি ডাকিয়া আনি? আমি ঘোর অবিশ্বাসী; তোমার ভালবাসা দেখিয়াও দেখি না, তোমার মঙ্গলপ্রদ বাণী শুনিয়াও শুনি না। আমিত আজিও জীবনের সকল কার্য্যে নিজের বুদ্ধি, নিজের শক্তির উপর নির্ভর না করিয়া, নিজের প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী না হইয়া, তোমার অঙ্গুলি নির্দ্দেশের অনুসরণ করিতে পারিতেছি না। নানাবিধ ঘটনাস্রোতে পড়িয়া কর্ত্তৃত্ববিহীন জড়পদার্থের ন্যায়, কর্ণধারবিহীন তরির ন্যায় যেদিকে সেদিকে ভাসিয়া বেড়াইতেছি। কবে আমার এ অন্ধতা দূর হইবে? কবে আমি অসন্দিগ্ধ চিত্তে তোমার উপর নির্ভর করিয়া তোমার নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতে শিখিব? তুমি সেই দিন শীঘ্র আনিয়া দাও। নতুবা আমার প্রাণের চঞ্চলতা, অশান্তি কিছুতেই দূর হইবে না।

তোমার পরিচয় পাইয়াও যে আমার মুখ আজিও বাহিরের দিকে রহিয়াছে, ইহা সামান্য আক্ষেপের বিষয় নহে। চক্ষু কোথায় খুলিয়া রাখিতে হয় ও কোথায় বন্ধ করিতে হয় তাহা আজিও আমি শিখিতে পারিলাম না বলিয়া আজিও তোমাতে মগ্ন হইতে পারিতেছি না। সংসারে আমি বেশ জাগ্রত থাকি, আমার চারিদিকে দৃষ্টি থাকে, সাধ্য কি সহজে আমাকে কেহ ঠকাইয়া যায়? কিন্তু অধ্যাত্ম রাজ্যে আমি অধিকাংশ সময়ই নিদ্রিত থাকি, সামান্য প্রলোভন ও কল্পনা আসিয়া অনায়াসে আমার সর্ব্বনাশ করিয়া যায়। সংসারে যে চক্ষু বুজিয়া, আর ধর্ম্মরাজ্যে যে চক্ষু খুলিয়া থাকিতে হয় ইহা জানিয়াও জানিতে পারিলাম না। বাহ্যরূপ ও আকারে সেই জন্য আমার আত্মা প্রায়ই বদ্ধ থাকে। ভিতরে দেখিতে শিখি নাই, উপর দেখিয়া মনে করি যে ভিতর দেখা হইল। দৃশ্যমান জগৎ দেখিয়া মনে করি যে প্রকৃত বস্তু দেখিলাম, ধনমানের সেবা করিয়া মনে করি যে পরকালের সম্বল করিতেছি। জগৎকে তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া মৃত জগৎ দেখি, আত্মাকে তোমা হইতে দূরে লইয়া কল্পনা দর্শন করি। মুখে বলি আমি তোমার, তুমি প্রাণের প্রাণ, জগতের জীবন। প্রভু আমার দ্বৈতভাব বিনষ্ট কর, প্রাণকে অন্তর্ম্মুখী কর, যে আমি তোমাতে বিশ্ব সন্নিবিষ্ট দেখিয়া অবিদ্যা, ভ্রম, ও কল্পনার হাত হইতে মুক্তি লাভ করি।

ভোগে মত্ত বলিয়া মৃত্যুকে বড় একটা মনে করি না। নিকট আত্মীয়ের মধ্যে কাহারও মৃত্যু ঘটিল, সংবাদ আসিয়া প্রাণে খুব জোরে ধাক্কা মারিল, তবু যে কে সেই। সেই যে মনে করিয়া আছি, যে আর সবাই মরিতে পারে, কিন্তু আমি এখন অনেক দিন বাঁচিব, সে ভ্রমাত্মক জ্ঞান কিছুতেই টলিবার নহে। কাজেই বৈরাগ্য স্ফূর্ত্তি পায় না। অন্যের বেলা সংসারের নশ্বরত্ব, ও আপনার বেলা অমরত্ব প্রচার করি বলিয়াই তো ভোগের এত প্রবল আধিপত্য। কিসে ভাল খাওয়া হবে, বেশ ভদ্রলোকের মত কাপড় পরা হবে, এই ভাবিয়াই তাই দিন যায়; ভগবচ্চিন্তার সময় কোথা হইতে হইবে? সাধে

কি সেকালের ঋষিগণ ভোগের মস্তকে পদাঘাত করিয়া বনে প্রবেশ করিতেন? আমিতো তা করিতে পারি না; আমার ধর্ম্মে তার ব্যবস্থা নাই। প্রভু কবে আমি বীতরাগ ও অনাসক্ত হইয়া ভোগ্য বস্তু ব্যবহার করিব? বৈরাগ্যের কথা কেবল মুখেই বলি, বৈরাগ্য হইতে প্রাণ এখনও বহুদূরে রহিয়াছে। সেই জন্য আমার কথা তুমি বিশেষ মনোযোগ কর না। মৃত্যু সংবাদসকল আমাকে সংসারের নশ্বরত্ব ও তোমার অমরত্ব মনে করাইয়া দিতে আসে, আমার ভাবগতি দেখিয়া বিষণ্ন মনে কালে মিশাইয়া যায়। হে বৈরাগীর শিরোমণি! এখন বৈরাগ্য জাগ্রত করিতে বলিব না, তার জন্য প্রাণ বোধ হয় প্রস্তুত হয় নাই, বৈরাগ্যের পিপাসা জাগ্রত কর। অনাসক্ত বৈরাগী তোমাকে যে ভাবে ভাবেন, তার কিঞ্চিৎ আভাস প্রকাশ কর।

অভ্যাস আমাদের শত্রু কি মিত্র, ঠিক্ করিয়া বলা বড় সহজ নহে। অভ্যাস যে আমাদের সাধন ভজনের প্রধান সহায়, এ কথা কে না বলিবে? আবার অপর দিকে দেখা যায়, অভ্যাস প্রাণকে অনেক সময় অসাড় ও কঠিন করিয়া ফেলে। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই আমরা বুঝিতে পারি যে, আমরা চতুর্দ্দিকে পরমেশ্বরের কৃপা দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছি, প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহার দয়া উপভোগ করিতেছি। এই যে শস্যশালিনী বসুন্ধরা, পৃথিবীর জীবনস্বরূপ এই যে সূর্য্য, আমাদের প্রতিদিনের অন্নজল, আমাদের বসন ভূষণ, আমাদের আরাম ও প্রয়োজনসাধনোপযোগী যাবতীয় গৃহ-সামগ্রী, আমাদের বাসগৃহ, আমাদের ধনসম্পত্তি সকলই তাঁহার দয়ার রূপান্তর মাত্র। আমাদের পিতা মাতা, পুত্র কন্যা, ভাই ভগ্নী, স্বামী স্ত্রী প্রভৃতি আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধব-দিগের ভিতর দিয়া তাঁহারই প্রেম নানা আকারে ও নানা ভাবে আমাদের উপর আসিয়া পড়িয়া আমাদের পার্থিব জীবনকে মধুময় করিয়া তুলিতেছে। জগতের পরিত্রাণের জন্য যে সকল আধ্যাত্মিক সত্য মানবহৃদয়ে এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে, যে সকল ধর্ম্মবিধান জগতে অভ্যুদিত হইয়াছে, যে সকল সাধু মহাত্মা এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তৎসমস্তই তাঁহার দয়ার প্রকাশ। এই যে ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ বিধান, এই যে আরাধনাধ্যানপ্রার্থনাসমন্বিত আমাদের মধুর উপাসনা প্রণালী, ইহা তাঁহার প্রসাদ ব্যতীত আর কি? কিন্তু নিত্য দেখিতেছি, নিত্য অনুভব করিতেছি বলিয়া, এ সমস্ত আমাদের পক্ষে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। আমরা ইহার মধ্যে একটা কিছু বিশেষত্ব দেখিতে পাই না। একটু বিশেষ করিয়া না ভাবিলে আমরা এই সকলের মধ্যে পরমেশ্বরের প্রেম উপলব্ধি করিতে পারি না। এ অবস্থাকে অসাড়তার অবস্থা ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? এই অসাড়তা দূর করিবার জন্য বিশেষ চিন্তা ও সাধন আবশ্যক। নতুবা আমরা কখনই পরমেশ্বরের প্রেম প্রকৃতভাবে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইব না।

সাধকের একটী লক্ষণ এই যে, তিনি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের পক্ষপাতী। প্রকৃতির সঙ্গে নির্জ্জনে বাস করিতে তাঁহার বড়ই অনুরাগ। অবকাশ পাইলেই তিনি ইষ্টক, কাষ্ঠ ও শকটের ঘর্ঘর নাদের রাজ্য হইতে যেখানে প্রকৃতি আপনার অতুল সম্পদ দিয়া বিশ্বপতির পূজা করিতেছে, সেইখানে ছুটিয়া যান। প্রকৃতির নিকটে গমনই প্রকৃত বানপ্রস্থধর্ম্ম-পালন। আর্য্য ঋষিরা সংসারাশ্রমের পর বানপ্রস্থের কাল ও অধিকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় এবিষয়েও মানব প্রকৃতির উপযুক্ত বিধান দিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন, যে জীব যখনই সংসারের কোলাহলে বিরক্ত হইয়া ঈশ্বরকে বিস্মৃত হয়, তখনই তাহাকে বায়ু পরিবর্ত্তন ও স্বাস্থ্য লাভের জন্য বনতীর্থে যাইতে হইবে। স্বভাবের একটী বিশেষ গুণ এই যে, সে ঈশ্বরকে স্মরণ করাইয়া দেয়। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য বাস্তবিকই ঈশ্বরের স্মারক লিপি। নিদ্রিত প্রাণে গুপ্ত ঈশ্বর স্মৃতি জাগ্রত করিবার এমন সহজ ও নিশ্চয় উপায় আর দেখা যায় না। সৃষ্টির মর্ম্ম আজিও কেহ ঠিক্ করিতে পারে নাই; জীব সৃষ্ট হইয়া পৃথিবীতে কেন আসে কেহই বলিতে পারে না। কিন্তু ভক্ত জীবনে প্রকৃতির সাধন দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, স্বভাব সৃষ্টির একটী উদ্দেশ্য ধর্ম্মজীবন গঠন করা। নিঃশব্দ নিশীথে তারকোজ্জ্বল নৈশ নীলাকাশের দিকে চাহিয়া দেখ, দেখিবে যে তোমার আত্মার আয়তন বৃদ্ধি হইয়াছে। অমল বারিস্রাবী নির্ঝর কল্লোল শ্রবণ কর, দেখিবে যে তোমার প্রাণে মধুরতার উৎস উন্মুক্ত হইয়াছে। দিগন্তব্যাপী প্রশস্ত প্রান্তরের মধ্যে দাঁড়াইয়া এক-বার বিশুদ্ধ বায়ুর আঘ্রাণ লও, দেখিবে যে ঈশ্বরের অনন্তভাব অতর্কিত ভাবে তোমার শান্ত প্রাণকে অধিকার করিয়া ফেলি-য়াছে। কবি কল্পনায় যে কবিত্ব অনুমান করিতে পারে না, ভক্ত স্বভাবের মুখ সেই কবিত্বে মাখা দেখেন। যেখানে প্রকৃতি মনোহর বেশে সাজিয়া বিশ্বপতির সঙ্গে নীরব আলাপ করেন, ভক্ত সেখানে গিয়া প্রাণ পাতিয়া রাখিতে বড় ভাল বাসেন। অনুকূল ও স্বভাবশোভাসমন্বিত স্থান তাই উপা-সনার জন্য প্রশস্ত বলিয়া পুরাতন ঋষিরা উপদেশ দিয়া গিয়া-ছেন। প্রকৃতির সঙ্গে নির্জ্জন বাস করা আমাদের পক্ষে সর্ব্বদাই আবশ্যক। নগরের নীরসতার মধ্যে বাস করিয়া করিয়া প্রাণ নীচ ও শুষ্ক হইয়া যাইবে ইহাতে বৈচিত্র্য কি? প্রকৃতির কাছে চল, সে নীচতা ও শুষ্কতা দূর হইবে, ও তাহার পরিবর্ত্তে উদারতা ও কোমলতা লাভ করিতে পারিবে।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

প্রেম সাধন।

এই জগতে নানা লোককে নানা ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে দেখা যায়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে অসৎকার্য্যে প্রবৃত্তি সম্বন্ধে কোন কথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। সৎকার্য্য সম্বন্ধে দেখিতে গেলে, কঠোর কর্ত্তব্য জ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়াও

কাজ করা যায়, আবার ঈশ্বরের প্রতি গভীর অনুরাগদ্বারা পরিচালিত হইয়া তাঁহার প্রিয় কার্য্য মনে করিয়াও কাজ করা যায়। কেহ বা লোকভয়ে অথবা পাঁচ জনের নিকট সুখ্যাতি পাইবার প্রত্যাশায় সৎপথে থাকে, কেহ বা সৎপথে থাকা মানুষের পক্ষে কর্ত্তব্য মনে করিয়া সাধুকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, আবার কেহ বা পরমেশ্বরের প্রতি প্রীতিনিবন্ধন আপনার ইচ্ছাকে তাঁহার ইচ্ছার অধীন করিতে চেষ্টা করে। লোকভয়ে বা প্রশংসার লোভে যে সকল সৎকার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, আধ্যাত্মিকজগতে তাহার কোনও মূল্য নাই। যে লোকভয়ে সৎপথে থাকে, গোপনে সুবিধা পাইলে সে যে অসৎকার্য্য করিবে না, মনে মনে সে যে দুশ্চিন্তা পোষণ করিয়া চিত্তকে কলুষিত করিবে না, এমন কথা বলা যায় না। এরূপ ব্যক্তি লোকের চক্ষে, সমাজের চক্ষে সচ্চরিত্র ও সাধুভাবাপন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারেন, কিন্তু ধর্ম্মের নিকট, ঈশ্বরের নিকট তাঁহার এই দৃশ্যমান সাধুতা দাঁড়াইতে পারে না। আবার যিনি ঈশ্বরকে ছাড়িয়া শুদ্ধ কর্ত্তব্যজ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া সত্যপালন, পরোপকার সাধন প্রভৃতি সাধুকার্য্যে নিযুক্ত হন, ধর্ম্মজগতে তাঁহার সেই নিরীশ্বর সাধুতাও আদর পায় না। সাধুতার প্রতি তাঁহার যে আস্থা, মানুষের প্রতি তাঁহার যে ভালবাসা, বিশেষ পরীক্ষা প্রলোভনের মধ্যে পড়িলে তাহার হ্রাস হইতে পারে; তেমন তেমন অবস্থায় পড়িলে তাঁহার কর্ত্তব্যজ্ঞান ক্ষীণ হইয়া পড়িতে পারে। তাঁহার সাধুতা যাহার উপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইতে পারে, এমন স্থায়ী ভিত্তি লাভ করা তাঁহার পক্ষে কখনই সম্ভব নহে।

ধর্ম্মজগতেও দুই প্রকারের সাধুতা দেখিতে পাওয়া যায়। কেহবা পরমেশ্বরকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ না করিয়া, কেবল বুদ্ধিগত সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া বিবেকানুমোদিত পথে চলেন, সকল সৎকার্য্যই ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য, বুদ্ধিদ্বারা মোটামুটি এইরূপ একটা মীমাংসা করিয়া লইয়া এবং ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন করাই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য, এই ধারণা হৃদয়ে লইয়া, শুদ্ধ কর্ত্তব্যজ্ঞানের অনুরোধে জিতেন্দ্রিয় ও সাধু হইতে চেষ্টা করেন, আবার কেহ বা ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার প্রেমে এমন মুগ্ধ হইয়া যান যে, তাঁহার আপনার উপর আর কর্ত্তৃত্ব থাকে না, ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধ কার্য্য করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে, প্রাণপণে তাঁহার ইচ্ছা পালন করাই তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়ায়। পরোক্ষভাবে কর্ত্তব্যজ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনের জন্যও লোকে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া থাকে, আবার প্রেমের অনুরোধেও আপনার প্রাণকে তুচ্ছজ্ঞানে প্রভুর চরণে উহা বলিদান দিতে পারে। কর্ত্তব্যের অনুরোধেও কষ্ট সহ্য করা যায়; আবার প্রেমের অনুরোধেও কষ্ট সহ্য করা যায়। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকার সাধুতার মধ্যে বিশেষ প্রভেদ আছে। কর্ত্তব্যের পথ শুষ্ক, প্রেমের পথ সরস; কর্ত্তব্যের পথ কঠিন, প্রেমের পথ সহজ। কর্ত্তব্যের মুখ সর্ব্বদা কঠোর ও রুক্ষ, তাঁহার প্রাণে কোমলতা নাই, তাঁহার ব্যবহারে মধুরতা নাই, তাঁহার কথায় রস নাই, তাঁহার জীবনে দীনতা নাই, তাঁহার ভ্রূ সর্ব্বদাই কুঞ্চিত, দেখিলেই বোধ হয়, তিনি কোন কঠোর ব্রত পালন করিতেছেন; প্রেমের মুখ সদাই প্রফুল্ল ও সহাস্য, তাঁহার প্রাণ সর্ব্বদাই সরস, ব্যবহার মধুর, কথা সুধাবর্ষী, জীবন বিনয়ে মাখান; তিনি যখন প্রাণ দিতে যাইতেছেন, তখনও তাঁহার আনন্দপূর্ণ মুখশ্রী দেখিলে বোধ হয় যেন কি সুখকর কার্য্য করিতে যাইতেছেন। ভালবাসার এমনই এক অদ্ভুত শক্তি আছে যে, উহা কঠিন কার্য্যকেও সহজ করিয়া দেয়। যাঁহার প্রাণে ঈশ্বরপ্রীতি আছে, তিনি যত সহজে ইন্দ্রিয় দমন করিতে পারেন, তিনি যত সহজে ধর্ম্মের জন্য, ঈশ্বরের জন্য কষ্ট সহ্য করিতে পারেন, এমন কেহই পারে না। প্রেমবিরহিত হইয়া শুদ্ধ মানসিকবল ও কঠোর সাধন দ্বারা ধর্ম্মপথে অগ্রসর হওয়া অতি কঠিন ব্যাপার। কিন্তু প্রেম থাকিলে ধর্ম্মপথের সমস্ত বাধাবিঘ্ন সহজে দূর করা যায়, ধর্ম্ম সাধনের কঠোরতা তিরোহিত হইয়া যায়। সংসার প্রেমিকের প্রাণকে আকর্ষণ করিয়া রাখিতে পারে না।

যদি সহজে সংসারাসক্তি দূর করিতে হয়, ইন্দ্রিয় দমন করিতে হয়, পাপ অভ্যাস পরাস্ত করিতে হয়, তাহা হইলে প্রেমের পথ অবলম্বন ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। জড়জগতে যেমন দেখা যায়, কোন একটী আকর্ষণের প্রভাব অতিক্রম করিয়া তাহার বিরুদ্ধে যাইতে হইলে উক্ত আকর্ষণের বিপরীত দিকে তদপেক্ষা অধিক বল প্রয়োগ করা আবশ্যক, ধর্ম্মজগতেও ঠিক্ সেইরূপ। নীচ আসক্তি সহজ দূর করিতে হইলে ঈশ্বরের প্রেমে যাহাতে প্রাণ আকৃষ্ট হয়, তাহার উপায় করিতে হইবে। এমন সহজ উপায় আর নাই। ভগবৎ প্রেমে একবার গা ভাসাইয়া দিতে পারিলে জীবনতরি এমন এক অনুকূল স্রোতের মুখে পড়িয়া যায় যে, তখন আর ধর্ম্মপথে চলা কঠিন বোধ হয় না। এই অবস্থায় ধর্ম্ম নিশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় স্বাভাবিক হইয়া পড়ে, সাধকের সমস্ত জীবন মধুময় হইয়া উঠে। যতদিন এই প্রেমের আলোকে হৃদয় আলোকিত না হয়, যতদিন এই প্রেমরসে প্রাণ অভিষিক্ত না হয়, ততদিন ধর্ম্মসাধন কঠোর ও নীরস বোধ হয়। বাস্তবিক দেখিতে গেলে প্রেমের সাধনই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধন।

উপরে যে প্রেমের কথা বলা হইল, তাহার সহিত পবিত্রতার সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। পবিত্র-স্বরূপ পরমেশ্বরের প্রতি যিনি প্রীতি স্থাপন করিতে পারিয়াছেন তাঁহার পক্ষে অপবিত্র কামনা হৃদয়ে পোষণ করা, সত্যস্বরূপকে যিনি ভাল বাসিতে শিখিয়াছেন তাঁহার পক্ষে অসত্যের সেবা করা কি কখন সম্ভবপর হইতে পারে? যাহা কিছু ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধ, তাহা সুখপ্রদ হইলেও তিনি তাহা বিষবৎ পরিত্যাগ করেন; আবার যাহা ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুযায়ী, তাহা কষ্টকর হইলেও তিনি তাহা আনন্দের সহিত আলিঙ্গন করেন। যিনি যথার্থ প্রেমিক তিনিই প্রকৃত বৈরাগী। ঈশ্বর প্রেমে যাঁহার দৃষ্টি অনুরঞ্জিত হইয়াছে তিনিই সংসারকে যথার্থ প্রেমের চক্ষে দেখেন, অথচ সংসারের মায়া মোহ তাঁহার হৃদয়কে কলুষিত করিতে পারে না। এক সর্ব্বগ্রাসী ঈশ্বরানুরাগ তাঁহার সমস্ত হৃদয়কে এমন অধিকার করিয়া বসে যে কোন প্রকার নীচ

আসক্তি সেখানে স্থান পায় না। যতদিন পর্য্যন্ত প্রাণে এই প্রেমের সঞ্চার না হয় ততদিন পর্য্যন্ত ধর্ম্মের প্রকৃত মধুরতা আস্বাদন করিতে পারা যায় না।

কিন্তু কি উপায়ে এই প্রেম আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইতে পারে? মানুষের সম্বন্ধে দেখা যায় যে সম্বন্ধের ঘনিষ্ঠতা, একত্র সহবাস, সৌন্দর্য্য বা ভালবাসাদ্বারা একহৃদয়ের প্রেম অপর হৃদয়ের দিকে আকৃষ্ট হয়। অর্থাৎ যাঁহার সহিত আমাদের খুব নিকট সম্বন্ধ, যিনি সর্ব্বদা আমাদের কাছে থাকেন, যাঁহার সৌন্দর্য্য আছে, অথবা যিনি আমাদিগকে ভাল বাসেন এরূপ ব্যক্তির প্রতি সহজে আমাদের অনুরাগ ধাবিত হয়। ঈশ্বরানুরাগ সম্বন্ধেও ঠিক্ এই কথা খাটে। পরমেশ্বরের সহিত আমাদের সম্বন্ধের ঘনিষ্ঠতা আমরা যতই উপলব্ধি করিতে পারিব, তাঁহার সৌন্দর্য্য ও প্রেম যতই উজ্জ্বল ভাবে বুঝিতে পারিব, ততই আমাদের প্রাণের অনুরাগ তাঁহার প্রতি ধাবিত হইবে। ব্রাহ্ম সমাজে যে পূর্ণাঙ্গ উপাসনা প্রণালীর অনুসরণ করা হয় তাহা এপক্ষে আমাদের একটী প্রধান সহায়। এমন মধুর, জীবনপদ উপাসনাপদ্ধতি আর কোনও ধর্ম্ম সমাজে নাই। এই উপাসনার ভিতর ডুবিতে পারিলে, আরাধনার মধ্য দিয়া ঈশ্বরের স্বরূপ ও সৌন্দর্য্যের মধ্যে মগ্ন হইতে পারিলে ধ্যানের মধ্য দিয়া তাঁহার সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠ ও নিকট সম্বন্ধ অনুভব করিতে পারিলে, ব্যাকুল প্রার্থনা দ্বারা প্রাণের গভীর অভাব তাঁহাকে জানাইতে পারিলে নিশ্চয়ই তাঁহার প্রতি প্রেম সঞ্চারিত হইবে। এমন সুন্দর উপাসনা প্রণালীর অধিকারী হইয়াও যে এতদিন আমরা ধর্ম্মের সার ধন প্রেম হইতে বঞ্চিত রহিয়াছি, তাহার একমাত্র কারণ এই যে, উক্ত উপাসনাপ্রণালী আমরা জীবনে সাধন করিতে চেষ্টা করি না। প্রেম সম্বন্ধে দুইটী সহজ সত্য আছে। বিশ্বাস ও সাধনের অভাবে জীবনপদ সত্য হইয়াও তাহা আমাদের নিকট মৃতবৎ রহিয়াছে। সে দুইটী সত্য এই,—সরলপ্রাণে ডাকিলে পরমেশ্বর পাপীর হৃদয়ে নিজের সৌন্দর্য্য প্রকাশিত করেন, (২) ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য ও প্রেম হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারিলে তাঁহার প্রতি প্রেমের সঞ্চার হইবেই। এই দুইটী সহজ সত্যে বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক যদি আমরা পূর্ণাঙ্গ উপাসনা জীবনে সাধন করিতে পারি তাহা হইলে অচিরে আমাদের প্রেমের অভাব বিদূরিত হইয়া জীবন মধুময় হইবে।

ব্রহ্ম কৃপা।

বুদ্ধিগত সংস্কার ও বিশ্বাসের মধ্যে প্রভেদ এই যে, বিশ্বাসের প্রভাব জীবনের সমস্ত কার্য্যে পরিব্যাপ্ত হয়, কিন্তু বুদ্ধিগত সংস্কার প্রাণের মূলদেশ পর্য্যন্ত পঁহুছিতে পারে না, এই জন্য জীবনের কার্য্যের উপরও তাহার তাদৃশ প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। গতবারে 'বিশ্বাসের বল' শীর্ষক প্রবন্ধে এই কথা বিশদরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করা গিয়াছে। এবারে আমরা একটী বিশেষ সত্য সম্বন্ধে এই কথার উপযোগিতা প্রদর্শন করিতে সচেষ্ট হইব। 'ব্রহ্মকৃপা'—এই কথাটী আমরা সময়ে, অসময়ে সর্ব্বদা ব্যবহার করিয়া থাকি। কিন্তু আমাদের জীবনের দিকে চাহিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে, আমাদের পক্ষে উহা বুদ্ধিগত সংস্কারের কথা মাত্র; ব্রহ্ম কৃপায় প্রকৃত বিশ্বাস যাহাকে বলা যাইতে পারে, তাহা আমাদের নাই। আমাদের মধ্যে এই কথাটীর অত্যন্ত অপব্যবহার হইতেছে বলিয়া বোধ হয়। যে অবস্থায় ও যেভাবে সচরাচর অনেকে এই কথা ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহাতে মনে হয় যেন মানুষের চেষ্টার সহিত ব্রহ্মকৃপার কোন সংস্রব নাই; আমরা অলস ও নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকিলেও ব্রহ্মকৃপাবলে স্বর্গরাজ্যে চলিয়া যাইব; আমরা যে ভাবেই জীবন কাটাই না কেন, এমন একদিন আসিবে, যে দিন হঠাৎ প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গের পর গাত্রোত্থান করিয়া দেখিব, আমরা আর সংসারে নাই, একেবারে স্বর্গরাজ্যে উপনীত হইয়াছি; অথবা প্রত্যেক মানুষের জীবনে এমন একটী বিশেষ মুহূর্ত্ত আসিবে, যখন হঠাৎ তাহার প্রাণ ব্রহ্মকৃপাবলে একেবারে জ্ঞানপ্রেমপুণ্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে। যদিও স্পষ্টতঃ আমরা এ কথা না বলি, তথাপি আমাদের ব্যবহার দেখিয়া, আমাদের নিশ্চেষ্ট ভাব দেখিয়া, সাধনভজনে আমাদের অনাস্থা দেখিয়া বোধ হয় যে, আমাদের মনের অতি গূঢ়তম প্রদেশে এই ভ্রান্ত সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া আছে। কি আশ্চর্য্য! এই পৃথিবীতে অতি সামান্য পদার্থ লাভ করিতে হইলেও বিনা পরিশ্রমে তাহা পাওয়া যায় না, এ কথা জানিয়াও আমরা বিনা পরিশ্রমে দেবদুর্ল্লভ স্বর্গীয় রত্নলাভের আশা করি! বিদ্যা ও ধনসম্পত্তি লাভের জন্য মানুষ কতই না কষ্ট স্বীকার করে! আর আমরা কি না সুখশয্যায় শয়ন করিয়া স্বর্গরাজ্যে যাইব বলিয়া নিশ্চিন্ত আছি! পৌত্তলিক উপাসকগণ তাঁহাদের ইষ্টদেবতার দর্শনলাভের জন্য কত তীর্থ পর্য্যটন, কত কৃচ্ছ সাধন করেন। আর আমাদের দেবতা সর্ব্বব্যাপী ও নিরাকার বলিয়া আমরা মনে করি যে, দিনের মধ্যে এক আধবার চক্ষু বুজিয়া বসিলেই তাঁহার কৃপায় অনায়াসে তাঁহাকে লাভ করিতে সমর্থ হইব! ইহা অপেক্ষা গুরুতর ভ্রম আর কি হইতে পারে?

আমরা ইতিপূর্ব্বে 'ধর্ম্মজীবনে অধ্যবসায়' শীর্ষক প্রবন্ধে বলিয়াছি, এবং এখনও সেই ভাবের পুনরুক্তি করিতেছি যে, বিনা পরিশ্রমে যেমন কোনও পার্থিব সামগ্রী লাভ করা যায় না সেইরূপ বিনা পরিশ্রমে ধর্ম্মলাভও করা যায় না। কখন কখন কাহারও কাহারও জীবনে এমন শুভ মুহূর্ত্ত আসিতে দেখা যায় বটে, যখন তাহার মন, আপাততঃ দেখিতে অতি সামান্য এমন কোনও কারণে অকস্মাৎ সাংসারিকতা বা ঘোর পাপের পথ হইতে পুণ্যের দিকে ফিরিয়া যায়। কিন্তু ইহাদ্বারা এরূপ বুঝা উচিত নহে যে, এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যে নরকের কীট ছিল, পরমুহূর্ত্তেই সে পুণ্যের সৌন্দর্য্যে অনুরঞ্জিত হইয়া স্বর্গের দেবতা হইয়া যায়। ইহা নিতান্ত ভ্রমের কথা, কল্পনার কথা। ঐ সকল শুভমুহূর্ত্তে পাপীর মন পাপ হইতে পুণ্যের দিকে ফিরিয়া দাঁড়ায় মাত্র, ঐ সময় হইতে তাহার জীবনে পুণ্যের জন্য সংগ্রাম আরম্ভ হয় মাত্র। স্বর্গরাজ্যে পঁহুছিবার, প্রকৃতপ্রস্তাবে পুণ্যবান্ হইবার পূর্ব্বে তাহাকে অনেক পরিশ্রম করিতে হইবে, অনেক চক্ষের

জল ফেলিতে হইবে, বহুদিনের অভ্যস্ত পাপের সহিত অনেক যুদ্ধ করিতে হইবে। আর একটী কথা। পূর্ব্বে যে শুভ মুহূর্ত্তের কথা বলা হইয়াছে, অপর লোকের চক্ষে তাহা আকস্মিক বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও বাস্তবিক তাহা আকস্মিক নহে। যাঁহাদের জীবনে ঐরূপ আপাতদৃশ্যমান আকস্মিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, তাঁহাদের মন বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই তাহার জন্য অজ্ঞাতসারে প্রস্তুত হইতে থাকে, উক্ত পরিবর্ত্তনের অনুকূল চিন্তাস্রোত তাঁহাদের মনে পূর্ব্ব হইতেই প্রবাহিত হইতে থাকে। তাহার পর হঠাৎ কোনও সামান্য ঘটনা উপলক্ষে জীবনে ঐ চিন্তাস্রোতের কার্য্য বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হইতে আরম্ভ হয়।

এক ভাবে দেখিতে গেলে আমাদের পরিশ্রম করিবার যে শক্তি ও প্রবৃত্তি আছে, অথবা যে সকল ঘটনায় আধ্যাত্মিক পরিবর্ত্তনের অনুকূল চিন্তা মনের মধ্যে জাগ্রত করিয়া দেয়, তৎসমস্তই ব্রহ্মকৃপালব্ধ। আমাদের ভিতর যে কিছু ভাল ভাব আছে, সে সকলই আমরা ঈশ্বরের নিকট হইতে পাইয়াছি। আমাদের এই শরীর ও আত্মা যখন তাঁহারই প্রদত্ত, তখন আর অন্য বিষয়ের কথা কি? এ অবস্থায় প্রশ্ন উঠিতে পারে যে আমাদের পরিশ্রম করিবার শক্তি ও প্রবৃত্তিই যখন ঈশ্বরের কৃপাসাপেক্ষ তখন আর মানুষের চেষ্টার স্থল রহিল কোথায়?

(ক্রমশঃ)

চিত্ত সংযম।

পাপের সহিত দুই প্রকারে সংগ্রাম করা যাইতে পারে। (১) পাপের প্রত্যেক প্রকাশের সহিত স্বতন্ত্র যুদ্ধ করা। সাধক জগতের অধিকাংশ লোকই এইরূপ সংগ্রামে প্রবৃত্ত। ইঁহারা পাপের প্রত্যেক প্রকাশকে সম্মুখ সমরে আহ্বান করিয়া জয় করিবার চেষ্টা করেন, যত প্রকার উপায় আছে সমস্তই গ্রহণ করেন, এবং প্রবল সংগ্রামের পর হয়ত শত্রুকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হন। কিন্তু যখন ইঁহারা একটী রিপুর সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত থাকেন, অন্য দিকে অলক্ষিত ভাবে অন্যান্য রিপুদল মস্তক উত্তোলন করিয়া ইঁহাদের প্রাণ বিনাশের চেষ্টা করে। তখন ইঁহারা তাহাদের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু তাহাদিগকে বিনাশ করিতে না করিতে আর এক দল শত্রু সমরক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই শ্রেণীর সাধকেরা সর্ব্বদাই সশঙ্ক, চিন্তাকুল ও নিদ্রাশূন্য; কৃপণ জারের ন্যায় ইঁহারা অহোরাত্র আপনাদিগকে প্রহরী বেষ্টিত করিয়া রাখেন, এক মুহূর্ত্তের জন্য ইঁহারা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। ইঁহাদের সাধনের কিছুই ত্রুটি হয় না, বরং ইঁহাদের জীবনে সাধনের যত বাহুল্য, এত আর অন্য কোথাও দেখা যায় না। পাপ কিন্তু রক্তবীজ ও রাবণের মত মরিয়াও মরে না। একবিন্দু রক্ত ভূমে পড়িবামাত্র শত রক্তবীজ সমরাঙ্গনে উদ্ভূত হয়। এক মুণ্ড কাটিবামাত্র সেই স্থানে নূতন মুণ্ড প্রকাশ পায়। একটী পাপ বিনাশ করিতে না করিতে দশটী পাপ দেখা দেয়, সাধকবৃন্দ পাপের সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রাম করিতে ক্রমশঃই হতবল ও অবসন্ন হইয়া পড়েন।

(২) আর এক প্রকার সংগ্রাম আছে, তাহাতে পাপ চিরদিনের জন্য বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এ সংগ্রামে সাধক পাপের প্রত্যেক বিকাশের সঙ্গে পৃথক্ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন না, অন্য প্রকার উপায় অবলম্বন করেন। পাপ বৃক্ষের শাখাচ্ছেদনে তিনি বৃথা সময় নষ্ট করেন না, যেখানে পাপের মূল সেখানে গিয়া উপস্থিত হন, এবং দূষিত মূল উৎপাটন করিয়া শাখাপ্রশাখাপত্রপুষ্পফলশোভিত পাপ তরু একেবারে বিনষ্ট করেন। রক্তবীজ ও রাবণের সঙ্গে তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে হয় না, তিনি এরূপ এক মন্ত্র সাধন করেন, যাহাতে পাপের সম্ভাবনা পর্য্যন্ত অসম্ভব হইয়া পড়ে। ঈশ্বরের কাছে অনেক কাঁদাকাটি করিয়া তিনি ঐশী প্রেমসিন্ধুর একবিন্দু প্রেম লাভ করেন। উহাতেই তিনি পাপের সুদৃঢ় মূল অনায়াসে ছেদন করিতে সমর্থ হন। উহারই কিঞ্চিৎ তিনি আপন চক্ষে লাগাইয়া দেন, আর দিব্য চক্ষু প্রাপ্ত পার্থের ন্যায় বিশ্ব ব্রহ্মময় দেখেন, পাপ করিতে পারেন না। সকলেরই মুখে, সকল পদার্থে তিনি ব্রহ্মের সৌন্দর্য্য দেখেন, ইষ্টদেবতার অনির্ব্বচনীয় সৌরভ আঘ্রাণ করেন। নরনারীর মুখে যে স্বর্গ দর্শন করিল, তাহার ব্যভিচারের সম্ভাবনা কোথায়? উহার বলেই তিনি আত্মপর জ্ঞানের হস্ত হইতে চির মুক্তি লাভ করেন, সকলকে আপনার বলিয়া জানিতে পারিয়া সকল পাপ হইতে রক্ষা পান; সকলেই তাঁহার আপনার, কাহার উপর ক্রোধ করিবেন? আপনার লোকের উপর কেহ কি রাগ করিতে পারে? কাজেই তাঁহাকে ক্রোধ পরিত্যাগ করিতে হয়। জগতে যাঁহার পর নাই, যিনি সকলের মিত্র, তিনি কাহাকে প্রবঞ্চনা করিবেন, কাহার সম্পত্তি অপহরণ করিবেন? আপনাকে বা আপনার লোককে কেহ ঠকাইতে চায় না, আপনার টাকা আপনি কেহ চুরি করে না। আপনার সম্পত্তিতে আপনি কিরূপে লোভ করিবে? সুতরাং তাঁহাকে লোভ ত্যাগ করিতে হয়। বিন্দুমাত্র প্রেমের কি দুর্জ্জয় শক্তি! কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি দুর্জ্জয় রিপু প্রেমের কাছে সহজেই পরাজিত হয়। প্রেমই প্রকৃত চিত্ত সংযম ও ইন্দ্রিয় দমনের শ্রেষ্ঠ উপায়।

ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগকে এই দ্বিতীয় প্রকার সাধন অবলম্বন করিতে উপদেশ দেন। যত দিন আমরা উহা না গ্রহণ করিব, ততদিন আমাদের বর্ত্তমান দুরবস্থা দূর হইবে না। বনে গমন করিয়া দীর্ঘকালব্যাপী শারীরিক কৃচ্ছ্র সাধনের সময় অতীত হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগে জীবন্ত বিশ্বাস ও প্রেম সাধন করিতে হইবে। যতদিন আমরা বাহিরে বাহিরে সাধন করিব, ততদিন আমাদের উত্থান পতন ঘুচিবে না। সাধনের মুখ ভিতর দিকে ফিরাইয়া দেওয়া আবশ্যক হইয়াছে। শত শত বৎসর যদি আমরা পাপের শাখাকর্ত্তনে প্রবৃত্ত থাকি, তথাপি সে কার্য্য ফুরাইবে না। শাখা ছাড়িয়া মূলে যাইতে হইবে। ব্রহ্ম প্রেমের এক বিন্দু তথায় ঢালিয়া দিতে হইবে, তবে

আমরা নিস্তার পাইব। পাপের যদি সম্ভাবনাই রহিল, তবে আর কি সাধন করিলাম; আজ আমি ভাল আছি, কাল যদি বিপথে যাইবার আমার শক্তি রহিল, তবে আমি আপনাকে নিরাপদ মনে করিতে পারি না। প্রেমাস্ত্র ভিন্ন কিরূপে পাপের সম্ভাবনার নিরোধ হইবে? আর পাপের সম্ভাবনা যদি রহিত না হইল, তবে জীব কিরূপে পরিত্রাণ পাইবে? চিত্তের অংশ বা বৃত্তি বিশেষ সংযত করিলে কি হইবে? সমস্ত চিত্তের সংস্কার আবশ্যক হইয়াছে। চিত্ত বৃত্তির মূলে আমাদিগকে গমন করিতে হইবে। সেখানে গিয়া দেখিতে পাই, যে একটা দুষ্ট "আমি" বসিয়া আছে, সে কিছুতেই মনে ব্রহ্মপ্রেমকে আসিতে দেয় না। ব্রহ্মপ্রেম কতই অনুনয় বিনয় করেন, স্বর্গের কতই প্রলোভন দেখান, কিন্তু সে আমিটী ঘোর দুষ্ট, তাই সহজে তাঁর কথায় ভিজে না। সে আমির চোখে জল নাই, প্রাণে কৃপা নাই, তাহার প্রকৃতি মরুভূমির মত খট্ খটে হইয়া রহিয়াছে। সে কেবলই লোকের দোষানুসন্ধান কার্য্যে ব্রতী, আপনার দোষ ভুলিয়াও দেখিতে পায় না, আর যদি বা কখন পায় সে দোষ স্বীকারের বিরুদ্ধে শত সহস্র ওজর বাহির করে। কিন্তু অন্যের বেলা তাহার কর্ত্তব্য জ্ঞান জাগ্রত হইয়া উঠে। আপনার পক্ষে "শান্তি রস" এবং অন্যের পক্ষে "বীররস"। প্রার্থনা করিয়া পারি, কাঁদা কাটি করিয়া পারি, হত্যা দিয়া পারি, যেমন করিয়া পারি, এই দুষ্ট আমিটাকে দমন করিতে হইবে, তারপর প্রবৃদ্ধ জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় ব্রহ্মকৃপা আমাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পাপের মূল তুলিয়া দিয়া যাইবে।

বহির্মুখ সাধনের একটী অবশ্যম্ভাবী ফল সাধনাহঙ্কার। যদি মনে হয়, আমরা অনেক সাধন ভজন করিতেছি, তাহা হইলে অমনি মনে হইবে, আমরা ভাল, আর যাহারা সাধন ভজন করিতেছে না, তাহারা মন্দ। কিন্তু যাঁহাদের সাধন অন্তর্মুখ, যাঁহাদের প্রাণে দুষ্ট আমি নাই, যাঁহাদের চিত্তের মূলে প্রেম, তাঁহাদের মনে অহঙ্কার আসিতে পারে না। তাঁহারা যে সকল নিগূঢ় মন্ত্র সাধন করেন, তাহাতে আপন কর্তৃত্ব অনুভব করেন না তাঁহারা নিজে সাধন করেন না, ঈশ্বর তাঁহাদিগকে সাধন করান। ঈশ্বরের কর্তৃত্ব তাঁহাদের প্রাণে এত উজ্জ্বল যে তাঁহারা অন্য কর্তৃত্ব বুঝিতে পারেন না। ঈশ্বরের দিকে তাঁহাদের স্থির দৃষ্টি, ঈশ্বরের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে প্রাণটা যে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে, সে দিকে লক্ষ্য নাই। জগতের লোক সে পরিবর্ত্তন দেখিয়া বিস্মিত ও অবাক্ হয়, কিন্তু তাঁহাদের সে দিকে দৃক্পাতও নাই। আত্মাতে তাঁহারা সদাই পরমাত্মার স্ফূর্ত্তি দেখিতে পান; জগতের সাধনাভাব দেখিয়া তাঁহাদের মনে তাই অহঙ্কার আসে না, জগতের হীনতা ও দুর্দ্দশা দেখিয়া তাঁহারা মর্ম্ম পীড়িত হন। পিতার জগৎ, পিতার পরিবার তাঁহার ইচ্ছার মত নহে দেখিয়া তাঁহারা অস্থির হন; আপনার ভাই, আপনার ভগিনী যদি বিপথে যায়, তবে কে স্থির হইতে পারে? অহঙ্কারের পরিবর্ত্তে অজস্র প্রেম তাঁহাদের উদার হৃদয় হইতে নিঃসৃত হইয়া জগৎকে প্লাবিত করে। তাঁহাদের হৃদয়ে অহংই থাকে না, অহঙ্কার কিরূপে তিষ্ঠিবে?

নির্জ্জন-চিন্তা

সাধু কাহাকে বলি? যে ব্যক্তি দশ টাকা দান করিয়া থাকেন, অথবা দশটা মিষ্ট কথায় লোককে সন্তুষ্ট করিতে পারেন, তাঁহাকে সাধু বলি না। যিনি নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়া পরিবার পরিজনের প্রাণে আনন্দ বিতরণ করিতে পারেন, কিম্বা নিরন্তর লোকের হিতাকাঙ্ক্ষায় নিযুক্ত থাকেন তাঁহাকেও সাধু বলি না। কেবল সেই ব্যক্তিকেই সাধু বলি, যাঁহার সঙ্গলাভে—যাঁহার নিকটস্থ হইতে না হইতে, প্রাণের অসাধু ভাব সকল আপনাপনি অদৃশ্য হয়—খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তিনিই সাধু যাঁহার সংস্পর্শ মাত্র আমি বুঝিতে পারিব যে আমার প্রাণের সাধু ভাবের ফুলগুলি ফুটিয়া উঠিতেছে এবং তাহার সৌরভে আমার প্রাণ আমোদিত হইতেছে। তাঁহাকেই সাধু বলি যাঁহার এক একটি কথা প্রাণের মর্ম্মস্থানকে স্পর্শ করে এবং সাংসারিক ভাবের প্রকোপকে খর্ব্ব করিয়া আত্মাকে ঈশ্বরাভিমুখ করিয়া দেয়। এইগুলিই প্রকৃত সাধু জীবনের লক্ষণ।

অনেকেই দেখিয়াছেন সময়ে সময়ে চন্দ্র ও সূর্য্যের চারিদিকে একটি মণ্ডলাকার রেখা দৃষ্ট হইয়া থাকে, উহাকে লোকে চন্দ্রমণ্ডল ও সূর্য্যমণ্ডল বলে। এইরূপ সাধু জীবনেরও একটি মণ্ডল আছে। উহাকে সাধুমণ্ডল অথবা সাধুতার গণ্ডী বলা যাইতে পারে। মানুষ সংসারের পথে চলিতে চলিতে যখন এই সাধুমণ্ডলের ভিতরে পড়িয়া যায়, তখন তাহার সংসারাসক্ত ও পাপান্ধকারে আচ্ছন্ন প্রাণে সাধুতার জ্যোতি প্রতিভাত হয়, তখনই সে সেই সাধুতার আলোকে আপনার অপকৃষ্টতা দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলে। ইহা কল্পনা নহে, ধর্ম্মজীবনের পরীক্ষিত সত্য।

২

শিশু যখন জননীগর্ভে বাস করে তখনও সে স্বতন্ত্র, কিন্তু তখন তাহার আহার নাই, নিদ্রা নাই, রোগ নাই, তাহার কিছুই নাই; জননীর আহার নিদ্রাই তাহার শরীর পোষণ করিতেছে, জননীর রোগে সে রুগ্ন, জননীর সুস্থতাতে সে সুস্থ হইতেছে—ইহা একটী বৈজ্ঞানিক সত্য। ইহার অনুরূপ একটী আধ্যাত্মিক সত্য আছে;—আমরা আত্মকৃত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া ও পরমেশ্বরের আদেশে জীবনপথে অগ্রসর হইয়া ক্রমে এমন এক স্থানে, এমন এক অবস্থাতে উপস্থিত হইব যেখানে আমাদের স্বাতন্ত্র্য থাকিবে মাত্র, আর কিছুই থাকিবে না। তখন আমরা পাপ ও পুণ্য, সুখ ও দুঃখ, শান্তি ও অশান্তির অতীত হইয়া * অনন্ত আনন্দময়ী জননীর নির্জ্জন, নিস্তব্ধ ক্রোড়ে বিশ্রাম করিব ও আত্মার নির্দ্দিষ্ট অনন্ত শান্তির পথে অগ্রসর হইতে থাকিব।

* ইহাই বেদান্ত শাস্ত্রানুমোদিত নির্ব্বাণ মুক্তির অবস্থা। ব্রাহ্মধর্ম্মের মুক্তির আদর্শ অন্যরূপ। ত, কৌ, স,

৩

শিশুর পক্ষে মা যে কি পরম ধন শিশু তাহা জানে না। আমরা তাহা বেশ বুঝিতে পারি। মানবাত্মার পক্ষে পরমাত্মা যে কি পরম বস্তু সংসারের দাস, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির দাস আমরা তাহা অনুভবই করিতে পারি না। ঈশ্বরনিরত মুক্তাত্মা সাধু পুরুষগণই সেই পরম প্রীতিপ্রদ সম্বন্ধ অনুভব করিতে পারেন। পরমেশ্বর! আমি সুখও জানি না, দুঃখও জানি না, আমি বিপদও জানি না সম্পদও জানি না, আমি কেবল তোমাকেই চাই, তোমাকে জানিতে হইলে যদি রাজসিংহাসন ও বৃক্ষতল এ দুইকে সমান জ্ঞান করিতে হয় তবে তাহাই হউক, প্রভু! এই প্রার্থনাকে মূলমন্ত্র করিয়া তোমার অনুগত দাস হওয়াই আমার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। কারণ, আমি জানি এই দাসত্বেই স্বাধীনতার জন্ম হয়, এই দাসত্বের ভিতরে অনন্ত জীবনের অঙ্কুর নিহিত আছে।

চ, ব।

প্রদেশীয় ব্রাহ্মসমাজ।

মেদিনীপুর গড়বেতা প্রার্থনা সমাজ।

শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র ঘোষ লিখিয়াছেন ;—

সর্ব্বসিদ্ধিদাতা মঙ্গলময় পিতার ইচ্ছায় সম্প্রতি (ব্রাহ্ম সংবৎ ৫৮, ১৭ই কার্ত্তিক বুধবার) গড়বেতায় একটী প্রার্থনা সমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। স্থানীয় ১০টী সভ্য লইয়া কার্য্য আরম্ভ করা গিয়াছে। ভগবানের ইচ্ছায় সভ্যগণের বর্ত্তমান ধর্ম্ম-পিপাসা স্থায়ী থাকিলে সমাজটীর স্থায়িত্ব আশা করা যায়।

আমি বিগত শারদীয় বন্ধের পূর্ব্বে কোন রাজকার্য্য বশতঃ প্রায় দেড় মাস এখানে অবস্থিতি করি। তখন সাধ্যমত দীনভাবে প্রকাশ্য বক্তৃতা, আলোচনা প্রভৃতি দ্বারা একটু আন্দোলনের জন্য চেষ্টা করা হইয়াছিল। একবার মেদিনীপুর হইতে বন্ধুগণ আসিয়াও বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহাদের আগমনে নগরসঙ্কীর্ত্তন, প্রাতঃকীর্ত্তন, উপাসনা ও বক্তৃতা হইয়াছিল। সেই সময়ে অত্রস্থ হরিসভার সভ্য মহাত্মাগণ হরিসভাগৃহে আমাদিগকে উপাসনা করিতে দিয়া এবং বক্তৃতার জন্য সময় সময় আমাদিগকে তথায় আহ্বান করিয়া আমাদিগের ধন্যবাদার্হ ও কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। বন্ধের পর আসিয়া প্রকাশ্যভাবে কোন কার্য্য করি নাই। প্রায় প্রত্যহই ধর্ম্ম পিপাসু সহৃদয় বন্ধুগণের সঙ্গে আলোচনাদি হইতেছে এবং মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইচ্ছায় "গড়বেতা প্রার্থনা সমাজ" সংস্থাপিত হইয়া প্রাণ মন পরিতৃপ্ত হইয়াছে। পিতার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

প্রেরিত পত্র।

ব্রাহ্মের লক্ষণ।

বলা বাহুল্য, যে কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সভ্যেরা যে পরিমাণে সচ্চরিত্র ও উপাসনাশীল হন, সেই পরিমাণে সেই সম্প্রদায় লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। অপর দিকে কোন সম্প্রদায়ান্তর্গত সকলই যে সমান পরিমাণে উন্নত হইবেন, ইহাও প্রত্যাশা করা যায় না। তবে এমন কতকগুলি সাধারণ গুণ চাই, যাহা না থাকিলে সেই সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়া যায় না। এইরূপ নিয়ম নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এই গুণের শ্রেষ্ঠতা অনুসারে সমাজের আদর্শের উচ্চতা স্থিরীকৃত হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, উদার সত্যধর্ম্ম ইহা শিক্ষিত মাত্রেই স্বীকার করেন, তবে তাঁহারা কোন বিশেষ বিশেষ ব্রাহ্মের ব্যক্তিগত অভাব বা দুর্ব্বলতা দেখিয়া, এই ধর্ম্মের নিন্দা করুন বা না করুন, ইহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন। এ বিষয়টী নিতান্ত উড়াইয়া দিবার বিষয় নহে। অথচ ইহা বলা যাইতে পারে যে যাঁহারা নিজের উন্নতির জন্য ব্যাকুল তাঁহারা অপরের ত্রুটি দেখিবেন কেন? কিন্তু অন্য পক্ষে ইহাও বলা যাইতে পারে যে সমাজের এমন কি আকর্ষণ আছে যাহাতে মন আকৃষ্ট হইতে পারে এবং লোকের মনে ধর্ম্মের জন্য ব্যাকুলতা জন্মাইয়া দিতে পারে? শুদ্ধ কতকগুলি বিশুদ্ধ মতে ইহা করিতে পারে না। মধুর, সুন্দর [illegible] ও জীবনই কেবল পারে। এই সুন্দর, মধুর জীবন লাভের একমাত্র উপায় উপাসনাশীলতা। কেহ কেহ স্বভাবতঃ অনেক বিষয়ে সচ্চরিত্র থাকিতে পারেন, কিন্তু উপাসনার রস অন্তরে প্রবেশ না করিলে সদ্ভাবগুলি সময়ে শুকাইয়া যায়, অন্ততঃ উপাসনা ব্যতীত উহা নিরাপদ নহে। ব্রাহ্মধর্ম্মের হিতৈষী যাঁহারা তাঁহারা অবশ্যই দেখিয়া থাকিবেন যে, ব্রাহ্ম সমাজের প্রকৃত উন্নতি সাধনের ইচ্ছা করিতে গেলে ঐ সমাজান্তর্গত অথবা ঐ সমাজপরিগণিত ব্রাহ্ম যাঁহারা হইবেন তাঁহাদের অন্ততঃ চরিত্রবান্ ও উপাসনাশীল হওয়া চাই, নতুবা এ ধর্ম্মের বিশেষ উন্নতি লাভের আকাঙ্ক্ষা একরূপ বৃথা। কতকগুলি বিশুদ্ধমত দিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম নিজের দারিদ্র হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন না, বিশুদ্ধ জীবন না দেখাইলে কেহ ইহাকে জীবন্ত ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিবে না। তবে কেহ কেহ যে প্রবল ধর্ম্ম পিপাসার অনুরোধে এ ধর্ম্মের আশ্রয় লয়েন সে স্বতন্ত্র কথা। যখন বিশুদ্ধ উপাসনাশীল জীবনের শ্রেষ্ঠতার উপর ব্রাহ্মধর্ম্মের বিস্তার নির্ভর করিতেছে, তখন কিসে উহা সংসাধিত হইতে পারে তাহা দেখা আবশ্যক। ব্রাহ্মসমাজকর্ত্তৃক গণিত কোন সভ্যের জীবনে যদি উপাসনাশীলতা বা সচ্চরিত্রতার অভাব দৃষ্ট হয়, তবে ব্রাহ্মজীবন বা ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি লোকের কত দূর শ্রদ্ধা থাকে, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। এজন্য আমাদের ক্ষুদ্র বিবেচনায় ব্রাহ্মসমাজের সভ্য মনোনয়ন সম্বন্ধে দুই একটী সুনিয়ম করা নিতান্ত আবশ্যক। ব্রাহ্ম

বলিলেই লোকে তাঁহার জীবন যেরূপ হইবার প্রত্যাশা করে, যাহাতে তাহা সফল হয়, তাহার যথাসাধ্য উপায় ব্রাহ্মসমাজকে করিতেই হইবে। ব্রাহ্ম বলিলে যদি কেহ তাঁহার সিদ্ধ পুরুষ হইবার প্রত্যাশা করেন, তবে সে প্রত্যাশা অতিশয় অধিক। তবে অন্ততঃ নিম্নলিখিত নিয়মগুলি না থাকিলে আমাদের বিবেচনায় ব্রাহ্মধর্ম্মের মর্য্যাদার হানি ও উচ্চ আদর্শকে খর্ব্ব ও হীন করা হয়।

(১) চরিত্রবান্ ও উপাসনাশীল ব্যক্তি পঞ্চবিংশ বর্ষের ন্যূনবয়স্ক না হইলে, ব্রাহ্ম সমাজ তাঁহাকে সভ্য পরিগণিত করিতে পারিবেন।

(২) যাঁহারা অনুষ্ঠানাদি বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মের মতানুসারে না করেন তাঁহারা এ সমাজের সভ্য হইতে পারিবেন না।

যাঁহারা উল্লিখিত নিয়মানুসারে ব্রাহ্মসমাজের সভ্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবেন না, তাঁহারা একটু স্থির চিত্তে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিবেন যে ইহাতে তাঁহাদের কোন ক্ষতি হওয়া দূরে থাকুক, বরং প্রকৃত মঙ্গলই হইবে। ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হওয়া সহজ ব্যাপার নহে ইহা বুঝিতে পারিলে আমাদের জীবনের উন্নতির জন্য অবশ্যই আমরা বিশেষ চেষ্টা করিব। ইহাতে সমাজের প্রতি সকলেরই আদর ও শ্রদ্ধা থাকিবে এবং ব্যক্তিগত জীবনও উন্নতি লাভ করিবে। অবশ্য ব্রাহ্মসমাজে নিজের প্রভুত্ব বা মত খাটাইবার জন্য কেহ আসেন না। এরূপ অভিসন্ধি যদি কাহারও থাকে তবে সে স্বতন্ত্র কথা। সকলেরই এক সাধারণ উদ্দেশ্য,—ঈশ্বরের মহিমা ও তাঁহার সত্যপ্রচারের উপায়বিধান। এই যে ব্রাহ্মসমাজ ইহার প্রতি দিন দিন লোকের শ্রদ্ধা ভক্তি কিসে বাড়ে।

কেহ কেহ এরূপ আপত্তি করিয়া থাকেন যে কে উপাসনাশীল ও চরিত্রবান্ ইহার মীমাংসা কে করিবে? এবং ইহা লইয়া এক গণ্ডগোল উপস্থিত হইতে পারে। শুনিলে প্রাণে বড় কষ্ট হয় যে কার্য্য নির্ব্বাহক সভার কোন কোন সভ্য 'ব্রাহ্মের উপাসনাশীল হওয়া চাই' একথার প্রতি তাচ্ছীল্য প্রকাশ করেন। ইংরাজি সভ্যতার অনুরোধে ব্রাহ্মসমাজকে আর হীন করা ভাল নহে। কার্য্য নির্ব্বাহক কি অধ্যক্ষ সভাকে কে উপাসনাশীল ও সচ্চরিত্র এবং সভ্য হওয়ার উপযুক্ত ইহার মীমাংসা করিতেই হইবে। সভ্য মনোনয়ন সম্বন্ধে নিয়মের শৈথিল্য বশতঃ সমাজের যে অনেক অনিষ্ট হইয়াছে ইহা বোধ করি অনেকেই স্বীকার করিবেন। অনেক শ্রদ্ধাস্পদ ব্রাহ্মের সহিত আমাদের এ সম্বন্ধে আলাপ হয়। তাঁহাদের সকলই প্রায় এক বাক্যে এ কথার সায় দেন, এবং উল্লিখিত নিয়ম বিধিবদ্ধ করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় মনে করেন।

আর প্রচারক নিয়োগ সম্বন্ধে একটী নিয়ম আমরা বিধিবদ্ধ করা আবশ্যক মনে করি। তাহা এই যে কোন বিশেষ কারণ ব্যতীত ত্রিংশৎবর্ষের ন্যূন বয়সে কেহ প্রচারকপদে নিযুক্ত হইতে পারিবেন না।

গয়া।
২৭এ নবেম্বর ১৮৮৭

বশম্বদ।
শ্রীচন্দ্র কুমার ঘোষ ও
শ্রীচন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

ক্রিয়াশীল ব্রহ্ম।

মহাশয়!

গত ১লা কার্ত্তিকের তত্ত্বকৌমুদীতে "ব্রহ্মের ক্রিয়াশীলতা" বিষয়ে আমার যে পত্র প্রকাশিত হয়, তাহার প্রতিবাদ করিয়া চক্রবেড়স্থ প্রার্থনা সমাজের উপাসক বাবু রামচরণ বন্দোপাধ্যায়ের স্বাক্ষরিত একখানি পত্র ১লা অগ্রহায়ণের তত্ত্বকৌমুদীতে মুদ্রিত হইয়াছে। তাঁহার ঐ পত্র সম্বন্ধে আমার দুই একটী কথা বলা আবশ্যক বিবেচনায় তাহা নিম্নে নিবেদন করিলাম।

প্রথম কথা এই যে, ব্রহ্ম যে চিরক্রিয়াশীল ইহার প্রমাণ যেমন ব্রাহ্ম ধর্ম্ম বিষয়ক পুস্তকে আছে, সেইরূপ প্রত্যেক ব্রাহ্মও তাহা বিশ্বাস করিয়া থাকেন। আমি আমার পত্রের মধ্যে কোনও স্থানে "নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম" অথবা উক্ত ভাব প্রকাশক কোনও শব্দ ব্যবহার করি নাই। তবে এই বলিয়াছি যে, 'তিনি যেমন জ্ঞান, প্রেম ও পবিত্রতাতে পরিপূর্ণ রহিয়াছেন, তেমনি তিনি যে "অনন্ত ক্রিয়াশীল" এই ভাবটী বিশেষ ভাবে আমাদের সাধন-প্রণালীর মধ্যে সাধিত হইতেছে না।' ইহাতে কি "নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম" বুঝাইতেছে? এ বিষয়ে একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে উক্ত পত্রের কথায় "নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম" বুঝাইতেছে না, কিন্তু "ব্রহ্ম যে ক্রিয়াশীল, তাহার সাধন হইতেছে না" ইহাই বুঝাইতেছে, সুতরাং রামচরণ বাবুর বিস্ময়ের ও তীব্র প্রতিবাদের কোন কারণ দেখা যাইতেছে না।

দ্বিতীয় কথা, আরাধনা প্রণালীর কয়েকটী শব্দ কেবল কয়েকটী শব্দ নহে তাহা ঈশ্বরের স্বরূপব্যঞ্জক। আরাধনাতে আমরা ঈশ্বরের স্বরূপের চিন্তা ও তাহা ব্যাখ্যা করিয়া থাকি। সুতরাং যে কোন প্রকারে হউক ঈশ্বরের স্বরূপ চিন্তা করিলেই তাহা আরাধনা হইবে। আরাধনা ও ঈশ্বরের স্বরূপ চিন্তা ইহা একই কথা।

রামচরণ বাবু শুনিয়া হয়ত সন্তুষ্ট হইবেন যে পত্রপ্রেরক জানেন যে ভাল করিয়া জ্ঞান প্রেমের সাধন হইতেছে না বলিয়াই ব্রাহ্মেরা কিছু অলস হইয়া পড়িয়াছেন সেই জন্যই পত্রপ্রেরকের অভিপ্রায় এই যে ব্রহ্মের ক্রিয়াশীলতার ভাব ব্রাহ্ম সাধারণের মনে বিশেষ রূপে জাগ্রত করিবার চেষ্টা করা হয়। ব্রহ্ম যে ক্রিয়াশীল এই ভাবটী যদি আমার মনে একবার জাগ্রত হয়, তাহা হইলে আমি কখনও অলস হইয়া থাকিতে পারিব না। কারণ আমার যিনি উপাস্য তিনি যখন ক্রিয়াশীল তখন আমি কি প্রকারে অলসভাবে নিশ্চিন্ত মনে থাকিতে পারিব? তাঁহাকে পাইতে হইলেই তাঁহার মত ক্রিয়াশীল হওয়া চাই। সুতরাং এই ক্রিয়াশীলতার ভাব মনে একবার জাগ্রত হইলেই তাহার সহিত জ্ঞান, প্রেম ও পবিত্রতার শিক্ষা অবশ্যম্ভাবিরূপে আসিবে। এই জন্যই বিশেষভাবে জ্ঞান, প্রেম ও পবিত্রতার সাধনের সহিত ক্রিয়াশীলতার সাধন যোগ করিতে প্রস্তাব করিয়াছিলাম।

প্রতিবাদক মহাশয় আমার পত্রের প্রতিবাদ করিতে গিয়া ব্রাহ্ম সাধারণকে অতি কঠোররূপে আক্রমণ করিয়াছেন

দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইয়াছি। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে এমন অনেক লোক আছেন, অন্ততঃ আমি এমন অনেককে জানি যাঁহাদের অধিকাংশই জ্ঞানী ও ভাল লোক। তাঁহাদের জ্ঞান ও ধর্ম্মপিপাসা দেখিয়া অনেক সময় আশ্চর্য্য হইয়া যাই। এমন কি তাঁহাদের সহবাসে থাকিয়া প্রাণে আশা হইতেছে যে, আমিও একসময়ে মানুষ হইতে পারিব। তবে রামচরণ বাবু মফঃস্বলে থাকেন, ব্রাহ্ম সাধারণের সহিত ভাল করিয়া মিশেন নাই বলিয়াই বোধ তাঁহার ঐরূপ ধারণা।

আর একটী কথা—কোন কোন শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মের ধারণা এই যে জ্ঞান বলিলেই ক্রিয়াশীলতা বুঝায়, এ ধারণা যৌক্তিক বলিয়া বোধ হয় না। কেননা "জ্ঞান" অর্থে জানা। জানা আর কাজ করা এক কথা নহে। আমি কোন বিষয় জানি ইহা বলিলেই কি কার্য্য বুঝাইতেছে? না, কার্য্য করিতে গেলে ইচ্ছাশক্তির পরিচালনা আবশ্যক। কার্য্য করিতে গেলে অবশ্য অগ্রে তাহা জানা চাই, কিন্তু জানিলেই যে কার্য্য করিতে হইবে তাহার কোন প্রমাণ নাই। সুতরাং জানা আর কাজ করা একই কথা নহে। অতএব জ্ঞান বলিলে ক্রিয়াশীলতা বুঝাইতেছে না। ইহা আর বেশী করিয়া বুঝাইবার আবশ্যকতা নাই। আমাদের দেশের মহাজ্ঞানী শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি মহাত্মারা জ্ঞানময় ব্রহ্ম স্বীকার করিয়াও তাঁহাকে নিষ্ক্রিয় বলিয়া গিয়াছেন। এখন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে জ্ঞানস্বরূপে ক্রিয়াশীলতার ভাব নাই, কিন্তু প্রেমস্বরূপে ক্রিয়াশীলতার ভাব রহিয়াছে। প্রেমস্বরূপ ব্যাখ্যা করিলেই ক্রিয়াশীলতার ভাব অবশ্যম্ভাবিরূপে আসিয়া পড়ে। আমার মতে এই ক্রিয়াশীলতার ভাব ব্রাহ্ম সাধারণের মনে বিশেষ ভাবে জাগ্রত করিয়া দিলে ভাল হয়। ইতি

কলিকাতা } নিবেদক,
১৫ই অগ্রহায়ণ। } শ্রীকুঞ্জবিহারী সেন।

সঙ্গত সভা।

৭ই অগ্রহায়ণ।

বিগত ৭ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার সঙ্গত সভার যে অধিবেশন হয় তাহাতে শ্রীযুক্ত আদিত্য কুমার চট্টোপাধ্যায় সংক্ষিপ্ত উপাসনা করেন। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী সভাপতি ছিলেন। গতবারের আলোচিত বিষয়টী গুরুতর বলিয়া তাহারই পুনরালোচনা হয়। আলোচনার সারাংশ নিম্নে দেওয়া গেল।

ক। অগ্রে উপলব্ধি করিয়া তাহার পর আরাধনা ও প্রার্থনাসূচক বাক্য উচ্চারণ করা যাইতে পারে, আবার বিশ্বাস হইতেও উহা করা যাইতে পারে। যেমন কোন অন্ধ ব্যক্তি আমার সহিত কথা কহিবার সময় আমাকে দেখিতে না পাইলেও আমার নিকট বর্ত্তমানতাতে তাহার যে বিশ্বাস আছে তাহার বশবর্ত্তী হইয়া আমাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কথা কহিতে পারে, সেইরূপ আমরা ঈশ্বরকে ঠিক্ সাক্ষাৎ ভাবে উপলব্ধি না করিতে পারিলেও তাঁহার অস্তিত্ব ও স্বরূপে আমাদের যে বিশ্বাস আছে সেই বিশ্বাসের ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক আমাদের যাহা বক্তব্য তাহা বলিতে পারি। এরূপ করাতে কোন অপরাধ হয় বলিয়া মনে হয় না। বিশ্বাসের সহিত যে আরাধনা বা প্রার্থনা করা যায় তাহা বিফল হয় না। হিন্দু ধর্ম্মের সাধন প্রণালীতে ধ্যানের ভাব, উপলব্ধির ভাব অধিক। আমরা হিন্দু ভাবাপন্ন বলিয়াই উপলব্ধি ব্যতীত যে উপাসনা তাহাকে উপাসনাই মনে করি না। অপর দিকে খৃষ্ট শিষ্যগণের বিশ্বাসের ভাব অনুরূপ। আমাদের তাহা নাই। তবে ইচ্ছাপূর্ব্বক নিজের ভাবের বিপরীত কথা বলিলে যে অপরাধ হয় তাহাতে সন্দেহ নাই।

খ। উপলব্ধি একটা স্থায়ী জিনিস নহে। ইহার উন্নতি আছে। এমন একটী অবস্থা নাই যাহাকে পূর্ণ উপলব্ধির অবস্থা বলা যাইতে পারে। উপলব্ধির উজ্জ্বলতা ক্রমেই বাড়িবে। এতদ্ভিন্ন সমস্ত স্বরূপ সকল সময় সমান উজ্জ্বল ভাবে উপলব্ধি করা যায় না। সুতরাং ঠিক্ কিরূপ উপলব্ধি হইলে আরাধনার শব্দ উচ্চারণ করা যাইতে পারে, আর কোন্ অবস্থায় তাহা পারা যায় না, তাহা ঠিক্ করিয়া নির্দ্দেশ করা সম্ভব নহে।

গ। ভাব ও উপলব্ধি কি এক পদার্থ? ভাব আমাদের ইচ্ছার অধীন নহে। উপলব্ধির চেষ্টা ভিন্ন আমাদের উপায়ান্তর নাই। আমার বোধ হয় একটী কথা বলিয়া চুপ করিয়া উপলব্ধির চেষ্টা করা ভাল। অনেক কথা বলিয়া ভাব উৎপাদনের চেষ্টা করা ভাল নহে। শব্দের এমন একটা প্রভাব আছে যে তাহা অনেক সময় ভাব উৎপাদন করিতে পারে। কিন্তু সেরূপ ভাব ঠিক্ নহে।

ঘ। যেস্থলে একজন ক্রমাগত অনেকক্ষণ ধরিয়া একটী স্বরূপের নানাদিক্ উপলব্ধি করিতেছেন, সেস্থলে তাঁহার পক্ষে উক্ত স্বরূপের ব্যাখ্যা এক কথায় শেষ করা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না।

গ। শুদ্ধ ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করিলেই আমার বিবেচনায় সত্যস্বরূপ উপলব্ধি করা হইল। সুতরাং উহা অনুভব করিতে পারিলে, আমি অন্য কথা বলিবার আবশ্যকতা বোধ করি না।

ঘ। কোন বিষয়ের প্রকৃত ভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে অন্য বিষয়ের সহিত তাহার সকল প্রকার সম্বন্ধ হৃদয়ঙ্গম করা চাই। নতুবা তাহাকে উপলব্ধি বলা যায় না।

ঙ। যিনি সত্যস্বরূপের মধ্যে অস্তিত্ব ভিন্ন আরও গভীর ভাব দেখিতে পান, তাঁহার পক্ষে শুদ্ধ অস্তিত্ব অনুভব করিবার জন্য একটী কথা বলিয়া চুপ করিয়া থাকা সম্ভব নহে।

চ। আরাধনা সম্বন্ধে যে অপরাধের কথা বলা হইতেছে, প্রার্থনা সম্বন্ধেও ত তাহা খাটে। তবে যিনি আরাধনার বেলা ভাবহীন কথা কহা অন্যায় মনে করেন, তিনি প্রার্থনা করা অপেক্ষাকৃত সহজ মনে করিবেন কিরূপে? সে যাউক, মনে করুন আমরা ঈশ্বরের দয়া উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছি।

এ অবস্থায় যদি কেহ ভিন্ন ভিন্ন ঘটনার ভিতর ঈশ্বরের দয়া অনুভব করিয়া তাহা বাক্য দ্বারা প্রকাশ করেন তবে তাহাতে অপরাধ কি? আর ইহা ভিন্ন উপলব্ধির অন্য উপায়ই বা কি হইতে পারে? যে সকল বিষয়ের ভিতর দিয়া আমরা ঈশ্বরের দয়া সম্ভোগ করিতেছি তাহা ছাড়িয়া স্বতন্ত্র ভাবে দয়া উপলব্ধি করা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? সরল চেষ্টায় অপরাধ হয় বলিয়া ত মনে হয় না। তবে দুই স্থলে অপরাধ হইতে পারে;—(১) যদি বিশ্বাসের বিপরীত কথা বলা হয়; (২) যদি ঈশ্বরকে ছাড়িয়া কেবল মানুষকে শুনাইবার উদ্দেশে কথা বলা হয়। উপলব্ধির যখন তারতম্য আছে, তখন শুদ্ধ উপলব্ধি আশানুরূপ গাঢ় হইতেছে না বলিয়া যে আমার পক্ষে আরাধনার বাক্য উচ্চারণ করা অপরাধ, এরূপ বলা যায় না।

গ। আমার বিবেচনায় সাক্ষাৎ ভাবে কথা বলিতে না পারিলে 'তুমি' না বলিয়া 'তিনি' বলাই শ্রেয়ঃ।

চ। একজনের সহিত কথা কহিবার সময় তাঁহাকে না দেখিয়াও 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করা যাইতে পারে। চৈতন্যদেব ঈশ্বর-বিরহের অবস্থাতেও তাঁহার ইষ্ট দেবতাকে 'কোথা গেলিরে' বলিয়া মধ্যম পুরুষে সম্বোধন করিতেন।

গ। আমার বোধ হয় আমরা অনেক সময় শুদ্ধ অভ্যাস বশতঃ 'তুমি' বলিয়া থাকি।

ঘ। যিনি প্রকৃত ভাবে উপাসনা করিতে চান, তিনি 'তুমি' বলুন আর 'তিনি' বলুন, সত্যস্বরূপের ভাব তাঁহার থাকিবেই।

ঙ। ঈশ্বর বর্ত্তমান থাকিয়া আমার কথা শুনিতেছেন, এ বিশ্বাস না থাকিলে উপাসনাই হয় না। এবং এ বিশ্বাস থাকিলে তাঁহাকে সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি না করিয়াও 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করা যাইতে পারে। মা যদি সন্তানের উপর নিজের অসন্তুষ্টি জানাইবার জন্য তাহাকে বাহিরে রাখিয়া গৃহের দ্বার বন্ধ করেন, তবে সন্তান কি তাঁহাকে 'তুমি দ্বার খোল' না বলিয়া 'তিনি দ্বার খুলুন' বলে?

চ। ইহা সত্য যে কতকগুলি কথা আমাদের এরূপ অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহার গভীরতা উপলব্ধি করিবার পূর্ব্বেই সেই সকল কথা আমাদের মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়ে। যাহাতে এরূপ না ঘটে এবং যাহাতে অন্ততঃ ঠিক বিশ্বাসের সহিত কথা বলিতে পারা যায়, সে সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

১৪ই অগ্রহায়ণ।

এই অধিবেশনে অতি অল্পসংখ্যক সভ্য উপস্থিত ছিলেন, এবং সাধারণের উপকারে আসিতে পারে, এমন কোন বিষয়ের আলোচনা হয় নাই।

প্রাপ্তি স্বীকার ও সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

অঞ্জলী;—আমরা ইতিপূর্ব্বেই এই পুস্তকের প্রাপ্তি স্বীকার করিয়াছি। গ্রন্থকারের এই প্রথম উদ্যম; সুতরাং বিজ্ঞ পাঠকগণ যে ইহার স্থানে স্থানে দোষ দেখিতে পাইবেন না, এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু তাঁহারা ইহার অনেক স্থানে যে সুন্দর ভাব ও কবিত্বের উচ্ছ্বাসও দেখিতে পাইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। গ্রন্থখানির একটু বিশেষত্ব আছে। ইহার অধিকাংশস্থলই উচ্চ ধর্ম্মভাব ও গভীর ঈশ্বর প্রীতির পরিচায়ক। গ্রন্থকার চেষ্টা করিলে কালে সুকবি হইতে পারিবেন, এরূপ আশা করা যায়।

বাল্যজীবন প্রথম ভাগ;—ইহাতে সংক্ষেপে ধ্রুব, প্রহ্লাদ, যুধিষ্ঠির, বুদ্ধদেব, খ্রীষ্ট, মহম্মদ, লুথার, নানক, চৈতন্য, রাজা রামমোহন রায়, থিওডোর পার্কার ও বাবু কেশবচন্দ্র সেনের বাল্যজীবনের চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। বালকদিগকে শিক্ষা দেওয়াই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। কিন্তু বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিগণও ইহা পাঠ করিয়া যথেষ্ট উপকার লাভ করিতে পারিবেন। গ্রন্থখানি বেশ সুপাঠ্য হইয়াছে।

হরি সঙ্কীর্ত্তন;—ইহাতে অনেকগুলি সুন্দর ভাবপূর্ণ কীর্ত্তন আছে। আমরা ইহার যত দূর দেখিয়াছি, তাহার মধ্যে কোনরূপ পৌত্তলিক ভাব বা কুসংস্কারের সংস্রব নাই। এই কীর্ত্তন সকল ব্রাহ্মসমাজে অনায়াসে ব্যবহৃত হইতে পারে। গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কণাদি আর একটু পরিষ্কার হইলে ভাল হইত।

উপাসনাই ধর্ম্মের প্রাণ;—এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা অত্যন্ত তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। উপাসনা যাহাতে জীবনে সাধিত হয়, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা হওয়া আবশ্যক। ইহার উপর যে আমাদের সমস্ত ধর্ম্মজীবন নির্ভর করিতেছে, তৎপক্ষে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

ইতিমধ্যে আমরা আরও দুই একখানি পুস্তক সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত হইয়াছি। বারান্তরে তাহার সমালোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

১লা কার্ত্তিক হইতে আমাদের প্রেরিতপত্রের স্তম্ভে ব্রহ্মের ক্রিয়াশীলতা সম্বন্ধে বাদানুবাদ চলিতেছে। আমাদের বিবেচনায় ব্রহ্মস্বরূপের এই ভাবটী অন্যান্য স্বরূপের মধ্যে নিহিত আছে। অনন্ত প্রেম ও অনন্তশক্তির সঙ্গে অনন্ত ক্রিয়াশীলতার যোগ অবিচ্ছেদ্য। আমাদের বোধ হয় 'সত্যং জ্ঞানং' ইত্যাদির সঙ্গে 'নিরলসং' বা তৎসদৃশ অন্য কোনও কথা যোগ করিবার আবশ্যকতা নাই। তবে আরাধনা সাধনের সময় যাহাতে আমাদের এই ভাবটীর প্রতি দৃষ্টি থাকে, তাহার জন্য উপায় গ্রহণ করা বিশেষ কর্ত্তব্য। এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বাবু রামচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অযৌক্তিক নহে। কিন্তু শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জবিহারী সেনের যুক্তির প্রতিবাদ করিতে গিয়া তিনি ব্রাহ্মসাধারণকে যে ভাবে আক্রমণ করিয়াছেন, তাহা একটু অপ্রাসঙ্গিক ও অতিরিক্ত পরিমাণে তীব্র হইয়াছে। তিনি কুঞ্জবাবুর যুক্তির উত্তর দিয়া নিরস্ত থাকিলেই ভাল হইত।' ব্রাহ্মগণ যে আশানুরূপ সাধনশীল হইতে পারেন নাই, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া ব্রাহ্ম সমাজে যে 'জ্ঞানী', 'প্রেমিক' ও 'পবিত্র হৃদয়' লোকের সংখ্যা

নিতান্ত বিরল এমন কথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। আমরা যে ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ হইতে অনেক দূরে পড়িয়া আছি, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু আমরা যে একেবারে 'অপবিত্রতায় ডুবিতেছি,' ব্রাহ্মের জীবনে যে একেবারে 'প্রেম নাই', 'উদারতা নাই', ব্রাহ্মের জীবন যে একেবারে 'ভীষণ মরুস্থলী' ও 'নিরীশ্বর' এ কথা বলিলে ব্রাহ্ম সমাজের প্রকৃত অবস্থা যথার্থভাবে বর্ণনা করা হয় না, এবং প্রকৃত ঘটনাকে নিতান্ত অতিরঞ্জিতভাবে চিত্রিত করা হয়।

আমরা অনেক দিন হইতে বলিয়া আসিতেছি যে ব্রাহ্ম সাধারণের বর্ত্তমান আধ্যাত্মিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় এবং তাহা দূর করিবার জন্য বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা আবশ্যক। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে এমন অনেক লোক দেখিতে পাওয়া যায় যাঁহারা আমাদের এ কথা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা বলেন, 'ব্রাহ্মসমাজের এমন বিশেষ কি অবনতি হইয়াছে যাহার জন্য ক্রমাগত এই বিষয় লইয়া আলোচনা করা যাইতেছে?' আমরা বলি অবনতির বাকি কি আছে? আমরা ব্রহ্মোপাসক বলিয়া পরিচয় দিয়া বেড়াইতেছি, অথচ সমস্ত দিনে একবারও ভাল করিয়া উপাসনা করিতে পারি না। সংসার পূজায় দিন সুন্দররূপে কাটিয়া যাইতেছে, ঈশ্বর অভাবে আমাদের ভোগের ত্রুটি কি হইতেছে? আমরা গৃহশূন্য ছিলাম, গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছি, নিঃস্ব ছিলাম অর্থ সংগ্রহ করিয়াছি, কিন্তু যে গৃহে চিরকাল থাকিতে হইবে, তাহার ভিত্তি এখন পর্য্যন্ত আরম্ভও হয় নাই; যাহা চিরদিনের সম্বল, তাহা হইতে আমরা এখনও অনেক দূরে রহিয়াছি। ব্রাহ্মসমাজের সাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থা আমাদের অবনতির এক অকাট্য প্রমাণ। ভক্তিভাজন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যাখান, স্বর্গীয় মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের আত্মনিবেদন ইত্যাদি গ্রন্থের ন্যায় একখানি পুস্তকও আমাদের সমাজ হইতে অদ্যাপি বাহির হইল না। প্রকৃত পিপাসু ও ঈশ্বরানুরাগী লোক যাহাতে বিশেষরূপে উপকৃত হইতে পারেন, এমন ধর্ম্মভাবপূর্ণ পুস্তক আমরা কয়খানা বাহির করিয়াছি? আর একটী প্রমাণ, আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের হীনত্ব। পাঁচ জন ব্রাহ্ম একত্রে মিলিত হইলে, ঈশ্বর প্রসঙ্গ না হইয়া সাংসারিক বা সামাজিক কথা হইয়া থাকে। ব্রাহ্ম বলিতে লোকে আগে সচ্চরিত্র, সত্যপরায়ণ সাধু বুঝিত, এখন তাহার বিপরীত বুঝিয়া থাকে। তৃতীয় প্রমাণ, আমাদের প্রচারের আশানুরূপ কার্য্যকারিতার অভাব। আমাদের সমাজ হওয়া অবধি কয়জন লোক প্রকৃতভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মের শরণাপন্ন হইয়াছে? তবুও কি আমরা বলিব, "আমাদের কি হইয়াছে, যে আমাদের বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে?" আমরা যে ঐ কথা বলি, উহাই আমাদের হীনতার প্রমাণ। জীবন্ত সাধক কখনই, আপন অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকেন না। তিনি সর্ব্বদাই আদর্শ হইতে আদর্শান্তরে ভ্রমণ করে, পুরাতন আদর্শ লইয়া চিরকাল দিনাতিপাত করেন না।

আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে আমাদের যে অবনতি হইয়াছে তাহার সর্ব্ব প্রধান প্রমাণ এই যে আমাদের পরস্পরের মধ্যে কোনও প্রকার আধ্যাত্মিক বন্ধন নাই বলিলেই হয়। ব্রাহ্মে ব্রাহ্মে, উপাসকমণ্ডলী ও আচার্য্যে, এমন কি আমাদের প্রচারকে প্রচারকে বিশেষ কোনও প্রকার আধ্যাত্মিক বন্ধন আছে বলিয়া বোধ হয় না। আমাদের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ একটী সাধক দল অদ্যাপি দৃষ্ট হইল না। কেবল মূল সত্যে মিল হইলেই কি ধর্ম্ম পরিবার সংগঠিত হয়? এক সময় ব্রাহ্মসমাজে একদল লোকের ভিতর এমন উচ্চ আধ্যাত্মিকতার ভাব ছিল, বিশ্বাস, ঈশ্বরানুরাগ ও সাধন ভজনের ভাব এমন প্রবল ছিল যে, তখন যিনি ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিতেন তিনিই ধর্ম্মজীবনে অগ্রসর হইবার আবশ্যকতা, সাধন ভজনের আবশ্যকতা বিশেষরূপে অনুভব করিতেন। যাঁহারা সাধন ভজন বিহীন তাঁহারা আপনাদিগকে ব্রাহ্মনামে অভিহিত করিতেই সঙ্কোচ বোধ করিতেন। কিন্তু বর্ত্তমানে আমাদের মধ্যে সেরূপ ভাব কোথায়? এখন মোটের উপর সচ্চরিত্র হইলে এবং কতকগুলি মূল সত্যে বিশ্বাস করিলেই যথেষ্ট হইল। ব্রাহ্মসমাজে থাকিতে হইলে আর কিছু করা যে আবশ্যক, ধর্ম্মজীবনে উন্নতি বলিয়া যে একটা জিনিস আছে, প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রাহ্ম হইতে হইলে যে বিশ্বাসী ও ঈশ্বরানুরাগী হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয় এবং তাহার জন্য পরিশ্রম করা নিতান্ত আবশ্যক, এ কথা অনেকের মনেই হয় না এবং তেমন উচ্চ আধ্যাত্মিকতার দৃষ্টান্ত বর্ত্তমানে ব্রাহ্ম সমাজের অতি অল্প লোকের জীবনেই দৃষ্ট হয়। আমাদের মধ্যে সে জন্য তেমন সমবেত চেষ্টাও নাই। এ অবস্থায় আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজের অবনতি হয় নাই এরূপ কথা যিনি বলিতে ইচ্ছা করেন বলুন, আমরা কিন্তু তাঁহার কথায় সায় দিতে পারি না।

সংবাদ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ অধিবেশন;—গত ১৫ই সেপ্টেম্বর শনিবার, অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় সিটি-কলেজ ভবনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের এক বিশেষ অধিবেশন হয়। আবশ্যক সংখ্যক সভ্য উপস্থিত না থাকাতে উক্ত দিবস সভার কার্য্য স্থগিত থাকে এবং ১৭ই অক্টোবর সোমবার অপরাহ্ন ৪ ঘটিকার সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনালয়ে উহার পুনরধিবেশন হইবে বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়। তদনুসারে উক্ত দিবস বেলা প্রায় ৪টার সময় নির্দ্দিষ্ট স্থানে ঐ স্থগিত সভার অধিবেশন হয়।

বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে ও বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়ের অনুমোদনে বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সহকারী সম্পাদক অধ্যক্ষ সভার নামে অধ্যক্ষ সভার সভ্য নির্ব্বাচনের অবান্তর নিয়মাবলী (যাহা ইতিপূর্ব্বে তত্ত্ব-

কৌমুদীতে প্রকাশিত হইয়াছিল) সভ্যগণের গোচরার্থ উপস্থিত করিলেন।

বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্তাব করিলেন যে, তৃতীয় নিয়মে, "আবশ্যক হইলে......সভ্যের নাম" ইহার স্থলে "৫০ জনের অপূর্ণ সংখ্যক সভ্যের নাম" এইরূপ পরিবর্তন করা হয়। বাবু কুঞ্জবিহারী সেন ইহার অনুমোদন করেন। কিন্তু এই পরিবর্তিত প্রস্তাব সভায় গ্রাহ্য হইল না।

বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্তাব করেন যে তৃতীয় নিয়মে "তিন" এই শব্দের পরিবর্তে "ছয়", ৪র্থ নিয়মে "দুই" এই শব্দের পরিবর্তে "চারি" এবং ৫ম নিয়মে "পাঁচ সপ্তাহ" এই কথাগুলির পরিবর্তে "আড়াই মাস" করা হউক। বাবু শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী এই প্রস্তাবের অনুমোদন করেন। অধিকাংশের অসম্মতিতে প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়।

অতঃপর বাবু সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রস্তাব করেন যে সমস্ত নিয়মগুলিই গৃহীত হউক। বাবু শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী এই প্রস্তাবের অনুমোদন করেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব ধার্য্য হইল।

তাহার পর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কলিকাতাস্থ উপাসক মণ্ডলীর সহকারী সম্পাদক উক্ত মণ্ডলী সংক্রান্ত নিয়মাবলীর ৫ম নিয়মের যে পরিবর্তন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিচার ও অনুমোদনার্থ পাঠাইয়াছিলেন, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক কর্ত্তৃক তাহা পঠিত ও সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হইল। উক্ত পরিবর্ত্তিত নিয়মটী এই ;—

"এখন হইতে কাহাকেও উপাসকমণ্ডলীর সভ্যরূপে গ্রহণ করিতে হইলে তাঁহার নাম কার্য্যনির্ব্বাহক সভায় প্রস্তাবিত ও অনুমোদিত হইবার ন্যূনকল্পে একমাস পরে তিনি উপাসকমণ্ডলীর সভ্যরূপে গণ্য হইতে পারিবেন।"

অধ্যক্ষ সভা ;—স্থানাভাববশতঃ আমরা এবার অধ্যক্ষ সভার তৃতীয় ত্রৈমাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ প্রকাশ করিতে পারিলাম না। উহা আগামীবারে প্রকাশিত হইবে।

ব্রাহ্মবন্ধু সভা ;—গত ১৭ই নবেম্বর বৃহস্পতিবার অপরাহ্ন ৭॥ ঘটিকার সময় ১৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ভবনে ব্রাহ্মবন্ধু সভার এক অধিবেশন হয়। তাহাতে ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা হয়। শ্রীযুক্ত গুরুচরণ মহলানবিশ মহাশয় সভাপতি ছিলেন। শ্রীযুক্ত আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা করেন। তিনি কেবল ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিক অবস্থার কথাই বলিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, বাহিরে দেখিতে আমাদের কার্য্যাদি বেশ সুন্দররূপে চলিতেছে বটে, কিন্তু প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা হইতে আমরা দূরে পড়িতেছি। প্রকৃত বিশ্বাস, ঈশ্বরানুরাগ, উপাসনাশীলতা প্রভৃতি বিষয়ে আমরা ক্রমে অবনত হইয়া পড়িতেছি। ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে ব্রাহ্মধর্ম্মের যে উচ্চ আদর্শ তাহা আমরা ক্রমে খর্ব্ব করিয়া ফেলিতেছি। আমরা বাহিরের আড়ম্বর লইয়াই ব্যস্ত, ঈশ্বরদর্শন, তাঁহার সহিত আত্মার প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন, হৃদয়ে তাঁহার বাণী শ্রবণ এ সকল বিষয়ের জন্য আমাদের কোন প্রকার চেষ্টা নাই। আমাদের পরস্পরের মধ্যে কোন প্রকার আধ্যাত্মিক বন্ধন নাই। এই দুরবস্থা দূর করিবার একমাত্র উপায় ব্রাহ্মধর্ম্মের পূর্ণাঙ্গ উপাসনাপ্রণালী জীবনে গাঢ়ভাবে সাধন করিতে চেষ্টা করা। আধ্যাত্মিকতাই ধর্ম্মসমাজের প্রাণ। আমরা যদি সাধনাদিদ্বারা সেই আধ্যাত্মিকতা লাভ করিতে চেষ্টা না করি, তবে অচিরে ব্রাহ্মসমাজ একটী জীবনহীন সম্প্রদায়ে পরিণত হইবে। ইহা দ্বারা জগতের কিছুমাত্র উপকার হইবে না। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, বাবু নবীনচন্দ্র রায়, বাবু চণ্ডীকিশোর কুশারী, বাবু কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়, বাবু মোহিনীমোহন রায়, বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায় ও বাবু রজনীনাথ রায় আলোচনায় যোগ দিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই প্রথম বক্তার কথার সমর্থন করেন।

সায়ংসমিতি ;—২১এ নবেম্বর সোমবার ব্রাহ্মবন্ধু সভার সম্পাদক বাবু রজনীনাথ রায়ের বিশেষ উদ্যোগে উক্ত সভার গৃহে ব্রাহ্মদিগের একটী সায়ংসমিতি হয়। সমিতিতে নিমন্ত্রিত পুরুষ ও মহিলাগণের চিত্তবিনোদনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছিল। ইহার জন্য রজনীবাবু আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

তত্ত্বকৌমুদীর মূল্য প্রাপ্তি

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বাবু বিহারীলাল রায় চৌধুরী	বরিশাল	৩
„ গোবিন্দচন্দ্র মজুমদার	কলিকাতা	১
„ ফণীন্দ্রমোহন বসু	ঐ	২॥০
„ ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়	ঐ	১
„ দুর্গাকুমার বসু	শ্রীহট্ট	৩
„ দুর্গাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়	কলিকাতা	১॥০
„ শিবচন্দ্র দেব	কোন্নগর	৩
„ ভগবতীচরণ দাস	ভবানীপুর	২॥০
„ সারদাপ্রসাদ দত্ত	চন্দননগর	১॥০
„ রসিকলাল দাস	ধার	৬
„ হরিদাস মল্লিক	খাগড়া	৩
„ শশিভূষণ বিশ্বাস	কলিকাতা	২॥০
„ দেবনারায়ণ ঘোষ	ঐ	১॥০
„ ব্রজমোহন চট্টোপাধ্যায়	ঐ	১
„ যশোদালাল সাহা	ঐ	২৸০
„ নন্দকুমার চৌধুরী	ঐ	॥৵০
শ্রীমতী জগত্তারিণী মৈত্র	ঐ	২॥০
বাবু গোকুলচন্দ্র দত্ত	কালিহাটী	৬
„ অভয়াচরণ বিশ্বাস	শ্রীহট্ট	৩
„ রাধাগোবিন্দ সাহা	কলিকাতা	১০
„ বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ	৪
সম্পাদক চক্রবেড়ে ব্রাহ্মসমাজ		১
বাবু বনওয়ারিচন্দ্র চৌধুরী	কাকিনিয়া	৮
„ মতিরাম মাইতি	কাঁথি	২॥০
„ প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়	আকাএব	৩
শ্রীমতী মনোরমা কাননগো	মৃজানগর	১।৵০
শ্রীযুক্ত বজরংবিহারী লাল	মোজাফারপুর	৩

১৩ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিসন্ প্রেসে শ্রীকার্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা ২১এ অগ্রহায়ণ মুদ্রিত ও ২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১০ম ভাগ।
১৭শ সংখ্যা।

১লা পৌষ বৃহস্পতিবার, ১৮০৯ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৮।

বাৎসরিক অগ্রিমমূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

পূজার আয়োজন।

মম আঁখি রাখ তব আঁখি 'পর
ভীষণ প্রান্তর সম এ সংসার,
একেলা যাইতে বড় ভয় পাই,
তুমি যদি নিয়ে চল তবে যাই,
বিপদ হইতে পাই গো নিস্তার;
এ দিক ও দিক দিওনা চাহিতে,
রাখ আঁখি স্থির তব আঁখি 'পর;—
এ ভুবন মাঝে অতুল সুন্দর
তব আঁখি সম আছে কি দেখিতে।
আসে আসুক না বিঘ্ন ঘোরতর,
বহে বহুক না ঝটিকা প্রবল;
চাহিনি তোমার আমার সম্বল
তুমি কভু নাথ! হ'ওনা অন্তর।
মানিব না মানা তব বাণী শুনি',
গণিব না কাঁটা, পথমাঝে দলি'
তব নাম গান করি' যাব চলি'
যথা সুখে বাস করে যোগী মুনি।

তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছ, আমি আমার প্রতিজ্ঞা কেন রক্ষা করিতে পারি না? তুমি বলিয়াছিলে যে আমাকে সুখী করিবে। সুখের যে আভাস তুমি প্রদর্শন করিয়াছ, তাহাতেই তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা হইয়াছে। তোমার দিকে তাকাইয়া, তোমার কাছে বসিয়া আমি যে সুখ পাই, তার কাছে ইন্দ্রত্ব পদ তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু আমি যে বলিয়াছিলাম ভাল হইব, সে প্রতিজ্ঞা কৈ রক্ষা করিতে পারিতেছি? তোমার কাছে জীবন দেখাইতে হইলে মুখ শুকাইয়া যায়। সুবিধা নাই, সুযোগ নাই বলিয়া পাপ করি না; কিন্তু যদি সুযোগ পাই, তবে যে পাপ করিব না কে বলিল? পাপের সম্ভাবনা যতদিন না বন্ধ হয়, ততদিন কেমন করিয়া বলিব ভাল হইয়াছি? পুণ্যের প্রতি আমার প্রেম কোথায়? তোমার কথা শুনিতে ও কথা শুনিয়া তাহা পালন করিতে আমার আগ্রহ কোথায়? হে সত্যব্রত! আপন প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া আপন সত্যপরতার দিবানিশি পরিচয় দিতেছ, তোমার দুঃখী পুত্র কি সত্যভঙ্গ করিয়া পতিত হইবে? তুমি ব্রত যদি পালন না করাও, তবে কে ব্রত পালন করিতে পারে? তুমি যেমন নিষ্ঠার সহিত তোমার কথা রাখিতেছ, তেমনি নিষ্ঠার সহিত আমাকে আমার কথা রাখিতে সমর্থ কর।

গভীর শান্তির মধ্যে তুমি বাস কর। গভীর অশান্তির অগ্নিতে আমি দগ্ধ হইতেছি। তোমার উপর নির্ভর নাই বলিয়া আমার এই দুর্দ্দশা। তোমার মত যার পিতা, তার আর ভাবনা কি? কিন্তু তোমাকে পিতা বলিয়া ডাকিয়াও আমার ভাবনা দূর হইতেছে না। কেবলই কি হবে, এই চিন্তা লইয়া আমি ব্যস্ত; আমার কল্পনা লইয়া অনুক্ষণই আকাশে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতেছি। ছেলের এত চিন্তা এত দুর্ভাবনা কেন? যে ভাল ছেলে হয়, সে বাপের দিকে কেবল চাহিয়া থাকে। বাপই তাহার ভবিষ্যৎ, বাপই তার ভাল মন্দ চিন্তা করেন। আমি আজও ভাল ছেলে হইতে পারি-নাই। যদি পারিতাম, তাহা হইলে তোমার অননুমোদিত একটী চিন্তাকেও মনে স্থান দিতাম না। ফলের কথা ভাবিবার তো আমার অধিকার নাই। শাস্ত্রে বলিয়াছে যে, কর্ম্মফল কামনারহিত হইয়া কার্য্য করিতে হয়। আমি তো দেখিতেছি, আমি প্রত্যেক কর্ম্মে পূর্ণভাবে কর্ম্মফল কামনা করি। ভক্তগণ যেমন করিয়া তোমার দিকে চাহিয়া থাকেন, যেমন করিয়া তোমার উপর নির্ভর করেন, তেমনি করিয়া আমাকে তোমার পানে চাহিতে, তেমনই করিয়া আমাকে তোমার উপর নির্ভর করিতে শিখাও।

নিজের অসৎ জীবনে যখন তোমার পবিত্র লীলা লহরী দেখিতে পাই, তখন মুগ্ধ হই, তখন প্রাণের মর্ম্মস্থানে শান্তির শীতলতা অনুভব করি। অভক্ত, হীন জীবনে এত করুণা, না জানি ভক্তজীবনে কি মধুর লীলা করিয়া থাক! প্রভু! তুমি আমার জন্য না করিয়াছ কি? তোমার অভাবে যে এখন কষ্ট হয়, একি সামান্য সৌভাগ্য? বিষয়ের কীট হইয়াও তোমার আলোকের অভাব বুঝিতে পারি। সম্মিলনের আশা করিতে সঙ্কোচ বোধ করি, কিন্তু তোমার জন্য আমি যে কাঁদিতে পারি, ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। ক্ষুদ্রজীব আমি, আমি তোমার

অনির্ব্বচনীয় করুণার বিনিময়ে কি দিব? আমার সাধুতা নাই, সাধুতা কিরূপে দিব? নয়নের অশ্রু তোমার দান, তোমার ধন তোমাকে কিরূপে দিব? দীন দুর্ব্বল আমি, ভাল করিয়া যে তোমার সেবা করি, সে শক্তিও আমার নাই। তোমার কাজ করিতে করিতে পদে পদে আপন অযোগ্যতা অনুভব করি। তোমার দয়ার বিনিময়ে আমার দিবার কিছু নাই। আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমার দ্বারে দিন রাত ভিক্ষা করিয়াই জীবন ধারণ করি। আরও দাও, আরও দাও, খুব দাও। স্বর্গীয় দাতা! দেওয়াই তোমার স্বভাব, ভিক্ষুক আমি, ভিক্ষাই আমার উপজীবিকা। দানের উপর দানে আমাকে ছাইয়া ফেল, আমি তোমার দানসাগরে ডুবিয়া যাই। তোমার দত্ত দান সমুদ্রের এক কণাও কি ধরিয়া রাখিতে পারিব না? এক কণা যদি রাখিতে পারি, তাহা হইলেই বাঁচিয়া যাইব।

স্থানে তুমি কাছে আছ, উপলব্ধি করিয়া তৃপ্ত হয় না তুমি তো জড় নও যে বাহিরের হাত দিয়া তোমাকে ধরিয়া ফেলিব। আত্মরূপী প্রভু কি ভাবে স্থানকে ব্যাপিয়া আছ, তুমিই বলিতে পার। আমি তোমাকে আত্মাতে উপলব্ধি করিতে চাই। আমি আত্মাতে তোমার নৈকট্য অনুভব করিবার আকাঙ্ক্ষা রাখি। দেখিতেছি, সে নৈকট্য অনুভব করা সহজ ব্যাপার নহে। তোমার মনের মতন না হলে তোমার নিকট আসিতে পারা যায় না, তোমারি অমনোমত কাজ করিয়া তোমার সঙ্গে সম্বন্ধস্থাপন করিতে পারা যায় না। শত দুর্ব্বলতায় পূর্ণ, সহস্র দোষের আধার এ হীন মন কি কখন তোমার নিকটবর্ত্তী হইতে পারে? তুমি বল হইতে পারিবে, তাই আশা হয়, নিজের দিকে চাহিয়া ত তিল মাত্র আশা হয় না। আজিও প্রলোভনে যখন মন চঞ্চল হয়, আজিও যখন পাপকে ভয় করি, তখন আর কেমন করিয়া বলিব যে তোমার নিকট-বর্ত্তী হইতে পারিয়াছি? বিন্দুমাত্র শৈথিল্য আসিলে তোমার মুখের জ্যোতি তুমি আমার প্রাণ হইতে অপসৃত কর। মানুষ দেবতার কাছে যাবে, এ কি সহজ কথা? প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক কার্য্য বিশুদ্ধ না হইলে কি তোমার দিকে অগ্রসর হওয়া যায়? উপাসনার সময় আরাধনার ফল কি, যদি কাজের সময় জন ধন, মান ও সংসারের আরাধনা করে? ভিতর বাহির যখন তোমাতে পূর্ণ হইবে, তখনই তোমার প্রকৃত নৈকট্য প্রাণে প্রকাশ পাইবে। প্রভু! প্রাণের আমূল শুদ্ধ করিয়া দাও, তোমার নিকটে থাকা ভিন্ন অন্যের নিকটে থাকিবার আমার প্রয়োজন কি?

অনেক দিন হইতে তোমার কথা না শুনিয়া কর্ণ বধির হইয়া গিয়াছে, তোমার কথা শুনা সম্বন্ধে কতক পরিমাণে অবিশ্বাস আসিয়া পড়িয়াছে। মনে করিয়াছিলাম তোমার কথা নাই শুনিলাম, বুদ্ধিগত সংস্কার বলে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিব তাহাই তোমার আদেশ বলিয়া মানিব। কিন্তু এখন দেখিতেছি যে ঠিক্ তোমার কথা বলিয়া কর্ত্তব্য পালন না করিলে যোগ ভঙ্গ হইয়া যায়। তোমার নৈকট্য হারাইয়া ফেলি। আগে বিশেষ বিশেষ কর্ত্তব্যে তোমার আদেশ শুনিবার চেষ্টা করিতাম, কিন্তু এখন দেখিতেছি যে, প্রত্যেক কার্য্যে তোমার আদেশ শুনিতে না পাইলে বিষম বিপদ্ উপস্থিত হয়। প্রভু আমার শ্রবণ শক্তি সুতীক্ষ্ণ করিয়া দেও, তোমার বাণী শ্রবণ সম্বন্ধে যদি আমার গুপ্ত অবিশ্বাস থাকে তাহা বিদূরিত কর। তোমার কথার যে আমি কাঙ্গালী হইব ইহাতে আশ্চর্য্য কি? সেকালের ভক্তেরা তোমার এক এক কথায় উন্মত্ত হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেন। সংসারের কথা ঢের শুনিয়াছি, এ বৃদ্ধ বয়সে সে অসার কথা শুনিতে আর ভাল লাগেনা। এখন প্রত্যেক কাজে, প্রত্যেক ঘটনায়, প্রত্যেক কথায় তোমার স্বর শুনিবার আকাঙ্ক্ষা হইয়াছে। কঠোর কর্ত্তব্য বলিয়া কাজ করিতে আর রুচি হয়না, তোমার কথা শুনিয়া তোমার সেবা করিতে বাসনা হইয়াছে। যখন এমন উচ্চ বাসনা জন্মাইয়াছ তখন অবশ্য তাহার তৃপ্তিও বিধান করিবে।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

ব্রহ্মকৃপা।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

যে অর্থে আমাদের যাহা কিছু আছে সকলই ব্রহ্মকৃপালব্ধ, আমরা গতবারে প্রবন্ধের আরম্ভে যে ব্রহ্মকৃপার কথা বলিয়াছি তাহা ঠিক্ সেই সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয় না। ব্রাহ্ম যখন মুক্তি সম্বন্ধে 'ব্রহ্মকৃপা' শব্দ ব্যবহার করেন তখন তাহার মধ্যে অন্য প্রকার একটু ভাব থাকে। সে ভাব এই যে, জীবের পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের কৃপা ক্রমাগত প্রবাহিত হইতেছে। এই কৃপা প্রবাহের মধ্যে যখন কেহ পড়িয়া যায়, তখন তাহার জীবনের গতি একেবারে ফিরিয়া যায়, সে ব্যক্তি নবজীবন লাভ করিয়া অনুকূলবায়ুচালিত নৌকার ন্যায় সংসারের প্রতিকূল স্রোত সহজে অতিক্রম করিয়া স্বর্গরাজ্যের দিকে চলিয়া যায়। এ কথাটী ঠিক্; আধ্যাত্মিক জগতে এমন একটী অবস্থা কাহারও কাহারও জীবনে আসিতে দেখা যায়, যখন বলা যায় যে সে ব্যক্তি নবজীবন লাভ করিয়াছে; আর সে মৃত্যুর রাজ্যে, পাপের রাজ্যে ফিরিয়া আসিবে না; এখন হইতে সে নিত্য উন্নতির উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিবে; ঈশ্বরের কৃপার কার্য্য তাহার জীবনে আরম্ভ হইয়াছে। খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে ইহাকে grace বা ব্রহ্মকৃপা লাভের অবস্থা বলে, হিন্দু শাস্ত্রে ইহাকে সিদ্ধির অবস্থা বলে। আধ্যাত্মিক জগতের এই নিগূঢ় সত্যটী সম্বন্ধে অনেকের বিশ্বাস বা সংস্কার এই যে, এই ব্রহ্মকৃপা, এই grace সম্বন্ধে কোন নিয়ম নাই। ইহা কখন্ কাহার হৃদয়ে আসিয়া পড়িবে তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। ইহা যখন মনুষ্যের চেষ্টার অতীত পদার্থ, তখন আমরা চেষ্টা করিয়া, পরিশ্রম করিয়া, সাধন ভজন করিয়া কি করিব? তাহাতে কেবল অহঙ্কার বাড়িবে মাত্র। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করাই আমাদের একমাত্র কার্য্য। তাহার পর যখন তাঁহার কৃপা হইবার তখন হইবে। একথাটী সম্পূর্ণ সত্য নহে। এরূপ সংস্কার আধ্যা-

ত্মিক আলস্যের পরিচায়ক মাত্র। ব্রহ্মকৃপা যে মানুষের চেষ্টার অতীত পদার্থ তাহাতে কিছু মাত্র সংশয় নাই। একথাটী যেমন ঠিক্, তেমনি ইহাও ঠিক্ যে, মানুষের চেষ্টা-ব্যতীত ব্রহ্মকৃপা স্ফূর্ত্তি লাভ করে না। পরমেশ্বর আমাদিগকে যে ইচ্ছাশক্তি প্রদান করিয়াছেন তাহা এই জন্য যে, আমরা তাহার পরিচালন দ্বারা তাঁহার নিকটস্থ হইবার চেষ্টা করিব। এই চেষ্টাব্যতীত কখনই তাঁহার কৃপাস্রোত আমাদের হৃদয়ে অবতীর্ণ হইতে পারে না।

বরফ যেমন আপনাকে আপনি গলাইতে পারে না, সেই-রূপ মানুষ নিজে নিজের মুক্তিসাধন করিতে পারে না। ইহা সত্য কথা। কিন্তু তাই বলিয়া যে মানুষের কিছু করিবার নাই তাহা নহে। পরিত্রাণের জন্য 'আত্মপ্রভাব' ও 'দেব-প্রসাদ' উভয়ই আবশ্যক। নদী ত প্রবাহিত হইতেছে। কিন্তু তৃষ্ণাতুর ব্যক্তি কি নদীর জল আপনা আপনি তাহার নিকট আসিবে মনে করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে? পিপাসা নিবারণ করিতে হইলে তাহাকে জলের নিকট যাইবার পরিশ্রম টুকু স্বীকার করিতেই হইবে। সূর্য্যালোক যদি দেখিতে চাও, তবে গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে কেন? যে অবস্থায় সূর্য্যালোক দেখা যায় আপনাকে সেই অবস্থায় ফেলিতে হইবে। বাতায়ন বন্ধ করিয়া গৃহের মধ্যে বসিয়া থাকিলে কি সমীরণ সেখানে গিয়া তোমাকে শীতল করিবে? সেইরূপ যে ভাবে মনকে প্রস্তুত করিলে, যে অবস্থায় আপনাকে ফেলিতে পারিলে ব্রহ্মকৃপা লাভের অধিকারী হওয়া যায়, সেই ভাবে মনকে প্রস্তুত করিতে হইবে, সেই অবস্থায় আপনাকে ফেলিতে হইবে। এবং তাহার জন্য পরিশ্রম করা চাই। ব্রহ্মকৃপা সম্বন্ধে যে কোনও নিয়ম নাই তাহা নহে। কৃষক যেরূপ ভূমি কর্ষণ করিয়া বৃষ্টির প্রত্যাশায় বসিয়া থাকে, আমাদিগকেও সেইরূপ মন প্রস্তুত করিয়া ঈশ্বরের কৃপার জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু এই উভয়ের মধ্যে একটু বিশেষ এই প্রভেদ আছে যে, কৃষকের পরিশ্রমের সহিত বৃষ্টির কোনও সম্বন্ধ নাই, কৃষক যতই পরিশ্রম করুক না কেন, সে বলিতে পারে না যে বৃষ্টি হইবেই; সে পরিশ্রম করিলেই যে বৃষ্টি হইবে এমন কোনও কথা নাই; বৃষ্টি হইতেও পারে, না হইতেও পারে। কিন্তু আধ্যাত্মিক রাজ্যে সরল চেষ্টা কখনও ব্যর্থ হয় না। সরল ও ব্যাকুল অন্তরে চেষ্টা করিলে ঈশ্বরের কৃপা অবতীর্ণ হইবেই হইবে। প্রকৃত বিশ্বাসী যিনি তিনি কখনই মনে করিতে পারেন না যে, ঈশ্বর পাপীর ক্রন্দন শুনেন না। ইহাত ঘোর অবিশ্বাসের কথা। যিনি ঈশ্বরকে দয়াময় বলিয়া বিশ্বাস করেন তিনি এরূপ চিন্তাকে কখনই মনে স্থান দিতে পারেন না যে, সরল ও ব্যাকুল ভাবে ঈশ্বরকে অন্বেষণ করিলে তাঁহার কৃপা লাভ করা যায় না। যথার্থ সাধক যিনি তিনি কখনই মনে করেন না যে, তাঁহার নিজের চেষ্টার বলে তিনি ঈশ্বরের কৃপা লাভ করিবেন। তাঁহার বিশ্বাস এই যে, তিনি যদি সরলতা, আগ্রহ ও অধ্যবসায়ের সহিত চেষ্টা করেন তাহা হইলে দয়াময় পরমেশ্বর তাঁহার প্রতি কৃপাবারি বর্ষণ না করিয়া থাকিতে পারিবেন না তবে কেন বলিব যে, ব্রহ্মকৃপা সম্বন্ধে কোনও নিয়ম নাই? যে অবস্থায় আপনাকে আনিলে ব্রহ্মকৃপা লাভের অধিকারী হওয়া যায়, সে অবস্থায় চিত্তকে অবস্থাপিত করিতে পারিলে নিশ্চয়ই ঈশ্বরের কৃপা লাভ করিতে পারা যায়। এবং সেই অবস্থা সম্পূর্ণরূপে মানুষের চেষ্টাসাপেক্ষ। ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

সে অবস্থা কি? সে অবস্থা ঈশ্বরের হস্তে সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ। মানবাত্মা যখন আপনার দুর্ব্বলতা পরিষ্কাররূপে অনুভব করত পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত তাঁহার হস্তে আপনাকে ছাড়িয়া দিতে পারে, তখনই তাহার মধ্যে ঈশ্বরের কৃপা অবতীর্ণ হয়, তখনই সে নবজীবন লাভ করিয়া অনুকূলবায়ু চালিত নৌকার ন্যায় সকল প্রতিকূল স্রোত সহজে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মরাজ্যের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। ইহাই প্রকৃত আধ্যাত্মিক উন্নতির মূলমন্ত্র। ইহাই পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার পুনর্ম্মিলনের অবস্থা। পরমেশ্বর মানুষকে যে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়াছেন, এই পূর্ণ আত্মসমর্পণেই তাহা সর্ব্বোচ্চ সফলতা লাভ করে। যাহাতে মানুষ স্বেচ্ছায় পরমেশ্বরের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে পারে, নিজের দুর্ব্বলতা বুঝিয়া আপনা হইতেই জীবনের সমস্ত ভার তাঁহাকে দিতে পারে, নিজে ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার অধীন হইতে পারে, এই অভিপ্রায়েই অনন্ত জ্ঞানময় পরমেশ্বর তাহাকে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি প্রদান করিয়াছেন। এই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অধীনতাই আমাদের প্রকৃত মনুষ্যত্বের মূল। নতুবা বিশ্ববিধাতা যদি মানুষকে ইচ্ছাশক্তিবিরহিত করিয়া, তাহাকে যন্ত্রের ন্যায় যে দিকে ইচ্ছা সে দিকে চালাইতেন, তাহা হইলে জড় পদার্থের সহিত তাহার বিশেষ কোনও প্রভেদ থাকিত না। এরূপ অধীনতার কোনও মূল্য নাই। মানুষ যখন আপনা হইতে পরমেশ্বরের হস্তে আত্মসমর্পণ করে তখনই তাহার প্রাণে ব্রহ্মকৃপা অবতীর্ণ হয়। ইহারই নাম আপনাকে ঈশ্বরের কৃপাস্রোতে ফেলিয়া দেওয়া। ইহার জন্য মানুষের নিজের চেষ্টা একান্ত প্রয়োজনীয়। এই জন্যই সাধু মহাত্মারা বলিয়াছেন, 'যেখানে মানুষের চেষ্টার পরিসমাপ্তি, সেই খানেই ব্রহ্মকৃপার আরম্ভ'। একথার গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, যখনই মানুষ নিজের অসহায়ত্ব ও দুর্ব্বলতা পরিষ্কাররূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া ঈশ্বরের উপর পূর্ণমাত্রায় নির্ভর করিতে পারে, তখনই সে ঈশ্বরের কৃপালাভে সমর্থ হয়।

কে বলিল ব্রহ্মকৃপা সম্বন্ধে কোনও নিয়ম নাই? কে বলিল মানুষের চেষ্টাব্যতীত ঈশ্বরের কৃপা মানবহৃদয়ে অবতীর্ণ হয়? ইহা অলস মনের কল্পনা মাত্র। স্নেহময়ী বিশ্বজননী অমৃতপাত্র হস্তে লইয়া মানবাত্মার দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছেন, প্রতি মুহূর্ত্তে প্রেমভরে আমাদিগকে উহা গ্রহণ করিবার জন্য ডাকিতেছেন। তাঁহার মধুর আহ্বানধ্বনি অনেক সময় মনের অবস্থাবিশেষে বা বিশেষ ঘটনাসূত্র অবলম্বন পূর্ব্বক সংসারের মোহ কোলাহল ভেদ করিয়া আমাদের আত্মার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া প্রাণকে বিচলিত করে। প্রাণ তাহা-শুনিয়া এক একবার তাঁহার কাছে যাইবে বলিয়া ফিরিয়া

দাঁড়ায়। কিন্তু সে ভাব কয়জনের জীবনে স্থায়ী হয়? ঈশ্বরের কৃপাস্রোত ত সকলের জন্যই প্রবাহিত হইতেছে, তবে সকলের জীবনে তাহার কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না কেন? কেবল যে আপনাকে তাহার ভিতর ফেলিতে জানে সেই জীবনে ঐ কৃপা লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়; নতুবা আমাদের মত অলস ও নিশ্চেষ্ট ভাবে মুখে 'ব্রহ্মকৃপা,' 'ব্রহ্মকৃপা' বলিতে পারিলেই যদি ব্রহ্মকৃপা লাভের অধিকারী হওয়া যাইত তাহা হইলে আর ভাবনা ছিল কি? যিনি ঈশ্বরের আহ্বানধ্বনি শ্রবণ করিয়া তাঁহার হস্তে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারেন তিনিই ব্রহ্মকৃপা লাভের অধিকারী হন। তাঁহার জীবনে ঈশ্বরের কৃপা অবতীর্ণ হইবেই হইবে। আমাদের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিই এই আত্মসমর্পণের ভিত্তিভূমি। ইহার পরিচালনা ব্যতীত, অর্থাৎ নিজের চেষ্টা ভিন্ন, ব্রহ্মকৃপার অধিকারী হওয়া অসম্ভব। যিনি নিজের দুর্ব্বলতা বুঝিয়া নিতান্ত দীনভাবে আপনার জীবনের ভার ঈশ্বরের হস্তে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অর্পণ করিতে পারেন, নিজের কর্ত্তৃত্ব বিসর্জ্জন দিয়া সরলভাবে 'প্রভুর ইচ্ছা পূর্ণ হউক' বলিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইতে পারেন, তিনিই ব্রহ্মকৃপা লাভ করিয়া কৃতার্থ হন। এই দীনতাই প্রকৃত মহত্ত্বের সোপান, এই দুর্ব্বলতাবোধই দুর্জ্জয় ঐশী শক্তির উৎস, এই আত্মসমর্পণই ব্রহ্মকৃপা লাভের একমাত্র অনুকূল অবস্থা।

উপাসনাতত্ত্ব।

৫

আরাধনা।

উপাসনার তিন অঙ্গ। আরাধনা, ধ্যান ও প্রার্থনা। সরল আত্মা এই তিন অঙ্গকে পৃথক্ করিতে পারে না, আরাধনা করিতে করিতে ধ্যানে গিয়া পড়ে, ধ্যান করিতে করিতে প্রার্থনায় গিয়া পড়ে। আরাধনায় অনেক সময় কিয়ৎ পরিমাণে ধ্যান ও প্রার্থনার ভাব আসিয়া পড়ে, প্রার্থনায় অনেক সময় আরাধনা ও ধ্যানের ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়। মন যদি সরল, বিনীত ও ঈশ্বরোন্মুখ থাকে, তবে এই তিন অঙ্গ অবশ্যই স্ফূর্ত্তি পাইবে। যাঁহারা কেবল প্রার্থনারই আবশ্যকতা অনুভব করেন, তাঁহারা কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলেই দেখিতে পাইবেন যে, আরাধনা ও ধ্যানের সার অতি নিগূঢ়ভাবে প্রার্থনায় মিশ্রিত আছে। প্রার্থনা যে করিব, কার কাছে? শূন্যের নিকট তো প্রার্থনা হয় না। জীবন্ত ঈশ্বরের বর্ত্তমানতা অনুভব না করিলে কি প্রার্থনা করা যায়? প্রার্থনা কি দূরত্ব দূর করা নহে? প্রভুর নিকট হইতে দূরে পড়িয়াছি, তাঁহার মুখচ্ছবি ক্রমেই মলিন হইয়া পড়িতেছে, এমন সময়েই তো প্রাণ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠে। আবার দেখুন, দাতার দাতৃত্বে যদি বিশ্বাস না থাকে, তবে কোন ভিক্ষুকই তাঁহার নিকট যায় না। ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনা শুনেন, আমাদের আত্মার কল্যাণ ও অভাব মোচন করেন, এ বিশ্বাসবিহীন হইয়া কে প্রার্থনা করিতে অগ্রসর হইবে? কাজেই দেখা যাইতেছে যে, ঈশ্বরের জীবন্ত বর্ত্তমানতা ও অনুপম দয়া অগ্রে উপলব্ধি করিতে হয়, পরে প্রার্থনা প্রাণ হইতে উত্থিত হয়। ঈশ্বরের জীবন্ত সত্তা ও অপার করুণা যে উপলব্ধি করিল আরাধনা ও ধ্যান করিতে তাহার কি অবশিষ্ট রহিল? সেইরূপ যিনি মনে করেন প্রার্থনা আবশ্যক নহে কেবল আরাধনা ও ধ্যানেই চলিতে পারে, তাঁহাকে আমরা জিজ্ঞাসা করি, তিনি কি তাঁহার প্রাণ পাষাণে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন? প্রভুর প্রেম ও সৌন্দর্য্যবাণে আহত হইলেন, অথচ আহত প্রাণ হইতে প্রার্থনার প্রবাহ নিঃসৃত হইল না, এ কি প্রকার আরাধনা ও ধ্যান করা? তাঁহাকে আমরা আরও জিজ্ঞাসা করি, যে মলিন জীব হইয়া বিনা প্রার্থনায় তিনি ব্রহ্মের নিকট কিরূপে অগ্রসর হইলেন? ভক্তের উদার প্রাণ যে অনন্ত পরমেশ্বরের মহিমা ধারণ করিতে চেষ্টা করিয়া স্তম্ভিত ও কম্পিত হয়, তিনি কিরূপে উন্নতমস্তকে সেই মহিমা-সমুদ্রের তীরে গমন করিলেন? জীবের সাধ্য কি যে সে আপন চেষ্টায় সেই অসীম বিরাট পুরুষের উপাসনা করিবে? ব্রহ্ম যদি তাহাকে উপাসনা করান, তবেই সে উপাসনা করিতে পারে। আর ধ্যানের তো কথাই নাই। যেখানে উপাস্য দেবতায় ও উপাসকে বিরলে আলাপ হয়, সেখানে যাওয়া কি সহজ কথা? বিনা প্রার্থনায় তথায় কে যাইবে? যখন ব্রহ্ম হাতে ধরিয়া, তাঁহার পুত্রকন্যাকে সেই নিভৃত অধ্যাত্ম রাজ্যে লইয়া যান, তখনই তাহারা সেখানে যাইতে পারে। আগে প্রার্থনাই কর, বা আগে আরাধনাই কর, ইহার কোন অঙ্গই ছাঁটিয়া ফেলিতে পার না, উপাসনা অঙ্গহীন করিলে জীবনও অঙ্গহীন থাকিয়া যায়। তবে বিশেষ প্রার্থনা স্বভাবতঃই আরাধনা ও ধ্যানের পর আসিয়া পড়ে। মানবতত্ত্ব উত্তমরূপে অনুশীলন করিয়াই ব্রাহ্মধর্ম্ম জীবপ্রকৃতির সম্যক্ উপযোগী এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর উপাসনা প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন।

আরাধনা কেবল ঈশ্বরের গুণানুবাদ নহে। আরাধনা ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য দেখিয়া সজ্ঞানে আত্মসমর্পণ করা। জড় জগৎও আরাধনা করে। বিশ্বাসীর চক্ষে বিশ্ব নীরবে দিবানিশি বিশ্বপতির আরতি করিতেছে। রবি চন্দ্র তারা সে আরতির দীপমালা, সুগন্ধ গন্ধবহ চামর ব্যজনকারী। বনরাজি তাঁহার চক্ষে অবিরত বনদেবতার চরণে কুসুমাঞ্জলি অর্পণ করিতেছে। কিন্তু সে আরাধনায় সচেতন ভাব নাই, আত্মসমর্পণ নাই। সচেতন পূজায় কেবল মানবাত্মার অধিকার। আত্মসমর্পণের সঙ্গে সৌন্দর্য্যের কার্য্য কারণ সম্বন্ধ, সৌন্দর্য্য না দেখিলে অনুরাগ হয় না, অনুরাগ না হইলে পূজা হয় না, পূজা না হইলে আত্মসমর্পণ হয় না। বিষয় মদে মত্ত জীবের গ্রীবা গর্ব্বে সদাই স্ফীত, ব্রহ্মসৌন্দর্য্য সে গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার এক প্রধান উপায়। সে সৌন্দর্য্যের কণিকা মাত্র যখন আত্মায় আসিয়া পড়ে, তখন প্রাণ বাস্তবিকই তৃণ হইতে অধিক দীনতা লাভ করে। আমাদের সকলেরই মনে অল্পাধিক পরিমাণে একটা স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যতৃষ্ণা আছে। আমরা প্রথমে জড় প্রকৃতির আকারগত সৌন্দর্য্যে সে তৃষ্ণা চরিতার্থ করিবার চেষ্টা করি। যখন তাহা বিফল হয়, তখন মানব প্রকৃতির অধ্যাত্ম সৌন্দর্য্যে

তৃপ্তি পাইবার প্রয়াস পাই। কিন্তু উহা সসীম বলিয়া সে তৃপ্তি স্থায়ী হয় না। অবশেষে আমরা ব্রহ্মের অপরূপ সৌন্দর্য্যরাশির নিকট আসিয়া উপস্থিত হই। সে সৌন্দর্য্যের শেষ নাই, সুতরাং তৃপ্তিরও শেষ হয় না। ভক্তবৎসল নিত্য তখন নব নব সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিয়া ভক্তের অনুরাগ প্রবৃদ্ধ করেন। আপনার হাতে প্রাণ রাখিতে আর ইচ্ছা থাকে না। স্বতঃই অভিলাষ হয় যে, অনন্ত গুণাধার প্রিয়তম দেবতার মোহন পাদপদ্মে প্রাণ পরিত্যাগ করি, আর তিনি আমাকে বিশুদ্ধ ভক্তের প্রকৃতি দিয়া পুনরায় বাঁচাইয়া তুলুন। ব্রহ্মের সৌন্দর্য্য চঞ্চল ভ্রমরবৃত্তি বিদূরিত করে, কেননা তাহার সঙ্গে অন্য কোন সৌন্দর্য্যের তুলনা হয় না। প্রাণ উহাতে চিরকালের জন্য বদ্ধ হইয়া থাকে, অন্য কোন স্থানে যাইতে চায় না, কেননা অন্য কোথাও গিয়া সে সুখী হইতে পারে না। যতই সে সৌন্দর্য্যজ্ঞান ঘনীভূত হয়, ততই তাঁহার রশ্মিতে উপাসক আপনার মলিনতা ও কুৎসিতরূপ দেখিয়া কুণ্ঠিত হন। কালে উপাস্য দেবতার অনুকরণের ইচ্ছা জন্মে। সত্যস্বরূপ অনুধ্যান করিতে করিতে সত্যাচার ও অবিচলিত সত্যানুরাগ আসিয়া পড়ে। সৌন্দর্য্য সমুদ্রে মগ্ন হইয়া সাধক প্রেমমণি প্রাপ্ত হন, তাঁহার প্রেম তখন জাতিকালে নিবদ্ধ থাকে না, সমস্ত জগৎময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। ক্রমে এমন অবস্থা হয় যে, ভিতরেও আরাধনা, বাহিরেও আরাধনা; জ্ঞান, প্রেম, ইচ্ছা ও কার্য্য সকলই আরাধনা করে, জীবন আরাধনা-ময় হইয়া পড়ে। কি উচ্চ আমাদের আরাধনার আদর্শ, আর কত নীচে আমাদের জীবনের আরাধনা!

এই উচ্চ আরাধনা জীবনে আনিতে হইলে বিশেষ সাধনের প্রয়োজন। সংসারের কুৎসিত রূপ দেখিয়া আমাদের রুচি বিকৃত হইয়া গিয়াছে। সে রুচি পরিবর্ত্তন করিয়া আমাদিগকে প্রাণে ঈশ্বরের অনন্ত সৌন্দর্য্য জাগ্রৎ করিতে হইবে। আরাধনার কথা অনেক শুনিয়াছি, তেমন সাধন করি-নাই, সুতরাং সে কথা আমাদের সম্বন্ধে শক্তিহীন হইয়া গিয়াছে। আজ ভাল আরাধনা হইল, আর একদিন কিছুই হইল না। আজ একজনের ভাল আরাধনায় যোগ দিলাম, প্রাণ উচ্ছ্বসিত হইল, ঘরে আসিয়া দেখি যে শুষ্কতা ছিল, সেই শুষ্কতা রহিয়াছে! অন্যের বসন পরিয়া মনে করি বেশ দেখাইতেছে, পাঁচবার আপনার দিকে চাহিয়া থাকি। অল্পক্ষণ পরেই আপনার প্রকৃত বসন, আপনার চীরবাস ও ছিন্নকন্থা বাহির হইয়া পড়ে। আমাদের জীবনে আরাধনা আজিও দাঁড়াইতে পারে নাই, উচ্ছ্বাস ও শুষ্কতার তরঙ্গে এদিক ওদিক ভাঙ্গিয়া বেড়াইতেছে। 'সত্যং' বলিলে বা শুনিলে অন্তরে কি প্রাণের প্রাণ ঈশ্বরের জীবন্ত বর্ত্তমানতার উপলব্ধি হয়? যাঁহারা সত্যং সাধন করিয়াছেন, সত্য শব্দ তাঁহাদের শ্রবণে পড়িবামাত্র, তাঁহারা জগদীশ্বরের জীবন্ত প্রকাশ উপলব্ধি করিয়া স্তম্ভিত হন। চৈতন্যচরিতামৃত পাঠে জানা যায় যে, শ্রীচৈতন্য হরিনাম শ্রবণে অস্থির হইতেন বলিয়া দুষ্ট বালকে তাঁহাকে 'হরি' বলিয়া ক্ষেপাইত। তিনি এক একদিন তাহাদের মুখে হরিনাম শুনিয়া ভাবাবেশে অজ্ঞান হইয়া পড়িতেন। আমাদের হীন জীবনেও কতবার দেখা গিয়াছে যে, যখন যে স্বরূপ বিশেষভাবে সাধন করা গিয়াছে, তখনই সেই স্বরূপের ভাব রাশি কঠিন প্রাণে ফুটিয়া উঠিয়াছে, সাধন ছাড়িয়া দিয়াছি, সে ভাব ম্লান হইয়া গিয়াছে। যিনি আরাধনার উচ্চ আদর্শ শৈলে আরোহণ করিতে চান, তিনি কালবিলম্ব না করিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হউন। এক একটী স্বরূপ লইয়া তাহার ভিতরে ডুবিতে চেষ্টা করুন, তাহার মধ্যে নিহিত ভাব সমুদ্র উৎসারিত করিবার প্রয়াস পান; দেখিবেন যে অচিরে আরাধনা ও আরাধনার সঙ্গে সঙ্গে জীবনও পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। এ সাধন সকলেরই অবলম্ব-নীয়। এ সাধন জীবন-ব্যাপী। অনন্ত ব্রহ্মকে জানিয়া কে ফুরাইতে পারিবে? যতই জানিব ততই আরও জানি-বার বিষয় দেখিতে পাইব। যতই স্বরূপোপলব্ধি গভীর হইবে, ততই আরও গভীরতর উপলব্ধি লাভের জন্য মন লোলুপ হইবে। ভক্তের অনুরাগ বাড়াইতে ব্রহ্ম যেমন জানেন, এমন আর কেহ জানে না। বর্ত্তমান অবস্থায় এই সাধন আমাদের অতীব প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। অধ্যবসায় ও একাগ্রতার সহিত এবং কায়মনোবাক্যে ব্রহ্মস্বরূপ সাধন ভিন্ন উচ্চ ধর্ম্ম জীবন লাভের উপায়ান্তর নাই।

চিত্তবিক্ষেপ।

গতবারে চিত্তসংযমের কথা বলিয়াছি, এবারে চিত্তসংযমের বিপরীত চিত্তবিক্ষেপের কথা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। আমরা বলিয়াছি প্রেমই প্রকৃত চিত্তসংযমের উপায়। আমরা এখন দেখাইতে চেষ্টা করিব, নির্ভরই চিত্তবিক্ষেপের শ্রেষ্ঠ প্রতীকার। চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই আপন মন পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পান যে, একটী বিশেষ কারণে মনের একাগ্রতা হয় না। মনঃসংযোগ করিয়া কোন বিষয় খানিক ক্ষণ পড়িতে ইচ্ছা করিতেছে, কিন্তু কোন মতেই তাহা পারিয়া উঠিতেছি না। কোন বন্ধুর সঙ্গে কোন বিষয়ে আলাপ করিতে গিয়া দেখিতে পাই, মূল প্রশ্ন কোথায় পড়িয়া থাকে অবান্তর কথা লইয়া বৃথা সময় নষ্ট করি। আরাধনা ও ধ্যানের সময় দেখা যায় যে, সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও অন্য চিন্তা আসিয়া মনকে ক্ষণে ক্ষণে অধিকার করে। অনেক পরিশ্রম করিয়া এই মনের কবাট বন্ধ করিলাম, খানিক পরে দেখি কয়েকটী অসার চিন্তা আমার অজ্ঞাতসারে মনের ভিতর আসিয়া উঁকি মারিতেছে। আরাধনা ও ধ্যানের সূত্র কতবার ছিঁড়িয়া যায়, আবার যত্ন করিয়া তাহা বাঁধিয়া দিতে হয়। এই এক গাছি সূতা পরাইয়া দিলাম, কিঞ্চিৎপরে দেখি যে, তাহা ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। সময় সময় এমনই হয় যে মনকে সংযত করাই দায় হইয়া উঠে। এই চঞ্চলতা ও চিত্তবিক্ষেপ আমাদের সকল প্রকার উন্নতির প্রধান অন্তরায়। এই রোগের জন্য আমাদের মন সুস্থ হইতে পারে না। মন সুস্থ হয় না বলিয়া চিন্তাশীলতা স্ফূর্ত্তি পায় না। আমাদের মধ্যে কয়জন প্রকৃত মৌলিক চিন্তাশীল লোক আছেন। মৌলিকচিন্তাবহুল কয়-খানি পুস্তক আমরা লিখিয়া উঠিতে পারিয়াছি। এই রোগে

কেবল যে আমাদের জ্ঞানোন্নতির পথে কণ্টক রোপণ করে তাহা নহে, ধর্ম্ম জীবনেরও বিশেষ অনিষ্ট করে। আমাদের দেশের প্রাচীন সাধক ও ভক্তবৃন্দ যে এই রোগের বিষয় বিশেষ অবগত ছিলেন, তাহা আমাদের দেশের প্রচলিত শাস্ত্র পাঠে জানা যায়। এই রোগের কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখিতে পাই যে, আমাদের প্রাণের মূলে দুইটী বিকট কীট বসিয়া আছে, তাঁহারাই আমাদিগকে সুস্থ হইয়া একাগ্রতা লাভ করিতে দেয় না। এই কীটের মধ্যে একটীর নাম বিষয়াসক্তি ও অপরটীর নাম অবিশ্বাস। মুখে আমরা যতই বৈরাগ্যের যশ প্রচার করি না কেন, মনে মনে একটুখানি সংসারাসক্তি পোষণ করি। এই নিগূঢ় আসক্তি বাহির করা অতীব সুকঠিন। উপরে উপরে শতবার পরীক্ষা করিয়া দেখি, কিছুই দেখিতে পাই না। প্রভুর জন্য আমরা কি না সহ্য করিয়াছি? পিতা মাতার মনে যার পর নাই ক্লেশ দিয়াছি, পিতামাতাকে ক্লেশ দিয়া আপনারাও ক্লেশ পাইয়াছি। যদি কেহ বলেন যে, এত করিয়াও কি আমরা প্রভুর জন্য আমাদের বর্ত্তমান সুখ ও সুবিধা ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহি? তাঁহাকে আমরা জিজ্ঞাসা করি, যদি প্রকৃতই তাহা হয়, তবে প্রভুর সঙ্গে এতবার প্রাণ দেওয়া নেওয়া করিতেছি কেন? কেন আমাদের জীবনে প্রভুর সিংহাসন স্থায়িরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে না? আমি প্রভুকে লাভ করিবার জন্য আমার দিক্ হইতে যতটুকু করা আবশ্যক ততটুকু করিয়াছি, অথচ প্রভুর কৃপা হইতেছে না, তাঁহার কোন্ ভ্রান্ত উপাসক একথা রসনায় আনিবে? খুব সুক্ষ্মরূপে আত্মপরীক্ষা করিলে দেখিতে পাই যে আমাদের বিষয়াসক্তি এখনও যায় নাই, ভিতরে ভিতরে আমরা প্রভুর অপেক্ষা সংসারকে প্রিয় মনে করি। এই সংসারাসক্তি নানা দিক্ হইতে নানা পাশে আমাদিগকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে। বৈরাগ্যরূপ ব্রহ্মাস্ত্রে এই বিষম পাশ ছেদন করিতে হইবে। আর একটী কীটের নাম অবিশ্বাস। ইহার আকার অতিশয় ক্ষুদ্র, কিন্তু ইহার শক্রতা অতি তীব্র। ঈশ্বরের অস্তিত্বে আমার খুব বিশ্বাস আছে, কিন্তু তাই বলিয়া কি আমার ক্ষুদ্র জীবনের তুচ্ছ জীবনাবলীর মধ্যে ঈশ্বরের কৃপার কার্য্যকারিতা মানিতে হইবে? আমি একটী কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, কাজ শেষ হইল, তারপর আমি ফলের জন্য একটুও ভাবিব না, ঈশ্বরের হাতে ফলাফল চিন্তার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইব, ইহা কি কখন হইতে পারে? ঈশ্বর অসীম ব্রহ্মাণ্ডের ভার বহিতেছেন, তাঁহার বড় বড় কাজ করা বড় বড় জিনিসের ভার লওয়াই শোভা পায়। তিনি এই কীটানুকীটের তুচ্ছ জীবনের তুচ্ছ ঘটনার ভার লইবেন, তাঁহার কি আর অন্য কর্ম্ম নাই? সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে দুষ্ট মন এইরূপে তর্ক করিয়া সর্ষপ প্রমাণ অবিশ্বাসকে ডাকিয়া আনে। যেমন সর্ষপ প্রমাণ বিশ্বাসের বলে গগণস্পর্শী পর্ব্বত স্থানান্তরিত ও উত্তাল তরঙ্গাকুল জলনিধি শান্ত হয়, তেমনই সর্ষপ প্রমাণ অবিশ্বাসের বলে, পর্ব্বত প্রমাণ পুণ্য ভ্রষ্ট ও সাগরোপম শান্তি বিশুষ্ক হয়। দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই অবিশ্বাসই ভাবনার জননী। ভাবনায় ভাবনায় নরনারীর মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। কিসের ভাবনা ভাবিতেছ ভাই ভগিনি, জিজ্ঞাসা করিলেই সকলের মস্তক হেঁট। দয়াল পরমেশ্বরে বিশ্বাস কর কি? বলিবামাত্র "হাঁ, বিশ্বাস করি" এই ধ্বনি চারিদিক্ হইতে উত্থিত হয়। কিন্তু সে ধ্বনির অর্থ নাই। দয়াল পরমেশ্বরের দয়ায় বিশ্বাস এবং ফলাফল ভবিষ্যৎ ভাবনা পরস্পরের বিরোধী। যিনি প্রভুর দয়ায় বিশ্বাস করেন, তিনি কখনও ভবিষ্যতের অসার চিন্তায় আপন মনকে বৃথা বীর্য্যহীন করেন না। কাজ করিলাম প্রভুর আদেশ শুনিয়া, ভাবনার বিষয় কি আছে? যতক্ষণ না ঠিক্ করিয়া আদেশ পালন করিতেছি ততক্ষণ ভাবনার কথা বটে, কিন্তু প্রাণপণে আদেশ পালন করিয়া কোথায় ভাবিব প্রভুর মনোমত হইল কি না, না ভাবি আমি সুখী হইব কি না, কার্য্যের ফল আমার ইচ্ছামত হইবে কি না! এই জন্য হিন্দু শাস্ত্রকারেরা পুনঃ পুনঃ নিষ্কাম কর্ম্মের উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। নিষ্কাম কর্ম্ম সাধনের উপায় মহর্ষি ঈশা যেমন শিখাইয়াছেন এমন বোধ হয় আর কেহ পারেন নাই। নিষ্কাম কর্ম্ম সাধন করিতে যদি চাও, তবে মহর্ষি ঈশার মত স্বর্গীয় পিতার উপর নির্ভর কর। নির্ভর ভাবনার কুঠার; যে নির্ভর করিতে শিখিয়াছে, সে ভাবনার হস্ত হইতে মুক্তি লাভের সুপথ দেখিয়াছে। তুমি আমি কোথায় সে জিনিস পাইব? যাঁহারা প্রভুর সুপুত্র, যাঁহাদের প্রভুর উপর অবিচলিত নির্ভর ও বিশ্বাস, ঘোরতর পরীক্ষা ও প্রতিকূলতাতেও তাঁহারা অচলের প্রায় অটল, আর আমরা পরীক্ষা ও প্রলোভনের নামে প্রভঞ্জন বিতাড়িত বেতস লতাবৎ বেপমান। যে নির্ভর ও বিশ্বাস বিপদের সময় ঠিক্ রাখিতে পারে না, তাহা নির্ভর ও বিশ্বাস পদের বাচ্য হইতে পারে না। একদিকে কল্পনায় আমরা ভাবী স্বর্গ নির্ম্মাণ করিতেছি, অবিশ্বাস সূত্র অবলম্বন করিয়া আর এক দিক্ দিয়া নরক আমাদের মনে প্রবেশ করিতেছে। এত শুনিলাম, এত শুনাইলাম, এত পড়িলাম, এত শিখাইলাম, অশিক্ষিত শিশু যে চক্ষে বাপ মার দিকে চাহিয়া থাকে, সে চাহনি আজিও শিখিতে পারিলাম না। এতবার প্রভুকে পিতা বলিয়া ডাকিলাম, কিন্তু পুত্রত্বের একটা সামান্য দিক্ আজিও প্রাণে পাইলাম না। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় অসার চিন্তাসকল দলে দলে আসিয়া আমার অন্তরস্থ শান্তিকে বার বার বিনাশ করিয়া যাইতেছে, আমি কিছুই প্রতীকার করিতে পারিতেছি না। এদিকে পিতা বলিতেছেন, "মূঢ় সন্তান, আমার দিকে একবার ভাল করিয়া চাও দেখি," আমি প্রাণপণে চক্ষু বুজিয়া থাকি। কেননা মনে মনে একটা ভয় আছে যে, ভাল করিয়া চাহিলে পাছে প্রাণটা একেবারে জন্মের মত হাত ছাড়া হয়। যতই পিতা অভয় দিয়া ভাবনা দূর করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া আমাকে তাঁহার দিকে যাইতে বলেন, ততই আমি কঠিন করিয়া আমার চক্ষু বন্ধ করি।

যে বিশ্বাস ও নির্ভর করিতে শিখিয়াছে, সে ভয় করিতে জানে না। যে অবিশ্বাসী ও আপনার জীবন ও কর্ম্মের ফলাফল আপনার হাতে রাখে, সে সদাই সশঙ্ক। মৃত্যুভয়, পাপের দণ্ডভয়, শত্রুভয়, সমাজভয়, প্রভৃতি নানা বিধ ভয়

তাঁহার আত্মাকে চাপিয়া রাখে, বাড়িতে দেয় না। বিশ্বাসী ও নির্ভরশীলের আত্মা ঈশ্বরের কৃপারূপ বারি ও আলোকে নিত্য নবজীবন লাভ করিয়া সুন্দররূপে বর্দ্ধিত হয়। সরল তরু অপেক্ষা সে অধ্যাত্ম তরুর সৌন্দর্য্য অধিক অবিশ্বাসীর আত্মার উপরে ভয় বসিয়া থাকে, তাহাকে মস্তক উত্তোলন করিয়া বর্দ্ধিত হইতে দেয় না। কল্পনা তাহাকে বিবিধমতে বিপদগ্রস্ত করে। কল্পনা যখন যার কাছে থাকে তখন তার হয়। সাধুর কল্পনা তাঁহাকে স্বর্গের অনুপম আলোক ও ঐশ্বর্য্য রাশি দেখায়। অবিশ্বাসীর কল্পনা তাহার একগুণ ভয়কে শতগুণ বর্দ্ধিত করে। পৃথিবীর শত শত নরনারী এইরূপে নির্ভর ও বিশ্বাসের অভাবে ব্রহ্মজ্ঞানসত্ত্বেও ব্রহ্মলাভ করিতে সমর্থ হন না। সাধে কি উপনিষৎকার বলিয়াছেন:—

নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নসমাহিতঃ
নাশান্তমানসোবাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ।

চিত্ত শান্ত ও সমাহিত না হইলে মানুষের মনই পাওয়া যায় না, বিশ্বপতিকে কিরূপে লাভ করিব? নিকটে পিতা দণ্ডায়মান, বার বার তিনি মধুরস্বরে আহ্বান করিয়া তাঁহার উপর নির্ভর করিতে বলিতেছেন, তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া সাধকবৃন্দ অসার চিন্তা ও ভাবনার হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া চক্ষের সমক্ষে স্বর্গধামে যাইতেছেন, অথচ তুমি আমি এবং তোমার ও আমার মত সহস্র সহস্র নরনারী অবিশ্বাসের কুয়াসায় আচ্ছন্ন হইয়া সে ডাক শুনিয়াও শুনিতেছি না, ইহা কি সামান্য পরিতাপের বিষয়? যেমন দিবসের আলোক নির্ব্বাণ ও দিবসের কোলাহল নিবৃত্ত না হইলে, নৈশ আকাশের তারকোজ্জ্বল মহিমা প্রকাশিত হয় না, তেমনি অসার ভাবনা নির্ব্বাণ ও ফলাফল চিন্তা নিরুদ্ধ না হইলে, আমাদের হৃদাকাশে ভক্তের লোভনীয় স্বর্গীয় পিতার নিরুপম পিতৃত্বের মহিমা প্রকাশিত হইবে না। যদি আমরা পুত্রের মত তাঁহার দয়ায় বিশ্বাস ও নির্ভর করিতে পারি, তবেই শান্ত ও সমাহিত চিত্তে তাঁহাকে পিতা বলিয়া ডাকিয়া সুখী হইতে পারিব।

প্রদেশীয় ব্রাহ্মসমাজ।

সৈয়দপুর হইতে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মজুমদার লিখিয়াছেন;—বিগত ২৩শে অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার, শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর স্থানীয় সমাজ গৃহে একটী সরল প্রার্থনার পর মহাত্মা কবীরের গ্রন্থ হইতে কোন কোন অংশ ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃবর্গকে মোহিত করেন। কবীরের গ্রন্থের ন্যায় প্রগাঢ় চিন্তার পরিচায়ক উপদেশ পূর্ণ গ্রন্থ খুব কম দেখা যায়। প্রায় সকলেই কবীরের গ্রন্থ ব্যাখ্যাতে অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন। শুক্রবার প্রাতঃকালে বিদ্যারত্ন মহাশয় সমাজ গৃহে উপাসনা করেন এবং "আমাদিগের দেবতা এবং দেবমন্দির" সম্বন্ধে উপদেশ দেন। বৈকালে শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রনাথ দে মহাশয়ের বাসাতে উপাসনা করেন এবং "মনুষ্য ঈশ্বরের বাগানের মালি" এই সম্বন্ধে সরল ভাষায় একটী মনোহর উপদেশ দিয়াছিলেন। অনেকগুলি ভদ্র মহিলা উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যার পর সমাজ গৃহে "বিশ্বাসের ভিত্তি" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাটী অতিশয় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। বক্তা অতি উজ্জ্বলভাবে সকলের হৃদয়ে বক্তৃতার ভাব মুদ্রিত করিয়া দিয়াছিলেন।

উত্তর বাঙ্গালাস্থ ব্রাহ্মসমাজ সমূহের মধ্যে সৈয়দপুর ব্রাহ্মসমাজের যেরূপ উন্নত অবস্থা ছিল, এমন আর কোন সমাজেরই ছিল না এবং বর্ত্তমান সময়ে ইহার যেরূপ দুরবস্থা এমন আর কোন সমাজেরই নহে। এখন এখানে একটীও আনুষ্ঠানিক বা প্রকৃত ব্রাহ্ম নাই। আমরা কয়েকটী দুর্ব্বল ভ্রাতা একত্রিত হইয়া ভগবানের নাম করিয়া থাকি। কিন্তু আমরা যেরূপ দুর্ব্বল এবং পাপে তাপে ক্লিষ্ট তাহাতে মধ্যে মধ্যে প্রচারক মহোদয়গণ যদি কৃপা প্রদর্শন পূর্ব্বক এইরূপ আসিয়া সুমধুর উপদেশ দ্বারা আমাদিগের মৃত প্রাণে ধর্ম্মভাব জাগ্রৎ করিয়া দেন তাহা হইলে আমরা এই সৈয়দপুরে ভগবানের নাম করিতে সক্ষম হইতে পারিব। এখন এখানকার অত্যন্ত মন্দ অবস্থা, এই মন্দ অবস্থার সময় যিনি আসিবেন তিনিই প্রকৃত সুহৃদ্ এবং মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।

প্রেরিত পত্র।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের প্রতি নিবেদন।

আগামী বৎসরের অধ্যক্ষ সভা সংগঠনের সময় সমুপস্থিত। এই সভার সভ্য মনোনয়নের আর অধিক বিলম্ব নাই। বর্ত্তমান অধ্যক্ষ সভার কলিকাতা ও মফঃস্বলবাসী সভ্য ও প্রতিনিধিগণের মধ্যে এমন কেহ কেহ আছেন যাঁহারা সভার অধিবেশনে রীতিমত উপস্থিত হন না; এমন কি পত্রদ্বারাও মতামত অবগত করেন না। এরূপ ব্যক্তিকে আমাদের কি পুনরায় মনোনীত করা উচিত? যাঁহাদের উপর আমাদিগের প্রাণের প্রিয়তম ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গলামঙ্গল বহুল পরিমাণে নির্ভর করে তাঁহারা নিজ কর্ত্তব্যের গুরুত্বই বুঝিলেন না, ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি আছে? সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ এইবেলা সতর্ক হউন। ধন, মান, বিদ্যা এ সকলকে উপযুক্ত মর্য্যাদা দিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছি। কিন্তু যখন আমাদের এত আশার জিনিস ব্রাহ্মসমাজের ভার তোমার হস্তে দিব তখন কেবল ভগবদ্ভক্তি ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠাই তোমাকে আমার নিকট আদরের বস্তু করিবে। বর্ত্তমান অধ্যক্ষ সভার সভ্যগণের মধ্যে কে কেমন যত্নশীলতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা আমরা সকলে জানিবার অধিকারী। এই জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক মহাশয়কে অধ্যক্ষ সভার সভ্যগণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি আগামীবারের তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিতেছি। তত্ত্বকৌমুদীতে অধ্যক্ষ সভার প্রতি অধিবেশনের যে কার্য্য বিবরণ প্রকাশিত হয়, তাহাতে উপস্থিত সভ্যগণের নাম দেওয়া হয় বটে, কিন্তু প্রত্যেক মনো-

নয়নকারীকে তত্ত্বকৌমুদী সংগ্রহ করিয়া একটী তালিকা প্রস্তুত করিবার কষ্ট দেওয়া অপেক্ষা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আপিস হইতে একটী তালিকা প্রকাশিত হইলে সকলেরই সুবিধা হয়। আশা করি, সম্পাদক মহাশয় ব্রাহ্ম সাধারণের এই সুবিধাটুকু করিয়া দিয়া সকলকে সুখী করিবেন। ইতিমধ্যে আমরা সকলেই লোক বাছিতে চেষ্টা করি।

জ্ঞাতব্য বিষয়;—(১) সভ্যের নাম, (২) কলিকাতাবাসী, মফঃস্বলবাসী কি প্রতিনিধি? (৩) বর্ত্তমান বৎসরের অধিবেশনের সংখ্যা, (৪) কত অধিবেশনে স্বয়ং উপস্থিত, (৫) কত অধিবেশনে পত্র দ্বারা মতামত জ্ঞাপন করিয়াছেন।

বসিরহাট
১২ই ডিসেম্বর ১৮৮৭

নিবেদক
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের বর্ত্তমান মত ও ব্যবহার।

মহাশয়!

শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারক পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের বর্ত্তমান মত ও ব্যবহারাদি সম্বন্ধে অল্পদিন হইল আমি ভক্তিভাজন প্রধান আচার্য্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আদিসমাজের সভাপতি ভক্তিভাজন রাজনারায়ণ বসু মহাশয়দিগের নিকট কতিপয় প্রশ্ন করিয়া পত্র লিখিয়াছিলাম। তাঁহারা আমার প্রশ্নের উত্তরে যাহা লিখিয়াছেন তাহা ব্রাহ্ম সাধারণের অবগতির জন্য আপনার পত্রিকাতে প্রকাশ করিলে বিশেষ উপকৃত হইব। নিম্নে মহর্ষি মহাশয়ের মত সম্বলিত পত্রের অবিকল নকল ও রাজনারায়ণ বাবুর পত্রের যে অংশ প্রকাশ করিতে অনুমতি দিয়াছেন তাহা লিপিবদ্ধ হইল। আমি পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের সহিত প্রায় বিশবৎসর যাবৎ বন্ধুতা ও স্নেহসূত্রে আবদ্ধ আছি। ভ্রম কুসংস্কারের তীব্র প্রতিবাদকারী ব্যক্তি ব্রাহ্মসমাজে বিজয় বাবুর ন্যায় আর দ্বিতীয় কেহ ছিল না। শ্রদ্ধাস্পদ কেশব বাবুর কন্যার বিবাহের ভয়ানক আন্দোলনের সময় আমি বিজয় বাবুর সহিত একত্র ও এক হৃদয় হইয়া কেশব বাবুর মত ও কার্য্যাদির প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ কোন প্রকার দূষণীয় মতের প্রচার দ্বারা খর্ব্ব হইতে দেখিলে প্রাণে বড় আঘাত পাই, নির্ব্বাক্ ও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না। তাই বিজয় বাবু দ্বারা পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে যে সকল ভ্রম ও কুসংস্কার প্রবিষ্ট হইতেছে, তাহার প্রতিবাদ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য বোধ করিতেছি। ব্যক্তিবিশেষ অপেক্ষা ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্ম্ম অধিক আদরণীয়।

(১) ব্যক্তি বিশেষকে গুরু বলিয়া মানিয়া তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ না করিলে ধর্ম্ম লাভ হয় না; (২) সাধুদিগের পদধূলি গ্রহণ ও অঙ্গে মাখা, পদে পড়িয়া থাকা, প্রসাদ গ্রহণ ইত্যাদি কার্য্য ধর্ম্মসাধনের উপায়; (৩) উচ্ছিষ্ট ভোজনে আধ্যাত্মিক অবনতি হয়; (৪) শক্তি সঞ্চার দ্বারা পৌত্তলিক ধর্ম্মে বিশ্বাসী, ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরোধী ব্যক্তি ও শিশুদিগকে দীক্ষা প্রদান করা; (৫) ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে আপনাআপনি পৌত্তলিকতা, জাতিভেদ ইত্যাদি কুসংস্কার চলিয়া যাইবে, পূর্ব্বে ঐ সকল ত্যাগ না করিলে ব্রহ্মোপাসনার ক্ষতি নাই, অর্থাৎ যে ব্যক্তি যে ধর্ম্মে সরল ভাবে বিশ্বাস করে সেই ধর্ম্ম সাধন করিতে করিতে সেই ব্যক্তি কালে সত্য লাভ করিবে; (৬) বাসুদেব, নারায়ণ ইত্যাদি পৌত্তলিক নাম দ্বারা দীক্ষা প্রদান; (৭) প্রাণায়াম দ্বারা যোগসাধন; (৮) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন সিদ্ধ যোগীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন এরূপ বলা; (৮) সিদ্ধযোগীরা সূক্ষ্ম শরীরে বিজয় বাবুর নিকট আসেন ও আলাপাদি করেন;—ইত্যাদি বিষয়ে মহর্ষি ও রাজনারায়ণ বাবুর মত জানিবার জন্য পত্র লিখিয়াছিলাম। তাঁহারা উভয়ে অনুগ্রহ পূর্ব্বক যে উত্তর প্রদান করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে ব্রাহ্মগণ দেখিতে পাইবেন যে তাঁহারা বিজয় বাবুর উক্ত মত সকলের পোষকতা করেন না। দেবেন্দ্র বাবুর পত্রে যে তিন খানা পুস্তকের নাম উল্লিখিত হইয়াছে তাহার মধ্যে কোথাও বিজয় বাবুর উক্ত মত সকলের পোষক কোন কথা পাওয়া যায় না। বিজয় বাবু বলেন মহম্মদ ও বুদ্ধের ন্যায় দুই এক ব্যক্তি স্বয়ং ধর্ম্মলাভ করিয়াছিলেন। শক্তি সঞ্চার করিতে সক্ষম এমত সিদ্ধ যোগীর নিকট সাধারণের দীক্ষা গ্রহণ করা আবশ্যক। এই মতের সমর্থনে বিজয় বাবু তাঁহার অনেক শিষ্যের নিকট বলিয়াছেন—গয়াতে যে পরমহংসের নিকট তিনি মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন, সেই পরমহংস যে যোগীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও সেই যোগীর নিকট দীক্ষা কি মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন। এই কথার উত্তরে মহর্ষি স্পষ্ট জানাইয়াছেন যে তিনি কোন যোগীর নিকট কোন প্রকার মন্ত্র গ্রহণ করেন নাই। বিজয় বাবুর কোন কোন শিষ্যের মুখে (তাঁহারা যে প্রণালীতে যোগ সাধন করিতেছেন তাহার পোষণার্থে) একথাও শুনা গিয়াছিল যে, মহর্ষি "প্রাণায়াম" দ্বারা যোগ সাধন করিয়াছেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এবং অন্যান্য কতিপয় ব্রাহ্মের নিকট দেবেন্দ্রনাথ বাবু বলিয়াছেন যে তিনি প্রাণায়াম দ্বারা যোগ সাধন করেন নাই, উহা ব্রাহ্মগণের জন্য অনাবশ্যক, ব্রাহ্মসমাজ প্রচলিত সাধন প্রণালী শ্রেষ্ঠ। এক্ষণে দেখা গেল বিজয় বাবুর বর্ত্তমান সাধন ও দীক্ষার সমর্থনার্থ মহর্ষির নাম উল্লেখ করিয়া যে দুইটী কথা বলা হইয়াছে তাহার একটীরও মূল নাই। মহর্ষির নামে এরূপ কথা বলা কতদূর সঙ্গত হইয়াছে তাহা ব্রাহ্মগণ বিচার করিবেন।

বিশুদ্ধ যুক্তি ও মতের উপর ব্রাহ্মধর্ম্ম সংস্থাপিত, ভ্রম কুসংস্কার উহার ত্রিসীমাতে নাই—ইহাই একমাত্র সত্য, পূর্ণ এবং পরিত্রাণের ধর্ম্ম বুঝিতে পারিয়াই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি। বিজয় বাবু অতিশয় ঈশ্বর ভক্ত ব্যক্তি সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করি, তাঁহার উপদেশ ও সহবাসে অনেক উপকার লাভ করিয়াছি; কিন্তু তিনি এক্ষণে ব্রাহ্মধর্ম্মকে লোকের নিকট যে ভাবে উপস্থিত করিয়াছেন তাহাতে অন্যান্য উপধর্ম্মের সহিত উহার "পার্থক্য" ও "বিশেষত্ব" কিছুই থাকে না। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই ভাবে

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিলে "ব্রাহ্মধর্ম্ম" বলিয়া একটী "সত্যধর্ম্ম" এবং ব্রাহ্মসমাজের নাম এখন কেহ শ্রবণ করিত কিনা গভীর সন্দেহের বিষয়।

২৬শে অগ্রহায়ণ। ১২৯৪। আপনাদের শ্রীনবকান্ত চট্টোপাধ্যায় ঢাকা।

পত্র।

সর্ম্মাদর ভাজন শ্রীযুক্ত বাবু নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সমীপেষু—

সাদর নমস্কারা নিবেদনঞ্চ।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আচার্য্যদেবের প্রতি প্রেরিত আপনার পত্রখানি আসিয়া পঁহুছিয়াছে। তিনি এখন আর পত্রাদি লিখিতে বা পড়িতে পারেন না, সুতরাং আমি আপনার পত্র পাঠ করিয়া তাঁহাকে শুনাইয়াছি এবং তদুত্তরে যাহা যাহা লিখিতে তিনি আমায় আদেশ করিয়াছেন, আপনার গোচরার্থে নিম্নে তাহা প্রকাশ করিতেছি।

ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিয়া যে কোন ব্যক্তি যে কোন কথা বা মত ব্যক্ত করিবেন সে সকলের উত্তর দিতে এবং তাহা লইয়া বাদানুবাদ করিতে এখন আর তাঁহার শক্তি নাই। যাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম, ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ, ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যানে ও ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস পুস্তকে তাহা তিনি সুব্যক্ত করিয়াছেন। এই সকলের বিপরীত কথা যিনি যাহাই বলুন তাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম নহে। ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরোধী কথা যিনি যাহাই বলুন, তাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের কোন অনিষ্ট হইবে না, পরন্তু এই জন্য সেই ব্যক্তিই ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মজনগণের নিকট হতাদর হইবেন।

মহর্ষি আচার্য্য গুরুদেব তাঁহার নিজের সম্বন্ধে এই বলেন যে, যে দিন তিনি অন্যান্য ব্রাহ্মগণের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের প্রতিজ্ঞা পাঠ করিয়াছিলেন, সে দিবস রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ অনুরুদ্ধ হইয়া বেদীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত তিনি কোন যোগীর নিকট কোন প্রকার মন্ত্র গ্রহণ করেন নাই। ইতি ১৯এ অগ্রহায়ণ ৫৮।

শ্রীপ্রিয়নাথ শাস্ত্রী।

পত্রে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নাম উল্লেখ করিবার কারণ এই যে, আমি মহর্ষিকে পত্র[illegible]ছিলাম—"আমরা জানি আপনি রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত শক্তিসঞ্চার করিতে সক্ষম এমত কোন যোগীর নিকট আপনি দীক্ষা কি মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন কিনা" ?

রাজনারায়ণ বাবুর পত্র।

পরম প্রণয়াস্পদ মিত্রবরেষু—

আপনার ১৬ অগ্রহায়ণের পত্র পাইয়া যার প্লর নাই দুঃখিত হইলাম। * * * * * "কয়েক মাসঃ পূর্ব্বে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় দেওঘরে আইসেন। তাঁহার সহবাসে একদিন থাকিয়া দেখিলাম তাঁহার যেরূপ আধ্যাত্মিক উন্নতি হইয়াছে এরূপ আধ্যাত্মিক উন্নতি ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে বিরল। যে একদিন এখানে ছিলেন তাঁহার সহবাসে কি পর্য্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম তাহা বলিতে পারি না। তাঁহার সহিত ছাড়াছাড়ি হইবার সময় কষ্ট হইতে লাগিল। কিন্তু উল্লিখিত আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের সঙ্গে তিনি এমত কতকগুলি মত অবলম্বন করিয়াছেন যাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের শাস্ত্রসঙ্গত নহে এবং যাহা অবলম্বন জন্য ব্রাহ্মেরা নিজ সম্প্রদায়ের বক্ষে তাঁহাকে রাখিতে পারেন না আর তাঁহারও তাহাতে থাকা উচিত হয় না। তিনি যদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে বাহির হইয়া একটি নূতন হিন্দু সম্প্রদায় সংস্থাপন করেন তাহা হইলে উক্ত অসঙ্গত দোষ অপনীত হয় এবং তিনি আমার অবিমিশ্র শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। আমি অন্যান্য হিন্দু সম্প্রদায়ের (ব্রাহ্ম সম্প্রদায়কে আমি হিন্দু সম্প্রদায় জ্ঞান করি) একান্ত ঈশ্বরপরায়ণ সাধুদিগকে তাঁহাদিগের ভ্রম সত্ত্বে যেমন অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি তাঁহাকেও সেরূপ শ্রদ্ধা করিব। আমি তাঁহাকে একজন প্রকৃত সাধুপুরুষ বলিয়া মনে করি। মত বিভেদ সত্ত্বেও আমি ঐরূপ জ্ঞান করি। মনুষ্যের মুখশ্রী যেমন ভিন্ন ভিন্ন তেমনি ধর্ম্মমতও ভিন্ন ভিন্ন। আমি কখনই প্রত্যাশা করিতে পারি না যে, সকল মনুষ্য এক মতাবলম্বী হইবে।"

স্নেহশীল
শ্রীরাজ নারায়ণ বসু।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার তৃতীয় ত্রৈমাসিক অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ।

গত ১৬ই অক্টোবর রবিবার অপরাহ্ণ দুই ঘটিকার সময় সিটীকলেজ গৃহে অধ্যক্ষ সভার তৃতীয় ত্রৈমাসিক অধিবেশন হয়। তাহাতে নিম্নলিখিত সভ্যগণ উপস্থিত ছিলেন,—

শ্রীযুক্ত আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সীতানাথ নন্দী, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র দে, শ্রীযুক্ত রজনীনাথ রায় ও শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বসু সহকারী সম্পাদক।

উপযুক্ত সংখ্যক সভ্য উপস্থিত না থাকায় উক্ত অধিবেশনে স্থির হয় যে, ২৩এ অক্টোবর রবিবার বেলা ২টার সময় সিটিকলেজ গৃহে অধ্যক্ষ সভার পুনরধিবেশন হইবে। তদনুসারে ২৩এ অক্টোবর রবিবার সভ্যগণ সিটীকলেজ গৃহে সমবেত হন। অপরাহ্ণ দুই ঘটিকার সময় সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত সভ্যগণ উপস্থিত ছিলেন :—

শ্রীযুক্ত গুরুচরণ মহলানবিশ (সভাপতি), শ্রীযুক্ত মথুরামোহন গঙ্গোপাধ্যায়, সীতানাথ নন্দী, উমাপদ রায়, কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়, নীলরতন সরকার, আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, কেদারনাথ রায়, হরকিশোর বিশ্বাস, শ্রীশচন্দ্র দে, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সীতানাথ দত্ত, জয়কৃষ্ণ মিত্র, শশিভূষণ বসু, নবদ্বীপ চন্দ্র দাস, কৃষ্ণকুমার মিত্র, উমেশচন্দ্র দত্ত এবং শশিভূষণ বসু (সহকারী সম্পাদক)।

দর্শক ;—শ্রীযুক্ত হরনাথ বসু, কুঞ্জবিহারী সেন, ও গগন চন্দ্র হোম।

শ্রীযুক্ত গুরুচরণ মহলানবিশ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর বিগত ত্রৈমাসিক অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল। তদনন্তর কার্য্য নির্ব্বাহক সভার তৃতীয় ত্রৈমাসিক কার্য্য বিবরণ ও হিসাব পাঠ করা হয়।

ত্রৈমাসিক কার্য্য বিবরণের স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তনের পর উহা এবং তৎসহ ত্রৈমাসিক হিসাব সভাকর্ত্তৃক গ্রাহ্য বলিয়া স্থির হইল।

তাহার পর কার্য্য নির্ব্বাহক সভার পক্ষ হইতে বাবু দ্বারকানাথ চট্টোপাধ্যায় প্রস্তাব করিলেন যে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ব্রাহ্মমিসন প্রেসের স্বত্বাধিকার আপনাদের হস্তে গ্রহণ করেন। এবং প্রেসের কার্য্য প্রণালী স্থির করিবার জন্য যে সবকমিটী নিযুক্ত করা হইয়াছিল তাহার রিপোর্ট পাঠ করিলেন।

বাবু মধুসূদন সেন এই প্রস্তাবের পোষকতা করিলে পর, বাবু সীতানাথ দত্ত প্রস্তাব করিলেন যে, ২৫এ অক্টোবর শুক্রবার বেলা ২টার সময় এই বিষয় নির্দ্ধারণার্থ অধ্যক্ষ সভার পুনরধিবেশন হইবে। বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় এই প্রস্তাবের পোষকতা করেন, এবং সভা তাহাই স্থির করেন।

তদনুসারে উক্ত দিবস নির্দ্ধারিত সময়ে সিটিকলেজ ভবনে অধ্যক্ষ সভার পুনরধিবেশন হয়। সভার নিম্নলিখিত সভ্যগণ উপস্থিত ছিলেন;—

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত (সভাপতি), শ্রীযুক্ত সীতানাথ নন্দী, আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, কেদার নাথ মুখোপাধ্যায়, হরকিশোর বিশ্বাস, মথুরামোহন গঙ্গোপাধ্যায়, জয়কৃষ্ণ মিত্র, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সীতানাথ দত্ত, উমাপদ রায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, নবদ্বীপ চন্দ্র দাস, শশিভূষণ বসু, আনন্দমোহন বসু, গুরুচরণ মহলানবিশ, কালীশঙ্কর শুকুল, গগনচন্দ্র হোম, অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়, ও শশিভূষণ বসু (সহকারী সম্পাদক)।

দর্শক;—শ্রীযুক্ত হরিমোহন ঘোষাল, শরচ্চন্দ্র সোম, হরনাথ বসু, কুঞ্জবিহারী সেন ও বরদাপ্রসন্ন রায়।

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর ব্রাহ্মমিসন প্রেসের স্বত্বাধিকার গ্রহণ সম্বন্ধে প্রস্তাব উত্থাপিত হইল এবং স্থির হইল যে,—

এই বিষয় মীমাংসা করিবার ভার কার্য্য নির্ব্বাহক সভার উপর দেওয়া হউক।

তাহার পর বাবু হীরালাল হালদারের এক পত্র পাঠ করা হয়। তাহাতে তিনি প্রস্তাব করিয়া পাঠান যে, পণ্ডিত বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়কে আগামী মাঘোৎসবে যোগ দিবার জন্য বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ করিতে কার্য্য নির্ব্বাহক সভাকে অনুরোধ করা হয়। বাবু সীতানাথ নন্দী এই প্রস্তাবের পোষকতা করেন।

এই বিষয় লইয়া কিঞ্চিৎ বাদানুবাদের পর বাবু সীতানাথ নন্দী প্রস্তাবকারীর পক্ষ হইতে প্রস্তাব উঠাইয়া লইতে স্বীকৃত হইলেন।

তাহার পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যরূপে মনোনীত হইলেন;—

বাবু নিবারণ চন্দ্র দাস, বাবু প্রতুল চন্দ্র সোম, বাবু গগনচন্দ্র দাস।

তাহার পর সভা ভঙ্গ হইল।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

স্থানান্তরে আমাদের ঢাকাস্থ বন্ধু নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়, মহাশয়ের একখানি পত্র প্রকাশিত হইল। তত্ত্বকৌমুদীর পাঠকদিগের অবিদিত নাই যে কিছুদিন হইতে শ্রদ্ধাস্পদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় কতকগুলি নূতন মত ও এক প্রকার নূতন সাধনপ্রণালী প্রচার করিতেছেন। তাহা ইতিপূর্ব্বে তত্ত্বকৌমুদীতে ও গোস্বামী মহাশয়ের প্রকাশিত যোগ সাধন নামক গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। ঐ সকল বিষয়ের সবিস্তর পুনরুল্লেখ করিয়া প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইবার ইচ্ছা ছিল না। অনেক সরল-চিত্ত, ধর্ম্ম পিপাসু, ও চরিত্রাংশে অতি শ্রদ্ধের ব্রাহ্ম যুবক এই সকল ভ্রমে পতিত হইতেছেন, ইহাতে আমরা অতিশয় দুঃখিত, তথাপি এতদিন প্রকাশ্যভাবে প্রতিবাদ ও আন্দোলন করা যায় নাই। নানা প্রকার কারণে এই প্রকার নীতি অবলম্বন করা গিয়াছে; তাহার প্রধান দুইটী কারণ এই;—প্রথম পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ন্যায় ব্রাহ্মসমাজের সেবা কে করিয়াছেন? তিনি যে ভয়ানক রোগে চির জীবনের জন্য আক্রান্ত সে রোগ এই ব্রাহ্মসমাজের সেবার জন্যই জন্মিয়াছে; কিরূপে সত্যের হস্তে প্রাণ সমর্পণ করিয়া ঈশ্বরের সেবা করিতে হয়, ইহার দৃষ্টান্ত আমরা যেমন তাঁহার নিকট পাইয়াছি এমন অতি অল্প স্থানেই দেখিয়াছি; তাঁহার ন্যায় কুসংস্কার ও অসত্যের প্রতিবাদ কে করিয়াছে? তিনিইত সর্ব্বপ্রথমে প্রতিবাদ করিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত করেন, তিনিই বিদ্ধত কীর্ত্তি কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গঠনে সহায়তা করেন। আমাদের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার প্রতি তাঁহার এই একমাত্র দাওয়া নহে, ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যে অল্প সংখ্যক ব্যক্তির প্রতি সাধক নাম প্রয়োগ করা যাইতে পারে তিনি তন্মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি; যাঁহার নিকট এত কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধায় ঋণ, তাঁহার কার্য্য সম্বন্ধে বিবাদ বিসম্বাদে প্রবৃত্ত হইয়া পাছে দলাদলি ও তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ, ঘৃণা, নিন্দা প্রভৃতির দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়,—এই ভয় ছিল। দ্বিতীয়, একবার বাদ প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইলে তাহাতে আমাদের যে কিঞ্চিৎ সময়, যে বাক্য, যে পরিশ্রম ব্যয় হইবে তাহা সমাজের কার্য্যে ও ধর্ম্ম সাধনে নিয়োগ করিলে অধিক কল্যাণের সম্ভাবনা আমাদের এইরূপ ধারণা ছিল। আজ যে আমাদের অবলম্বিত নিয়মের ব্যাঘাত করিয়া নবকান্ত বাবুর পত্র মুদ্রিত করা গেল, তাহা কেবল একটী অসত্য প্রচারের পথে অর্গল দিবার জন্য। গোস্বামী মহাশয়ের নবশিষ্যগণ নিজ পক্ষ সমর্থনার্থে এই কথা রাষ্ট্র করিয়াছেন যে, ভক্তিভাজন প্রধান আচার্য্য—শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ও গোপনে কোন সাধুর নিকট তাঁহাদের প্রণালীর অনুরূপ কোন প্রণালীতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। নবকান্ত বাবু যে এই অসত্য প্রচার বন্ধ করিবার জন্য এত ক্লেশ স্বীকার

করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার ব্রাহ্মসমাজের প্রতি অনুরাগই প্রকাশ পাইতেছে। আশা করি আমাদের নব-যোগী বন্ধুগণ ইহার পরে আর মহর্ষি মহাশয়ের নামে ওরূপ কথা প্রচার করিবেন না।

এখন প্রশ্ন হইতেছে সিদ্ধযোগীর নিকটে শক্তি সঞ্চার ভিন্ন, আধ্যাত্মিক উচ্চ অবস্থা পাওয়া যায় না, ইহা যদি সত্য হয়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কিরূপে সে অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন? এস্থলে আমরা বিনয়ের সহিত নব-যোগী ভ্রাতাদিগকে একটী কথা চিন্তা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি। আমাদের বিবেচনায় তাঁহারা একটী ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। আমাদের সাধন-বিহীনতার দোষে যাহা চলিতেছে, তাহা তাঁহারা ভ্রম ক্রমে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা প্রণালীর উপরে আরোপণ করিতেছেন। সাধন-বিহীন হইয়া অতি উৎকৃষ্ট প্রণালী অবলম্বন করিলেও তাহার ফল দর্শে না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রাণ মন দিয়া ইহাকে সাধন করিয়াছেন বলিয়া ইহার রস পাইয়াছেন, সাধন করিয়া দেখ তোমরাও রস পাইবে। ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে এখনও সাধনের ভাব পরিস্ফুট হয় নাই, ইহা স্বীকার করি; কোথায় সকলে প্রাণপণে সেই দিকে যত্ন করিব না অনেকে ঈশ্বরের এমন অমূল্য দানকে অবহেলা করিয়া অপর দিকে ছুটিতেছেন। ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়।

যে সকল ব্রাহ্মবন্ধু গোস্বামী মহাশয়ের নব প্রণালীতে দীক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি আমাদের কি ভাব? আমরা বিশ্বাস করি যে পবিত্র পুরুষ আমাদিগের হস্ত ধরিয়া ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে আনিয়াছেন, তিনিই তাঁহাদিগকে আনিয়াছেন। তাঁহারা ধর্ম্মের জন্য, বিশ্বাসের জন্য, ব্রাহ্মসমাজের জন্য কত কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, সেই কৃপাময়ের কৃপা ভিন্ন কি এ সকল সম্ভব হয়? তিনি কেন তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্মের ও ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয়ে আনিয়াছিলেন? তাঁহাদিগকে তরাইবেন, এবং তাঁহাদের দেহ মন, শক্তি লইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে জগতে প্রতিষ্ঠিত করিবেন বলিয়া। এই ব্রাহ্মসমাজ যেমন আমাদের ঘর, তেমনি তাঁহাদেরও ঘর। ব্রাহ্মধর্ম্মের গৌরব এই যে, আমরা মত, রুচি, প্রভৃতি প্রবৃত্তিগত বহুতর বিভিন্নতা সত্ত্বেও তাঁহার পরিবার ভুক্ত থাকিয়া তাঁহার সেবা করিব। আমাদের মধ্যে নিরামিষাশী ও আমিষাশী, গেরুয়াধারী, হ্যাটকোট পরিধায়ী, খ্রীষ্ট ভাবাপন্ন ও হিন্দু ভাবাপন্ন, সকল প্রকার একত্র বসবাস করিবেন। এ সকল বৈচিত্র সত্ত্বেও পরস্পরের প্রতি উদারতা, স্নেহ, আত্মীয়তা থাকিবে। কিন্তু সকল বৈচিত্রের মধ্যে আমাদের সকলের হৃদয় ব্রাহ্মসমাজে থাকিবে এবং সকলের হস্ত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে নিয়ত থাকিবে। যে কোন প্রণালী বা সাধন ব্রাহ্মদিগকে এই উভয় যোগ হইতে বিচ্ছিন্ন করিবে, তাহাকে ব্রাহ্মসমাজের প্রাণনাশক বলিয়া গণনা করিতে হইবে। কি পরিতাপের বিষয়, গোস্বামী মহাশয়ের অবলম্বিত প্রণালীকে নবকান্ত বাবুর ন্যায় আরও অনেকে ব্রাহ্মধর্ম্মের ও ব্রাহ্মসমাজের প্রাণনাশক বলিয়া অনুভব করিতেছেন। হইতে পারে, যে এরূপ বিবেচনা করা তাঁহাদের পক্ষে ভ্রম, কিন্তু এই ভ্রম বহুজনের মনে জন্মিতেছে। যাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের অনিষ্টের সম্ভাবনা, তাহার প্রতি ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের হিতৈষী মাত্রেরই বিরাগ জন্মে। এই কারণের এত বিরাগ দৃষ্ট হইতেছে। যদি লোকের মনের সংস্কারকে তাঁহার ভ্রান্ত সংস্কার বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে আপনাদের আচরণের দ্বারা ত্বরায় ইহা দূর করিবার উপায় করা কর্ত্তব্য।

আমাদের কোন বন্ধুর লিখিত "নির্জ্জন-চিন্তা" শীর্ষক কতকগুলি প্যারাগ্রাফ গতবারে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার একস্থলে "তখন আমরা পাপ ও পুণ্য, সুখ ও দুঃখ, শান্তি ও অশান্তির অতীত হইয়া" ইত্যাদি কথা লিখিত থাকায় আমরা তন্নিম্নে মন্তব্যে লিখিয়াছিলাম, "ইহা বেদান্ত শাস্ত্রানুমোদিত নির্ব্বাণ মুক্তির অবস্থা। ব্রাহ্মধর্ম্মের মুক্তির আদর্শ অন্যরূপ।" গতবারের "তত্ত্বকৌমুদী" প্রকাশিত হইবার পর আমাদের উক্ত বন্ধু আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, তিনি "নির্ব্বাণ মুক্তি" মতের পক্ষপাতী নহেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম যাহাকে মুক্তি বলেন তাহার সহিত তাঁহার মতের কোন প্রকার ভিন্নতা নাই। তাঁহার যে কথাগুলির উপর আমরা মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলাম তৎসম্বন্ধে তাঁহার কেবল এইমাত্র বলা অভিপ্রেত ছিল যে, তিনি[illegible]-অবস্থার কথা বলিয়াছেন সে অবস্থায় স্থূলদর্শী লোকে যাহাকে পাপ পুণ্য, সুখ দুঃখ বা শান্তি অশান্তি বলে তাহার অতীত হইয়া আমরা সাংসারিক দুঃখ বিপদ যন্ত্রণা প্রভৃতি হইতে বিশ্রাম লাভ করিব। এবং এই জন্যই তিনি শেষে "অনন্ত শান্তির পথে অগ্রসর হইতে থাকিব" এইরূপ কথা বলিয়াছেন।

সংবাদ।

তত্ত্ববিদ্যা সভা;—বিগত ১৭ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার সন্ধ্যা ৭৷৷০ ঘটিকার সময় ১৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ভবনে তত্ত্ববিদ্যা সভার এক সাধারণ অধিবেশন হয়। তাহাতে বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর "সমাধি" সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধ পাঠ শেষ হইলে পর যে আলোচনা হয় তাহাতে শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত, সীতানাথ দত্ত এবং ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায় মন্তব্য প্রকাশ করেন। রাত্রি দশটার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

ছাত্র সমাজ;—গত ২৫এ অগ্রহায়ণ শনিবার ৬ ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় ছাত্র সমাজে উপাসনা করেন এবং সুরাবিরোধী জেম্‌স্ ষ্টার্লিংএর জীবন চরিত অবলম্বন করিয়া একটী লিখিত উপদেশ পাঠ করেন।

পূর্ব্ব-বাঙ্গালা প্রচারক নিবাস;—গত ৪ঠা অগ্র-

হায়ণ পূর্ব্ব-বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের যে অধিবেশন হয় তাহাতে "রামচন্দ্র প্রচারক নিবাস" ও "পূর্ব্ব-বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের প্রচার কার্য্যালয়" সম্বন্ধে লিখিত নিয়মগুলি নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

প্রচারক নিবাস সম্বন্ধীয় সাধারণ নিয়ম।

(প্রচারক নিবাস বলিতে নীচের তালার হল, গৃহ ও তাহার বারান্দা ব্যতীত উক্ত বাটী ও তাহার সমস্ত প্রাঙ্গণ বুঝাইবে।)

১। যাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ ও পবিত্রতা খর্ব্ব-হয়, প্রচারক নিবাসে এমন কোনও কার্য্য হইতে পারিবে না।

২। মন্দিরে যখন উপাসনা, বক্তৃতা বা উপদেশাদি হইবে, তখন তাহার ব্যাঘাত হইতে পারে এমন কোনও কার্য্য প্রচারক নিবাসে বা প্রচার কার্য্যালয়ে হইতে পারিবে না। (প্রচারক নিবাসে যে আচার্য্য বা প্রচারক বাস করিতেছেন তাঁহার স্বসম্পর্কীয় অথচ ব্রাহ্মধর্ম্ম ভিন্ন অন্য ধর্ম্মাবলম্বী কোনও ব্যক্তি যদি তাঁহার সহিত উক্ত বাটীতে থাকেন তবে উক্ত ব্যক্তি তাঁহার নিজ বিশ্বাসানুযায়ী দৈনিক পূজা অর্চনাদি করিতে পারিবেন।)

প্রচার কার্য্যালয় সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী। ("প্রচার কার্য্যালয়" বলিতে প্রচারক নিবাসের নীচের তালার হল গৃহ ও তৎসম্মুখস্থ বারান্দা বুঝাইবে।)

১। যাহাতে পৌত্তলিক অথবা নাস্তিক ভাবের উদ্রেক হইতে পারে, অথবা যাহা অন্য কোনও প্রকারে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরোধী এরূপ কোনও কার্য্য, গান বা সঙ্কীর্ত্তন এই প্রচার কার্য্যালয়ে হইতে পারিবে না।

২। প্রচার কার্য্যালয়ে কোনও ধর্ম্মকে নিন্দা বা উপহাস করা হইবে না। কিন্তু সকল প্রকার ধর্ম্ম বিশ্বাস সম্বন্ধে আলোচনা থাকিবে।

৩। রোগ প্রতীকার ভিন্ন অন্য কোনও কারণে কোন প্রকার মাদক দ্রব্য প্রচার কার্য্যালয়ে গ্রহণ বা সেবন করা হইবে না। (তামাকু ও নস্য এই নিয়মের অন্তর্ভূত নহে)

৪। যাহাতে পৌত্তলিক বা অপবিত্র ভাবের উদয় হইতে পারে এরূপ কোন প্রকার চিত্র বা মূর্ত্তি প্রচার কার্য্যালয়ে রাখা হইবে না।

৫। আমাদের দেশে যে প্রকার পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিবার রীতি প্রচলিত আছে, প্রচার কার্য্যালয়ে সেরূপ অভিবাদন চলিতে পারিবে; কিন্তু এখানে কেহ কাহাকেও সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিতে বা কাহারও চরণ ধরিয়া থাকিতে পারিবেন না।

পুনা প্রার্থনা সমাজ;—গত ১৮ই অগ্রহায়ণ শনিবার হইতে ২৬এ অগ্রহায়ণ রবিবার পর্য্যন্ত পুনা প্রার্থনা সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব নিম্নলিখিত প্রণালীতে সম্পন্ন হইয়াছে;—

১৮ই অগ্রহায়ণ, শনিবার;—সায়াহ্নে সাধারণ অধিবেশন ও কার্য্যবিবরণ পাঠ।

১৯এ, রবিবার (বিশেষ উৎসবের দিন);—প্রাতে উপাসনা, অপরাহ্নে বালক বালিকাদিগের সম্মিলন; সায়াহ্নে উপাসনা।

২০এ, সোমবার;—রাত্রিতে ইংরাজী বক্তৃতা।

২১এ, মঙ্গলবার;—রাত্রিতে পুরাণ পাঠ।

২২এ, বুধবার;—রাত্রিতে সঙ্গত সভা ও শাক্যমুনির জীবন-চরিত সম্বন্ধে ডি, গাঙ্গুলির বক্তৃতা।

২৩এ, বৃহস্পতিবার;—রাত্রিতে মহারাষ্ট্রী ভাষায় বক্তৃতা।

২৪এ, শুক্রবার;—রাত্রিতে কীর্ত্তন।

২৫এ, শনিবার ও ২৬এ, রবিবার;—উপাসনা ও সাধনার্থ পল্লীগ্রামে গমন।

পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের উৎসব;—গত ১৯শে অগ্রহায়ণ হইতে ২৬শে তারিখ পর্য্যন্ত পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্ম-সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই উৎসব উপলক্ষে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এখানে আগমন করিয়াছিলেন। উৎসবের কয়েকদিন উপাসনা কার্য্য পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, এবং বাবু রজনী কান্ত ঘোষ কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া ছিল। ধর্ম্মালোচনার দিন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কয়েকটী অতি সুন্দর সারগর্ভ উপদেশ দিয়াছিলেন। ২০শে অগ্রহায়ণ তারিখে পূর্ব্ব বঙ্গ রঙ্গ-ভূমি গৃহে শাস্ত্রী মহাশয় "রাজা রামমোহন রায় ও তাঁহার জীবনের শিক্ষা" বিষয়ে সুদীর্ঘ একটী উৎকৃষ্ট বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। সভাস্থলে ৫।৬ শত লোক সমাগত হইয়াছিলেন। ২৩শে তারিখে উক্ত রঙ্গ ভূমি গৃহে "ভারতে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষ কার্য্য" বিষয়ে শাস্ত্রী মহাশয়ের আর একটী বক্তৃতা হয়। বক্তৃতা দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম কি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য এদেশে অভ্যুদিত হইয়াছেন তাহা অতি সুন্দর রূপে প্রদর্শিত হইয়াছিল। জ্ঞান এবং প্রেম সাধন দ্বারা যেমন ঈশ্বর লাভ করা ব্রাহ্মধর্ম্মের আদেশ, সৎকার্য্যও একটী ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রধান সাধন। কেবল ধ্যান ধারণা দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষ উদ্দেশ্য সম্পন্ন হইবে না এই বিষয় কয়েকটী অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইয়া দিয়াছিলেন। ভারতবর্ষীয় এবং ইউরোপীয় ধার্ম্মিক লোকের পার্থক্য অতি উজ্জ্বলরূপে দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। ২৫শে তারিখ বাবু মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় "মনুষ্যত্বের লক্ষণ" বিষয় পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মমন্দির গৃহে একটী অতি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন যে, যাহা সত্য বুঝিবে তদনুযায়ী কার্য্য করিতেই হইবে এবং ঐরূপ কার্য্য করাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব। ২৭শে তারিখ প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ব্রাহ্মিকাদের উৎসব কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছিল। শ্রদ্ধাস্পদ মনোরমা মজুমদার মহাশয়া এবং শ্রদ্ধাস্পদ মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় দ্বারা এই দিনের কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভা মনোনার্থ ভোটীং পত্র বিতরিত হইয়াছে। যে সকল সভ্য মহাশয়রা তাহা প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহারা আবেদন করিলে তাহা প্রাপ্ত হইবেন।

সাঃ ব্রাঃ সমাজ কার্য্যালয়
২১০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
১২ই ডিসেম্বর ১৮৮৭।

শ্রীশশিভূষণ বসু,
সহঃ সম্পাদক।

১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিশন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা ১ই পৌষ মুদ্রিত ও ২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১০ম ভাগ।
১৭শ সংখ্যা।

১৬ই পৌষ শুক্রবার, ১৮০৯ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৮

বাৎসরিক অগ্রিমমূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৴১০

পূজার আয়োজন।

মনের আশা।

চলিতে চলিতে পথে উঠি পড়ি শতবার,
তুমি আশা দেও মনে, সঞ্চার স্বর্গীয় বল ;
ভজনসাধনহীন, আমি অতি দুরাচার,
নিজ দোষে পাপে পড়ি', যাতনা চরম ফল।
দেখে শুনে অবশেষে, লয়েছি শরণ তব,
করিতেছি তব কাছে চিরতরে অঙ্গীকার,—
যায় যাবে প্রাণ তবু আমার যা কিছু সব
তব পদে দিব, তাতে তোমারি যে অধিকার।
নাহি চাহি হ'তে আমি বৈরাগী ; বিজনে বসি'
না চাহি থাকিতে নাথ ! মুদে আঁখি অনুক্ষণ ;
ধনমানযশোলোভে ফিরিব না দিশি দিশি ;—
তোমা ধনে ছাড়ি' অন্য ধনে কিবা প্রয়োজন ?
চলিব তোমার সাথে আঁখি রাখি তব পানে ;
করিব তোমার গৃহে দাসত্ব ব্রত পালন ;
প্রাণযোগে যোগী হ'য়ে শুনিব বিবেক কাণে
তোমার অভয় বাণী ;—করহে আশা পূরণ।

প্রভু, তোমার সঙ্গে ভাব রাখিতে আমরা একান্ত অশক্ত। যখন মন ভাল থাকে, উপাসনায় যখন প্রাণ গলিয়া যায়, তখন তোমার সঙ্গে কতই ভাব করি, তোমার কাছে তোমার মনোমত কতই প্রতিজ্ঞা করি, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, সেইভাব রাখিতে পারিনা, অনেকক্ষণ যাইতে না যাইতে তোমার কাছে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম সব ভুলিয়া যাই। তোমার উপর আজিও মন ভাল করিয়া বসে নাই, তোমার প্রতি ভালবাসা দাঁড়ায় নাই, জমাট বাঁধে নাই, ভাসিয়া বেড়াইতেছে। কতবারই তোমাকে প্রাণ দিতেছি আবার কতবার ফিরাইয়া লইতেছি। অন্যলোক হইলে আমাদের মুখ দর্শন করিত না। তুমি নাকি বড় দয়ালু, তোমার প্রকৃতি নাকি বড়ই কোমল, তাই তুমি আমাদিগকে নিকটে যাইতে দেও। ভাবের উচ্ছ্বাসের সময় তোমার কাছে যত কথা কহি, পরে তার কয়টা রক্ষা করি ? পদে পদে তোমার কাছে মিথ্যাবাদী হইতেছি, তবু তুমি দয়া করিতে কখন পরাঙ্মুখ নহ। চিরকাল কি তোমার সঙ্গে এমনই অসদ্ব্যবহার করিব? চিরকালই তোমার মধুর ব্যবহারে এমনই বিকৃত প্রতিশোধ দিব ? তাই বলি, যে ভাব রাখিতে শিখাও। অল্প ভাব করি সেও ভাল, কিন্তু যেটুকু ভাব করিব সেটুকু যেন চিরকালের জন্য করি।

—০—

তোমার এক ইচ্ছার বলে এতবড় বিশ্ব নির্ম্মিত হইয়াছে। তোমার ক্ষমতার সীমা কৈ ? তোমার এককণা শক্তি লইয়া ঝটিকা শত শত বনস্পতিকে ভূপাতিত করে। তোমার সন্তান হইয়া কিন্তু আমার এমন ইচ্ছার বল নাই যে,নিজকৃত প্রতিজ্ঞা পালন করি। আমি কি হতভাগ্য ! সর্ব্বশক্তিমানের পুত্র হইয়া আমি দুর্ব্বল ও বীর্য্যহীন। দেখ আমার উপর অপ্রেম, স্বার্থপরতা ও বিষয়াসক্তি কেমন সুখে রাজত্ব করিতেছে। বিনা বাক্যব্যয়ে আমি তোমার স্থানে কেমন তাহাদিগকে অধিকার করিতে দিয়াছি ! বহুকাল হইতে দাসত্ব করিয়া মন নীচ ও নিস্তেজ হইয়া গিয়াছে। তোমার নাম করিয়া আমি যে দুষ্কর কার্য্য সকল করিতে পারি তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। তোমার বলে ভক্তগণ যে অলৌকিক ক্রিয়া সকল করিয়া গিয়াছেন তাহা মনে রাখিতে পারি না। প্রভু ! তোমার সন্তানের দিকে একবার চাহিয়া দেখ। এ ক্ষীণ, দুর্ব্বল ও নিষ্প্রভ আত্মা দেখিলেই তোমার দয়া হইবে, তুমি বিনা আমার ইচ্ছাকে সবল করিতে পারে এমন আর কেহ নাই। মহা-শক্তি ! দুর্ব্বল প্রাণে শক্তি সঞ্চার কর।

—০—

এখনও যেন কি একটু ব্যবধান তোমার ও আমার মাঝে রহিয়াছে। নহিলে তোমাতে ডুবিতে পারিতেছি না কেন ? নহিলে আরাধনা ও ধ্যানের সময় সম্পূর্ণরূপে আত্মবিস্মৃত হইতে পারি না কেন? এতদিন তোমার জন্য ক্রন্দন করিয়াও সে ব্যবধান ঘুচাইতে পারিলাম না কেন ? বুঝি বা ক্রন্দন করিবার কোন দোষ ঘটিয়া থাকিবে। হয়ত আমি ইচ্ছা করিয়া সেই ব্যবধানটুকু রাখিয়াছি। আমি হয়ত ভরসা করিয়া একেবারে তোমার সম্মুখে যাইতে চাহিনা। অল্প বিশ্বাসী আমি, তাই তোমার পুণ্যময় আবির্ভাবের নিকট সম্পূর্ণরূপে আপনাকে উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করিনা। তুমিত এমন দেবতা

নহ যে আমি তোমাকে সম্মুখে দেখিতে চাহিব, আর তুমি পশ্চাতে লুকাইয়া থাকিবে। প্রভু মিনতি করি কি সে ব্যবধান? কিসে তাহা দূর হয় বলিয়া দাও। আর কতদিন পৃথক্ হইয়া থাকিব? অব্যবহিত সন্নিধানে তোমাকে না দেখিলে জীবন-রথ আর ভাল করিয়া চলেনা। পিতা পুত্রে কি যবনিকা মধ্যে রাখিয়া কথা বার্ত্তা চলিতে পারে? পিতাই বা কেমন করিয়া তৃপ্ত হন, পুত্রই বা কেমন করে উদ্ধার পায়? আমি যে তোমার দর্শনের বড় কাঙ্গাল। মুখের আবরণ খোল, আমি তোমার মুক্তরূপ দেখিয়া জীবনের সম্বল করিয়া লই।

—০—

প্রভু, আমি খুব স্বার্থপর। অন্যের জন্য আমি কতক্ষণ ভাবি? অন্যের জন্য আমি কি করি? আমি কেবল আমার সুখ স্বচ্ছন্দ, আমার সাধন ভজন লইয়া ব্যস্ত। অন্যে সুখ স্বচ্ছন্দে আছে কি না, অন্যের সাধন ভজন কেমন হইতেছে, তাহা জানিতে আমি তত ব্যগ্র নহি। এই স্বার্থপরতাই আমার সর্ব্বনাশ করিল। এই আত্মপর জ্ঞানরূপ গ্রন্থি আমার মুক্তির পথ অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। "উদার চরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকং" কথাটি আমার সম্বন্ধে পুস্তকেই আবদ্ধ রহিয়াছে। আমি মুখে বলি সবাই আমার ভাই, কাজে কিন্তু সবাই আমার পর। এমন নীচ মনেও আশা হয় যে, একদিন তোমার কৃপায় এই ভেদজ্ঞান ঘুচিবে ও আমি আত্মপর নিরপেক্ষ হইয়া মুক্তভাবে সকলকে প্রাণে ধারণ করিতে পারিব। সকলকে আপনার বলিয়া মনে না করিলে যে ক্ষমা আসে না, রাগ যায় না। তোমার উদার প্রেমের এককণা দিয়া এই অধমের নীচতা কি ঘুচাইবে? কে সঙ্কীর্ণতা পোষণ করিতে চায়? অনেক দিন স্বার্থপরতার সেবা করিয়াছি, সে এখন শীঘ্র আমাকে ছাড়িতে চায় না। তুমি দয়া করিয়া আমাকে স্বার্থপরতার পাশ হইতে মুক্ত কর।

উৎসবের দেবতা, উৎসব আগত প্রায়। এই বেলা হইতে আমার দুর্ব্বল মনকে প্রস্তুত করিয়া দাও। কত উৎসব সম্ভোগ করিলাম, তুমি কত ধন রত্ন দিলে। নির্ব্বোধ ছেলের ন্যায় আমি প্রায় সে সব হারাইয়াছি। এবার আবার দিতে হইবে। অল্প দিলে চলিবে না, আমার অনেক আকাঙ্ক্ষা, অনেক দিতে হইবে। আগামী বৎসরের সম্বল করিয়া দিতে হইবে। শুধু দিলে হইবেনা। আমি বড় অসাবধান, বড় নির্ব্বোধ। তুমি আমার বস্ত্রে ধন রত্ন বাঁধিয়া দাও, শত্রুরা আসিয়া সে সব কাড়িয়া লয়। ধন রত্ন দিবার সময়ে উহা রক্ষা করিবার শক্তি দিও। এবার উৎসব হইতে যেন নবজীবনের স্রোত খুলিয়া যায়—নূতন প্রতিজ্ঞা পাশে আপনাকে বদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। তুমি সহায় হও, মনকে প্রবুদ্ধ কর।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

উৎসবের উদ্বোধন।

(১)

উৎসবের পূর্ব্বে উদ্বোধন আবশ্যক। সামাজিক উপাসনায়, আরাধনা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে আচার্য্য উপাসক মণ্ডলীকে উদ্বুদ্ধ করেন। নানা স্থান হইতে নানাবিধ ভাব লইয়া উপাসকবৃন্দ উপাসনামন্দিরে উপস্থিত হন। মানবতত্ত্বদর্শী আচার্য্য তাই উদ্বোধনদ্বারা উপাসকগণকে প্রথমে জাগ্রৎ করিতে চেষ্টা করেন। উপাসকের মন যদি জড়তায় পরিপূর্ণ ও নিদ্রিত রহিল, তাহা হইলে অতি সরস উপাসনা, অতি মধুর সঙ্গীত ও অতি সারগর্ভ উপদেশে তাহার কিছুই হইবে না। সে হতভাগ্য মন্দিরে থাকিয়াও থাকে না—তাহার শরীর মন্দিরে থাকে কিন্তু তাহার আত্মা অসার চিন্তার রাজ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়। মনোবিজ্ঞানও উদ্বোধনের সার্থকতা সপ্রমাণ করে। যদি কোন ব্যক্তি কোন বিশেষ চিন্তায় মগ্ন থাকেন, আর তাঁহার কাণের কাছে গিয়া কেহ তাঁহাকে ডাকে, তাহা হইলে তিনি মনোযোগের অভাবে সে ডাক শুনিতে পান না। মনোবিজ্ঞান এই সত্য প্রচার করে। আমাদের দৈনিক জীবনেই ইহার শত শত প্রমাণ দেখিতে পাই। যদি আরাধনা ও উপদেশের প্রতি উপাসকের মনোযোগ না থাকে, মনোবিজ্ঞানের নিয়মানুসারে আরাধনা ও উপদেশ তাঁহার কাছে অশ্রুত থাকে। মনোযোগ আকর্ষণের জন্য উদ্বোধনের প্রয়োজন।

সামাজিক উপাসনা সপ্তাহে একবার হইয়া থাকে। উৎসব বৎসরে একবার ঘটিয়া থাকে। দৈনিক উপাসনা ও সামাজিক উপাসনায় যদি উদ্বোধনের প্রয়োজন হয়, তবে উৎসবের জন্য যে বিশেষ উদ্বোধনের প্রয়োজন, তাহাতে সন্দেহ নাই। হিন্দুরাও মহাশক্তি পূজার পূর্ব্বে বোধন করিয়া থাকেন। উৎসবের পর উৎসব মাথার উপর দিয়া চলিয়া গেল। দেবতার নিকট উৎসবকারিগণ কত ধন, কত রত্ন লাভ করিলেন। কিন্তু উৎসবের ফল কি আমাদের জীবনে দাঁড়াইতে পারিয়াছে? এই কথার উত্তর দিতে নিশ্চয়ই সকলে কুণ্ঠিত হইবেন। উৎসব স্বর্গের বিহঙ্গ, কি একটু অমৃত কর্ণকুহরে ঢালে আর উড়িয়া যায়। সে অমৃত অল্পদিনই থাকে, কিন্তু সে অমৃত লাভের স্মৃতি যায় না। সে স্মৃতি কেবল দৈনিক জীবনের হীনতা দেখাইয়া দিতে থাকে। উৎসবের তেজ দশ দিন, একমাস, না হয় জোর ছয় মাস থাকে। তাহার পর আত্মার প্রকৃত ক্ষীণকায় বাহির হইয়া পড়ে, আর সে বুঝিতে পারে যে, সে এতদিন কেবল অনায়াসলব্ধ আর এক রাজ্যের পরিচ্ছদ পরিয়া বেড়াইতেছিল। উৎসবের ঐশ্বর্য্য কিসে রক্ষা পায়, এই চিন্তা সকল সরল উপাসকের মনকে আন্দোলিত করিয়া থাকে, এবং গভীরভাবে সকলের সেই চিন্তা করা আবশ্যক।

এ কথা সত্য যে, কেবল নিজের চেষ্টায় কিছুই হয় না।

এ কথাও সত্য যে, যে চেষ্টা করে না, ঈশ্বরের কৃপা তাহার কাছে আসিতে পারে না। উৎসবের জন্য আমরা প্রস্তুত হই আমাদের এমন সাধ্য কি? অথচ অপ্রস্তুত মনে যদি উৎসবের মধ্যে আপনাদিগকে ফেলি, তাহা হইলে বিশেষ কোন ফল না পাইবারই সম্ভাবনা। আমাদিগের দিক্ হইতে যতটুকু করা উচিত, ততটুকু আমাদের সাধ্যমতে করিতে হইবে। আমাদিগকে প্রথমে আত্ম-চিন্তা করিতে হইবে। কাজসারা রকম আত্ম-চিন্তায় কোন ফল নাই। আপনাকে প্রবঞ্চনা করিতে গেলে আপনিই প্রবঞ্চিত হইব। গভীর, তীক্ষ্ণ ও মর্ম্মভেদী আত্ম-চিন্তা আবশ্যক। মনশ্চক্ষুর নিকটে বিগত বৎসরের জীবনকে ধর। উৎসবের দেবতার পুণ্যপাপদর্শী, সূর্য্য-চন্দ্র-নিন্দিত, কোমল অথচ সুতীক্ষ্ণ চক্ষুর দিকে একবার চাও, আর আপনার হীন জীবনের দিকে একবার চাও। অপূর্ব্ব আলোক দেখিবে, প্রাণের গুপ্ত পাপের মূল সকল বাহির হইয়া পড়িবে। ক্রমাগতঃ পাপের মূল অন্বেষণ করিতে করিতে মহেশ্বরের জ্ঞানালোকে পাপের গুপ্ত মূল সকল পরিষ্কার দেখিতে পাইবে। এই আত্ম-চিন্তার সময়ে আপনাকে বিন্দুমাত্র দয়া করিবে না। আপনার দোষ আলোচনার সময় মন হইতে শত সহস্র কুতর্ক ও ওজর উঠিতে দেখা যায়। সে সকলের দিকে মনোযোগ দিবে না। যে ক্রোধ অপ্রেমের রূপান্তর, যে ক্রোধের জন্য আমরা সর্ব্বদাই অনুতাপ করি—আপনার উপরে তাহাকে পূর্ণমাত্রায় প্রয়োগ করিতে হইবে। আমি নীচ, পাতকী, কৃতঘ্ন, দুরাচার। আমিই আমার ও প্রভুর মধ্যে ব্যবধান হইয়া রহিয়াছি। এ হেন দুষ্ট আমিকে ইহ জন্মে আর ভালবাসিব না।

আত্ম-চিন্তার বাতাসে প্রাণে যখন অনুতাপের অগ্নি জ্বলিয়া উঠিবে, তখন আত্মা উৎসবের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িবে। তখন উৎসবের দেবতার নিকট বিশেষ করিয়া হত্যা দিবার বাসনা জন্মিবে। অগ্নি জ্বলিয়া উঠিলে নির্ব্বাণের চেষ্টা স্বতঃই স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে। কি বাহিরে, কি অন্তরে রোগ নির্দ্ধারণ করা চিরকালই কঠিন। রোগ যদি একবার নির্দ্ধারিত হইল তাহা হইলে আর ভাবনা কি? সুচিকিৎসকের কাছে রোগী তখন ঔষধ গ্রহণ করিলে রোগ হইতে মুক্তি লাভ করে। যাহার জন্য আমাদের জীবনের রথ চলিতেছে না, যাহার জন্য যোগের সূত্র বার বার ছিঁড়িয়া যায়, যাহার জন্য উৎসবের তেজ সম্বৎসর ধারণ করিয়া রাখিতে পারি না, সেই বিশেষ অভাবের কেশ ধরিয়া ঈশ্বরের কাছে যাইতে হইবে। সাধারণ ভাবে প্রার্থনা করিলে কিছুই হয় না। সাধু লোকের জীবনের ইতিহাস পাঠে দেখা যায় যে, বিশেষ অভাবের জন্য প্রার্থনা করিয়াই তাঁহারা সফল হইয়াছেন। আমাদিগকেও সেই মহাজনপদচিহ্নিত স্বর্গীয় পদবী অবলম্বন করিতে হইবে। কিন্তু কেবল বিশেষ অভাব নির্দ্ধারণ করিলে যথেষ্ট হইবে না। পাপ পরিত্যাগের জন্য মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে। সঙ্কল্প করিয়া যেমন উৎসবে প্রবেশ করিতে হইবে, তেমনই আবার সঙ্গে সঙ্গে অচল ও অটল প্রতিজ্ঞায় আপনাকে বদ্ধ করিতে হইবে। প্রাণস্পর্শ করিয়া অঙ্গীকার করিতে হইবে যে, প্রাণান্তেও প্রভুর পরিচিহ্নিত পথ পরিত্যাগ করিব না, প্রাণান্তেও তাঁহার আদেশ অবহেলা করিব না। প্রভু তাঁহার সকল প্রতিজ্ঞাই কেমন সুন্দর রূপে পালন করেন, আর আমরা আমাদের কয়টা অঙ্গীকার রক্ষা করিয়া থাকি? পৌত্তলিকগণ যেমন দেবতার কাছে মানস করিয়া থাকেন, আমাদেরও কতক পরিমাণে সেইরূপ করা আবশ্যক। তাঁহারা বাহিরের জিনিস মানেন, আমরা অন্তরের অরিদলকে বিসর্জ্জন দিতে অঙ্গীকার করিব। এক হাতে সঙ্কল্প, এক হাতে মানস, প্রাণে অনুতাপ ও বিনয় এবং ললাটে অটল প্রতিজ্ঞা লইয়া যিনি উৎসবের দেবতার নিকট অগ্রসর হইবেন, তাঁহার জীবনে যে বিশেষ পরিবর্ত্তন হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। (ক্রমশঃ)

ক্রিয়াশীল ব্রহ্ম।

(প্রাপ্ত)

বিগত কয়েক সংখ্যক তত্ত্বকৌমুদীতে "ক্রিয়াশীল ব্রহ্ম" সম্বন্ধে কিছু কিছু আন্দোলন চলিতেছে। এই আন্দোলনের কোন প্রকার মূল আছে কি না অর্থাৎ আমাদের বর্ত্তমান আরাধনা প্রণালীতে ব্রহ্মের ক্রিয়াশীলতার ভাব আছে কি না তাহার বিচার করিতে হইলে দুই প্রকারে বিচার করা আবশ্যক; ১ম, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি আরাধনার স্বরূপ গুলি যেখান হইতে লওয়া হইয়াছে সেখানকার ভাব অর্থাৎ স্বরূপ গুলির আবিষ্কর্ত্তা উপনিষৎকার ঋষিদিগের মত কি; ২য়, এই আন্দোলন বিশুদ্ধ যুক্তি দ্বারা অনুমোদিত কি না। আমরা উক্ত উভয় প্রকারে দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান আরাধনা প্রণালীতে অর্থাৎ "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। শান্তং শিবমদ্বৈতং। শুদ্ধমপাপবিদ্ধং।" ইহার মধ্যে ব্রহ্মের ক্রিয়াশীলতার ভাব নাই। ব্রাহ্মগণ ব্রহ্মকে ক্রিয়াশীল বলিয়া বিশ্বাস করেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের আদর্শ আরাধনা প্রণালীতে যদি ক্রিয়াশীলতার ভাব প্রকাশ না পায় তাহা হইলে যে তাঁহাদের আরাধনা প্রণালী অসম্পূর্ণ রহিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমরা আজি উক্ত আরাধনা প্রণালীতে ক্রিয়াশীলতার ভাবের অভাব দেখাইতে চেষ্টা করিব। পাঠকগণ একটু চিন্তার সহিত আমাদের আলোচনাতে যোগ দিলে বাধিত হইব।

প্রথম, সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।—আরাধনা প্রণালীর এই চরণটী কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয়-তৈত্তিরীয়োপনিষতের ব্রহ্মানন্দ বল্লীর প্রথম অনুবাকের দ্বিতীয় শ্লোকের মধ্য হইতে গৃহীত। শ্লোকটী এই—"ওঁ ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্। তদেষাভ্যুক্তা। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম॥ যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি॥ ২॥" অর্থ—"ব্রহ্মবিদেরা ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন এবং তাঁহাদের দ্বারা ইহা উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্মই সত্য বস্তু, এবং জ্ঞান ও অনন্ততা তাঁহার স্বরূপ। যিনি তাঁহাকে পরমাকাশরূপে হৃদয়ে নিহিত বলিয়া দেখিতে পান, তিনি সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মের সহিত সকল প্রকার কামনার বিষয় ভোগ করেন।" এই শ্লোকটীর মধ্যে ক্রিয়াশীলতার ভাব কোথাও

সযতনে তুলে আজি দিব তব করে—
আবার আসিনু প্রভু! তোমার দুয়ারে!

(২)

আবার আসিনু প্রভু! তোমার দুয়ারে,
হৃদয়ের ছবিখানি দেখাবার তরে—
ঐ দেখ! চিতানলে
পুড়িতেছে জলে' জলে'
প্রাণের বাসনাগুলি ধ্বক্ ধ্বক্ করে'—
শ্মশান-হৃদয় ল'য়ে এসে'ছি দুয়ারে।

(৩)

শ্মশানহৃদয় ল'য়ে এসেছি দুয়ারে,
দিবে না কি প্রেম ধারা নিভাবার তরে?
জ্বলিবে কি এ অনল,
দহিবে কি হৃদি-স্থল
রাবণের চিতাসম ধু ধু ক'রে? বিভু!—
পুড়িবে কি নিশি দিন, নিভিবে না কভু?

(৪)

পুড়িবে কি নিশি দিন, নিভিবে না কভু?
তুমি ত হৃদয়-নাথ, হৃদয়ের প্রভু?
হৃদয়েতে ব'সে ব'সে
দেখিবে কি হেসে হেসে
কেমনে এ পাপী জন পোড়ে নিশি দিন?—
কেমনে তাহার প্রাণ হয় প্রাণ-হীন?

(৫)

দেখ তবে দেখ নাথ! ঐ দেখ চেয়ে
হৃদয়ের অন্তস্তলে নয়ন মেলিয়ে,
ঐ যে একটী আশা—
দিয়ে কত ভালবাসা
সযতনে পুষিলাম প্রাণের মাঝারে—
অবশেষে ভস্ম-রাশি! ভস্ম-রাশি পরে!

(৬)

পুড়ে গেল ছাই হ'য়ে, কিছু নাহি আর,
অসারের সহ আজি মিশিল অসার,
শূন্য হ'ল প্রাণ মন,
পূর্ণ হ'ল তব পণ,
আমার বলিতে কিছু রাখিলে না আর—
অসারে বিনাশি, আজি করিলে অসার।

(৭)

অসারে বিনাশি আজি করিলে অসার,
আমার বলিতে কিছু রাখিলে না আর।
তবে কেন প্রাণ-মাঝে
এখনও নানা সাজে
অসারের ভস্ম-রাশি করিছে বিরাজ?—
কভু ভাঙ্গে, কভু গড়ে, ধরে নানা সাজ?

(৮)

আবার আশার কথা কহিবারে চায়,
আবার আশার ঘর বাঁধিবারে, হায়!
কতই প্রয়াস করে,
কত কথা কহে মোরে,
অবশেষে শ্মশানেতে ফেলে চলে যায়!—
আবার যে শূন্য-প্রাণ, শূন্যেই লুটায়!

(৯)

আজি আসিয়াছি প্রভু! তোমার দুয়ারে,
জীবনের প্রহেলিকা বুঝিবার তরে।
বল নাথ! এই ভাবে
আর কত দিন যাবে
আশা আর নিরাশার দোলায় বসিয়া?—
শূন্য আর পূর্ণ প্রাণে সংগ্রাম করিয়া?

(১০)

বল নাথ! বল, বল! আর কত দিন
অকূল ভবের নীরে হ'য়ে লক্ষ্য-হীন
ভাসাব জীবন-তরি?—
কবে বা ডুবিয়া মরি!—
আর এ যাতনা নাথ! সহিতে না পারি,
যাহা হয় কর গতি, হৃদয়-বিহারী!

বি—

প্রেরিত পত্র।

ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান আন্দোলন ও তাহার গতি।

ব্রাহ্মসমাজ অধুনা একটী মহা বিপ্লবের মধ্য দিয়া চলিতেছেন। অনেক দিন ধরিয়া এ সম্বন্ধে নানা প্রকার তর্ক বিতর্ক, বাদানুবাদ ও সময় সময় বিবাদ বিসম্বাদও চলিতেছে। বিষয়টী এতই গুরুতর যে ইহার উপর ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ বিশেষরূপে নির্ভর করিতেছে। সুতরাং এ বিষয়ে কোন মতামত প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে যে কত চিন্তা, কত অধ্যয়ন ও গবেষণার প্রয়োজন তাহা ভাবিতে গেলে আমার ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক বিলোড়িত হইয়া যায়। এই ভাবিয়াই এ বিষয়ে সাধারণ্যে কোন মতামত প্রকাশ করিতে সাহসী হই নাই। কিন্তু যখন দেখিতেছি যে দিন দিন ব্রাহ্মসমাজ এই আন্দোলনের মধ্যে পড়িয়া তাঁহার পূর্ব্বের প্রকৃত সত্যনিষ্ঠা হারাইয়া মতবদ্ধ হইতে যাইতেছেন তখন নিজের অক্ষমতা জানিয়াও আর চুপ করিয়া থাকা যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না। সকল দেখিয়া শুনিয়া আমার যেরূপ বিবেচনা হইতেছে তাহা বলাই শ্রেয়ঃ—যদি তাহাতে সত্যের পথ কিছু পরিষ্কার হয়।

এই আন্দোলনের বিষয় ব্রাহ্মসমাজে নবপ্রচলিত প্রাণায়াম যোগ ও ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্ব প্রচলিত উপাসনা প্রণালী। চির প্রচলিত না বলিয়া পূর্ব্ব প্রচলিত বলার কারণ এই যে,

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচলিত উপাসনা প্রণালী বহু পরিবর্ত্তনের পর বর্ত্তমান আকার গ্রহণ করিয়াছে। রাজা রামমোহন রায় যে ভাবে উপাসনা করিতেন রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ তাহার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করেন। তিনি এমন কি বেদী হইতে ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রাণায়াম যোগের বিষয়েও উপদেশ দিতেন। তৎপরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অনেক পরিবর্ত্তন করিয়া উপাসনা প্রণালীকে একটী বিশেষ আকার প্রদান করেন। বাবু কেশব চন্দ্র সেনের হস্তে তাহার আরও পরিবর্ত্তন হয় এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এই পরিবর্ত্তিত প্রণালীর অল্প মাত্র পরিবর্ত্তন করিয়াই তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। এই উভয় প্রণালীর আপেক্ষিক গুণাগুণ ও সত্যাসত্য বিচার করা এস্থলে আমার উদ্দেশ্য নহে; আর এরূপ দুইটী প্রণালীর কোন্‌টী সত্য, কোন্‌টী মিথ্যা, বা কোন্‌টীর মধ্যে কি পরিমাণে সত্য আছে তাহা নির্দ্ধারণের পক্ষে আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান কত দূর সক্ষম তাহাও বুঝিতে পারি না। কিন্তু কোন্‌টী সত্য, কোন্‌টী মিথ্যা নির্দ্ধারণ করা নিতান্তই দুষ্কর হইলেও সত্যগ্রহণ বা সত্যান্বেষণের প্রকৃত ভাব বা মানসিক গতি (Spirit) কি তাহা নির্দ্ধারণ করা তত কঠিন নহে। আমরা যদি এই সত্যের ভাবকে হৃদয়ে রক্ষা করিয়া সত্যান্বেষণে প্রবৃত্ত হই, যদি আমরা পূর্ব্ব প্রচলিত বা নবপ্রচলিত সত্য বা সত্যের নামধারী সকল মতামত বা প্রণালীকেই কঠোর যুক্তি ও (experiment) পরীক্ষার অধীন করিয়া জীবন পথে চলিতে পারি তাহা হইলে আমাদের প্রিয় ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তিত হইবার কারণ নাই। সত্যই হউক, মিথ্যাই হউক, জ্ঞানের আলোকে আসিলে সকলেরই প্রকৃতরূপ দেখা যাইবে—অসত্য আপনা হইতে খসিয়া পড়িবে, সত্য আলোক পাইয়া উজ্জ্বল হইবে ও ব্রাহ্মসমাজকে অলঙ্কৃত করিবে। এখন দেখা যাউক সত্যের ভাব কি? সকলেই ত বলেন, আমরা সত্যকে অবলম্বন করিয়াছি, আমাদের মধ্যেই সত্য রহিয়াছে। তবে কি বলিতে হইবে যে সকলেই সত্যান্বেষণ করিতেছেন? কখনই নহে। সত্য কোনও গণ্ডী মানে না। যাঁহারা বলেন, সত্য এখানেই আছে, অন্যত্র নাই—তাঁহারা নিশ্চয়ই সত্যান্বেষণ করিতেছেন না। তাঁহাদের বিশেষ বিশেষ মতামতের বিচার না করিয়াও বলা যাইতে পারে যে, তাঁহারা ভ্রান্তিমার্গে বিচরণ করিতেছেন। দ্বিতীয় কথা এই যে, সত্য নির্ভীক, সত্য কখনও ভয় করিতে জানে না। এ বিষয়ে এক পাশ্চাত্য সাধু বলিয়াছেন "I shall follow truth even if it leads me to hell"; বাস্তবিক, সত্যান্বেষীর কথাই এই। তাঁহাকে যদি সত্যের জন্য নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় তাহাতে তিনি কখনই পশ্চাৎপদ হন না। সত্যই তাঁহার পরম মঙ্গল; তিনি ভয় করিবেন কিসের জন্য? প্রকৃত সত্যান্বেষী কখনও কোন গৃহীত মত দ্বারা তাঁহার বিচারশক্তিকে ম্লান হইতে দেন না। গৃহীত, চিরপূজিত, প্রিয় মত ও সত্যের নামে আগত নূতন মতের মধ্যে প্রকৃত সত্যান্বেষী কোন প্রভেদ করিতে জানেন না। ইহাই প্রকৃত সঙ্কট স্থান, ইহাই সত্যান্বেষীর প্রকৃত পরীক্ষার স্থান। কোন গৃহীত মতের পক্ষ সমর্থন করা উকিলের কার্য্য হইতে পারে কিন্তু বিচারকের কার্য্য নহে। যদি আজি দেখি যে যুক্তির উগ্রনিশ্বাসে আমার চিরপূজিত প্রিয় মতগুলি একটুও সঙ্কুচিত হইতেছে, আশঙ্কায় তাহাদের মুখ বিবর্ণ হইয়া যাইতেছে, তখনই বুঝিব যে আমার মতগুলি সুবিজ্ঞ ধার্ম্মিকদিগের অবলম্বিত পরম সত্য মত হইলেও তাহা আমার পক্ষে অবিমিশ্র কুসংস্কার ও অসত্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাহা দ্বারা আমার আত্মার কখনও কল্যাণ হইতে পারে না। তাহা অপরের পক্ষে স্বর্গের পথ হইলেও আমাকে তাহা অসত্যের নরকে ডুবাইতেছে ও ডুবাইবে।

একদিন আমাদের পবিত্র ব্রাহ্মসমাজ সত্যের দুন্দুভি নিনাদে শিক্ষা দিয়াছিলেন যে, এই বিশ্ব অনন্তপ্রসারী, মানবাত্মা অনন্তমুখী, সুতরাং সত্যও অনন্ত, মানবাত্মাও অনন্ত উন্নতিশীল। অনন্তমুখে প্রবাহিত হইয়া অনন্তের সহিত মিলনই মানবাত্মার চরম লক্ষ্য ও এই লক্ষ্য সিদ্ধির জন্যই ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুত্থান। ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ও আন্দোলন দেখিয়া বড়ই আশঙ্কা হইতেছে যে, ব্রাহ্মসমাজ অল্পে অল্পে সেই অত্যুচ্চ লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টিহীন হইতেছেন, ব্রাহ্মসমাজের সেই অনন্তমুখী স্রোত যেন একটী বিশেষ খাদের মধ্যে বদ্ধ হইতে যাইতেছে। প্রত্যেক ব্রাহ্মেরই একান্ত কর্ত্তব্য যে তিনি চিন্তা করিয়া দেখেন যে তিনি কোন বিশেষ মত বা প্রণালীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া এই উদার লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইতেছেন কি না—কোন বিশেষ সত্যের প্রতি সমস্ত মনোযোগ দিতে যাইয়া তিনি এই সত্যের ভাব (Spirit) হারাইতেছেন কিনা।

অনেক দিন হইতেই আমার এরূপ আশঙ্কা হইতেছে। সম্প্রতি ১লা পৌষের তত্ত্বকৌমুদীতে যে তিনখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে আমার আশঙ্কা আরও বদ্ধমূল হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজে নবাগত প্রাণায়াম যোগের প্রতিবাদ করিতে গিয়া প্রতিবাদকারিগণ আর একটী নূতন সত্যের কষ্টীপাথর খাড়া করিতেছেন, ভিন্নাকারে অভ্রান্ত শাস্ত্র ও অভ্রান্ত ঋষিবাদের সূত্রপাত করিতে যাইতেছেন। ব্রাহ্মগণ একদিন সত্যের অদম্য উৎসাহে আমাদের পবিত্র প্রিয় ব্রাহ্মসমাজের ললাটদেশ হইতে অভ্রান্তশাস্ত্রের কালিমা মুছিয়া ফেলিয়া তাঁহার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন—সত্যের পথ পরিষ্কার করিয়াছিলেন। আজ বড়ই পরিতাপের বিষয়, কতকগুলি ব্রাহ্ম ব্রাহ্মসমাজকে শাস্ত্র নিগড়ে বাঁধিতে যাইতেছেন। শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের স্বাক্ষরিত পূজ্যপাদ দেবেন্দ্র বাবুর পত্রে লিখিত আছে: "যাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম, ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থে, ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যানে ও ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস পুস্তকে তাহা তিনি (দেবেন্দ্র বাবু) সুব্যক্ত করিয়াছেন। **এই সকলের বিপরীত কথা যিনি যাহাই বলুন তাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম নহে।**" ব্রাহ্মগণ! অতি আশঙ্কার কথা; একবার বিশেষ সতর্কতার সহিত বিচার করিয়া দেখুন, ইহার অর্থ কি? ইহার গতি কোন দিকে? ইহা দ্বারা কি ব্রাহ্মধর্ম্মকে গণ্ডীবদ্ধ করা হইতেছে না? ইহাদ্বারা কি ব্রাহ্মসমাজের স্কন্ধে অভ্রান্ত শাস্ত্রের গুরুভার চাপাইয়া দেওয়া হইতেছে না? ইহা দ্বারা কি এই শাস্ত্র প্রণেতা বা সংগ্রহকারকে অভ্রান্ত ঋষির অবাচনীয় পদে প্রতিষ্ঠিত করা হইতেছে

না? যদি তাহাই সত্য হয়, তাহা হইলে কি ব্রাহ্মসমাজ সত্যের পথ পরিত্যাগ করিয়া অসত্য মার্গ অবলম্বন করিতেছেন না? ভক্তিভাজন রাজনারায়ণ বাবুর পত্রেও এই শাস্ত্রের কথা সমর্থিত হইয়াছে। তিনি বিজয় বাবুর মতামত উল্লেখ করিতে গিয়া বলিতেছেন:—"তিনি (বিজয় বাবু) এমত কতক গুলি মত অবলম্বন করিয়াছেন যাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের শাস্ত্র সম্মত নহে।" বিজয় বাবুর মতামতের মধ্যে ভ্রম প্রমাদ থাকিলে তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য যুক্তিমার্গ অবলম্বন করা উচিত। কিন্তু কোন শাস্ত্রের দোহাই দিয়া এরূপ মীমাংসা করিতে যাওয়া ব্রাহ্মোচিত নহে—ইহা সত্যের বিচার নহে—ইহা ঘোর কুসংস্কার। ব্রাহ্মধর্ম্মের শাস্ত্র! ইহা এক নূতন কথা!! ব্রাহ্মসমাজ কখনই তাহা স্বীকার করিতে পারেন না। যদি কোন ব্রাহ্ম শাস্ত্র মানিতে প্রস্তুত হন, শাস্ত্রের দোহাই দিয়া সত্যের মীমাংসা করিতে অগ্রসর হন তাহা হইলে অসঙ্কুচিত চিত্তে বলা যাইতে পারে যে তিনি তাঁহার ব্রাহ্মত্ব হারাইয়াছেন। উন্নতিশীল ব্রাহ্মের মুখ সম্মুখের দিকে—ভবিষ্যতের দিকে;—শাস্ত্রের মুখ পশ্চাতে—ভুতকালেই তাহার জীবন। সুতরাং শাস্ত্রের ধর্ম্ম চিরমৃত, ব্রাহ্ম কোন শাস্ত্র মানিতে পারেন না।

আর একটী কথা বলিয়াই আমার বক্তব্যের উপসংহার করিব। তাহা এই:—নূতন মত, নূতন প্রণালীর প্রতি ব্রাহ্মসমাজের কিরূপ ভাব হওয়া উচিত? বিনা বিচারে, বিনা পরীক্ষায় কোনও মত বা প্রণালীর সত্যাসত্য নিরূপিত হওয়া সম্ভবপর নহে। বিস্তৃত বিচার ও পরীক্ষা হইতে না দিলে বা তাহার পথে কোনও প্রকার বাধা দিলে সত্যের পথ রুদ্ধ করা হয়। আমরা একটী সত্য পাইয়াছি বা একটী সত্য পন্থা পাইয়াছি,—সুতরাং অন্য কোন সত্য বা সত্য পন্থার প্রয়োজন নাই, বা অন্য কোন সত্য বা সত্য পন্থা থাকিতে পারে না এরূপ ভাবিলে সত্যের অবমাননা করা হয়। এই কয়েকটী কথা একটু বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তব্য অতি স্পষ্টরূপে উপলব্ধ হইবে। যাহা কিছু সত্যের নামে ব্রাহ্মসমাজের সম্মুখে উপস্থিত হইবে—ব্রাহ্মসমাজ নির্ম্মুক্ত ভাবে তাহার সবিশেষ ও সুবিস্তৃত আলোচনা করিবেন; সত্য হইলে তাহা গ্রহণ করিবেন, মিথ্যা হইলে তাহা কখনই ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ লাভ করিতে পারিবে না। যদি কোন নূতন সাধন প্রণালী ব্রাহ্মসমাজের সম্মুখে উপস্থিত হয়, (বর্ত্তমান সময়ে যেমন প্রাণায়াম যোগ আসিয়াছে ও ভবিষ্যতে যদি অন্য কোন প্রণালী আসে) তাহা হইলে বিনা পরীক্ষায় তাহার বাধা দেওয়া ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তব্য নহে। বরং যাহাতে তাহার বহু বিস্তৃত পরীক্ষা হইতে পারে এরূপ সুযোগ করিয়া দেওয়া উচিত। যাঁহার ইচ্ছা হইবে তিনি তাহার পরীক্ষা করিতে পারিবেন এবং যত অধিক সত্যান্বেষী ব্রাহ্ম এরূপ পরীক্ষাতে প্রবৃত্ত হইবেন, ততই পরীক্ষাতে ভ্রম প্রমাদ কম হইবার সম্ভাবনা। এরূপ বিস্তৃত পরীক্ষাতে এরূপ নবপ্রবর্ত্তিত প্রণালীর মধ্যে যাহা কিছু সত্য থাকে তাহা বাহির হইয়া পড়িবে ও তাহা ব্রাহ্মসমাজেরই সম্পত্তি হইবে, আর তাহার মধ্যে যদি কিছু ভ্রম প্রমাদ থাকে তাহাও কালক্রমে বাহির হইয়া পড়িবে ও সত্যপ্রিয় ব্রাহ্মগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইবে। এই পরীক্ষাতে প্রবৃত্ত হইতে হইলে সকল ব্রাহ্মেরই একটী কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। সকল মতের মধ্যে, সকল প্রণালীর মধ্যেই ভ্রম প্রমাদ থাকিতে পারে—সুতরাং সকলেরই সাবধান হওয়া উচিত যে একটী সত্য বুঝিয়া তাহা গ্রহণ করিতে গিয়া যেন সেই সঙ্গে সঙ্গে আনুসঙ্গিক অসত্যও গ্রহণ করা না হয়; অন্য পক্ষে একটী অসত্য পরিত্যাগ করিতে গিয়া কেহ যেন সেই সঙ্গে সঙ্গে কোন সত্যকে দূরে নিক্ষেপ না করেন।

কলিকাতা।
১০শে ডিসেম্বর। ১৮৮৭

অনুগত
শ্রীসীতানাথ নন্দী।

প্রদেশীয় ব্রাহ্মসমাজ।

দার্জ্জিলিং।

গত নবেম্বর মাসে পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন সিলিগুড়ি, তিস্করিয়া ও খরসঙ্গ ব্রাহ্মসমাজ পরিদর্শন পূর্ব্বক ২১এ তারিখে দার্জিলিঙ্গে উপস্থিত হন। তিনি ২২এ ও ২৩এ তারিখে সায়ংকালে তত্রত্য দুই জন ব্রাহ্মের বাটীতে এবং ২৪এ ও ২৫এ তারিখে সায়ংকালে সমাজ মন্দিরে উপাসনা করেন এবং ২৬এ নবেম্বর সায়াহ্নে সমাজ মন্দিরে "বিশ্বাসের ভিত্তি" সম্বন্ধে একটী বাঙ্গালা বক্তৃতা করেন। এসময় দার্জিলিঙ্গে যেরূপ শীতের প্রাদুর্ভাব এবং বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সংখ্যা যেরূপ অল্প তাহাতে ধরিতে গেলে শ্রোতার সংখ্যা নিতান্ত অল্প হয় নাই; এবং বক্তৃতা শুনিয়া অনেকেই তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন। বক্তৃতার প্রথমাংশে মানুষের ভৌতিক প্রকৃতি কতদূর অপূর্ণ ও উহা অপেক্ষাকৃত পূর্ণভাবাপন্ন আধ্যাত্মিক প্রকৃতির কিরূপ সাহায্য সাপেক্ষ তাহা দেখান হয়। তাহার পর আবার আমাদের সেই অপেক্ষাকৃত পূর্ণতাসম্পন্ন আধ্যাত্মিক প্রকৃতি কিরূপ সর্ব্বপ্রকার ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক প্রকৃতির স্রষ্টা, অনন্ত জ্ঞানময়, পরমেশ্বরকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে তাহা দেখাইয়া বক্তা এই বলিয়া বক্তৃতা শেষ করেন যে, পরমেশ্বরের সহিত আমাদের এই যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ও তাঁহার উপর আমাদের এই যে নির্ভরের ভাব ইহা বিশ্বাস দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও উপলব্ধ হয়। সঙ্গীতের পর বক্তৃতা আরম্ভ হয় এবং বক্তৃতান্তে প্রার্থনা ও সঙ্গীত করিয়া কার্য্য শেষ হয়। ২৭এ নবেম্বর প্রাতঃকালে প্রচারক মহাশয় মন্দিরের নিয়মিত উপাসনার কার্য্য করেন এবং ঐ দিবস অপরাহ্ণে ভগবদ্গীতা হইতে ব্রহ্ম প্রতিপাদক শ্লোক পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎকালে অনেক শিক্ষিত ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যারত্ন মহাশয় ২৮এ তারিখে দার্জিলিং পরিত্যাগ করেন। যদিও তিনি ছয় দিনমাত্র তথায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার বক্তৃতা ও উপদেশাদি শ্রবণ করিয়া অনেকেই উপকার লাভ করিয়াছেন।

বাঙ্গালোর ক্যান্টনমেন্ট ব্রাহ্ম প্রার্থনা সভা।

অষ্টম সাম্বৎসরিক কার্য্য বিবরণ (১৮৮৬, নবেম্বর হইতে ১৮৮৭, অক্টোবর পর্য্যন্ত);—

গত বৎসর প্রতি সোমবার ও শুক্রবার সামাজিক উপাসনা হইয়াছে। এই সকল উপাসনা সভায় প্রতিবারে গড়ে ১৫ জন সভ্য ও দর্শক উপস্থিত ছিলেন। মহোৎসব;—১৮৮৬ সালের ১৯এ নবেম্বর হইতে ২২এ পর্য্যন্ত চারি দিন সপ্তম সাম্বৎসরিক মহোৎসব হয়। প্রথম দিবস সন্ধ্যা ৬টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত কর্ণাটী ভাষায় উপাসনা হয়। কটনপেটা সমাজের শ্রীমান্ লিঙ্গমাচারী বেদীর কার্য্য করেন। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যা ৬টার সময় ইংরাজী বক্তৃতা; বিষয়,—"সুনীতি," বক্তা শ্রীমান্ সুব্রহ্মণ্য আয়ার। তৃতীয় দিন প্রাতে ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত তামিল ভাষায় উপাসনা হয়। শ্রীমান্ গোপাল স্বামী আয়ার বেদীর কার্য্য করেন। বেলা দশটার সময় প্রায় তিন শত দরিদ্র লোককে তণ্ডুল বিতরণ করা হয়। অপরাহ্ণ ৩টা হইতে ৪টা;—শ্রীমান্ গোপাল স্বামী আয়ার ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ হইতে শ্লোক পাঠ করেন। ৪টা হইতে ৫টা;—শ্রীমান্ সোমসুন্দর মুদালিয়র, রামস্বামী নাইডু ও রাজু মুদালিয়র কর্ত্তৃক সঙ্কীর্ত্তন। ৫টা হইতে ৬টা;—তামিল ভাষায় বক্তৃতা; বিষয়,—"মহাত্মা" (Great men), বক্তা—শ্রীমান্ ত্রিভঙ্গদস্বামী মুদালিয়র। ৬টা হইতে ৬॥টা, সম্পাদক কর্ত্তৃক ১৮৮৫—৮৬ সালের কার্য্য বিবরণ পাঠ। ৬॥টা হইতে ৮টা;—উপাসনা; শ্রীমান্ গোপালস্বামী আয়ার বেদীর কার্য্য করেন। চতুর্থ দিন সায়াহ্নে ৬টা হইতে ৮টা উপাসনা হয়; শ্রীমান্ গোপালস্বামী আয়ার বেদীর কার্য্য করেন। উৎসবে সকলেই বিশেষ আনন্দ সম্ভোগ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্ম ব্যতীত অপর ধর্ম্মাবলম্বী অনেক শিক্ষিত ভদ্রলোক উৎসব ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

সাধারণ সভা;—১৮৮৬ সালের ১২ই ডিসেম্বর কর্ম্মচারী নিয়োগের জন্য ব্রহ্ম মন্দিরে সাধারণ সভার অধিবেশন হয় এবং নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কর্ম্মচারিরূপে মনোনীত হন;—শ্রীমান্ ত্রিভঙ্গদস্বামী মুদালিয়র—সম্পাদক; শ্রীমান্ গোপাল স্বামী আয়ার—সহকারী সম্পাদক; শ্রীমান্ আয়া স্বামী মুদালিয়র, সদাশিব মুদালিয়র, রাজারাম পিলাই, রঙ্গস্বামী চেটী, শিঙ্গর-ভেলু মুদালিয়র, রামস্বামী নাইডু, আনন্দরঙ্গম্ পিলাই, গোবিন্দরাজু পিলাই, গোপালস্বামী আয়ার, রাজু মুদালিয়র, সোমসুন্দর মুদালিয়র, ও সুব্রহ্মণ্য আয়ার—ডিরেক্টর; সোমসুন্দর মুদালিয়র—পুস্তকাধ্যক্ষ। ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারিগণ যেরূপ উৎসাহের সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন তাহার জন্য তাঁহারা সভার বিশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন।

সভ্য ও সহানুভূতিকারক;—বর্ত্তমানে সভ্য ও সহানুভূতি কারকদিগের সংখ্যা ৮৫ জন। ইহার মধ্যে ৩জন সভ্য নূতন। কর্ত্তব্যানুরোধে অন্যূন ৩৫ জন সভ্যকে স্থানান্তরে যাইতে হইয়াছে।

মৃত্যু;—মান্দ্রাজ দেশীয় পদাতিক সৈন্যের ২৭ সংখ্যক রেজিমেণ্টের পেন্সন প্রাপ্ত জমাদার আপিয়া নাইডুর মৃত্যুতে সভ্যগণ অত্যন্ত শোক পাইয়াছেন। ইনি অতি নিষ্ঠাবান্ লোক ছিলেন।

অর্থাদি সাহায্য লাভ;—১৮৮২ সালে রায় বাহাদুর আর্কট নারায়ণস্বামী মুদালিয়র কাল্ভারি রোডস্থ ২১২ নম্বরের সুপ্রশস্ত অট্টালিকাটী প্রার্থনা সভাকে দান করিয়া সভাকে বিশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। ইনি একজন অত্যন্ত ধর্ম্মনিষ্ঠ লোক; ইনি ফিলান্থ্রপিক সভার প্রধান উৎসাহদাতাদিগের মধ্যে একজন। তাঁহার প্রদত্ত বাটী পাওয়াতে সভার কার্য্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন পারভেয়ার শ্রীমান্ পুণ্যস্বামী পিলাই সৈন্যদিগের সহিত ব্রহ্মদেশে যাইবার সময় দুইটী বড় বড় গ্লোব ও প্রায় দশটাকা মূল্যের একটী দেয়াল ল্যাম্প সভাকে প্রদান করিয়া যান; এবং শ্রীমান্ সুন্দর বিনায়ক মুদালিয়র সভার পুস্তকালয়ের জন্য প্রায় পনর টাকা মূল্যের একটী গোল টেবিল দান করিয়াছেন; ও ভিক্টোরিয়া প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীমান্ নারায়ণস্বামী আচারী তাঁহার প্রকাশিত কয়েকখণ্ড ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান পদ্ধতি পুস্তক সভার সভাদিগের সকলকে বিনামূল্যে বিতরণার্থ প্রেরণ করেন। ইহাঁরা সকলেই সভার ধন্যবাদের পাত্র।

রবিবাসরীয় নৈতিক বিদ্যালয়,—১৮৮৭ সালের জানুয়ারী মাসে এই বিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং ৩১ জন বালকের নাম তালিকাভুক্ত করা হয়। গতবৎসর শ্রীমান্ গোপালস্বামী আয়ার ইহাদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন।

বিশেষ উপাসনা;—গত ১৬ই ফেব্রুয়ারি মহারাণীর রাজত্বোৎসব উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা ও উপদেশ হয়। শ্রীমান্ ত্রিভঙ্গদস্বামী মুদালিয়র বেদীর কার্য্য করেন। সায়াহ্নে মন্দিরের প্রত্যেকস্থান দীপমালায় সুসজ্জিত করা হয় এবং প্রায় ৩৫ জন বালককে "এনায়ারগড়কুপদেশ" নামক পুস্তক বিতরণ করা হয়।

যোগী পরিব্রাজক;—গত ২০এ জুন হরিচরণ মহারাজ নামক একজন পঞ্জাবী যোগী "ভক্তিযোগ" সম্বন্ধে হিন্দীভাষায় উপদেশ দেন। প্রায় ২৫০ জন ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠান;—গতবৎসর সভার ৩ জন সভ্য ব্রাহ্মধর্ম্মানুসারে অনুষ্ঠান করেন। তাহার বিশেষ বিবরণ যথাসময়ে ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রচার;—বাঙ্গালোর সহরবাসী দুইজন সভ্যের সাহায্যে তত্রস্থ শ্রীমান্ লিঙ্গচারী ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। তিনি এবং তাঁহার একজন বন্ধু শ্রীমান্ শিবরাম রাস এক্ষণে মহীশুর নগরে প্রচার করিতেছেন। মহীশুরে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবারজন্য কর্ণাটী ভাষায় লিখিত কতকগুলি পুস্তক ও পুস্তিকা তাঁহাদিগের নিকট পাঠান হইয়াছে। কিন্তু এ কার্য্য সুচারু রূপে সম্পন্ন করিবার জন্য বিশেষ অর্থ সাহায্য আবশ্যক।

আয় ব্যয় স্থিত;—গতবৎসরে সভার আয় সর্ব্বশুদ্ধ টাকা ১৬৬ ৸৵৩ পাই, ব্যয় টাকা ১৪৫ ৸৵১০ পাই, হস্তেস্থিত টাকা ২০ ৸৶ ৫ পাই।

মঙ্গলময় পরমেশ্বরের ইচ্ছা জয় যুক্ত হউক; তাঁহার আশীর্ব্বাদ সকলের মস্তকে অবতীর্ণ হউক।

সিরাজগঞ্জ।

ঈশ্বর প্রসাদে গত ২৮এ নবেম্বর হইতে সিরাজগঞ্জ ব্রাহ্মসমাজের একাদশ সাম্বৎসরিক উৎসব আরম্ভ হইয়া ১লা ডিসেম্বর উহা শেষ হইয়াছে। ২৭এ নবেম্বর রবিবার কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় উপস্থিত হন। পরদিবস (২৮এ নবেম্বর, সোমবার) তত্রত্য নূতন উপাসনা মন্দির উপাসকদিগের ব্যবহারের জন্য খোলা হয়। ঐ দিবস সমাজের সভাগণ প্রত্যূষে সম্পাদকের বাটীতে সমবেত হইয়া ব্রহ্ম নাম গান করিতে করিতে নূতন উপাসনালয়ে উপস্থিত হন। মন্দিরের সম্মুখভাগস্থিত ভূমি চন্দ্রাতপ ও পতাকায় সুসজ্জিত হইয়া আনন্দোৎসবের সূচনা করিতেছিল। সেখানে উপস্থিত হইয়া সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মজুমদার যে সকল মূল সত্য অনুসারে এই নূতন মন্দিরের কার্য্য চলিবে তাহা পাঠ করিলে পর পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী একটী সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা করেন। তদনন্তর মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত হইলে তথায় যথারীতি উপাসনা ও উপদেশ হয়। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বেদীর কার্য্য করেন। উপদেশের বিষয়,—"বিশ্বাসই ধর্ম্মের ভিত্তি"। তৎপরে উৎসাহ সহকারে ব্রহ্মনাম সঙ্কীর্ত্তনের পর প্রাতঃকালীন উপাসনা শেষ হয়।

অপরাহ্নে সমাজ মন্দিরে শাস্ত্রী মহাশয় "প্রকৃত উপাসক কে এবং কি উপায়ে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায়?"—তৎসম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ইতর ভদ্র সকল শ্রেণীর দেশীয় লোকই বক্তৃতা শুনিতে আসিয়াছিলেন। বক্তৃতা অতি সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। সায়াহ্নে মন্দিরে যথারীতি উপাসনা হয়। শাস্ত্রী মহাশয় বেদীর কার্য্য করেন। ২৯এ নবেম্বর মঙ্গলবার বিশেষ উৎসবের দিন। রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র উপাসকগণ মন্দিরে সমবেত হন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বেদীর কার্য্য করেন। উপদেশের বিষয়,—"বিশ্বাস ও সামাজিক উৎপীড়ন।" উপাসনা ও উপদেশ অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। অপরাহ্নে সমাজগৃহে ধর্ম্ম বিষয়ক আলোচনা হয়। ইহাতে তত্রত্য ধর্ম্ম সভার অনেক সভ্য এবং অনেক শিক্ষিত ভদ্র লোক উপস্থিত ছিলেন। অভ্রান্ত শাস্ত্র ভিন্ন ধর্ম্মজ্ঞান সম্ভব কি না, নিরাকারের উপাসনা সম্ভব কি না ইত্যাদি যে সকল প্রশ্ন সচরাচর ব্রাহ্মদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইয়া থাকে সেই সকল প্রশ্নই উত্থাপিত হইয়াছিল। প্রশ্নের উত্তর শুনিয়া অনেকেই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সায়ংকালীন উপাসনায় বেদীর কার্য্য করেন এবং "প্রাত্যহিক উপাসনা" সম্বন্ধে উপদেশ দেন। উপদেশ শুনিয়া উপাসকগণ বিশেষ উপকার লাভ করিয়াছেন।

৩০এ নবেম্বর প্রাতঃকালীন উপাসনায় প্রচারক মহাশয় বেদীর কার্য্য করেন। রাত্রিতে সমাজ গৃহের প্রাঙ্গণে বহু লোকের সমাগম হয় এবং শাস্ত্রী মহাশয় "মুক্তি" সম্বন্ধে একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। প্রথমে বক্তব্য বিষয়ের গুরুত্ব শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে সুন্দররূপে মুদ্রিত করিয়া দিয়া, বক্তা হিন্দু শাস্ত্রে কাহাকে মুক্তি বলে এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের মুক্তির আদর্শের সহিত তাহার প্রভেদ কি তাহা বুঝাইয়া দেন। উপসংহারে তিনি সকলকে এই বলিয়া উৎসাহিত করেন যেন সকলে গভীর চিন্তা দ্বারা বিষয় কামনা দমন ও ঈশ্বরের হস্তে আত্ম সমর্পণ করত প্রকৃত মুক্তির পথে চলিতে চেষ্টা করেন। প্রায় দেড় ঘণ্টা বক্তৃতা হয়। এতাবৎকাল সকলে একাগ্র মনে বক্তৃতা শ্রবণে মগ্ন ছিলেন।

১লা ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার প্রভাত হইতে সমাজ গৃহে কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় উপাসনাকালে বেদীর কার্য্য করেন। অপরাহ্নে তত্রত্য বালিকা-বিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগকে পুরস্কার বিতরণের জন্য উক্ত বিদ্যালয়ে একটী মহতী সভা হয়। সেরাজগঞ্জস্থ পাটের কলের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সি, ম্যাকডনেল এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই সভায় শাস্ত্রী মহাশয় উপস্থিত থাকিয়া সময়োপযোগী মন্তব্য প্রকাশ করেন। দরিদ্রদিগকে তণ্ডুল ও বস্ত্র বিতরণ করিয়া উৎসবের কার্য্য শেষ করা হয়।

প্রাপ্তিস্বীকার ও সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত নিম্নলিখিত পুস্তক ও পত্রিকাদির প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি।

(১) বিশ্বাসী, ধর্ম্মবিষয়ক মাসিক পত্রিকা, ১ নম্বর নন্দকুমার চৌধুরীর লেন হইতে শ্রীশ্রীশচন্দ্র ঘোষ বি, এ, কর্ত্তৃক প্রকাশিত। আমরা এই পত্রিকার ২ য় ভাগের প্রথম চারিসংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। আমরা সকল বিষয়ে "বিশ্বাসীর" মতের সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতে পারিলাম না বটে, কিন্তু আমরা এই পত্রিকার যে চারিসংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা পাঠ করিয়া অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছি। ইহার সকল মতামতের সমালোচনার স্থান আমাদের নাই। আমরা এখানে কেবল এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে ইহা বেশ দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইতেছে।

(২) আহ্বান, (উৎসবের উপহার,) ব্রাহ্মসম্বৎ ৫৮;—ইহা একটী কবিতা মাত্র। ডিমাই আটপেজী ফর্ম্মার পাঁচপৃষ্ঠায় সমাপ্ত। শুদ্ধ একটী ভাব লইয়া কবিতাটী রচিত হইয়াছে। রচনা ও ভাবের সমাবেশ মন্দ হয় নাই।

(৩) প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম কি?—হড়া হিন্দুধর্ম্ম প্রচারিণী সভা হইতে প্রকাশিত এবং বিনামূল্যে বিতরিত। আমরা এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি পাঠ করিয়া যৎপরোনাস্তি সন্তোষ লাভ করিয়াছি। প্রকাশকগণ লিখিয়াছেন, "সহৃদয় দেশবাসীদিগের নিকট প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম যে কি, এই বিষয়টী বিশেষ রূপে বিবেচনা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত অতি সংক্ষেপে বিবিধ প্রকার শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত ভাগ হইতে কিছু অংশ

উদ্ধার করত উপহারস্বরূপ অর্পণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।” প্রকাশকদিগের সরল সাধু ইচ্ছা পূর্ণ হউক ইহাই আমাদের একান্ত বাসনা।

(৪) চিন্তাপ্রবাহিণী, প্রথমভাগ; শ্রীপ্রিয় নাথ দাসকর্ত্তৃক প্রকাশিত। এরূপ পুস্তক প্রকাশ করিয়া জনসমাজের বিশেষ কোনও উপকার হইবে বলিয়া বোধ হয় না। বরং ইহাতে এমন দুই একটী ভাব আছে যাহাতে অপকারের সম্ভাবনা অধিক।

(৫) মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প, শ্রীনন্দমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। এইক্ষুদ্র পুস্তক খানিকে উক্ত মহাত্মার সংক্ষিপ্ত জীবনী বলিলেও চলে। পুস্তক প্রণেতা ইঁহার অতি নিকট সম্পর্কীয় লোক, সুতরাং বাহিরের লোক অপেক্ষা নন্দমোহন বাবুর কথা যে অধিক প্রামাণ্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। ইহাতে উক্ত মহাত্মার দৈনিক জীবনের অনেক সুন্দর ঘটনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবন চরিতলেখক দিগেরও অনেক উপকারে আসিবে।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

আগামী বৎসরের প্রথম হইতে বালিকাদিগকে ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে শিক্ষার্থ গ্রহণ করিবারজন্য বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট উক্ত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষদিগকে অনুমতি দিয়া আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। ছাত্রীদিগের নিমিত্ত নিম্ন লিখিত বিশেষ নিয়ম করা হইয়াছে;—

(১) যাহারা বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় নাই, তাহাদিগকে নিম্ন লিখিত বিষয়ে বিশেষ পরীক্ষা দিতে হইবে—রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বাঙ্গলার ইতিহাস, অঙ্ক ত্রৈরাশিক পর্য্যন্তএবং সেই শ্রেণীর অন্যান্য বিষয়; (২) ষোল বৎসরের ন্যূনবয়স্ক কাহাকেও লওয়া হইবেনা; (৩) যাহারা পরীক্ষায় উচ্চ স্থান লাভ করিবে তাহাদিগের কয়েক জনকে মাসিক সাত টাকা করিয়া বৃত্তি দেওয়া হইবে এবং অবশিষ্ট সকলে বিনা বেতনে পড়িতে পাইবে; (৪) ছাত্রী-দিগকে স্কুলে আনিবার জন্য একখানি গাড়ী রাখা হইবে; (৫) শিক্ষকের সম্মুখের আসনগুলি ছাত্রীগণের জন্য পৃথক্ ভাবে নির্দ্দিষ্ট থাকিবে; (৬) ছাত্রীদিগকে রাত্রিকালে রোগী-দের নিকট থাকিতে হইবে না; (৭) শবচ্ছেদ গৃহের যেদিকে ছাত্রীগণ বসিবে সেদিকে যাহাতে অপর কেহ না যাইতে পারে তাহার উপায় করা হইবে; (৮) যাহারা মফঃস্বল হইতে আসিবে তাহারা স্বর্ণময়ী হোষ্টেলে থাকিবার অধিকার পাইবে। যাঁহাদের মধ্য হইতে ছাত্রী প্রেরিত হইবার সম্ভাবনা অধিক তাঁহাদের যদি কিছু প্রস্তাব করিবার থাকে এই সময় তাহা করা উচিত। প্রথম হইতে উপযুক্ত সাবধানতা অবলম্বন করাই ভাল। বিষয়টী যেরূপ গুরুতর তাহাতে এই প্রথম পরীক্ষা নিষ্ফল হইলে আবার এদিকে লোকের ও গবর্ণমেণ্টের মন ফিরাইতে বহুদিন লাগিবে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে বঙ্গের প্রসিদ্ধ লেখক বাবু রাজকৃষ্ণ রায়ের বিশেষ যত্নে ও উদ্যোগে বীণা রঙ্গভূমি নামে একটী নূতন নাট্যালয় নির্ম্মিত ও তাহার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। এখানে কেবল পুরুষগণ অভিনয় করিবেন। রাজকৃষ্ণ বাবু নিজে যেরূপ সচ্চরিত্র লোক তাহাতে আশা করা যায় যে তাঁহার তত্ত্বাবধানে রঙ্গভূমিতে মাদক সেবনাদি কোনও প্রকার দুর্নীতি প্রশ্রয় পাইবে না। বারাঙ্গনাদিগের অভিনয়ের বিরুদ্ধে আমাদের দেশের লোকের যে রুচি ফিরিতেছে বীণা রঙ্গভূমির প্রতিষ্ঠা তাহার একটী প্রমাণ এবং সেই জন্যই আমরা এই ব্যাপার সুসম্পন্ন হওয়াতে বিশেষ সুখী হইয়াছি। আমরা আশা করি স্বদেশের প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বিশুদ্ধ নাট্যামোদী ব্যক্তিগণ এই রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠাতৃগণকে উৎসাহ প্রদানে বিরত হইবেন না। নাট্যা-ভিনয়দ্বারা বাস্তবিক সমাজের কোনও স্থায়ী উপকার হয় কি না সে বিষয়ে আমাদের গভীর সন্দেহ আছে। তবে যাঁহারা নাটকাভিনয় দেখিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের পক্ষে বীণা রঙ্গভূমির ন্যায় স্থানে যাওয়াই ভাল। কারণ, অভিনয় দেখিয়া উপকার হউক বা না হউক বারাঙ্গনাদের অভিনয় দেখিতে গিয়া যে অনেকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে ও হইতেছে তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই।

প্রচারক নিয়োগ সম্বন্ধে আমাদের আর দুই একটী কথা বলিবার বাকি আছে। এতদিন স্থানাভাব বশতঃ তাহা বলা হয় নাই। এবারে এসম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য তাহা বলিয়া শেষ করিব। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে প্রচারক নিয়োগ কালে বিদ্যা অপেক্ষা উন্নত ধর্ম্মজীবনের উপরই অধিকতর লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। প্রচার বাক্য দ্বারা হয় না, প্রকৃত প্রচার জীবন দ্বারাই সাধিত হয়। একজনের হয় ত খুব বিদ্যাবুদ্ধি থাকিতে পারে, তিনি অখণ্ডনীয় তর্ক যুক্তি দ্বারা ধর্ম্মমত সমর্থন করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার জীবন যদি তেমন না হয়, তাঁহার জীবনে যদি তেমন ভালবাসা, বিনয়, পবিত্রতা, উদারতা ও বিশ্বাস ভক্তি না থাকে, তবে সে তর্ক যুক্তিতে কোনও স্থায়ী ফল লাভের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যাঁহার সরল বিশ্বাস ও গভীর ঈশ্বরানুরাগ আছে, তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি না থাকিলেও তাঁহার প্রতি লোকের শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হইবেই হইবে। তাঁহার জীবনের দৃষ্টান্তে অপরের উপকার হইবেই হইবে। এই যে নিজের জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা অপরের জীবনে বিশ্বাস, ভক্তি ও পবিত্রতার ভাব প্রস্ফুটিত করিয়া দেওয়া ইহাই প্রকৃত প্রচার। কিন্তু কথা এই যে যিনি প্রকৃত বিশ্বাসী, যিনি ঠিক্ ঈশ্বরের আদেশ বুঝিয়া এবং তাঁহার কার্য্য বলিয়া প্রচার কার্য্যে জীবন সমর্পণ করিয়াছেন, তিনি প্রভুর কার্য্য উপযুক্তরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য কোনও প্রকার পরিশ্রম স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইবেন কেন? তিনি যদি দেখেন,

তাঁহার জীবনের ব্রত ভালরূপে সম্পাদন করিবার জন্য কোন বিষয় বিশেষ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা আবশ্যক, তবে তিনি দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া সেই জ্ঞান উপার্জ্জন করিবার চেষ্টা করিবেন। মহাত্মা কেরি প্রভৃতি অনেক শ্রদ্ধেয় খৃষ্টীয় প্রচারকের কথা শুনা যায় যাঁহারা জীবনের প্রথমাবস্থায় তেমন শিক্ষা লাভ করিবার সুবিধা পান নাই; কিন্তু পরে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া যখন দেখিয়াছেন জ্ঞানালোচনা ভিন্ন প্রভুর কার্য্য ভালরূপে সম্পাদন করিবার সুবিধা হইতেছে না, তখন তাঁহারা প্রাণপণে জ্ঞান লাভের জন্য পরিশ্রম করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজ হইতে যাঁহারা প্রচারকরূপে নিযুক্ত হন, তাঁহাদের এ সম্বন্ধে অনেক সুবিধাও আছে। তাঁহাদিগকে প্রায়ই সাংসারিক অর্থাভাব দূর করিবার জন্য চিন্তা বা পরিশ্রম করিতে হয় না। তাঁহাদের হস্তে যথেষ্ট সময় আছে এবং তাঁহারা তাহার কিয়দংশ অনায়াসেই জ্ঞানালোচনার জন্য নিয়োজিত করিতে পারেন। তাঁহারা যাহাতে নিশ্চিন্তভাবে জ্ঞান ও ধর্ম্মে উন্নত হইবার জন্য পরিশ্রম করিতে পারেন তদুপযুক্ত সময়ের অভাব আছে বলিয়া যে তাঁহারা জ্ঞানালোচনা করিতে পারিবেন না এরূপ আপত্তি বোধ হয় কেহই উত্থাপন করিতে প্রস্তুত নহেন।

সংবাদ।

অষ্টপঞ্চাশত্তম মাঘোৎসব ;—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে আগামী অষ্টপঞ্চাশত্তম মাঘোৎসব সম্পন্ন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন ;—

৪ঠা মাঘ মঙ্গলবার	প্রাতঃকালে	ব্রাহ্মপরিবার ও ছাত্রাবাস সকলে উপাসনা ও ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণার্থ প্রার্থনা। সায়ংকালে উৎসবের উদ্বোধন।
৫ই ,, বুধবার	,,	ছাত্রোপাসক সমাজের উৎসব। অপরাহ্নে ব্রাহ্ম বালক বালিকাদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা। সায়ংকালে "থিওডোর পার্কারের জীবনচরিত" সম্বন্ধে বক্তৃতা।
৬ই ,, বৃহস্পতিবার	,,	উপাসনা। সায়ংকালে "সেণ্ট-পলের জীবন চরিত" সম্বন্ধে বক্তৃতা।
৭ই শুক্রবার		উপাসনা। সায়ংকালে ছাত্র সমাজের উৎসব।
৮ই শনিবার		বঙ্গমহিলা সমাজ এবং ব্রাহ্মিকা সমাজের উৎসব। সায়ংকালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক সভা।
৯ই ,, রবিবার		উপাসকমণ্ডলী এবং সঙ্গত সভার উৎসব।
১০ই ,, সোমবার		উপাসনা। অপরাহ্নে নগরসংকীর্ত্তন। সায়ংকালে উপাসনা।
১১ই মাঘ মঙ্গলবার	প্রাতঃকাল	সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব।
১২ই ,, বুধবার	,,	উপাসনা। অপরাহ্নে আলোচনা। এবং বালক বালিকাদিগের সম্মিলন। সায়ংকালে "ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য ও তাহার প্রণালী" সম্বন্ধে বক্তৃতা।
১৩ই ,, বৃহস্পতিবার	,,	উপাসনা। সায়ংকালে তত্ত্ববিদ্যা সভার উৎসব।
১৪ই ,, শুক্রবার	,,	উপাসনা। "ধর্ম্মবীরদিগের জীব চরিত" সম্বন্ধে বক্তৃতা।
১৫ই ,, শনিবার	,,	উপাসনা। সায়ংকালে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উৎসব।
১৬ই ,, রবিবার	,,	উদ্যান-সম্মিলন।

তত্ত্বকৌমুদীর মূল্যপ্রাপ্তি।

মে ১৮৮৭।

বাবু যদুনাথ বন্দোপাধ্যায়	জোড়হাট	৩৲
,, নবকুমার সমাদ্দার	লক্ষ্মীপুর	২৷৵০
,, হরিমোহন চক্রবর্ত্তী	কুলাঘাট	৩৲
,, অনাথবন্ধু রায়	কাকিনীয়া	৩৲
,, অক্ষয়কুমার সেন	কুমিল্লা	৩৲
,, রজনীকান্ত নিয়োগী	কলিকাতা	১৲
,, হরেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী	ঐ	২৷০
,, গোবিন্দচন্দ্র বসু	ঐ	১৲
,, রাজেন্দ্রনাথ বাগচি	ভররা	৩৲
,, অতুলমোহন দাস	ঢাকা	৩৲
,, শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়	লাহোর	৫৲
,, চন্দ্রশেখর ঘোষাল	আজমীর	৩৲
মাণিকদহ ব্রাহ্মসমাজ সম্পাদক		৬৲
,, মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	কলিকাতা	১৲
,, উমাপদ রায়	ঐ	১৷০
,, গুরুদয়াল সিংহ	কুমিল্লা	৩৲
,, গঙ্গাগোবিন্দ নন্দী	কলিকাতা	২৷০
,, মন্মথমোহন দাস	পিরোজপুর	৩৲
,, রমানাথ বসু	হাওড়া	৩৲
,, মোহিনীমোহন বসু	কলিকাতা	৷০
,, যুগলাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	আলিগড়	৬৲
,, গোবিন্দনাথ সিংহ	ডিব্রুগড়	৩৲
,, গোবিন্দচন্দ্র গুহ	রংপুর	৫৲
,, কালীপ্রসন্ন বসু	ঐ	৩৲
,, কেদারনাথ কুলভি	বাঁকুড়া	১৲
,, নবীনচন্দ্র ঘোষ	চেতলা	৸০।
,, ক্ষেত্রমোহন ধর	কলিকাতা	১৲
,, ব্রজেন্দ্রকুমার বসু	ডুমরাঁও	৫৴০
,, জগদীশ্বর গুপ্ত	বাগেরহাট	৩৲
,, ভারতচন্দ্র গুপ্ত	কাকিনিয়া	৩৲
,, কালীকুমার গুপ্ত	ঐ	৩৲
,, যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	ঐ	৬৵০
,, কেদারনাথ রায়	কলিকাতা	১৲
,, লক্ষ্মণচন্দ্র আস	মঙ্গলগঞ্জ	৬৲
,, বসন্তকুমারী দাস	বরিশাল	৬৲
,, কালীকৃষ্ণ দত্ত	কলিকাতা	১৲
,, অক্ষয়কুমার মিত্র	বোম্বে	৫৲
ব্রাহ্মসমাজ সম্পাদক	শিলং	৩৲
বাবু শ্রীনাথ গুহ	পটুয়াখালি	৩৷০
,, প্রিয়নাথ দাস	পায়রাশি	১৲
,, ক্ষেত্রমোহন দত্ত	কলিকাতা	১৲
,, চন্দ্রনাথ চৌধুরী	বরাহনগর	৩

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১০ম ভাগ। ১৯শ সংখ্যা। ১লা মাঘ শনিবার, ১৮০৯ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৮।

বাৎসরিক অগ্রিমমূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

পূজার আয়োজন।

গাই আর শুনি, শুনি আর গাই।

হয়েছে বাসনা মধুর সঙ্গীত
শুনা'ব তোমায়, তুমি হবে প্রীত,
কিন্তু সুরবোধ নাহিক কিঞ্চিৎ,
মাধুরীবিহীন মন মরু প্রায়।
গীত বিশারদ! করেছ মধুর
বালক বচন, বিহঙ্গের সুর,—
কর না কণ্ঠের নীরসতা দূর
মাধুরী বরষি' বাঁচাও আমায়।
মাতাও দেখা'য়ে মূরতি শোভন,
কাঁপাও শুনা'য়ে ভারতী মোহন,
মূর্চ্ছনা রাগিণী গ্রাম রাগগণ,
দেব! দয়া করি' বিকাশ হৃদয়ে।
গায় রবি শশী যে গীত গগনে,
ভকত নিরত সদা যে কীর্ত্তনে,
মিলাইয়া কণ্ঠ সে কীর্ত্তন সনে
গাউক পরাণ প্রেমে মত্ত হ'য়ে।
গাই আর শুনি, শুনি আর গাই,
তব যশোগাথা, অন্ত যার নাই।

রাজাধিরাজ, শুনিতেছি শীঘ্র তোমার এক দরবার হইবে। সে দরবারে ধর্ম্মজগতের অনেক রাজা, অনেক কুলীন, অনেক সম্ভ্রান্ত লোক যাইবেন। আমাকেও যাইবার জন্য তুমি অনুরোধ করিয়াছ। কিন্তু আমি তথায় কিরূপে যাইব? আমার ভাল কাপড় চোপড় নাই, আমি কি পরিয়া সে সভায় উপস্থিত হইব? অনেক দিন হইল তুমি নূতন কাপড় কিনিয়া দিয়াছিলে, আমি পাপের কালী, অসাধুতার কাদায় সে কাপড় এত মলিন করিয়া ফেলিয়াছি যে, তাহা পরিয়া বাহির হইতে লজ্জা করে। কত বৎসর ধরিয়া কাপড় শাদা করিবার চেষ্টা করিতেছি, কিছুতেই পারিয়া উঠিতেছি না। সবাই ভাল, নূতন ও শাদা কাপড় পরিয়া দরবারে যাইবে, আমি আমার মলিন বাস ও ছিন্ন উত্তরীয় লইয়া কিরূপে সেই বড় লোকদের সভায় উপস্থিত হইব? তুমি তো নিমন্ত্রণ করিয়া বসিলে, আমি যাই কেমন করিয়া? যাইবার বাধা তোমার কাছে খুলিয়া নিবেদন করিলাম। তোমার ভাণ্ডারে অনেক কাপড় আছে, দু একখানা গরিবকে দিবে কি? নহিলে আমার যে যাওয়া হয় না! দেবতারা যে কাপড় পরেন, দয়া করিয়া তাহার একটুখানি আমাকে পরাইয়া দাও।

ভক্তবৎসল, ভক্তের মেলা হইবে, সে মেলায় কি অভক্তের স্থান হবে? যে টুকু ভক্তি তুমি আমাকে দিয়াছিলে, কাজ করিতে গিয়া সে টুকু হারাইয়া ফেলিয়াছি, ভক্তদের ঘরে শুষ্ক মন মরু লইয়া কি যাইতে পারি? চক্ষে জল, প্রাণে রস না থাকিলে তাঁহারা তাঁহাদের কাছে ঘেঁসিতে দেন না। বৃষ্টি না হলে কি রামধনু দেখা যায়? আমার চক্ষু শুকাইয়া গিয়াছে—আমি সে ভক্তবৃন্দের দর্শন পাইব না। সম্বৎসর ধরিয়া তাঁহারা তাঁহাদের প্রাণ ভক্তিতে ভরিয়াছেন, তাঁহাদের বাসনা যে, উৎসবের সময় মনের সাধে তোমার পদে ভক্তি বারি ঢালিয়া দিবেন। যখন তাঁহারা ভক্তি-জল উপহার দিবেন, তখন তুমি তাঁহাদের মুখে যে অপরূপ সৌন্দর্য্য মাখাইয়া দিবে, তাহা আমি দেখিতে পাইব না! প্রভু, এমনই কি হবে? আমি একজন কাঙ্গাল, অনেক দিন হইতে উৎসবের শুভদিনের প্রত্যাশায় চেয়ে আছি, আমি যেতে পাব না? তুমি অনুগ্রহ কর, তোমার কটাক্ষ মাত্রে ভক্তির সমুদ্র জন্মিতে পারে। তুমি কণামাত্র ভক্তি দেও। আমি সিক্ত চক্ষুতে, সিক্ত প্রাণে, ভক্তের ভিড় যেখানে সেইখানে উপস্থিত হই।

জননি, লোকে বলিতেছে তোমার বাড়ীতে একটী বৃহৎ ভোজ হইবে। তুমি অনেক আয়োজন করিয়াছ, বাছিয়া বাছিয়া ভাল ভাল স্বর্গের জিনিস আহরণ করিয়াছ। ছেলে মেয়েদের কাছে করিয়া বসাইয়া খুব যত্নে আহ্লাদের সহিত খাওয়াইবে। আমি একজন দীন ভিখারী এক পাশে পড়িয়া আছি। সম্বৎসর প্রায় উপবাস করিয়া আছি বলিলেও বলিতে পারি। আমার দশা কি করিবে? আমাকে কি কিছু খাইতে দিবে? ভাল ছেলেদের তো খুব ভাল করিয়া খাওয়াইবেই, এ মন্দ ছেলের দশা কি হইবে? মা, খুব ভাল জিনিস অনেকদিন খাই নাই। খুব ভালজিনিসের স্বাদ এক রকম

ভুলিয়া গিয়াছি। তোমার উপর জোর করিতে পারি না। যদি আমাকে ভাল জিনিসের উপযুক্ত মনে না কর, তাহা হইলে না হয়, সকলের খাওয়া হইলে পাতে যা পড়িয়া থাকিবে তাহাই দিও। তুমি হাতে করিয়া তো দিবে তাহা হইলেই আমার ঢের হইবে। তুমি হাতে করিয়া যাহা দেও, তাহাই আমার কাছে অমৃত। দেবতারা যাহা খান, তাহার কণামাত্র দিলেই আপনাকে ধন্য মনে করিব।

প্রভু, তোমার যজ্ঞ যে আগতপ্রায়, তাহাতে বলির দরকার হইবে কি? বলি দিবার অনেকগুলি জিনিস সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি। অসাধুতা, অপ্রেম, নিন্দাবাদ, স্বার্থপরতা প্রভৃতি অনেক বিকট পশু আনিয়াছি। উহাদের উৎপাতে তোমাকে ঘরে আনিতে পারি না—আপনাকে পূর্ণাহুতি দিতে পারি না—ওগুলাকে একেবারে নাশ করা বড়ই প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। শুভ সময় উপস্থিত প্রায়। এখন যেন উহাদের জন্য বিন্দুমাত্র মায়া না করি, উহারা আমার কে? কেহ নয়,—পর, ঘোরতর পর। উহাদের জন্য মমতা কি? ওরা আমার সর্ব্বনাশ করিতেছিল, ভাগ্যে তুমি ছিলে, তাই আমি এবাত্রা রক্ষা পাইয়াছি—ওরা মরিয়া গেলে আমি বাঁচি। উৎসবরূপ মহাযজ্ঞে উহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিব, তবে মনের ক্ষোভ যাইবে। মনটাকে খুব শক্ত করিয়া দাও। জয় দয়াল বলিব, আর একটা একটা মনের দৈত্য ও রিপুকে ধরিয়া তোমার চরণে বিনাশ করিব। এবারকার উৎসব আমাদের রিপুবধ যজ্ঞে পরিণত হউক।

প্রাণাধিক, কি বলে, তোমায় ডাকিব? ডাকিবার কথা আর খুঁজিয়া পাই না। কি বলিয়া ডাকিলে প্রাণের তৃপ্তি হইবে জানি না। কাঙ্গাল আমি, রাজরাজেশ্বর তুমি, তোমাকে কি ভালবাসা জানাইব? তোমার খেয়ে, তোমার পরে, তোমার কাছে শিখে আমি মানুষ, আমি আবার তোমার কাছে কি ভালবাসা জানাইব? আমার প্রত্যেক নিশ্বাস যদি তোমার যশোগান হয়, প্রত্যেক চিন্তা যদি প্রার্থনা হয়, তবুও কিছুই হয় না। কোথায় ছিলাম, কোথায় আসিয়াছি! এত অল্প দিনের মধ্যে কি অপূর্ব্ব লীলাই করিলে! আমি তোমার দিকে একটু হেলিয়াছি মাত্র, তুমি অমনি আপনাকে দিতে উদ্যত! একথা যখন ভাবি, আহ্লাদে মন স্থির রাখিতে পারি না। মনে হয় আহ্লাদে সহস্র খণ্ড হই, আর আমার প্রত্যেক খণ্ড তোমার যশোগান করুক। তুমি যখন ঘৃণা কর নাই, তুমি যখন ছুঁয়েছ তখন আশা হয়েছে। উৎসব সফল কর। তোমার নামের মোহর আমাদের প্রাণে মারিয়া দাও। শান্তি ও অমৃতবৃষ্টি হউক—প্রেম-বিশ্বাসের বন্যা; সন্তপ্ত ও অবিশ্বাসী প্রাণ প্লাবিত করুক।

প্রভু, উৎসব ক্রমশঃই নিকট হইতে নিকটতর হইতেছে, কিন্তু আমি উৎসবের নিকটস্থ হইতে পারিতেছি না। প্রস্তুত হইবার জন্য আমি যতই চেষ্টা করি, সব যেন বিফল হইয়া যাইতেছে। এক এক সময় প্রাণের ভিতর এমনই যাতনা হইতেছে যে, আর স্থির থাকিতে পারিতেছি না। উৎসবের পূর্ব্বে একি বিপদ উপস্থিত? কোথায় এখন তোমার খুব নিকটে থাকিব, তোমার মুখ খুব উজ্জ্বলভাবে দেখিব, না তোমা হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছি, তোমার মুখচ্ছবি ম্লান হইয়া যাইতেছে। তুমি দুঃখে সহানুভূতি করিতেছ, তাই সহিষ্ণু হইয়া কোন মতে বাঁচিয়া রহিয়াছি। প্রভু! আমি আর কি বলিব? যদি কাঁদিতে কাঁদিতে আমি উৎসবে প্রবেশ করিব, ইহাই তোমার ইচ্ছা হয়, তবে তাহাই হউক। কিন্তু ফুল্লমুখ ভক্তবৃন্দের সভায় অন্ধকার মুখ লইয়া আমার যাওয়া কি ভাল দেখাবে? সুখে রাখ, দুঃখে রাখ, হাসাও আর কাঁদাও ধরা দিও। পাই পাই, পাই না এভাব দূর কর, পেয়েছি একথা স্পষ্ট অনুভব করিতে দাও। তোমার সুন্দর চক্ষুর তাড়িত প্রাণে সজোরে আঘাত করুক যে, আমি পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারি যে, প্রভু আমাকে ধরিয়াছেন। তুমি আমার দুঃখে সহানুভূতি কর, ইহা আমি উজ্জ্বলরূপে বুঝিতে পারিলেই আপনাকে ধন্য মনে করিব।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

উৎসবের উদ্বোধন।

(২)

কেবল আত্মচিন্তা লইয়া উৎসবে প্রবেশ করিলে চলিবে না। আত্মচিন্তা অনেক সময় বড় স্বার্থপর হইয়া পড়ে। অনেক সময়ে সে কেবল আপনার অভাবের দিক্ দেখে, ঈশ্বরের পূর্ণতার দিকে চাহে না। শুধু অভাবে হইবে না, ভাবও কিঞ্চিৎ চাই। উৎসব ক্ষেত্রে ইহলোক পরলোকের সাধু মণ্ডলী উপস্থিত হইবেন। ইহা কবিত্ব বা কল্পনা নহে, সত্য সত্যই তাঁহারা আসিবেন। তাঁহাদের মুখ কেমন প্রফুল্ল! তাঁহাদের চক্ষেও জল আছে, কিন্তু সে জল আনন্দের অশ্রু। তাঁহারা উৎসবের দেবতার কাছে খুব ঘেঁসিয়া বসিবেন. তাঁহাদের মুখের আলো দেবতার মুখে পড়িবে, দেবতার মুখের আলো তাঁহাদের উপর পড়িয়া তাঁহাদের স্বাভাবিক মুখশ্রী দশ গুণ উজ্জ্বল করিয়া দিবে। তাঁহারা আনন্দে উন্মত্ত ও অধীর হইয়া গানের লহরী তুলিবেন। আর তুমি আমি ভাই কি করিব? আমরা কি দগ্ধ ও বিষন্ন মুখ লইয়া উৎসবের উৎসবত্ব মলিন করিব? আমাদের মুখে কি একটুও আহ্লাদের রেখা, উৎসবের চিহ্ন প্রকাশ পাইবে না? উৎসব আনন্দের ব্যাপার, উৎসবের দিনে তো দুঃখ করিবার পথ থাকিবে না। পিতার ফুল্লমুখ, ভক্তদিগের কমলানন, তার মাঝে অন্ধকার মুখ লইয়া আমরা কেমন করিয়া যাইব? আমাদের কি আনন্দ করিবার বা হাসিবার কিছুই নাই? আমরা যে পাপী, অপরাধী, অজ্ঞান ও অপ্রেমিক, ইহা তো সত্য কথা, কে বলিবে ইহাতে অণুমাত্র মিথ্যা আছে? আমাদের মধ্যে এমন কোন্ মহাজন আছেন যিনি আপন বক্ষে হাত দিয়া

বলিতে পারেন যে, তিনি পিতার প্রাণে কখনও আঘাত করেন নাই? পদে পদে আমরা তাঁহাকে অপদস্থ করিয়াছি, আর পদে পদে তিনি আমাদের মান বাড়াইয়াছেন। এসব তো সত্য কথা। এসব তো ক্ষোভ ও মর্ম্ম বেদনার কথা। সুখের কথা কি কিছু নাই? হে ব্রহ্মপরায়ণ ব্রাহ্ম, একটু ভাবিয়া দেখ দেখি। বিশ্বাসচক্ষু একটু মাজিয়া দেখ, আনন্দ করিবার অনেক কারণ আছে। আমরা পাপী বটি, কিন্তু পিতার 'ডাক শুনিয়াছি। আমরা মন্দ বটি, কিন্তু পিতা বলিয়াছেন ভাল হও', একথা আমরা স্বকর্ণে শুনিয়াছি। না যদি শুনিতাম, তাহা হইলে আজি কি প্রাণ থাকিত? 'ভাল হও', পিতা ভিন্ন একথা আর কেহ বলিতে পারে না। আমি আমাকে 'ভাল হও', বলিতে পারি না। সে কথার জোর হইবে কেন? সেকথা শুনিতে ভক্তি হইবে কেন? এখন বল ভাই, আনন্দ করিবার, উদ্বুদ্ধ হইবার কিছু আছে কিনা। পিতা ডাকিয়াছেন, একথা স্মরণ হইলে প্রাণের মধ্যে কি তড়িত প্রবাহ ছুটে না? পিতা উৎসবে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, প্রতি মুহূর্ত্তে পিতা তাঁহার সহবাস রূপ মহোৎসবে নিমন্ত্রণ করিতেছেন। একথা যদি মান, তাহা হইলে আর কাঁদিতে পারিবে না। যদি নিতান্তই কাঁদিতে হয় এক চক্ষে কাঁদ। পিতার মধুর কণ্ঠস্বর যখন শুনিয়াছ, তখন আর এক চক্ষে তোমাকে হাসিতে হইবে। অনুতাপের হুতাশনের মধ্যে আনন্দের প্রস্রবণ উন্মুক্ত করিতে হইবে। পিতা যখন ডাকিয়াছেন তখন আর ভাবনা কি? হইলামই বা আমরা মন্দ, পিতা আমাদিগকে ভাল করিয়া দিবেন। তিনি তো মন্দকে ফেলেন না—পাপীকে পরিত্যাগ করেন না।

ধর্ম্মজগতে সকলই বিশ্বাসের কারখানা। অতএব ধর্ম্ম জগতের সকল অনুষ্ঠানে বিশ্বাস চাই। বিনয় চাই, সঙ্কল্প চাই সত্য, কিন্তু বিশ্বাস না থাকিলে সকলই বিফল। যদি ভাই তোমার বিশ্বাস না থাকে যে, এ উৎসব তোমার আমার কাজ নহে, উৎসবের দেবতার কাজ, তাহা হইলে এ উৎসবে যোগ দিয়া যে তুমি বিশেষ ফল পাইবে এমন আশা করা যায় না। উৎসব ঈশ্বরের বলিয়া যদি বিশ্বাস না থাকে তবে উহাতে যোগ দিতে ভাল করিয়া প্রবৃত্তিই হইবে না, ফলের কথা তো পরে। ফলাফল বিচার করিবারই বা এত ব্যস্ততা কেন? ফলাফলের ভার যদি বিধাতার হাতে রাখিবার বিশ্বাস না হইয়া থাকে, তবে এতদিন কি সাধন ভজন করিলাম? এত দেখিয়া শুনিয়া, এত ঠেকিয়া শিখিয়া যে পিতার পদে প্রাণটা ঢালিয়া দিতে পারি না, ইহা নিতান্ত আক্ষেপের বিষয়। ফলাফলের বিষয়ে যদি আমরা উদ্বিগ্ন হই তাহা হইলে পিতাকে আমাদের নিশ্চয় অবিশ্বাস করা হইবে। পিতা তাঁহার কথা চিরকালই রাখেন, আমরা আমাদের কথা লক্ষবার ভাঙ্গি। তবে কেন তাঁহার উপরে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিব না? ঈশ্বরের আহ্বান উপলব্ধি করিয়া, ফলাফলের ভার ঈশ্বরের হাতে রাখিয়া আমাদিগকে উৎসবে প্রবেশ করিতে হইবে। বাহিরের আড়ম্বর ও প্রণালীর ঘটার দিক্ হইতে দৃষ্টি তুলিয়া লইতে হইবে। নহিলে মন্দিরের উৎসব মন্দিরেই রহিয়া যাইবে, প্রাণে আসিয়া লাগিবে না। উৎসবকে প্রাণে লাগাইতে হইলে গভীর বিশ্বাসের প্রয়োজন। সঙ্গীতের লহরীর সঙ্গে সঙ্গে প্রাণেও গাহিয়া উঠিবে, উপদেশের অমৃতবর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণে নবজীবন ও অটল প্রতিজ্ঞা-স্রোত খুলিয়া যাইবে, নহিলে উৎসব কি? আমাদের শরীর নাচাইয়া কি হইবে, মনটা নাচা চাই। আবার এমনই মত্ততা চাই যে, উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নৃত্য করা শেষ হইয়া না যায়। নিজ জীবনে, ব্রাহ্ম সমাজের জীবনে, জগতের জীবনে ঈশ্বরের মহতী কৃপা যদি আমরা অনুধ্যান করি, নিশ্চয়ই আমাদের মন নাচিয়া উঠিবে, উৎসব অবতীর্ণ হইবে। পাপী অপরাধী হইয়া আজি যে উৎসব করিতে পারিতেছি, ইহা কি ঈশ্বরের কম দয়া? ভিন্ন দেশবাসী, ভিন্ন অবস্থার, ভিন্ন প্রকৃতির হইয়াও যে এ উৎসবের দেবতার নামে মিলিত হইতে পারিতেছি, ইহা কি ঈশ্বরের কম দয়া? বড় বড় লোক আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতেছে, তবু আমরা আজি উৎসাহে ও আনন্দের সহিত উৎসব করিতে যাইতেছি, ইহা কি ঈশ্বরের কম দয়া? দেশের গণ্য মান্য লোক আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন, তবু আমরা অবিচলিতচিত্তে সুদৃঢ় করে প্রভুর পাদপদ্ম ধরিতে যাইতেছি ইহা কি তাঁহার কম দয়া? সাধনবিহীন, ভজনবিহীন, ভক্তিবিহীন হইয়াও আমরা যে প্রভুর অলৌকিক কার্য্য কলাপের ও মধুর প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের কথা এমন করিয়া ভাবিতে পারিতেছি ইহা কি তাঁহার কম দয়া? যাঁহার এত দয়া, যাঁহার দয়া বলিয়া কেহ ফুরাইতে পারে না, অথচ না বলিয়া কেহ থাকিতে পারে না, তাঁহার উৎসবের নিমন্ত্রণ পাইয়া মন উৎফুল্ল হইবে না, প্রাণ নাচিবে না তো কবে প্রাণ উৎফুল্ল হইবে ও নৃত্য করিবে? কাঁদিবারও সময় আছে, হাসিবারও সময় আছে। এতদিন কাঁদিয়াছি এখন প্রভু ভক্তদের সঙ্গে হাসিতে ডাকিতেছেন, এখন কি আমি মুখ মলিন ও মেঘাচ্ছন্ন করিয়া ঘরের কোণে বসিয়া থাকিব? প্রভু ভক্তদিগকে নাচিতে ডাকিতেছেন, এখন কি আমি শোকবস্ত্র পরিয়া অমঙ্গলের ধ্বনি তুলিয়া আর্ত্তনাদ করিব? তিনি কাঁদিতে বলিলে কাঁদিতে পারি, আর হাসিতে বলিলে হাসিতে পারিব না, এ কিপ্রকার তাঁহার কথা শুনা?

উৎসবে প্রবেশ করিতে হইলে আর একটী কথা মনে রাখিতে হইবে যে, উৎসব কাহারও নিজস্ব নহে, উহা সকলের সাধারণ সম্পত্তি। একা আমি ও ঈশ্বরে গোপনে যে উৎসব হয়, ভক্তপ্রাণে সে উৎসব প্রায়ই হইয়া থাকে, আমরা কিন্তু যে উৎসবে যোগ দিতে যাইতেছি, ইহা সেরূপ নির্জ্জন উৎসব নহে, ইহা সাধারণ উৎসব। সবাই মিলিয়া এ উৎসব করিতে হয়। একা একা হয় না। তাই আমরা ব্রাহ্মমণ্ডলীকে কৃতাঞ্জলিপুটে সাদরে নিমন্ত্রণ করিতেছি। এস ভাই ভগিনি এস, হাত ধরাধরি করিয়া পিতার গৃহে পিতার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাই। বৎসরকার দিনে আজি পরস্পরের প্রতি অসদ্ভাব পোষণ করিব না। যদি দোষ করিয়া থাকি, তবে চরণে ধরিয়া ক্ষমা চাহিতেছি। যদি ক্ষমা না কর তবে আমি মারা যাইব। আজিকার দিনে ভাই ভগিনী সকলে একপ্রাণ হইয়া না গেলে প্রভু প্রবেশ করিতে দিবেন না। ছার অহঙ্কারে কি আমার সম্বৎসরের আশা বিফল হইয়া যাইবে? চূর্ণ হউক এমন পাপ অহঙ্কার, যাহা

ভাই ভগ্নীকে পরস্পর হইতে পৃথক্ করিয়া রাখে। আজি পরস্পরের চরণে প্রণত হইতে হইবে। পরস্পর পরস্পরের পরিচারক হইতে হইবে। যিনি ভাল করিয়া পরিচর্য্যা করিতে পারিবেন তিনিই বড় পরিচারক হইবেন, যিনি ভাল করিয়া দাসত্ব করিতে পারিবেন তিনিই আমাদের মধ্যে বড় হইবেন। অসদ্ভাব, অপ্রেম পরিহার করিয়া চল তবে আমরা উৎসব রাজ্যে প্রবেশ করি। পিতার কৃপা আমাদিগকে শীঘ্র ধরিয়া তাঁহার চরণে লইয়া যাক। তাঁহার মুখের পানে তাকাইয়া আমরা অবাক্ হইয়া থাকি। তাঁহার কথা বলিতে ইচ্ছা হয় তিনি বলুন, না হয় চুপ করিয়া থাকুন। আমরা যদি দুই চারি মিনিট তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকিতে পারি তাহা হইলেই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট হইবে। ইহলোক ও পরলোকবাসী সাধু মণ্ডলীকেও আমরা আহ্বান করি। তাঁহারা আমাদের নমস্য ও ভক্তি ভাজন, তাঁহাদিগকে স্থানে তাঁহাদিগকে না বসাইয়া কি আমরা উৎসবে যাইতে পারি? সবাই মিলে এস তবে ছুটিয়া পিতার মন্দিরের দিকে যাই। তাঁহার পবিত্রাত্মা আমাদিগকে তাঁহার কৃপা ধারণে প্রস্তুত করুক। বিনয় ও ভক্তির বসন ও কুসুমদামে সজ্জিত করিয়া পরমেশ্বর আমাদিগকে উৎসব ক্ষেত্রে উপস্থিত করুন।

উপাসনাতত্ত্ব

(৬

ব্রহ্ম স্বরূপ।

আরাধনা শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা বলিয়াছি যে, ব্রহ্মস্বরূপ সাধন ভিন্ন উচ্চ ধর্ম্ম জীবন লাভের উপায়ান্তর নাই। বর্ত্তমানে আমরা সত্যং জ্ঞানং প্রভৃতি স্বরূপ নিচয়ের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

স্বরূপ সাধনের পূর্ব্বে স্বরূপ কি, তাহা জ্ঞানদ্বারা নির্ণয় করিয়া লইতে হইবে। স্বরূপ জ্ঞানে যদি ভ্রম থাকে, স্বরূপ সাধনও দূষিত হইয়া পড়ে। ধর্ম্ম জগতের ইতিহাসে আমরা এই সত্যের প্রমাণ পাই। আমরা দেখিতে পাই যে, ঈশ্বরের অদ্বিতীয় অখণ্ডত্ব অস্বীকার করিয়া খৃষ্টধর্ম্ম ত্রিদেববাদ ও হিন্দুধর্ম্ম বহুদেববাদে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, এবং ঈশ্বরের পবিত্র স্বরূপ অবহেলা করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম অপবিত্রতা মিশ্রিত ভাবুকতা দোষে দূষিত হইয়াছে। একমাত্র আত্মরূপী ঈশ্বরের বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক পূজা প্রচারার্থ ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয়। ব্রহ্মোপাসকদিগকে বিশেষ রূপে সতর্ক থাকিতে হইবে যে, তাঁহাদের ব্রহ্ম পূজায় কোন প্রকার ভ্রম, অসত্য, বা কুসংস্কার না প্রবেশ করিতে পারে।

আর একটী কথা এই যে, স্বরূপ জ্ঞানের বিশদতা অনুসারে ব্রহ্ম-দর্শনের উজ্জ্বলতার তারতম্য হয়। ইহা সকলের স্বীকৃত কথা যে, যিনি যে বস্তুর স্বরূপ ভাল করিয়া জানেন, তিনি সেই বস্তু ভাল করিয়া দেখেন ও সম্ভোগ করিতে পারেন। কে না জানে যে, সাধারণ লোক অপেক্ষা বিজ্ঞানবিদেরা বস্তুতত্ত্ব অধিকতর সূক্ষ্মরূপে দেখিতে পান, সাধারণ লোকে যেখানে কিছুই দেখে না, সেখানে তাঁহারা অনেক দেখেন, সাধারণ লোক যেখানে এক গুণ সৌন্দর্য্য দেখে, সেখানে তাঁহারা শতগুণ সৌন্দর্য্য আবিষ্কার করেন। কোমল কুসুমদলের কান্তি সকলেরই চিত্ত হরণ করে, কিন্তু অণুবীক্ষযোগে উদ্ভিদবেত্তা তাহাতে যে সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য রাশি দেখিতে পান, তাহা সাধারণের নিকট প্রচ্ছন্ন থাকে। এই সহজ কথাটী মনে রাখিলে জ্ঞান ও ভক্তির বিরোধ বিদূরিত হয়। স্বরূপসকলের বিষয় সর্ব্বদা চিন্তা করিতে হইবে; ব্রহ্মবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা স্বরূপনিচয়ের যে সকল ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, যত্নের সহিত তাহা আয়ত্ত করিতে হইবে। তাহা হইলে ক্রমে স্বরূপ সকলের পরিষ্কার ভাব হৃদয়ঙ্গম হইবে।

সকল স্বরূপের মূলে অনন্ততা। সচ্চিদানন্দং বা "সত্যং শিবং সুন্দরং" বা যাহাই বলিয়া ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্দেশ করুন, দেখিতে পাই সে সকল স্বরূপই অনন্ত। এক একটী স্বরূপ এক একটী অতলস্পর্শ সমুদ্র, যতই কেন অবতরণ কর না কিছুতেই তলদেশ স্পর্শ করা যায় না। আধ্যাত্মিক অগস্ত্যবৃন্দও সেই স্বরূপ সিন্ধুচয় শুষিতে পারেন না। তিনি জ্ঞানের অতীত; যতই কেন তাঁহাকে জানি না, কখনই সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারিব না, জ্ঞাত ব্রহ্মত্বের অতীত অনন্ত অজ্ঞাত ব্রহ্মত্ব রহিয়া যাইবে,—অনন্তব্রহ্ম বলিতে আমরা ইহাই বুঝিয়া থাকি।

"নাহং মন্যে সুবেদেতি নোনবেদেতি বেদচ" আদি বচনে প্রাচীন ঋষিগণ ঐশী অনন্তভাবের এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। অনন্ততাতেই ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব। অনন্ততার প্রাচীর জীব কখনই উল্লঙ্ঘন করিতে পারিবে না। ব্রহ্মাভিমুখে জীব চিরকাল অগ্রসর হইবে বটে, কিন্তু কখনও ব্রহ্মত্ব লাভ করিতে পারিবে না, ব্রহ্মসিন্ধুতে বিন্দুবৎ বিলীন হইবে না, ব্রহ্মজ্যোতির শুভ্রত্বে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের রশ্মির ন্যায় মিশাইয়া যাইবে না। সুতরাং ব্রাহ্মের অনন্তবাদ একদিকে যেমন অনন্ত উন্নতিবাদের পক্ষপাতী, আর একদিকে উহা তেমনি প্রচলিত স্থূল অদ্বৈতবাদের বিরোধী।

ব্রহ্মের এই অনন্ততা আমাদের বড় আদরের বস্তু। অনন্ত দেবতার আমরা যে পূজা করিতে পাই, ইহা আমাদের মহোচ্চ অধিকার। অদ্বিতীয় কল্পনা বলে ফিডিয়াস নিরুপম মিনর্ভা মূর্ত্তি খোদিত করুন, আর স্বর্গীয় প্রতিভাপরিচালিত হইয়া মাইকেল এঞ্জেলো গম্ভীর ও সুন্দর দেবমূর্ত্তিই চিত্রিত করুন, সে মূর্ত্তি ও চিত্রের সৌন্দর্য্যও কালে ম্লান হইয়া যায়। সত্য ঈশ্বরের সত্য সৌন্দর্য্য ও মহিমা কিন্তু আজও পর্য্যন্ত কেহ ধ্যান করিয়া পুরাতন করিতে পারিল না।—চৈতন্যের প্রেম সর্ব্বগ্রাসী ও ঈশার নির্ভর অচলোপম হইলেও উহা অন্ত-বিশিষ্ট, সুতরাং উহা মানবহৃদয়ের অনন্ত পিপাসা অনন্তকাল নিবারণ করিতে সমর্থ হয় না। অনন্ত ঐশী পূর্ণতাই মানবহৃদয়-নিহিত পূর্ণতাপ্রাপ্তির তৃষ্ণা নিবারণ করিতে সমর্থ। ব্রহ্মের ব্রহ্মত্বের শেষ নাই বলিয়া ব্রহ্মসঞ্চারিত পূর্ণতালাভতৃষ্ণার তৃপ্তিরও কখনও বিরাম হয় না। যতই সে তৃষ্ণা চরিতার্থ হয়, ততই তাহা আরও বর্দ্ধিত হইয়া উঠে।

স্বরূপ সকলের অনন্ততার কথা বলিলাম, এখন দেখা যাউক্ স্বরূপ কি? ঈশ্বর জড় নহেন, আত্ম পদার্থ, সুতরাং আত্ম পদার্থের স্বরূপ সকল তাঁহাতে অনন্ত ভাবে বিদ্যমান।

আত্মা বলিলে আমরা বুঝিব, শক্তি, জ্ঞান, প্রেম ও পুণ্যশালী ব্যক্তিবিশেষ। ঈশ্বর বলিলে, আমরা অনন্ত শক্তি জ্ঞান প্রেম ও পুণ্যময় ব্যক্তি বুঝিয়া থাকি। ঈশ্বর গুণসমষ্টি নহেন, নির্গুণও নহেন। তিনি গুণসমন্বিত অনন্ত অস্তিত্ব। প্রত্যেক পদার্থেই তিনি আছেন; তিনি সর্ব্বব্যাপী। কিন্তু তাঁহার সর্ব্বব্যাপিত্ব স্থূল ও কঠিন বা সূক্ষ্ম ও তরল পদার্থের স্থানব্যাপিত্ব নহে। মানবাত্মা সম্বন্ধেও আমরা স্থানব্যাপিত্ব মানি না। আমরা বলিতে পারি না আত্মা হস্তে, পদে কি মস্তকে আছেন। আমরা বলিতে পারি না যে হস্ত পদ ছিন্ন হইলে হস্ত পদে যেটুকু আত্মা ছিল তাহা বাহির হইয়া যায়। অখণ্ড আত্ম পদার্থ সম্বন্ধে স্থান নির্দ্দেশ প্রলাপ মাত্র। অনন্ত ঐশী আত্মা সম্বন্ধে স্থানব্যাপিত্ব কল্পনা করা অর্থহীন ও অজ্ঞানমূলকতা। কে বলিবে যে ক্ষুদ্রকায় জীবে ঈশ্বর অল্প পরিমাণে ও বৃহৎকায় জন্তুতে অধিক পরিমাণে আছেন। অথচ তিনি সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বদাই কাছে আছেন। কিরূপে তবে তিনি আছেন? আমরা বলি তিনি প্রাণরূপে, বিদ্যমান। আমরা বলি তিনি শক্তির শক্তি, অস্তিত্বের অস্তিত্ব, জীবনের জীবন। প্রকৃতির কার্য্য পর্য্যালোচনা না করিয়া যে সকল শক্তি বা নিয়মে আমরা উপনীত হই, সেই সকল শক্তি বা নিয়ম, সেই মহাশক্তি ও বিশ্বনিয়ন্তার কার্য্য প্রণালী। সত্যই

"ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥"

ভৌতিক পদার্থেরও তিনি প্রাণ, আত্ম পদার্থেরও তিনি জীবন; তিনিই কেবল নিরপেক্ষ, আর সকলই আপেক্ষিক। তিনি মনের মন; তাঁহারই বলে আমরা চিন্তা করি। তাঁহারই বলে আমরা কার্য্য করি। তাই বলিয়া এরূপ বুঝিতে হইবে না, যে আমাদের ব্যক্তিত্ব নাই। ইচ্ছা দিয়াছেন সত্য, কিন্তু তিনিই আবার ইচ্ছাকে স্বাধীন করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং জীবনের আদর্শ হইয়া আবার ইচ্ছাকে নিয়মিত উন্নতির পথে অগ্রসর করিতেছেন। তাঁহার অসীম জ্ঞান আমাদের জ্ঞানলাভেচ্ছা উত্তরোত্তর বলবতী করিতেছে, তাঁহার অনন্ত উদার প্রেম, আমাদের স্বার্থপরতাকে দিন দিন খর্ব্ব করিতেছে।

"দীনাত্মারাই ধন্য।"

যখন প্রবল বন্যায় কোন দেশ প্লাবিত হইয়া যায়, তখন চারিদিক্ একাকার দেখায়; যে দিকে চাও সেই দিকেই জল; মাঠ, ঘাট, পথ, খানা, ডোবা, পুষ্করিণী, উচ্চভূমি, নিম্নভূমি, কিছুরই কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না; সব এক হইয়া যায়; যতদূর দৃষ্টি চলে ততদূর বিস্তীর্ণ জলরাশি ভিন্ন আর কিছুই নয়নগোচর হয় না; কেবল মধ্যে মধ্যে দুই একটী উচ্চ বৃক্ষকে জলরাশির উপর নিজ নিজ মস্তক উন্নত করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখা যায়। তাহার পর যখন বন্যার জল সরিয়া যাইতে আরম্ভ হয়, তখন ক্রমে ক্রমে অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্থান সকল জলহীন হইয়া রৌদ্রতাপে শুষ্ক হইতে থাকে; কিন্তু বন্যার জল চলিয়া গেলে পরও অনেক দিন পর্য্যন্ত নিম্নভূমি সকল জলে পরিপূর্ণ থাকিতে দেখা যায়। নিম্নভূমির জল শীঘ্র শুষ্ক হয় না; যে স্থান যত অধিক নিম্ন সেস্থান শুষ্ক হইতে তত অধিক দিন লাগে।

আধ্যাত্মিক জগতেও এইরূপ ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়। পরমেশ্বরের প্রেমস্রোত যখন উৎসব প্রভৃতি কোনও বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে জনসমাজে বিশেষভাবে অনুভূত হয়, তখন যাঁহারা উহার শক্তির মধ্যে আসিয়া পড়েন তাঁহাদের প্রায় সকলেরই হৃদয় ঐ স্রোতে প্লাবিত হইয়া যায়; যে অত্যন্ত অপ্রস্তুত মনে উক্ত ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়, সেও কিছু না কিছু পরিমাণে উহার প্রভাব অনুভব করিয়া থাকে। তবে যাহারা নিতান্ত অহঙ্কৃত বা অবিশ্বাসী, এরূপ দুই চারি জন লোক হয়ত উন্নত মস্তকে এই প্রেমপ্লাবনকে উপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু এরূপ লোকের সংখ্যা বড় অধিক নহে। সাধারণতঃ এই সকল প্রেমস্রোতে সাধু অসাধু, বিনীত অবিনীত, প্রেমিক অপ্রেমিক, বিশ্বাসী অবিশ্বাসী সকলেরই হৃদয় অল্প বা অধিক পরিমাণে প্লাবিত ও আর্দ্র করিয়া দিয়া যায়। তাহার পর ক্রমে যত দিন যাইতে থাকে, সংসারের প্রখর উত্তাপে ঐ বন্যার জল ততই শুষ্ক হইতে থাকে। তখন যে সকল হৃদয় অহঙ্কারে স্ফীত, সেই সকল হৃদয় সর্ব্বাগ্রে প্রেমহীন ও শুষ্ক হইতে আরম্ভ হয়। জড়-জগতে যেমন জল নিম্নগামী, জড়জগতে যেমন উচ্চস্থানে জল দাঁড়ায় না, আধ্যাত্মিক জগতেও সেইরূপ প্রেম নিম্নগামী, গর্ব্বস্ফীত হৃদয়ে প্রেমের জল, ভক্তির জল দাঁড়াইতে পারে না। যাহারা নিতান্ত দীনাত্মা, যাহারা নিজের অযোগ্যতা ও অসারতা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে, কেবল তাহাদের হৃদয়েই পূর্ব্বোক্ত প্রেমবন্যার জল দাঁড়াইতে পায়। তাহাদের হৃদয় শীঘ্র শুষ্ক হয় না; যে যত অধিক পরিমাণে নিজের হীনতা বুঝিতে পারে, যে যত অধিক পরিমাণে আপনাকে দীনহীন কাঙ্গাল বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারে, তাহার প্রাণে পরমেশ্বরের প্রেমবারি তত অধিককাল স্থায়ী হইয়া থাকে।

কি উৎসবাদি বিশেষ ঘটনায়, কি আমাদের দৈনিক জীবনে, সকল স্থলেই ঐ এক কথা,—নিজের অযোগ্যতা, নিজের অসারতা বুঝিতে না পারিলে ঈশ্বরের কৃপা অনুভব করিতে পারা যায় না। যাহার প্রাণে অহঙ্কারের ভাব যত প্রবল, সে ঈশ্বর কৃপার অনুভূতি হইতে সেই পরিমাণে বঞ্চিত। পরমেশ্বর যে তাহাকে কৃপা করেন না তাহা নহে। তাঁহার চন্দ্র সূর্য্য যেমন ব্যক্তিনির্বিশেষে আলোক বিতরণ করিতেছে, তাঁহার মেঘ যেমন পাপী সাধু সকলেরই জন্য বারিবর্ষণ করিতেছে, তাঁহার বায়ু যেমন সকলেরই জন্য প্রবাহিত হইতেছে, তাঁহার পৃথিবী যেমন সকলেরই আহারের জন্য শস্য উৎপাদন করিতেছে, সেইরূপ তাঁহার কৃপাস্রোত দিবানিশ সকলেরই জন্য প্রবাহিত হইতেছে। ধন্য সেই ব্যক্তি, যিনি অন্তরে বাহিরে সেই কৃপার কার্য্য প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিয়া

তাঁহার চরণে মস্তক অবনত করেন। ধন্য সেই ব্যক্তি, যিনি সজ্ঞানে ও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সেই কৃপাস্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দেন। তিনিই মুক্তি পথের প্রকৃত পথিক, তিনিই অমৃতধামের যাত্রী, তিনিই স্বর্গরাজ্যের অধিকারী। যে আপনাকে নিতান্ত অনুপযুক্ত ও অসার জানিয়া একান্তমনে পরমেশ্বরের উপর নির্ভর করে, যে আপনাকে নিতান্ত অজ্ঞান ও দুর্ব্বল জানিয়া প্রভুর হস্তে নিজের সমস্ত ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হয়, এবং সকল অবস্থাতেই প্রাণ খুলিয়া বলিতে পারে, "প্রভু! আমার ইচ্ছা নয়, কিন্তু তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক," দয়াময় প্রভু তাহার মলিন মুখ উজ্জ্বল করেন, তাহার অবনতমস্তক উন্নত করেন, তাহার দুর্ব্বলতা দূর করিয়া তাহার প্রাণে আশ্চর্য্য শক্তি সঞ্চার করেন, তাহার মরুভূমিসদৃশ প্রাণে ভক্তিনদী প্রবাহিত ও প্রেমের কুসুম সকল প্রস্ফুটিত করেন। তাহার জীবনের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখিয়া সে নিজেই অবাক্ হইয়া যায়, লোকে ত আশ্চর্য্য হইবেই। এই দীনতাবোধই ব্রহ্মকৃপালাভের একমাত্র উপায়, এই দুর্ব্বলতাবোধ হইতেই প্রাণে নবজীবন সঞ্চার হয়, প্রেমভক্তির উৎস খুলিয়া যায়। এই জন্যই মহর্ষি ঈশা বলিয়াছেন, "দীনাত্মারাই ধন্য, কারণ স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই যে আপনাকে বাস্তবিক নিতান্ত অসহায় বলিয়া অনুভব করত একান্তমনে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হয়, সে দয়াময় প্রভুর চরণাশ্রয় লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হয়। আর অতি কৃপাপাত্র দীন সেই ব্যক্তি যে নিজের গর্ব্বিত মস্তক উন্নত করিয়া স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে চায়, যে নিজের জ্ঞান বা সাধুতার অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া ঈশ্বরের পুত্রকন্যাগণকে ঘৃণা বা উপেক্ষার চক্ষে দর্শন করে, এবং ভাই ভগ্নীর প্রাণে আঘাত করিতে কুণ্ঠিত হয় না। স্বর্গরাজ্যের দ্বার অতি সঙ্কীর্ণ; এখানে ক্ষুদ্র পিপীলিকার প্রবেশাধিকার আছে, কিন্তু মদমত্ত হস্তী এখানে প্রবেশ করিতে পারে না। গর্ব্বোন্নত মস্তক ও দর্পস্ফীত হৃদয় লইয়া কখনই সে সঙ্কীর্ণ দ্বার অতিক্রম করা যায় না। নিতান্ত কদাচারী মহাপাতকীও ঈশ্বরের কৃপালাভ করিয়া পবিত্র ও ধন্য হইতে পারে, কিন্তু অহঙ্কারী ব্যক্তি অন্যদিকে সহস্র সদ্গুণে অলঙ্কৃত হইলেও প্রেমময়ের, প্রেমরসের আস্বাদন লাভ করিতে সমর্থ হয় না। যতদিন না তাহার অহঙ্কার চূর্ণ হয়, ততদিন ঈশ্বরের সহিত তাহার আত্মার শুভ সম্মিলন অসম্ভব। দয়াময়ের আধ্যাত্মিক অন্নছত্রে চীরবাসধারী, গলিত কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ভিক্ষুকেরও স্থান হয়, কিন্তু মহামূল্য পরিচ্ছদশোভিত দিকপালগণ সেখানে প্রবেশ করিতে পারেন না। ভিক্ষুকের মেলায় ভিক্ষুকেরই প্রবেশাধিকার আছে, যে ভিক্ষুক নয় তাহার সেখানে যাইবার অধিকার কি?

প্রেমময়ের প্রেমোৎসব আগতপ্রায়। এই উৎসবে কত কাঙ্গালী বিদায় হইবে! কত দীনহীন ভিখারী সম্বৎসরের সম্বল করিয়া লইবে! কত লোককে হয়ত দয়াময় চিরজীবনের সম্বল করিয়া দিবেন! কিন্তু কাঙ্গালী না হইতে পারিলে সেখানে গিয়া কোনও লাভ নাই। নিজের অযোগ্যতা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া নিতান্ত দীনভাবে তাঁহার শরণাপন্ন হইতে না পারিলে নিরাশ মনে ও শূন্য হস্তে সেখান হইতে ফিরিয়া আসিতে হইবে। শুদ্ধ বাহিরে দীনের বেশ পরিধান করিলে হইবে না, শুদ্ধ বাহিরে ভিক্ষুকের ন্যায় কাতরতা দেখাইলে হইবে না, শুদ্ধ মুখে আপনাকে কাঙ্গাল বলিলে হইবে না। সংসারের কাজ কর্ম্ম উপলক্ষে মানুষ যখন কাঙ্গালী বিদায় করে, তখন যাহারা বাস্তবিক কাঙ্গালী নয় এমন কত-লোক তাহাদের দলে মিশিয়া দাতাদিগকে প্রতারিত করে। এখানে সে প্রবঞ্চনা চলিবে না। সেই অন্তর্যামী সর্ব্বজ্ঞ পুরুষকে বাহিরের অশ্রুজল, বাহিরের ক্রন্দন ও কাতরতাদ্বারা কে ভুলাইতে পারে? আপনাকে যথার্থ অসহায় কাঙ্গাল বলিয়া অনুভব করিতে না পারিলে তাঁহার নিকট কিছুই পাওয়া যাইবে না। যে নিজের দরিদ্রতা যত অধিক পরিমাণে বুঝিতে পারিবে, তাহাকেই তিনি তত অধিক পরিমাণে প্রেমান্ন ও পবিত্রতার বসন বিতরণ করিবেন। যিনি উৎসব হইতে স্থায়ী সম্বল লাভ করিতে চান, তাঁহাকে সকল অহঙ্কার চূর্ণ করিতে হইবে, তাঁহাকে নিজের অযোগ্যতা ও দরিদ্রতা বিশেষরূপে অনুভব করিতে হইবে। নতুবা সাময়িক ভাবোচ্ছ্বাসে, অথবা অন্যের ভাবস্রোতের আঘাত প্রতিঘাতে হৃদয় মুহূর্ত্তের জন্য বিগলিত ও নয়ন অশ্রুজলে প্লাবিত হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে জীবনের কোনও স্থায়ী উপকার হইবে না। 'হৃদয়নিহিত গূঢ় অহঙ্কারের বীজ বিনষ্ট না হইলে, সঙ্কীর্ত্তনেই উন্মত্ত হও, আর অশ্রুজলে ধরাতলই সিক্ত কর, দুই দিন পরে তাহার কোন চিহ্নও দেখিতে পাইবে না। এই অহঙ্কারই আমাদের সর্ব্বনাশের মূল, এই অহঙ্কারই আমাদের সমস্ত অপ্রেম অসদ্ভাবের আকর। এই অহঙ্কারের জন্যই আমরা জীবন্ত ও সরস ধর্ম্মের আশ্রয়ে থাকিয়াও শুষ্ক ও মৃতবৎ পড়িয়া রহিয়াছি; উৎসবের পর উৎসব কাটিয়া যাইতেছে তথাপি আমাদের প্রাণে স্থায়ী ও জলন্ত বিশ্বাসের বিশেষ লক্ষণ কিছুই দেখা যাইতেছে না। অহঙ্কার চূর্ণ না হইলে, নিজের অযোগ্যতা ভাল করিয়া অনুভব করিতে না পারিলে, কখনই আমরা ঈশ্বরের হস্তে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিতে পারিব না; এবং পূর্ণ আত্মসমর্পণ ভিন্ন কেহ কখনও ঈশ্বরের কৃপা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় নাই ও হইবে না। তাই উপরে বলা হইয়াছে যে, যিনি উৎসব হইতে স্থায়ী উপকার লাভ করিতে চান, যিনি উৎসবের সময় প্রেমময়ের প্রেমস্রোত হৃদয়ে ভাল করিয়া ধরিতে চান, যিনি রাজরাজেশ্বরের দান সাগরে উপস্থিত হইয়া স্থায়ী সম্বল লাভ করিতে চান, তাঁহাকে এখন হইতে নিজের অযোগ্যতা ও দরিদ্রতা ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে, তাহার জন্য বিশেষ ভাবে চিন্তা ও প্রার্থনা করিতে হইবে। নিজের অভাব ও মলিনতা বেশ করিয়া বুঝিয়া দীন হীন ভিক্ষুকের ভাবে, মস্তক অবনত করিয়া প্রভুর দ্বারস্থ হইতে না পারিলে কখনই আমরা তাঁহার কৃপা লাভ করিতে সমর্থ হইব না। আধ্যাত্মিকরাজ্যে যে আপনাকে যত ছোট মনে করে, দয়াময় তাহাকে তত উচ্চস্থান প্রদান করেন; আর যে আপনাকে যত বড় মনে করে, তাহার সেই পরিমাণে অধোগতি হয়।

দয়াময় পরমেশ্বর আমাদের প্রকৃত ছবি আমাদের অন্তরে প্রকাশিত করুন, আমাদিগকে নিজ নিজ অযোগ্যতা, মলিনতা ও দারিদ্রতা প্রকৃতভাবে অনুভব করিতে সমর্থ করুন। আমরা যেন আগামী উৎসবে যথার্থ দীনভাবে তাঁহার দ্বারস্থ হইতে পারি।

ব্রহ্মোৎসব কি ?

অনুষ্ঠান যতই কেন বিশুদ্ধ ও স্বর্গের জিনিস হউক না, করিতে করিতে ক্রমে উহার স্বর্গীয়ত্ব হ্রাস হয় এবং পৃথিবীর ধুলা কাদার সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া অত্যন্ত অসার কার্য্যে পরিণত হইয়া পড়ে। তখন সে অনুষ্ঠান আত্মার পক্ষে কল্যাণকর না হইয়া অনিষ্টকর হয়, এবং কুসংস্কার ও ভ্রমের পথ মুক্ত করে। বিগত সাতান্ন বৎসর ধরিয়া আমরা উৎসব করিতেছি। প্রতি বৎসর মাঘ মাসে দশ পনর দিন করিয়া বিশেষভাবে ঈশ্বর পূজা করি এবং তাহাতে মাঝে মাঝে বেশ ভাবের উচ্ছ্বাস হয়। সঙ্কীর্ত্তনে নাচ, ভাবের উচ্ছ্বাসে মত্ত হই। দিন কতক খুব নাচানাচি, বেশ মাতামাতি হয়। দেশ দেশান্তর হইতে ভাই ভগিনীরা আসিয়া যোগ দেন। নূতন ভাই ভগিনীদের সহিত পরিচিত হই, পুরাতন ভাই বন্ধুদিগের সহিত যে আলাপ তাহার নূতন সংস্কার করিয়া লই। উৎসব সমাপ্ত হইলে যে যার ঘরে ফিরিয়া যাই। উৎসবের পূর্ব্বে যেমন ছিলাম উৎসবের পরে তদপেক্ষা কিছু অধিক সুস্থ হইয়াছি বলিয়া বোধ হয় না। উৎসব একটী ব্রাহ্মসমাজের রীতি হইয়া পড়িয়াছে। দশজনে যোগ দেয় তাই আমরা যোগ দিই। যাঁহারা আমাদের শ্রদ্ধেয় ও ভক্তিভাজন তাঁহারা যখন যোগ দিতেছেন তখন আমরাও যোগ দিব বৈ কি, এইরূপ ধরিয়া লই। দেখিয়া শুনিয়া, যুক্তি হেতু বাদ দিয়া অভ্যাস ও রীতির অনুরোধে যোগ দিই বলিয়া উৎসব আমাদের পক্ষে সাময়িক আমোদ ও উত্তেজনায় পরিণত হয়। ব্রাহ্মভাই, যদি স্থায়ী ফল লাভের আশা রাখ, তাহা হইলে উৎসবকে জাগ্রত করিতে হইবে। সমস্ত বৎসর যাহার দিকে চাহিয়া থাক, সে জিনিসটা প্রাণের উপর দিয়া চলিয়া যাইবে, অথচ প্রাণের কিছু হইবে না ইহা নিতান্ত আক্ষেপের বিষয়। বনের পাখী বনে ডাকে, সঙ্গীত মাধুরীতে বনদেবতাকে মোহিত করে, আমি যখন বন দিয়া যাই তখন তাহা শুনিতে পাই। উৎসব পাখী খানিকটা স্বর্গ ঢালিয়া দিয়া প্রাণ কাঁদাইয়া মন মজাইয়া চলিয়া গেল, আবার একবৎসর তার গান শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। ইহাতে কি প্রাণ পরিতৃপ্ত হয়? কখনই না। যদি কোন রকমে সেই বনের পাখী, স্বর্গের দূতকে বুঝাইয়া সুঝাইয়া আমার প্রাণোদ্যানে বাসা করাইতে পারি, তাহা হইলে কি সুখের বিষয় হয়! পাঠক, তোমার যদি তেমন অভিলাষ থাকে তবে এস উৎসবকে জাগ্রত করি। উৎসবের নিগূঢ়তত্ত্ব আবিষ্কার করি, উৎসবের ভিতর যে স্বর্গ লুকাইয়া আছে তাহা টানিয়া বাহির করি। যেখানে সাধারণ লোক শাদা আলোক দেখে, সেখানে বৈজ্ঞানিক সাত রকম রং দেখিতে পান। আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানবিৎ! এস উৎসবরূপ শুভ্র কিরণ পুঞ্জকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখ, উৎসবস্রষ্টা কি কি বর্ণদ্বারা উহাকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

আমাদের দিক্ হইতে উৎসবকে প্রথমতঃ যজ্ঞের মত দেখা যাইতে পারে। সেকালে রাজারা ঋষিরা বড় বড় যজ্ঞ করিতেন। বেদের একটা দিকই যজ্ঞের অনুশাসন লইয়া ব্যস্ত। সেই যজ্ঞে বড় বড় অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত হইত, কত ঘৃত যে বৈশ্বানরদেবের কবলে অর্পণ করা হইত তাহার পরিমাণ কে করিবে? যজ্ঞীয় যূপে সংখ্যাতীত প্রাণী বলি দেওয়া হইত। জনমেজয় রাজার পিতা ঋষিশাপে সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করেন। রাজা মহা ক্রুদ্ধ হইয়া সর্পনাশের জন্য এক মহা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন, সেই যজ্ঞে রাশি রাশি সাপ দগ্ধ হইল। একালে আর সে সব বাহিরের যজ্ঞ নাই। মানস যজ্ঞই বর্ত্তমান যুগের বিধান। পশুবলি হইতে আরম্ভ করিয়া বিরোচন পুত্রের বিষ্ণুপদে আত্মবলি পর্য্যন্ত যে বলির ভাব উঠিয়াছিল সেই বলি বর্ত্তমান বিধানানুসারে মনেই হইয়া থাকে। বাহিরের সর্প বিনাশের জন্য এখন যজ্ঞের প্রয়োজন নাই, কিন্তু মনের ভিতর দুধ ভাত খাওয়াইয়া যে সকল সাপ সযত্নে পুষিয়াছি, তাহাদের বিনাশের জন্য মহা হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করা বিশেষ আবশ্যক। উৎসবই সেই অগ্নি জ্বালিবার উপযুক্ত স্থল। উৎসব পুরাতন ও নূতনের মধ্যস্থ সেতু। উৎসবে যোগ দিতে গেলে পুরাতন ছাড়িতে হয়, নূতন ধরিতে হয়। পুরাণ মলিন কাপড়, পুরাণ অসৎ অভিদল পরিত্যাগ করিতে হয়। উৎসব মন্দিরে পুরাণ জিনিষ লইয়া যাইবার প্রভুর আদেশ নাই। আমাদের হিন্দু ও মুসলমান ভ্রাতারা তাঁহাদের উৎসবের দিনে নূতন পোষাক পরেন, উৎসবের দিন আমাদেরও নূতন পোষাক পরিবার বিধি আছে, যে পোষাক পৃথিবীর দরজীতে প্রস্তুত করিতে পারে না—স্বর্গ হইতে প্রস্তুত করাইয়া আনিতে হয়। পুরাতন কাপড়, পুরাতন ভাষা ও পুরাতন সহচর পাপ সকল উৎসবাগ্নিতে দগ্ধ করিতে হইবে। জনমেজয়ের যজ্ঞে হোতা এক অপূর্ব্ব মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক যে সর্পের নাম করিয়া আহুতি দিতেন, কথিত আছে যে, সেই সাপ যেখানে থাকিত সেখান হইতে মন্ত্র তাহাকে ধরিয়া আনিত। তক্ষক ইন্দ্রের সিংহাসন ধরিয়াছিলেন বলিয়া ইন্দ্রশুদ্ধ আহুত, শেষে আস্তিকের কৌশলে তক্ষক রক্ষা পান। এতো গেল পুরাণের কথা। এখন আসল কথা এই যে, যদি ব্রহ্ম নাম উচ্চারণ করতঃ একটা পাপ সাপের নাম ধরিয়া আহুতি দেওয়া যায়, তাহা হইলে সে সাপটাকে অগ্নিতে পুড়িয়া নিশ্চয়ই মরিতে হইবে। ইহা জীবনের পরীক্ষিত কথা! শত শত সাধু জগাই মাধাইয়ের জীবন ব্রহ্মনাম মন্ত্রের এই অদ্ভুত ক্ষমতার সাক্ষ্য দিয়া থাকেন। পাপের উপর কিসের মায়া? পাপের দংশনের জ্বালায় নিশায় নিদ্রা হয় না, দিবসে শান্তি পাই না। তাহাদিগকে উৎসবাগ্নিতে কেন পোড়াইব না? এত দিন আমাদের সঙ্গে তাহারা ছিল, তাহাতে কি হইয়াছে? তাহারা কি আমাদের মঙ্গল করিয়াছে? অণুমাত্র নহে। যদি আমরা উৎসবে যজ্ঞাগ্নি জ্বালিতে পারি ও ব্রহ্মনামরূপ মহা-

মন্ত্র বিশ্বাসের সহিত উচ্চারণ করিতে পারি, তাহা হইলে উৎসব আমাদের পুরাতন বেশ ঘুচাইয়া নবীন বসন্তের সাজে যে সাজাইয়া দিবে তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

উৎসবকে যখন যজ্ঞাগ্নি মনে করি ও তাহাতে পাপ কীট সকল দগ্ধ করি, তখন বীভৎস, বীর ও রৌদ্র রসের অবতারণা হয়। পাপ কীট গুলা দেখিলে মন কি শিহরিয়া উঠে না? যখন এই কীট গুলাকে বীর দর্পে পোড়ান যায় তখন প্রাণে বীরত্বের উৎসাহ, রৌদ্র ভাব জ্বলিয়া উঠে। উৎসব কিন্তু কেবল বীররসের অবতারণাস্থল নহে; ইহাতে কারুণ্য, শান্তি, মাধুর্য্য প্রভৃতি অন্যান্য রসেরও আবির্ভাব হইয়া থাকে। আমাদের দিক্ হইতে উৎসবকে পুষ্প বৃষ্টি বলিয়াও দেখিতে পারি। আমরা বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি, যখন রাজাতে ও রাণীতে মিলন হয়, তখন দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করিয়া থাকেন; নলদময়ন্তীতে দীর্ঘবিরহের পর যখন মিলন হইল তখন দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করিলেন। হরিশ্চন্দ্র ও শৈব্যা যখন ঘোর কষ্ট ও যন্ত্রণার পর মিলিত হইলেন, তখন দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করিলেন; এইরূপ আরও শত শত মিলনে দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া কথিত আছে। এখন দেখা যাউক সে সকল কথার ভিতরে বাস্তবিক কোনও সত্য আছে কি না। সেকালে পুরাণের দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করিতেন কবিরা বলিয়া গিয়াছেন, একালের সত্য দেবতা আধ্যাত্মিক মিলনের সময় সত্য সত্য আধ্যাত্মিক পুষ্পবৃষ্টি করেন কি না, সাধকমণ্ডলীর হৃদয় উত্তর দিউক। যখন দশটী আত্মা ব্রহ্মের পূজার জন্য মিলিত হয়, তখন সেই সকল মিলিত আত্মা হইতেই কি কেবল পূজা উঠিয়া থাকে, পূজ্য দেবতা হইতে কিছু নামে না? পূজা কি একদেশব্যাপী হয়, পূজাতে কি কেবল দেওয়া হয় কিছুই পাওয়া যায় না? বিশ্বাসী বলেন, যত দেওয়া যায় তার অধিক পাওয়া যায়। ব্রহ্মের নামে পাঁচ জন মিলিত হইলেই ব্রহ্ম পবিত্রতা, উদ্যম ও প্রেমরূপ পুষ্পবৃষ্টি করেন। প্রাণ-সাজি মিলিত হইবার আগে খালি থাকে! কিন্তু মিলনের পরে দেখি ফুলে ভরা হইয়াছে। ফুল কোথা হইতে আসিল? ব্রহ্ম পাঠাইয়া দিয়াছেন। আবার ব্রহ্মের পুষ্পবৃষ্টি হইতে হইতে আর একটী ব্যাপার ঘটিয়া যায়। মিলিত ভক্ত সমাজ ব্রহ্মদত্ত পুষ্পলাভ করিয়া পুষ্পক্রীড়া করেন। যেখানে বরফ পড়ে, শুনিয়াছি সেখানকার ছেলেরা বরফের গোলা করিয়া পরস্পরকে ছুঁড়িয়া মারে! ব্রহ্মদত্ত শুভ্র ফুল লইয়া ভক্তেরা সেইরূপ বরফের গোলা ছোঁড়ার মত ফুল ছোঁড়াছুঁড়ি করেন। তখন পুষ্পবৃষ্টির বড় ঘটা পড়িয়া যায়। একজন সাধকের প্রাণ হইতে একটী ফুল উঠিয়া আর একজনের দিকে দৌড়ে; আবার সে সাধকের প্রাণ হইতে তেমনই একটী সুন্দর গোলাপফুল উঠিয়া প্রথমোক্ত সাধকের দিকে আসে। পথের মাঝে দুই ফুলে দেখা হয়। দেখার পর দুই ফুল দশগুণ উজ্জ্বল হইয়া উঠে। ব্রহ্ম নামে মিলিত হইলে বাস্তবিকই এইরূপ ভাব রূপ গোলাপ পুষ্পের উৎসব হয়। উপর হইতে ব্রহ্ম পুষ্প ঢালিতেছেন, আবার নীচে ভক্ত হইতে ভক্তান্তরে পুষ্প ছুটাছুটি করিতেছে বিশ্বাসী কেবল এই পুষ্পবৃষ্টি দেখিতে পান। আমরা যদি বিশ্বাসী হই আমরাও সেই পুষ্পবৃষ্টি দেখিতে পাইব।

এতক্ষণ আমাদের দিকের কথা বলিতেছিলাম, এখন ঈশ্বরের দিকের কথা বলি। ঈশ্বরের দিক্ হইতে আমরা উৎসবকে দরবার মনে করিতে পারি। উৎসব বাস্তবিকই প্রভুর একটী স্বর্গীয় দরবার। দরবার কি? দেখা দেওয়া। তুমি আমি যখন দেখা করি, তখন অন্য লোক আসে না। সুতরাং তোমার আমার দেখা দেওয়াকে দরবার বলা যায় না। কিন্তু বড় লোক যখন দেখা দেন, তখন অনেক লোক আসে, সেই জন্য বিশেষ দিন ও বিশেষ স্থান অবধারিত হয়, যাহাতে সকলেই তাঁহাকে দেখিতে পান। ব্রহ্মোৎসবে ব্রহ্ম ব্রহ্মোপাসক-দিগকে দেখা দেন। দেশ দেশান্তর হইতে ভাই ভগিনী আসেন ব্রহ্মকে দেখিবেন বলিয়া। ঘরে ঘরে প্রাণে প্রাণে ব্রহ্মকে দেখিয়া আমরা কৃতার্থ হই, কিন্তু সকলে মিলিয়া বিশেষ দিনে দেখা এক পৃথক্ ব্যাপার। আমাদের দরবারে অন্যান্য দরবারের মত খুব ভিড়—অনেক লোক আসেন। ব্রহ্মদর্শন-লালসা কি সামান্য ব্যাপার। জগন্নাথের টান যাহাকে ধরে, সেকি জগন্নাথকে না দেখিতে আসিয়া স্থির থাকিতে পারে। পৃথিবীর দরবারের মত এ দরবারেও প্রবেশের জন্য টিকিট আছে। যে সে লোক প্রবেশ করিতে পারে না। প্রবেশ করিয়া আবার যেখানে সেখানে বসিতে পাইবে, তাহার সম্ভাবনা নাই। অন্যান্য দরবারের মত এখানে বসিবার আসন সম্বন্ধে খুব কঠিন নিয়ম। তুমি আমি কি মহর্ষি ঈশার আসনে বসিতে পারি? স্বর্গের দূত তখনই আমাদিগকে সেখান হইতে উঠাইয়া দিবে। আগে উৎসবের দেবতা, তাঁর অব্যবহিত সন্নিধানে ঈশা, মুসা, মহম্মদ, নানক চৈতন্য প্রভৃতি মহাজনেরা। তার পরে অন্যান্য সাধারণ উপাসকবৃন্দ। কেহই বঞ্চিত হন না, কিন্তু কেহই প্রগল্ভতা ও অনধিকারপ্রবেশ করিতে পারেন না। প্রভু এমন করিয়া প্রকাশিত হন যে সকলেই তাঁহাকে আপন আপন শক্তি অনুযায়ী দেখিতে পান। যাঁহার যে পরিমাণে ব্রহ্মকে দেখিবার ও ধারণ করিবার ক্ষমতা জন্মিয়াছে, ব্রহ্মকে তিনি ততখানি দেখিতে পান। ভক্ত মহাজনেরা সাধারণ উপাসক হইতে নিশ্চয়ই তাঁহাকে অধিক উজ্জ্বলভাবে দেখিতে পান। পৃথিবীর দরবার গৃহের ন্যায় এ স্বর্গের দরবারগৃহও খুব সুসজ্জিত। পিতার মুখশোভা ও সমাগত ভক্তবৃন্দের পরিচ্ছদ ও লাবণ্য দরবারের শান্তি ও পবিত্রতা দশগুণ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। কত লোক উৎসব গৃহে দেবতা ও উপাসকদিগের এই শোভা দেখিয়াই আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করে। যে যেমন লোক প্রভু তাহাকে তেমনি সমাদর করেন। কাহারও দিকে চাহিয়া দেখেন, কাহারও সঙ্গে কথা কন, কাহাকেও বা স্পর্শ করেন, সকল শ্রেণীর লোকেরাই কিছু না কিছু লাভ করেন। কেহই নিরাশ মনে অন্ধকার লইয়া ফিরিয়া আসেন না। যে যেমন আধ্যাত্মিক নজর লইয়া যায়, তদনুযায়ী কিন্তু তদপেক্ষা অনেক গুণ অধিক উপহার লইয়া ফেরে। কেবল অবিশ্বাসী, অবিনীত, অভক্ত ও কপট ব্যক্তিরা প্রবেশ করিতে পারে না, যদি বা প্রবেশ করে, তবে যেমন ভাবে প্রবেশ করে তেমনি ভাবে বাহির হইয়া আসে।

উৎসবকে অনেক সাধক প্রেমের বন্যা বলিয়া থাকেন, এক ভাবে দেখিতে গেলে একথা খুব সত্য। উৎসবে বন্যার সকল লক্ষণগুলি দেখা গিয়া থাকে। বন্যার প্রথম গুণ, আবর্জ্জনা ভাসাইয়া লইয়া যায়। উহা গ্রামে ও নগরে প্রবেশ করিয়া খানা খন্দ বিল খাল সব পরিপূর্ণ করে, এবং তাহাতে যে সকল মলিনতা ও আবর্জ্জনা থাকে সব ভাসাইয়া লইয়া যায়। উৎসবও সেইরূপ ভক্ত অভক্ত সকলের প্রাণকে পূর্ণ করে এবং মলিনতা পাপ অসাধুতা যাহা কিছু থাকে সকলই ভাসাইয়া লইয়া যায়। বন্যাসকল প্রকৃতির সম্মার্জ্জনী, উৎসব সকল অধ্যাত্ম রাজ্যের সম্মার্জ্জনী, উভয়ই ঝাঁট দেয়, পরিষ্কার করে, ধৌত করে। বন্যা আবার কেবল ধৌত করে না। বন্যা যেখান দিয়া চলিয়া যায় সেখানে নূতন মৃত্তিকা পড়ে ভূমি নষ্টপ্রায় উর্ব্বরাশক্তি পুনর্লাভ করিয়া পুনরুজ্জীবিত হয়। উৎসবও যে কেবল আত্মা পবিত্র করে এমন নহে, নূতন জীবনের মাল মসলা জীবনে রাখিয়া যায়। নবীন উৎসাহ, নবীন উদ্যম, নবীন যৌবনে আত্মাকে ভূষিত করে। বন্যা যেমন মৃতপ্রায় ভূমিকে বাঁচায় উৎসবও তেমনি মৃতপ্রায় আত্মাকে বাঁচায় ও সাজায়। বসন্ত প্রকৃতিকে সাজায়, সাজনির্ম্মিতা প্রতিমাকে সাজায়, স্বর্ণকার দেহকে সাজায়, উৎসব আত্মাকে সাজায়। উৎসব স্বর্গের বাগানের মালী। ভাল ভাল ফুল দিয়া মালা প্রস্তুত করে আর সেই মালা উপাসক বৃন্দকে পরাইয়া দেয়।

যে সময়ে আমরা উৎসব করি সে সময়ের বিশেষত্ব আমরা অনেক সময়ে ভুলিয়া যাই। যদি উহা আলোচনা করি তাহা হইলে আমাদের অনেক উপকার হইতে পারে।

উপরে যে সকল কথা বলা হইল তাহা সকল উৎসব সম্বন্ধে প্রযোজ্য। এগারই মাঘ কিন্তু একটী বিশেষ দিন। এগারই মাঘে ঈশ্বরের কৃপায় ব্রাহ্মসমাজ শিশুর জন্ম হইয়াছিল। আমরা ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গীভূত। সকল জাতিতে জন্ম-দিন জন্মতিথিকে একটী শুভানুষ্ঠান বলিয়া গণ্য করে। আমাদের সমাজের জন্ম-দিনকে আমাদের বিশেষ ভাবে দেখা উচিত। ব্রাহ্মসমাজের জন্মরূপ ঘটনা অনন্তকালকে আলোড়িত করিয়াছে, ভারত হইতে ইউরোপে তাহার কম্পন পৌছিয়াছে। যে জন্ম দিন ভারতে নবজীবন, নূতন ধর্ম্ম, ও নূতন সমাজ স্থাপন করিয়া নূতন উন্নতির পথ খুলিয়া দিয়াছে সেদিন ও অন্য দিনে প্রভেদ করিতে হইবে। ভারতে শাস্ত্রদাসত্ব ও জাতি ভেদের পাপ বিনাশ করিবার যে আন্দোলন অভ্যুত্থিত হইয়াছে, সেই আন্দোলনের জন্ম-দিনের বিশেষ মাহাত্ম্যকে আমরা অনুভব করিব না? এমন মহিমান্বিত বিশেষ দিন ব্রহ্ম পূজা করা ভাগ্যের বিষয়। দয়াময় যে আমাদের এগারই মাঘে উৎসব করিতে দেন তাহার জন্য তাঁহার কাছে চিরকৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। তিনি আশীর্ব্বাদ করুন, আমাদের হাত ধরিয়া উৎসবে লইয়া চলুন।

কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ১৮৮৭ সনের ৪র্থ ত্রৈমাসিক কার্য্য বিবরণ।

এই তিন মাসের মধ্যে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ১০টী সাধারণ ও ২টী বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। বাবু দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয় কার্য্যনির্ব্বাহক সভার পদ পরিত্যাগ করেন।

আমরা এবার এই তিন মাসের কার্য্য বিবরণ দিবার পূর্ব্বে একটী দুঃখ জনক বিষয়ের অবতারণা করিতে বাধ্য হইতেছি। পণ্ডিত শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী মহাশয় কয়েক বৎসর ধরিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক থাকিয়া পঞ্জাবে কার্য্য করিতেছিলেন। এই সময় মধ্যে তাঁহার মত সম্বন্ধে নানারূপ পরিবর্ত্তন ঘটিতেছিল, কার্য্য নির্ব্বাহক সভা কয়েক বৎসর ধরিয়া সে সকল বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন মধ্যে মধ্যে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার নিকটে তাঁহার সম্বন্ধে যে সকল অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল তাহার যথোপযুক্ত প্রতিকার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি তিনি প্রকাশ্য পত্রে ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত তাঁহার সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহিত সকল সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া এক পত্র লিখিয়াছিলেন। এইরূপ অবস্থায় কার্য্যনির্ব্বাহক সভা তাঁহার পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু তিনি যে উৎসাহ ও অনুরাগের সহিত এত কাল ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়াছেন তাহার জন্য তাঁহারা তাঁহাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন এবং আশা করেন ভবিষ্যতে তাঁহার সহিত আবার মিলিত হইতে পারিবেন।

প্রচার—নবদ্বীপ বাবু ভিন্ন প্রচারক মহাশয়দিগের কাহারও নিকট হইতে তাঁহাদের কার্য্য বিবরণ পাওয়া যায় নাই। এ জন্য তাঁহাদের কার্য্যের বিশেষ বিবরণ দেওয়া যাইতে পারিল না। বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অধিকাংশ সময় পীড়িত ছিলেন, এজন্য তিনি বিশেষ কিছুই করিতে পারেন নাই।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী—এই তিন মাসের মধ্যে অধিকাংশ সময় কলিকাতায় থাকিয়া উপাসকমণ্ডলীর উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। ছাত্র সমাজে অনেকগুলি বক্তৃতা করিয়াছেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অনুরোধ ক্রমে, সিরাজগঞ্জ, ঢাকা ও গিরিধি ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে গমন করিয়া তথায় উপাসনা উপদেশ এবং বক্তৃতাদি দ্বারা ধর্ম্ম প্রচারের সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীরামপুর ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে গমন করিয়া উপাসনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার সম্পাদনের সাহায্য করিয়াছেন।

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন—উত্তর বাঙ্গালার অন্তর্গত সিলিগুড়ি, খার্সিয়াং, তিনধরিয়া, দার্জিলিং, সৈয়দপুর, দিনাজপুর, সদ্যপুষ্করিণী, বোয়ালিয়া, কোচবিহার প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়া বক্তৃতা ও উপদেশাদি দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন।

বাবু নবদ্বীপ চন্দ্র দাস—নিজের প্রয়োজনে কিছুকাল কলিকাতায় ছিলেন। নবেম্বরের প্রথমেই তাঁহার কার্য্যক্ষেত্রে গমন করেন। প্রথম, ময়মনসিংহের অন্তর্গত টাঙ্গাইল যাইয়া তথাকার সমাজে সামাজিক উপাসনা ও একদিন একটী বক্তৃতা করেন। বন্ধুদের বাসায় উপাসনা ও উপদেশ হয় এবং একদিন নগরকীর্ত্তন হয় তদুপলক্ষে আকুর টাকুর গ্রামে প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন, ইহা ভিন্ন অনেকগুলি পল্লীতে উপাসনা হইয়াছে—কুমুল্লি গ্রামে উপাসনা উপদেশ হয়, কয়টীয়া গ্রামে বক্তৃতা, উপাসনা উপদেশাদি হয়। মৈমামুড়া গ্রামে বক্তৃতা ও উপাসনাদি হয়, নাগরপাড়া গ্রামে প্রার্থনা ও বক্তৃতা হয়, আটিছড়ী গ্রামে প্রার্থনা ও বক্তৃতা হয় সিংজুরী গ্রামে প্রার্থনা ও বক্তৃতা হয়, মাট্টা গ্রামেও ঐরূপ প্রার্থনা ও বক্তৃতাদি হইয়াছে। ভাদগ্রাম নামক পল্লীতে প্রকাশ্য বক্তৃতা উপাসনা উপদেশাদি হইয়াছে, এ অঞ্চলে এক সময় ব্রাহ্মদিগকে ও ব্রাহ্মধর্ম্মকে অতি অনিষ্টকারী বস্তু বলিয়া মনে করিত। ঐ সব গ্রামে প্রতি স্থানে পুরুষ এবং রমণীতে প্রায় ২।৩ শত লোক উপস্থিত হইতেন। তৎপরে ইনি এখান হইতে ঢাকা গমন করেন। তথায় ২ দিন থাকিয়া পারিবারিক উপাসনা ব্যতীত আর কোন কার্য করিতে পারেন নাই। তৎপর সে স্থান হইতে ময়মনসিংহ যান। এখানেও বেশী দিন থাকিতে পারেন নাই কেননা ইহার পরই কুমিল্লা ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে যাওয়ার প্রয়োজন হয়। সুতরাং ময়মনসিংহে পারিবারিক উপাসনা আলোচনা এবং একবেলা সমাজে উপাসনা ও উপদেশ হয়। কুমিল্লাতে উপাসনা আলোচনা উপদেশ এবং বক্তৃতাদি হইয়াছিল। অনেক বন্ধুর গৃহে উপাসনা হয়। কোথাও কোথাও পারিবারিক উপাসনা হয়। কুমিল্লা হইতে নোয়াখালি গমন করেন। যাইবার

পথে চৌদ্দগ্রাম নামক স্থানে একদিন অপেক্ষা করেন। এখানে মুন্সেফ বাবুর গৃহে উপাসনাদি হইয়াছিল। নোয়াখালিতে উপাসনা উপদেশাদি হইয়াছে এবং প্রকাশ্য দুইটী বক্তৃতা হইয়াছে ইহা ব্যতীত প্রায় প্রতিদিন ভদ্রলোকদের গৃহে প্রার্থনা ও আলোচনা হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতাতে থাকিয়া নিয়মিতরূপে অনেকগুলি ব্রাহ্ম পরিবারে উপাসনাদি করিয়াছেন, কয়েকটী মহিলাকে নিয়মিত শিক্ষা দান করেন এবং কোন্নগর সমাজের আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন।

নিম্নলিখিত স্থান হইতে প্রচারক মহাশয়দিগের নিমন্ত্রণ আসিয়াছিল।

রামপুর বোয়ালিয়া, সিরাজগঞ্জ, ঢাকা, গিরিধি, কোচবিহার, ও বাগআঁচড়া।

স্থায়ী প্রচার ফণ্ড—এই তিন মাসের মধ্যে এই ফণ্ডে ৭।৴১০ টাকা পাওয়া গিয়াছে। এই ফণ্ডে মোট ১৯৫৬॥৶১০ স্থিত আছে।

পুস্তকালয়—ইহার কার্য্য পূর্ব্বের মতই চলিতেছে। বাবু উমাচরণ সেন স্থানান্তরে গমন করাতে ইহার সহকারী সম্পাদকের কার্য্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার—ইহার কার্য্য পূর্ব্বের ন্যায় চলিতেছে। কিন্তু ইহার আর্থিক অবস্থা ভাল নয়।

তত্ত্বকৌমুদী—ইহার কার্য্য পূর্ব্বের ন্যায় চলিতেছে। ইহার আর্থিক অবস্থা মন্দ নয়।

উপাসকমণ্ডলী—ইহার কার্য্য কয়েক মাস নিয়মিত ভাবে চলিয়া আসিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, সীতানাথ দত্ত ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় উপাসকমণ্ডলীর আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন।

সঙ্গত সভা—ইহার কার্য্য নিয়মিত ভাবে চলিয়াছে।

অনুষ্ঠান—আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে জানিয়াছি যে গত তিন মাসের মধ্যে ১টী জাত কর্ম্ম ও দুইটী বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

তত্ত্ববিদ্যা সভা—এই সভায় শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় "সমাধি" বিষয়ে একটী উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করিয়াছেন।

ব্রাহ্মবন্ধু সভা—এই তিন মাসের মধ্যে বাবু আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 'ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন ও তৎসম্বন্ধে আলোচনা হয়। এই সভার উদ্যোগে ইতিমধ্যে একটী সায়ং সমিতি হয়। তাহাতে অনেক সভ্য উপস্থিত হইয়াছিলেন।

ছাত্র সমাজ—পূজার বন্ধের পর হইতে এই সমাজের কার্য্য রবিবার প্রাতে না হইয়া শনিবার সায়ংকালে হইয়া আসিতেছে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র ও বাবু আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই সভায় বক্তৃতা করিয়াছেন।

পুস্তক প্রচার—১৮৮৮ সনের "এলম্যানেক" শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। পুস্তক প্রচার কমিটির অনুরোধে "জাতীয় সঙ্গীত" নামক পুস্তকের ৪৬৪ খণ্ড অর্দ্ধমূল্যে ক্রয় করা হইয়াছে। বাবু নবীনচন্দ্র রায় কৃত "ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রশ্নোত্তর" নামক হিন্দি পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে, শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। খসিয়াভাষার একখানি সংগীত পুস্তক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাহায্যে মুদ্রিত হইতেছে। জীবনালোক, পরকাল, কেন আছি ? এই তিনখানি পুস্তক পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

ব্রাহ্ম মিসন্ প্রেস—অধ্যক্ষ সভার বিগত ৩য় ত্রৈমাসিক অধিবেশনে, অধ্যক্ষ সভা প্রেসের সত্ত্বাধিকার ক্রয় করা সম্বন্ধে বিবেচনার ভার কার্য্য নির্ব্বাহক সভাকে দেন। কার্য্য নির্ব্বাহক সভা বিশেষ বিবেচনা করিয়া এই প্রেসের সত্ত্বাধিকার ক্রয় করিয়াছেন। যত দূর দেখা গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয় এই প্রেসের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ অভাব দূর হইবে।

দাতব্য বিভাগ—বাবু দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয় এই বিভাগের সম্পাদকতা গ্রহণ করিয়া বিশেষ পারদর্শিতার সহিত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আসিতেছিলেন। সম্প্রতি তিনি ইহার সম্পাদকের পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। দাতব্য বিভাগের গত তিন মাসের স্থিত সহিত ১৩৭৸৴৫ আয় হইয়াছিল এবং ১৩৪॥৴ খরচ হইয়া অবশিষ্ট ৩।৫ হস্তে রহিয়াছে।

ট্রষ্টী—বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ট্রষ্টীর পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং পণ্ডিত শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী মহাশয়ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ পরিত্যাগ করাতে ট্রষ্টীর পদও পরিত্যাগ করিয়াছেন।

উপাসনালয়ের বারেন্দা—আমরা আহ্লাদের সহিত জানাইতেছি যে, মন্দিরের সম্মুখে একটী বারেন্দা প্রস্তুত হইতেছে। এতদিন এইটী না হওয়াতে মন্দিরটী অঙ্গহীন হইয়াছিল। ইহার জন্য ন্যূনাধিক ৫০০৲ টাকা ব্যয় হইবে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আয় ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

আয়		ব্যয়	
প্রচার ফণ্ডের দান		* প্রচার ব্যয়	৩৮৪৲
প্রাপ্তি	২৪৫।৶৹	† কর্ম্মচারীর বেতন	১৮৩৸৹
বার্ষিক দান	৫১৴৹	ডাক মাশুল	১৮৸৶১৫
মাসিক দান	১৭২॥৹	পাথেয়	৮২৶১৫
এককালীন দান	১৭॥৹	বিবিধ হিসাবে	১৫৷৹৫
ঐ চাউলের মূল্য	৪।৴	মুদ্রাঙ্কণ	১৩৲
	২৪৫।৶	দরিদ্র ছাত্রদিগের বেতন	২৬৲
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের চাঁদা	২২২।৫		৭২৪৸৶৫
বার্ষিক	১৩১।৵৫	হাওলাৎ শোধ	৮৫৲
মাসিক	৩৪৲	গচ্ছিত শোধ	৪১৶
এককালীন	৫৲		৮৫০/৫
পাথেয় হিসাবে	৫১৸৶৹	স্থিত	৩১৶১২॥
	২২২।৫	মোট	৮৮৩৶১৭॥
প্রচার-গৃহ ভাড়া	৭৪॥৹		
কর্ম্মচারীর বেতন প্রাপ্ত	৫০৲		
তত্ত্বকৌমুদী ফণ্ড হইতে	৩২৲		
পুস্তকের ফণ্ড হইতে	২৮৲		
	৬০		
দরিদ্র ছাত্রদিগের বেতন সিটীকলেজ হইতে প্রাপ্ত	২৭॥৹		
	৬২৯॥৶৫		
হাওলাৎ গ্রহণ	১০৬৲		
গচ্ছিত	৫৭।৶		
	৭৯৩।৫		
পূর্ব্বস্থিত	৮৯৸৶১২॥		
মোট	৮৮৩৶১৭॥		

ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার।

জমা		খরচ	
মূল্য প্রাপ্তি	৩৩৯।৶৹	ডাকমাশুল	১২৫৸৫
বিজ্ঞাপন	২৬৲	বিবিধ	৩৭॥/৹
বিবিধ	৫৲	কাগজ	৫৬।৹

* ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত প্রচারকদিগের ২০৫৸৶ প্রাপ্য আছে।

† ঐ ঐ কর্ম্মচারীদিগের ৪১৸৹ ঐ

গচ্ছিত	৪০৲	কমিসন	॥৶০
হাওলাত	১৭৲	হাওলাতদান	২৫৲
নগদ বিক্রয়	।০	গচ্ছিত শোধ	৪০৲
	———	কর্ম্মচারীর বেতন	৫৮॥০
	৪২৭॥৶০	(নবেম্বর পর্য্যন্ত)	
		মুদ্রাঙ্কণ	৯০৲
পূর্ব্বকার স্থিত	১৫৮৸৶১০	হাওলাত শোধ	১৭৲
	———		———
	৫৮৬॥১০		৪৫০৸৫
		স্থিত	১৩৫৸৫
			———
			৫৮৬॥১০

মুদ্রাঙ্কণ এবং অন্যান্য বাবদে ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জারের প্রায় ১৫৫০ টাকা দেনা আছে।

তত্ত্বকৌমুদী।

জমা		খরচ	
[illegible] প্রাপ্তি	৩৩৫৶১৫	ডাক মাশুল	৫১৸০
নগদ বিক্রয়	।৶০	কাগজ	৪৬॥৶০
	———	বিবিধ ব্যয়	২২৸৶৫
	৩৩৫॥/১৫	কমিসন	১৲
পূর্ব্ব স্থিত	৮৪৯৶১৫	কর্ম্মচারীর বেতন (নবেম্বর পর্য্যন্ত)	৪৪৲
	———		
	১১৮৫/১০	মুদ্রাঙ্কণ (১লা পৌষ পর্য্যন্ত)	৮১৲
			———
			২৪৭।/৫
		স্থিত	৯৩৭৸৫
			———
			১১৮৫/১০

পুস্তক বিক্রয়ের হিসাব।

আয়		ব্যয়	
পুস্তকের বাকী মূল্য		মুদ্রাঙ্কণ	৪॥০
আদায়	৫৫৸০	অপরের পুস্তকের মূল্য	১৮৸০
নগদ বিক্রয়	২২৪৸৶০	কমিশন	২৪।৶১০
সমাজের ১৭৫॥৶২		বিবিধ	১০৸/০
অপরের ৬৯৶১৫		কাগজ	৩৮৸৶০
———		পুস্তকের ডাকমাসুল	৮৶১০
২২৪৸৶০		ডাকমাসুল	৶.৫
পুস্তকের ডাঃ মাঃ	৩৲	কর্ম্মচারীর বেতন	
গচ্ছিত	৬৪।০	(নবেম্বর পর্য্যন্ত)	২৮৲
	———	পুস্তক বাঁধাই	৮৲
	৩৪৭৸৶০	পুস্তক খরিদ	৪০৲
পূর্ব্বস্থিত	১৭৫৮॥/৫	গচ্ছিত শোধ	১১৩৷৶৫
	২১০৬॥৫		২৯৫।০
		স্থিত	১৮১১।৫
			২১০৬॥৫

প্রেরিত পত্র।

বাবু রাজনারায়ণ বসু ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র সম্বন্ধে দুই একটী কথা।

মহাশয়!

গত ১৬ পৌষের তত্ত্বকৌমুদীতে বাবু সীতানাথ নন্দী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের পত্রের যে সমালোচনা করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে। আশা করি এই পত্রখানি আগামী বারের তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

রাজনারায়ণ বাবুর পত্র প্রকাশিত হইলে পর ব্রাহ্ম ভ্রাতা বাবু কুঞ্জবিহারী সেন রাজনারায়ণ বাবুকে তাঁহার পত্রোল্লিখিত "ব্রাহ্মধর্ম্মের শাস্ত্র সঙ্গত নহে" এই কথাটির অর্থ জানিবার জন্য পত্র লিখেন। তদুত্তরে তিনি কুঞ্জ বাবুকে জানাইয়াছেন "আমার এরূপ মনে হইতেছে যে শাস্ত্র শব্দ আমি আদবে ব্যবহার করি নাই"। আমি তাঁহার পত্রখানি যখন পাঠ করিয়াছিলাম তৎকালে ঐ স্থানের লেখা স্পষ্টরূপ বুঝিতে পারি নাই। এক্ষণে পুনর্ব্বার পত্র পাঠ করিয়া বোধ হইল যে ঐ স্থানে "শাস্ত্র" না পাঠ করিয়া "ব্রাহ্মধর্ম্মের মত সঙ্গত নহে" এরূপ পাঠও করা যাইতে পারে। 'শাস্ত্র' শব্দ ঐ স্থানে সহজেই "মত" অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে কোন গ্রন্থে আবদ্ধ নহে রাজনারায়ণ বাবুর প্রকাশিত প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা পুস্তকে ব্রাহ্মধর্ম্মের লক্ষণের মধ্যে তাহা স্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে।

মহর্ষি মহাশয়ের পত্র সম্বন্ধে ভ্রাতা সীতানাথ নন্দী যাহা বলিয়াছেন তাহাও ঠিক বোধ হইতেছে না। কারণ মহর্ষি এ কথা বলেন নাই যে তাঁহার পত্রোল্লিখিত পুস্তকের বাহিরে ব্রাহ্মধর্ম্মের কোনও সত্য নাই। তিনি একথা বিশ্বাস করেন যে তাঁহার উল্লিখিত পুস্তকে ব্রাহ্মধর্ম্মের মত বিবৃত হইয়াছে। উহার "বিপরীত" মত কি কথা তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম মনে করেন না। বিজয় বাবুর বর্ত্তমান মত ও ব্যবস্থাদি সম্বন্ধে মহর্ষির সহিত কিছু দিন গত হইল আমার অনেক আলাপ হইয়াছিল। শ্রদ্ধাস্পদ বিজয় বাবুর নিকট মহর্ষি সম্প্রতি যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা প্রকাশিত হইলে ব্রাহ্মগণ দেখিতে পাইবেন যে মহর্ষি বিজয় বাবুর বর্ত্তমান মত ও ব্যবস্থা কতদূর সমর্থন করেন। "শক্তি সঞ্চার" সম্বন্ধে মহর্ষি তাঁহার মত আমাকে স্বয়ং নিজ হস্তে লিখিয়া জানাইয়াছেন। তাহা পরে প্রকাশিত হইবে। তিনি কোন যোগীর নিকট শক্তি লাভ করেন নাই তাহা আমাকে স্পষ্ট বলিয়াছেন।

ঢাকা		আপনাদের
২৩শে পৌষ		শ্রীনবকান্ত চট্টোপাধ্যায়,
১২৯৪		ঢাকা।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

"ক্রিয়াশীল ব্রহ্ম" সম্বন্ধে আমরা দুই খানি পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। একখানির লেখক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বসু—শ্রীবাড়ী, অত্রপুর। অপর খানির লেখক শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—হাবড়া, চক্রবেড় প্রার্থনা সমাজ। প্রথমপত্রের সার মর্ম্ম এই যে, 'ঈশ্বর যখন সৃষ্ট জীবের ন্যায় অপূর্ণ ও দুর্ব্বল নহেন, তখন নিদ্রা তন্দ্রা নিষ্ক্রিয়তা ইত্যাদি তাঁহাতে আরোপ করা যায় না। ধ্যানের সময় উপাসকের প্রাণে সক্রিয় ঈশ্বরের লীলাই দেখিতে পাওয়া যায়। তখন মনের সমুদায় সদ্বৃত্তি জাগিয়া উঠে ও অসদ্বৃত্তি মৃতকল্প হয়। ধ্যানস্থ সেবকে অদৃশ্য ও অজ্ঞাতভাবে ঐশীশক্তি সঞ্চারিত হইতে থাকে। ঈশ্বর নিষ্ক্রিয় হইলে কখনই মানবহৃদয়ের এরূপ পরিবর্ত্তন সম্ভব হইত না। ঈশ্বরের প্রকৃত উপাসনায় নিষ্ক্রিয়তা আসিতে পারে না, বরং তাহার তিরোভাব হয়। ঈশ্বর শুদ্ধমপাপবিদ্ধং সুতরাং তাঁহার মধ্যে যেমন অন্যান্য পাপ নাই, সেইরূপ আলস্য ও নিষ্ক্রিয়তারূপ পাপও নাই। এইজন্য আরাধনার বীজমন্ত্রে "সক্রিয়ং" বা তদনুরূপ কোনও কথা সন্নিবিষ্ট করা অনাবশ্যক।' দ্বিতীয় পত্রের মর্ম্ম এই যে, 'ঈশ্বরের মঙ্গল কার্য্য দেখিয়াই আমরা তাঁহাকে মঙ্গলময় বা শিবম্ বলি। সুতরাং ঈশ্বরকে শিবম বলিলেই ক্রিয়া-

শীল বলা হইল। মানুষের প্রেম সকল সময় কার্য্যে পরিণত হয় না বলিয়া ঈশ্বর সম্বন্ধে সেরূপ বলা সঙ্গত নহে। প্রেমের লক্ষণই প্রিয়কার্য্য সাধন করা। এতদ্ভিন্ন প্রেম পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। সুতরাং যাঁহাতে পূর্ণ প্রেম, তিনি যে নিষ্ক্রিয় ইহা সম্ভবপর হইতে পারে না। ব্রহ্মসমাজ হিন্দুশাস্ত্র হইতে আরাধনা প্রণালীর কয়েকটী শব্দ সংগ্রহ করিয়াছেন মাত্র, কিন্তু বেদান্ত প্রতিপাদ্য নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেন নাই।" স্থানাভাববশতঃ এবং ব্রহ্মসমাজের উপাস্য ঈশ্বরের ক্রিয়াশীলতা সম্বন্ধে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে কোনও মতভেদ নাই বলিয়া আমরা পত্র দুইখানি আনুপূর্ব্বিক প্রকাশ করিলাম না। সত্যংজ্ঞানং প্রভৃতি কথাগুলি উপনিষদে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ব্রাহ্মসমাজে ঠিক সেই অর্থে ব্যবহৃত হয় না। কোনও ব্রাহ্ম আপনার ইষ্টদেবতাকে নিষ্ক্রিয় মনে করেন বলিয়া আমরা জানি না। ঈশ্বরকে প্রীতি করা ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই যখন প্রকৃত উপাসনা, ঈশ্বরের শক্তি প্রতিনিয়ত জগতে, ইতিহাসে ও মানবাত্মায় কার্য্য করিতেছে ইহাই যখন ব্রাহ্মের ধর্ম্ম বিশ্বাসের মূলমন্ত্র তখন আর এ বিষয় লইয়া অধিক বাদানুবাদ করা নিষ্প্রয়োজন।

আমাদের কলিকাতাস্থ উপাসনা মন্দির প্রস্তুত করিতে যে ঋণ হইয়াছিল, ঈশ্বর কৃপায় অল্প দিন হইল, তাহার পরিশোধ হইয়াছে। এই ঋণ থাকাতেই কার্য্যনির্ব্বাহক সভা এত দিন মন্দিরের সম্মুখের বারান্দা আরম্ভ করিতে সাহস করেন নাই। সম্মুখে একটী বারান্দা ও চূড়া না থাকাতে মন্দিরটী এতদিন শ্রীহীন হইয়া আছে; উহা উপাসনা মন্দির বলিয়াই বোধ হয় না। এই জন্য মন্দিরের ঋণ শোধ হইবার পর হইতেই কার্য্যনির্ব্বাহক সভা এই বিষয়ে মনোযোগী হইয়াছেন, এবং দুই একজন ব্রাহ্ম ভদ্রলোক ও ব্রাহ্মমহিলা কয়েকশত টাকা সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হওয়ায় বারান্দা নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে, এবং যাহাতে আগামী মাঘোৎসবের পূর্ব্বে কার্য্য শেষ হয়, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইতেছে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বন্ধুগণের প্রতিশ্রুত অর্থে সমস্ত ব্যয়ের অতি অল্পাংশই নির্ব্বাহিত হইবে। এই কারণে সাধারণের নিকট সাহায্য ভিক্ষার জন্য শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রসন্নকুমার রায়, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও গুরুচরণ মহলানবিশ মহাশয়ত্রয়ের নামাঙ্কিত একখানি আবেদন পত্র বিতরিত হইয়াছে। বারান্দাটী শেষ করিতে অনুমান ২৫০০ আড়াই হাজার টাকার প্রয়োজন। ব্রাহ্মগণ এবং ব্রাহ্মসমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী অপরাপর মহোদয়গণ সামান্য কিঞ্চিৎ সাহায্য করিলেই আমাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট হইবে। আমরা আশা করি, বন্ধুগণের অনুগ্রহে এই অল্প টাকার জন্য আমাদিগকে দায়গ্রস্ত হইতে হইবে না। যাঁহার যাহা দিতে ইচ্ছা হয়, অনুগ্রহপূর্ব্বক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আফিসে অথবা শ্রীযুক্ত গুরুচরণ মহলানবিশ মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করিলেই হইবে।

সংবাদ।

বাঘআঁচড়া ব্রাহ্মসমাজ;—দয়াময় পরমেশ্বরের কৃপায় নিম্নলিখিত প্রণালী মতে বাগআঁচড়া ব্রাহ্মসমাজের ত্রয়োবিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এতদুপলক্ষে কলিকাতা ও বরিশালের কয়েকটী ভাই ভগ্নী উপস্থিত হইয়া যথেষ্ট আনন্দ ও উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন। ১৫ই পৌষ বৃহস্পতিবার:—সায়ংকালে উৎসবের উদ্বোধন। বাবু রূপচাঁদ মল্লিক মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। ১৬ই পৌষ শুক্রবার:—প্রাতে উপাসনা ও সংকীর্ত্তন। বাবু রূপচাঁদ মল্লিক মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। পরে কাঙ্গালি বিদায়; সাধারণ ভাবে পয়সা ও চাউল এবং বিশেষ ভাবে অন্ধ ও আতুরদিগকে বস্ত্র প্রদান করা হয়। অনেককে আহার করানও হইয়াছিল। মধ্যাহ্নে প্রীতিভোজন। অপরাহ্ন ৩টার পরে বিশ্বাস সম্বন্ধে আলোচনা। সায়ংকালে কীর্ত্তন ও উপাসনা। বাবু চণ্ডীচরণ গুহ আচার্য্যের কার্য্য করেন, এবং "নির্ভর ও নাম সাধন" সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। উপদেশ অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। ১৭ই পৌষ শনিবার:—প্রাতে ব্রাহ্মিকা সমাজে উৎসব:—শ্রীমতী প্রসন্নময়ী ভট্টাচার্য্য উপাসনার কার্য্য করেন। পরে শ্রীমতী সখীমণি মল্লিক একটী সরল প্রার্থনা করেন। সায়ংকালে সমাজে উপাসনা হয়। বাবু কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান হইতে পাঠ ও "চরিত্র" সম্বন্ধে একটী সুন্দর উপদেশ প্রদান করেন। ১৮ই পৌষ রবিবার: কীর্ত্তন ও উপাসনা। বাবু রূপচাঁদ মল্লিক মহাশয় আ কার্য্য করেন, এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান ও উপদেশ পাঠ করেন।

শ্রাদ্ধ;—বিগত ২৬এ অগ্রহায়ণ রবিবার সদ্যপুষ্কর্ণী আমাদের পরলোকগত বন্ধু রাধাচরণ ঘোষের বাৎসরিক শ্র হইয়া গিয়াছে। রংপুর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ী, শিলি ও কলিকাতা হইতে বন্ধুগণ শ্রাদ্ধে যোগ দিয়াছিলেন। বাবু প্যারীলাল ঘোষ আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। বন্ধুর সহধর্ম্মিণী এবং পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় উপাসনান্তে প্রার্থনা করেন। শান্তিদাতা পরমেশ্বর পরলোক বন্ধুর আত্মাকে শান্তিতে রাখুন।

অসবর্ণ বিবাহ,—গত ১২ই অগ্রহায়ণ রবিবার রাত্র ৭ সাত ঘটিকার সময় দিনাজপুরে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মোহন কর মহাশয়ের বাসায় বিক্রমপুর সোণারঙ্গ নিবাসী কায়স্থ কুলোদ্ভব শ্রীমান্ মনোমোহন দের সহিত দিনাজপুর ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভুবন মোহন কর মহাশয়ের পালিতা কন্যা রাজবংশীয় কুলোদ্ভবা শ্রীমতী সুনীতি বালার শুভ পরিণয় ব্যাপার ব্রাহ্ম পদ্ধতিক্রমে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। পাত্রের বয়স ২৩ বৎসর কন্যার বয়স ১৬ বৎসর। বিবাহ ৪ আইন মতে রেজিষ্ট্রী হইয়াছে। এই বিবাহে শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত ভুবনমোহন কর মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন।

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন;—গত ৪ঠা পৌষ শ্রদ্ধেয় প্রচারক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় দিনাজপুর গমন করিয়া নিম্নলিখিত কার্য্য করিয়াছেন;—৪ঠা পৌষ রবিবার—রাত্রিতে সমাজ মন্দিরে উপাসনা। ৫ই পৌষ সোমবার। প্রাতে শ্রদ্ধেয় ভুবনমোহন কর মহাশয়ের বাসাতে উপাসনা। রাত্রি ৭টার সময় ব্রহ্ম মন্দিরে "বিশ্বাসের ভিত্তি" সম্বন্ধে বক্তৃতা, বক্তৃতা শুনিতে অনেক লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং সকলেই প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। ৭ই পৌষ মঙ্গলবার। রাত্রিতে শ্রদ্ধেয় রজনীকান্ত বসু মহাশয়ের বাসাতে উপাসনা।

নূতন পুস্তক;—তত্ত্বকৌমুদী হইতে বর্ত্তমান সময়োপযোগী কতকগুলি প্রবন্ধ স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তিত করিয়া আগামী উৎসবের মধ্যে পুস্তককারে প্রকাশিত হইবে। পুস্তকের নাম "জীবন্ত ও মৃত ধর্ম্ম"।

সঙ্গীত-লতিকা—সিন্দুরীয়াপটী ব্রাহ্মসমাজের একজন উপাসিকা প্রণীত। ব্রাহ্মসমাজ এই দেশকে অনেকগুলি সুমধুর পারমার্থিক সঙ্গীত উপহার দিয়াছেন। এই ভগিনী সেই উপহারের ডালাতে কয়েকটী ফুল ফেলিয়া দিবার [illegible] অগ্রসর হইয়াছেন। এ উদ্যম প্রশংসনীয়।

কলিকাতা ১৩নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা ১লা মাঘ মুদ্রিত ও ২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে প্রকা

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১০ম ভাগ।
২০শ সংখ্যা।

১৬ই মাঘ রবিবার, ১৮০৯ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৮

বাৎসরিক অগ্রিমমূল্য ২॥৵
মফস্বলে ৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

পূজার আয়োজন।

উপহার।

উৎসবে বিশেষভাবে তব প্রেমবারি
বরষিয়া করিলে গো পরাণ শীতল।
কিবা দিব প্রতিদান, অনাথ বৎসল!
দুঃখী আমি? জয় জয় মহিমা তোমারি।

সম্বৎসর ধরি' নাথ! দুয়ারে তোমার,
'দাও দাও' বলি' কত ধনরত্ন চাই!
দিতেছ কতই নিত্য, অবধি ত নাই,
অতীব বিচিত্র তব দয়ার ব্যাপার!

ধন্য রাজরাজেশ্বর, করুণানিধান!
দীনে দয়া করি' বড় সুকীর্ত্তি রাখিলে!
ধন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম, তব দয়ার বিধান!
যার গুণে পাপী ভাসে প্রেমের সলিলে।

নিত্য বলি 'দাও দাও', কি বলিব আজ?—
লও লও প্রাণ মন, হে হৃদয়রাজ!

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

অষ্টপঞ্চাশত্তম মাঘোৎসব।

বর্ত্তমানযুগে ব্রাহ্মধর্ম্ম জীবন্ত ঈশ্বরের করুণার সাক্ষাৎ নিদর্শন; ব্রাহ্মসমাজ সেই বিশ্ববিধাতার প্রত্যক্ষ লীলাভূমি। ঈশা, বুদ্ধ, চৈতন্য প্রভৃতি মহাত্মগণের জীবন যে প্রেমজলধির উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ, আমাদের প্রিয় এই ব্রাহ্ম সমাজও সেই প্রেম-জলধির তরঙ্গোচ্ছ্বাস। বহুশতাব্দী পূর্ব্বে পরমেশ্বরের হস্ত যেমন সাক্ষাৎ ভাবে তাঁহার জগতে কার্য্য করিত, এই উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতা, জ্ঞান ও সংসারিকতার কোলাহলের মধ্যেও যে তাঁহার হস্ত ঠিক্ সেই রূপ সাক্ষাৎ ভাবে কার্য্য করিতেছে; তখন যেমন সরল সাধকের প্রাণে পরমেশ্বর আত্মস্বরূপ প্রকাশিত করিতেন, নির্ভরশীল, অনুতপ্ত আত্মাকে স্বর্গীয় শক্তিদ্বারা অনুপ্রাণিত করিতেন, এখনও যে সেইরূপ করিয়া থাকেন; তখনকার বিশ্বাসিগণ যেমন অন্তরে বাহিরে তাঁহাকে দেখিয়া, প্রাণের মধ্যে তাঁহার জীবনপ্রদ, পরিত্রাণপ্রদ বাণী শ্রবণ করিয়া নবজীবন লাভ করিতেন, বর্ত্তমান যুগের বিশ্বাসিগণের জীবনেও যে ঠিক্ সেইরূপ ঘটনা সম্ভব;— ব্রাহ্মসমাজ তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা করুণাময়ের এই বিশাল প্রেমা[illegible]র স্রোতে আসিয়া পড়িয়াছেন; ধন্য তাঁহারা যাঁহারা বিশ্বাস[illegible]ক ব্রাহ্মসমাজের ঘটনাবলীর মধ্যে সেই বিশ্ববিধাতার হস্ত দেখিতে সমর্থ হইয়াছেন। পরমেশ্বর স্বয়ং তাঁহাদের তাপিত প্রাণ শীতল করিবেন; তাঁহাদের ক্ষীণ প্রাণে দুর্জ্জয় ব্রহ্মশক্তি সঞ্চারিত করিবেন; তাঁহাদের জীবনে অলৌকিক ব্যাপার সকল সংঘটিত করিবেন; তাঁহাদের মৃত প্রাণে জীবন সঞ্চার করিবেন। এবারকার মাঘোৎসবে আমরা তাহার কথঞ্চিৎ আভাস পাইয়াছি।

বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই প্রেমময় তাঁহার প্রেমোৎসবের আয়োজন করিতেছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিক দুরবস্থার দিকে ক্রমে ক্রমে অনেকেরই দৃষ্টি পড়িতেছিল, এবং এই বিষয় লইয়া তত্ত্বকৌমুদী ও মেসেঞ্জারের স্তম্ভে এবং সঙ্গত সভায় অনেকদিন হইতে আন্দোলন চলিতেছিল। প্রকৃত ব্রাহ্মজীবন লাভ করিতে হইলে গভীর আধ্যাত্মিক উপাসনা ও একত্র সাধন ভজন যে একান্ত প্রয়োজনীয় আমাদের মধ্যে কেহ কেহ তাহা অনুভব করিয়া সেই উদ্দেশ্যে পূর্ব্ব হইতেই একত্র বিশেষভাবে উপাসনাদি আরম্ভ করিয়াছিলেন। অবশেষে বিগত অক্টোবর মাসে সঙ্গত সভার এক অধিবেশনে স্থির হয় যে, প্রতি রবিবার প্রাতে অল্প সংখ্যক কয়েকজন লোকের মধ্যে যাহাতে জমাট উপাসনা হয় তাহার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। তদনুসারে গত ৩০ এ অক্টোবর হইতে প্রতি রবিবার প্রাতঃকালে বিশেষ ভাবে উপাসনা হইয়া আসিতেছে, এবং এই উপাসনাদ্বারা অনেক পিপাসু আত্মার বিশেষ উপকার হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজে যে পূর্ণাঙ্গ উপাসনা প্রণালী প্রচলিত আছে তাহা জীবনে ভাল করিয়া সাধন করিতে পারিলে, তাহার ভিতরে ভাল করিয়া ডুবিতে পারিলে যে কত রত্ন লাভ করা যায় অনেকেই তাহার একটু একটু আভাস পাইয়াছেন ও পাইতেছেন, এবং এই রবিবাসরীয় বিশেষ উপাসনাদ্বারা তাঁহাদের মন উৎসবের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। এতদ্ভিন্ন উৎসবের তিন মাস পূর্ব্ব হইতে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এবং বাবু কেদার নাথ

মুখোপাধ্যায়, হরিমোহন ঘোষাল, আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েক জন ব্রাহ্মভ্রাতা এই ব্রত গ্রহণ করেন যে, তাঁহারা উৎসব পর্য্যন্ত প্রতিদিন প্রাতঃকালে কলিকাতাস্থ ব্রাহ্ম পরিবার-সমূহে ও ব্রাহ্ম ছাত্রদের বাসায় বাসায় সঙ্কীর্ত্তন ও প্রার্থনা করিয়া বেড়াইবেন। তাঁহারা বিশেষ উৎসাহের সহিত এই ব্রত পালন করিতেছিলেন এবং তাঁহাদের এই চেষ্টা দ্বারা কলিকাতাস্থ ব্রাহ্মদিগের মন উৎসবের জন্য কতক পরিমাণে প্রস্তুত হইতেছিল। এইরূপে দয়াময় পরমেশ্বর ব্রাহ্মসাধারণের আধ্যাত্মিক নিদ্রা ভঙ্গ করিবার জন্য চারিদিক্ হইতে নানা উপায় বিধান করিতেছিলেন, এবং তাঁহার কৃপায় এবারকার উৎসবে অনেকেই বিশেষভাবে তাঁহার প্রকাশ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। যাহাতে ইহার ফল আমাদের জীবনে স্থায়ী হয়, তিনি আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ করুন। এই প্রার্থনা করিয়া আমরা এবারকার উৎসবের বিবরণ যথাসাধ্য পাঠকবর্গের গোচর করিতে চেষ্টা করিব।

৪ঠা মাঘ মঙ্গলবার।

৪ঠা মাঘ মঙ্গলবার হইতে উৎসবের কার্য্য আরম্ভ হয়। ঐ দিবস প্রাতঃকালে কলিকাতাস্থ ব্রাহ্ম পরিবারসমূহে ও ব্রাহ্ম ছাত্রদিগের বাসায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণোদ্দেশে বিশেষ উপাসনা হইবে বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। অনেক ব্রাহ্ম গৃহস্থ পূর্ব্ব হইতেই নিজ নিজ আবাস বাটী পত্রপুষ্প পতাকায় সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। ঐ সকল পতাকা "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং", "সত্যমেব জয়তে", "মা আনন্দময়ী" প্রভৃতি ধর্ম্মভাবোদ্দীপক বাক্য বক্ষে ধারণ করিয়া প্রাতঃসমীরণের সঙ্গে সঙ্গে যেন দয়াময়ের কৃপার সমাচার প্রচার করিতেছিল। ছাত্রাবাস সমূহও ঐ রূপে সুসজ্জিত হইয়া মঙ্গলময়ের মঙ্গলোৎসবের সূচনা করিতেছিল। মঙ্গলবার প্রত্যুষেই কলিকাতাস্থ প্রত্যেক ব্রাহ্ম পরিবার ও ছাত্রাবাস হইতে ব্রহ্মসঙ্গীত এবং আরাধনা ও প্রার্থনার ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল এবং সকলেই সেই পিতার নিকট সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণার্থ প্রার্থনা করিতেছেন এই ভাব স্মরণ করিয়া অন্ততঃ তৎকালের জন্য ব্রাহ্মগণ আপনাদিগকে এক পরিবারভুক্ত বলিয়া অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সাধারণ অভাবের জন্য মধ্যে মধ্যে এইরূপ একহৃদয় হইয়া প্রার্থনা করিতে পারিলে পরস্পরের সম্বন্ধ যে ঘনিষ্ঠতর হইতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই দিবস সায়ংকালে উৎসবের উদ্বোধন হয়। সন্ধ্যার প্রাক্কাল হইতেই সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছিল। দেখিতে দেখিতে উপাসক ও দর্শকবৃন্দে উপাসনামন্দির পূর্ণ হইয়া গেল। নির্দ্ধারিত সময় উপস্থিত হইলে "অচল ঘন গহন গুণ গাও তাঁহারি" এই সঙ্গীতের পর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এই বলিয়া উদ্বোধন আরম্ভ করিলেন ;—

দুর্ব্বলতাই বল, নির্ভরই শক্তি। যখনই আমরা আপনাদের দুর্ব্বলতা ও অসারতা উপলব্ধি করিয়া ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিতে পারি তখনই প্রাণে বল সঞ্চার হয়, হৃদয় ঐশী শক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। শিশুর ন্যায় অসহায় কে আছে? অথচ শিশুর এই দুর্ব্বলতাই অন্যের সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়া তাহাকে নানা বিপদের মধ্যে রক্ষা করে। শিশুকে দেখিলে অত্যন্ত পাষণ্ড যে তাহারও প্রাণ কোমল হয়। নারীগণ দুর্ব্বল বলিয়া অবলা নামে খ্যাত হইয়া থাকেন। কিন্তু তেমন তেমন অবস্থায় পড়িলে এই অবলাগণ যেরূপ মানসিক বলের পরিচয় দেন তাহা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। নিজের জীবনে যখনই দুর্ব্বলতা, অবনম্র ভাব ও বিষাদ অনুভব করিয়াছি, যখনই নিতান্ত নিরুপায় হইয়া পরমেশ্বরের উপর একান্ত মনে নির্ভর করিয়াছি, তখনই প্রাণে বল পাইয়াছি। এই মহোৎসব করিতে পারি এমন কি শক্তি আমাদের আছে? ঈশ্বর স্বয়ং পূজা না করাইলে কে তাঁহার পূজা করিতে পারে? এই যে কত আকুল নরনারী আশা করিয়া এখানে আসিয়াছেন, ইহাঁদিগকে তিনিই এখানে তাঁহার দয়া উপভোগ করিবার জন্য আনিয়াছেন। আমরা তাঁহারই উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার আরাধনায় প্রবৃত্ত হই।

উদ্বোধনান্তে "আজি বাহছে বসন্ত পবন সুমন্দ" এই গানটীর পর আরাধনা আরম্ভ হইল। যখন শত শত উপাসক উৎসাহের সহিত একপ্রাণে, একস্বরে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন, তখন সমস্ত মন্দির যেন ব্রহ্মের গম্ভীর সত্তাতে পূর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আরাধনা, ধ্যান ও সাধারণ প্রার্থনা শেষ হইলে পর বেদী হইতে যে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল তাহার সারাংশ নিম্নে দেওয়া গেল ;—

কাহারও বাটীতে যখন উৎসব বা পর্ব্ব হয়, তখন বাড়ীর বালক বালিকারা কতদিন হইতে আনন্দ করিতে থাকে! তাহারা কত আশা করিতে থাকে, কে কি জিনিষ পাইবে তৎসম্বন্ধে কত উৎসাহের সহিত পরস্পর বলাবলি করিতে থাকে, কত আশার সহিত দিন গণনা করিতে থাকে! কেন তাহারা এত আনন্দিত হয়? কিছু পাইবে বলিয়া। অবশেষে যখন সেই আনন্দের দিন উপস্থিত হয়, তখন তাহাদের মুখ কেমন প্রফুল্ল হইয়া উঠে! তাহাদের পিতামাতা তাঁহাদের স্নেহের চিহ্নস্বরূপ যে সকল দ্রব্য তাহাদিগকে প্রদান করেন, তাহা পাইয়া তাহাদের কেমন আনন্দ হয়! তাহারা কাপড়, ছবি প্রভৃতি যে সকল বস্তু উপহার পায়, কত যত্নের সহিত তাহা তুলিয়া রাখে, কত আনন্দের সহিত বন্ধুবান্ধবদিগকে ঐসকল বস্তু দেখায়! আমরা যে এতদিন হইতে মহোৎসবের আশা করিতেছিলাম, উৎসব আসিবে বলিয়া দিন গণিতেছিলাম, কিসের জন্য? আমরা কিপ্রকার বস্তু পাইব বলিয়া আশা করিতেছি? আমরা এমন কি লাভ করিব বলিয়া প্রত্যাশা করিতেছি, যাহা আনন্দের সহিত অপরকে দেখাইতে পারিব? এই বিষয়টী একবার ভাল করিয়া চিন্তা করা আবশ্যক। একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই আমরা দেখিতে পাইব যে, সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর আমাদের সকলের আত্মার অতি নিকটে রহিয়াছেন। আমাদের মধ্যে এমন পাপী কেহ নাই, যাহার প্রাণের মধ্যে তিনি প্রাণের প্রাণ হইয়া বর্ত্তমান নাই। আমাদের মধ্যে এমন নরাধম কেহ নাই, যে তাঁহার কৃপার সীমাকে অতিক্রম করিতে পারে। তিনিই আমাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা

করিতেছেন। তিনিই আমাদিগকে পরিত্রাণের পথে লইয়া যাইতেছেন। তিনিই আমাদের একমাত্র আশ্রয় ও অবলম্বন-রূপে সর্ব্বদা আমাদের প্রাণের নিকটে রহিয়াছেন। কিন্তু সংসারে পড়িয়া আমরা ইহা ভুলিয়া যাই। তিনি যে সর্ব্বদা কত নিকটে রহিয়াছেন, তাঁহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ যে কত ঘনিষ্ঠ অনেক সময় তাহা আমাদের মনে থাকেনা। যখনই আমরা তাঁহাকে ভুলিয়া যাই, তখনই আমরা পাপে পড়ি, তখনই আমরা প্রবৃত্তির হস্তে আত্মসমর্পন করি, তখনই আমরা ভাই ভগ্নীর সহিত বিবাদ বিসম্বাদে প্রবৃত্ত হই। আর যখন বিশ্বাস নয়নে তাঁহাকে প্রাণের মধ্যে দেখিতে পাই, তখন পাপ আমাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না, তখনই আমরা প্রবৃত্তির উপর জয় লাভ করিতে পারি, তখনই আমরা ভাই ভগ্নীকে প্রেমের চক্ষে দেখিতে সমর্থ হই। এই উৎসবে আসিয়া আমরা কি দেখিব? এখানে আমরা দেখিব যে, পরমেশ্বর আমাদের প্রাণের প্রাণ হইয়া, আমাদের জীবনের বিধাতা হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছেন; আমরা তাঁহার প্রেম-বাহুর আলিঙ্গনের মধ্যে বাস করিতেছি। শুদ্ধ মুখে তিনি আছেন বলিলেই হয় না। প্রাণের মধ্যে তাহা দেখিতে হইবে তিনি যে আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন, তিনিই যে আমাদিগকে ব্রাহ্মসমাজে আনিয়াছেন, তিনিই যে আমাদিগকে পরিত্রাণের পথে লইয়া যাইতেছেন, তিনিই যে এইসকল পিপাসু নর নারীকে উৎসবে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন, ইহা উজ্জ্বলরূপে উপলব্ধি করিতে হইবে, বিশ্বাস চক্ষে দেখিতে হইবে। তিনি উৎসবক্ষেত্রে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া আমাদিগকে লজ্জা দেন; তাঁহাকে ভুলিয়া সংসার লইয়া ব্যস্ত ছিলাম, তাঁহার বিরুদ্ধে কত অপরাধ করিয়াছি, আমরা তাঁহার সহবাসের কত অনুপযুক্ত, তাহা দেখাইয়া দিয়া তিনি আমাদিগকে লজ্জিত ও অনুতপ্ত করেন। তাঁহার করুণায় কি হয় তাহা আমরা বুঝিনা। সাধুরা বারম্বার তাহা বলিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরের কৃপায় নবজীবন লাভ করা যায়। তাঁহার করুণা যদি বিশ্বাস নয়নে দেখা যায় তাহা হইলে সেই জীবন পাওয়া যায়, যে জীবন আর যায় না। সেই জীবনভিন্ন মানুষ দাঁড়াইতে পারে না, বাঁচিতে পারেনা। আমাদের চেষ্টায় যাহা হয় না হয় তাহা ত দেখিয়াছি। আমরা প্রেম করিতে গিয়া অপ্রেম আনয়ন করি, আমরা শান্তি সংস্থাপন করিতে গিয়া অশান্তির বীজ বপন করি। আর যেই প্রভুর কৃপা প্রকাশিত হয় অমনি সমস্ত অপ্রেম, অশান্তি তিরোহিত হয়, মরুভূমিতে প্রেমের কুসুম সকল প্রস্ফুটিত হয়। তাঁহার কৃপায় কি হয় আমরা অনেকবার তাহা দেখিয়াছি। কিন্তু সে সকল কথা আমাদের মনে থাকেনা। এই উৎসবে তিনি আমাদিগকে কত আধ্যাত্মিক রত্ন প্রদান করিবেন। তিনি এই উৎসবে আমাদিগকে যাহা দিবেন তাহার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান এই যে, তিনি আমাদের ন্যায় পাপীর সঙ্গে বসিবেন, আমাদের সঙ্গে কথা কহিবেন। আমরা তাঁহার সহবাসে থাকিয়া পাপজীবনের যন্ত্রণার শান্তি করিব, তাঁহার সহবাসে আমরা নবজীবন লাভ করিব, এই আশায় আমরা এখানে আসিয়াছি। দয়াময় প্রভু কি আশা পূর্ণ করিবেন না? আমরা যদি তাঁহার কৃপার উপর একান্ত মনে নির্ভর করিতে পারি, তবে করুণাময় পরমেশ্বর নিশ্চয়ই আমাদের আশা পূর্ণ করিবেন, তাঁহার প্রেমজ্যোতিতে আমাদের চক্ষু উজ্জ্বল করিবেন। জীবনের পরীক্ষায় দেখিয়াছি তাঁহার করুণায় সকল অভাব দূর হয়। আমাদের তিনি ভিন্ন অন্য গতি নাই। আমরা আর কাহার দিকে চাহিব? ভাই ভগ্নি! এস আমরা একান্ত অন্তরে তাঁহারই শরণাপন্ন হই, উৎসবে নবজীবন পাইবার আশায় তাঁহাকে ডাকি। তিনি যে অন্তরে রহিয়াছেন। পাপীকে তিনিত পরিত্যাগ করেন না। তাঁহার যে পাপীকে পরিত্যাগ করিবার যো নাই। পাপীকে উদ্ধার করাই যে তাঁহার কাজ। ইহাই যে তাঁহার প্রকৃতি। তবে আমরা নিরাশ হইব কেন? এস সকলে একহৃদয় হইয়া নবজীবনলাভের জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি। দীন ভাবে ও বিশ্বাসের সহিত তাঁহার উপর নির্ভর করিতে পারিলে নিশ্চয়ই তিনি আমাদের উপর তাঁহার কৃপাবারি বর্ষণ করিবেন।

উপদেশান্তে প্রার্থনা এবং "বরিষ ধরা মাঝে শান্তির বারি" এই সঙ্গীত ও "আজি মাতিব আনন্দে সবে" এই সঙ্কীর্ত্তনের পর প্রথম দিবসের কার্য্য শেষ হয়।

৫ই মাঘ, বুধবার।

এই দিবস প্রাতঃকালে ছাত্রোপাসক সমাজের উৎসব হয়। প্রথমতঃ সঙ্গীত হইলে পর সম্পাদক বার্ষিক কার্য্য বিবরণ পাঠ করিলেন। স্বর্গীয় গিরীন্দ্রমোহন গুপ্ত এই সমাজের এক প্রধান অবলম্বন ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে এই সমাজ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এখন ইহার স্থায়িত্ব অনিশ্চিত।

রিপোর্ট পাঠ শেষ হইলে শ্রদ্ধাস্পদ বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত উপাসনা করিলেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম এই;— ছাত্র জীবনই ধর্ম্মসাধনের প্রকৃত সময়। ছাত্রকে পরিণত বয়স্ক যুবকের মত অগণ্য প্রলোভনের সহিত সংগ্রাম করিতে হয় না। কিন্তু কিরূপে সাধন করিতে হইবে? এক নাম সাধন হইতেই সমস্ত হয়। বিশ্বাস, ভক্তি ও অনুরাগ থাকিলেই হইল। ভক্তপ্রবর বালক প্রহ্লাদের কাহিনী কেনা জানে? পুরাণে বলে, তিনি কেবল হরিনাম সাধন করিয়া নিজে মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। কেবল তাহা নহে, তাঁহার নিকটে হরিনাম শুনিয়া অশিক্ষিত দৈত্য বালকেরাও মাতিয়া উঠিয়াছিল।

অপরাহ্ণ প্রায় ৪ টার সময় উপাসনালয়ে ব্রাহ্ম বালক-বালিকাদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য ব্রাহ্মগণ সম্মিলিত হন। বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, চণ্ডীকিশোর কুশারি, শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী, ডাক্তার প্রসন্ন কুমার রায়, বাবু কালীশঙ্কর শুকুল, আনন্দচন্দ্র মিত্র ও যদুনাথ চক্রবর্ত্তী এবং মফস্বল হইতে আগত এক জন বন্ধু আলোচনায় যোগ দেন। এখানে যে আলোচনা হইয়াছিল, তাহার স্থূল মর্ম্ম এই;—

শিক্ষার অভাবে ব্রাহ্ম বালক বালিকাদের দিন দিন অবনতি

হইতেছে। তাহাদিগের শিক্ষা লাভের জন্য উপযুক্ত বিদ্যালয় নাই। তাহারা অন্য সমাজের বালক বালিকাদিগের সহিত মিশিয়া কুশিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছেন। সিটি স্কুল দ্বারা এ অভাব দূর হইতেছে না। তাহাতে অন্য সমাজের ছেলের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। ব্রাহ্ম বালক বালিকাদিগের জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালয় না হইলে চলে না। বোর্ডিং হইলে ত ভালই হয়। কলিকাতায় বিদ্যালয় ও বোর্ডিং হইলে মফস্বলের ছেলে মেয়েরাও আসিয়া এখানে শিক্ষা লাভ করিতে পারে। কিন্তু তাহাতে একটু আশঙ্কার কারণও আছে। মফস্বলস্থ ব্রাহ্মগণ অতি শিশু সন্তানদিগকে এখানে পাঠাইতে পারিবেন না। তাঁহাদিগের অপেক্ষাকৃত অধিকবয়স্ক বালক বালিকারাই এখানে আসিবে। তাহাদিগের সহিত মিশিয়া এখানকার অল্প বয়স্ক বালক বালিকারা কুশিক্ষা পাইতে পারে। মফস্বলস্থ ব্রাহ্মেরা অত্যন্ত গরিব। তাঁহারা অধিক টাকা খরচ করিতে পারিবেন না। এখানেও সকলের অবস্থা সমান নহে। স্কুলের শিক্ষকদিগকে বিশ্বাস করিয়া সকলে ছেলে মেয়ে পাঠাইবেন কিনা তাহাও সন্দেহ। ব্রাহ্ম বালকবালিকাদের জন্য ব্রহ্মবিদ্যালয়ও নৈতিক বিদ্যালয় আছে। কিন্তু অধিকাংশ ব্রাহ্ম তাহাতে নিজ নিজ সন্তানদিগকে প্রেরণ করা আবশ্যক মনে করেন না। সুতরাং নূতন বিদ্যালয় স্থাপন করিবার পূর্ব্বে ব্রাহ্ম সাধারণের মন প্রস্তুত করা চাই। ঐ বিদ্যালয়ে উপযুক্ত আমোদ প্রমোদেরও ব্যবস্থা থাকিবে। নতুবা বালকবালিকাদের মন বিকৃত হইয়া যাইবে। ব্রাহ্মেরা যে সকল সত্য অনেক কষ্টে লাভ করিয়াছেন, তাঁহা যদি তাঁহাদের সন্তানদিগকে শিখাইয়া না যাইতে পারেন, তাহা হইলে আর কি হইল? শিক্ষার উপযুক্ত বন্দোবস্ত করিতে পারিলে ব্রাহ্ম সমাজের শক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে। ছাত্রবেতন হইতে অতি অল্প আয় হইবে। সুতরাং চাঁদা তুলিতে হইবে, এবং কয়েক জন লোককে নূতন বিদ্যালয়ের জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকিতে হইবে। এই কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য একটী কমিটি গঠিত হইল। একজন প্রবীণ ব্রাহ্ম সেই স্থলেই চাঁদা স্বাক্ষর করিতে, একজন বিদ্যালয়ের ভার লইতে এবং অপর একজন এই বিদ্যালয়ে কাজ করিবার জন্য চাকুরী পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

কমিটীর সভ্যদিগের নাম;—

বাবু যদুনাথ চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, বাবু অঘোর নাথ মুখোপাধ্যায়, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, চণ্ডীকিশোর কুশারি এবং কালীশঙ্কর শুকুল (সম্পাদক)।

সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকার পূর্ব্ব হইতে থিওডোর পার্কারের জীবন সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতা শুনিবার জন্য উপাসনালয়ে লোক সমাগম হইতে লাগিল। বসিবার আসন সকল শীঘ্র পূর্ণ হইয়া যাওয়াতে শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে অনেককে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইয়াছিল। বক্তৃতা শেষ করিতে দুই ঘণ্টার অধিক সময় লাগিয়াছিল। কিন্তু বক্তৃতা এরূপ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল যে সকলেই ধীরভাবে ও মনোযোগের সহিত বক্তৃতা শেষ হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়াছিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে দুইটী সঙ্গীত হইলে পর নগেন্দ্র বাবু সময়োচিত একটী প্রার্থনা করিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। তিনি যাহা বলিয়াছিলেন স্থানাভাববশতঃ আমরা তাহা এস্থলে বিস্তারিত ভাবে লিপিবদ্ধ করিতে পারিলাম না। উৎসব উপলক্ষে যে চারিটী দীর্ঘ বক্তৃতা হইয়াছিল তাহা ভবিষ্যতে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

বক্তৃতান্তে প্রার্থনা ও সঙ্গীতের পর দ্বিতীয় দিবসের কার্য্য শেষ হইল।

৮ই মাঘ বৃহস্পতিবার।

এই দিবস প্রাতঃকালে বাবু যদুনাথ চক্রবর্ত্তী উপাসনার কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ নিম্নে দেওয়া গেল;—

ভগবদ্গীতাতে একটী উক্তি আছে; পরমেশ্বরের মুখে সে উক্তিটী দেওয়া হইয়াছে। ঈশ্বর বলিতেছেন পুণ্য সংস্থাপন ও পাপ বিনাশের জন্য আমি যুগে যুগে সংসারে অবতীর্ণ হই। পরমেশ্বর যুগে যুগে, মধ্যে মধ্যে ধর্ম্ম সংস্থাপন ও অধর্ম্ম বিনাশের জন্য অবতীর্ণ হন, সকল সময় থাকেন না, যখন পাপ বৃদ্ধি পায়,তখন অবতীর্ণ হইয়া পাপ বিনাশ করেন—এবম্প্রকার উক্তিতে যদিও আমরা সম্পূর্ণ রূপে সায় দিই না, কিন্তু ইহার মধ্যে একটী গভীর সত্য প্রচ্ছন্ন আছে, তাহা অস্বীকার করিতে পারি না। ঈশ্বর সর্ব্বকালব্যাপী, বিশ্বসংসারে চির অধিষ্ঠিত। তিনি সংসারকে পরিত্যাগ করিয়া, মনুষ্যকে যাহা ইচ্ছা কাজ করিতে দিয়া স্বর্গের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করেন একথা আমরা বিশ্বাস করিনা। একটী বিধান প্রেরণ করিয়া বিধানের ফল কিরূপ হয় তাহা পরে দেখিব, যদি পাপ বৃদ্ধি হয় তবে পাপ বিনাশ ও পুণ্য প্রতিষ্ঠার জন্য অবতীর্ণ হইব,এই স্থির করিয়া ঈশ্বর নিশ্চিন্ত থাকেন আমরা এরূপ বিশ্বাস করি না। বিশ্বাসী বলেন, যে প্রত্যেক হৃদয়ে, প্রতি মুহূর্ত্তে ঈশ্বর অবস্থিতি করেন, এবং প্রত্যেক মুহূর্ত্তে আত্মাকে জাগ্রত করিয়া ধর্ম্ম পথে লইয়া যান। বিশ্বাসী দেখেন যে, অন্তর্যামী আমাদের মনে সর্ব্বদা অধিষ্ঠান করিয়া পুণ্যবুদ্ধি ও সুমতি বিধান করিতেছেন।

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

গীতা তবে কেন একথা বলিয়াছেন? ইহার মধ্যে কিছু সত্য আছে কি না।

এক দিক্ হইতে দেখা যায় যে মানুষ কখন কখন আপনার বুদ্ধি ও কল্পনা অনুসারে সংসারে কার্য্য করে ও ধর্ম্ম সংস্কার করিতে যায়। সে এক প্রকার ধর্ম্ম। কিন্তু পরমেশ্বরের দিক্ হইতে যে ধর্ম্ম আসে, যে সত্য সংস্থাপিত হয় তাহা আর এক প্রকার। শেষোক্ত প্রকারের ধর্ম্মকে সাত্বিক ও প্রথম প্রকারকে রাজসিক ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে। মানুষের দিক্ হইতে ধর্ম্ম সংস্কার করিতে গিয়া পরমেশ্বরের দিক্ হইতে যে ধর্ম্ম আসে তাহা অনেকে ভুলিয়া যায়। মানুষ আপনার বিদ্যা,বুদ্ধি, কল্পনা, যুক্তি একত্র করিয়া যে ধর্ম্ম সংস্কার করে সে এক প্রকার ধর্ম্ম। আর উপযুক্ত সময়ে ঈশ্বর পাপ বিনাশ ও পুণ্য প্রতিষ্ঠার জন্য যে সত্য ধর্ম্ম প্রেরণ করেন তাহা আর এক প্রকার। এই দুই প্রকার ধর্ম্ম ভাবের মধ্যে আমরা কোন্দিকে গ্রহণ করিব,কোন্-

টীতে আমরা সাত্ত্বিক ভাব ও ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর দেখিতে পাই? ঈশ্বর কতবার অবতার হইয়াছেন, কিরূপে আসিয়াছেন, কি লীলা করিয়াছেন, ইহা যেরূপে যিনি বুঝুন, ইহার মূলে এই সত্য আছে যে, পরমেশ্বর উপযুক্ত সময়ে আপনি সত্য ধর্ম্ম সংস্থাপন করেন। মানুষ নিজের বুদ্ধিদ্বারা সমাজের যে সংস্কার করে উহা রাজসিক ব্যাপার, উহাতে সাত্ত্বিক লোকেরা তৃপ্তি লাভ করেন না, কেন না সে অবস্থায় মানুষ আপন বিধি ব্যবস্থা লইয়া ব্যস্ত থাকে এবং আপন মতকে বলবৎ করিবার জন্য উপায়, অভিসন্ধি ও কৌশল অবলম্বন করে, ভগবান্‌কে লাভ করাই যে জীবনের উদ্দেশ্য তখন সে তাহা বিস্মৃত হয়। মানুষের দিক্ হইতে যে সংস্কার হয় তাহাতে দোষ গুণ উভয়ই থাকে। নাস্তিক ঈশ্বরপরায়ণ ও বিশ্বাসী লোক সত্যকে লক্ষ্য করিয়া সেই সংস্কারের বিচার করেন, অন্য প্রকার লোক অন্য ভাবে উহার বিচার করে।

যদি বিশ্বাস করি যে পরমেশ্বরের দিক্ হইতে ধর্ম্ম আসিয়াছে তবে তাহাতে তাঁহার হস্ত দেখিতে পাইব। পরমেশ্বরের শক্তি প্রকৃতির সকল বিষয়েই দেখা যায়; সে শক্তির কার্য্য ধর্ম্মে কেন না দেখা যাইবে? প্রত্যেক অস্তিত্বের মূলে মানুষ কাহার হস্ত দেখিতে পায়? আপনার হস্ত, আপনার জ্ঞান দেখে, না ঈশ্বরের হস্ত দেখিতে পায়? সংসারের সমস্ত জড় পদার্থ যে হস্ত কর্ত্তৃক আমাদের কল্যাণের জন্য প্রেরিত হইয়াছে, ধর্ম্মও সেই হস্ত কর্ত্তৃক প্রেরিত। যিনি চন্দ্র সূর্য্যকে পাঠাইয়াছেন তিনিই ধর্ম্মকে পাঠাইয়াছেন। আমাদের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সকল প্রকার অভাব মোচনের ভার ঈশ্বরের হস্তে। মানুষ নিজের ভার নিজে বহন করিতে পারে না, সে ধর্ম্ম সংস্কারের গুরু ভার কি রূপে গ্রহণ করিবে? ধর্ম্ম সংস্কার ও প্রচার আমাদের পরিত্রাণের জন্য। অন্য অভিপ্রায়ে যদি ঐ সকল হইত তাহা হইলে বোধ হয় কখনই সে সকল স্থায়ী হইত না। মানুষ যদি আপন ইচ্ছা অনুসারে সত্য প্রতিষ্ঠিত করিত তাহা হইলে সে সত্য থাকিত না। ঈশ্বর সত্যের সংস্থাপক, উৎস, প্রেরক ও প্রচারক হইয়া সত্য প্রচার ও প্রেরণ করেন, তাই সত্য প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত এবং পুণ্য জয়যুক্ত হয়। মানুষের জয় পরাজয়ে, ধর্ম্মপ্রচারকের জয় পরাজয়ে সত্যের জয় পরাজয় হয় না। ভগবদ্গীতার পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে এই সত্যই দেখিতে পাই যে, যখন মানুষ দেখিতে পায় যে তাহার ধর্ম্ম ও পরিত্রাণ ঈশ্বরের হস্তে ন্যস্ত এবং তাহার ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ এক উৎস, শক্তি ও কারণ হইতে আসিতেছে, তখনই সে বুঝিতে পারে যে, ঈশ্বরপ্রেরিত ধর্ম্ম বিধি ব্যবস্থা চিরকালই জয়যুক্ত হইবে, আর অন্য ধর্ম্ম বিধি সমস্ত বিলুপ্ত হইবে।

এই ধর্ম্ম সংস্কার ও সত্য প্রতিষ্ঠা কার্য্যে আমাদের কোনও কর্ত্তব্য ও অধিকার আছে কি না? ইহাতে আমাদের কতটুক করিবার আছে যতক্ষণ তাহা বুঝিতে না পারি ততক্ষণ ধর্ম্ম সংস্কার কেবল কোলাহল ও আন্দোলনে পর্য্যবসিত হয়। ধর্ম্ম সংস্কারে আমাদের কতটুক হস্ত আছে তাহা বুঝা আবশ্যক। অনেক সময় আমাদের নিকট যাহা অত্যন্ত অলীক ও অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় হয়তো তাহাই আমাদের করণীয়। আবার অনেক সময় যাহা আমাদের করণীয় বলিয়া মনে করি হয়ত তাহাতে আমাদের অধিকার নাই, ঈশ্বরের পূর্ণ অধিকার। এবিষয়ে আমাদের কতটুক খাটিবার, করিবার ও ভাবিবার আছে ভাল করিয়া দেখিতে হইবে। কেননা আমরা একটী ধর্ম্মসমাজের অঙ্গস্বরূপ। যুগে যুগে ঈশ্বর ধর্ম্ম পাঠান ইহা সত্য, মানবের ক্ষমতা ও উন্নতির পরিমাণ দেখিয়া তিনি সত্য পাঠান ও সত্যের অধিকারী করেন ইহাও সত্য। কিন্তু আমাদের ইহা বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে যে বিধান একটী বৃহৎ ধর্ম্ম পরিবার, আমরা তাহার অঙ্গ, প্রত্যেক অঙ্গের কার্য্য ও অধিকার আছে। সচরাচর অধিকার ও ক্ষমতা বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহার কথা আমি উল্লেখ করিতেছি না। ভাই ভগিনীর পরিত্রাণের জন্য পরমেশ্বর আমাদিগকে যে অধিকার ও শক্তি দিয়াছেন তাহারই কথা বলিতেছি। ঈশ্বরের কার্য্য তিনি করিতেছেন। সত্য-প্রতিষ্ঠা তাঁহার কার্য্য, আমাদের নহে। সত্যের জয় হইবে কি না, এইরূপ করিলে সত্য সুচারুরূপে প্রচারিত হইবে কি না ইত্যাদি ভাবে ফলাফল চিন্তার অধিকার আমাদের নাই। এসকল তাঁহার ভাবিবার বিষয়, তিনি ভাবিবেন। আমরা কেবল তাঁহার আদেশ পালন করিব। ফলদাতার হাতে ফলাফল রাখিয়া ধর্ম্মবুদ্ধিতে, তাঁহার আলোকে যাহা তাঁহার আদেশ বলিয়া বুঝিতে পারিব তাহাই করিয়া যাইব। যিনি ফল দিতে পারেন, ফলাফল দেখিবার অধিকার তাঁহার, যিনি ফল দিতে পারেন না ফলাফল চিন্তার তাঁহার অধিকার নাই। ধর্ম্মগোষ্ঠীর প্রত্যেক অঙ্গের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য আছে। আমরা যদি আপন আপন কার্য্য করিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পন্ন করি, তিনি তাঁহার ধর্ম্মসংস্কার ও সত্য-প্রচার করিবেন। আমরা যদি না পারি, বিশুদ্ধ ইচ্ছাধীন হইয়া, বিশুদ্ধ হস্তে ও চিত্তে যাহারা পারিবে তিনি তাহাদের দ্বারা তাঁহার কার্য্য করাইয়া লইবেন। ইহারা আরম্ভ করিয়াছে ইহাদের দ্বারাই শেষ করিতে হইবে এমন কিছু বিচার হইবে না। প্রথম সংস্কারক হইয়াও আমরা যাহা না করিতে পারি, দীন বেশে আসিয়া, ঈশ্বরাধীন হইয়া আর একজন তাহা করিতে পারে। আমাদের আপনাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। প্রভুর ধর্ম্ম-পরিবারের অঙ্গীভূত হইয়া আমরা আপনাদের কার্য্য করিতেছি কিনা দেখিতে হইবে। যদি এ প্রকার বিশ্বাস করিতে পারি যে ঈশ্বরের অধীন হইয়া কার্য্য করিতেছি তাহা হইলে আমাদিগকে আর কিছু অনুসন্ধান করিতে হইবে না। আমরা পবিত্র মণ্ডলীর উপযুক্ত হইতেছি কি না ইহাই অনুসন্ধানের বিষয়। একটী সাধুজীবনের দৃষ্টান্ত ও কার্য্য সংসারে যত ফল প্রসব করে শত উপদেশেও তাহা করিতে পারে না। সাধুরা যে ধর্ম্ম প্রচার ও সত্যের জয় ঘোষণা করেন, ঈশ্বরের নাম সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হন, তাঁহার অভ্যন্তরে কি নিগূঢ় তত্ত্ব আছে? তাহা এই যে তাঁহারা আপনাদিগকে বিস্মৃত ও কার্য্যের ফলাফল-বিচারশূন্য হইয়া আপনাদের জীবন ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুগত

করিয়া থাকেন। তাঁহারা আপনাদের নির্ম্মল জীবনের বিশুদ্ধ জ্যোতি বিস্তার করিয়া গিয়াছেন, পৃথক্ ভাবে ধর্ম্ম প্রচার করেন নাই। আরণ্য পুষ্প অরণ্যে যখন আপন সৌরভ ও কান্তি বিস্তার করে, সে কি তখন জানে যে লোকে তাহাকে দেখিয়া ও আঘ্রাণ করিয়া মুগ্ধ হইবে? সাধক সেইরূপ আপনার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করত স্বীয় পবিত্র জীবনের কার্য্য দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার করিয়া যান। পবিত্র গোষ্ঠীর অঙ্গ হইয়া যদি পবিত্র জীবন যাপন করিতে না পারি তাহা হইলে কোনও ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান সুসিদ্ধ হইবে না। লোকে বলিতেছে যে আমাদের ধর্ম্মের বিস্তার হইতেছে না। কেহ কেহ বলিতেছে যে ইহাদের জীবন নির্ব্বাণপ্রায় ইহাদের দ্বারা আর ধর্ম্ম প্রচারিত বা রক্ষিত হয় না, ইহাদের মধ্যে উপযুক্ত লোক নাই। মানুষের দিক্ দিয়া যাহারা দেখে তাহারাই ওরূপ বলিয়া থাকে। মানুষ আপন অর্থ গণনা করিয়া তাহার দ্বারা কি হইতে পারে না পারে নিরূপণ করে, ঐ সকল লোক, তেমনই মানুষের বল গণনা করিয়া ধর্ম্মের ফলাফল বিচার করে। মানুষের দিক্ দিয়া দেখিলে ঐরূপ সন্দেহ ও আশঙ্কা করিবার কারণ আছে বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু গীতার ও ঈশ্বরের দিক্ দিয়া দেখিলে আশার সংবাদ লাভ করা যায়। আমরা কি অস্বীকার করিতে পারি যে ধর্ম্ম সংস্থাপন ও সত্য সংস্কার কার্য্যে ঈশ্বর আপনার হস্ত নিযুক্ত রাখিয়াছেন? আমরা কি মনে করি যে ঈশ্বর আমাদের ধর্ম্ম প্রেরণ করেন নাই, রামমোহন রায় ইহা দিয়া গিয়াছেন? তেমন পণ্ডিত এখন নাই, সুতরাং সে ধর্ম্মও এখন থাকিবে না একথা কি আমরা বিশ্বাস করিতে পারি? যিনি চন্দ্র সূর্য্যকে পাঠান তিনিই ধর্ম্ম পাঠান, যিনি দেশে বিদেশে ধর্ম্ম পাঠান তিনি আমাদের দেশেও ধর্ম্ম পাঠাইয়াছেন। ঈশ্বরের দিক্ দিয়া দেখ, দেখিবে রামমোহন রায় তাঁহার একটী যন্ত্র মাত্র, তাঁহার শুভ ইচ্ছার প্রকাশ মাত্র। কর্ত্তা, বিধাতা ও যন্ত্রী যখন রহিয়াছেন, তখন কি যন্ত্রের অভাব হইবে? শত শত রামমোহন উদিত হইবেন। হয়ত বা নির্জ্জন প্রদেশ হইতে উত্থিত হইয়া দীন দুঃখী কোনও ধর্ম্মপরায়ণ লোক ধর্ম্ম উজ্জ্বল করিবেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রেরয়িতা বর্ত্তমান। অবিশ্বাস বলে তিনি নাই, ধর্ম্ম বিনষ্টপ্রায়; বিশ্বাসী দেখেন ঈশ্বর ধর্ম্মকে আপন বক্ষে আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছেন, চিরকাল রাখিবেন। আমাদের নিয়ম ও মত থাকিবে কি না জানি না, কিন্তু ঈশ্বর আপন পক্ষ পুট মধ্যে তাঁহার সত্য ধর্ম্মকে রক্ষা করিবেন।

কিন্তু আমাদের কার্য্য যেন আমরা করিতে পারি। আমাদের জীবনের দৃষ্টান্ত যদি সত্য প্রচারের ব্যাঘাত করে, সে ব্যাঘাত স্থায়ী হইবে না, আমাদের জয় পরাজয়, বিশ্বাস অবিশ্বাস দ্বারা সত্য ধর্ম্মের কিছুই ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না। কোটি কোটি পাপ দুরাচারে কি ধর্ম্ম বিনাশ পাইয়াছে, না ঈশ্বরের নাম নির্ব্বাণ হইয়াছে? পাপ থাকিলেই কি ধর্ম্মের পরাজয় হয়? না; ঈশ্বর আছেন, তাঁহার আলোক অক্ষুণ্ণ, কখনও নির্ব্বাণ হয় না; অনন্তকাল সেই আলোক থাকিবে, থাকিয়া অবিশ্বাস, অন্ধকার ও মোহ ধ্বংস করিবে। আমাদের জীবনের দৃষ্টান্তে তাঁহার কি ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে? কিন্তু অপরাধের ভারে আমাদিগকে কোথায় যাইতে হইবে বলিতে পারি না। কলঙ্কের ভার ও ছায়া আনিয়া যদি আমরা ঈশ্বরের আলোক নির্ব্বাণ ও পুণ্যের সৌরভ ম্লান করিতে চেষ্টা করি, আমাদের অসদৃষ্টান্ত দেখাইয়া নরনারীকে তাড়াইয়া দিই, তাহা হইলে পৃথিবী আমাদের ভার বহিবেন না, ইহাই আশঙ্কা হয়। ধর্ম্মগোষ্ঠীর অঙ্গ বলিয়া যখন আপনাকে স্বীকার করি তখনই এই চিন্তা আসিয়া প্রাণকে অস্থির করে। আমাদের অপরাধ ও অসদৃষ্টান্তে আমরা অন্যান্য আত্মাদিগকে সত্য ধর্ম্মের দিক্ হইতে দুই এক দিনের জন্য বিমুখ করিতে পারি, কিন্তু চিরকাল পারিব না। তাই বলি যে আমাদের যেটুকু কার্য্য তাহা যেন করিয়া যাইতে পারি, আমাদের আচার ব্যবহার ও জীবন যেন সম্পূর্ণরূপ নিষ্কলঙ্ক হয়। আমরা যখন ধর্ম্ম পরিবারের অঙ্গ হইয়াছি, তখন আমরা উক্ত পরিবারের আভরণস্বরূপ হইয়া যেন উহার সৌন্দর্য্য ও সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করি, এবং উহার কলঙ্কের কারণ না হই।

সায়ংকালে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সেণ্টপলের জীবনসম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ ও হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। আজিও মন্দির পূর্ব্বদিবসের ন্যায় শ্রোতৃবৃন্দে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সঙ্গীত ও প্রার্থনার পর বক্তৃতা আরম্ভ হয়। বক্তৃতা শেষ করিতে প্রায় দুইঘণ্টা লাগিয়াছিল। স্থানাভাববশতঃ আমরা আপাততঃ তাহা বিস্তারিত ভাবে প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

বক্তৃতান্তে প্রার্থনা ও সঙ্গীতের পর তৃতীয় দিবসের কার্য্য সমাপ্ত হয়।

৭ই মাঘ, শুক্রবার।

এই দিবস প্রাতঃকালে পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন। তিনি যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহার সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল;—

সংসার ধর্ম্মকে বার বার একটী কথা জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতেছে, সে কথাটি এই, "হে ধর্ম্ম তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে যে প্রেমে ও ভাবে মিলন করাইয়া শান্তি, সুখ ও তৃপ্তি আনিয়া দিবে; কিন্তু তাহা না করিয়া তুমি কেবল অহঙ্কার উৎপাদন করিতেছ কেন?" ধর্ম্ম গম্ভীর ও বিনীত ভাবে, অথচ তেজের সহিত এই উত্তর দিয়া আসিতেছেন, 'বিষ রোয়ে তো অমৃত কাঁহা পাওয়ে—সংসার তুমি বিষ বপন করিতেছ, অমৃত কোথায় পাবে?'—ধর্ম্মের কাছে শান্তি ও তৃপ্তি পাইবার আশা করিতে পার, তোমার কাছে তাহা পাওয়া যাইবে কেন? বিষ বপন করিয়া অমৃত পাওয়া পৃথিবীর নিয়ম নহে। পৃথিবীর নিয়ম এই যে, যে যেমন বীজ বপন করে সে তেমনই ফল পায়। যে ধান্য বপন করে সে তিল পায় না, যে তিল বপন করে সে ধান্য পায় না। সংসার তুমি বিষ বপন করিয়াছ বিষের জ্বালায় তোমাকে পুড়িয়া মরিতে হইবে, বিষ বপন করিয়া অমৃত কেন পাইবে? আনন্দ, সুখ, পবিত্রতা তুমি পাইতে পার না। বাল্যকাল হইতে প্রতিহিংসা বিষের বপন

করিয়া রাখিয়াছ, অশান্তি অসন্তাব ভোগ করিবে বলিয়া ; এখন বলিতেছ "অমৃত চাই, তৃপ্তি ও আনন্দ চাই !' " ইহাতে ধর্ম্মের দোষ নাই, ধর্ম্ম চিরকালই পবিত্রতা ও পুণ্যের আলয়। সংসারে অমৃত বপন না করিলে ধর্ম্ম কি করিবে? উৎসব করিতে আসিয়া অনেকে বলেন যে আনন্দ ও তৃপ্তি পাইলেন না। ভাই ! যখন এই কথা বলিবে, তখন ভাবিয়া দেখিও কি বুনিয়াছ। সম্বৎসর ধরিয়া আগ্রহের সহিত যাহা বুনিয়াছ তাহাই পাইবে, শান্তি পাইবে না। উৎসবের ভাবের জল পড়িলে, যাহা বুনিয়াছ তাহা উৎসবের সময় ষষ্টিগুণ সতেজ হইয়া তোমার কাছে আসিবে। যাঁহারা অমৃত বুনেন উৎসবের কৃপার জল তাঁহারাই লাভ করেন, যাঁহারা বিশ্বাসের বীজ বপন করিয়াছেন তাঁহারা সুখে নৃত্য করিতে করিতে গৃহে গমন করেন।

কিন্তু বিষ বপন করিয়া এই যে ফসল সংগ্রহ করিয়াছি—তাহা হইতে কি কোনও মতে নিস্তার পাওয়া যাইবে না? তাহা যদি হয় তাহা হইলে ত বড় নিরাশার কথা। আশার কথা না বলিয়া নিরাশার কথা বলিলে অন্যায় করা হয়। ব্যাধি হইলে যখন চক্ষু নিমীলিত, মুখ অসাড় ও শরীর স্পন্দহীন হইয়া পড়ে এবং চিকিৎসক মুখ দিয়া ঔষধ প্রবেশ করাইয়া দিতে পারেন না, তখন শোণিতের সঙ্গে ঔষধ মিশাইয়া দিলে আশ্চর্য্য ফল হয়। রোগীর শারীরিক প্রণালী সকল ঔষধের গুণে প্রমুক্ত হইয়া যায়, বদ্ধ মুখ খুলিয়া যায়, বাক্‌শক্তিহীন রোগী পথ্য ও জল চাহিতে আরম্ভ করে, নবজীবনসঞ্চারের চিহ্নসকল ক্রমে ক্রমে দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা বিষের জ্বালায় অস্থির ও হতচেতন হইয়া উৎসব করিতে আসিয়াছি। আমি নিজের কথা বলিতেছি। বিষ বুনিয়া বুনিয়া চেতনহীন হইয়াছি। যদি চেতনা থাকে তাহাহইলে পরমেশ্বরের নাম গ্রহণ করিলেই পরিত্রাণ হইবে। তাঁর নাম লইলে পরিত্রাণ পাইব এ তো সহজ কথা, কিন্তু নাম যে লইবে অগ্রে তাহার চেতনা লাভ করা ত আবশ্যক? নিদ্রিত আত্মাকে জাগ্রৎ করিতে হইবে। ঘুম ভাঙ্গিলে পাখীর মুখে ভগবানের নাম শুনিয়া পরিত্রাণ হইতে পারে। কিন্তু বিষজাত এ নিদ্রা ভাঙ্গে কিসে? সুচিকিৎসক কঠিনরোগাক্রান্ত রোগীর শোণিতে মহৌষধ মিশাইয়া দিলে যেমন তাহার শারীরিক প্রণালীসকল উন্মুক্ত হয়, ধর্ম্মজগতেও সেইরূপ ঘটনা ঘটে। ধর্ম্মজগতেও সেরূপ রোগী রহিয়াছে কিন্তু তাহার পক্ষে মহৌষধ কি, এবং সে ঔষধ দিবে কে? মানুষের হাতে সে মহৌষধ নাই, ব্রহ্মকৃপারূপ কবিরাজই সে ঔষধ দিতে পারেন, যে ঔষধ সেবনে অবশ আত্মা চেতনা লাভ করে। আমাদের আত্মা মরে নাই, নিদ্রিত আছে, কিসে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইবে? আমাদের স্মৃতিই আত্মার শোণিত,স্মৃতি লোপ কর,আত্মা বিলুপ্ত হইবে। স্মৃতি না থাকিলে আত্মা আছে কে বলিল? আমি গত কল্য ছিলাম কে বলিল? আত্মার স্মৃতিস্বরূপ এই শোণিতের মধ্যে যখন ব্রহ্মকৃপা ব্রহ্মনামরূপ মহৌষধ ঢালিয়া দেন, তখন নিদ্রিত আত্মা জাগ্রৎ হইয়া উঠে। ব্রহ্মকৃপাবলে ঔষধ শোণিতে লাগিবা মাত্র প্রাণ মন হৃদয় জাগ্রৎ ও প্রফুল্ল হয়, আধ্যাত্মিক চক্ষু কর্ণ নাসিকা খুলিয়া যায়, অধ্যাত্ম রাজ্য দেখিবার উপায় হয়। মুক্ত অধ্যাত্ম ইন্দ্রিয়গণ ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দর্শন স্পর্শ ও শ্রবণ করে,তাহাদের নিকট জগৎ ঈশ্বরময় হয়। ইহাই উৎসবের ভাব। যখন প্রাণ খুলিয়া যায় এবং স্মৃতির মধ্যে ব্রহ্মনাম প্রবেশ করিয়া মনকে জাগ্রত করে তখন নিত্য উৎসব আরম্ভ হয়। আমরা বিষ বপন করি, ভগবান্ অমৃত বপন করেন। তাঁহার কৃপামৃত যখন আমরা লাভ করি তখন জীবিত লোকের মত বলি, পরমেশ্বর সর্ব্বত্র প্রকাশিত। ব্রহ্মকৃপার উপর নির্ভর না করিলে শত যুগ তপস্যা করিলেও কিছু হইবে না; ধর্ম্মভাব বিদ্যা জ্ঞানের অভিমানে কিছুই হইবে না। ধর্ম্ম জীবনে ব্রহ্মকৃপা ভিন্ন ব্রহ্ম দর্শন মিলেনা। যিনি আপনার উপর নির্ভর করেন তিনি বিনাশ প্রাপ্ত হন এবং বিষ বপন করেন। ব্রাহ্মসমাজ ইহার সাক্ষ্য দিন।

ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং
পাশনাশহেতুরেষঃ নতু বিচার বাগ্বলং।

আমরা কাঙ্গাল, প্রতীক্ষা করিয়া আছি কখন ব্রহ্ম প্রাণে কৃপাবপন করিবেন। ব্রহ্মকৃপামৃতের উপর নির্ভর করিয়া উৎসব কর, শান্তিতে প্রাণ পরিপূর্ণ হইবে।

এই দিবস সায়ংকালে ছাত্র সমাজের উৎসব হয়। প্রথমে সঙ্গীত হইলে পর বাৎসরিক কার্য্য বিবরণ পঠিত হইল। তৎপরে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কতকগুলি ছাপান কার্ড বিতরিত হয়। উহাতে ইংরাজী ভাষায় নিম্নলিখিত কথাগুলি মুদ্রিত ছিল;—

ছাত্র সমাজ।

উৎসবোপহার।

ছাত্রগণ, ভ্রাতৃগণ,

১। ঈশ্বরকে জানিতে চেষ্টাকর; কারণ, তাঁহাকে জানিলে তোমাদের পার্থিব জ্ঞান স্বর্গীয় জ্ঞান দ্বারা অলঙ্কৃত হইবে।

২। প্রাত্যহিক উপাসনা অভ্যাস কর; কারণ, উপাসনাই আত্মার অন্নপান।

৩। সৎকার্য্য করিতে ও অসৎকার্য্য পরিত্যাগ করিতে কখনও ভীত হইও না; কারণ, বিবেকের আদেশ প্রতিপালন করাতেই মানুষের প্রকৃত মহত্ত্ব।

৪। যাহা কিছু শরীর মনকে কলুষিত করে তাহা সর্ব্ব প্রযত্নে পরিত্যাগ করিবে। নারীগণকে পবিত্রতার মন্দিররূপে এবং পবিত্রতাকে মনুষ্যত্বের সাররূপে ভাবিবে।

৫। সর্ব্ববিষয়ে মিতাচারী হইবে; কারণ, আত্মশাসনই আধ্যাত্মিক বলের পরিচায়ক।

৬। চরিত্রে ও জীবনে, জ্ঞান ও বিশ্বাস, বিবেক ও ভক্তি আত্মচেষ্টা ও ঈশ্বরের উপর নির্ভর, প্রেম ও পবিত্রতা, এবং বৈরাগ্য ও জগতের প্রতি প্রেমের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবে।

কার্ড বিতরণের পর উপাসনা আরম্ভ হইল। শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র আরাধনা করিলেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত

শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় কার্ডে যে কয়েকটী কথা মুদ্রিত হইয়াছিল তাহা অবলম্বন করিয়া ছাত্রদিগকে কিঞ্চিৎ উপদেশ দেন। অবশেষে প্রার্থনা ও সঙ্গীত হইয়া চতুর্থ দিবসের কার্য্য শেষ হয়।

৮ই মাঘ, শনিবার।

এই দিবস প্রাতঃকালে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ব্রাহ্মিকা সমাজের উৎসব উপলক্ষে উপাসনা করেন ও উপদেশ দেন। প্রায় ২০০ ব্রাহ্মিকা ও হিন্দু মহিলা উপস্থিত ছিলেন। উপদেশের সারাংশ নিয়ে দেওয়া গেল;—

আমাদের দেশীয় প্রাচীন মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারতে তিনটী বিভিন্ন প্রকারের চরিত্র প্রকটিত হইয়াছে;—(১) রাবণ, (২) কৃষ্ণ, (৩) রাম। রাবণকে রাক্ষস বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কৃষ্ণ একজন রাজনীতিবিশারদ লোক, কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধের সহিত ইনি বিশেষভাবে সংসৃষ্ট ছিলেন। তিনি অত্যন্ত কূটনীতিপরায়ণ, বুদ্ধিমান্ ও দূরদর্শী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। রাবণের চরিত্রে যেরূপ পাশব বলের প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়, কৃষ্ণের চরিত্রে সেইরূপ মানসিক বল ও বুদ্ধি চাতুর্য্যের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। কৃষ্ণের সময়ে বুদ্ধিমত্তারই সম্যক্ আদর ছিল। কিন্তু রামের চরিত্র আধ্যাত্মিকভাবপ্রধান। কুরুপাণ্ডবদিগের ন্যায় তিনিও সৈন্য সামন্ত লইয়া সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে যুদ্ধ সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের। তিনি কর্ত্তব্যের অনুরোধে, তাঁহার মহিষীর ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধ করিয়াছিলেন। রামের সময়ে আধ্যাত্মিকতাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। এই তিন জন বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের মধ্যে কে নারীগণের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতেন তাহা অনুধাবন করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, পশু প্রকৃতি বিশিষ্ট রাবণ আদর্শ রমণী সীতাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া গিয়া তাঁহাকে তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজের বশে আনিবার চেষ্টা করিয়াছিল। এরূপ ব্যবহার অসভ্যাবস্থার, পশু ভাবের আধিপত্যের অবস্থারই উপযোগী। জ্ঞানপ্রধান যুগের আদর্শপুরুষ কৃষ্ণ স্ত্রীলোকদিগকে ক্রীড়া-সামগ্রীর ন্যায় ভাবিতেন—তিনি তাহাদিগকে ভাল বাসিতেন, আদর করিতেন, তাহাদিগকে লইয়া আমোদ করিতেন—কিন্তু তাহাদিগকে সম্মান করিতে জানিতেন না। ইহা বর্ত্তমান জ্ঞান প্রধান যুগের অনুযায়ী ভাব। কিন্তু রামের চরিত্রে এ সম্বন্ধে কত প্রভেদ দেখ। সীতা তাঁহার সহধর্ম্মিণী। সীতার অনুপস্থিতিতে অন্ততঃ তাঁহার স্বর্ণনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি নিকটে না রাখিলে তাঁহার ধর্ম্ম সাধন হয় না! আধ্যাত্মিক উন্নতির ইহাই মূলমন্ত্র। মানুষ আধ্যাত্মিকতাতে যতই উন্নত হইতে থাকিবে, ততই বুঝিতে পারিবে যে নারীগণ আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রধান সহায়। ব্যক্তিগত বিশেষ অবস্থা ছাড়িয়া দিয়া সমস্ত মানবজাতির কথা সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে বলা যায় যে, কি ঈশ্বর প্রীতি কি তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন, নারীগণ অংশভাগিনী না হইলে ইহার কোনটীই পূর্ণভাবে চলিতে পারে না। এখন যেরূপ সকল প্রকার মহৎ কার্য্য হইতে স্ত্রীলোকদিগকে দূরে রাখা হয়, মানবজাতির আধ্যাত্মিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এভাব নিশ্চয় চলিয়া যাইবে। কেবল তাহাই নহে, আমার বিশ্বাস এই যে, কিয়ৎকালের জন্য প্রাচীন ভাবের বিপর্য্যয় হওয়া অত্যাবশ্যক। তোমরা এতদিন শুনিয়া আসিয়াছ যে স্ত্রীলোক সকল বিষয়ে পুরুষের অনুগামিনী হইবে, এবং নারীগণ যে দুরবস্থার কূপে পতিত হইয়াছে পুরুষেরা তাহাদিগকে তাহা হইতে উদ্ধার করিবে। কিন্তু সভাজগৎ অচিরে সপ্রমাণ করিবে যে, স্ত্রীলোকের প্রতি শ্রদ্ধার অভাববশতঃ পুরুষেরাই দুরবস্থার কূপে পতিত হইয়াছে, এবং তাহাদিগকে সেই কূপ হইতে উদ্ধার করিবার ভার স্ত্রীলোকদের উপর। ইংলণ্ড ও আমেরিকার দিকে চাহিয়া দেখ সেখানে নারীগণ পুরুষদিগকে পানদোষ ও অপবিত্রতার কূপ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। ভারত কন্যাগণ! তোমাদের সমক্ষেও তদনুরূপ মহাব্রত রহিয়াছে। কিন্তু হায়! সেদিন আসিতে এখনও কত বিলম্ব রহিয়াছে! অগ্রসর হও, ব্রাহ্মসমাজ তোমাদের জন্য দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছেন। এমন সুবিধা ছাড়িও না, দেখিবে সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর স্বয়ং তোমাদের জীবনের এই নবকার্য্যকারিতার পথে তোমাদিগকে লইয়া যাইবেন। ঈশ্বরপ্রীতিরূপ উজ্জ্বল রত্নদ্বারা ও পবিত্রতা রূপ স্বর্গীয় আলোক দ্বারা হৃদয় মন বিভূষিত কর। তোমরা এখনও জান না তোমাদের জন্য কত সৌভাগ্য সঞ্চিত রহিয়াছে। ঈশ্বর প্রীতিতে প্রাণ মন ঢালিয়া দিয়া সেই সৌভাগ্যের উপযুক্ত হও।

মধ্যাহ্নে বঙ্গ মহিলাসমাজের অধিবেশন হয়। ঐ সভায় কুমারী লাবণ্যপ্রভা বসু মিস্ উইলার্ডের কার্য্য সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং ডাক্তার মোহিনীমোহন বসুর সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা বসু অপরের রচনা হইতে কতকগুলি উদ্ধৃত অংশ পাঠ করেন। তৎপরে বঙ্গমহিলা সমাজের বর্ত্তমান দুরবস্থা সম্বন্ধে কিয়ৎকাল কথোপকথন হইয়া সভাভঙ্গ হয়।

সন্ধ্যা ৭টার সময় উপাসনা মন্দিরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশন হয়। তাহার কার্য্য বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে।

৯ই মাঘ রবিবার।

এই দিবস প্রাতঃকাল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কলিকাতাস্থ উপাসকমণ্ডলীর উৎসবের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। প্রথমতঃ সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন হইলে পর বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র উপাসনার কার্য্য আরম্ভ করেন। কিন্তু উদ্বোধনের সময় তাঁহার হৃদয় এমন এক ভাবস্রোতে পূর্ণ হইয়া গেল যে, তিনি কোনও মতেই সেই উচ্ছসিত ভাবের আবেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। এবং "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" প্রভৃতি আরাধনার সূত্র উচ্চারণের পর উপাসক মণ্ডলীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন যে, তিনি উপাসনা করিতে সম্পূর্ণ অপারগ এবং এই কথা বলিয়াই বেদী হইতে নামিয়া আসিলেন। উপাসকগণ এতক্ষণ কোনও রূপে আপনাদের হৃদয়স্থ ভাবের বেগ সম্বরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণকুমার বাবুর কথা শুনিয়া আর তাঁহারা চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। চতুর্দ্দিক্ হইতে একেবারে

প্রার্থনা সঙ্গীত ও অস্ফুট রোদনধ্বনি উত্থিত হইয়া উপাসনা-মন্দির পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিল। চারিদিকে যেন ভাবের তুফান বহিতে লাগিল। সে অপূর্ব্ব দৃশ্য যথাযথ বর্ণন করা লেখনীর অসাধ্য। দয়াময়ের কৃপা কখন যে কি ভাবে প্রকাশিত হয় কিছুই বলা যায় না। তাঁহার কৃপায় এই দিন কত শুষ্ক হৃদয় সরস হইয়াছিল! কত পাষাণ ভেদ করিয়া প্রেমভক্তির প্রস্রবণ প্রবাহিত হইয়াছিল! কত পাপীর প্রাণ অনুতাপের অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইয়াছিল! বাস্তবিক তাঁহার কৃপায় পাষাণও দ্রবীভূত হয়, অসম্ভব সম্ভব হয়। প্রায় দুই ঘণ্টার অধিককাল এই ভাবে কাটাইয়া উপাসকগণ স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

অপরাহ্ন প্রায় চারি ঘটিকার সময় সঙ্গত সভার উৎসব হয়। প্রথমতঃ সঙ্গীত হইলে পর বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস সময়োচিত একটী প্রার্থনা করেন। তৎপরে বাৎসরিক কার্য্য বিবরণ পঠিত হয়। বাবু আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় একটী প্রবন্ধ পাঠ করিবেন বলিয়া কথা ছিল। কিন্তু তিনি সমাজ সংক্রান্ত অন্যান্য কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় কোনও নূতন প্রবন্ধ লিখিয়া উঠিতে পারেন নাই এবং সাংসারিক ব্যাঘাত নিবন্ধন সঙ্গতের উৎসবেও আসিতে পারেন নাই। এই জন্য তাঁহার অনুরোধে বাবু ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় আদিত্য বাবুর লিখিত "ব্রহ্মকৃপা" শীর্ষক একটী পূর্ব্ব প্রকাশিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। ইহার ভিন্ন ভিন্ন অংশ ইতি পূর্ব্বে তত্ত্বকৌমুদীতে মুদ্রিত হইয়াছে এবং পরে উহা একত্রিত আকারে "জীবন্ত ও মৃত ধর্ম্ম" নামক পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। এই জন্য আমরা এস্থলে উক্ত প্রবন্ধের সারাংশ মুদ্রিত করা আবশ্যক মনে করিলাম না। প্রবন্ধ পাঠের পর বাবু কেদানাথ রায় ধর্ম্মজীবনের জোয়ার ভাঁটা সম্বন্ধে কথা উত্থাপন করেন। বাবু ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়, বাবু জগদীশ্বর গুপ্ত, ডাক্তার পি, কে, রায়, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এবং আরও কেহ কেহ এই কথাবার্ত্তায় যোগ দিয়াছিলেন।

সায়ংকালে সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত উপাসনার কার্য্য করেন ও উপদেশ দেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের ভাব নিম্নে দেওয়া গেল ;—

ধর্ম্ম জগতে আশ্চর্য্য লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়া থাকে। একটী লোক প্রতিদিন স্বহস্তে নরহত্যা ও পরের ধন লুণ্ঠন করিয়া আপন পরিবারবর্গের জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। সে অতিশয় নিষ্ঠুর, নির্ম্মম ও হৃদয়বিহীন ছিল; কখনও নিরাশ্রয় পথিকের কাতর ক্রন্দনে কর্ণ পাত করিত না; কিছুতেই তাহার মনে বিন্দু মাত্র প্রেম বা করুণার সঞ্চার হইত না। ঘোর নিষ্ঠুর সেই দস্যু দস্যুবৃত্তি দ্বারা পাপবৃত্তি দ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করিত। দেখি যে সেই ব্যক্তি ধর্ম্ম জগতে আসিয়া যে হস্তে হত্যা, লুণ্ঠন ও অশেষবিধ অসৎকার্য্য সম্পাদন করিয়াছিল, সেই হস্তে লেখনী ধরিয়া জীবন্ত প্রেমতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, মুক্তিতত্ত্ব, পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃ প্রেম, আদর্শসতীত্ব প্রচার করিল, নিতান্ত নিষ্ঠুর যে প্রাণ তাহাতে কোমলতা প্রকাশ পাইল, প্রেমোচ্ছ্বাস-বশতঃ কি এক মহাভাব তাহার মহাপ্রাণের সহিত মিলিত হইল যে, তাহার প্রভাবে ভারতের প্রত্যেক পরিবার প্রেমে প্লাবিত ও জগৎ প্রেমাদর্শে পূর্ণ হইয়া গেল। ব্যস্ত হইয়া সে ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলাম 'তুমি এখানে কেন?' তাঁহার মুখে এই উত্তর শুনিলাম, "আর কি আমার সে দিন আছে? কৃপাময়ের কৃপায় এরূপ হইয়াছে। কিরূপে এরূপ হইল জানি না।" নর শোণিত-কলঙ্কিত হস্ত এখন প্রেম বিস্তারে ব্যস্ত! সংসার যাহাতে প্রেমে নিমগ্ন হইতে পারে সেই জন্য সেই নিষ্ঠুর হৃদয় লালায়িত! কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! তিনি বলিলেন, "শুভক্ষণে সাধুসমাগম হইয়াছিল। কৃপা করিয়া তারক ব্রহ্ম নাম তিনি পাপীর কর্ণে শুনাইয়াছিলেন। সেই নাম হইতে তাড়িত সঞ্চারিত হইয়া প্রাণকে পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল! জানি না কিরূপে এরূপ ঘটিল। এরূপ অবস্থা যে ঘটিবে ইহা স্বপ্নের অগোচর ছিল। কোন পথে বেড়াইতেছিলাম কোথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি! কৃপাময়ের কৃপায় জীবনের গতি ফিরিয়াছে সেই জন্য আমি এখানে।"

আবার দেখিলাম সুরাসক্ত দুই ব্যক্তি জঘন্য বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবন কলঙ্কিত করিতেছিল। তাহাদের ভয়ে নগরের লোক শশব্যস্ত। তাহাদের দৌরাত্ম্যে সতীর সতীত্ব থাকে না, মানীর মান থাকে না, লোকের প্রাণ রক্ষা হয় না। সেই দুই ব্যক্তি এই প্রকার জঘন্য জীবনের পথে বিচরণ করিতে করিতে কোথা হইতে কোন্ পথ দিয়া ধর্ম্মরাজ্যে উপস্থিত হইল? দুর্দ্দান্ত অসুরের মত পথে পথে যাহারা লোকের বিভীষিকা উৎপাদন করিয়া বেড়াইত, ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিয়া দেখি তাহারা গলবস্ত্রে করযোড়ে লোকের নিকট এই বলিয়া ভিক্ষা করিতেছে, "আপনারা কৃপা করিয়া আপনাদের চরণ আমাদের মাথায় রাখুন, আমরা আপনাদের পদ ধৌত করিয়া জীবন সার্থক করি।" জিজ্ঞাসা করিলাম, 'জগাই মাধাই! তোমরা এখানে কেন?' গদগদস্বরে তাহারা বলিল, "কি বলিব? আর কি আমাদের সেদিন আছে? কৃপাময়ের কৃপায় জীবন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, সেদিন চলিয়া গিয়াছে। তাই এখানে এখন এই ভাবে দিন যাপন করিতেছি। কিরূপে এমন হইল জানি না। মদ্যপানে দুজনে অজ্ঞান ও অচেতন ছিলাম। যাঁহাদিগকে আঘাত করিয়াছিলাম, তাঁহারা ছুটিয়া আসিয়া প্রেমালিঙ্গন প্রদান করিলেন অমনি জীবন পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। কঠিন লৌহ স্পর্শমণি স্পর্শে কিরূপে সুবর্ণ হইয়া গেল বুঝিতে পারিলাম না। আপনাদের পাপাচার, কলঙ্ক ও ঘোর অপরাধ স্মরণ করি আর নিতান্ত পরিতাপে প্রাণ বিদীর্ণ হয়। উদ্ধারের আশায় সকলের চরণ তলে মস্তক রাখি। উহা ভিন্ন আমাদের মত ঘোর পাপীদিগের উদ্ধারের আর পথ দেখি না।" এই কথা তাহাদের কাছে শুনিলাম।

আর একস্থানে দেখিলাম দুই ভাই সম্পদে লালিত হইয়া স্বর্ণ পর্য্যঙ্কে আসীন ও স্রক্ চন্দনে ভূষিত হইয়া বিবিধবিলাসে মগ্ন রহিয়াছিলেন, তাঁহারা রাজ্যেশ্বরের প্রধান মন্ত্রী, তাঁহাদের অতুল ঐশ্বর্য্য। বিষয় কার্য্যে তাঁহারা সদাই ব্যস্ত, এরূপ অবকাশ নাই যে অন্য চিন্তা করেন, পৃথিবীর প্রভুর মন যোগাইবার জন্য সকল সময়েই ব্যস্ত। রৌদ্র নাই, বৃষ্টি নাই,

রাত্রি নাই, দিন নাই, সদাই পার্থিব প্রভুর সেবাতেই নিযুক্ত। ইহারা সম্পদ্ ঐশ্বর্য্যে দিন দিন উন্নত হইতেছিলেন এমন সময়ে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! দেখি না তাঁহারা অধ্যাত্মরাজ্যে বিচরণ করিতেছেন! ধর্ম্ম জগতে তাঁহাদিগকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম 'আপনারা এখানে?' তাঁহাদের মুখেও সেই উত্তর,—"কৃপাময়ের কৃপায় আর কি আমাদের সে দিন আছে? প্রকৃত প্রভু যিনি তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছে। ধন সম্পদকে চিরবিদায় দিয়া এবং সুখ বিলাস তুচ্ছ করিয়া ছিন্ন বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক সুখ বৃক্ষ তলে বসিয়া কি অনন্ত আনন্দ, সুখ ও সম্পদ সম্ভোগ করিতেছি তাহা আর কি বলিব? বিষপান করিতে আর প্রবৃত্তি নাই। ভক্তবৃন্দের সঙ্গে মিলিত হইয়া অমৃত পান করিতেছি। রিপু ও বিষয় সেবা হইতে বিভুর কৃপায় উদ্ধার হইয়া এখানে আসিয়াছি। সুদিন হইয়াছে তাই এখানে দেখিতেছ।"

যাহা বলিলাম ইহা কি কেবল কল্পনার কথা না সত্য ঘটনা? সেই চোর রত্নাকর আজি মহাপ্রেমিক বাল্মীকি। সেই ভয়ঙ্কর দুর্দ্দান্ত জগাই মাধাই আজি তৃণ অপেক্ষা হীন ও ধূলায় লুণ্ঠিতশির। সেই রূপসনাতন আজি উজিরী ত্যাগ করিয়া ফকিরী গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা জানি এসব কথা সত্য। কিন্তু এসব ঘটনার মধ্যে যে আশ্চর্য্য শক্তি লুক্কায়িত রহিয়াছে তাহা কি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি? লোকে উদাসীন ভাবে জিজ্ঞাসা করে ধর্ম্ম কি? তাহারা ধর্ম্ম লইয়া পরিহাস করে, এবং ধর্ম্মকে বাতুলের প্রলাপ বলে। যদি ধর্ম্মকে দেখিতে চান তবে কি এখানে দেখিবেন না? ধর্ম্ম একটী মহা সর্ব্ববিজয়ী শক্তি। এই শক্তিতে যাহা করিতে পারে আর কোন শক্তিতে তাহা পারে না। অন্য শক্তি যাহা পারে না ইহা তাহা পারে। অগ্নির শক্তি দেখিয়াছেন, অগ্নিতে কঠিন ভিন্ন প্রকারের ধাতু গলাইয়া এক করে। তাড়িতের শক্তি আপনারা দেখিয়াছেন। ভৌতিক জগতে উহার অলৌকিক শক্তি নিমেষে আশ্চর্য্য ক্রিয়া সম্পাদন এবং বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন সংঘটন করে। ধর্ম্মের শক্তি আরও অদ্ভুত, আরও আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সম্পাদন করে; তাহা ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ধর্ম্ম কি করেন? ধর্ম্ম চোরকে জগতের ধর্ম্মপ্রচারক, মহাজ্ঞানী, মহাপ্রেমিক মহর্ষি করেন, ঘোর রিপুদাস দুর্দ্দান্ত প্রকৃতি মানুষকে ফাঁদে ফেলিয়া পতঙ্গের মত করিয়া, লোকের পদানত ও ধূল্যবলুণ্ঠিতমস্তক করেন। আবার যাহারা ঘোর বিষয়ের উপাসক, বিলাসী ইন্দ্রিয়াসক্ত হইয়া ইহসংসারে বাস করিতেছিল, তাহারা যে অতুল বিষয় সম্পদ্ তুচ্ছ করিয়া ফকীর হইয়া মহানন্দে নৃত্য করে, তাহাও কেবল ধর্ম্মের শক্তিতে সংঘটিত হয়। কি আশ্চর্য্য! কে বলে ধর্ম্মদ্বারা অলৌকিক কার্য্য হয় না? ধর্ম্মের অলৌকিক শক্তি প্রমাণ করিবার জন্য লোকে সামান্য দৃষ্টান্ত দেখায়, লোকে দেখায় যে ধর্ম্মবলে সুরার কলস দুগ্ধকুম্ভ হয়, অথবা সুরা শোণিতে পরিবর্ত্তিত হয়। ইহা ত সামান্য কথা। হৃদয়, প্রকৃতি ও জীবনের পরিবর্ত্তনেই ধর্ম্মের অলৌকিক শক্তির প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। ধর্ম্ম জীবনের গতি ফিরাইয়া দেয়—পাপের দিকে প্রাণের গতি ছিল, বিষয়ে পাপে চক্ষু আবদ্ধ ছিল, ধর্ম্ম আসিয়া বীরবলে পাপীর মস্তক ঘুরাইয়া ও চক্ষু ফিরাইয়া দিল। সংসারের দিকে চিরকালের জন্য সে পশ্চাৎ ফিরিয়া রহিল। যাহা সে কখন দেখে নাই, শুনে নাই, কল্পনা করে নাই তাহাই দেখিল। আশ্চর্য্য দৃশ্য! ধর্ম্মের নিকট অসম্ভব সম্ভব হয়। ঘোর পাপী, ইন্দ্রিয়দাস, বিলাসাসক্ত ও চিরকালের জন্য আবদ্ধকর হইয়া আছ? ভাবিও না, ধর্ম্মবল অতিক্রম করিতে পারিবে। ধর্ম্ম যখন ধরিবে, ধর্ম্ম যখন আক্রমণ করিবে তখন তুমি নিশ্চয়ই পরাজিত হইবে। তখন এখন যাহারা তোমার প্রভু, তাহাদিগকে চিরদিনের মত ছাড়িয়া দিতে হইবে। ঈশ্বর ধরিলে, জীবন্ত ধর্ম্ম আক্রমণ করিলে কাহারও সাধ্য নাই, শক্তি নাই যে ধরিয়া রাখে বা ছাড়াইয়া লয়। কাহারও সাধ্য নাই যে ধর্ম্মকে পরিহাস, উপহাস ও বিদ্রূপ করিয়া উড়াইয়া দিবে। ধর্ম্ম কথার কথা নহে, অলৌকিক শক্তি। সে অলৌকিক কার্য্য করিয়াছে, চিরকাল করিবে। ধর্ম্মের ইতিহাস দেখ, পাঠ কর বিশ্বাসের অসংখ্য প্রমাণ, মুখের কথায় নহে, ভক্ত জীবনে দেখিতে পাইবে। ভক্তবৃন্দ চিরদিনই নিজজীবনে ধর্ম্মের জীবন্ত শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। ধর্ম্ম যদি প্রাণে স্থান পায়, আশ্চর্য্য কার্য্য সকল সম্পাদিত হয়। এই ধর্ম্ম স্বয়ং ঈশ্বরের শক্তি। এই ধর্ম্ম মানুষের প্রাণে আছে, প্রত্যেকের প্রাণে লুক্কায়িত আছে, এবং প্রত্যেকের প্রাণে প্রকাশিত ও প্রস্ফুটিত হইতে পারে। সেই শক্তিবলে ঈশ্বরাদর্শে প্রত্যেক নরনারী গঠিত হইতে পারেন। বট বীজে যেমন ভাবী বট বৃক্ষ লুক্কায়িত, এই নীচ ক্ষুদ্র অধম জীবনে তেমনই দেবজীবন লুক্কায়িত। ভাই ভগিনীগণ! ছদ্মবেশ ধরিয়া আর কতদিন থাকিবে? এ যে তোমাদের ছদ্মবেশ। এই যে বল যে ব্যস্ত হয়ে থাক, দিবারাত্রি খাট, অবকাশ নাই কখন নির্জ্জন চিন্তা, কখন উপাসনা করিবে,—এ সকল ছাড়িয়া দেও। ভগিনি, তুমি যে বল, গৃহ কার্য্যে, সুখ বিলাসে, সন্তান পালনে তুমি এত ব্যস্ত যে তুমি ঈশ্বরকে ডাকিবার সময় পাও না; ভাই, তুমি বাণিজ্য চালাইবে, ধনমান সুখ সম্পদ উপার্জ্জন করিবে, আপীসে যাইবে বলিয়া বল যে সময় পাওনা,—ওসকল কথা ছাড়িয়া দাও। উহা কপট কথা—ছদ্মবেশ মাত্র। তোমরা আপনাদিগকে চিনিতেছ না, তাই প্রাণের কথা মুখ হইতে বাহির হইতেছে না। আপনার প্রতি চেয়ে দেখ, তোমরা কি কেবল শরীর? তোমাদের কার্য্য কি কেবল কোলাহল করা, ব্যস্ত হইয়া সংসারের তুচ্ছ বস্তু লইয়া ক্রীড়া করা? ওসকল বাল্যকালে শোভা পাইত, চিরকাল শোভা পাইবে কেন? বাল্যক্রীড়া ছাড়, ছদ্মবেশ ছাড়! আর সময় নাই, কপট কথা ছাড়। কিসের জন্য ব্যস্ত? কে ঘুরাইতেছে? মোহশক্তি, ইন্দ্রিয়াসক্তি পাপাসক্তির চক্রে ঘুরিয়া মরিতেছ। মুখ ফিরাইয়া দেও, সংসার ও বিষয়ের দিকে পশ্চাৎ কর; যিনি প্রাণদাতা, অনন্ত সুখের আকর তাঁর দিকে দৃষ্টি কর। কার সহায়তায় করিবে? নিজের শক্তিতে

কি পারিবে? আমরা দুর্ব্বল, সংসারাসক্ত, রিপুর আক্রমণে পদে পদে পরাস্ত ইহা সকলে জানে, বাহিরের লোকেও জানে। সকল শক্তি যাঁর, অনন্ত শক্তিমান্ সেই পরমেশ্বরের যদি শরণাপন্ন হই, সকল আক্রমণকারী পরাস্ত হইবে, তিনি বলবান্ তাঁহার শরণ লইলে দুর্জ্জয় বলে আমরা বলী হইব। তিনিই ধর্ম্মবল। তিনি যদি ধরেন, কার সাধ্য আমাদের নিকট আসে? ভয়ে সব সঙ্কুচিত হইয়া পলায়ন করিবে। বিষয়াসক্তি, সংসারের সমস্ত শক্তি তাঁহার নিকট পরাস্ত হইবে। তাঁহার শক্তি দ্বারাই যুগে যুগে ধর্ম্ম জগতে অলৌকিক কার্য্য সকল সাধিত এবং পাপীর পরিত্রাণ ও উদ্ধার সম্পাদিত হইতেছে। এসকল ছদ্মবেশ ত্যাগ কর। বাহিরের কোলাহল ও ব্যস্ততা চিরদিনের জন্ত পরিত্যাগ কর। অসার সংসার ভাবনা ভাবিয়া ও স্বার্থসাধন করিয়া চব্বিশ ঘণ্টা ক্ষেপণ করত ভস্মে ঘৃত ঢালিলে কি হইবে? কিসের জন্ত চব্বিশ ঘণ্টা দিব? কিসের জন্ত চব্বিশ ঘণ্টা দিলে পোষাইবে? অমূল্য সময়, অমূল্য জীবন সম্পূর্ণ রূপে প্রভুর চরণে সমর্পণ করি—তাঁর চরণে এ প্রাণ ঢালিয়া দিই, তাহা হইলে তাঁহার মহাপ্রাণের সহিত আমাদের ক্ষুদ্র প্রাণ সংযুক্ত হইয়া অনন্ত সুখ সম্পদ লাভ করিয়া চিরদিনের মত কৃতার্থ হইবে। তাঁহার শক্তি অদ্ভুত, তাঁহার কার্য্য অলৌকিক; তাঁহার শরণাপন্ন হইলে সকল আশা পূর্ণ হইবে।

১০ই মাঘ সোমবার।

এই দিবস বাবু নবদ্বীপ চন্দ্র দাস প্রাতঃকালীন উপাসনার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন ও উপদেশ দেন। উপদেশের সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল;—

ধন উপার্জ্জন করা সহজ কিন্তু রক্ষা করা কঠিন। ধন অনেক প্রকারে পাওয়া যায়। অনেক পরিশ্রম করিয়া ধন উপার্জ্জন করিতে হয়, আবার বিনাশ্রমেও সময়ে সময়ে ধন লাভ হয়। উত্তরাধিকার সূত্রে পৈতৃক বা মাতামহত্যক্ত সম্পত্তি পাওয়া যায়। পথে ঘাটেও অনেকে অনেক ধন পাইয়া থাকে। কিন্তু ধনের সদ্ব্যবহার করা বা ধন রক্ষা করা বড় কঠিন ব্যাপার।

ধনী লোকের ছেলে পিতার অনেক ধন পায়। কিন্তু ধনের সদ্ব্যবহার জানে না, ধন রক্ষা করিতে জানে না বলিয়া অল্প সময়ের মধ্যে সে গরিব হইয়া পড়ে। ধনের অসদ্ব্যবহার করে বলিয়া তাহার ধন ক্ষয় পায়। দুর্দ্দিনে তাহার খাইবার কিছু থাকে না। সে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। যদি ধন রক্ষা করিতে পারিত তাহা হইলে সে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিত, পৃথিবীর দুর্দ্দিনে তাহাকে ক্লেশ পাইতে হইত না, সৎকার্য্য করিয়া সে আপন জীবন কৃতার্থ ও ধন্ত করিতে পারিত। ধন রক্ষা করিতে জানেনা বলিয়া সে ব্যক্তি নানা দুষ্কার্য্যে রত হয়, বাবুগিরি, বিলাসিতা ও অযথা ব্যয় করিয়া ফকীর হইয়া পড়ে।

সংসারে অনেক সময় দেখা যায় যে একজন বহুশ্রমে অর্থ উপার্জ্জন করিল, মিতব্যয় দ্বারা সেই অর্থ রক্ষা করিল, নিজে ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়া গরিবকে কাপড় দিল, সৎকার্য্য করিয়া সুখস্বচ্ছন্দে রহিল। আর একজন অনায়াসে অর্থ পাইয়া কাপড় ছিঁড়িতে না ছিঁড়িতে তাহা ফেলিয়া দিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করিতে লাগিল ও নানা মন্দ কার্য্যে রত হইয়া ফকীর হইয়া পড়িল।

ধর্ম্মজগতে সেইরূপ সাধুজীবনে দেখা যায় যে তাঁহারা পিতৃ উপার্জ্জিত অর্থ রক্ষা করেন, কদাচ তাঁহারা আধ্যাত্মিক ধনের অপব্যবহার করেন না। তাঁহারা ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত মুক্তা বানরের ন্তায় ফেলিয়া দেন না। দুঃখের দিনে তাঁহারা সেই ধন দিয়া জীবন রক্ষা করেন। মহাপাপী ছিলেন, অযাচিত অনেক ধন পাইলেন, পাইয়া যত্নের সহিত তাহা রক্ষা করিলেন; অভ্যস্ত পাপ হইতে রক্ষা পাইলেন, পাপাসক্তি দূর হইয়া গেল, তাঁহাদের চিত্ত নির্ম্মল হইল। অযাচিত পৈতৃক সম্পত্তিদ্বারা তাঁহারা আপনাদিগকে এই রূপে রক্ষা করিলেন।

আমরা পরিশ্রম করিয়া অথবা অযাচিত ভাবে ঈশ্বরের নিকট হইতে কতই ধন লাভ করি। এই যে আমরা নিত্য উপাসনা করি, সপ্তাহে সপ্তাহে, মাসে মাসে ও বৎসরে বৎসরে সমাজে আসি, যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে 'ঈশ্বর হইতে কোনও ধন পাইয়াছ কি?' তাহা হইলে কেহ্না বলিবেন যে তিনি নিশ্চয়ই কিছু পাইয়াছেন। কেন তবে আমরা হীন লোকের মত হায় হায় করি?

যে সব ধন আমরা পাইয়াছি তাহা যদি একটী ঘরে রাখি তবে সে ঘর পূর্ণ হইয়া যায়। প্রাপ্ত ধন যদি সঞ্চয় করিতে জানিতাম তাহা হইলে প্রাণ এত দিনে একটী প্রকাণ্ড ধন ভাণ্ডার হইত। আমরা ধন রাখিতে জানি না, কি পরিশ্রম লব্ধ কি অনায়াস লব্ধ সকল প্রকার ধন বানরের ন্তায় ছড়াইয়া ফেলি, তাই আমাদের এত দুর্দ্দশা। ধন রক্ষা করিতে জানিলে আমাদের অবস্থা এরূপ মলিন হইত না।

মহোৎসবের দ্বারে আমরা উপস্থিত। অনেক অমূল্য ধন ইতি পূর্ব্বে পাইয়াছি, আগামী কল্য আরও অনেক পাইব। যে পরিশ্রম করিয়াছে সেও পাইবে, যে দেখিতে আসিবে সেও পাইবে, কেহই বঞ্চিত হইবে না। যাহারা কাতর হইয়া ডাকিবে তাহারা পাইবে, যাহারা কেবল দেখিতে আসিবে, ঈশ্বরের ধ্বনি যাহারা শুনে নাই তাহারাও পাইবে। সবাই ধন পাইবে সন্দেহ নাই। বৎসর বৎসর যেমন পাই সেইরূপ বা তদধিক পাইব, এবং তাহা লাভ করিয়া দিন দিন উন্নত হইতে ও ঈশ্বরের নিকট যাইতে যত্ন করিব।

ঈশ্বর অমূল্য সম্পত্তি দিবেন আমি কি কিছু রাখিতে পারিব না? পিতা যাহা দিবেন কি করিয়া রক্ষা করিব আমি তাহাই চিন্তা করিতেছি। আপনাদিগকে বলিতেছি আপনারাও চিন্তা করুন।

অনেক পাইয়াও যাহাতে ফকীর কাঙ্গালের মত পথে ঘাটে মানুষের কাছে ছুটাছুটি না করিতে হয়, যাহা পাইলাম তাহা যাহাতে রক্ষা করিতে পারি এবং আরও অধিক ধন ভবিষ্যতে যাহাতে লাভ করিতে পারি তাহার জন্ত সচেষ্ট হইতে হইবে। সাধুরা যখন অমূল্য ধন পান অথবা তাহার

আভাস মাত্র পান, তখন আরও অধিক পাইবার জন্য তাঁহাদের প্রাণ মন আকুল ও লালায়িত হয়। আমাদের ব্যবহার ঠিক্ তাহার বিপরীত। উৎসবের পর আরও অধিক পাইবার জন্য আমাদের ব্যাকুলতা ও লালসা থাকে না, বরং যাহা পাইয়াছিলাম তাহা হারাইয়া ফেলি।

সাধুরা যদি ধন পান, গর্ব্বিত হন না; দীন, ব্যাকুল, অকিঞ্চন হইয়া থাকেন। আমরা ত কিছুই নহি। আমাদের ভিতরে যাহা কিছু, সব পিতা দেন। তাহার উপর আমরা আবার লব্ধ ধনের যত্ন করিতে পারি না। আমাদের ভিতর তবে গর্ব্ব কেন? দুই টাকা পাইলে প্রাণ স্ফীত হয়, দুই পাতা পড়িয়া মনে করি জ্ঞানী হইয়াছি, একটু চোখের জল পড়িল, অমনি মনে করি খুব ভাব হইয়াছে। তাই আমাদের এত দুর্দ্দশা, তাই আমরা প্রাপ্ত ধন হারাই। আমরা পাইয়াছি কি? অপদার্থ আমরা, পিতা দয়া করিয়া যাহা দিয়াছেন, তাহার জন্য গর্ব্ব করিব কেন? মন যাহাতে নীচু হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। নীচু স্থান ভিন্ন জল দাঁড়াইতে পারে না।

সাধুরা যে ধন পান, তাহা রক্ষা করিতে প্রাণপণ করেন। কেবল যে রক্ষা করেন তাহা নহে, আবার ঘরে ঘরে বিতরণ করেন। আমরা বিতরণ করা দূরে থাকুক, রক্ষা করিতে পারি না। ধন রক্ষার জন্য আমাদিগকে প্রাণ দিতে হইবে। স্বার্থপর হইয়া ধন সম্ভোগ করিলে হইবে না। ধন ঘরে ঘরে বিতরণ করিলে ধন বৃদ্ধি পায়। ধর্ম্মরাজ্যে ধন বৃদ্ধির এই আশ্চর্য্য নিয়ম। আমরা যাহা পাই, স্বার্থপর হইয়া নিজে সম্ভোগ করি বলিয়া তাহা বিনাশ পায়। প্রাপ্ত ধন ভাই ভগিনীকে বিলাও তবে ধন বৃদ্ধি পাইবে, রক্ষা পাইবে।

আমরা না রাখিতে পারি, না বিতরণ করি। আমরা যে পৈতৃক ধন পাই, আমরা তাহার যোগ্য নহি। আমাদের প্রাণ নীচু নহে, আমরা দীন অকিঞ্চন হইতে পারি না, সেই জন্য পিতার গৃহ হইতে বাহির হইতে না হইতে শত্রু আসিয়া আক্রমণ করে। কাঙ্গালের ধন বলিয়া কি আমরা শত্রুর সঙ্গে প্রাণপণে সংগ্রাম করি? আমরা পাইতে আসিয়াছি—দুদিন পরে আরও পাইব, এখনও পাইতেছি। লব্ধ ধন কত্ত ভাঙ্গাঘরে, গর্ব্বিত হৃদয়ে রাখিলে, তাহা হারাইয়া যাইবে, বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।

একটু ভাব না হইতে হইতে আলোচনা করিয়া ভাব উড়াইয়া দেন কেন? ভাব রক্ষা করুন। তর্ক করেন কেন? এক জনের হইলে চারি জনে বলিয়া, প্রশংসা করিয়া গর্ব্ব বাড়ান কেন? ভিতরে ভিতরে বলিবেন, বাহিরে কৃতজ্ঞ হইবার আবশ্যকতা নাই। একটু না বলিতে বলিতে প্রাণ ফুলিয়া উঠে, আলোচনার স্রোতে পড়িয়া সব হারাইয়া যায়।

নীচু হইয়া, অকিঞ্চন হইয়া লব্ধ ধন রক্ষণে যত্নশীল হউন। স্বার্থপর না হইয়া ঘরে ঘরে সেই ধন, বিতরণ করিয়া জীবন ধন্য করুন।

এই দিবস অপরাহ্ণে নগর সংকীর্ত্তন হয়। পূর্ব্ব দিবস হইতেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল ও মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হইতেছিল। মধ্যাহ্নে আকাশ একটু পরিষ্কার হওয়াতে সকলে আশা করিয়াছিলেন যে নগর সংকীর্ত্তনকারীদিগকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে না। কিন্তু ক্রমে নভস্তল আবার মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল এবং যখন গোলদীঘিতে সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল তখন বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। তথাপি সংস্কৃত কালেজের দক্ষিণ দিকের বারাণ্ডার সম্মুখস্থ ভূমিতে প্রায় দুই তিন শত লোক সমবেত হইয়াছিল। ভাই লছমণ প্রসাদ উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দকে উদ্দেশ করিয়া হিন্দিতে একটী ক্ষুদ্র বক্তৃতা করিলে পর পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী সময়োচিত একটী প্রার্থনা করেন। তৎপরে সকলে উৎসাহের সহিত "প্রাণভরে, আজি গান কর, ভবে ত্রাণ পাবে আর নাহি ভয়।" এই নূতন সংকীর্ত্তন গান করিতে করিতে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের দিকে চলিলেন। ক্রমে নূতন লোকের আগমনে তাঁহাদের দল পুষ্ট হইতে লাগিল। মেঘ বৃষ্টি সত্ত্বেও অনেক ব্রাহ্ম মহিলা শকটারোহণে সংকীর্ত্তনকারীদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। বৃষ্টির জলে সংকীর্ত্তনকারীদিগের মস্তক ও গাত্রবস্ত্র অভিষিক্ত হইয়া গেল, পথের কর্দ্দমে চরণ কর্দ্দমাক্ত হইয়া গেল, তথাপি তাঁহাদের উৎসাহের বৃদ্ধি ব্যতীত হ্রাস হইতেছে না। এই ভাবে ব্রহ্ম নাম গান করিতে করিতে সকলে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট হইতে মাণিকতলা ষ্ট্রীট দিয়া কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে আসিয়া পড়িলেন। এবং সেখান হইতে দক্ষিণ দিকে ফিরিয়া সন্ধ্যার পরে সকলে উপাসনা মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সময়াভাবে এবার গায়কগণ সমস্ত সংকীর্ত্তনটী আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। কেবল "প্রাণভরে আজি গান কর" ইত্যাদি চরণটীই গান করা হইয়াছিল। সমস্ত সংকীর্ত্তনটী নিম্নে দেওয়া গেল;—

তাল—ধামাল।

(তোরা) আয়রে ভাই থাকিস্‌নে আর মোহেতে ভুলে।
পুণ্যময়ের পুণ্যরাজ্য এলো রে দেখ্ ভূমণ্ডলে।
(ওরে নগরবাসী!)
প্রচারি', আশার বাণী ডাকেন সকলে,
পাপিগণে কৃপাগুণে তারিবেন বলে,
শুন সে মধুর ধ্বনি স্বর্গে মর্ত্ত্যে ওই উথলে। (ওরে শোনরে ভাই)

তাল—খয়রা।

শুন শুন বাণী। (আজ শ্রবণ পেতে)
(আজ বধির হয়ে থেকনা রে)
দাঁড়ায়ে হৃদয়দ্বারে, ডাকিছেন বারে বারে,
(বলে পাপী আয় ত্বরা করে)
(যদি) ত্রাণ পেতে চাও, প্রাণ তাঁরে দেও,
সে পদে লুটায়ে পড় অমনি। (গতি কর বলে)
বিষয় গরল পিয়ে, জুড়াবে না কভু হিয়ে,
সেই সুধারসে যেই জন মজে
তার যে ত্রিতাপ যায় তখনি। (চিরদিনের মত)
এ ছার হৃদয় দিলে, যদিরে সে ধন মিলে,
(তবে) সঁপি মন প্রাণে লভনা সে ধনে,
লভিলে জীবন পাবে এখনি। (সেই জীবন ধনে)

তাল—লোফা।

ভাইরে!—গভীর পাপের কালি ঘুচিবার নয়,
বিনা তাঁরি কৃপাবারি জানিও নিশ্চয়।

বিনা তাঁরি (পাপের কালি ঘোচে না ঘোচে না)
(ও তাঁরি কৃপা বিনা) কৃপাবারি জানিও নিশ্চয়।
ভাইরে!—দুস্তর ভব-জলধি কে করিবে পার,
বিনা সেই কৃপাসিন্ধু ভব-কর্ণধার?
বিনা সেই (সহায় কে আর আছে রে)
(ভব পারে নিতে) কৃপাসিন্ধু ভব-কর্ণধার?
ভাইরে!—মহামোহে পড়ে কেন ভজিলে অসার?
প্রাণ দিলে প্রাণ মিলে বুঝিলে না সার!
প্রাণ দিলে (পাপের জ্বালা থাকে না, থাকে না)
(পরাণ শীতল হয় রে) প্রাণ মিলে বুঝিলে না সার।
(কেন বুঝলে না রে) (মহামোহে পড়ে)

তাল—একতালা।

প্রাণভরে আজি গান কর, ভবে ত্রাণ পাবে আর নাহি ভয়।
ও ভাই শুন সমাচার, পাপীদের ভার,লয়েছেন আপনি দয়াময়;
(আর ভয় নাই রে)
প্রভুর প্রেম-রাজ্য,দেখ প্রকাশিল,তাঁহার করুণা নামিল ধরায়।
(চেয়ে দেখ দেখ রে)
এমন কৃপা ফেলে, ও ভাই দূরে গেলে, বল কোথা আর
জুড়াবে হৃদয়?
(এমন কিবা আছে)

তাল—একতালা।

আনন্দে গাইয়ে চল আর কিবা ভয় রে,
প্রেমময়ের প্রেমরাজ্য এসেছে ধরায় রে,
কে যেন হৃদয়ের মাঝে বলে পাপী আয় রে
(বলে আয় পাপী আয় রে)
(বলে ত্বরা করে আয় রে)!
আজি সে সুরব শুনে ব্যাকুল পরাণ রে!
এত দিনে পাপীজনে পায় পরিত্রাণ রে!
(বুঝি যায় স্বর্গধাম রে)!
(বুঝি হয় পূর্ণ কাম রে)!
আজি সে মধুর ধ্বনি জাগে বিশ্বময় রে!
সবে মিলে হৃদয় খুলে বল ব্রহ্ম জয় রে!
(বল জয় ব্রহ্ম জয় রে)!
(বল হক্ ব্রহ্ম জয় রে)!
(বল জয় দয়াময় রে)!

তাল—ধামাল।

(মিল)—ফেলিয়া অসার সুখ আয় তোরা চলে;
গেল বেলা মিছে খেলা ছাড় সকলে;
জীবন সফল হবে প্রাণ মন বিকাইলে। (ওরে নগরবাসী)

সকলে উপাসনা মন্দিরে প্রত্যাবৃত্ত হইলে পর উপাসনা আরম্ভ হইল। বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের ভাব নিম্নে প্রকাশিত হইল;—

পরমেশ্বর আছেন ইহা নূতন কথা নহে৷ বালক বলিতেছে পরমেশ্বর আছেন, যুবক বলিতেছে পরমেশ্বর আছেন, বৃদ্ধ বলিতেছে পরমেশ্বর আছেন। কিন্তু কে প্রাণগত বিশ্বাসের সঙ্গে বলে পরমেশ্বর আছেন? যে যথার্থই বলিতে পারে পরমেশ্বর আছেন, সে আর মানুষ থাকে না, সে দেবতা হইয়া যায়। আমরা ধর্ম্মের অনেক উচ্চ উচ্চ কথা বলিয়া থাকি; কিন্তু এই একটী কথাই যথেষ্ট। এই একটী কথার মধ্যে কোটি স্বর্গ স্থিতি করিতেছে। প্রাণ মনের সহিত ভাল করিয়া কেহ যদি একবার বলিতে পারে, পরমেশ্বর আছেন, এই সংসার সঙ্কটে তাহার আর ভাবনা কি? তাঁহার সকল বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। ব্রাহ্ম সমাজে আমরা অনেক দিন হইতে একটী কথা শুনিয়া আসিতেছি, "বিশ্বাসো ধর্ম্ম মূলংহি" বিশ্বাস ধর্ম্মের মূল, কিন্তু বিশ্বাস কি কেবল ধর্ম্মের মূল? বিশ্বাস ধর্ম্মের আদি, মধ্য, অন্ত সকলই। বিশ্বাসে ধর্ম্মের আরম্ভ, বিশ্বাসেই ধর্ম্মের পোষণ, বিশ্বাসেই ধর্ম্মের পরিণাম। সকলেই বলে ঈশ্বর আছেন; কয়জন অন্তরের সহিত বলেন? মুখের কথায় কিছু হয় না।

সত্য স্বরূপ পরমেশ্বরে কি বিশ্বাস কর? তবে অসার মরীচিকাতুল্য সংসার মায়ায় ভুলিয়া যাও কেন? তুমি কি যথার্থ বিশ্বাস কর, পরমেশ্বর সত্য পুরুষ? তবে ভেলকি বাজিতে ভুলিয়া যাও কেন? যদি সত্যই জানিয়াছ, সত্যই বুঝিয়াছ, পরমেশ্বর সত্য, তবে মায়ার খেলায় অন্ধ হইয়া আপনার সর্ব্বনাশ আপনি কর কেন?

তুমি কি বিশ্বাস কর, অন্তর্যামী পরম পুরুষ সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন? তবে কি নির্জ্জনে অন্ধকারে দুষ্কার্য্য করিতে পার না? তবে কি কুচিন্তাকে অন্তরে স্থান দিতে পার না? যদি জান অন্তর্যামী বর্ত্তমান তবে হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে কেমন করিয়া শয়তানকে স্থান দাও?

তুমি কি বিশ্বাস কর পরমেশ্বর আনন্দস্বরূপ? তবে এত নিরানন্দ কিসের জন্য? তবে শোকে তাপে জর্জ্জরিত হও কেন? সেই শান্তি সমুদ্রে বিশ্বাস কর কি? বিশ্বাস থাকিলে প্রাণে অশান্তি দুর্ভাবনা কি এক নিমেষ তিষ্ঠিতে পারে? তুমি কি পরমেশ্বরকে তোমার পিতামাতা পরমাত্মীয় বলিয়া বিশ্বাস কর? তবে একটী পয়সা হারাইলে,—একটী মৃদ্ভাণ্ড ভাঙ্গিলে দুঃখিত হও কেন? যদি পরমেশ্বরকে দয়াময় পতিত পাবন বলিয়া জান, তবে এত দীর্ঘ নিশ্বাস, এত হতাশ্বাস কিসের জন্য? যিনি কোটি কোটি জগাই মাধাইকে উদ্ধার করেন, তাঁহার প্রেমের ছায়ায় বাস করিয়া হতাশ হও কেন?

বিশ্বাস ধর্ম্মের আরম্ভ; বিশ্বাস ধর্ম্মের পরিণাম। বিশ্বাস-চক্ষে ঈশ্বরকে দেখা যায়। আমরা আস্তিক, ঈশ্বরকে মানি। আস্তিকতা দুই প্রকার। এক প্রকার মুখের কথায়, বক্তৃতায় উচ্চ উপাসনা প্রার্থনায়, দর্শন ও বিজ্ঞানে। এই প্রকার আস্তিকতা লোকে দেখে ও প্রসংশা করে। এইরূপ আস্তিক লোককে লোকে ধার্ম্মিক বলিয়া মান্য করে। আর এক প্রকার আস্তিকতা আছে সেরূপ আস্তিকতা যাঁহার প্রাণে সঞ্চারিত হয়, তাঁহার জীবন পবিত্র হইয়া যায়। শোক তাপে তিনি অটল থাকেন। সে আস্তিকতা পরম শত্রুকেও আলিঙ্গন করে। এই শেষোক্ত আস্তিকতাই প্রকৃত আস্তিকতা।

সে দিন আপনারা মহাত্মা পলের গুণ কীর্ত্তন শুনিয়াছেন।

সেই মহাত্মা পল বলিয়াছেন;— "যদি কেহ বলে যে আমি ঈশ্বরকে ভাল বাসি, অথচ যদি সে ভ্রাতাকে ঘৃণা করে তবে সে মিথ্যাবাদী।" সেইরূপ আমি বলি, যদি কেহ বলে আমি ঈশ্বরকে মানি, অথচ যদি তাহার জীবনে স্বার্থপরতা নীচতা, ও পাপের দুর্গন্ধ থাকে তবে সে মিথ্যাবাদী।

ঈশা যাহা বলিয়াছেন, আপনাদের স্মরণ নাই কি'—"যদি তোমার এক সর্ষপ কণা তুল্য বিশ্বাস থাকে, তুমি ঐ পর্ব্বতকে বলিবে, পর্ব্বত চলিয়া যাও পর্ব্বত চলিয়া যাইবে।" সাধু বাক্য মিথ্যা নহে। একটি সর্ষপ কণার তুল্য বিশ্বাসে পর্ব্বত চালিত হয়, দুঃখ, বিপদ, পাপ ও তাপের দুর্লঙ্ঘনীয় পর্ব্বত চলিয়া যায়। তবে কেন আমাদের পাপ তাপ বিদূরিত হইবে না? আমাদের কি এক সর্ষপ কণার তুল্য বিশ্বাসও নাই? আমাদের বিদ্বেষ, রিপুপরতন্ত্রতা, কাম ক্রোধের উৎপীড়ন যায় না কেন? জ্ঞানী দার্শনিক! ইহার উত্তর কর। সর্ষপ তুল্য বিশ্বাসে পর্ব্বত চলে, প্রাণের পাপ দুঃখ যায় না কেন? কোথায় সেই বিশ্বাস? এক সরিষা ভোর কি বিশ্বাস নাই? হে ভগিনি! হে ভাই! তবে কিসের গর্ব্ব? হে ব্রাহ্ম! হে ব্রাহ্মিকা! আমরা কি ব্রহ্মকে মানি?

আমি মনে করি, যে পরিমাণে পরমেশ্বরে বিশ্বাস স্থির হয়, সেই পরিমাণে জীবনে পবিত্রতা ও প্রেম সঞ্চারিত হয়, জীবন মধুময় হইয়া যায়। যদি জীবনে পবিত্রতা ও প্রেম না থাকে তবে তোমার বিশ্বাস কোথায়? বিশ্বাস আছে, অথচ তোমার জীবন পাপ তাপে কলঙ্কিত, সূর্য্য উদিত হইয়াছে অথচ জগৎ তমসাচ্ছন্ন, ইহা আমি বিশ্বাস করি না। যে পরিমাণে বিশ্বাস, সেই পরিমাণে জীবন পবিত্র ও প্রেমময় হইবেই হইবে। চারি আনা বিশ্বাস চারি আনা জীবনের উন্নতি; আট আনা বিশ্বাস আট আনা জীবনের উন্নতি, ষোল আনা বিশ্বাস ষোল আনা জীবনের উন্নতি। বাগাড়ম্বর বক্তৃতায় হইবে না। বিশ্বাস আছে প্রেম পবিত্রতা নাই, ইহা মিথ্যা কথা, আমি ইহা বিশ্বাস করি না।

যখন পাপ করি তখন আমি কি পরমেশ্বরকে বিশ্বাস করি? ঈশ্বরে বিশ্বাসও পাপ, সূর্য্যও অন্ধকার কি একত্রে থাকিতে পারে? হে সাকারবাদী হিন্দু! তুমি যাগ যজ্ঞ, দোল দুর্গোৎসব করিতেছ, "বার মাসে তের পার্ব্বণে" লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া যশস্বী হইতেছ, প্রতিদিন গঙ্গাস্নান করিয়া তোমার দেহ পবিত্র করিতেছ, অথচ যদি দেখি যে তোমার চরিত্রে অপবিত্রতা ও ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য বর্ত্তমান, তোমার হৃদয়ের গূঢ় স্থানে নরকের দুর্গন্ধ, তুমি প্রকাশ্যে শাক্ত বা বৈষ্ণব যাহাই কেন হও না, যদি তোমার গোপনীয় চরিত্রে কলঙ্ক থাকে, তবে বলি তুমি হিন্দু নহে, নাস্তিক। হে মুসলমান! তুমি মসজিদে যাও, কোরাণ পড়, পাঁচ বার করিয়া নমাজ কর, অথচ যদি তোমার গোপনীয় চরিত্রে ইন্দ্রিয় দোষ থাকে, নীচ স্বার্থ পরতার দুর্গন্ধ থাকে, তবে তুমি মুসলমান না নাস্তিক?

হে খৃষ্টীয়ান! তুমি গির্জ্জায় যাও, বাইবেল পড়, উচ্চৈঃস্বরে সুদীর্ঘ প্রার্থনা কর, রাস্তার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ধর্ম্ম প্রচার কর, কিন্তু যদি তোমার জীবনে প্রেম, পবিত্রতা ও নিঃস্বার্থ পরহিতৈষণা না থাকে, তবে তুমি কিসের খৃষ্টিয়ান? তুমি নাস্তিক।

হে ব্রাহ্ম! গুটী কতক মত মানিলেই ব্রাহ্ম হওয়া যায় না। বক্তৃতা করিলে বা পুস্তক লিখিলেই ব্রাহ্ম হয় না। আন্দোলন, উৎসব করিতে পারিলেই ব্রাহ্ম হয় না, তর্কাস্ত্রে উপধর্ম্মাবলম্বীদিগকে পরাস্ত করিতে পারিলেই ব্রাহ্ম হয় না। যাহার প্রাণের ভিতর ঈশ্বরের সিংহাসন নাই, সে কিসের ব্রাহ্ম? যে ব্রহ্মে আত্ম সমর্পণ করিয়াছে সেই ব্রাহ্ম। মত ও বাগড়ম্বরের পরদা ভেদ করিয়া ভিতরে দেখ দেখি তুমি কতটুকু ব্রাহ্ম, কতটুক নাস্তিক।

সে দিন যে থিয়োডোর পার্কারের মহৎ চরিত্র আপনাদের নিকট কীর্ত্তন করিলাম, তিনি বলিতেন, নাস্তিকতা দুই প্রকার; মত গত নাস্তিকতা ও কার্য্য গত নাস্তিকতা। কেহ কথায় বলে ঈশ্বর মানি না, কেহ কার্য্যের দ্বারা দেখায় যে সে ঈশ্বর মানে না।

আমার পরিচিত কোন কোন নিরীশ্বর বাদী বলেন, যে পরমেশ্বরকে মানিয়াও, দীর্ঘ প্রার্থনা ও উপাসনা করিয়াও যদি চরিত্রের নীচতা থাকে, ঈশ্বরকে মানিয়াও যাহা না মানিয়াও যদি তাহাই হয়, যদ তোমাদের ও আমাদের মধ্যে জীবনগত কিছু পার্থক্য না থাকে, তবে ঈশ্বরকে মানিয়া ফল কি? একথার উত্তর কিরূপে দিতে হইবে? মুখে নহে, যদি জীবন ও চরিত্র ইহার উত্তর দেয়, তবেই ইহার উত্তর হয়। যদি নিরীশ্বরবাদী দেখিতেন যে, যে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস প্রকাশ করে, প্রার্থনা করে, তাহারই জীবন পবিত্র হইয়া যায়, পরহিত ব্রতে সে আত্মসমর্পণ করে, তাহা হইলে আর তিনি এমন কথা বলিতে সাহস করিতেন না। যদি তিনি দেখিতেন যে যেমন শুষ্ক তৃণ অগ্নির সংস্পর্শে আসিলে উহা নিশ্চয়ই দগ্ধ হইয়া যায়, সেই রূপ যে পরমেশ্বরের নাম গ্রহণ করে, তাহারই পাপ তাপ বিনষ্ট হয়, চরিত্র উন্নত হয়, তাহা হইলে আর তিনি এমন কথা বলিতে সাহস করিতেন না। যদি লোকে দেখে যে উপাসনা করিয়াও যাহা, না করিয়াও তাই, তবে তাহারা কেন এমন কথা বলিবে না? উপাসনা করিয়াও যদি বিদ্বেষ ও ক্ষুদ্রতা রহিল, তবে লোকে কেন এমন কথা বলিবে না? এত প্রেমের কথা বলিয়াও যদি পর নিন্দায় আনন্দ পাইলে তবে লোকে কেন এমন কথা বলিবে না?

সত্য বিশ্বাস চাই। বয়স কাটিয়া গেল। কাল কেশ শাদা হইল। ভাষার ছটা, কল্পনার মাধুর্য্য, কথার আন্দোলনে আর তৃপ্তি হয় না। জগদীশ্বর দয়া কর! আমাদিগকে দয়া কর!

বিশ্বাস প্রাণের ভিতরে আসিলে, কে পাপের সেবা করিতে পারে? যখন পাঁচ বৎসরের একটী শিশুর কাছে দুষ্কার্য্য করিতে লজ্জা হয়, তখন পরমেশ্বর আছেন বিশ্বাস করিয়া কে পাপ করিতে পারে?

সত্য স্বরূপের ব্যাখ্যা করিয়াও একটী গৃহমার্জ্জার মরিলে ক্রন্দন কর, তবে কে বলিবে যে তুমি যথার্থই সত্য স্বরূপে বিশ্বাস কর?

সত্য স্বরূপকে সত্যভাবে ধর। যাহাতে সত্য স্বরূপকে সত্য ভাবে ধরিতে পার, তাহার জন্য প্রাণগত চেষ্টা কর। সুখের সময় দয়াময় ঈশ্বরকে মানি, আর দুঃখের সময় তাঁহাকে ভুলিয়া যাই, অথবা দুঃখের সময় তাঁহাকে মানি এবং সুখের সময় ভুলিয়া যাই, তবে আমি কিসের ব্রাহ্ম? সুখ দুঃখ, সুস্থতা অসুস্থতা, সম্পদ্ বিপদ্, সকল অবস্থাতেই তিনি আমাদের ঈশ্বর। সুখের সময় ডাকিব, দুঃখের সময়ও ডাকিব, তিনি কেবল সুখের ঈশ্বর নহেন, দুঃখেরও ঈশ্বর। আনন্দ লাভ করিলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও, দুঃখ পাইলে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে পার না? সন্তানবিয়োগ হউক, সর্ব্বনাশ ঘটুক, পথের ভিখারী হও, সকল অবস্থার মধ্য দিয়াই তাঁহার কৃপার স্রোত বহিতেছে। যদি বিশ্বাস থাকে সুখের জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিব, দুঃখের জন্যও তাঁহাকে ধন্যবাদ দিব। দুঃখের জন্য সুখের জন্য, সম্পদের জন্য বিপদের জন্য, আলোকের জন্য অন্ধকারের জন্য তাঁহার চরণে কৃতজ্ঞতা উপহার দিয়া কৃতার্থ হইব। সুখে দুঃখে তিনি আমাদেরই। আজ পুত্র জন্মিল বলিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলে, যদি দারুণ মৃত্যু সেই পুত্রের কেশাকর্ষণ করিয়া সেই অদৃশ্য অজ্ঞাত লোকে লইয়া যায়, তখন কি দয়াময়কে ধন্যবাদ দিবে না? তখন কি বলিবে না, তুমি দয়াময়, তুমি দয়াময়, তুমি ধন্য, তোমার কৃপা ধন্য, তোমার হস্তের কশাঘাত সহ্য করিয়া আমি ধন্য হইলাম? তাঁহার প্রদত্ত কষ্ট সহ্য করিয়া আমরা বলিব, ধন্য প্রভো তোমার কৃপা হস্ত হইতে যে বিপদ্ আসিতেছে, তাহার জন্য তোমাকে শত ধন্যবাদ। ইহারই নাম বিশ্বাস। তিনি সজনের ঈশ্বর, নির্জ্জনের নন? ব্রহ্ম মন্দিরের ঈশ্বর, কার্য্য ক্ষেত্রের নন? সম্পদের ঈশ্বর বিপদের নন? জীবনের ঈশ্বর মৃত্যুর ঈশ্বর নন? সজনে নির্জ্জনে, উপাসনায় সাংসারিক কার্য্যে, প্রকাশ্য সভায়, গৃহে পরিবারের মধ্যে সর্ব্বত্র তাঁহারই চরণে পড়িয়া থাকিব। জীবনে মরণে সকল অবস্থায় তাঁহাকে হৃদয় সমর্পণ করিব। তবেই আমি ব্রাহ্ম হইতে পারিব। প্রাণেশ্বরের চরণে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইব।

১১ই মাঘ, মঙ্গলবার।

১১ই মাঘ আমাদের বিশেষ উৎসবের দিন। পূর্ব্বরাত্রি হইতে উপাসনা মন্দির ও তাহার সম্মুখস্থিত নূতন বারান্দা পত্র পুষ্পে সজ্জিত হইয়া আনন্দময়ের আনন্দোৎসবের সূচনা করিতেছিল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন সত্ত্বেও রাত্রি প্রায় চারিঘটিকা হইতে ব্রাহ্মপল্লী ও অন্যান্য স্থানের ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাগণ উপাসনা মন্দিরে সমবেত হইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এবং তখন হইতেই সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তনের ধ্বনি শ্রুত হইতেছিল। যতই রাত্রি শেষ হইতে লাগিল ততই দলে দলে উপাসকগণ আসিয়া বসিবার আসন পূর্ণ করিতে লাগিলেন। সূর্য্যোদয়ের পর আর একটীও আসন খালি রহিল না। তখনও যাঁহারা আসিতে লাগিলেন তাঁহাদিগকে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল। নির্দ্দিষ্ট সময়ে আমাদের রামপুরহাট হইতে আগতবন্ধু রাজকুমার বাবুর সুপরিচিত সুমধুর কণ্ঠ হইতে "মা মা বলে' ডাকিগো তোমারে" এই গানটী উত্থিত হইয়া উপাসকদিগের প্রাণ পূর্ণ করিয়া ফেলিল। তৎপরে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় উদ্বোধন আরম্ভ করিলেন।

প্রথম হইতেই উপাসকগণ প্রাণের মধ্যে ও উৎসব মন্দিরে দয়াময়ের কৃপাবায়ুর সঞ্চার অনুভব করিতেছিলেন। উদ্বোধনের ভাবেও তাঁহারা তাহার আভাস দেখিতে পাইলেন এবং সকলে উৎসুক মনে প্রেমময়ের প্রেম-বারিধারা লাভ করিবার জন্য হৃদয় পাতিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। উদ্বোধনের পর সঙ্গীত ও যথারীতি আরাধনা, ধ্যান ও সাধারণ প্রার্থনাদি হইল। তদনন্তর শাস্ত্রী মহাশয় নিম্নলিখিত ভাবে উপদেশ প্রদান করিলেন;—

বৃদ্ধ দায়ুদ নৃপতির নাম অনেকে শ্রবণ করিয়া থাকিবেন। তিনি যে একজন ঈশ্বর ভক্ত ছিলেন, তাহাও আপনারা বোধ হয় অবগত আছেন। তৎকৃত স্তুতি বন্দনা পাঠ করিতে গিয়া একটা কথা দেখিতে পাইলাম। ঈশ্বরকে সম্বোধন করিয়া দায়ুদ বলিতেছেন, "আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, যে রসনা দ্বারা এমন কথা বলিব না যাহাতে তোমার মহিমার হ্রাস বা করুণার খর্ব্বতা হয়।" ভক্তদলের অগ্রগণ্য প্রাচীন দায়ুদ নৃপতি বলিতেছেন, "I am purposed", অর্থাৎ "আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে রসনা দ্বারা এমন কথা ব্যবহার করিব না, যাহাতে তোমার প্রতি নির্ভরের অভাব প্রকাশ করিবে।"

কেমন করিয়া আমরা ঈশ্বরের মহিমা খর্ব্ব করি? অসাধু আলাপ, অসাধু কথা দ্বারাই কি কেবল ঈশ্বরের মহিমা খর্ব্ব করা হয়? রসনা দ্বারা পরনিন্দা, কুৎসা ঘোষণা, অথবা প্রকাশ্য ভাবে ঈশ্বর নাই, উপাসনা প্রার্থনার আবশ্যকতা নাই প্রভৃতি কথা প্রচার করিলেই কি কেবল ঈশ্বরের মহিমা হ্রাস করা হয়? দায়ুদের পক্ষে ঐ কথা কি অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে? যে ব্যক্তি উপাসক ও ভক্ত সে অবিশ্বাসী হইয়া অসাধু কথা বলিবে, লোকের প্রতি বিদ্বেষ, কটূক্তি অথবা লোকের কুৎসা ও নিন্দাবাদ করিবে, সেই আশঙ্কায় যে সে ব্যক্তি ব্যস্ত হইয়া প্রতিজ্ঞা ও শপথ করিতেছে, ইহা সম্ভব নহে। যিনি ঈশ্বরের নামে এত স্তবস্তুতি রাখিয়া গিয়াছেন, দুর্ম্মতিবশতঃ তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব, মহিমা ও করুণা অস্বীকার করিয়া ফেলিবেন, সেই জন্য যে এরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন, এ অর্থও যুক্তিযুক্ত নহে।

প্রাচীন নৃপতি তবে ওরূপ কথা কেন বলিলেন? অবশ্যই উহার কোন গভীর অর্থ আছে। গূঢ়রূপে চিন্তা করিয়া দেখি যে কেবল যে নাস্তিক, ইন্দ্রিয় পরতন্ত্র, পাপী, অবিশ্বাসী ও সংশয়ী ব্যক্তিই ঈশ্বরের মহিমা খর্ব্ব করে, তাহা নহে। বিশ্বাসী বলিয়া যাঁহাকে জানি, রসনায় যিনি ঈশ্বরের নাম করেন, ঈশ্বরের সেবক ও উপাসক বলিয়া আপনার পরিচয় দেন, তাঁহারও এমন অবস্থা হইতে পারে, যে তিনি রসনা দ্বারা ঈশ্বরের মহিমা খর্ব্ব করিতে পারেন। সে অবস্থা কি? মনোযোগ সহকারে চিন্তা করিয়া দেখ, যে অধিক কথা কি, প্রার্থনা দ্বারাও ঈশ্বরের মহিমা খর্ব্ব করা যাইতে পারে। ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে কতকগুলি স্থূল সত্য আছে, তাহা ধর্ম্মের ভিত্তিস্বরূপ। সেই সকল সত্যের উপর যাহাতে সন্দেহ প্রকাশ পায়,

এমন ভাষা যদি উচ্চারণ করি, তাহা হইলে ঈশ্বরের মহিমা বিশেষরূপে খর্ব্ব করা হয়। প্রথম কথা, সার কথা—ঈশ্বর সত্য। কোন কথায় যদি উঁহার বিরুদ্ধ ভাব প্রচার করি, তাহা হইলেই তাঁহার মহিমা খর্ব্ব করা হয়। দয়াময় মহাসত্য, সত্য সত্যই কৃপা করেন, তিনি কৃপার আধার,—ভাষায় যদি ইহা ম্লান করিবার ও ইহার বিরুদ্ধ ভাব উৎপাদন করিবার চেষ্টা করি তাহা হইলে তাঁহার মহিমার হ্রাস করা হয়। অনেক সময়ে বিশ্বাসীও এইরূপে ঈশ্বরের মহিমা খর্ব্ব করিয়া শান্তিস্বরূপ আধ্যাত্মিক ধন লাভে ও করুণা সম্ভোগে বঞ্চিত থাকেন।

তিনটী বিষয়ে আমরা ঈশ্বরের মহিমা খর্ব্ব করিয়া অবিশ্বাস প্রকাশ করত শান্তি পাই ও আধ্যাত্মিক জীবনের ক্ষতি করি। প্রথমতঃ যে নিরাশ হয় না নিরাশার কথা উচ্চারণ করে সে ঈশ্বরের মহিমা খর্ব্ব করে। 'পাব না', 'পারিলাম না', এমন কথা যে বলে সে ঈশ্বরের মহিমা খর্ব্ব করে। কেন না ঈশ্বর আছেন ইহা যদি সত্য হয়, ঈশ্বরের কৃপা যদি সত্য হয় তবে পাপীর উদ্ধারও যে হইবেই হইবে ইহাও সত্য কথা। ইহার বিরুদ্ধে কোনও কথা বলিলেই দেবতার মহিমা খর্ব্ব করা হয়।

অনন্ত নরকের মতে আমাদের আস্থা নাই। পাপী অনন্ত কাল নরকাগ্নিতে দগ্ধ হইবে একথা আমাদের ভাল লাগে না। পাপী অনন্তকাল দগ্ধ হইবে, আর সৃষ্টিকর্ত্তা ক্রুদ্ধ হইয়া অনন্ত কাল তাহাকে দেখিবেন না একথায় আমরা সায় দিতে পারি না। কারণ,একথা বলিলে ঈশ্বরের করুণার বিরুদ্ধে বড় নিন্দাবাদ করা হয়। ভয়েসি সাহেব পূর্ব্বে বিশ্বাসী খৃষ্টান ছিলেন এবং অনন্ত নরকে বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার ভগিনীর কিন্তু খৃষ্ট ধর্ম্মে বিশ্বাস ছিল না। পাছে তিনি অনন্ত নরকে পড়েন এই ভয়ে ভয়েসি সাহেব ভগিনীকে সর্ব্বদাই বুঝাইতেন, ভগিনীর জন্য সর্ব্বদাই ভাবিতেন। এক দিন রাত্রে ভাই ভগিনী অনেকক্ষণ ধরিয়া ধর্ম্ম বিষয়ে বিতণ্ডা করিলেন। ভগ্নীর বিষয় ভাবিয়া ভয়েসি সমস্ত রাত্রি ক্রন্দন করিলেন, অশ্রুজলে বালিস ভিজিয়া গেল, সমস্ত রাত্রি যন্ত্রণাতে তাঁহার নিদ্রা হইল না। প্রভাতে তাঁহার অন্তরে আলোক প্রকাশ পাইল। প্রত্যাদেশ হইল, "তুমি তোমার একটী ভগিনী পাছে অনন্ত নরকে যায় বলিয়া সমস্ত রাত্রি ক্রন্দন করিলে, আর আমি আমার কন্যাকে অনন্ত নরকে ফেলিয়া দিব, ইহা কি সম্ভবে?"

যে জন্য আমরা অনন্ত নরকে বিশ্বাস করিতে পারি না, সেই জন্য একথাও মানিতে পারি না যে ঈশ্বরের জয় হইবে না। প্রার্থনা দ্বারা, উপাসনা দ্বারা পাপীর ত্রাণ হইবে না,একথার অর্থ এই যে ঈশ্বর পাপের কাছে হারিয়া যান, পাপের জয় হয়। পুণ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে না, সাধুতার উপর অসাধুতা, পাপ উঠিয়া দাঁড়াইবে একথা বলিলে ঈশ্বরের মহিমা খর্ব্ব করা হয়। ইহা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের কথা নহে। ভাই ভগিনী! আপনাকে খুব মলিন বিবেচনা কর তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু মনে মনে ভাব কি যে ঈশ্বর পরাজিত হইবেন, তাঁহার করুণা জয়যুক্ত হইবে না?

নিরাশার কথা কেন বলি, তাহা জানি। কত শত,কত সহস্র বার প্রতিজ্ঞা, উপাসনা ও ঈশ্বরের চরণালিঙ্গন করিলাম, অথচ যেই পাপ আসিয়াছে, অমনি আমাদের প্রতিজ্ঞা শিথিল হইয়াছে। দুইবার নহে, দশবার নহে, শতবার নহে, অনেকবার অনুতাপের ক্রন্দন কাঁদিয়াছি। নিজের দুর্ব্বলতা দেখিয়া তাই মনে হয়, যে আমরা পারিব না।

ঈশ্বর সবল বিশ্বাসী বিনয়ীর উদ্ধারের জন্য সদাই ব্যস্ত। আমি পড়িয়া আছি,আমার পরিত্রাণ হইবে না,এমন কথা বলিলেই ঈশ্বরের মহিমা খর্ব্ব করা হয়। এরূপ কথা কখনও বলিবে না। প্রতিজ্ঞা কর, অবিশ্বাসের কথা বলিয়া আর ঈশ্বরের মহিমা খর্ব্ব করিবে না। প্রতিজ্ঞা করিয়া রাখিতে পার নাই? কতবার তাহা গণিয়া রাখিয়াছ কি? একজন মহাপুরুষকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, শত্রুদিগকে কতবার ক্ষমা করিতে হইবে? তিনি বলিয়াছিলেন সপ্ততি গুণ সাতবার। লক্ষবার আমাদের প্রতিজ্ঞা, উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ভাঙ্গিয়া গড়াগড়ি গিয়াছে। ছেলেরা যেমন খেলার ঘর তুলে, আমরা তেমনি কতবার বাস করিবার জন্য যত্ন করিয়া প্রেম ও পবিত্রতার ঘর তুলিয়াছি, দুর্দ্দান্ত দস্যু আসিয়া ঘর ভাঙ্গিয়া দিয়া গিয়াছে; হৃদয় প্রাঙ্গণে সে ঘর ভাঙ্গিয়া গড়াগড়ি গিয়াছে। ভাই ভগিনি! এমন দুর্দ্দশা অনেক বার হইয়াছে। তাই বলিয়া কি তোমরা বলিতে চাও যে ঈশ্বর পরাজিত হইবেন? হাজার বার ভাঙ্গিলেও আশা করিবে। নিরাশার কথা মুখে বলা আর ঈশ্বরকে অস্বীকার করা সমান কথা।

প্রতিজ্ঞার কত বল জান? তোমরা শুনিয়াছ এক জন মহাপুরুষ (থিওডোরপার্কার) তাঁহার বন্ধুদিগকে বলিয়াছিলেন, আমি বলিতেছি যে অমুক নগরে যতক্ষণ না পৌঁছিব ততক্ষণ পর্য্যন্ত মরিব না। বাস্তবিক তিনি ততক্ষণ মরেন নাই। আমরা শুনিয়াছি যে যোগীদের ইচ্ছামৃত্যু হয়। তাঁহারা বলেন মরিব না আর মরেন না। প্রতিজ্ঞার এত বল কেননা সে দয়ার উপর নির্ভর করে। নিরাশা দয়া হইতে বঞ্চিত। অতএব প্রতিজ্ঞা কর যে এরূপ প্রার্থনা, এরূপ ভাব রসনা দ্বারা প্রকাশ করিবে না যাহাতে ঈশ্বরের মহিমা খর্ব্ব করা হয়।

আর এক ভাবে রসনাদ্বারা ঈশ্বরের মহিমা খর্ব্ব করা যাইতে পারে। পাইয়া যদি বলি পাই না, তাহা হইলে প্রভুর মহিমা খর্ব্ব করা হয়। পাইয়া যে সন্তান পাই না বলে,মা তাহাকে কিছু দিতে চান না। যদি আমরা সর্ব্বদা বলি পাই না, পাইলাম না, তাহা হইলে ঈশ্বরের মহিমা নিশ্চয়ই খর্ব্ব করা হয়। যেটুকু পাও বুকে ধরিয়া আনন্দ কর। প্রকৃত বিশ্বাসী বলেন প্রভু যা দিলেন আমার ঢের হইল। এক জন ব্রাহ্ম বন্ধুর একটী সন্তান মরিয়া গেলে তিনি তাঁহার পরিবারকে শোক করিতে বারণ করিয়া বলিয়াছিলেন, একটী গিয়াছে আর দুইটীতো বাঁচিয়া আছে? যতটুকু ঈশ্বর দেন ততটুকুতেই অধিকার। বেশীতে কি অধিকার? ইহা বাস্তবিক কথা, কল্পনা নহে। কোন জিনিসের উপর অধিকার স্থাপন করিতে গিয়া আমরা অন্ধকারে পড়ি। দাওয়া করিয়া বসি যে চিরদিন যেন চক্ষু ঈশ্বরের প্রেমোজ্জল মুখ দেখিয়া ধন্য হয়। কিসের দাওয়া? ঐ

দাওয়াতেই অন্ধকার আসে। কিসের অধিকার? যদি জন্মান্ধ হইতাম তাহা হইলে কি হইত? করুণার উপর দাওয়া কি? আবার করুণা পাইয়া তাঁহার জন্য কৃতজ্ঞ না হইয়া যদি বলি পেলাম না,দিলেন না, তাহা হইলে কি ঘোর অপরাধ করা হয়! একবার এক স্থানে কাঙ্গালী বিদায় হইতেছিল। সেই কাঙ্গালীদের মধ্যে এক জন বালক ছিল। তাহার মুখ দেখিয়া সকলের দয়া হইল, সকলে বলিল একে একখানা ভাল কাপড় দাও। কাপড় পাইয়াও দেখা গেল সে আবার হাত পাতিতেছে, সকলে তখন বিরক্ত হইয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিল। যাহা পাইলে তাহার জন্য যদি প্রাণ খুলিয়া কৃতজ্ঞতা না দাও, তাহা হইলে বলি তুমি ঈশ্বরের মহিমা খর্ব্ব করিলে। আমরা কি বলিব না যে প্রভু ঢের হইয়াছে; কোন্ পথে যাইতেছিলাম, আর তিনি কোথায় আনিলেন! সত্য সত্যই তিনি আমাদিগকে প্রেম ডোরে বাঁধিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন; আনিয়া নিজের হাতে আমাদের মুখে অমৃতের পাত্র ধরিয়াছেন। তবে কেন বলিব তিনি কৃপা করেন নাই?

আর এক ভাবে ঈশ্বরের মহিমা খর্ব্ব করা যায়। আমরা ভয় পাইয়া ঈশ্বরের দান হারাইয়া ফেলি। যখন আমরা পাই তখন ভয়ে ভয়ে হাত পাতি, ভাল করিয়া হাত পাতিতে পারি না, তাই ভাল করিয়া তাঁহার দান ধরিতে পারিনা। কত দিয়াছিলেন পথে সব ফেলিয়া দিয়াছি, আবার হয়ত ফেলিয়া দিব, এই চিন্তায় মন আকুল হয়। যদি জান যে থাকিবে না তবে সত্য সত্যই থাকিবে না। ভয়ে অর্দ্ধেক মৃত্যু হয়। যেখানে মারী ভয় উপস্থিত হয় সেখানে যে ভয় পায় সে আগে মরে। ভয়ের কথা বলা হইবে না। মনে মনে যদি আমরা স্থির করি যে কৃপা ভোগ করিব না, তাহা হইলে কাজেই কৃপা ভোগ ঘটিবে না। যদি মনে করি ঈশ্বরের ঘরে বাস করিব না, ঈশ্বরের চরণে থাকিব না তাহা হইলে সত্য সত্যই সেখানে থাকা ঘটিবে না। যদি ভয় থাকে তবে ঈশ্বরের কাছে থাকিতে পারিব না। আমরা তাঁহাকে প্রভু বলিতেছি কি দুদিনের জন্য? সেবার ব্রত, প্রচার ব্রত, উপাসনা ব্রত লইয়াছি কি দুদিনের জন্য? দুদিনের জন্য থাকিব বলিয়া হৃদয় মন দিই নাই। সকল দিন কিছু সমান থাকিবে না। কখনও অনুকূলতা,কখনও প্রতিকূলতা, কখনও সুবিধা কখনও অসুবিধা ঘটিবে। কেবল অনুকূল অবস্থায় থাকিব, কেবল সরস হইয়া থাকিব এমন সম্ভব নহে। আমাদের কর্ত্তব্য এই যে অনুকূল ও সরস অবস্থাতেই থাকি বা প্রতিকূল ও নীরস অবস্থাতেই থাকি বৃদ্ধ দাযুদের মত থাকিব। রসনাকে ঈশ্বরের মহিমা কখন খর্ব্ব করিতে দিব না। প্রতিজ্ঞা ইহপরকালের মত করিতে হইবে। দুদিনের জন্য জীবন বিক্রয় করিব বলিলে কে শুনিবে? উপাসক উপাস্য দেবতার জন্মের মত গোলাম হইয়া পড়ে; দুবাহুতুলে আনন্দে তাঁহার কার্য্য সাধন করে। চিরকালের জন্য তাঁহার দাসত্ব করিব, তাঁহার হইয়া থাকিব, চিরকালের জন্য কৃপার সাক্ষ্য দিব, পাপের সাক্ষ্য দিব না, প্রত্যেককে এই প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে। হৃদয় দুদিনের জন্য দিলে চলিবে না। ধর্ম্ম ও ঈশ্বর সম্বন্ধে বালকের খেলা করা উচিত নহে। ছেলেরা টলিতে টলিতে মার হাতে ফুল দেয়, আবার দুই মিনিট বাদে তাহা তুলিয়া লয়। আমরা কি সেইরূপ প্রাণের ফুল একবার ঈশ্বরের হাতে দিব, আবার তুলিয়া লইব? দিয়াছি যাহা তাঁহা একেবারে দিয়াছি। জন্মের মত তাঁহার হইয়া গিয়াছি, এই কথা বলিতে হইবে। পাপ ও সংসারাসক্তি আসিলে বলিব যে আমরা ঈশ্বরের হইয়া গিয়াছি, আর আমাদিগকে পাইবে না। আমাদিকে প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে রসনা দ্বারা ঈশ্বরের মহিমা আর খর্ব্ব করিব না।

আর এক প্রকারে ঈশ্বরের মহিমা খর্ব্ব করা যাইতে পারে। নিরাশ হইয়া আমরা যদি বলি, ঈশ্বরের মহিমা ও নাম জয়যুক্ত হইতেছে না বা হইবে না, তাহা হইলে তাঁহার মহিমা খর্ব্ব করা হয়। ঈশ্বর স্বয়ং যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন, তাঁহার জয় হইবে না ত কি আমাদের জয় হইবে? আমাদের ত ভারি যোগ্যতা! আমাদের দ্বারা যুদ্ধ জয় করিতে হইলেই প্রতুল আর কি! রুগ্ন, দুর্ব্বল, দীনহীন, আশ্রয়হীন, যাহাদের আহা বলিবার লোক নাই, এরূপ লোক দিয়া কি যুদ্ধে জয় লাভ হয়? মানুষের দিকে চাহিতে গেলে সকল আশা উড়িয়া যায়। মানুষের দিকে চাও, দেখিবে আমাদের ধন নাই। আমাদের মধ্যে কয়টা ধনী আছে? কত ভিক্ষা করিয়া আমরা উৎসব করি। ধন, মান, বিদ্যা আমাদের নাই। যুদ্ধের সম্বল কিছুই নাই। একেত দু পাঁচটা সৈন্য, তাহারা আবার আপনারা আপনাদের ক্ষতি করে। আপনাদের উপর আপনারা তরবার চালায়। নিরাশ হইবার কারণ যথেষ্ট রহিয়াছে। মানুষের দিকে চাহিলে কথা কহিবারও বল থাকে না। সেই জন্য প্রভু নিজে ভার লইয়াছেন। তাই ত জলে ঝড়ে ভিজিয়া আমরা গান করিয়া আসিলাম,—"ও ভাই শুন সমাচার পাপীদের ভার লয়েছেন আপনি দয়াময়।"

মানুষের কি সাধ্য যুদ্ধ ঘোষণা করে? ঈশ্বর আপনি যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন। কাহার সঙ্গে? পাপ, দুর্নীতি, কুসংস্কার, ভ্রান্তি, দুর্গতির সঙ্গে। প্রভু স্বয়ং অবতীর্ণ। যদি জিজ্ঞাসা কর পৃথিবি! তোমাদের সৈন্য কই? আমরা বলিব, আমাদের সৈন্য কোথায়? অসম্ভব সম্ভব করিতে, আশ্চর্য্য দেখাইতে, খঞ্জ,অন্ধ, গলিত কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত, ভাঙ্গা চোরা লোক লইয়া স্বয়ং জগৎপতি অবতীর্ণ হইয়াছেন। পৃথিবীর রাজারা যুদ্ধের আয়োজনের জন্য কত ভাল ভাল সৈন্য সংগ্রহ করেন, টাকা যোগাড় করেন, কত ট্যাক্স স্থাপন করেন! আর জগৎপতি কিনা আজি কাণা খোঁড়া লোক লইয়া সংগ্রাম করিবেন! ভাঙ্গা চোরা লোককে কোলে টানিয়া তিনি বলিতেছেন, 'যা তোরা আমার নাম প্রচার কর।' আজ আশা কি হইতেছে? ইতিহাস পড় নাই? ঈশ্বর দেখাইতে চান, যে পৃথিবীর রাজাদের মত গোলাগুলি, ডাইনেমাইট, কামান লইয়া তিনি যুদ্ধ করেন না। স্বর্গরাজ পিতা বিধান রূপ তৃণ কুড়াইয়া পাপের বিরুদ্ধে নিক্ষেপ করেন, সেই তৃণের দুর্জ্জয় বল দেখিয়া পৃথিবী কাঁপিয়া উঠে। ইন্দ্রকরধৃত বজ্র অপেক্ষাও সে তৃণের বল অধিক।

মানুষ যজ্ঞ রন্ধন করিবার সময় কত ভাল ভাল রন্ধন পাত্র

সংগ্রহ করে। আর জগজ্জননী যখন যজ্ঞ রাঁধেন তখন যে সকল ভাঙ্গা হাঁড়ি সমাজ ফেলিয়া দিয়াছে তাহাই কুড়াইয়া লন। তিনি সেই ভাঙ্গা হাঁড়িতে অমৃত রন্ধন করিয়া পাপীর মুখে তুলিয়া দেন। ব্রাহ্ম! ব্রাহ্মিকা! বিশ্বাস নয়নে দেখ। আজি অবিশ্বাসী হইয়া কি বলিবে যে ঈশ্বরের জয় হইবে না? আজি অবিশ্বাসের কথা বলিও না। অই শুন আজি রামমোহন রায় তোমাদের সঙ্গে বলিতেছেন 'জয় ব্রহ্ম কৃপার জয়!' আজি কেশব চন্দ্র সেন তোমাদের সঙ্গে বলিতেছেন 'জয় দয়াল প্রভুর জয়!' আজি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তোমাদের সঙ্গে বলিতেছেন 'জয় ব্রহ্ম কৃপার জয়!' ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা! তোমরা ঢের অবিশ্বাস করিয়াছ, এখন বিশ্বাস কর। কে বলিল তোমাদের পরিত্রাণ হইবে না? আমাদের ভার ঈশ্বর লইয়াছেন, আমাদের ত্রাণ হইবেই হইবে। আনন্দ কর, প্রতিজ্ঞা কর যে আর কখনও অবিশ্বাসের কথা মুখে আনিবে না, নিরাশার কথা বলিবে না। সকলে প্রাণ খুলিয়া গাও, "ও ভাই শুন সমাচার পাপীদের ভার লয়েছেন আপনি দয়াময়।"

উপদেশের সময় উপাসকদিগের মধ্যে এমন কেহ ছিলেন না যাঁহার প্রাণ দ্রবীভূত হয় নাই। এবারে সকলেই ভাবের বাহ্যিক প্রকাশ দমন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি অস্ফুট ক্রন্দন ধ্বনিতে উপাসনামন্দির পূর্ণ হইয়া গেল; সকলের গণ্ডস্থল বাহিয়া অশ্রুধারা পতিত হইতে লাগিল। অবিশ্ব বিশ্বাস ও আশার কথা শুনিয়া অনেক তাপিত প্রাণ শীতল ও পরিতৃপ্ত হইল; বিশ্ববিধাতা স্বয়ং ব্রাহ্ম সমাজের প্রাণ হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছেন, ব্রহ্ম দয়ারূপ বিধানে তাঁহারই হস্ত কার্য্য করিতেছে এই প্রাণপ্রদ, সুমধুর বিধানতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া সকলে আপনাদিগকে কৃতার্থ বলিয়া অনুভব করিলেন। অবিশ্বাসও শুষ্কতার পরাজয় হইল, বিশ্বাস ও প্রেমের জয় হইল।

উপদেশান্তে "ও ভাই শুন সমাচার পাপীদের (আমাদের) ভার, লয়েছেন আপনি দয়াময়।" এই নূতন সঙ্কীর্ত্তন উৎসাহের সহিত গীত হইল। অনন্তর প্রার্থনাও সঙ্গীতের পর প্রাতঃকালীন উপাসনা শেষ হইল।

মধ্যাহ্নে আনন্দ বাজারে প্রীতিভোজন এবং বেলা ১ টার সময় মাধ্যন্দিন উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত উপাসনার কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের ভাব নিম্নে দেওয়া গেল;—

প্রাণের ঈশ্বর আমাদিগের সহিত মিলিত হইবার জন্য আমাদিগের ঘরে বসিয়া প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন—প্রাণ মন্দিরের নিভৃত স্থানে বসিয়া প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন—আমরা কিন্তু ঘর ছাড়িয়া দূরে দূরে ভ্রমণ করি। আমরা জগতের বাহিরের রাজ্যে আমাদিগের বাসস্থান নির্ম্মাণ করি, ঘর ছাড়িয়া বাহিরে বাহিরে পর্য্যটন করিয়া সুখ শান্তি অন্বেষণ করি। প্রাণেশ্বর প্রাণ মন্দিরে বসিয়াই আছেন। দিন যাইতেছে, রাত্রি যাইতেছে, মাস যাইতেছে, বৎসর যাইতেছে—আমরা তাঁহার নিকটস্থ হইতেছি না। তিনি আমাদিগের রক্ষার জন্য—পালনের জন্য আমরা যেখানে যাই, সেইখানেই ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন; ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল, রোগের ঔষধ, যখনকার যে অভাব, তাহা মোচন করিবার সুন্দর উপায় বিধান করিয়াছেন; কিন্তু প্রতীক্ষা করিতেছেন কখন আমরা ঘরে ফিরিয়া তাঁহাকে দেখিব। তাঁহার বাহিরের সকল ব্যবস্থার মর্ম্ম এই যে আমরা সেই সকলের মধ্যে তাঁহার প্রেমের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহাকে অন্বেষণ করিব, ভাল করিয়া তাঁহার পরিচয় লইব, তাঁহার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইব এবং অবশেষে তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইয়া প্রাণের অনন্ত আশা পূর্ণ করিব। ভুবনমোহন শোভাসৌন্দর্য্যে পূর্ণ হইয়া প্রাণের দেবতা প্রাণের মধ্যে অপেক্ষা করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার আশা পূর্ণ হইতেছে না। তিনি আমাদিগের চিত্ত আকর্ষণ করিবার জন্য বাহিরে যে সকল সুখের আয়োজন করিয়াছেন, যে সকল ভোজ্য ভোগ্য অশেষবিধ সামগ্রী সাজাইয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে আমাদের মন এমনি মুগ্ধ হইয়া পড়ে যে আমরা তাঁহাকে ভুলিয়া থাকি এবং তাঁহাকে ছাড়িয়া সেই সকল বস্তু লইয়া থাকিতেই লালায়িত হই। তিনি কিন্তু তাহাতে তৃপ্ত হন না, সুখের বস্তু সকল দিয়া যখন আমাদের মন না পান, তখন তিনি সে সকল হরণ করিয়া দুঃখের উপর দুঃখের দূত প্রেরণ করিয়া আমাদিগের চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা করেন, জীবনে অভাবনীয় ঘটনা সকল সংঘটন করেন। এ সকলের উদ্দেশ্য কেবল তাঁহার দিকে আমাদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিয়া তাঁহার ক্রোড়ে আমাদিগকে টানিয়া লওয়া।

সুন্দর প্রেমময় ঈশ্বর ঘরে বসিয়া তাঁহার প্রেমজালে ঘেরিয়া এইরূপে আমাদিগকে টানিতেছেন এবং আমাদিগের জন্য ক্রমাগতই প্রতীক্ষা করিতেছেন, কিন্তু আমরা কি তাঁহার প্রেম বুঝি, তাঁহার দরদ বুঝি, তাঁহার প্রেমের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার চেষ্টা করি? আমাদের প্রাণ মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ, আমাদের ঘর আমাদের চক্ষে অন্ধকারময়, আমাদের প্রাণের দেবতা আমাদের দৃষ্টির অগোচর। জীবনের সুখ সকল সম্ভোগ করিয়া যখন সুখদাতাকে স্মরণ হয় ও আমরা হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা তাঁহাকে অর্পণ করিতে—প্রেমভরে তাঁহাকে একটী প্রণাম করিতে উৎসুক হই, তখন দেখি প্রাণের দ্বার খোলে, তাঁহার মুখের আলো একটু একটু আমাদের মুখে পড়িয়া আমাদের মুখকে কত উজ্জ্বল করে, তাঁহাকে দেখিবার প্রয়াস কত বর্দ্ধিত করিয়া দেয়! আবার জীবনে দুঃখ বিপদের কঠোর কশাঘাতেও যখন চৈতন্যের উদয় হয়, যখন সংসার শূন্য দেখিয়া তাঁহার কাছে যাইবার জন্য হৃদয় আকুল হয়, তাঁহার জন্য হাহাকার করি, অশ্রুপাত করি, তাঁহাকে লইয়া প্রাণ শীতল করিবার জন্য ব্যগ্র হই, তখন দেখি, প্রাণ মন্দিরের দ্বার একটু একটু খুলে, প্রাণারামের অমৃত জ্যোতির এক এক কণা হৃদয়ে পড়িয়া হৃদয়কে শীতল করিয়া দেয়। কিন্তু তথাপি আমরা কি সকল ছাড়িয়া তাঁহার সহিত গিয়া সম্মিলিত হইতে

পারি? তিনি যে জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন, তাঁহার সে আশা কি চিরকালের জন্য পূর্ণ করিতে পারি? সুখে বা দুঃখে তাঁহার প্রতি আমাদের যে আকর্ষণ হয়, তাহা কত ক্ষীণ, তাঁহার প্রতি যে অনুরাগের উদয় হয়, তাহা কত চঞ্চল!! সে আকর্ষণ—সে অনুরাগ আমাদিগকে ঘরের ভিতরে লইয়া যাইতে পারে না, আমরা অল্পে সন্তুষ্ট হইয়া আবার বাহিরে ফিরি—আবার প্রাণেশ্বর হইতে দূরে গিয়া জীবন যাপন করিতে উৎসুক হই। আমরা যখন তাঁহাকে ডাকি, তাঁহার উপাসনা করি, তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন করি, তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি, তখন আমাদের সম্বন্ধে তাঁহার আশা কত বাড়ে, তিনি আমাদিগকে পাইবার জন্য কত আগ্রহান্বিত হন, 'আয় আয় সন্তান' বলিয়া তিনি কত মধুর স্বরে, উচ্চ বাণীতে ডাকিতে থাকেন, কিন্তু আমরা দেখিয়াও দেখি না, শুনিয়াও শুনি না, তাঁহার সঙ্গে গিয়া মিলিত হই না। আমাদের উপাসনা প্রার্থনা বাক্যাড়ম্বর মাত্র হয়, হৃদয়ের ক্ষণিক উত্তেজনার ভাসা ভাসা ভাব মাত্র হয়, আমাদের প্রাণ বাহিরের দিকে উন্মুখ হইয়া থাকে, তাঁহাতে মজে না, গলে না, প্রেমজলধিতে গিয়া মিশে না, আমরা তাঁহার আশা পূর্ণ করিতে পারি না।

কবে সেই শুভ দিন, শুভ মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইবে, যখন আমি সচেতন হইয়া তাঁহাকে ডাকিব, বাহির হইতে মুখ ফিরাইয়া তাঁহার নিকট যাইবার জন্য আকুল হইব, তিনি আমার প্রাণ মন্দিরে আমাকে পাইবার জন্য অবিরত প্রতীক্ষা করিতেছেন ইহা অনুভব করিব এবং প্রাণের প্রমত্ত অনুরাগের সহিত তাঁহার সঙ্গে সেই নির্জ্জন নিভৃত স্থানে সম্মিলিত হইয়া চিরদিনের জন্য তাঁহার হইয়া যাইব? দয়াময় সেই শুভদিন শীঘ্র আনয়ন করুন।

মাধ্যন্দিন উপাসনা শেষ হইলে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বেদী হইতে শাস্ত্রপাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ব্যাখ্যানের বিষয় ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্য ও গার্গীর কথোপকথন। ব্যাখ্যানের পর সঙ্গীত ও প্রার্থনা হয়। শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত কেদার নাথ রায় ও মফস্বল হইতে আগত একটী বন্ধু প্রার্থনা করেন। প্রত্যেক প্রার্থনার শেষে সঙ্গীত হইয়াছিল। পরে সন্ধ্যার অনুমান এক ঘণ্টাকাল পূর্ব্ব হইতে বেদীর পার্শ্বস্থ স্থানে উৎসাহের সহিত সঙ্কীর্ত্তন হয়। সঙ্কীর্ত্তন শেষ হইতে হইতে সায়ংকালীন উপাসনার সময় উপস্থিত হইল। নির্দ্দিষ্ট সময়ে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বেদীতে উপবেশনপূর্ব্বক উদ্বোধন আরাধনাদি যথারীতি সম্পন্ন করিলেন। পরে ধ্যান ও সাধারণ প্রার্থনার পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ দীক্ষিত হইবার জন্য বেদীর নিকট দণ্ডায়মান হইলেন।

যোগেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, মুকুন্দলাল সরকার, শশধর আচার্য্য, বনমালী বসু, অবিনাশ চন্দ্র বসু, মহেশ চন্দ্র ঘোষ, মনোমোহন বিশ্বাস, অভয়চরণ ভড়, দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ, প্রসন্নকুমার কুণ্ডু।

ইহাদের প্রত্যেকের গলদেশে পুষ্পমালা দেওয়া হইয়াছিল। সকলে দণ্ডায়মান হইলে পর দীক্ষার্থীদিগের মধ্য হইতে একজন সকলের হইয়া একখানি প্রতিজ্ঞা পত্র পাঠ ও একটী প্রার্থনা করিলেন। তৎপরে শাস্ত্রী মহাশয় দীক্ষিতদিগকে যে উপদেশ দেন তাহার সারাংশ নিম্নে দেওয়া গেল;—

তোমরা কি অভিপ্রায়, কি উদ্দেশ্য দ্বারা চালিত হইয়া এই স্থানে দাঁড়াইয়াছ? কিসের আকর্ষণে তোমরা আসিয়াছ? যদি পার্থিব ধনের আকর্ষণে আসিয়া থাক, তবে চলিয়া যাও, এস্থানে তাহা পাইবে না। যদি মান সম্ভ্রমের আশায় আসিয়া থাক, তাহা হইলে বলিতেছি চলিয়া যাও, তাহার এ পথ নহে। যে পথে হাজার হাজার, কোটি কোটি নরনারী চলিতেছে, যেখানে পাপ, অসাধুতা, ভ্রম রাজত্ব করিতেছে, সেখানে যাও। আমাদের এখানে দারিদ্র্য যন্ত্রণা, বিদ্বেষ বিরাগ আছে, ধন মানের আশা নাই। আমরা এই মাত্র আশা দিতে পারি, যে এখানে আসিলে তোমরা প্রাণ ভরিয়া পবিত্র সত্যস্বরূপ ঈশ্বরকে ডাকিয়া প্রাণ জুড়াইবে। তোমাদের পাপ তাপ দূর হইবে, তোমরা দুর্ব্বলতায় বল পাইবে, প্রলোভনের মধ্যে ঈশ্বরের চরণ আলিঙ্গন করিয়া তোমরা উদ্ধার পাইবে, এ আশা আমরা তোমাদিগকে করিতে বলিতে পারি। ঈশ্বরের নামে, ঈশ্বরের পুণ্য ও প্রেমের আকর্ষণে এখানে আসিয়াছ। সংসার তাপে তপ্ত ও অনুতাপদগ্ধ দুঃখী ব্রাহ্মদের মধ্যে প্রাণের ঈশ্বরকে লইয়া বাস করিতে পারিবে।

তোমরা আজি হইতে ঈশ্বরের সৈনিক দল ভুক্ত হইলে। ঈশ্বর সমর ঘোষণা করিয়াছেন, তোমরাও পৌত্তলিকতা, জাতিভেদ, দুর্নীতি ও পাপের বিরুদ্ধে সমর ঘোষণা কর। পৃথিবী ও সংসার হইতে তোমাদিগকে আজি আমরা ছিঁড়িয়া লইতেছি। যে যা বলে বলুক, তোমরা আজি হইতে পৃথিবীর নহে, পাপের নহে। ঈশ্বরের সেনা হইয়া দাঁড়াইয়াছ, তাঁহার নিশান ধরিতে হইবে। জীবনে নীতি, পবিত্রতা, ব্রহ্ম মহিমা যাহাতে রক্ষা পায়, তাহার চেষ্টা কর। যদি মনে কর যে তাহা পারিবে না, এখনও সময় আছে, চলিয়া যাও। ব্রাহ্ম হইয়া যদি ব্রহ্ম নামে কলঙ্ক আন, তাহা অপেক্ষা তোমাদের না জন্মান ভাল ছিল।

এ বড় দুর্গম পথ। ঐ যে সব লোক মনে মনে ও বাহিরে বিদ্রূপ করিতেছে, অভয়দাতার নাম করিয়া বামহস্তের অঙ্গুলীদ্বারা উহা উড়াইয়া দিবে। তাঁহার কাছে যতক্ষণ আছ, ততক্ষণ তোমাদের মার নাই। আর অবিশ্বাসী হইয়া যদি তাঁহাকে ছাড়িয়া দাও বাঁচিবে না। ধার্ম্মিকেরা বলিয়াছেন, যে ধর্ম্মের পথ শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায়। অসবধান হইবামাত্র পতন।

যদি মনে মনে এরূপ আশা করিয়া থাক যে ব্রাহ্ম পরিবারে দুঃখের সময় বড় আরাম ও যত্ন পাইবে, তবে আমি বলিতেছি সে আশা ছাড়। কেননা ব্রাহ্মদিগের মধ্যে পরস্পরের প্রতি ভালবাসা নাই। পার্থিব সাহায্যের আশা করিও না। তোমরা ঈশ্বরকে ডাকিবে, আমরাও তোমাদের সহিত কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া তাঁহাকে ডাকিব, এই মাত্র সাহায্য পাইবে।

ধর্ম্মজীবনের দ্বারের শোভা দেখ! ভাই ভগিনী বহু দূর

হইতে স্বর্গ-রাজ্যের সহযাত্রী হইতে আসিয়াছেন, তাঁহাদের হস্তে বিজয় নিশান, বিধাতা তাঁহাদের সঙ্গী। তোমাদিগকে সাহস দিতেছি, তোমাদের সঙ্গে একজন আছেন। তাঁহাকে জীবনের সম্বল করিয়া ধর। অনেক পরিবর্ত্তন আসিবে, সব দিন কিছু সমান যাইবে না, সব দিন কিছু তোমরা আরাম করিতে পাইবে না। সময়ে সময়ে ক্লান্ত, ও বিষণ্ণ হইয়া পড়িবে। যে নামে এখন মাতিয়াছ, এমন সময় আসিবে যখন সে নামও ভাল লাগিবে না। এক উপায়, উপাসনা ধরিয়া থাক। উপাসনা কখনও ছাড়িও না—উপাসনা ছাড়িলে মরিয়া যাইবে; কোথায় যাইবে কেহ অন্বেষণ করিয়া বাহির করিতে পারিবে না। কোথায় অর্থোপার্জ্জনে গর্ত্তের পড়িয়া যাইবে, কেহ খোঁজ খবর করিতে পারিবে না। তেমন করিয়া ধনোপার্জ্জন করা অপেক্ষা ব্রাহ্মসমাজে না থাকাই ভাল। ধন মান ইন্দ্রিয়ের সেবা করিয়া কি হইবে? উপাসনা ছাড়িলে বিষয়ী ব্রাহ্ম হইয়া পড়িবে। খাওয়া ছাড়, পরা ছাড়িতে হয় ছাড়, কিন্তু উপাসনা ছাড়িও না। উপাসনাকে আজি হইতে জীবনের ব্রত কর। ঈশ্বরকে ধরিয়া অগ্রসর হও। কত লোকে তোমাদিগকে শুভাশীর্ব্বাদ করিবে।

তোমরা অনেক ক্লেশ পাইয়াছ, তোমাদের অঙ্গে অনেক প্রহার পড়িয়াছে। মনে করিলে চক্ষে জল আসে। চোর, পাপী, মাতালকে লোকে মারে না, কিন্তু যাহারা ঈশ্বরের নাম করে, তাহাদিগকে মারে। আমাদের সমাজের এমনই দুর্গতি হইয়াছে! আরও কত কষ্ট হয়ত ঘটিবে। ব্রহ্মকবচদ্বারা বুক বাঁধ, শান্তি খড়্গ লইয়া সমরে অবতীর্ণ হও। বিশ্বাস, প্রেম, পবিত্রতা ও ব্রহ্ম যাহাদের দিকে তাহাদের জয় হইবেই হইবে। সকলে একবার বল "ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং।"

দীক্ষিতদিগের প্রতি উপদেশ দেওয়া হইলে পর, ব্রাহ্মসাধারণকে লক্ষ্য করিয়া যে উপদেশ প্রদত্ত হয় তাহার সারাংশ নিম্নে প্রকাশিত হইল;—

ভাই ভগিনি! আশা করি ক্লান্ত হও নাই। আজি দেখ পিতার ঘরের কি শোভা! মন্দিরের গ্যালারির অর্দ্ধেক অংশ আজি ভগিনীগণে পূর্ণ হইয়াছে। ইহা দেখিয়া আমার মনে যে ভাবের উদয় হইতেছে, আজি আপনাদিগের সমক্ষে তাহা নিবেদন করিব।

একটী বাড়ীতে অনেকগুলি স্ত্রীলোক ও একটী মাত্র বংশধর সন্তান আছে। তাহার অনেক পিসী, অনেক ভগ্নী। সে সন্তান সদাই দিদি, পিসীমা ও দাস দাসীর বুকে বুকে, কোলে কোলে ফিরে। তাহাকে কেহ মাটিতে নামায় না। সেই বংশধর সন্তানের কত আদর! পাড়ার লোকে বলাবলি করে যে ছেলে বরে না গেলে বাঁচি। ছেলে ক্রমে বড় হইল। ভগিনী, পিসীদের বাড়ী হইতে রোজ নূতন নূতন পোষাক আসে। ক্লাসের ছেলেরা বলাবলি করে, কোথা হইতে রোজ এ এত নূতন পোষাক পায়। কেহবা বুঝাইয়া দেয়, উহার আবার নূতন পোষাকের ভাবনা কি? উহার কত দিদি, কত পিসী, তাহারা রোজ রোজ কত তত্ত্ব পাঠায়! উহার কত আদর! ওযে সাত মায়ের ছেলে।

আমার মনে হয়, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সেই আদরের ছেলে। যার কাছে যাইতেছেন, সেই আদর করিতেছে। যার যা আছে তিনি তাই দিতেছেন। কেহ লিখিয়া, কেহ বলিয়া কেহ ভাবিয়া আপনা হইতে করিতেছেন। কেন উহার প্রতি এত যত্ন। উহা ভারতের কুল প্রদীপ, বংশধর বলিয়া। উহার দেব অংশে জন্ম। পুরাকালে অসুরদের দৌরাত্ম্যে দেবতারা অস্থির হইয়া যখন নারায়ণের নিকট গিয়াছিলেন, তখন নারায়ণ তাঁহাদিগকে আদেশ করিলেন, "তোমরা আপন আপন অংশ দিয়া এক নূতন দেব সৃষ্টি কর।" এ কালেও দেবাসুরে যুদ্ধ চলিয়াছে। এই যুদ্ধে সেই নূতন দেবতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ। ভারত বহুকাল হইতে পরপদ পীড়িত হইয়া, বহু শতাব্দী ধরিয়া অত্যাচার সহিয়া সহিয়া রসাতলে যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। ঈশ্বরের চরণে ভারতের ক্রন্দন পৌঁছিল, ঈশ্বর বলিলেন, দেবঅংশে একজন জন্মিবে, সেই তোমার দুঃখ হরণ করিবে। বুদ্ধের জ্ঞান, চৈতন্যের প্রেম, খ্রীষ্টের বিশ্বাস, এবং মহাজনদের রক্ত লইয়া তিনি কুল-প্রদীপ বংশধর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে গড়িলেন। বড় দুঃখের বিষয় যে আমরা ইহা আজিও বুঝিতে পারিতেছি না। ইউরোপ আমেরিকা—কিন্তু আমাদিগের দিকে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া আছে।

এতদিন যে প্রশ্নের মীমাংসা হয় নাই এখন তাহা হইতে চলিয়াছে। অভ্রান্ত গুরু ছাড়িয়া, শাস্ত্র ছাড়িয়া একেশ্বরবাদ থাকিতে পারে কি না, এই প্রশ্নের মীমাংসা এতদিন হয় নাই, চেষ্টা হইয়াছে মাত্র, মীমাংসা হয় নাই। দেশের মধ্যে জ্ঞানী লোক, চিন্তাশীল লোক অনন্য ভাবে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। চাহিয়া থাকিবারই তো কথা। বড় বড় কাজ করিবার জন্যই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্ম। সত্যস্বরূপ নিরাকার ঈশ্বরের আধ্যাত্মিক পূজা প্রতিষ্ঠা করিতে, মানব চরিত্রের হীনতা দূর করিয়া তাহাকে উন্নত করিতে, জাতিভেদের মূলে কুঠারাঘাত করিতে, নারীকে শিক্ষা দান করিয়া উন্নত পবিত্র জীবনের অধিকার দিতে, দুঃখিনী বিধবার দুঃখ দূর করিতে, সমুদায় নর নারীকে উচ্চ পবিত্র স্বর্গীয় স্বাধীনতার পন্থা দেখাইতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্ম। উহাকে কি তবে কুল-প্রদীপ, আশাস্থল বলিয়া লোকে মনে করিবে না।

বড় দুঃখের বিষয় এই যে, ইউরোপের লোকেরা আজি কালি আমাদের সম্বন্ধে বড় আশা করিতেছেন না। তাঁহাদের মন নিরাশ হইতেছে। তাঁহারা বলিতেছেন আমাদের দ্বারা কিছু হইবে না। ইহার কারণ কি? কারণ বাহিরের নহে। প্রকৃত কারণ দুইটী, প্রথম কারণ এই যে আমাদের মধ্যে অনেকে ব্রাহ্ম জীবনের আদর্শ কেহ সুস্থিরভাবে ধরিতে পারিতেছেন না। দশ, পনর, বিশ বৎসরের ব্রাহ্মেরাও দাঁড়াইতে পারিতেছেন না। যে কয় জন অবশিষ্ট আছেন তাঁহারা যে ওরূপ করিবেন না, কে বলিল? আদর্শ যদি আমরা স্থির রাখিতে না পারি তাহা হইলে কোনও মতে আপনাকে স্থির রাখিতে পারিব না। আধ্যাত্মিকতা, নীতি,

স্বাধীনতা, প্রেম ও পবিত্রতা সম্বন্ধে আমাদের আদর্শ যেদিন ম্লান হইবে সেই দিন আমাদের অধোগতি হইবে। যাঁহাদিগকে নেতা বলি তাঁহারাই যদি আদর্শ স্থির রাখিতে পারিলেন না, তবে আমরা কিরূপে পারিব? এই সকল ভাবিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রতি লোকের আস্থার হ্রাস হইতেছে।

দ্বিতীয় কারণ, গৃহ বিবাদ ও অসদ্ভাব। ভারতে বিশ কোটি লোকের বাস। বঙ্গদেশে ব্রাহ্ম সংখ্যা আটশত। এই মুষ্টি প্রমাণ লোকে সত্যরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবে ইহা কি আশা করিতে পারা যায়? তাহার উপর আবার এই এক মুষ্টি লোকের শক্তি কলহ, মতভেদ ও ভ্রাতৃবিরোধে ক্ষয় হইয়া যাইতেছে। সেই জন্যই লোকের শ্রদ্ধা কমিয়া যাইতেছে।

এই দুইটী অনিষ্ট নিবারণ করিতে হইবে। একদিকে যেমন উজ্জ্বল বিশ্বাস চাই, তেমনি আর একদিকে মিলন চাই। পরস্পর স্বাধীন থাকিয়াও মিলিত হইতে হইবে। ঐকতান বাদনে সেতার এসরাজ প্রভৃতি যন্ত্র সকল যে যার আপনার সুরে বাজে, অথচ সমস্ত মিলিত হইয়া একতানে বাজে। মহাত্মা কেশবচন্দ্র সর্ব্বদা এই দৃষ্টান্ত দিতেন। ব্যক্তিত্ব ঘুচিবে না অথচ মিলন থাকিবে, এক ভাব দ্বারা পরিচালিত হইয়া সকলে নিজ নিজ কার্য্য করিবেন। যখন উদ্দেশ্য এক তখন কার্য্যে অমিল হইবে কেন?

ঈশ্বরের কাছে অপরাধ স্বীকার কর। কি ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছ? ভাবিয়া দেখ কি করিয়াছ। কেবল পরস্পরকে ছোরা ছুরি মারিয়াছ, কেবল পরস্পরের সমালোচনা করিয়াছ। নিজের সমালোচনা কর। পাঁচ খানা বাজনা এক সুরে বাজেনা কি? এই কয় দিন তাহার দৃষ্টান্ত কি দেখিলে না? এই কয় দিন কেমন হইতেছে! যে পারিতেছে সে গাইতেছে। মানুষগুলা সব যেন ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। এখন সব মলিনতা ঘুচিয়া গিয়াছে—এখন সকলেরই এক সুর।

আমাদের ঈশ্বর, আকাঙ্ক্ষা, উদ্দেশ্য, আদর্শ সব এক। আপনাকে যত ভুলিয়া যাইবে তত সকলে এক হইবে, তত সকলে লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইবে। এমনি করিয়া লাগিয়া দেখ দেখি, শক্তি হয় কি না? মানুষের প্রতিকূলতা, বিদ্রূপ তুলারাশির মত ব্রহ্ম-কৃপাবলে উড়িয়া যাইবে। ভয় পাইও না। ব্রহ্ম কৃপার জয় নিশ্চয়ই হইবে। আবার পর বৎসরে যেন দুঃখের কথা শুনিতে না হয়। প্রতিজ্ঞা কর যেন ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পার। ঢাকা লাহোর যেখানে যে থাক, সকলেরই এক আকাঙ্ক্ষা, আশা ও উদ্দেশ্য। সকলে এক সুরে বাজিবে। এই ভাব প্রাপ্ত হইবার জন্য চেষ্টা কর।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে কি সুবিধা! এখানে কোন লোক অগ্রসর হইয়া বলিতেছে না যে, আমাকে আশ্রয় কর, পরিত্রাণ পাইবে। ঈশ্বর ও আত্মার মধ্যে কেহ আবরণ হইতে পারিতেছে না। কে খাওয়াইতেছে, কার অভয় বাণী প্রাণে শুনিতেছ? তিনি স্বয়ং ব্রহ্ম। আমাদের উপর তাঁহার কত আদর! তিনিই এই মন্দির প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। এই যে বাড়ীতে এত লোক খাইতেছে, কে টাকা দিয়াছে? আমরা গরিব, কোথায় টাকা পাইব? কত ব্যয় হইতেছে, কে টাকা দিয়াছে? প্রভু দিয়াছেন। যদি বল এই মন্দির কে সাজাইয়া দিয়াছে? আমি বলিব, আমাদের জন্য মা সাজাইয়াছেন।

ভাই ভগিনি! আমরা তোমাদের আদর যত্ন করিতে পারি নাই। তাহার জন্য দুঃখ করিও না। বাপের বাড়ী আসিয়া কে কবে অপরের আদরের অপেক্ষায় বসিয়া থাকে? সেখানে সকলেই আপনি সব দেখিয়া শুনিয়া লয়; আপনার ইচ্ছামত আহার বিহার করে। ভগিনি! যদি তোমাদিগকে কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করে তবে তাহাদিগকে বলিও, "বাপের বাড়ী গিয়াছিলাম, সেখানে দেখিলাম, মানুষগুলা ব্রহ্ম নামে পাগল হয়েছে, নহিলে কাদায় পড়িয়া কাঁদে কেন?" ব্রহ্ম-কৃপার জয়! ব্রহ্ম কৃপার রাজ্য নামিয়াছে। পাপের দুর্গ কম্পিত ও সুসমাচার প্রচারিত হউক। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ! দশ বৎসরের বালক! তোমার দেবাংশে জন্ম; তুমি কুল-প্রদীপ। তুমি বাঁচিয়া থাক! আমাদিগকে তুমি রাখিবে। দেবাশীর্ব্বাদ, প্রভুর আশীর্ব্বাদ পাইয়াছ, তুমি আমাদিগকে রাখিবে। আমাদের কর্কশ কথায় আমাদিগকে ফেলিয়া যাইও না।

ব্রহ্ম চরণেএস সকলে পড়ি, দেখি পরিত্রাণ হয় কি না, ব্রহ্ম-কৃপা অবতীর্ণ হয় কি না। যাহারা ছাড়িয়া গিয়াছে তাহাদের নাম ধরিয়া পিতার কাছে কাঁদি, যাহারা পাপে ডুবিয়াছে, এস তাহাদের জন্যও পিতার কাছে খুব কাঁদি। সকলে বল, "এমন কৃপা ফেলে, কোথায় গেলে, বল কোথা আর জুড়াবে হৃদয়?" সত্যের জয় হইবেই হইবে, অহঙ্কারের জয় হইবে না। পাপ চাপা দিয়া কি সত্য নষ্ট করা যায়? তুলা চাপা দিয়া কি আগুন নির্ব্বাণ করা যায়? ব্রহ্মাগ্নি দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে, আর অগ্নিকাণ্ড হইবে। সম্মুখে কার ঘর? ছেলে সামলাও। নগরবাসী! রাত্রে ঘুমাইতেছ, দ্বিপ্রহর রজনীতে তোমাদের গৃহে ব্রহ্মাগ্নি জ্বলিয়া উঠিবে, তখন দেখিবে, আর রক্ষা নাই।

প্রবৃদ্ধ জলোচ্ছ্বাসের ন্যায়, হিমালয়নিঃসৃত গঙ্গার ন্যায় ব্রহ্মচরণ পদ্ম হইতে মুক্তির সমাচার নামিয়া আসিতেছে। পাপীর পরিত্রাণ এবার নিশ্চয়, ঈশ্বরের জয় নিশ্চয়।

তৎপরে প্রার্থনা ও সঙ্গীত হইয়া এই দিবসের কার্য্য শেষ হয়।

১২ই মাঘ, বুধবার।

এই দিবস বাবু নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় প্রাতঃকালীন উপাসনার কার্য্য করেন ও উপদেশ দেন। উপদেশের সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল;—

দুই রাজ্য, দুই জগৎ, দুই পথ। আমাদের বাহিরে এই পরমাশ্চর্য্য পরম সুন্দর মনোহর জগৎ, আমাদের ভিতরে ইহা অপেক্ষা অধিকতর আশ্চর্য্য, সুন্দর ও মনোহর জগৎ রহিয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ মনুষ্যই ভিতরের জগতের [illegible] ও সংবাদ লয় না, তাহার বিষয় কিছুই জানে না। মানুষের দুই দিকে গতি—অন্তর্মুখ ও বহির্মুখ।

সংসারীর বাহিরেই সর্ব্বস্ব। সে বাহিরে যাহা কিছু দেখে

তাহাই সার সত্য বলিয়া জানে। অন্তর্জগতের বিষয় কিছুই বুঝে না। যাহার দৈর্ঘ্য, বিস্তার ও বেধ আছে, তাহারই সত্তা সে বুঝিতে পারে, তাহার অতীত কিছু সে বুঝে না। ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় ভিন্ন মানুষের যে আর কিছু ভোগ্য বিষয় আছে, তাহা সে জানে না। ইহ সংসারে দুঃখের সামান্য কারণ ঘটিলে সে কাতর হইয়া পড়ে। সুখের সামান্য কারণেও আনন্দে নৃত্য করে। অস্থায়ী স্বপ্নবৎ বিষয়ের উপর তাহার সুখ দুঃখ নির্ভর করে। অথচ তাহাই তাহার সর্ব্বস্ব। অন্তর্জগতের বিষয় সে কিছুই জানে না, চক্ষু মুদিয়া যে অন্ধকার দেখে, কাজে কাজেই তাহার এক পয়সা মা বাপ। শুষ্ক তৃণের ন্যায় এখানকার চঞ্চল বায়ুতে সে দিবারাত্রি আন্দোলিত হইতেছে, তাহার দৃষ্টি সর্ব্বদাই বহির্মুখ, অন্তর্মুখ হইতে সে জানে না।

ইহা ত গেল সংসারের কথা। ধর্ম্ম রাজ্যেও এইরূপ অন্তর্মুখ ও বহির্মুখ দৃষ্টি আছে। অন্তরে ধর্ম্ম ও বাহিরে ধর্ম্ম এই দুই প্রকার দেখা যায়। পরমেশ্বরের চক্ষুর সম্মুখে থাকিয়া ধর্ম্ম সাধন করা এবং লোক চক্ষে আপনাকে ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত করা এই দুই প্রকার দেখিতে পাই। ধর্ম্ম জগতে যাঁহারা বিচরণ করিতেছেন তাঁহাদের মধ্যেও দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর লোক ভাবেন কিসে সাধু হইব, আর এক শ্রেণীর লোকের চিন্তা কিসে লোকে সাধু বলিবে। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক জগতের হিতকর যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন তাহা লোকের চক্ষের সম্মুখেই সর্ব্বদা সংসাধিত হইয়া থাকে। দুর্ভিক্ষে দান করিলে উহা যদি সংবাদপত্রে না উঠে, এমন দানে কি ফল? ঐ গরিব আতুরকে একটা পয়সা দিলাম যদি পথের লোক কেহ না দেখে এমন দানের কি ফল? কেবল ইহাই নহে। আরাধনা প্রার্থনা প্রভৃতি আন্তরিক সাধন সকলেরও বহির্মুখ গতি হয়, অর্থাৎ তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ বিনষ্ট হইয়া যায়।

আমি কোন সমাজের নিয়মিতরূপে বেদীর কার্য্য করিতাম। আমাদের উপাসক মণ্ডলীর একজন সভ্য এক দিন গোপনে আমাকে একটী কথা বলিলেন। তিনি বলিলেন, "মহাশয়, সে দিন আপনার প্রার্থনা শুনিয়া আমার হৃদয় বিগলিত হইল, আমার অশ্রুপাত হইল। যখনই অশ্রুপাত হইল, তখনই একবার মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম, আমার যে অশ্রুপাত হইতেছে লোকে তাহা দেখিতেছে কি না? সরলভাবেই অশ্রুপাত হইয়াছিল কিন্তু আমার অজ্ঞাতসারে কোথা হইতে যশোলিপ্সা আসিয়া সে ভাব বিনাশ করিয়া দিল।" বাস্তবিকই আমাদের স্বর্গ নরক পরস্পরের অতি নিকট।

ইহা ত গেল ধর্ম্মের ভাণ। যখন মানুষ সরলভাবে ধর্ম্মসাধন করে, তখন কি তাহার বহির্মুখ গতি থাকে? থাকে বই কি। ধর্ম্ম জগতের অধিকাংশ স্থলেই এইরূপ। পৌত্তলিক হিন্দু কেবল বাহিরে বাহিরে ঘুরিতেছেন। তিনি সরল, তিনি বিশ্বাসী, তিনি নিষ্ঠাবান্, অথচ তাঁহার কেবলই বহির্মুখ গতি। তাঁহার দেবতা বাহিরে, তাঁহার পূজা বাহিরে, তাঁহার পূজার উপকরণ বাহিরে, তাঁহার তীর্থ বাহিরে, তাঁহার মুক্তি, পরিত্রাণ সকলই বাহিরে। তাঁহার ধর্ম্ম প্রধানতঃ বহির্জ্জগতে স্থিতি করিতেছে। দেহটাকে দূর বৃন্দাবন বা বারাণসীতে টানিয়া লইয়া না গেলে তাঁহার দেবদর্শন হইবে না। নদী বিশেষে স্নান না করিলে তিনি পবিত্র হইবেন না। এ সকলই বহির্মুখ গতি। অন্তর্জগৎ তিনি দেখিতে পান না।

মুসলমান মসজিদে যান, কোরাণ পড়েন, উপবাস করেন, পাঁচবার করিয়া নমাজ করেন। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে এসকলই বাহিরের কাজ। খৃষ্টীয় জগতের অবস্থা কি? মহাত্মা থিওডোর পার্কার বলেন, অধিকাংশস্থলেই যদি খ্রীষ্টীয়ানেরা গির্জ্জায় যান, বাইবেল পাঠ করেন, তাহা হইলেই তাঁহারা মনে করেন যথেষ্ট ধর্ম্ম হইল। হৃদগত পবিত্রতার দিকে অনেক স্থলেই দৃষ্টি নাই।

ব্রাহ্ম তুমি কি মনে কর? তোমার বহির্মুখ গতি না অন্তর্মুখ গতি? তুমি বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছ না অন্তর্জ্জগতে প্রবেশ করিয়াছ? তোমার ধর্ম্মের সকলই অন্তরে। প্রায়শ্চিত্ত, উপাসনা, তীর্থ, মুক্তি সকলই অন্তরে। সত্য ধর্ম্ম অন্তরে—বহুকাল হইতে ব্রাহ্মসমাজে এই কথা শুনিয়া আসিতেছি। তুমি কি সেই পন্থা পাইয়াছ, যদ্দ্বারা অধ্যাত্ম জগতে প্রবেশ করা যায়? তোমার কি সেই চক্ষু বিকসিত হইয়াছে, যদ্দ্বারা নরচক্ষুর অতীত রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শবিরহিত সেই অধ্যাত্ম জগৎ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হওয়া যায়? তুমি বাহিরের গ্রন্থ পাঠ করিতেছ, বাহিরের বক্তৃতা উপদেশ শুনিতেছ, বাহিরের সামাজিক আন্দোলনে উন্মত্ত হইতেছ, কিন্তু তোমার নিজের অন্তরে কি হইতেছে, তাহা কি একবার দেখ? তুমি সংবাদ পত্র পাঠ করিয়া জগতের অপর পৃষ্ঠের খবর লও, কিন্তু তোমার আপনার ঘরে কি হইতেছে তাহার কি সংবাদ লইয়া থাক? তোমার ধর্ম্মে বলে স্বর্গ নরক বাহিরে না অন্তরে। তোমার অন্তরে স্বর্গ না নরক একথার কি ভাল করিয়া খবর লও? যদি অন্তরে ধর্ম্ম না হয় সহস্র বৎসর বাহিরে 'ধর্ম্ম', 'ধর্ম্ম' করিলেও কিছুই পাইবে না।

যাহাদের বহির্দৃষ্টি প্রবল, তাহারা ধর্ম্মকে অঙ্কশাস্ত্রের বিষয় করিয়া ফেলে; পাটীগণিতের দ্বারা ধর্ম্মের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করে; কত টাকা দান করিলাম, কয়জন গরিবের উপকার করিলাম, কয়জন বিধবার অশ্রুবারি মুছাইয়া দিতে চেষ্টা করিলাম কেবল এই গণনায় প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু ধর্ম্ম গণিতের বিষয় নহে।

ঈশা একদিন সশিষ্যে বসিয়া আছেন, তাঁহার সম্মুখে একজন একান্ত দুঃখিনী জীর্ণবসনা নারী য়িহুদীদিগের ধর্ম্ম মন্দিরে সেই দেশের একটী পয়সা ফেলিয়া দিল, ঈশা দেখিয়া বলিলেন, "ঐ যে দুঃখিনী নারী ধর্ম্মমন্দিরে একটী পয়সা ফেলিয়া দিল, উহার মূল্য ধনীদিগের লক্ষ লক্ষ মুদ্রা দান অপেক্ষা অধিক।"

ধর্ম্মরাজ্যে এক, দুই, তিন করিয়া গণনা হয় না। এখানে একই সর্ব্বস্ব। সেই একক পাইলেই সকল পাইবে।

তবে কি বাহির ছাড়িয়া দিব, তবে কি সংসারের কাজ, ব্রাহ্মসমাজের কাজ, সমাজ সংস্কার, ধর্ম্ম সংস্কার প্রভৃতি হিতকর

কার্য্য ছাড়িয়া দিয়া কেবল চক্ষু মুদিয়া বসিয়া থাকিব?—এই কথা অনেকে বলিবেন। কিন্তু সে ভয় নাই। সম্পূর্ণরূপে বাহির ছাড়িয়া দিয়া অন্তর্জ্জগতে চিরবাস করিবার কথা বলিতেছি না। অন্তর বাহিরে যোগ চাই, এই কথাই বলিতেছি। অন্তর ভুলিয়া গিয়া বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াইলে কিছুই হইবে না, ইহাই বলিতেছি। বহির্দৃষ্টি প্রবল থাকিলে কিছুই হইবে না, ইহাই বলিতেছি।

যে পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা তুমি বহির্জ্জগতের সহিত যোগ রাখিতেছ, যদি আজি তাহা বিনষ্ট হইয়া যায় বল দেখি তাহা হইলে তোমার ধর্ম্মসাধনের কি হইবে? তোমার চক্ষু গেল, তুমি কি করিয়া সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করিবে? তোমার কর্ণ গেল তুমি কি করিয়া বক্তৃতা, উপদেশ, সঙ্গীত শ্রবণ করিবে? যে কয়েকটী জানেলা দিয়া তুমি বহির্জগতের প্রতি তাকাইয়া আছ সকল গুলিই যদি বন্ধ হইয়া যায় তোমার ঘর যে অন্ধকার হইয়া গেল। বাহিরের দিকে আর কেমন করিয়া দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে? তোমার গ্রন্থ, গুরু, উপদেশ, সঙ্গীত, সঙ্কীর্ত্তন, আন্দোলন, আলোচনা সকলই গেল। তুমি বলিতে পার সত্য সত্যই তো তাহা হয় নাই, সত্য সত্যই তো তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই?

আমি বলি এখন না হইতে পারে, কিন্তু একদিন কি নিশ্চয়ই হইবে না? এই চক্ষুকর্ণাদি পঞ্চেন্দ্রিয় সত্য সত্যই কি এক দিন চিতানলে পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে না? তখন তোমার বাহিরে কি থাকিবে? তোমার চিন্তা, ভাব, কার্য্য সকলেরই গতি যদি বহির্মুখ হয় তবে জিজ্ঞাসা করি হে ভাই! তখন তোমার কি থাকিবে? তখন তুমি কি করিবে? তোমার ভিতরে অন্ধকার বাহিরেও অন্ধকার। যে দেহ তোমার সর্ব্বস্ব সেই দেহটী যখন আগুনে পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে তখন তুমি কি করিবে? যে সুখ তোমার সর্ব্বস্ব, যাহা ভিন্ন অন্য সুখ তুমি জান না, তাহা তোমার নিকট অসম্ভব হইয়া যাইবে। কোথায় থাকিবে তোমার সমাজ, তোমার মন্দির, তোমার গ্রন্থ, তোমার উপদেষ্টা। সংসারী তাহার ঘর বাড়ী টাকা কড়ির জন্য যেমন কাঁদিবে, হে বহির্মুখ সাধক! তুমিও তেমনি তোমার ধর্ম্মের বাহিরের উপকরণের জন্য অন্তরে অন্তরে হাহাকার করিবে। তাই বলি যাহাতে অন্তরে কিছু হয় এমন যত্ন কর। অন্তরে ব্রহ্ম মন্দির প্রতিষ্ঠিত কর। বাহিরের মন্দির চলিয়া গেলেও কিছুই ক্ষতি হইবে না। অন্তরে তোমার আত্মার অভ্যন্তরে যে মহাগ্রন্থ রহিয়াছে তাহার পত্র উদ্ঘাটিত হউক, অনন্তকাল পাঠ করিলেও ফুরাইবে না; বাহিরের গ্রন্থ চলিয়া যায় যাউক। অন্তরে যে গুরু আছেন তাঁহার উপদেশ শ্রবণ কর, অনন্তকাল ধরিয়া শুনিলেও তাহা ফুরাইবে না; বাহিরের গুরু চলিয়া যান যাউন। অন্তরে সেই নীরব মধুর কীর্ত্তন নিনাদিত হউক, অনন্তকাল পর্য্যন্ত নিনাদিত হউক; বাহিরের মৃদঙ্গ করতাল রাগ রাগিণী নিস্তব্ধ হইয়া গেলেও ক্ষতি নাই। ভিতরে অন্বেষণ কর, ভিতরের জগতে প্রবেশ কর। সেখানকার মাধুর্য্য দেখিয়া বিমুগ্ধ হও। সেখানকার সত্য শিক্ষা করিয়া জ্ঞানী হও। সেখানকার ভাবে ভাবুক হও। সেখানকার প্রেমে প্রেমিক হও। জ্ঞানস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ অন্তরেই আছেন। অন্তরে তাঁহাকে লাভ করিয়া অনন্তকাল পর্য্যন্ত তাঁহার চরণতলে বসিয়া কৃতার্থ হও।

অপরাহ্নে বেলা ১টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত প্রচার কার্য্য সম্বন্ধে আলোচনা হয়। এই দিবস সমস্ত কথা শেষ না হওয়াতে পরদিবস অপরাহ্নে পুনরায় এই আলোচনা সভার অধিবেশন হয়। আলোচনা সভার কার্য্য বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে।

আলোচনার পর বালকবালিকাদিগের সম্মিলন হয়। অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় প্রায় তিনশত বালক ও বালিকা মনোহর সাজে সজ্জিত হইয়া উপস্থিত হইলে পর, সকলেরই গলদেশে পুষ্প হার এবং হস্তে এক একটি পুষ্পগুচ্ছ দেওয়া হয়। বেদির একপার্শ্বে বালকদিগের এবং অপরপার্শ্বে বালিকাদিগের বসিবার আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সকলে যথাস্থানে উপবেশন করিলে পর, "বরষ পরে, পিতার ঘরে মিলিনু সকলে" এই সঙ্গীতটি গীত হয়। এই গীতটির প্রথম চরণ বালকগণ ও দ্বিতীয় চরণ বালিকাগণ এবং সর্ব্বশেষের কয়েক চরণ সকলে মিলিয়া সমস্বরে গাহিলে পর পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সংক্ষিপ্ত প্রার্থনান্তর একটি সুন্দর উপদেশ প্রদান করেন। উপদেশের সার মর্ম্ম এই—"তোমরা সকলেই খেলওয়াড়ি কাচের খেলিবার মার্ব্বল দেখিয়াছ, তাহার ভিতরে কেমন নানাপ্রকার রং দেওয়া থাকে, সেই জন্য সে গুলি বড়ই সুন্দর দেখায়; দেখিলে মনে হয় যেন বাহিরে রং দেওয়া আছে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। যখন কাচ গলাইয়া মার্ব্বল প্রস্তুত করে, তখন কৌশল করিয়া তাহার ভিতরে রং ঢালিয়া দেয়। কাচ স্বচ্ছ বলিয়া তাহার ভিতরের রং বাহির হইতে সব দেখা যায়, অথচ যতই খেলা কর, যতই জলে ধোও না কেন কিছুতেই তাহার রং উঠিয়া যায় না। কিন্তু যদি সত্য সত্যই মার্ব্বলের উপরে রং মাখান থাকিত, তাহা হইলে অল্প দিন খেলা করিলেই অথবা জলে ডুবাইলেই, তাহা উঠিয়া যাইত। সেইরূপ তোমাদের এই উপরের বেশ ভূষা, সুন্দর কাপড়, সুন্দর সুন্দর জামা, ফুলের মালা এসবই কিছুদিন পরে নষ্ট হইয়া যাইবে। আজ এই সাটিনের চক্‌চকে জামা গায়ে দিয়া আপনাকে কেমন সুন্দর মনে করিতেছ! কিন্তু দুই মাস কি চারি মাস পরে ইহাতে ধুলা লাগিয়া, তৈল লাগিয়া ইহা ময়লা হইয়া যাইবে। তোমরা ইহা ফেলিয়া দিবে। এইরূপ বাহিরে আপনাকে সুন্দর করিবার জন্য যতই সুন্দর জিনিষ ব্যবহার কর না কেন, কিছু দিন পরে সবই পুরাতন হইয়া যাইবে, নষ্ট হইয়া যাইবে। কিন্তু তোমরা যদি ভিতরে সুন্দর সাজে সজ্জিত হও, অন্তরে সদ্‌গুণরূপ রং ঢালিয়া দিতে পার, অর্থাৎ তোমরা যদি সত্যপরায়ণ, ধর্ম্মশীল এবং শান্ত শিষ্ট হও, তাহা হইলে তোমরা চিরস্থায়ী সৌন্দর্য্য লাভ করিতে পারিবে। ঐ সকল সদ্‌গুণই ভিতরের রং। উহা জলে ধুইয়া যায় না, তৈল ও ধূলি লাগিয়া নষ্টও হয় না, এবং কোনও কালে পুরাতন হয় না, বরং যত ব্যবহার করিবে ততই উজ্জ্বল, ততই সুন্দর হইবে। অতএব তোমরা বাহিরে সুন্দর হইবার চেষ্টা না করিয়া যাহাতে ভিতরে সুন্দর হইতে পার তাহার জন্য এখন হইতে চেষ্টা করিবে।" তদনন্তর শাস্ত্রী মহাশয়

বালক বালিকাদিগের জন্য প্রার্থনা করিলে পর দুইটী সঙ্গীত হয় ও তৎপরে তাহাদের প্রীতিভোজন হয়। একটী শ্রদ্ধেয়া ব্রাহ্ম মহিলা বালক বালিকাদিগের প্রীতিভোজনের জন্য চাঁদা সংগ্রহ এবং সমস্ত তত্ত্বাবধানের ভার লইয়াছিলেন। তজ্জন্য আমরা ব্রাহ্ম সাধারণের পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার সময় সঙ্গীত ও প্রার্থনার পর পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় "ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্য ও তাহার প্রণালী" সম্বন্ধে একটী হৃদয় গ্রাহী বক্তৃতা করেন। প্রায় দুই ঘণ্টা কাল বক্তৃতা হইয়াছিল। বক্তৃতাটী ভবিষ্যতে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

১৩ই মাঘ বৃহস্পতিবার।

এই দিবস বাবু সীতানাথ দত্ত প্রাতঃকালীন উপাসনার কার্য্য করেন ও উপদেশ দেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের ভাব নিম্নে প্রদত্ত হইল ;—

এখানে অনেক অভিজ্ঞ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উপস্থিত ; আমি তাঁহাদিগকে উপদেশ দিবার নিতান্ত অনুপযুক্ত। আমি কেবল জীবনের একটী পরীক্ষিত সত্য সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিব। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে আমার পৌত্তলিকতায় বিশ্বাস ছিল। পৌত্তলিকতা আমার নিকট কেবল একটা মত মাত্র ছিল না ; পৌত্তলিক দেব দেবীকে আমি জীবন্ত ও অতিশয় নিকট আত্মীয় বলিয়া বিশ্বাস করিতাম। আমার নিজগ্রামে এক চৈতন্য মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই মূর্ত্তিকে আমি একজন অতি নিকটস্থ বন্ধু বলিয়া বিশ্বাস করিতাম ও ভক্তি করিতাম। নিজ বাড়ীতে যে সকল দেব দেবীর পূজা হয় তাহাদিগকে এত জীবন্ত বলিয়া মনে করিতাম যে সময়ে সময়ে তাহাদের বিষয় স্বপ্ন দেখিতাম। দেখিতাম যেন তাহাদের সঙ্গে বেড়াইতেছি, তাহাদের সমভিব্যাহারে গ্রামস্থ দেবালয়ে যাইতেছি। কিন্তু অতি বাল্যকালেই এই বিশ্বাসে আঘাত পড়িল ও ব্রাহ্মধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইলাম। ব্রাহ্মধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইয়া প্রথমতঃ বিশেষ লাভবান্ হইতে পারিলাম না। নূতন ধর্ম্মজীবনের প্রারম্ভ হইতেই আমার একটী সঙ্গী জুটিলেন। এই সঙ্গী আমাকে বহুকাল পর্য্যন্ত অশান্তি ভোগ করাইলেন। ইহার কঠোর মূর্ত্তি দেখিয়া ইহাকে প্রথমতঃ চিনিতে পারি নাই, ইহাকে ধর্ম্ম জীবনের ঘোর শত্রু বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। ইনি প্রথমে সন্দেহের আকারে আসেন, কিন্তু ক্রমে বুঝিতে পারিলাম ইনি স্বর্গের দূত ; ইহার নাম ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ; ইনি সত্য ধর্ম্মের পরম সহায়। ইনি আমাকে নূতন ধর্ম্মজীবনের প্রারম্ভেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার ঈশ্বর কোথায় ?" আমি অতি বাল্যকালে ব্রাহ্মধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইলাম বটে, কিন্তু এই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে না পারিয়া ঘোর অশান্তিতে দগ্ধ হইতে লাগিলাম। বাল্যকালীন কোমল হৃদয়ে এই অশান্তি প্রায় অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। আমার পূর্ব্বপূজিত দেবতারা চক্ষু কর্ণের গ্রাহ্য প্রত্যক্ষ দেবতা ছিলেন ; "তোমার দেবতা কোথায় ?" বলিলে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ দ্বারা সহজেই তাঁহাদিগকে দেখাইয়া দিতে পারিতাম। কিন্তু নিরাকার ঈশ্বরকে এইরূপে সহজে দেখাইতে না পারিয়া ঘোর অশান্তিতে পড়িলাম। বাল্যকালে পৌত্তলিকতায় যে সরল বিশ্বাস থাকে, তাহা হারাইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইলে ব্রাহ্মধর্ম্ম সেই সরল বিশ্বাসের পরিবর্ত্তে কি দিতে পারেন ইহা একটী গভীর প্রশ্ন। আপনারা এই প্রশ্নটীর বিচার করিবেন। যাহা হউক আমি সেই ঘোর অশান্তিতে পড়িয়া সেই সময়ে ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে যে দুই একটী যুক্তিতর্কের কথা শুনিয়াছিলাম তদ্দ্বারা মনকে বুঝাইতে লাগিলাম, কিন্তু ইহাতে আমার সঙ্গী পরিতৃপ্ত হইলেন না। তিনি কিছু দিন নীরব থাকিয়া আবার মধ্যে মধ্যে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "তোমার ঈশ্বর কোথায় ?" ক্রমে ব্রাহ্মসমাজের সহজ জ্ঞানের মত শিক্ষা করিলাম। শুনিলাম ঈশ্বর-বিশ্বাস সমুদায় যুক্তিতর্কের অতীত, ইহা আত্মা নিহিত, ইহা সহজজ্ঞানসম্ভূত বিশ্বাস। কিছুদিন এই মতে তৃপ্ত রহিলাম। যখন সেই স্বর্গীয় দূত আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন "তোমার ঈশ্বর কোথায় ?"—"তুমি কেন তাঁহাকে বিশ্বাস কর ?" তখন বলিতাম তাঁহাকে বিশ্বাস করি এই জন্য যে তাঁহাতে বিশ্বাস স্বাভাবিক, সহজ-জ্ঞান সম্ভূত বিশ্বাস। ইহাতে তিনি কিছু দিন নীরব রহিলেন। কিন্তু ক্রমে দেখিলাম আমি এই সহজজ্ঞানের মত শিক্ষা করিয়াও সন্দেহের হাত হইতে রক্ষা পাই নাই, জীবন্ত বিশ্বাস লাভ করিতে পারি নাই। ক্রমে দেখিলাম সহজজ্ঞানের মত ঠিক হইতে পারে এবং আমি বিশ্বাস করি যে ইহা ঠিক, কিন্তু আমি প্রকৃত সহজ জ্ঞান পাই নাই। প্রকৃত সহজ জ্ঞান পাইলে আমি প্রকৃত বিশ্বাসও পাইতাম, বিশ্বাস আমার কাছে সহজ হইত। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বিশ্বাস আমার কাছে সহজ নহে ; আমার মন এখনও সন্দেহ-যুক্ত, প্রকৃত সরল বিশ্বাস আমার পক্ষে সহজ বস্তু নহে, অতি কঠিন ব্যাপার। সুতরাং সহজ জ্ঞানের মত আমাকে আর তৃপ্তি দিতে পারিল না। তখন বুঝিলাম জ্ঞান উপার্জ্জন করা আবশ্যক, ব্রহ্মকে না জানিলে তাঁহাতে প্রকৃত বিশ্বাস জন্মিবে না, সন্দেহ দূর হইবে না। তখন জ্ঞানালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। অনেক পাশ্চাত্য ব্রহ্ম জ্ঞানীর চরণ তলে বসিয়া জ্ঞানালোচনা করিলাম। এই জ্ঞানালোচনাদ্বারা প্রভূত উপকার লাভ করিলাম। অদূরদর্শী সন্দেহবাদী ও অজ্ঞেয়তাবাদীদিগের ভ্রম বুঝিতে পারিলাম। মন বিশ্বাসের সুদৃঢ় ভূমি পাইয়া কিছু দিনের জন্য পরিতৃপ্ত হইল। তখন যদি সেই স্বর্গীয় দূত জিজ্ঞাসা করিতেন—"তোমার ঈশ্বর কোথায় ?" তখন তাঁহাকে উপার্জ্জিত জ্ঞানের কথা বলিতাম, জগৎ ও আত্মার মধ্যে ঈশ্বরের কার্য্য দেখাইয়া বলিতাম কার্য্যের জ্ঞানবান্ কর্ত্তা যিনি তিনিই ঈশ্বর। ব্রহ্মজিজ্ঞাসা নীরব হইতেন। কিন্তু সময় বুঝিয়া তিনি আবার আসিলেন, আসিয়া বলিলেন, তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দিলে কৈ ? আমি জিজ্ঞাসা করি, "তোমার ঈশ্বর কোথায় ?" তুমি আমাকে পরোক্ষ জ্ঞানের কথা বল ; তুমি কি তোমার ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখিতেছ ? আমাকে দেখাও দেখি তোমার ঈশ্বর কোথায় ? তখন হৃদয়ে আবার অতৃপ্তি প্রবেশ করিল। বুঝিলাম ঈশ্বর সম্বন্ধীয় প্রত্যক্ষ জ্ঞান ভিন্ন, ঈশ্বর দর্শন ভিন্ন, আর কিছুতে আমাকে পরিতৃপ্ত করিতে

পারিবেনা। তখন, যে জ্ঞানের আলোচনায় অনেক পরিমাণে তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলাম সেই জ্ঞানালোচনাতেই আরও গভীর ভাবে মগ্ন হইতে লাগিলাম। আমি বিশ্বাস করি যে ব্রহ্মজ্ঞানেরই উচ্চতর অবস্থা ব্রহ্মদর্শন; উজ্জ্বল প্রত্যক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানই ব্রহ্মদর্শন; বিনীত শান্তমনে জ্ঞানের পথে চলিলে ব্রহ্মদর্শন লাভ করা যায়। যাহা হউক, জ্ঞানের পথে চলিয়া আমি অবশেষে বুঝিতে পারিলাম যে জগৎ জড়ময় নহে, জগৎ চিন্ময় —জগৎ ব্রহ্মময়। জগতকে জড়ময় মনে করা বহুল সন্দেহ ও অবিশ্বাসের কারণ। এই সত্য আমার নিকট যতই উজ্জ্বল হইতে লাগিল ততই আত্মা-চক্ষু প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল, চক্ষুর বহিরাবরণ সরিয়া যাইতে লাগিল। ক্রমেই দেখিতে লাগিলাম ব্রহ্ম কেবল বিশ্বের অন্তরালবর্ত্তী চিৎশক্তি নহেন, তিনি চিন্ময় বিশ্বরূপ। এই বহুমূল্য জ্ঞান সাধন করিয়া জীবনের প্রভূত উপকার হইল। বিশ্বাস অনেক পরিমাণে উজ্জ্বল হইল। কিন্তু ইহাতেও আত্মা পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করিল না। দেখিলাম ঈশ্বর বাহিরে প্রকাশিত, কিন্তু আমার আত্মা এখনও অন্ধকারাচ্ছন্ন। ঈশ্বর দর্শন করিতে হইলে বহির্জগতের দিকে তাকাইতে হয়, ইন্দ্রিয়ের সাহায্য লইতে হয়; ইন্দ্রিয় দ্বার বন্ধ করিলে অন্ধকার দেখি, ঈশ্বর এখনও প্রাণে প্রকাশিত হন নাই, এখনও যেন প্রাণ হইতে দূরে অবস্থিত রহিয়াছেন। ইহা দেখিয়া হৃদয় আবার অতৃপ্ত হইল, ঈশ্বরকে প্রাণে দর্শন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। ক্রমে এ সম্বন্ধেও আলোক পাইতে লাগিলাম। বুঝিলাম প্রাণের মধ্যে যে তাঁহাকে প্রাণের প্রাণ রূপে দেখিতে পাই না তাহার প্রধান কারণ আমার অহং ভাব; এই অহংভাবের আবরণ তাঁহার মুখকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। মোহে অন্ধ হইয়া যাহা নিজের নহে তাহাকে নিজের মনে করিতেছি। কিন্তু বাস্তবিক আমার নিজের কি আছে? সবই যে তাঁহার। অমি মনে করি—আমি জানি, আমি অনুভব করি, আমার নিজ শক্তিতে কার্য্য করি, আমি তাঁহা হইতে স্বতন্ত্ররূপে অবস্থিতি করিতেছি; কিন্তু এই সমস্ত যে নিতান্ত ভুল। তিনি আমার জ্ঞানের নিত্য আধার। আমার ভাবের নিত্য আধার। আমার শক্তির নিত্য আধার। আমার প্রত্যেক মুহূর্ত্তের চিন্তা,ভাব,শক্তি তাঁহা হইতে নিঃসৃত হইতেছে। যাহা লইয়া আমার আমিত্ব, আমার জ্ঞান, আমার ভাব, আমার শক্তি, আমার আত্মজ্ঞান সবই যে তাঁহার, তিনি প্রাণ স্বরূপ, তিনি জীবনাধার। এই সত্য যতই উজ্জ্বলরূপে উপলব্ধি করিতে লাগিলাম ততই আত্মার অন্ধকার ঘুচিয়া যাইতে লাগিল, অহংভাবের আবরণ সরিয়া যাইতে লাগিল— ঈশ্বরের প্রাণরূপী আত্মরূপী আবির্ভাব আত্মাতে উজ্জ্বলতররূপে প্রকাশিত হইতে লাগিল। ভ্রাতা ভগ্নীগণ, এই প্রকাশের ফল বর্ণনাতীত ইহা অনুভব করিবার বস্তু, ইহা বর্ণনা করা যায় না। ইহা আত্মাকে একেবারে মুগ্ধ করিয়া ফেলে, এক অতি মধুর নির্ম্মল আনন্দে আত্মাকে মগ্ন করিয়া ফেলে। সমুদায় শোক, অশান্তি, শুষ্কতা একেবারে দূর হইয়া যায়। ঈশ্বরের প্রেমানন্দের কথা কিঞ্চিৎ জানিতাম,—তাঁহাকে,প্রাণরূপে দর্শন করাতে যে এত আনন্দ তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না। কিন্তু এই দর্শনের ফল কেবল আনন্দ নহে; প্রেমপুণ্যও ইহার প্রত্যক্ষ ফল। অহংভাব বিনাশের সঙ্গে অপ্রেম, ও পাপের বীজও বিনষ্ট হয়। অহংভাবই স্বার্থপরতা, অপ্রেম ও পাপের বীজ। ইহা আমার, উহা আমার, আমার সুখ চাই, আমার লাভ চাই—তাঁহাকে ছাড়িয়া আমি আবার একটা কিছু যাহাকে তৃপ্ত করিতে হইবে;—তাঁহার ইচ্ছা ছাড়া আমার আবার একটা ইচ্ছা আছে, প্রবৃত্তি আছে যাহাকে পরিতৃপ্ত করিতে হইবে, তাঁহার কার্য্য ছাড়া আমার আবার কতক গুলি কার্য্য আছে যাহা করিতে হইবে,—এই মোহসম্ভূত ভ্রান্ত ধারণাই সমুদায় অপ্রেম ও পাপের বীজ। যে পরিমাণে নিজের অসারতা দেখি, আর তাঁহাকে সার বলিয়া উপলব্ধি করি, যে পরিমাণে তাঁহাকে প্রাণরূপে জীবনের জীবনরূপে দর্শন করি, সেই পরিমাণে স্বার্থপরতা অপ্রেম অপবিত্রতা চলিয়া যায়। ভ্রাতা ভগ্নীগণ, সাধনের এই অমূল্য সঙ্কেত পাইয়া আমি কৃতার্থ হইয়াছি। আমাকে লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া বলিতে হইতেছে আমি বিশ্বাস করি আমি তাঁহার অন্বেষণ পাইয়াছি; কোথায় গেলে তাঁহাকে দেখা যায়, তাঁহার প্রেম পুণ্যের ভাগী হওয়া যায় আমি তাঁহার সন্ধান পাইয়াছি। বিগত মাঘোৎসবের সময়ে আমি এই সাধনের আভাস পাইয়াছিলাম; এই এক বৎসর কাল যথা সাধ্য এই সাধন করিয়া প্রভূত উপকার পাইয়াছি, আশা করি আরও অনেক পাইব। তিনি কৃপা করিয়া আমার আমিত্ব বিনাশ করুন, জীবনে তাঁহার একাধিপত্য সম্পূর্ণ রূপে প্রতিষ্ঠিত করুন, তাঁহার জ্ঞানে, তাঁহার প্রেমে, তাঁহার সেবায় ডুবিয়া যাই।

এই দিবস অপরাহ্নে আলোচনা সভার পুনরধিবেশন ও তথায় প্রচার কার্য্য সম্বন্ধে আলোচনা হয়। সায়াহ্নে তত্ত্ববিদ্যা সভার উৎসব হইবার কথা ছিল। কিন্তু বিশেষ কারণবশতঃ উক্ত সময়ে বঙ্গমহিলা সমাজের সায়ংসমিতি হয়। এই সমিতিতে কলিকাতাস্থ ও মফঃস্বল হইতে আগত অনেক ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা একত্র সম্মিলিত হইয়াছিলেন। ফাদার লাঁফোঁ তাড়িত বল সম্বন্ধে কতকগুলি প্রক্রিয়া দেখাইতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, কিন্তু মেঘ বৃষ্টির সময় এই সকল প্রক্রিয়া দেখান যায় না বলিয়া তিনি উহা দেখাইতে পারেন নাই। কেবল সঙ্গীত ও কথাবার্ত্তা হইয়াই সমিতির কার্য্য শেষ হয়।

১৪ই মাঘ শুক্রবার।

এই দিন বাবু আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রাতঃকালীন উপাসনা নির্ব্বাহ করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের ভাব নিম্নে প্রকাশিত হইল;—

এবার উৎসবে কি সুন্দর দৃশ্যই দেখিলাম! বাস্তবিক পরমেশ্বরের কৃপায় অসম্ভব সম্ভব হয়, মৃত প্রাণে জীবন সঞ্চার হয়, পাষাণ বিগলিত হয়। নতুবা এ ভাবের উচ্ছ্বাস কোথা হইতে আসিল? আমাদের শুষ্ক প্রাণে প্রেমের স্রোত কেমন করিয়া প্রবাহিত হইল? ইহা কি মানুষের চেষ্টার ফল? আমরা যদি আপনারা ইচ্ছা করিয়া এরূপ ভাবের উচ্ছ্বাস আনয়ন করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আর ভাবনা কি

ছিল? তাহা হইলে ত আমরা চিরদিনই হৃদয়ে সরস ভাব রক্ষা করিতে পারিতাম। কিন্তু তাহা ত পারি না। তবে কেন বলিব না যে এই ভাবোচ্ছ্বাস দয়াময় পরমেশ্বরের করুণার প্রকাশ বই আর কিছুই নহে? আমাদের প্রত্যেকের জীবনে তাঁহার কৃপা প্রত্যক্ষ ভাবে কার্য্য করিতেছে। এই ব্রাহ্মসমাজে তাঁহার কৃপা-স্রোত নিয়ত প্রবাহিত হইতেছে। ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার কৃপার বিধান। বুদ্ধ, ঈশা, চৈতন্য প্রভৃতি মহাজনগণের জীবন যে প্রেমজলধির তরঙ্গোচ্ছ্বাস, ব্রাহ্মসমাজও সেই প্রেমজলধির তরঙ্গোচ্ছ্বাস ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই ব্রাহ্মসমাজরূপ বিধানের মধ্যে সেই বিশ্ব বিধাতার হস্ত প্রত্যক্ষ ভাবে কার্য্য করিতেছে। সমীরণ যখন শান্তভাবে প্রবাহিত হয় তখন কে তাহার শক্তির বিষয় চিন্তা করে? কিন্তু এই বায়ু যখন গগন মেদিনী মহাশব্দে পূর্ণ করিয়া, সমুদ্র বক্ষ আলোড়িত করিয়া, বৃহৎ বৃহৎ তরুরাজি সমূলে উৎপাটিত করিয়া, প্রকাণ্ডকায় অর্ণবযান সমূহকে ক্রীড়নকের ন্যায় ঊর্দ্ধে উত্থাপিত অথবা জলগর্ভে নিমজ্জিত করিয়া ভীম প্রভঞ্জনের আকারে প্রবাহিত হয় তখন লোকে তাহার পরাক্রম দেখিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া যায়। সেইরূপ পরমেশ্বরের কৃপাপবন জীবের অশেষবিধ কল্যাণ সাধনের জন্য নিয়ত প্রবাহিত হইতেছে। যখন উহা শান্তভাবে কার্য্য করে তখন আমরা উহার শক্তি অনুভব করিতে পারি না। কিন্তু যখন এই করুণা বিধানরূপে প্রকাশিত হয়, যখন নাস্তিকের হৃদয় কম্পিত করিয়া, সমাজের বক্ষ আলোড়িত করিয়া, পাপের পর্ব্বত উৎপাটিত করিয়া বিশ্ব বিধাতার কৃপা বায়ু প্রলয় পবনের ন্যায় প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন তাহার পরাক্রম দেখিয়া মানুষ বিস্মিত ও অবাক্ হইয়া যায়। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, যখন পৃথিবীর কোনও অংশের বায়ুর ভার নিকটবর্ত্তী প্রদেশের বায়ুর ভার অপেক্ষা বিশেষ পরিমাণে কমিয়া যায়, তখনই বায়ু সমুদ্রের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য মহাবাত্যা সংঘটিত হইয়া থাকে। ঈশ্বরের করুণা-বায়ু সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। যখন মানুষের দোষে জনসমাজে অসামঞ্জস্য উপস্থিত হয়, যখন ধর্ম্ম মৃতপ্রায় ও পাপ প্রবল হইয়া উঠে, যখন অন্যায় ও অত্যাচারের প্রাদুর্ভাব হয় ও জনসমাজের অংশ বিশেষ অপর অংশকে তাহাদের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখে, তখনই এই সামাজিক অসামঞ্জস্য দূর করিয়া সামঞ্জস্য বিধানের জন্য, অধর্ম্মকে পরাজিত ও ধর্ম্মকে জয়যুক্ত করিবার জন্য, ঈশ্বরের কৃপাপবন বিধানরূপ মহা ঝটিকার আকারে, ধর্ম্মবিপ্লবরূপ মহাবাত্যার আকারে জনসমাজকে আন্দোলিত করিতে থাকে। আজি এই অধঃপতিত দেশের উদ্ধারের জন্য, দেশের দুর্নীতির স্রোত নিবারণের জন্য, বিবিধ সামাজিক কুপ্রথা বিদূরিত করিবার জন্য দয়াময়ের করুণা ব্রাহ্মধর্ম্মরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। একবার বিশ্বাস চক্ষে চাহিয়া দেখ, দেখিবে তাঁহার কৃপাহস্ত ইহার মধ্যে কার্য্য করিতেছে। তিনি দয়া করিয়া আমাদিগকে এই বিধান স্রোতের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছেন। আমরা অতি দীন হীন, দুর্ব্বল তাহাত সত্য। কিন্তু আমরা যদি বিশ্বাসের সহিত তাঁহার উপর নির্ভর করিতে পারি তাহা হইলে তাঁহার কৃপায় আমাদের ন্যায় সামান্য লোকদিগের দ্বারাও তিনি আশ্চর্য্য কার্য্য সকল সম্পন্ন করাইয়া লইবেন। তাঁহার কৃপায় বাস্তবিকই অসম্ভব সম্ভব হয়। তাঁহার কৃপায় বাস্তবিকই বোবায় কথা কয়। আমার নিজের জীবন তাহার সাক্ষী। আমার বক্তৃতা শক্তি নাই; আমি সাধারণের সমক্ষে দুইটা কথা গুছাইয়া বলিতে পারি না। কিন্তু আজি তাঁহার কৃপায় কত স্বর্গীয় কথা আমার মুখ দিয়া বাহির হইতেছে। ইহা তাঁহার করুণা নহে ত কি?

ভয় কি? ভাবনা কি? প্রভু নিজে যখন আমাদিগকে তাঁহার এই কৃপা বিধানের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছেন তখন কি ইহাতে তাঁহার কোনও উদ্দেশ্য নাই? তিনি ইচ্ছা করিলে অতি সামান্য যন্ত্র দ্বারাও অলৌকিক কার্য্য করাইয়া লইতে পারেন। যাদুকরেরা যেমন এক মুষ্টি ধূলি লইয়া তাহা অন্য বস্তুতে পরিণত করে, সেইরূপ সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর পৃথিবীর ধূলিকেও নিজ শক্তি দ্বারা এমন ভাবে অনুপ্রাণিত করিতে পারেন যে সেই ধূলি মুষ্টি জলন্ত কামানের গোলার ন্যায় পাপের দুর্গ কম্পিত ও ধরাশায়ী করিতে পারে। তাঁহার রাজ্যে একটী ক্ষুদ্র পিপীলিকাও বৃথা সৃষ্ট হয় নাই, আর তিনি কৃপা করিয়া স্বয়ং যাহাদিগকে তাঁহার বিধানের মধ্যে আনিয়াছেন তাহাদের জীবনের বিশেষ কোনও কার্য্য নাই ইহা কি সম্ভব? আমাদের মধ্যে অতি সামান্য যিনি তাঁহারও কিছু করিবার আছে, দিবার আছে। আমরা যেন কেহ কাহাকেও তুচ্ছ বোধে উপেক্ষা না করি। জ্ঞানী ভাই! ভাবুকের ভাবোচ্ছ্বাসকে তুচ্ছ করিও না। সুকোমল ভাব কুসুমগুলিকে রুক্ষভাবে দলিত করিও না। ভাবুক ভাই! তোমাকেও বলি জ্ঞানকে তুচ্ছ করিও না। যিনি কর্ম্মী তিনিও যেন জ্ঞান ও ভাবকে উপহাস না করেন। জ্ঞান, ভাব, কর্ম্ম সকলই চাই। সকলের সামঞ্জস্য বিধানের জন্যই ব্রাহ্মধর্ম্ম আসিয়াছেন। যিনি জ্ঞান ও কর্ম্মকে তুচ্ছ করিয়া কেবল ভাবেরই সমাদর করেন, তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের মহত্ত্ব বুঝেন নাই। যিনি কর্ম্ম ও ভাবকে উপেক্ষা করিয়া কেবল জ্ঞানকেই সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রদান করেন, তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের মহত্ত্ব বুঝিতে পারেন নাই। যিনি জ্ঞান ও ভাবকে অবহেলা করিয়া কেবল শুষ্ক কর্ম্মের মধ্যে পরিত্রাণ অন্বেষণ করেন, ব্রাহ্মসমাজকে কেবল সমাজসংস্কারের স্থান বলিয়া মনে করেন, তিনিও ব্রাহ্মধর্ম্মের মহত্ত্ব বুঝিতে পারেন নাই। ব্রাহ্ম জীবনের পূর্ণতা বিধানের জন্য জ্ঞান, ভাব ও কর্ম্ম এই তিনই সমান প্রয়োজনীয়। আমাদের দেশের যোগ ভক্তি, খৃষ্টধর্ম্মের বিশ্বাস, নির্ভর ও ঈশ্বরের কার্য্যে আত্মসমর্পণ, প্রাচ্য ভাবুকতা ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান—ব্রাহ্মধর্ম্মের উদার বক্ষে এ সকলেরই জন্য স্থান আছে—কেবল আছে নহে, এ সকলের একত্র সমাবেশেই ব্রাহ্মধর্ম্মের ও ব্রাহ্ম জীবনের পূর্ণতা। ইহার কোনটীকেই আমরা ছাড়িতে পারি না। ব্রাহ্মধর্ম্মের মহত্ত্ব ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। ইহা ক্রীড়ার বস্তু নহে, ইহা

মানুষের কল্পিত ধর্ম্ম নহে। ইহা বিশ্ববিধাতার জীবন্ত ধর্ম্ম-বিধান। বিশ্বাসের সহিত তাঁহার উপর নির্ভর করিতে পারিলে নিশ্চয়ই তাঁহার কৃপাস্রোত আমাদের উপর দিয়া প্রবাহিত হইবে। আমরা যে অতি অপদার্থ তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু আমরা যদি একান্তমনে তাঁহার উপর নির্ভর করিতে পারি, আমরা যদি আপনাদের অযোগ্যতা অনুভব করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইতে পারি, আমরা যদি নিজের সুখ স্বার্থ ও মান অভিমান, নিজের প্রবৃত্তি ও রুচি তাঁহার চরণে বলিদান দিয়া তাঁহার কৃপাস্রোতে গা ঢালিয়া দিতে পারি, তাহা হইলে তিনি এই অপদার্থ লোকদের দ্বারাই নিজের কার্য্য সাধন করাইয়া লইবেন, এই দুর্ব্বল অকিঞ্চিৎকর লোকদিগকেই তাঁহার শক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ করিবেন।

সায়াহ্নে ৩॥০ টার সময় বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র "ধর্ম্মবীরদিগের জীবন চরিত" সম্বন্ধে একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। সঙ্গীত ও প্রার্থনার পর বক্তৃতা আরম্ভ হয়, এবং বক্তৃতান্তে পুনরায় প্রার্থনা ও সঙ্গীত হয়। বক্তৃতা শেষ করিতে প্রায় আড়াই ঘণ্টা লাগিয়াছিল, অথচ সকলেই আদ্যোপান্ত সমান আগ্রহের সহিত বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন। বক্তৃতার বিস্তারিত বিবরণ ভবিষ্যতে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

১৫ই মাঘ শনিবার।

এই দিবস প্রাতঃকালে বাবু অঘোর নাথ মুখোপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করেন ও উপদেশ দেন। উপদেশের সারাংশ নিম্নে প্রকটিত হইল;—

১১ ই মাঘের উৎসবের শেষ দিন আসিয়া উপস্থিত। অনন্ত ব্রহ্মের উৎসব শেষ হইতে চলিল। আমরা এই উৎসবে অনেক শুনিয়াছি, বলিয়াছি। যাঁহারা প্রাণারামের আশ্রয়ে আরাম সম্ভোগ করিয়াছেন, তাঁহার নামে যাঁহাদের প্রাণ শীতল হইয়াছে তাঁহারা ধন্য হইয়াছেন। আশা করি, এমন কেহ নাই যাঁহারা সেরূপ আরাম পান নাই। আমাদের মধ্যে অনেক অভাগা,অভাগিনী আছেন জানি,উৎসবে তাঁহাদের কি হইল বুঝিতে পারি নাই, উৎসবের ব্যাপার শেষ হইলে বুঝিব কি হইয়াছিল।

ঈশ্বর নিজে প্রকাশিত হইয়াছিলেন। একথা কল্পনা নহে। সে প্রকাশ কি আমরা চক্ষে দেখিয়াছি? দেখিয়াছি, ব্রহ্মমন্দিরে ভক্তদের ক্রন্দনে, হাস্যে ও সঙ্গীতে প্রভুকে প্রকাশিত হইতে আমরা দেখিয়াছি। তিনি চিরপ্রকাশ কিন্তু আমরা তাহা সর্ব্বদা বুঝিতে পারি না বলিয়া তিনি আমাদিগকে তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন, সকলকে একাসনে বসাইয়া অন্তরের মলিনতা ও দুর্গন্ধ বিদূরিত করিয়াছেন, যে দুর্গন্ধ অতি যত্নে সংবৎসর কাল আমরা পোষণ করিয়াছিলাম পরমেশ্বর সত্য সত্যই তাহা দূর করিয়া সকল হৃদয়কে পবিত্র বসন ভূষণে সুসজ্জিত করিয়া দিয়াছেন।

এখনও সে দৃশ্য ভুলিতে পারি নাই। কিন্তু মনে ভয় হইতেছে। ভয়ের কথা উল্লেখ করিতে ইচ্ছা হয় না, কি জানি ভয়ের সঙ্গে আশা সরিয়া পাছে পড়ে। ভয় এই যে আমরা যে সঙ্গীত, হাস্য ও নৃত্য করিলাম আমাদের এই মত্ততা কতক্ষণ স্থায়ী হইবে। আনন্দ করিয়াছি সত্য কিন্তু আনন্দ থাকিবে কতক্ষণ? একাকার হইয়াছিল সত্য একাকার রক্ষিত হইবে কি না। আমার মত ক্ষুদ্র হৃদয় যদি কাহারও থাকে, তাহা হইলে তিনি আমার মত এই চিন্তা করিতেছেন। ভয় করিব না সত্য, কেন না প্রভু মাভৈঃ রবে আশা দিতেছেন; এখনও আমরা পড়ি নাই, নিদ্রিত হই নাই, মন্দির ত্যাগ করি নাই, আনন্দ সম্ভোষের জন্য প্রত্যহ প্রাতে এখানে আসিতেছি, প্রভু আশা দিয়াছেন, সুখী করিয়াছেন বলিয়া এই লোভ আমরা সম্বরণ করিতে পারি নাই। আমরা ক্ষুদ্র বিষয় লোভের দাস, কিন্তু মহান প্রেমময়ের লোভের আকর্ষণ অতিক্রম করিতে পারি নাই। এই আশঙ্কা যে, এই চিত্র আমাদের প্রাণে অঙ্কিত থাকিবে না; প্রতি বৎসরে যেমন হয় এবার এই নূতন বৎসরেও সেইরূপ দুর্দ্দশা হইবে! অতি যত্নে স্নেহময়ী জননী যে সকল সম্ভাব দিয়াছেন আমার মত লোকের তাহাই যথেষ্ট, যাঁহারা ভক্ত তাঁহারা কত প্রকার উপহার মস্তক পাতিয়া লইয়াছেন, সেই সকল উপহারে তাঁহাদিগকে সুসজ্জিত দেখিতেছি, রিপুগণ যেখানে গিয়া অপহরণ করিতে পারে না; হৃদয়ের সেই গভীরতম স্থানে তাঁহারা সেই সকল উপহার অতি যত্নে রক্ষা করিবেন। সমস্ত বৎসর সেই ভাণ্ডার হইতে অমৃত পান করিবেন। কিন্তু যাঁহাদের ভাগ্যে তাহা হইবে না তাঁহাদের বড়ই দুর্দ্দশা! উৎসব আমাদিগকে অমৃত দান করিয়াছে হতভাগ্য লোকের পক্ষে তাহা বিপরীত। তাহাদের বরং উৎসবে না আসিলে ভাল ছিল। এত আনন্দ সদ্ভাব প্রেম ভক্তি দেখিয়া দুর্ভাগা জীবের প্রাণে হিংসা, অন্তরে গরল সঞ্চার হইল।

উৎসবের দিন চলিয়া গেল এখন আমরা কি করিব? অযাচিত ভাবে যে এত ধনরত্ন ও আশীর্ব্বাদ লাভ করিলাম ইহার মধ্যেই দেখিতেছি যে তাহা দূর করিবার যন্ত্র ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিতেছি। কত হাস্য নৃত্য চীৎকার করিয়া সঙ্গীত করিয়াছি। পরমেশ্বর আমাদের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া আমাদিগকে উন্মত্ত করিয়াছিলেন। সে অনুরাগ সে উৎসাহ ইহার মধ্যেই কতক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে, উৎসবের দিনের সে প্রাতঃকাল ও আজিকার প্রাতঃকালে অনেক প্রভেদ। স্নেহময়ী স্নেহ করিয়া যাহা দিলেন তাহা কি হ্রাস হইতে দিব? যাহাতে ঈশ্বরের দান অন্তর্হিত হইয়া না যায় সে জন্য আমাদিগকে চেষ্টা করিতে হইবে। যাঁহারা আপন হৃদয়ের সদ্ভাব দান করিয়াছেন, তাঁহারা ধন্য; যাঁহারা সেরূপ পারেন নাই তাঁহারা ক্রন্দন করুন, চিন্তা করুন। এখনও সময় আছে অন্য চিন্তা পরিত্যাগ করুন। সমস্ত বৎসর সম্মুখে রহিয়াছে হিংসা নিন্দা পরচর্চ্চায় উৎসব ক্ষেত্রকে কলঙ্কিত করে এরূপ লোক নাই, থাকিতে পারে না। স্নেহময়ীর স্নেহগুণে সকলেরই এখন একভাব এক প্রাণ। যাহাতে এই ভাব রক্ষা করিতে পারি তাহার চেষ্টা দেখি। আমাদের ইচ্ছাতে কিছুই হইবে না,পরমেশ্বরের ইচ্ছা রক্ষা করিতে পারে। তিনি ইচ্ছাময়, তিনি রক্ষা করিলে বাঁচিয়া যাই, নতুবা জানিনা

কোন মুহূর্ত্তে আমাদের ভাব উড়িয়া যাইবে চিহ্ন মাত্র থাকিবে না।

জ্ঞান, ভক্তি ও জীবনের এখনই যে আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে যাঁহাদের মধ্যে সাধুভাব আছে তাহা লজ্জার ভয়ে অন্তর্হিত হইতেছে। ভাই ভগিনি, কেন তোমরা আলোচনা করিয়া স্বর্গীয় রত্ন ঠেলিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিতেছ? কেহ বলিতেছেন অমুক লোকটা কি করিল, কেহ বলিতেছেন এই উৎসবের মধ্যে কি সত্য পাওয়া গেল? প্রত্যেকেই কি সত্য সংগ্রহ করিয়াছেন? আমি যতটুকু দেখিয়াছি তাহা এই যে, ঈশ্বর সত্য, তাঁর নাম সত্য। তিনি শিবসুন্দর এই শব্দ দুইটী জানি, তাহাতে কি? তিনি মঙ্গলময়, অতি রমণীয় জানিলেই কি মঙ্গল ভাবে ডুবিয়া যাইতে পারি, তাঁহার আকর্ষণ অনুভব করিতে পারি? জ্ঞানে শিবসুন্দর মঙ্গল জানা, আর সেই সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হওয়া এক নহে। কি হবে সে জ্ঞানে যাহা মুক্তি পথের সহায় হইল না? জ্ঞানী সেরূপ হইতে চাই না। যদি কেহ বলেন যে, জ্ঞান চক্ষু না থাকিলে সুন্দর অসুন্দর কিরূপে নির্ণয় করিব? চক্ষু ব্যতীত কর্ণাদি আরও জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে। অনন্তের দ্বার অনন্ত, প্রকাশও অনন্ত। অনন্ত দ্বার দিয়া তিনি প্রকাশিত হন। কেবল যে চক্ষু দিয়া আমরা দেখি তাহা নহে। শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে কোন অঙ্গ বিশেষ ব্যতীত জীবন ধারণ অসম্ভব এ কথা আমি বিশ্বাস করিতে পারি না চক্ষুতে রোগ হইলে সে রোগ হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা কর, কিন্তু অন্যান্য অঙ্গকেই রক্ষা করা চাই। অন্যান্য অঙ্গকে ত্যাগ করিয়া চক্ষু রক্ষা করা জীবন ধারণ নহে। জ্ঞান চক্ষু, ভক্তি শরীর। সমস্ত শরীর বিনাশ প্রাপ্ত হউক, চক্ষু রক্ষা হউক, এ কিরূপ আশা? শরীর গেলে চক্ষু থাকে না, চক্ষু গেলেও শরীর থাকে না। জ্ঞান চক্ষুর সহিত মিলিত হইয়া আমি পূর্ণ আত্মা। জ্ঞান বিনা সুন্দর দেখিতে পাইব না। সুন্দর কি?—ব্রহ্ম। শিব সুন্দর যিনি, তিনিই সুন্দর।

আমরা আধ্যাত্মিক জগতে শিশু। আমাদের ভয় নাই, উল্লাস,হাস্য,নৃত্য ও ক্রন্দন আছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশু সংসারে খেলা করিয়া বেড়ায়। উহাতে তাহাদের অঙ্গ সুন্দররূপে চালিত, হৃষ্ট পুষ্ট ও কর্ম্মক্ষম হয় এবং বল লাভ করে। সেই জন্য শিশু ক্রীড়া করিয়া থাকে। মাতৃ ক্রোড়ে শিশু শুইয়া আছে, তাহার চক্ষু কি দেখিতেছে জানি না—কিন্তু হস্ত পদ সঞ্চালিত হইতেছে, সে হাস্য, ক্রন্দন ও ক্রীড়া করিতেছে। অধ্যাত্ম জগতে আমাদের সেইরূপ অবস্থা। আমরা শিশু, আমাদের শিশু-আত্মা ক্রন্দন ও হাস্য করিবে, ভাবের উচ্ছ্বাস হইবে। তাহা না হইলে আত্মার বিকাশ হইবে না। উহা যদিও জীবনের একটী মাত্র বিভাগ, কিন্তু উহা আবশ্যক। ক্রমশঃ যখন আত্মা সুগঠিত হইয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে, তখন সে হাস্য, ক্রন্দন উল্লাস আদি বাতুলের ন্যায় ব্যবহার করিবে না। যাহাদের আত্মা শৈশবাবস্থায় তাহাদের অন্য কোন প্রলোভন নাই, তাহারা আর কি করিবে? তাহারা আত্মসম্বরণ করিতে পারে না।

সুবিজ্ঞ, জ্ঞানী কেবল জ্ঞানের অভিমান ও চক্ষু লইয়া আছেন। অন্যান্য অঙ্গ সম্বন্ধে তিনি উদাসীন। আমরা চিরকাল শিশু থাকিব না—অন্ধ যে সে চক্ষু পাইবে। তবে যত্ন, চেষ্টা, প্রার্থনা চাই। জ্ঞানাভিমানী ভাই, কেন বলিতেছ, ইহারা বাতুলের মত প্রলাপ বকিতেছে? তোমার মধ্য দিয়া দেখিতেছি পরম জ্ঞানদাতা আমাকে সতর্ক করিতেছেন। তুমি একটু জ্ঞানের দিকে, আমি একটু ভাবের দিকে। ভক্তি অন্ধ নহে; কারণ, ভাব ও জ্ঞানের মিলনেই প্রকৃত ভক্তি। ভাবের উচ্ছ্বাস অঙ্গমাত্র লক্ষ্য নহে। ভক্তি ও জ্ঞান এই দুইয়ের মিলন যেস্থানে, যেখানে পরম যোগী সকলের সহিত সংযুক্ত সেইখানে যাইব। জ্ঞানশূন্য ভক্তিকে ভাব বলি। যখন ভক্তি জ্ঞান পূর্ণ হইবে, তখন আত্মা পূর্ণাকার প্রাপ্ত হইবে। ঈশ্বরের ইচ্ছা যে সকল প্রকার শক্তিরই বিকাশ হয়। শক্তি বিশেষের বিকাশ তাঁহার ইচ্ছা বিরুদ্ধ।

ঈশ্বর স্বয়ং আমাদিগকে ধরিয়া আকর্ষণ করিতেছেন। তাঁহার সাবধান করা একরূপ, আর আমাদের সাবধান করা আর একরূপ। তিনি সাবধান করেন অতি যত্নে, অতি সংগোপনে। আমাদের তাহার বিপরীত। তুমি যে ভাই নৃত্য করিলে, উহা কি আসল না নকল? যতটুকু আসল ততটুকু লাভ, যতটুকু নকল ততটুকু ক্ষতি। যাঁহার আসল, তাঁহার চরণে প্রণাম করিব, যাঁহার নকল তাঁহাকে ওরূপ করিও না বলিয়া সাবধান করিয়া দিব। ভাবুকদিগকে জ্ঞানশিক্ষা দিব, জ্ঞানাভিমানীদিগকে ভাবুকতা শিক্ষা দিব। আমরা বালক, ভাবে আমরা আরাম পাই, এ উপকার হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিও না। জ্ঞানী, অভিমানী কর কিসের? যতটুকু তোমার অভিমান, ততটুকু তুমি ঈশ্বর হইতে দূরে। ঈশ্বর তোমার অভিমানের অন্তরালে। তুমি আগে অভিমান দূর কর তবে ঈশ্বর আসিতে পারিবেন। যে জ্ঞানে অভিমান, সে জ্ঞান জ্ঞান নহে। ভাবুক যাঁহারা তাঁহারা জ্ঞানীদিগকে আকর্ষণ করেন, জ্ঞানীরা ভাবুকদিগকে অকর্ষণ করেন। স্নেহময়ী জননী ভাবুক কন্যা, জ্ঞানী পুত্র একত্র করিয়া উৎসব সম্ভোগ করান। ভয় করিও না। জ্ঞানী, প্রলাপ বলিয়া ভাবুকতাকে ঘৃণা করিও না। ভাবুক,জ্ঞানকে অভিমান বলিয়া অবজ্ঞাচক্ষে দেখিও না। জ্ঞানী, মহাভাবে লোকে কি করিয়া থাকে না দেখিয়া থাকতো শিক্ষাকর, পরে মন্তব্য প্রকাশ করিও। ভাবুক, তোমার ভাব যদি নকল ও পাঁচজনের সঙ্গে থাকা হেতু উৎসাহজনিত হয়, তাহা হইলে সে ভাব কখনই থাকিবে না।

এগারই মাঘের উৎসবের শেষ আসিয়া উপস্থিত। অনন্তরূপিণীর অনন্ত উৎসবের শেষ নাই এস তাঁর চরণে পড়িয়া অনন্ত কাল তাঁর উৎসব করি। এখন যদি উৎসবের ভাবের বিলোপের চেষ্টা করি, ক্ষতিগ্রস্ত হইব। ভাই ভগিনী, সাবধান! কত কি দেখিলে, প্রাণের মধ্যে কত কি পাইলে, ধরিলে দেখিলে, কাঁদিয়া হাসিলে, হাসিয়া কাঁদিলে, সুখে দুঃখে, দুঃখে সুখে উলটা পালটা হইয়া গেল। সাধু অসাধু, জ্ঞানী মূর্খ, সরস কঠিন কে কোথায় রহিলে? কে এক করিল,কে কঠিন লোহকে বিগলিত করিল? ব্রহ্মবিৎ পণ্ডিত মূর্খের গলা জড়াইয়া ধরিল,

কাহারও লজ্জা হইল না। পণ্ডিত মূর্খের গলা ধরিয়া ক্রন্দন করিল। স্নেহময়ীর নিকট পণ্ডিত মূর্খ, বিদ্বান্ অবিদ্বান্ ধনী নির্ধন নাই। যিনি এমন করে বিগলিত করেন, সাবধান আবার তাঁহার সম্বন্ধে কঠিন হইও না। বাহিরের শীতল, বায়ু বা জল যদি লাগে, তবে প্রাণ আবার কঠিন হইয়া যাইবে। এখন যদি কিছু গড়িতে চাও, তবে এই বেলা গঠন করিয়া লও। তিনি অনেক নিরাকার মূর্ত্তি দেখাইলেন, সর্ব্বাগ্রে এই তরল অবস্থায় শীঘ্র প্রেমের মূর্ত্তি গঠন কর, আর গঠন করিয়া অতি যত্নে রক্ষা কর। আমার চক্ষে সকলই প্রেমময় দেখিতেছি। গঠনের সময় উপস্থিত, এ সময় হারাইও না, গত বৎসরের মত ভাঙ্গিও না। এখনও গড়িতে পার, কোমল আছে; কঠিন হইলে ভাঙ্গিয়া যাইবে। উৎসবের পূর্ব্বদিকের সূর্য্য ক্রমশঃ অস্ত যাইবে। যখন সে আবার উদিত হইবে, তখন মহিমা প্রচার হইবে। এখন কি আমাদের হৃদয় ঘর বন্ধ? যদি বন্ধ থাকে তবে খুলিয়া দাও। যাহা দেখিয়াছ সে সকল ভাব স্মরণ কর এবং তরল হয়, দেখিতে পাইবে যে জনচিত্তহারী আবার চিত্তে বিহার করিবেন। ভয় করিও না।

ব্রহ্মবিদ্যালয় ও তত্ত্ববিদ্যা সভার উৎসব।

সায়ংকালে তত্ত্ববিদ্যা সভা ও ব্রহ্মবিদ্যালয়ের বার্ষিক সভা হয়। ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সঙ্গীত ও প্রার্থনানন্তর তত্ত্ববিদ্যা সভার বার্ষিক কার্য্য বিবরণ পঠিত হয়। তাহাতে সভার উদ্দেশ্য, কার্য্য প্রণালী, বক্তৃতা ও বক্তাদিগের তালিকা, ভবিষ্যৎ কার্য্য প্রণালীর আভাস প্রভৃতি বিষয় বিবৃত হয়। এই পত্রিকার পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যায় এই সমুদায় বিষয় প্রায় সমস্তই প্রকাশিত হইয়াছে, সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ করা গেল না। তৎপর আর একটী সঙ্গীতের পর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের কার্য্য বিবরণ পঠিত হয়। শিক্ষকদিগের কার্য্যাধিক্য ও অসুস্থতা নিবন্ধন এবৎসর এই বিদ্যালয়ের কার্য্য তাদৃশ সন্তোষকর হয় নাই। যাহা হউক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি বিদ্যালয়ের হিতাকাঙ্ক্ষিগণের স্নেহদৃষ্টি ইহার উপর অব্যাহত রহিয়াছে এবং আগামী বার যাহাতে বিদ্যালয়ের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, তাহার আয়োজন হইতেছে।

ছাত্রসংখ্যা বৎসরের প্রথমভাগে ন্যূনাধিক ৪০ জন ও শেষভাগে ন্যূনাধিক ২০ জন ছিল, ১০ জন মাত্র বার্ষিক পরীক্ষায় উপস্থিত হন; তন্মধ্যে এই ৭জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন প্রথম শ্রেণী—(১) জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ ২'ক, অবিনাশচন্দ্র সরকার ২ খ, যশোদালাল সাহা। দ্বিতীয় শ্রেণী—(১) প্রিয়বন্ধু নিয়োগী, (২) সীতানাথ চক্রবর্ত্তী, (৩) আভরণচন্দ্র রায়। তৃতীয় শ্রেণী—শ্রীমতী সুশীলাবালা ঘোষ। তৎপরে ছাত্রদিগকে পুরস্কার বিতরণ করা হইলে বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও সর্ব্বশেষে সভাপতি মহাশয় ব্রহ্মবিদ্যালয় ও তত্ত্ববিদ্যা সভা সম্বন্ধে আপন আপন মন্তব্য প্রকাশ করেন। বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় জ্ঞানালোচনার আবশ্যকতা এবং ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উপকারিতা সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করেন। প্রকৃত ধর্ম্ম জীবন লাভ ও ধর্ম্মের বিশুদ্ধতারক্ষার পক্ষে জ্ঞানালোচনা যে নিতান্ত আবশ্যক, নানা যুক্তি ও দৃষ্টান্ত দ্বারা সকলে তাহাই প্রদর্শন করেন। বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত প্রাচীন ভারতে ব্রহ্মবিদ্যালোচনার কি জ্বলন্ত উৎসাহ ছিল, ব্রহ্মবিদ্যা কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিল, ব্রহ্মজ্ঞান হইতে বিচ্যুত হওয়াই যে আমাদের বর্ত্তমান দুর্গতির একটী প্রধান কারণ, ব্রাহ্মসমাজে ব্রহ্মবিদ্যালয় দ্বারা যে কত উপকার দর্শিয়াছে, এই সমুদায় বিষয় বিবৃত করিয়া কি ভাবে ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা করিতে হয় তদ্বিষয়ে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে উপদেশ দেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী—ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার হইতেছে বটে, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মকে জ্ঞানে ও কার্য্যে জীবনে সুন্দররূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা অতি অল্পই হইয়াছে—এই সুদৃঢ়ীকরণ কার্য্যে ব্রহ্মবিদ্যালয় ও তত্ত্ববিদ্যা সভা দুটি প্রধান সহায়, এককালে ব্রাহ্মসমাজ জ্ঞানে দেশের নেতা ছিলেন, এখন ব্রাহ্মসমাজে জ্ঞানালোচনার হ্রাস হওয়াতে ব্রাহ্মসমাজ সেই নেতৃত্ব হারাইয়াছেন ও উপহাসের পাত্র হইয়াছেন—এই সমুদায় প্রদর্শন করিয়া এই সভা ও বিদ্যালয়ের কার্য্যে আগামী বৎসর স্বয়ং বিশেষভাবে যত্নবান্ হইবার সঙ্কল্প প্রকাশ করেন। ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায়—ব্রাহ্মসমাজে প্রকৃত ধর্ম্মজ্ঞানের অভাব, ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ক পুস্তকের অল্পতা, তত্ত্ববিদ্যা সভা ও ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য, ব্রাহ্মধর্ম্ম বিশেষতঃ ব্রহ্মসাধন প্রণালীর বিশুদ্ধতা ও ব্রাহ্মসমাজের একতা রক্ষার জন্য জ্ঞানালোচনার আবশ্যকতা, ব্রহ্ম বিদ্যালোচনার প্রণালী, ইত্যাদি বিষয় বিবৃত করিয়া বলেন যে, ঈশ্বর সম্বন্ধীয় প্রত্যক্ষজ্ঞান সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজ যে সত্য রত্ন লাভ করিয়াছেন, তাহা সভ্য জগতে প্রচার করিতে গেলে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা, আধ্যাত্মিক ভাব মূর্খ জ্ঞানী উভয়েরই থাকিতে পারে, কিন্তু কোন ভাব সত্য ধর্ম্মানুমোদিত এবং কোন ভাব বিকৃত, তাহা জ্ঞানী ভিন্ন কেহই বলিতে পারে না। প্রকৃত ভক্তি কি? 'প্রকৃত উপাসনা কাহাকে বলে' এই সকল প্রশ্নের উত্তর কেবল ভক্ত যিনি, কেবল উপাসক যিনি তিনি দিতে পারেন না; যিনি ভক্ত ও উপাসক, অথচ জ্ঞানী, কেবল তিনিই দিতে পারেন। এই আলোচনা শেষ হইলে সঙ্গীতানন্তর সভার কার্য্য শেষ হয়।

১৬ই মাঘ রবিবার।

অদ্য উদ্যান-সম্মিলন, প্রাতঃকালে সকলে আহীরিটোলার ঘাটে নৌকারোহণ করিয়া দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে পৌছিলেন। সেখান হইতে অনেকে হইয়া খোল ও করতাল যোগে ব্রহ্মনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে বাবু শম্ভুচরণ মল্লিক মহাশয়ের বাগানে উপস্থিত হইলেন। তথায় প্রায় ছয় শত ভ্রাতা ভগ্নী সমবেত হইয়া চন্দ্রাতপ ছায়াতে ব্রহ্মোপাসনাতে প্রবৃত্ত হইলেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই স্থানে নিম্নলিখিত ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন।

শ্রীমতী কামিনী সেন বি, এ, শ্রীমতী হেমলতা ভট্টাচার্য্য, শ্রীমতী কিশোরীবালা দেবী, বাবু রসিকলাল দত্ত, বাবু আভরণ চন্দ্র রায়, বাবু বামনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ও বাবু ভুবনমোহন ভট্টাচার্য্য।

সায়াহ্নে উপাসকগণ পুনরায় উপাসনামন্দিরে সমবেত

হইলে পর, যথারীতি উপাসনা হয়। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় উপাসনার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন ও উপদেশ দেন। উপদেশের ভাব নিম্নে প্রদত্ত হইল ;—

উৎসবের মধ্যে আমি একটী বিশেষ উপহার পাইয়াছি। উপদেশ পাইতে পারি বলিয়া সে বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি। একজন লোক আমাকে একখানি পত্র লিখিয়াছেন। লোকটীর ব্রাহ্মধর্ম্মে অনুরাগ আছে। দেশের লোকে ব্রাহ্মদিগের উপর যে সকল কটূক্তি করে, তাহার কতকগুলি তিনি সেই পত্রে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ঐ কটূক্তি বিশেষ বিশেষ ব্রাহ্মের দোষ কীর্ত্তন। উহা নিতান্তই অমূলক বলিয়া উপেক্ষার যোগ্য। ঐ সকল কটূক্তির সাধারণ মর্ম্ম এই যে, ব্রাহ্মেরা সকলেই কপট এই যে শত শত নরনারী ঈশ্বর পূজার জন্য ব্যাকুল হইয়া আসিয়াছে, এই যে জীবন্ত ঈশ্বরের উপাসনা ও তাঁহার নাম প্রচার হইতেছে, এ সকল কপটতা ও স্বার্থসাধন। কি স্বার্থসাধনের জন্য এই উপাসনা ও প্রচারাদি হইতেছে, পত্রে তাহার কোন উল্লেখ নাই, চিন্তা করিয়া তাহা পাওয়াও সুকঠিন। এত ক্লেশ পাইয়া পার্থিব সুখের প্রত্যাশা ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মেরা কেন সে সকল কার্য্য করিতেছে, তাহার উল্লেখ পত্রে নাই, পত্রলেখক সে বিষয়ে চিন্তাও করেন নাই। এতগুলি পিপাসু আত্মা সবাই কপট, এ কথা তিনি কিরূপে সম্ভব বলিয়া, বিশ্বাস করিলেন বলিতে পারি না। এই কথায় আমার দুইটি গল্প মনে পড়িল। একজন লোক তাঁহার স্ত্রীকে খুব প্রহার করিতেন, স্ত্রীও তার প্রতিশোধ দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। কথায় কথায় উভয়ের সর্ব্বদাই বিবাদ হইত। তাঁহাদের কলহের উৎপাতে পাড়ার লোক নিদ্রা যাইতে পারিত না। রাত্রি নাই, দিন নাই, তুচ্ছ কথা লইয়া তাঁহাদের কাটাকাটি, মারামারি, ক্রন্দন ও চীৎকার শুনা যাইত। কিছুদিন পরে তাঁহাদের একটী কন্যা হইল। কন্যাটী ক্রমে বড় হইয়া পুতুল খেলিতে আরম্ভ করিল। এক দিবস পুতুলের কর্ত্তা ও গৃহিণী নির্ম্মাণ করিয়া তাহার হস্তে দেওয়া হইল, বালিকা তখন জিজ্ঞাসা করিল, ইহারাও মারামারি, কি কাটাকাটি করিবে? কর্ত্তা গৃহিণীর যেমন আচরণ সে দেখিয়া আসিতেছে, পুতুল কর্ত্তা গৃহিণীর নিকটও সে সেইরূপ আশা করিল। যেমন শিক্ষা, যেমন স্থানে বাস, সেইরূপ তাহার ধারণা হইবে ইহা আর বিচিত্র কি। আর একটী গল্প এই যে, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এই কলিকাতা নগরীতে একজন ধনী লোক ছিলেন। নৃত্য গীতাদির সময়ে গায়কের গান ও বাদ্যকরের তালে তালে বাজান দেখিয়া তিনি বলিতেন, ওসকল যোগ সাজস ও পরামর্শ করিয়া করা, নহিলে কি একজন গাইবে আর একজন তাহার সঙ্গে ঠিক্ তালে তালে বাজাইতে পারে? সঙ্গীতবিদ্যা বলিয়া যে এক বিদ্যা আছে তাহা তাঁর ধারণা ছিল না। এই যে দেশের লোকে বলিতেছে ব্রাহ্মেরা কপট, ইহার কারণও সেইরূপ সরলতার ধারণা শক্তির অভাব। সরল বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া ব্রাহ্মেরা ঈশ্বরকে ডাকে ও তাঁর জন্য কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করে, ইহা ঐ সকল লোক ধারণাই করিতে পারে না। ইংরাজী শিক্ষায় উহাদের বিশ্বাস বিকৃত হইয়া গিয়াছে। উহারা প্রতিদিন কার্য্যে কপটতা দেখে এবং কপটতার বায়ুর মধ্যে বাস করে। আপনারা যেরূপ, যেমন দেখে এবং যেমন অবস্থায় থাকে, তার অতিরিক্ত কিছু আকাঙ্ক্ষা করিতে পারে না, মনে করে অন্য সকলে যাহা করে তাহাও তাহাদের মত কপটতা। দেশের এ অতি ভয়ানক শোচনীয় অবস্থা! সরল বিশ্বাস ও বিবেকপরায়ণতার ধারণা পর্য্যন্ত অন্তর্হিত!

পত্রলেখক বলেন, দেশের লোকের আর একটী কথা এই যে, ব্রাহ্মেরা যেমন কপট, ব্রাহ্মদিগের স্ত্রীরাও তেমনই অপবিত্রচিত্তা। অবিবাহিত থাকিয়া এবং স্বাধীনভাবে সমাজে মিশিয়াও স্ত্রীলোকে যে পবিত্র থাকিতে পারে, এ কথা তাহারা মনেই আনিতে পারে না। চিন্তা চক্ষুতে তাহারা অন্তরে কেবল নরক ও অপবিত্রতা দর্শন করে। নারীর মুখের দিকে তাহারা পবিত্রভাবে তাকাইতে পারে না, কল্পনাতেও তাহারা ভাবিতে পারে না যে ঈশ্বরের কৃপাবলে নারীগণ পবিত্রভাবে জীবন যাপন করিতে পারেন। বাল্যবিবাহ অবরোধ আদি কুপ্রথায় তাহাদের প্রকৃতি এরূপ বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা তাহাদের অস্থিতে অস্থিতে এরূপ প্রবেশ করিয়াছে যে, পবিত্রভাবে তাহারা আদৌ রমণীর বিষয় ভাবিতে পারে না। স্বাধীনভাবে স্ত্রী পুরুষ পবিত্রতার মুকুট পরিয়া ঈশ্বরের পূজা করিবে, আর দেশের লোকে বলিবে উহারা কপট ও অপবিত্রচিত্ত। কি শোচনীয় অবস্থা!!! সেণ্ট পল এথেন্স নগরে প্রচার করিতে গিয়া দেখিয়াছিলেন যে, সুশিক্ষিত ও সুসভ্য এথিনীয়েরা পুতুল নির্ম্মাণ করিয়া মহান্ পরমেশ্বরের মহিমা খর্ব্ব করিতেছে ও নিতান্ত দুরবস্থায় পতিত রহিয়াছে। জ্বলন্ত ভাষায় তিনি তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। পুতুল পূজা পাপে আমাদের দেশের লোকগণও সেইরূপ কলুষিত ও দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। জানিতাম না যে জড়ের উপাসনায় মানবের চিত্ত এত দূষিত হয়। এখন দেখিতেছি যে, পবিত্র ঈশ্বরোপাসনা ভিন্ন কোন মতেই ত্রাণ নাই। ব্রাহ্মসমাজের গুরুতর দায়িত্ব। এই যে এক ভয়ানক ব্যাধি দেশের অস্থিতে অস্থিতে প্রবেশ করিয়াছে, যাহার জন্য দেশের লোকের সরলতা ও সাধুতাতে বিশ্বাস পর্য্যন্ত লুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে, ইহার ঔষধ দিবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয়। অকৃত্রিম অনুরাগের সহিত আত্মসমর্পণ করিয়া ঈশ্বরানুরাগী নরনারী কিরূপে পরিত্রাণ পায়, তাহা দেখাইবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকাশ। ব্রাহ্মধর্ম্ম ধর্ম্মভাবহীনতা, কপটতা ও ভণ্ডতা দূর করিবেন, এবং সত্যে বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত করিবেন। ব্যাধি যেমন গভীর, ঔষধও তেমনই সতেজ ও বিষাক্ত। এই যে নারীর দিকে ভাল করিয়া চাহিতে না চাহিতে পুরুষদিগের কল্পনা কলুষিত হইয়া গেল, এই যে রমণীকুল অজ্ঞান ও কুসংস্কারে নিমগ্ন রহিয়াছে, এই সকল দূর করিয়া নারীদিগের কার্য্যক্ষেত্র বর্দ্ধিত এবং নরনারী সকলের চরিত্র উন্নত ও ধর্ম্মশোভায় সুসজ্জিত করিবার জন্যই ব্রাহ্মধর্ম্মের আগমন। ইহা দ্বারা নরনারী প্রেমে উজ্জ্বল হইবে, ঈশ্বর চরণে আত্মসমর্পণ করিবে, আত্মসংযম, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, বৈরাগ্য ও স্বার্থনাশ শিক্ষা করিবে এবং সমুদায় কুরীতি, কুপ্রথা ও দুর্নীতি নাশ করিয়া

সত্যস্বরূপের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিবে। বিধাতা স্বয়ং ইহার প্রাণ। তিনি ইহার কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। তিনিই সকলকে আকর্ষণ করিতেছেন, বিধান দিতেছেন এবং পথ প্রদর্শন করিতেছেন। নরনারীর পাপ তাপ হরণ করিবার ভার তিনি স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন।

উৎসবের শেষে আমরা অনুভব করিতে চেষ্টা করিব যে, দেশের দুর্নীতি, হীনতা ও মলিন ভাব দূর করিবার ভার ঈশ্বর আমাদিগের উপর অর্পণ করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং এই ব্রতপালনের সহায়। তাঁহার ইচ্ছা যে নরনারী অসত্যের সেবা না করে, কলুষিত না হয়, সমুদয় দুর্নীতি সমূলে উন্মূলিত করিয়া সত্যরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করে। ধন্য আমরা যে, মহেশ্বর আমাদিগকে এই মহাব্রত গ্রহণ করিতে আহ্বান করিয়াছেন। লোকে আমাদিগকে কপট বলে বলুক, আমরা সে কথায় কর্ণপাত করিব না। আমরা দেখিয়াছি যে, ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, সকল বিরুদ্ধাচরণ পণ্ড হইয়া যায়, এবং পাপ তাপ পলায়ন করে। তিনি মেষপালক, আমরা মেষ। মেষদলের ভার মেষপালকের উপরই চিরকাল থাকিবে। এস সকলে তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিয়া, তাঁহার জ্যোতিতে অনুরঞ্জিত হইয়া পবিত্র জীবন লাভ করত অসাধুতা দগ্ধ করি, প্রেমালোকে উজ্জ্বল হইয়া তাঁহার যশোগান করত আনন্দলাভ করি। ভাই ভগিনীগণ, তোমাদের পথে অনেক বিঘ্ন, কিন্তু কি করিবে, স্বয়ং বিধাতা যে ডাকিতেছেন। ভগিনীগণ, পুরুষের পরিত্রাণ তোমাদের হস্তে। পুরুষেরা বলিতেছে, যে তোমরা তাহাদিগকে উদ্ধার কর, সংশোধন কর, দুর্নীতি নিবারণ করিয়া তোমরা কাপুরুষদিগকে শিক্ষা দাও, তাহারা তোমাদিগকে পবিত্র চক্ষে দেখিতে শিক্ষা করুক্। কাপুরুষত্ব ও দুর্নীতি দূর করিবার ভার এবং পুরুষদিগের ভবিষ্যৎ উন্নতি তোমাদের হস্তে। কে কি বলে শুনিও না। যে ত্রাণ চায়, সে ত্রাণ পায়। পরিত্রাণের দ্বার উন্মুক্ত। ঈশ্বরের কৃপাময় নাম ধারণ করিয়া অগ্রসর হও। তাঁহার করুণা ও মুক্তির বিধান উপস্থিত, আপনাদিগকে সেই বিধান স্রোতে ঢালিয়া দাও উদ্ধার হইবে। ঈশ্বরের নাম জয়যুক্ত ও ধন্য হইবে।

এইরূপে দয়াময়ের কৃপায় অষ্টপঞ্চাশত্তম মাঘোৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গেল। উৎসবের মধ্যে তাঁহার প্রত্যক্ষ দয়ার ব্যাপার দর্শন করিয়া, ব্রাহ্মসমাজে তাঁহার কৃপাহস্ত স্বচক্ষে দেখিয়া এবার অনেক শুষ্ক প্রাণে রসসঞ্চার হইয়াছে, অনেক পাষাণহৃদয় বিগলিত হইয়াছে, অনেক নিরাশ প্রাণে আশা ও উৎসাহের উদয় হইয়াছে, অনেকের বিশ্বাস উজ্জ্বলতর হইয়াছে। বাস্তবিক তাঁহার কৃপায় অসম্ভব সম্ভব হয়। তাঁহার কৃপালাভ করিলে নিতান্ত অপদার্থ ও দুর্ব্বল লোকের দ্বারাও আশ্চর্য্য কার্য্য সকল সম্পাদিত হইতে পারে। তাঁহার সেই পরিত্রাণপ্রদ কৃপার স্রোত ব্রাহ্মসমাজরূপে আজি এই অধঃপতিত দেশের উদ্ধারের জন্য প্রবাহিত হইতেছে। তিনি যাহাদিগকে এই কৃপাস্রোতের মধ্যে আনিয়া ধন্য ও কৃতার্থ করিয়াছেন, তাহারা যাহাতে আপনাদের সুখস্বার্থ মান অভিমান ভুলিয়া গিয়া তাঁহার মহিমা জীবনে মহিমান্বিত করিতে পারে, তাহাদের জীবনে যাহাতে তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হয়, তিনি দয়া করিয়া এই আশীর্ব্বাদ করুন।

ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

গত ১লা পৌষের তত্ত্বকৌমুদীতে আমি শ্রদ্ধাস্পদ বিজয় বাবুর বর্ত্তমান মত বিষয়ে যাহা লিখিয়াছিলাম তৎসম্বন্ধে ভক্তিভাজন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর গোস্বামী মহাশয়কে যে দুই খানা পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা এবং বিজয় বাবুর উত্তর, মহর্ষি মহাশয়ের অনুমতিক্রমে আপনার নিকট পাঠাইলাম। আশা করি, ব্রাহ্মসাধারণের অবগতির জন্য পত্র তিন খানা শীঘ্রই তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশ করিবেন। চিন্তাশীল ব্রাহ্মগণ স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন যে বিজয় বাবুর পত্রে কয়েকটী অতিশয় আপত্তিজনক ও দূষণীয় মত রহিয়াছে। ঐ সকল মতের সবিশেষ আলোচনা করিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিতে ইচ্ছা রহিল। যত শীঘ্র পারি, তাহা লিখিয়া পাঠাইব।

নিঃ—

শ্রীনবকান্ত চট্টোপাধ্যায়

ঢাকা।

বিজয় বাবুর নিকট মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম পত্র।

স্নেহাস্পদেষু—

তোমার মূর্ত্তি যেমন সৌম্য, তোমার প্রকৃতি যেমন ধীর, তোমার ঈশ্বরপ্রেম তাহারই সদৃশ। তুমি একদিন [illegible] ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান শুনিতে শুনিতে তাহাতে আকৃষ্ট হইলে এবং কত কঠোর ত্যাগ স্বীকার করিয়া তুমি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ ও প্রচার করিলে। ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির জন্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের প্রতি আমার সমধিক আশা ছিল। কিন্তু তিনি পরম পিতার আহ্বানে অল্প বয়সেই পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে তোমাদের প্রতিই আমার সকল আশা ভরসা নিহিত। তন্মধ্যে তুমি ধার্ম্মিক প্রচারকদিগের অগ্রণী হইয়া এ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম্মের সেবায় প্রাণ মন অর্পণ করিয়া খাটিতেছ। "নাগান্ননস্তম্ভ হুতত্রপঃ পটন্ গুহ্যানি ভদ্রানি কৃতানি চ স্মরন্ গাং পর্য্যটন্ তুষ্টমনা গতস্পৃহঃ কালং প্রতীক্ষন্ নমদো বিমৎসরঃ।" তোমাকে এই যে উপদেশ দিয়া প্রচারকের আদর্শ দেখাইয়াছিলাম, তুমি সেই আদর্শকে ধ্রুব লক্ষ্য করিয়া প্রচারকের নির্দ্দিষ্ট পথে থাকিয়া বঙ্গদেশের সকল স্থানে ব্রহ্মবীজ ছড়াইয়া বেড়াইতেছ। তোমার নিষ্কাম ভক্তি ও ঈশ্বরেতে প্রীতি তোমার আত্মাকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। তোমার উৎসাহ জীবন্ত। যে উৎসাহে উত্তেজিত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিবার উদ্দেশে তুমি আমার নিকটে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলে তাহা আমার এখনও স্মরণ আছে। তোমাদের মধ্যে আমি আর অতি অল্প দিনই আছি। যখন আমি এই পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়া যাইব তখন ব্রাহ্মসমাজ কেবল তোমাদেরই জীবন হইতে আলোক পাইয়া উজ্জ্বল

হইবে এবং তোমাদেরই আত্মা হইতে জ্ঞান ধর্ম্ম লাভ করিয়া বর্দ্ধিত হইবে, ইহাই আমার শেষ জীবনের আশা ও আনন্দ। এই আনন্দেই আমার শরীর সবল হয়, ও ইন্দ্রিয় সতেজ হয়। কিন্তু বর্ত্তমান মাসের তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকাতে তোমার উপরে কতকগুলি ব্রাহ্মধর্ম্ম বিরোধী মতের আরোপ দেখিয়া নিতান্ত ক্ষুব্ধচিত্ত হইয়া আমার জরাজীর্ণ দুর্ব্বল শরীরেও তোমাকে এই পত্র লিখিতেছি। "সাধুদিগের পদ-ধূলি গ্রহণ ও অঙ্গে মাখা, পদে পড়িয়া থাকা, প্রসাদ গ্রহণ ইত্যাদি কার্য্য ধর্ম্মসাধনের উপায়; শক্তি সঞ্চার দ্বারা পৌত্তলিক ধর্ম্ম বিশ্বাসী ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরোধী ব্যক্তি ও শিশুদিগকে দীক্ষা প্রদান করা; ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে আপনাপনি পৌত্তলিকতা জাতিভেদ ইত্যাদি কুসংস্কার চলিয়া যাইবে; পূর্ব্বে ঐ সকল ত্যাগ না করিলে ব্রহ্মোপাসনার ক্ষতি নাই অর্থাৎ যে ব্যক্তি যে ধর্ম্ম সরলভাবে বিশ্বাস করে সেই ধর্ম্ম সাধন করিতে করিতে সেই ব্যক্তি কালে সত্য লাভ করিবে; সিদ্ধ যোগীর সূক্ষ্মশরীরে আগমন ও আলাপাদি করা"; এই সকল কথা তোমার মত বলিয়া ব্যক্ত হইয়াছে। বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাসকে এই সকল অযথাবাদ ও কুসংস্কারযুক্ত করিয়া প্রচার করিতে হইলে তাহার গতি রোধ করা হয়। একমাত্র পৌত্তলিকতা পরিহারের জন্যই এদেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের উদ্ভব এবং রামমোহন রায় হইতে এখনকার নবীন প্রচারক অবধি সকলের এত চেষ্টা ও যত্ন। এই চেষ্টা ও যত্নের পরিণাম কি এই হইবে যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পূর্ব্বে পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিতে হইবে না? আত্মার সহিত পরমাত্মার যে যোগ তাহা স্বাভাবিক যোগ এবং ঋষিদিগের আত্মা অবধি আমাদিগের প্রত্যেকের আত্মার স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যয়। এই আত্মপ্রত্যয়ের স্থানে কি এখন, সাধুর পদে পড়িয়া না থাকিলে, সাধুর পদ-ধূলি অঙ্গে না মাখিলে এবং অন্য কর্ত্তৃক শক্তি সঞ্চারিত না হইলে মনুষ্যের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইবে না, এই প্রত্যয়কে হৃদয়ে স্থান দিতে হইবে? এই প্রত্যয়কে যদি হৃদয়ে স্থান দিতে হয়, তবে গায়ত্রী মন্ত্রের মূল্য থাকে না, "হৃদা মনীষা মনসাভি কৢপ্তঃ" অর্থাৎ হৃদগত সংশয় রহিত বুদ্ধির যোগে মনন করিলে ব্রহ্ম প্রকাশিত হন, এই ঋষি বাক্য মিথ্যা হয়। এবং আধ্যাত্মিক যোগের শিক্ষা ও ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল বিশ্বাস বিধ্বস্ত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়।

ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সত্য ধ্রুব সত্য। তাহা প্রথম যুগে যেমন শেষ যুগেও তেমনি। দ্যুলোকেও যেমন ভূলোকেও তেমন। তাহার রূপান্তর হয় না, পরিবর্ত্তন হয় না। তাহা সূর্য্যের ন্যায় প্রদীপ্ত এবং সাগরের ন্যায় গম্ভীর। তাহা মধুময় প্রাণময়। এই সত্য তোমার হৃদয়ে অবিচলিত থাকুক তোমার প্রতি আমার এই শুভ আশীর্ব্বাদ। প্রার্থনা করি যে তোমাদের মধ্যে ধর্ম্মগত বিভিন্নতা তিরোহিত হইয়া সাম্য বিরাজ করিতে থাকুক। তোমরা সকলে এক হৃদয় এক প্রাণ হইয়া সত্য প্রচারে ব্রাহ্মধর্ম্মের গৌরব রক্ষা কর এবং ব্রহ্মযোগে যুক্ত হইয়া অনন্ত উন্নতির পক্ষে আনন্দে পদ নিক্ষেপ কর। ইতি ১৭ই পৌষ।

নিতান্ত শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মণঃ।

(বিজয় বাবুর উত্তর)

ওঁ

প্রণতি পূর্ব্বক নিবেদনম্—

মহাশয়ের ১৭ই পৌষ তারিখের আশীর্ব্বাদ পত্র পাইয়া সন্তুষ্ট ও আপ্যায়িত হইলাম। দুর্ব্বল শরীরে এতাদৃশ অনুগ্রহ প্রকাশ দ্বারা আমার প্রতি আপনার অবিচলিত স্নেহেরই পরিচয় দিয়াছেন। প্রার্থনা করি যেন আপনাদের অনুগ্রহ ও স্নেহাশীর্ব্বাদের উপযুক্ত থাকিয়া জীবনে সত্যস্বরূপ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে পারি।

যাহা সত্য তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম, আমার এইরূপ বিশ্বাস এবং এই সত্য আমি চিরদিন প্রচার করিয়া আসিতেছি। কোন বিশেষ সময়ের মধ্যে কোনও সমাজ বা ব্যক্তি যে সকল সত্য প্রচার করেন তদতিরিক্ত কোনও নূতন বা অপ্রকাশিত সত্য আবিষ্কৃত হইতে পারে না, ইহা বোধ হয় কেহই মনে করিতে পারিবেন না। ব্রাহ্মসমাজের নিকট হয়ত এখনও এমন অনেকগুলি সত্য অপ্রকাশিত রহিয়াছে যাহা সহস্র সহস্র বৎসর মধ্যে ব্রাহ্ম সাধকের জীবনের মূল হইয়া দাঁড়াইবে। আর আমি যে পথে চলিতেছি, তাহা ঋষি প্রবর্ত্তিত পথ; অতি পুরাকাল হইতে তদবলম্বনে অনেক মহাপুরুষ কৃতার্থতা লাভ করিয়া গিয়াছেন। আপনার ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্যাখ্যান গ্রন্থেও তাহার অনেক আভাস পাওয়া যায়। "হৃদা মনীষা মনসাভি কৢপ্তঃ" এই শ্লোক শিরোধার্য্য করিয়া আমি বিশ্বাস করি এবং ধ্রুব সত্য বলিয়া জানি যে, নিঃসংশয় বুদ্ধিযোগে মনন করিলে ব্রহ্ম প্রকাশও লাভ হয়; কিন্তু বুদ্ধির অসংশয়তা লাভ অনায়াসসাধ্য নয়। তাহার জন্য উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। যদি তাহা না হয়, তবে ধর্ম্ম প্রচারের ও উপদেশের আবশ্যকতা থাকে না। মনের সেই উন্নত অবস্থা লাভের জন্য বিবিধ উপায় থাকিতে পারে; যিনি যাহাতে ফল লাভ করেন, তিনি তাহা অবলম্বন করুন্। আমি এমন কথা বলি না যে, আমার প্রণালী ভিন্ন অন্য প্রণালী নাই। কিন্তু যে উপায় আমার ব্রহ্মযোগলাভের পক্ষে আমাকে সহায়তা করিয়াছে ও করিবে, তাহা আমার প্রাণের বস্তু, অতি আদরের ধন; সে ধনের মর্য্যাদা বুঝিতে পারি আমাকে এই আশীর্ব্বাদ করুন। ধর্ম্মসাধনের উপায় সম্বন্ধে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থেই এইরূপ উপদেশ দেখিতে পাই—"তদ্বিজ্ঞানার্থং সদ্ গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ। তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্ প্রশান্ত চিত্তায় ক্রমান্বিতায় যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্।" ইহাতে স্পষ্টই দেখা যায় যে সদ্গুরু সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিতেই হইবে। পৌত্তলিক ধর্ম্মবিশ্বাসী লোকদিগকে গ্রহণ করা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তৎসম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে ব্রাহ্মসমাজে এইরূপ লোকেরই আধিক্য, যাঁহারা ব্রাহ্মমতে ধর্ম্মচর্য্যা করেন অথচ নিজ নিজ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে পৌত্তলিক অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাহাদিগের অপেক্ষা সরল বিশ্বাসী সাকারোপাসকের অবস্থা আমি শ্রেষ্ঠ মনে করি। আর প্রকৃত বস্তু লাভ করিলে যখন সর্ব্বপ্রকার পদ্ধতি ও সাম্প্রদায়িকতা সর্প কঞ্চুকবৎ স্বতঃই স্খলিত হইয়া পড়ে, তখন ধর্ম্ম জীবনের প্রারম্ভে আচার

গত পার্থক্য আছে বলিয়াই কাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে আমি এরূপ মনে করি না এবং প্রাণের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া সহসা তাহার গ্রহণ শক্তির অতীত সত্য তাহার সম্বন্ধে প্রচার করিলে তাহার হিত অপেক্ষা অনিষ্টেরই অধিক সম্ভাবনা। এবং আমার এই বিশ্বাস যে, ঋষিগণও অধিকারী ভেদে ধর্ম্ম গ্রহণের বিভিন্ন উপায় নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

আমি অনন্ত জীবনে অনন্ত সত্য লাভ করিয়া সার্ব্বভৌমিক ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে পারি, আপনার পদ প্রান্তে বিনীত ভাবে এই আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা।

"যোগ সাধন" নামে একখানা পুস্তিকা প্রেরিত হইল। কাহারও দ্বারা উহা পড়াইয়া শ্রবণ করিলে আমার মতামত অনেক বিষয় আপনি জানিতে পারিবেন।

ঢাকা। প্রণত

সন ১২৯৪। ২০ পৌষ। শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

মহর্ষির দ্বিতীয় পত্র।

স্নেহাস্পদেষু—

তোমার ২০শে পৌষ দিবসের পত্র পাইয়া অতীব সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি বহু অন্বেষণ ও বহু সাধন করিয়াছ। যাহা সত্য বলিয়া তোমার প্রতীতি হইয়াছে তাহা তুমি চিরদিন ব্রাহ্মসমাজে প্রচার করিয়া আসিতেছ। তুমি অবশ্য অবগত আছ যে, সকল যোগ অপেক্ষা অধ্যাত্মযোগ আত্মজ্ঞানী ব্রাহ্মের পক্ষে নিতান্ত শ্রেয়স্কর। তোমার প্রতি আমার এই অনুরোধ, তুমি ব্রাহ্মদিগকে এই যোগের শিক্ষা দেও, ব্রাহ্মসমাজের হিতসাধন কর।

যদি জ্যোতির্ব্বিদ্যা প্রভৃতি অপরাবিদ্যা শিক্ষার জন্য আচার্য্যের আবশ্যক হয় তবে কি সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্মবিদ্যার জন্য আচার্য্যের আবশ্যক হইবে না? এমন কখনই হইতে পারে না। নিপুণরূপে ব্রহ্মজ্ঞান শিখিতে হইলে বিদ্বান্ গুরুর নিতান্ত আবশ্যক। অতএব ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থে এই উপদেশ আছে, "তদ্বিজ্ঞানার্থং সগুরু মেভাবি গচ্ছেৎ" সদ্গুরুর নিকট শিক্ষা ব্যতীত তাঁহার পদে পড়িয়া থাকা, প্রসাদ গ্রহণ প্রভৃতি কার্য্যের কিছুই মাহাত্ম্য নাই। ইহা কখন ধর্ম্ম সাধনের উপায় নহে। সদ্গুরুর নিকটে শিক্ষা লাভ করাই একমাত্র উপায়।

পৌত্তলিককে নিরাকার ব্রহ্মোপাসক করাই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের মুখ্য উদ্দেশ্য। পৌত্তলিককে তাঁহার ভ্রান্তি বুঝাইয়া দিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ কর। কিন্তু এ কথা বলিও না যে "যাহার যাহা বিশ্বাস তিনি তাহাই সরলভাবে সাধন করুন কালে সত্য লাভ করিবেন।" এ কথা বলিলে কালেরই প্রাধান্য দেওয়া হয়, আচার্য্য কর্ত্তৃক উপদেশও আবশ্যক থাকে না। এইরূপ বাক্যে নিরাকার নির্ব্বিকার ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতি ব্রহ্মজিজ্ঞাসুর চৈতন্যের উদ্রেক করা দূরে থাকুক বরং তদ্বিরুদ্ধে সাকার দেবদেবীর প্রতিই তাহার সংস্কারকে দৃঢ় করিয়া দেওয়া হয়। অতএব ইহাতে সাবধান থাকিয়া তুমি ব্রাহ্মধর্ম্মের সেবায় যেরূপ মন প্রাণ দিয়া কর্ম্ম করিতেছ সেইরূপই করিয়া ব্রাহ্মসমাজের হিত সাধন করিতে থাক। ইতি ২৬শে পৌষ ৫৮।

নিতান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা।

প্রদেশীয় ব্রাহ্মসমাজ।

মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের দ্বাচত্বারিংশৎ উৎসবের বিবরণ।

২২শে মাঘ শনিবার—সাধারণ পুস্তকালয় গৃহে বাবু তারক গোপাল ঘোষ বি, এ, কর্ত্তৃক "ভারতে ব্রাহ্মধর্ম্ম" বিষয়ে বক্তৃতা। ব্রাহ্মধর্ম্মের পূর্ণতা, বিশুদ্ধতা অতি উজ্জ্বলতর রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছিল। ২৭শে মাঘ বৃহস্পতিবার—উৎসবের উদ্বোধন হয়। বাবু তারকগোপাল ঘোষ উপাসনা করেন। ২৮শে মাঘ শুক্রবার—অপরাহ্নে দরিদ্রদিগকে পয়সা ও অন্ধ আতুরকে বস্ত্র দান। রাত্রে বাবু তারকচন্দ্র ঘোষ উপাসনা করেন। "নিজে যিনি চেষ্টা করেন ঈশ্বর তাঁহার সহায় হন" এই বিষয়ে উপদেশ প্রদত্ত হয়। ২৯এ মাঘ শনিবার—অপরাহ্ন ৪টার সময় পাহাড়ীপুর সমাজ হইতে নগর সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে ব্রহ্মমন্দিরে আগমন করা হয়। বাবু তারকগোপাল ঘোষ বি, এ, পথে দুবার সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা এবং মন্দিরে উপাসনার কার্য্য প্রাণের ব্যাকুলতা ও উৎসাহের সহিত সম্পন্ন করায় অনেকেরই হৃদয় বিগলিত হইয়াছিল। ১লা ফাল্গুন রবিবার—সমস্ত দিন উৎসব। শ্রদ্ধেয় প্রচারক পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় দুইবেলা উপাসনা এবং মধ্যাহ্নে কবীরের গ্রন্থ পাঠ ও আলোচনার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। প্রাতের উপাসনা অতীব হৃদয়স্পর্শী হইয়াছিল। ২রা ফাল্গুন সোমবার—পাহাড়ীপুর সমাজের উৎসব। প্রাতে ও রাত্রে প্রচারক মহাশয়ই উপাসনা করেন। ৩রা ফাল্গুন মঙ্গলবার—অপরাহ্ণ ৬টা সাধারণ পুস্তকালয় গৃহে "ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রাহ্মধর্ম্ম" বিষয়ে বিদ্যারত্ন মহাশয় বক্তৃতা করেন। পুরাকাল হইতে কিরূপে আর্য্য ঋষিদিগের মনে ব্রহ্মজ্ঞানের সূত্রপাত হইয়া ক্রমে ক্রমে পরিস্ফুট অবস্থা প্রাপ্ত হয় তাহা আর্য্য ধর্ম্মগ্রন্থের বিভিন্ন সময়ের শ্লোকাদি দ্বারা স্পষ্টতঃ দেখান হয় এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম যে আমাদের গৃহ, পরিবার, কর্ম্মক্ষেত্র, সজন, নির্জ্জন, জীবন, মরণের ধর্ম্ম কেমন সুন্দর,কেমন মধুর তাহা সুন্দররূপে বুঝাইয়া দেন। ৪ঠা ফাল্গুন বুধবার—অপরাহ্নে বালক বালিকার সম্মিলনে উপাসনা এবং গান হয়। প্রচারক মহাশয় বালক বালিকাদিগকে উপদেশ দেন এবং উপদেশের পর তাহাদিগকে মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়। ৫ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার—মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক সভার নিয়োগ ও কার্য্য নির্ব্বাহক সভা সংগঠন হয়। ৮ই ফাল্গুন শুক্রবার—গোপগিরিতে গিয়া ব্রাহ্মবন্ধুগণ উপাসনা ও আনন্দোৎসব করেন। এই উৎসবের কার্য্য ব্যতীত প্রচারক মহাশয় কোন কোন ব্রাহ্ম পরিবারে পারিবারিক উপাসনা ও বাবু তারকচন্দ্র ঘোষের বাসায় বাবু বেণীমাধব মিত্রের ৩য় পুত্রের নামকরণ উপলক্ষে ৩রা ফাল্গুন মঙ্গলবার উপাসনা করেন। (বালকটীর নাম শ্রীমান্ বিনয়ভূষণ রাখা হইয়াছে। প্রচারক মহাশয় "আসামে কুলী" বিষয়ে একটী প্রকাশ্য বক্তৃতাও করিয়াছিলেন।

টাঙ্গাইল।

গত ১১ই ও ১২ই মাঘ টাঙ্গাইল ব্রাহ্মসমাজের মাঘোৎসব হইয়া গিয়াছে। টাঙ্গাইলের অন্তর্গত করটীয়াস্থ বন্ধুগণ ১১ই মাঘের উৎসবে যোগদান করতঃ উৎসাহিত হইয়া ১২ই তাঁহাদিগের বাসস্থান করটীয়া গ্রামে একটী ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়াছেন। প্রত্যেক মঙ্গলবার এই সমাজের সাপ্তাহিক উপাসনা হইয়া থাকে।

২৫এ ফাল্গুন বুধবার বাবু গুরুগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী মহাশয় এখানে আগমন করিয়া অত্রস্থ ব্রাহ্মসমাজে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, এবং 'অধম সেবকের নিবেদন' নামক উপদেশ প্রদান করিয়া ২৬এ বৃহস্পতিবার করটীয়া ব্রাহ্মসমাজে যাইয়া তত্রত্য বাজারে 'ধর্ম্মের আবশ্যকতা' সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন।

২৭এ ফাল্গুন শুক্রবার গুরুগোবিন্দ বাবু পুনরায় এখানে আসিয়া রাত্রিতে অত্রস্থ উকীল বাবু রাধানাথ ঘোষ মহাশয়ের বাসায় রাধানাথ বাবুর উদ্যোগে উপাসনা করতঃ "অধম সেবকের নিবেদন" নামক উপদেশ প্রদান করিয়া সিরাজগঞ্জ অঞ্চলে যাইবার জন্য টাঙ্গাইল পরিত্যাগ করিয়াছেন।

প্রেরিত।

এই বেনারস সহর হিন্দুদিগের একটী মহাতীর্থ স্থান। ইহাকে হিন্দুধর্ম্মের দুর্গ বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। নিতান্ত নিঃস্ব না হইলে আস্থাবান্ হিন্দু মাত্রেই কখন না কখনও এই তীর্থ স্থান দর্শন করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া থাকেন। কিন্তু এই সুদৃঢ় দুর্গের নামই গ্রহণ কর, আর যাহাই কিছু বল, সত্যের জয় সর্ব্ব স্থানে সর্ব্ব কালে অপ্রতিহত ভাবে হইয়া আসিতেছে। দেখুন, এমন যে হিন্দুদিগের সুদৃঢ় দুর্গ বেনারস সহর, আজ ৫ বৎসর হইতে এখানেও একটী ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়া সত্যের জয়, ঈশ্বরের জয় ঘোষণা করিতেছে। এখানেও, ইহার বুকের মধ্যে সত্যধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্মের বিজয় ভেরী নিনাদিত হইতেছে। দয়াময় ঈশ্বরের কৃপায় বিগত ৩০এ পৌষ এই ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চম সাম্বৎসরিক উৎসব এবং বিগত ১১ই মাঘ ব্রাহ্মসমাজের জন্মদিন উপলক্ষে এই সমাজে বিশেষ উৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। তাহার আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত পশ্চাৎ বিবৃত হইতেছে। কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে এখানে একটী কথার উল্লেখ করিলে অধিক অসঙ্গত হইবে না যে, এই কঠিন স্থানে, এই পরীক্ষার স্থানে সত্যধর্ম্ম প্রচার করিতে হইলে যেরূপ উপাসনাশীলতা ও ধর্ম্মলাভার্থে ব্যাকুলতার প্রয়োজন, যেরূপ প্রাণগত যত্ন ও চেষ্টার প্রয়োজন, এবং পরস্পরের মধ্যে যেরূপ ভ্রাতৃভাব ও একপ্রাণতার প্রয়োজন, বড় দুঃখের বিষয় এই যে, এখানকার অধিকাংশ ব্রাহ্ম সভ্যদিগের মধ্যে তাহার বিশেষ অভাব দৃষ্ট হয়। আরও দুঃখের বিষয় এই যে, এই হিন্দুধর্ম্মের সুদৃঢ় দুর্গমধ্যে প্রকৃত প্রস্তাবে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের বিজয় পতাকা উড্ডীয়মান করিতে হইলে, পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের মহান্ সত্য সকল বিশেষরূপে প্রচার করিতে হইলে, পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের মহিমা ইহার চতুর্দ্দিকে ঘোষণা করিতে হইলে, আমাদিগের শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারক মহাশয়দিগের যেরূপ জীবন্ত উৎসাহ ও ব্যাকুলতা, অদম্য অধ্যবসায় ও যত্ন পরিশ্রম, এবং আদর্শ ত্যাগস্বীকার ও কষ্ট সহিষ্ণুতার প্রয়োজন, আমাদিগকে বড় ক্ষোভের সহিত বাধ্য হইয়া বলিতে হইতেছে যে, তাঁহাদিগের মধ্যে তাহার সহস্রাংশের একাংশও দেখিতে পাওয়া যায় না! এখানে আসিয়া তাঁহাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করা দূরে থাকুক, অন্য কোন নিজের কার্য্যোপলক্ষে এখানে আসিয়াও ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে একটী কথা বলিতেও তাঁহাদের বড় ভার বোধ হয়, তাঁহারা বড় কষ্ট বোধ করিয়া থাকেন! শ্রদ্ধেয় প্রচারক ভ্রাতৃগণ! আমি বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করি, বলুন দেখি, এই প্রকারে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য আপনারা কি পবিত্র প্রচার ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন? বলুন দেখি, এ প্রকার মৃতভাব ও দীর্ঘসূত্রীতা দ্বারা এই পতিত দেশের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার হইবার কি কোন সম্ভাবনা আছে? বড় দুঃখেই এ কথাগুলি বলিলাম—ক্ষমা করিবেন।

এখানকার ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি বাবু রামচন্দ্র মৌলিক মহাশয় ব্রাহ্মসমাজ ও উপাসনাদির জন্য তাঁহার নিজ বাটীর কিয়দংশ ছাড়িয়া দিয়াছেন। সেই স্থানেই পঞ্চম সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছিল। বিগত ২৯এ পৌষ সন্ধ্যাকালে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক বাবু লক্ষ্মণপ্রসাদ মহাশয় উৎসবের উদ্বোধন ও উপাসনার কার্য্য করেন। উদ্বোধন সম্বন্ধে তিনি যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা বড় উত্তেজক ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। ৩০এ পৌষ এই সমাজের জন্মোৎসব। প্রাতঃকালে বাবু লক্ষ্মণপ্রসাদ মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন, কিন্তু তাহা তত প্রাণমন মুগ্ধকর হয় নাই, কেমন যেন ভাসা-ভাসা হইয়াছিল। ১টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত গরিব দুঃখীদিগকে চাউল বিতরণ করা হইয়াছিল। এটা বড় দয়ার, বড় মহত্বের কাজ। প্রত্যেক ব্রাহ্মসমাজ হইতেই উৎসবোপলক্ষে দুঃখীদিগের প্রতি কোন প্রকারে দয়া প্রকাশের ব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্যক। এ বিষয়ে মফস্বলের ব্রাহ্মসমাজ সমূহ হইতে কলিকাতার ব্রাহ্মসমাজ সকল পশ্চাৎপদ হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহারা সমাজ গৃহ পুষ্পপত্র দ্বারা সুশোভিত করিতে, বাগানে গিয়া আমোদ প্রমোদ করিতে এবং বড় তৃপ্তির সহিত নিজে আহার করিতে বেশ জানেন; কিন্তু দুঃখী প্রাণীকে অন্ততঃ এক বেলাও উদর পূরিয়া আহার দেওয়া তত আবশ্যক বিবেচনা করেন না!! আমরা নিজের আহার ও বাগানে যাওয়া প্রভৃতির বিরোধী নহি। কিন্তু বিশেষ আনন্দের দিনে দুঃখী প্রাণীদিগকে আনন্দের সহিত আহার করানকে অধিকতর ধর্ম্মসম্মত ও পবিত্র কার্য্য মনে করি। লোভীদিগের নিরামিষভোজনের বিরুদ্ধ যুক্তি যেমন অসার, কৃপণদিগের দুঃখীর প্রতি দয়া ও দানের বিরুদ্ধ যুক্তিও তেমনই অসার ও অকিঞ্চিৎকর। আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি, আমিষ ভোজনে যদি জিহ্বাতৃপ্তিকর সুখ না থাকিত, দুঃখীদিগকে দান করিতে যদি পয়সা খরচ না হইত, তাহা হইলে কেহই নিরামিষ ভোজনের ও দুঃখীর প্রতি দানের বিরুদ্ধে কুতর্ক উত্থাপন করিতেন না। তার্কিক মহাশয়েরা স্মরণ রাখিবেন, তাঁহাদের আদর্শস্থল ইংরাজেরা গরিব দুঃখী

দিগের জন্ত প্রধানতঃ হাঁসপাতাল সকল সংস্থাপন করিলেও তাঁহাদের চক্ষের সম্মুখে প্রতিদিন কত ধনী লোকে সেখানে গিয়া চিকিৎসিত হইতেছেন, তথাপি দেখুন ইংরাজেরা হাঁসপাতাল সকল উঠাইয়া দিতেছেন না। সে সকল কথা এখন যাউক, ২টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত ধর্ম্মালোচনা প্রভৃতি হয়। কোন একটী বিশেষ ঘটনাতে তাহা তত তৃপ্তিকর হয় নাই।

৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত নগর সংকীর্ত্তন হয়। এই সংকীর্ত্তন উপলক্ষে প্রচারক মহাশয় এখানকার অহল্যা বাইয়ের ঘাটে "প্রকৃত মনুষ্য কাহাকে বলে" এই সম্বন্ধে একটী বড় প্রাণ মন মুগ্ধকর বক্তৃতা করিয়াছিলেন, এমন কি পাষাণ হৃদয় কনেষ্টবলেরা পর্য্যন্ত মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। ৮টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত প্রচারক মহাশয়ই গম্ভীর ভাবে উপাসনাদি করেন। এই প্রকারে এ উৎসব দয়াময়ের কৃপায় সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

১১ই মাঘের উৎসব। এই দিন ব্রাহ্মসমাজের জন্মদিন; প্রত্যেক ব্রাহ্মের পক্ষে ইহা একটি বিশেষ দিন; এই দিনে এখানে কোন প্রচারককে আনা হয় নাই। উপাসনাদির কার্য্যভার সম্পাদক বাবু মহেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় গ্রহণ করেন। তাঁহারই যত্নে ও অধ্যবসায়ে এখানে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে এবং তাঁহারই যত্নে ও অধ্যবসায়ে এই সমাজ এক প্রকার মৃত হইয়া এখনও কথঞ্চিৎ জীবিতাবস্থায় আছে। ১১ই প্রাতঃকালে ৭টা হইতে ৯॥০ পর্য্যন্ত উপাসনাদি হয়। উপাসনা বড় ভাল, বড় সরস হইয়াছিল। মধ্যাহ্নকালে দরিদ্রদিগকে চাউল বিতরণ করা হইয়াছিল। ২টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ও আলোচনা প্রভৃতি হয়াছিল। ৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত ব্রহ্ম সংকীর্ত্তন হইয়াছিল। এই দিন প্রায় এই সময়ে সম্পাদক মহাশয়ের একটী পুত্র সন্তান লাভ হয় এবং সেই উপলক্ষে তিনি উৎসব ক্ষেত্র হইতে প্রস্থান করিতে বাধ্য হওয়াতে জৌনপুর হইতে আগত বাবু উমাচরণ সেন মহাশয় সন্ধ্যাকালের উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করেন। এখানে এ কথার উল্লেখ করা আবশ্যক যে, এই দিন সন্ধ্যাকালে ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের বিখ্যাত গায়ক বাবু চন্দ্রনাথ সেন মহাশয় আমাদের সঙ্গে যোগ প্রদান করিয়া সুমধুর ব্রহ্ম সঙ্গীত দ্বারা আমাদের সকলেরই আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। দয়াময় ঈশ্বরের কৃপায় এই প্রকারে এখানকার উৎসবদ্বয় সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক, সত্যেরই জয় হউক।

বেনারস
১৬ই ফাল্গুন ১৮০৯ } শ্রীভগবতীচরণ দে।

সংবাদ।

বর্ত্তমান বৎসরের জন্য বাবু আনন্দমোহন বসু, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি, বাবু গুরুচরণ মহলানবিশ, সম্পাদক, অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়, ও শশিভূষণ বসু এম এ, সহকারী সম্পাদক, এবং মথুরামোহন গাঙ্গুলি, ধনাধ্যক্ষ, নিযুক্ত হইয়াছেন।

নিম্নলিখিত মহিলা ও ভদ্রলোকগণ বর্ত্তমান বৎসরের জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষসভার সভ্য মনোনীত হইয়াছেন।

কলিকাতা ;—পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, এম এ, বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, বিএ, সীতানাথ দত্ত, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, এম এ, আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র, বিএ, রজনীনাথ রায়, এম এ, আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় বিএ, কালীশঙ্কর সুকুল, এম এ, উমাপদ রায়, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি, মিস কামিনী সেন, বিএ, ডাক্তার মোহিনীমোহন বসু, বাবু নীলরতন সরকার, বিএ, পরেশনাথ সেন, বিএ, দুর্গামোহন দাস, ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় বিএ, গগনচন্দ্র হোম, জগদীশচন্দ্র বসু, বি এস সি, হীরালাল হালদার, এম এ, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফণীন্দ্রমোহন বসু, বঙ্কবিহারী বসু, চণ্ডীকিশোর কুশারী, কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী বিএ, কৈলাসচন্দ্র সেন, হরনাথ বসু, হরকিশোর বিশ্বাস, গোবিন্দনাথ গুহ বিএ।

মফস্বল ;—শ্রীমতী অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায়, বগুড়া, লছমনপ্রসাদ, লক্ষ্ণৌ, মুন্সী জালালুদ্দীন জলপাইগুড়ি, মনোরমা মজুমদার ঢাকা, বাবু চণ্ডীচরণ সেন, কৃষ্ণনগর, নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় ঢাকা, ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসু, মৈমনসিংহ, বাবু যদুনাথ চক্রবর্ত্তী, সিমলা, বজরঙ্গ বিহারী, বিষ্ণুপুর, বাবু বিপিনচন্দ্র পাল, লাহোর, নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম এ, বিএল, ভাগলপুর, বুচিয়া পান্টালু মান্দ্রাজ, বাবু চন্দ্রকুমার ঘোষ, বিএল, গয়া, রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, কালনা, রজনীকান্ত ঘোষ, বিএল, ঢাকা, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, বিএ, পুরী, বিপিনবিহারী রায়, মানিকদহ, মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় বিএ, ঢাকা, কালীমোহন দাস, বরিশাল, কেদারনাথ কুলভি, বাঁকুড়া।

নিম্নলিখিত মহিলা ও ভদ্রলোকগণ মফস্বল সমাজের প্রতিনিধি মনোনীত হইয়াছেন।

বরিশাল, স্বর্ণপ্রভা বসু, জামালপুর, পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন, রামপুর হাট, বাবু যদুনাথ রায়, দার্জিলিং, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী, সিরাজগঞ্জ, নিলাম্বর গুই, ঢাকা, ডাক্তার পি, কে, রায়, নাওগাঁ, বাবু গোবিন্দরাম বড়ুয়া, সিমলাপাহাড়, কেদারনাথ চৌধুরী, ধুবড়ী, অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায়, কোন্নগর, সাতকড়ি দেব, ফরিদপুর ভুবনমোহন সেন, গোয়াড়ি কৃষ্ণনগর, শশিভূষণ সেন, কটক, মধুসূদন রাও, রঙ্গপুর, কৃষ্ণদয়াল রায়, জলপাইগুড়ি, নবদ্বীপচন্দ্র দাস, সিলং, রাজচন্দ্র চৌধুরী, কাকিনিয়া, গুরুচরণ মহলানবিশ, নাগআঁচড়া, পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, মানিকদহ, বাবু বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণনগর, সূর্য্যকান্ত রায়, মুর্শিদাবাদ, বাবু শশীভূষণ বসু, ভবানীপুর, প্রার্থনা সমাজ শ্রীশচন্দ্র দে, বোয়ালিয়া, মধুসূদন সেন, শ্রীহট্ট, কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বর্দ্ধমান, বীরেশ্বর সেন, বাঁকুড়া, বারাণসী চট্টোপাধ্যায়, মজিলপুর, সীতানাথ নন্দী, ভবানীপুর, কেদারনাথ রায়, মেদিনীপুর, জয়কৃষ্ণ মিত্র।

অধ্যক্ষ সভার গত বিশেষ অধিবেশনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি, সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক ও ধনাধ্যক্ষ ব্যতীত

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য মনোনীত হইয়াছেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, এম এ, বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, বিএ, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র এম এ, আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র, বিএ, কালীশঙ্কর সুকুল, এম এ, উমাপদ রায়, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, হীরালাল হালদার, এম এ, ডাক্তার পি, কে, রায়, বাবু মধুসূদন সেন, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

১৮৮৮ সালে বঙ্গমহিলা সমাজের অধিবেশনে ডাক্তার পি, কে, রায় মানবাত্মা, ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও স্বরূপ, ও মানবাত্মা এবং পরমাত্মার সম্বন্ধ, উপাসনা, এবং কর্ত্তব্য ও বিবেক, স্বর্ণপ্রভা বসু, মাতার কর্ত্তব্য, কামিনী সেন বিএ, সমাজ ও সামাজিক জীবন কাহাকে বলে, সুবর্ণপ্রভা বসু, স্ত্রীর কর্ত্তব্য, রাধারাণী লাহিড়ী, সামাজিক সুরীতি ও সদাচারের আবশ্যকতা, বাবু আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় চরিত্র গঠন ও ব্রাহ্মিকার কর্ত্তব্য কি, অবলা বসু, গৃহিণীর কর্ত্তব্য, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী পাপ কি, মুক্তি কি? পরকাল ও প্রকৃত ধর্ম্মজীবন কি? সরলা রায়, আলাপ, পত্রাদি লেখা, দেখা সাক্ষাৎ, সায়ং সমিতি ও রমণীর পরিচ্ছদ ইত্যাদি সম্বন্ধে রীতিনীতি কিরূপ হওয়া উচিত এবং লাবণ্যপ্রভা বসু বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর বয়স্থা কুমারীগণের কর্ত্তব্য কি বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন। ১৫ই এপ্রেল, ১লা আগষ্ট ও ২৪ এ নবেম্বর সায়ংসমিতি হইবে, ২৯ শে ডিসেম্বর মহিলাদিগের সামাজিক রীতিনীতি সম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণ নিয়মের আলোচনা হইবে।

বর্ত্তমান বৎসরের তত্ত্ববিদ্যা সভার অধিবেশনে বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র, বিএ, বৌদ্ধধর্ম্ম, বাবু সীতানাথ দত্ত, ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্ববিদ্যা, বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, এম, এ, এমার্সনের ধর্ম্ম, বাবু ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় বিএ, ধর্ম্মের আদর্শ, বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত বিএ, ব্রাহ্মসমাজে ধর্ম্ম-জীবনের বিকাশ ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, এম এ, দেশীয় ও পাশ্চাত্য ধর্ম্মের আদর্শ ও উপনিষদের ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করিবেন। ১৩ই ফাল্গুন উক্ত সভার অধিবেশনে বাবু হীরালাল হালদার এম এ, ব্রাহ্মধর্ম্মের দার্শনিক ভিত্তি সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ডাক্তার পি, কে, রায় ও বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরও নবেম্বর ও অক্টোবর মাসে দুইটী প্রবন্ধ পাঠ করিবেন সে প্রবন্ধ দ্বয়ের বিষয় স্থিরীকৃত না হওয়াতে আমরা তাহা প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

বিগত ৮ই ফাল্গুন হইতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মবিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। প্রতি রবিবার অপরাহ্ন ৪॥ ঘটিকার সময়ে উক্ত সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা মন্দির গৃহে বিদ্যালয়ের কার্য্য হইয়া থাকে। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ শিক্ষকতা কার্য্যের ভারগ্রহণ করিয়াছেন।

উচ্চশ্রেণী ধর্ম্ম-বিজ্ঞান-শিক্ষক ডাক্তার পি কে রায়। ধর্ম্ম অনুষ্ঠান শিক্ষক পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী। বি এ ক্লাসের ছাত্র ও গ্র্যাজুয়েটগণ এই শ্রেণীতে ধর্ম্মশিক্ষালাভ করিতে পারিবেন।

মধ্যম শ্রেণী ধর্ম্ম ও নীতিবিজ্ঞান, শিক্ষক, বাবু সীতানাথ দত্ত, ধর্ম্ম ও নীতি অনুষ্ঠান, শিক্ষক বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত এফ এ এবং এণ্ট্রান্স শ্রেণীর ছাত্রগণ এই শ্রেণীতে ধর্ম্মশিক্ষালাভ করিতে পারিবেন। নিম্ন শ্রেণী ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষক বাবু মোহিনীমোহন রায় এই শ্রেণী ব্রাহ্ম বালকবালিকাদের জন্য। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে, ইতিমধ্যেই উচ্চশ্রেণীতে ১৫ জন ছাত্র হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ৫ জন গ্র্যাজুয়েট। ব্রহ্মবিদ্যালয় সম্বন্ধে আরও বিশেষ কিছু জানিতে যদি কেহ ইচ্ছুক হয়েন, তিনি যেন অনুগ্রহ করিয়া ব্রহ্মবিদ্যালয়ের সম্পাদক বাবু সীতানাথ দত্তের নিকট অনুসন্ধান করেন। সীতানাথ বাবুর ঠিকানা, ২১০।৬ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট।

বিগত ৫ই ফাল্গুন ব্রাহ্মবন্ধু সভার বার্ষিক অধিবেশন হয়। উক্ত অধিবেশনে বাবু শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী ব্রাহ্মসমাজের জন্ম ও উন্নতি সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। বর্ত্তমান বৎসরের জন্য বাবু রজনীনাথ রায় এবং তাঁহার অনুপস্থিতিকালে ডাক্তার মোহিনীমোহন রায় উক্ত সভার সম্পাদক এবং বাবু হরকিশোর বিশ্বাস সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন।

গত ৭ই মাঘ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা গৃহে ১৮৭২ সালের তিন আইন অনুসারে একটী ব্রাহ্ম বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্রের নাম বাবু তারকচন্দ্র ঘোষ, বয়স প্রায় ৩০ বৎসর। পাত্র বিপত্নীক, মেদিনীপুরের মুনসেফি আদালতের সেরেস্তাদার। পাত্রী বাবু হরনাথ বসুর দ্বিতীয়া কন্যা কুমারী শ্রীমতী সুশীলাবালা বসু, বয়স ১৭ বৎসর। পাত্র, পাত্রী উভয়েই কায়স্থকুলোদ্ভব। পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।

আমাদের বন্ধুগণের মধ্যে অনেকে আমাদিগকে উৎসবের বিস্তারিত বিবরণ মুদ্রিত করিতে অনুরোধ করেন। সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ করিতে বিলম্ব হওয়াতে তত্ত্বকৌমুদী প্রকাশিত হইবার পক্ষেও অনেক বিলম্ব হইল। বোধ হয় আরও দুই সংখ্যার পর নিয়মিত সময়ে কাগজ বাহির হইবে।

বিজ্ঞাপন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক পদে অভিষেক করিবেন স্থির করিয়াছেন।

সাঃ ব্রাঃ সমাজ কার্য্যালয়। শ্রীগুরুচরণ মহলানবিশ
১৫ই মার্চ্চ, ১৮৮৮। সম্পাদক, সাঃ ব্রাঃ সমাজ।

আগামী ৭ই এপ্রিল শনিবার বেলা ৫টার সময়ে সিটী কলেজ গৃহে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষসভার ১ম ত্রৈমাসিক অধিবেশন হইবে।

আলোচ্য বিষয়।

(১) কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ১ম ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণ ও আয় ব্যয়ের হিসাব।

(২) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনালয়ের চূড়া নির্ম্মাণ।

(৩) যাঁহারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ৫ বৎসরের চাঁদা দেন নাই তাঁহাদিগকে সভ্য-পদচ্যুত করিবার প্রস্তাব।

(৪) সভ্য মনোনয়ন।

(৫) বিবিধ।

গুরুচরণ মহলানবিশ
সম্পাদক, সাঃ ব্রাঃ সমাজ।

তত্ত্ব কৌমুদী

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

১০ম ভাগ।
২৩শ সংখ্যা।

১লা চৈত্র মঙ্গলবার, ১৮০৯ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৯।

বাৎসরিক অগ্রিমমূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩৲
প্রতিখণ্ডের মূল্য ৵০

পূজার আয়োজন।

আমাকে কাঙ্গালের রোগে ধরিয়াছে। আমি যত পাই না কেন, আমার আরও চাহিতে ইচ্ছা করে। তোমার দান যখন আমি মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করি, আরও অধিক দানের জন্য আমার প্রাণ তখন লোলুপ হইয়া উঠে। পরিমিত পদার্থকে আদর্শ করিবার আদেশ নাই, তুমি স্বয়ংই সকল আদর্শের শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দিয়াছ। অল্প দ্রব্যে, অল্প উন্নতিতে তাই তুষ্ট থাকিতে পারি না। উৎসবে পাপীদের সঙ্গে একাসনে বসিয়া কত ব্যাপারই দেখাইলে! এখন ইচ্ছা হইতেছে যে, নিত্য তুমি তেমনই ব্যাপার দেখাও। বৎসরের মধ্যে যদি এক দিন মত্ত করিতে পার তবে বাকী তিন শত চৌষট্টি দিন কি মত্ত রাখিতে পার না? সর্ব্বশক্তিমান্, অলৌকিক কার্য্যসকল তুমি সর্ব্বদাই ঘটাইয়া থাক, তুমি নিত্য উৎসব করাইতে পার না,একথা কে মুখে আনিবে? [illegible] অসম্ভবকে সম্ভব, রজনীতে সূর্য্যোদয় এবং কটাক্ষে ঘোর দুরাচারকে ত্রাণ কর, নিত্য উৎসব করান তোমার পক্ষে কি কঠিন ব্যাপার? দুর্ব্বল আমি, আমার ব্যাকুলতাকে জাগ্রত রাখিতে পারি না, তাই নিত্য উৎসব সম্ভোগ করিতে পারি না। হীন প্রাণে লীলা করিতে তুমি কুণ্ঠিত নও, তোমার লীলার ক্ষেত্র হইবার জন্য আমিই সকল সময়ে প্রস্তুত নই। প্রমত্তদিগের প্রভু, মত্ততার কণিকামাত্র তোমার সন্তানকে দাও, সে কৃতার্থ হইয়া আনন্দে নৃত্য করিবে।

হে প্রাণের বসন্ত! জীবনে প্রত্যহ নূতন ফুল বিকসিত কর। শুষ্ক ফুলে তোমাকে পূজা করিয়া কে তৃপ্ত হইবে? প্রভাত যেমন প্রতিদিন নূতন সাজে সজ্জিত হইয়া তোমার যশোগান করে, আমি চাই যে আমিও তেমনি নিত্য "নবভাবে নবপ্রেমে মাতি" তোমার পূজা করি। পুরাতন ভাবে সেবা করিয়া প্রাণ তুষ্ট হয় না, নব নব উৎসাহ লইয়া প্রত্যহ তোমার কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণের আকাঙ্ক্ষা রাখি। জীবনে ইহার মধ্যে বার্দ্ধক্যের নিদর্শন দেখিয়া লজ্জিত, ক্ষুব্ধ ও বিষণ্ণ হইয়াছি। কোথায় দেখিব যে, প্রত্যহ নূতন ভাবে তোমার পূজা করিব, না দেখিতেছি তোমার উপাসনা পুরাতন হইয়া পড়িতেছে, মুখ দিয়া পুরাতন কথা বাহির হইতেছে। বসন্তাগমে বিটপীরাজি নব [illegible] করিতেছে। আর আমার বার্দ্ধক্য স্মরণ করিয়া আমি অশ্রুপাত করিতেছি। নবজীবনদাতা, আমি তোমার একান্ত অধীন, আমার জীবন মরণ তোমারই হস্তে। তুমি আমার হৃদয়ে চির-বসন্তরূপে বিরাজ কর, তোমাকে জানিবার ইচ্ছা চিরকালই প্রবল থাকুক,তোমার সেবা করিবার বাসনা চিরকালই অক্ষুণ্ণ থাকুক। বার্দ্ধক্যের চীরবাস পরিত্যাগ করিয়া যৌবনের নবীন বসন পরিধান পূর্ব্বক তোমার উপাসনা ও সেবা করি ইহাই আমার বাসনা। উৎসাহ-সূর্য্য হৃদয়ে চির উদিত থাকুক, নিত্য নব নব উৎসাহে তোমার অর্চ্চনা করিয়া তোমার উপাসক নামের সার্থকতা সম্পাদন করি।

আমি যে বলি যে তোমার কার্য্য করি ইহা কি সত্য কথা? কর্ত্তব্য বলিয়া যে সকল কার্য্য করি সকলই কি তোমার জন্য? পরিবার পালনের জন্য আমি যে ধন উপার্জ্জন করি সে তোমার জন্য না আমার জন্য অনেক সময় বুঝিতে পারি না। যদি তোমারই জন্য তবে সন্দেহ হয় কেন? অনেক সময়ে দেখি যে আগে কাজ করিয়া পরে তোমার আদেশ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করি। আমার সেবা যদি প্রকৃত তোমার সেবা হইত তবে এমন বিভ্রাট ঘটিবে কেন? যে তোমার যথার্থ ভৃত্য, সে অগ্রে তোমার আদেশ লয়, তার পর কার্য্যে অবতরণ করে। যে তোমার অনুমোদিত বলিয়া কার্য্য করে তাহার হৃদয়ে কতই তৃপ্তি! কাজ করিয়া সে শ্রান্ত হয় না, কাজ করিতে করিতে বিরক্তি আসিয়া তাহার মনকে আচ্ছন্ন করে না। কাজ যেন আমার ভার বোঝা। স্কন্ধে কাজ পড়িয়াছে, কি করি করিতে হয়। কাজ ফুরাইয়া গেলে মনে করি যে বাঁচিলাম, আপদ বিদায় হইল। কোথায় তোমার জন্য পরিশ্রম করিতে পাইতেছি বলিয়া আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিব, না মনে করি যে কাজ করিয়া তোমাকে বাধ্য করিতেছি। এ বিড়ম্বনা হইতে প্রভু রক্ষা কর। আত্মসেবা করিয়া তোমার সেবা করিতেছি বলিয়া কত দিন আর লোককে প্রবঞ্চনা করিব? প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধের নিগূঢ় রহস্য আমাকে বুঝাইয়া দেও, আমি একবার সাধ মিটাইয়া তোমার দাসত্ব করিয়া কৃতার্থ হই। শুষ্ক সৎ কার্য্য লইয়া আমি কি করিব? তোমার প্রেমের জন্য যে কার্য্য না করিলাম তাহা ব্যর্থ হইল। যাহাতে তোমাকে সর্ব্ব কর্ম্ম সমর্পণ করিতে পারি, তুমি এমন শুভ বুদ্ধি প্রেরণ কর।

মানুষের কাছে কথা রাখিতে আমার কতই আগ্রহ। মানুষকে কথা দিয়া সে কথা রক্ষা না করা যে অত্যন্ত নীচতা ইহা আমি খুব স্বীকার করিয়া থাকি। কিন্তু তোমার কাছে যে অঙ্গীকার করি সে অঙ্গীকার পালনে আমার তত যত্ন দেখিতে পাই না। তোমার নিকট যত প্রতিজ্ঞাই করিয়াছি তাহার কয়টী আমি রক্ষা করিতে পারিলাম? দিনের দিনের পর দিন আমি তোমার কাছে মিথ্যাবাদী হইতেছি, অথচ সে জন্য বিশেষ যন্ত্রণা বোধ হয় না। আমি যখনই আমার দুর্ব্বলতার ওজর করি তখনই তোমার অনন্ত শক্তির কথা বলিয়া আমাকে নিরুত্তর করিয়া দাও। তুমি বল, "সন্তান! তুমি আমার বলে বাঁচিবে, আমার বল অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে তুমি কেন দুর্ব্বলতার কথা বলিতেছ?" যথার্থই তুমি প্রত্যেক সৎচিন্তা ও সৎ প্রতিজ্ঞার সহায়। যে সৎ প্রতিজ্ঞা করে সে তোমার অনন্ত শক্তির সাহায্য পায়। আমি ভাল করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতে পারি না তাই আমার এমন দুর্দ্দশা! যদি আমার প্রত্যেক প্রতিজ্ঞাকে তোমার নামে মন্ত্রপূত করিয়া প্রয়োগ করিতে পারিতাম তাহা হইলে উহা নিশ্চয়ই অব্যর্থ হইত। তোমার ইচ্ছা যখন সতত মানবের কল্যাণসাধনে ও পাপ বিনাশে রত, তখন আর আমার চিন্তা কি? তোমার পাপবিজয়ী শক্তিতে আমার বিশ্বাস উজ্জ্বল করিয়া দাও।

মন, ভবিষ্যতের জন্য তুমি এত ব্যস্ত কেন? তুমি তো আর অনাথ নও যে তোমার ভবিষ্যৎ ভবিষ্যতের হস্তে থাকিবে! যখন এক মঙ্গলময় সর্ব্বশক্তিমান্ পুরুষের হস্তে তোমার ভবিষ্যতের ভার রহিয়াছে তখন আর তোমার উদ্বিগ্ন হইবার প্রয়োজন কি? সাধু এমারসনের মহাবাক্য স্মরণ রাখিও, "যাহা কিছু আমি দেখিয়াছি, তাহা যাহা কিছু দেখি নাই তাহার জন্য স্রষ্টার উপর নির্ভর করিতে শিক্ষা দেয়।" ভূতকালে দেখিয়াছ, বর্ত্তমান কালে দেখিতেছ, যে তোমার জীবনের স্রষ্টা তোমার জীবনকে মঙ্গলের পথে পরিচালিত করিয়াছেন ও করিতেছেন। ভবিষ্যতের জন্য অদৃষ্টের জন্য তবে তুমি কেন চিন্তিত হইবে? একজন ক্ষমতাশীল পুরুষের হস্তে জীবনের ও ভবিষ্যতের ভার দিতে পারিলে কি আরাম! রমণী ও বালকের জীবন এই নির্ভরের ভাবের কি জলন্ত দৃষ্টান্ত রমণী পতির মুখের দিকে চান, সেখানে অটল বীরত্ব ও অক্ষুণ্ণ প্রতিজ্ঞার নিদর্শন দেখিয়া তিনি জীবন্তভাবে সংসারে বিচরণ করেন। বালক তাহার পিতা মাতার হস্তে সকল ভার দিয়া প্রফুল্ল মনে ক্রীড়ায় রত হয়। প্রভু কি কখন তাঁহার অঙ্গীকার পালনে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন? তবে উৎকণ্ঠা কেন? স্থির হও, তোমাকে পরিত্রাণ দিবেন বলিয়া প্রভু যে অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহা স্মরণ কর এবং "মাতৃকোলে শিশু সন্তান যেমন, তেমনি আনন্দে কর বিচরণ।" ভয়ের কারণ নাই, "ব্রহ্ম নামের বলে তুমি স্বর্গ রাজ্য অধিকার করিবে।"

দুয়ে দুয়ে চারি, একথা যেমন সত্য, সূর্য্য চন্দ্রের আকর্ষণে জোয়ার ভাঁটা হয়, একথা যেমন সত্য, "প্রার্থনা কর প্রার্থিত বস্তু পাইবে" একথাও তেমনি অভ্রান্ত সত্য। ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। দাতার ঐশ্বর্য্যের অভাব নাই, কিন্তু আশ্চর্য এই, দারিদ্র্যের বাহুল্য সত্বেও ভিক্ষুকের অভাব আছে। দুই চারি জন লোক বালকের মত বিশ্বাস লইয়া অকুতোভয়ে স্বর্গের দ্বারে আঘাত করেন। যেমন আঘাত, অমনি দ্বার খুলিয়া যায়, আর তাঁহারা অনায়াসে স্বর্গে প্রবেশ করেন। আর তোমার আমার মত অল্প বিশ্বাসী লোকের দ্বারে আঘাত করা কদাচিৎ ঘটিয়া উঠে। অনেক সময়ে দ্বারে হাতই পড়ে না, আকাশে আঘাত করিয়া মনে করি, ঈশ্বরের দ্বারে আঘাত করিয়াছি। যদি বা এক আধ বার দ্বারে করার্পণ করি, আমাদের হস্ত এমনি কম্পিত হয় যে, ভাল করিয়া আঘাতই হয় না। প্রার্থনা করিতে জানি না, প্রার্থনা সাধন করি না, অথচ জীবন ভাল হইতেছে না বলিয়া ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করি। আমাদের জীবন অনুন্নত থাকুক, ইহা ত ঈশ্বরের অভিলাষ নয়, তবে তাঁহার দোষ কি? মন! প্রভুকে এখনও ডাকিতে শিখ নাই। আর বিলম্ব করিও না,—ভিক্ষুকের কাছে যাও, কেমন করিয়া ভিক্ষা করিতে হয় শিখিয়া আইস, পিতামাতাকে কেমন করিয়া বিশ্বাস করিতে হয় বালকের কাছে শিক্ষা কর। প্রভু সত্যপরায়ণ, আঘাত করিলেই দ্বার খুলিবেন অঙ্গীকার করিয়াছেন।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

আগ্নেয় স্নান।

জড়জগতে ও মনোজগতে অনেক বিষয়ে মিল থাকিলেও, কতক বিষয়ে অমিল দেখিতে পাওয়া যায়। একটী অমিলের কথা আমরা পাঠকবর্গকে এই প্রস্তাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিব। স্নানের ফলাফল সকলেই অবগত আছেন। স্নানে দেহের মলিনতা বিদূরিত হয়, ও রক্ত সঞ্চালনের সাহায্য হয়। দেহকে পরিষ্কৃত ও সুস্থ রাখিতে হইলে যেমন জড়জগতে স্নান করিতে হয়, আত্মাকে বিশুদ্ধ ও উন্নতিশীল অবস্থায় রাখিতে হইলে অধ্যাত্ম জগতে অধ্যাত্ম স্নানের তেমনি আবশ্যক। প্রভেদ এই, জড়জগতের স্নান জলে, অধ্যাত্ম জগতের স্নান অনেক সময় অগ্নিতে করিতে হয়। নিদাঘ-ক্লিষ্ট ঘর্ম্মাক্ত জীব শৈত্য লাভের আশায় নদী বা সরোবরে অবগাহন করে, শীত-ভীত আত্মা উষ্ণতা পাইবার লোভে উৎসাহ-অগ্নিতে অবতরণ করে। শৈত্য আত্মার বিষম শত্রু। মহাজনদিগের ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে তাঁহারা যে, সকল বিষয়কে নিজ নিজ জীবনের লক্ষ্য করিয়াছিলেন, সে সকল বিষয় সম্বন্ধে তাঁহাদের মনে শীতল ভাব যাহাতে না আসে, সে জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। উইলবারফোর্স দাসত্ব প্রথা নিবারণকে তাঁহার জীবনের একটী লক্ষ্য বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। উক্ত প্রথার বিপক্ষে কেহ কখনও তাঁহার শীতল ভাব দেখে নাই। কারারুদ্ধ করিয়াও গালিলিয়োকে কেহ বলাইতে পারে নাই যে, পৃথিবী নিশ্চল। বাহুল্য ভয়ে অন্য দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা গেল না। ধর্ম্মজগতে শীতলতা অধিকতর অনিষ্টকর। আমি যদি ঈশ্বরের বিষয়ে শীতল ভাবে কথা কহি, লোকে নিশ্চয়ই আমার বিশ্বাসের দৃঢ়তা সম্বন্ধে সন্দেহ করিয়া বলিবে, যে ইনি নিজেই ভাল করিয়া বিশ্বাস করেন না, আবার অপর লোককে বিশ্বাস শিখা-

হইতে আসিয়াছেন! বিশ্বাস ও শীতলতায় কখনই মিল হইতে পারে না। ঈশ্বরে বিশ্বাস করি অথচ আমার প্রাণ শীতল, কথা শীতল, চক্ষু শীতল, ইহা অসম্ভব। ঈশ্বরে আমি মুগ্ধ, অথচ ঈশ্বরের কথা বলিবার সময় আমার চক্ষু দিয়া অগ্নি নিঃসারিত হয় না; ঈশ্বরের কার্য্য করিবার সময় আমার প্রাণে আগুণ ছুটেনা, ইহা অতি অবিশ্বাসের কথা। বিশ্বাসীর চক্ষু, কার্য্য, জীবন ও কথা সকলই অগ্নিময়। তাঁহার ভিতর হইতে সর্ব্বদাই এরূপ উত্তাপ বাহির হয় যে, সংসারী লোকে সহসা তাঁহার নিকট যাইতে সাহস করে না।

উৎসব ও উপাসনা এক একটী আগ্নেয় ব্যাপার। এক এক বার উৎসব আসে, আর আমাদিগকে অগ্নিতে স্নান করাইয়া যায়। আমাদের দৈনিক উপাসনাও আমাদের জীবনের উষ্ণতার কারণ। এক একবার ভাল উপাসনা করি, আর প্রাণে ব্রহ্মাগ্নি জ্বলিয়া উঠে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ঐ অগ্নি সংসারের শীতলতায় শীঘ্রই নির্ব্বাণ হইয়া যায়। উপাসনা পুরাতন ও ভারবহ হইয়া পড়ে, স্বরূপ সাধনের সরসত্ব হ্রাস পায় ও ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধনে অরুচি ও অনাস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। কিরূপে প্রাণে দিবানিশি ব্রহ্মাগ্নি জ্বালিয়া রাখিতে পারা যায়? আমরা শুনিয়াছি যে, আমাদের দেশে পূজ্যপাদ আর্য্য সন্তানেরা তাঁহাদের গৃহে দিবানিশি গার্হস্থ্য অগ্নি জ্বালিয়া রাখিতেন। আমরা আরও শুনিয়াছি, যে রোম রাজ্যে রোমীয় রমণীকুল দেবমন্দিরস্থ অগ্নি রক্ষার্থ চির-কৌমার্য্য-ব্রত গ্রহণ করিতেন। মনোগৃহে সেইরূপ অগ্নি জ্বালিয়া রাখিবার অথবা হৃদয় মন্দিরে ব্রহ্মাগ্নি রক্ষা করিবার জন্য, সুদৃঢ় ব্রত গ্রহণ করিতে হইলে আমাদিগকে কি করিতে হইবে? প্রথম কথা এই, শীতলতাকে মহাপাপ বলিয়া ধারণা করিতে হইবে। শীতলতাকে পাপ বলিয়া বোধ করিতে না পারিলে তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্র গ্রহণ করিতে প্রবৃত্তিই হয় না। আজ কাল কোন বিষয়ে উৎসাহের সহিত আলাপ করিলে লোকে মনে করে, ইনি এ বিষয়ে বড় গোঁড়া। লোকে মনে করে করুক, উৎসাহ না থাকিলে সফলতা লাভ করা যে অতীব দুরূহ ইহাতে সন্দেহ নাই। ধন মানের জন্য অথবা খ্যাতি লাভের আশায় উৎসাহ প্রকাশে যদি দোষ না ঘটে, তাহা হইলে ধর্ম্মের জন্য উৎসাহে যে কেন দোষ ঘটিবে ইহা বুঝিয়া উঠা ভার। ধর্ম্মাপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ও মহত্তর বস্তু জগতে আর কি আছে? তাই বলিতেছিলাম যে, অগ্রে শীতলতাকে পাপ ও উষ্ণতাকে পুণ্য ও ঈশ্বরানুমোদিত বলিয়া জানিতে হইবে। রোগ নির্দ্ধারণেই অর্দ্ধেক রোগ নিবারণ। যখনই দেখিবে যে, উপাসনা শুষ্ক হইয়া যাইতেছে, আত্মচিন্তার তীব্রতা হ্রাস হইতেছে এবং সিংহের ভাব ঘুচিয়া মৃদু ভাব প্রবেশ করিতেছে, তখনই বুঝিতে হইবে যে, ঔষধি প্রয়োগের সময় উপস্থিত। ঈশ্বর চির-ব্যস্ত ও চির-উৎসাহী, এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তাঁহার প্রকৃত সেবকদিগের প্রাণে চির-ব্যস্ততা ও চির-উৎসাহ প্রকাশ পাইবে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য।

দ্বিতীয় কথা এই, সর্ব্বদা অগ্নি জ্বালিয়া রাখিবার চেষ্টা করিবে। অগ্নির সংস্কার আছিতে। পুরাণে আমরা শুনি যে যখন অতিরিক্ত হবি পানে অগ্নির ক্ষুধা মান্দ্য উপস্থিত হয়, শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন খাণ্ডব দহন করাইয়া অগ্নির সেই রোগ বিদূরিত করেন। অগ্নির আহার যোগাইতে পারিলেই অগ্নিকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারা যায়। দেখিতে হইবে যে, আর কাষ্ঠ আছে কি না, না থাকে নূতন কাষ্ঠ আনিতে হইবে। উপাসনা ও প্রার্থনা পুরাতন হইয়া পড়িতেছে যেমন বোধ হইবে অমনি নূতন উপাসনা ও প্রার্থনা করিবার চেষ্টা করা আবশ্যক। নূতন কার্য্যপ্রণালী, নূতন কার্য্য ক্ষেত্র, সর্ব্বদাই স্থির করিতে হইবে। গাছের শির যিনি নব পল্লবে সুসজ্জিত করেন এবং বিহঙ্গ পক্ষ যিনি নূতন পক্ষে বিভূষিত করেন, তিনি আত্মাকে পুরাতন ভাব, জ্ঞান ও জীবন লইয়া থাকিতে বলিবেন ইহা অতি অকিঞ্চিৎকর কথা। ঈশ্বর চির-নূতন; নিত্য নব নব ভাবে সাধক প্রাণে প্রকাশিত হন। তাঁহার উপাসকও যে নিত্য নব নব ভাবে তাঁহার পূজা করিবে, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। বিশ্বাসী হৃদয়ের একটী প্রধান লক্ষণ নবীনত্ব। উপাসনা গৃহ হইতে বিশ্বাসী প্রত্যহ নূতন মুকুট পরিয়া আসেন। কর্ম্মক্ষেত্রে বিশ্বাসী প্রত্যহ নূতন উৎসাহ যোজনা করেন। জ্ঞান ভাব ও কার্য্যের ক্ষেত্র বৃদ্ধি করিতে তিনি সদাই ব্যস্ত। পুরাতন কথা তিনি বলিতে পারেন, কিন্তু এমন নূতন বেগে সেই সকল কথা তাঁহার নিকট হইতে বাহির হয় যে, লোকে শুনিয়া অবাক হইয়া যায়। নূতন ভাব ও কার্য্যরূপ আহার লাভ করিয়া বিশ্বাস-অগ্নি সর্ব্বদা প্রজ্বলিত থাকে। শীতলতা তাঁহার নিকটে ভয়ে অগ্রসর হইতে পারে না।

তৃতীয় কথা এই যে, নূতন ভাব ও কার্য্য দিয়া যেমন অন্তরাগ্নিকে সজীব করিতে হইবে, তেমনই সংসা বা দুর্ব্বলতা বশতঃ সেই অগ্নি নির্ব্বাণ হইলে তাহা জ্বালিবার জন্য পুনরায় প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে। যখন বাহিরের অগ্নি নির্ব্বাণপ্রায় হয় তখন লোকে ফুৎকার দিয়া তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করিতে চেষ্টা করে। যখন অধ্যাত্ম অগ্নি নির্ব্বাণপ্রায় হয় তখনও তেমনি ক্রমাগত চেষ্টা করিয়া অগ্নিকে সজীব করিতে হইবে। শীতলতা আসিবার উপক্রম হইয়াছে যেমন দেখিবে অমনি সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আত্মার মূলে ফুৎকার দিতে প্রবৃত্ত হইবে। অসিদ্ধ লোকদিগের পক্ষে সংসার আদৌ নিরাপদ স্থান নয়। এমনই কুটিল উহার শীতলতা যে, তাহা অতর্কিত ভাবে প্রাণের অগ্নি নষ্ট করিয়া ফেলে। খুব তেজস্বী লোকদিগকেও ঐ শীতলতার হস্ত হইতে মুক্তি লাভের জন্য সাবধান থাকিতে হয়। দুর্ব্বল লোকদিগের ত কথাই নাই তাহাদিগের বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক। এ রোগের ঔষধ এই যে শীতল বায়ুর আভাস পাইবামাত্র উহা দূর করিবার চেষ্টা করিবে। ফুঁ দিয়া ফুঁ দিয়া কিছুই হইল না, একথা বলিও না। বল যে ফুঁ দেওয়া হয় নাই। সর্ব্বশক্তিমান্ আমাদের ত্রাণের জন্য ব্যস্ত। যথার্থই যদি আমরা ফুৎকার প্রয়োগ করি তিনি তাঁহার সাহায্য দানে বিরত হইবেন না। অনন্ত শক্তিশালী পুরুষ, যাহাদের সহায় তাহাদের আবার ভাবনা কি? সাবধান থাকিতে হইবে যে অগ্নি একবারে নির্ব্বাণ না হয়—নির্ব্বাণের উপক্রমেই ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। পরমেশ্বর আমাদের ঔষধ ও ঔষধদাতা চিকিৎসক।

তাঁহার নাম ধরিয়া ফুৎকার দিলে যদি নির্ব্বাণপ্রায় উৎসাহ-অগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া না উঠে তবে সে নামের মহিমা কি ?

বাহিরের উৎসব শেষ হইয়াছে, ভিতরের উৎসব অনন্ত কালেও শেষ হইবে না। যাঁহারা অগ্রের স্থানে স্বীকৃত আছেন তাঁহারা অগ্রসর হউন। ব্রহ্মাগ্নিতে তাঁহারা আপন আপন প্রাণ অগ্নিময় করিয়া লউন। এবং নূতন উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের সহিত নববর্ষের কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন। আসুন সকলে মিলিয়া শীতলতা ও মৃদুভাব চিরদিনের জন্য বিদায় করিয়া দিই। আমাদের বাক্য ও কার্য্য অগ্নিময় হউক। আমাদের জীবনের অগ্ন্যুৎপাতে বঙ্গভূমি অগ্নিময় হইয়া উঠুক। ব্রহ্মাগ্নি গৃহে গৃহে প্রবেশ করিয়া পাপ কুসংস্কার নিরুদ্যম ও নিরাশার কুটীর দগ্ধ করুক। নূতন প্রতিজ্ঞা, নূতন ব্রত গ্রহণ এবং নূতন দায়িত্ব অনুভব করিয়া আসুন আমরা জীবন-সংগ্রামে অবতীর্ণ হই। ব্রহ্মরূপ অনন্ত অগ্নি আমাদের নেতা ও সেনাপতি—শীতলতার উপর জয় লাভে কি আর অণুমাত্র সন্দেহ আছে ?

"তস্মিন্ প্রীতি তস্য প্রিয় কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

দুইই চাই, তস্মিন্ প্রীতি ও চাই, তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনও চাই। পৃথক করিলেই প্রমাদ, ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য দেয়। আমরা দেখিতে পাই যে হিন্দু-ধর্ম্মের সম্প্রদায় বিশেষ তস্মিন্ প্রীতি সাধন করিতে গিয়া চরিত্রের বিশুদ্ধতা হারাইয়া ফেলিয়াছে। আমরা আরও দেখিতে পাই যে ধর্ম্ম বিশেষ তস্য প্রিয় কার্য্য সাধন করিতে গিয়া তস্মিন্ প্রীতি রক্ষা করিতে পারে নাই। আমরা বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও খৃষ্টধর্ম্মের কথা বলিতেছি। বৈষ্ণবধর্ম্মে যেমন মহাভাব সাধন হইয়াছিল এমন আর অন্য কোনও ধর্ম্মে হইয়াছিল বলিয়া শুনিতে পাই না। ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের যে সম্বন্ধ তাহা যত প্রকার মধুর ভাবে সাধন করা যাইতে পারে বৈষ্ণব ধর্ম্ম তাহার কিছুই ত্রুটি করেন নাই। হাস্য, ক্রন্দন, ও মূর্চ্ছাদি যে সকল ভক্তির লক্ষণ ভাগবতাদিতে উক্ত আছে বৈষ্ণবেরা আপন জীবনে সে সকল দেখাইয়াছেন। তথাপি ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্যকারী বলিয়া তাঁহারা আজিও ও সাধারণের নিকট পরিচিত হইতে পারেন নাই। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে যে ঈশ্বর প্রীতি নাই এমন কথা বলা হইতেছে না, কিন্তু ইহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন যে খৃষ্টসম্প্রদায় সকলের বিশেষতঃ প্রোটেষ্টাণ্টদিগের মধ্যে তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনের দিক্‌টা তস্মিন প্রীতির দিক্ হইতে অধিকতর স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে। আমাদের জীবনেও আমরা এই সত্যের যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম করি। যখন আমরা ভাবেরদিকে অধিক দৃষ্টি করি তখন আমাদের সৎকর্ম্ম সাধনের দিকে তত মনোযোগ থাকে না, আবার যখন প্রিয় কার্য্য সাধনেচ্ছু হইয়া নানা কার্য্যে প্রবৃত্ত হই তখন ঈশ্বর প্রীতি হারাইয়া ফেলি।

বাস্তবিক "তস্মিন্ প্রীতি" ও "তস্য প্রিয়কার্য্য সাধন" দুইটী বিসম্বাদী বস্তু নহে। উহারা একই মানসিক অবস্থার দুইটী দিক্ মাত্র। যেমন এক জনকে ভাল বাসি অথচ যদি তার হিতকার্য্য অনুষ্ঠান না করি এরূপ ভালবাসা ভালবাসা বলিয়াই গণ্য হয় না তেমনই ঈশ্বরকে প্রীতি করি অথচ যদি তাঁর প্রিয়কার্য্য সাধন করি না তাহা হইলে সে ঈশ্বর প্রীতি প্রীতি শব্দেই বাচ্য হইতে পারে না। ঈশ্বর প্রীতি ও প্রিয়কার্য্য সাধনে কার্য্য কারণ সম্বন্ধ। বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞান ও দর্শন এই দুইটীতে পৃথক্ করিতে গিয়া হিতবাদ প্রচার করিয়াছেন। আপন স্বার্থ বা সাধারণ স্বার্থ সাধনের জন্য যে কর্ম্ম তাহাই এখন সৎকর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অনেকেই এখন বলেন যে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া উপাসনা করিলে কি হইবে? সৎকর্ম্ম কর, ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন কর, মানবজীবনের উদ্দেশ্য সফল হইবে। যাঁহারা এরূপ বলেন, তাঁহারা উপরিউক্ত ব্রাহ্মধর্ম্ম বীজের প্রথমার্দ্ধ বিস্মৃত হন। প্রকৃত উপাসনাশীল লোক যে সৎকর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারেন না একথা তাঁহারা ভুলিয়া যান। দুই দিকেই বাড়াবাড়িতেই বিপদ। নিরীশ্বর শুষ্ক কার্য্যকলাপ ও কার্য্যহীন অসার ভাবুকতা উভয়েই সমান দুষণীয়। আমাদের দেশের জ্ঞানপথাবলম্বীরা কর্ম্মপাশ হইতে মুক্তিলাভকেই প্রকৃত মুক্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। এখনও অনেককে এই মত সমর্থন করিতে দেখা যায়। এখানে নিস্ক্রিয়তার আশঙ্কা বলবতী। এখানে এরূপ মত প্রচার করা আবশ্যক যাহাতে লোকে কর্ম্মবন্ধ হইতে মুক্তি পাওয়াকে মুক্তি বলিয়া মনে না করে। কিন্তু অপরদিকে ইহাও দেখিতে হইবে যে, ইউরোপের হিতবাদ মতদ্বারা প্রণোদিত হইয়া নিরীশ্বর পরোপকারে লোকের চিত্ত আবদ্ধ না হইয়া পড়ে। এ বিষয়ে ঈশ্বরে সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণাদি যে গীতার উপদেশ আছে তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর উপদেশ আমাদের জানা নাই। কেবল হিত কর্ম্ম করিলেই মানবাত্মার পূর্ণ বিকাশ হয় না। এই মহাসত্য সাধারণে বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হওয়া আবশ্যক। বাস্তবিক যদি আমরা সাধুকর্ম্মের সাধুত্বের মূল অনুসন্ধান করি তাহা হইলে দেখিতে পাই যে ঈশ্বরাদেশই উহার প্রাণ। আপন বা সাধারণ স্বার্থ সাধন কি মানব হৃদয়ে আদেশ প্রচার করিতে পারে? তুমি এ পথে যাও, ওপথে যাইওনা, তুমি একার্য্য কর ও কার্য্য করিও না, এ সকল কথা আমরা কাহাকেও বলিতে পারি না, সমাজ ও আমাদিগকে বলিতে পারে না। যে আজ্ঞা পালন করিবে সে আজ্ঞা দাতা হইতে পারে না, যে ভৃত্য সে প্রভু হইতে পারে না। ঈশ্বর আদেশ প্রত্যেক সৎকর্ম্মের প্রেরয়িতা হইলেও এক জন উহা না জানিয়া কেবল লোকের হিতার্থ ঐ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারেন। সুতরাং কর্ম্ম করিবার পূর্ব্বে সর্ব্বাগ্রে দেখিতে হইবে, কি সঙ্কল্প করিয়া কার্য্য করা হইতেছে। ঈশ্বর প্রীতির অনুরোধে না কেবল লোক হিতের জন্য কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইতেছে ইহা খুব সাবধানের সহিত না দেখিলে নিরীশ্বর হিতবাদের হস্ত হইতে মুক্তি পাওয়া দুরূহ হইবে। বিশ্বাসী যে সদনুষ্ঠান করেন, উহা কেবল সদনুষ্ঠান নহে উহা তাঁহার দেবতার সেবা। কেন না তিনি উক্ত অনুষ্ঠান আপনার বা সাক্ষাৎসম্বন্ধে অপরের হিতের জন্য সংসাধন করেন নাই। কেবল তাঁহার ইষ্ট দেবতার আদেশে কার্য্য

সম্পন্ন হইয়াছে। আমাদের ও বিশ্বাসীর সদনুষ্ঠানে সুতরাং অনেক প্রভেদ।

প্রকৃত প্রিয়কার্য্য সাধনের আমরা কয়েকটী লক্ষণ দেখিতে পাই। তন্মধ্যে প্রধান দুই একটীর এস্থানে উল্লেখ করা যাইতেছে। প্রথম লক্ষণ এই যে উহাতে স্বার্থ সাধনের গন্ধ মাত্র নাই। বিশ্বস্ত ঈশ্বর ভৃত্য সম্পূর্ণরূপে কর্ম্মফল কামনা বিরহিত। তিনি কিসে সুখী হইবেন, লোকে কিসে তুষ্ট হইবে, সে দিকে তাঁহার দৃষ্টি নাই, প্রভু কিসে তুষ্ট হইবেন, এই ভাবনায় সেবক সদাই ব্যাকুল। কাজ তাঁহার নহে, বশ তাঁহার নহে। তিনি প্রভুর কথায় কার্য্য করেন, এবং ফলাফলের কথা উঠিলে ঈশ্বরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করেন। স্বর্গ লাভার্থ বা অন্য কোন প্রকার সুখ লালসায় তিনি শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন না, প্রভুর প্রীত্যর্থে তিনি সকল কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করেন। আমরা যে সবাই কার্য্য করি—কেহ অধ্যাপনা, কেহ চাকুরী, কেহ বা অন্য ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করি,—জিজ্ঞাসা করি, এই যে ৬।৭ ঘণ্টা করিয়া দেহ ধারণের জন্য লোকে পরিশ্রম করে, তাহার কতটুকু ঈশ্বর প্রীত্যর্থে হইয়া থাকে। আমরা অর্থের ও রাজপুরুষের সেবা করিয়া মনে করি যে ঈশ্বরের সেবা করিতেছি। প্রকৃত সেবকের ভাব লইয়া সুতরাং আমরা কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করি না, কার্য্যের সঙ্গে উপাসনার মিল রাখিতে হইবে বলিয়া কার্য্যে নামিবার পর বলপূর্ব্বক একটা মিল করিয়া লই। কিন্তু সে মিল স্বাভাবিক নহে, দীর্ঘকাল থাকিবে কেন? শীঘ্রই চলিয়া যায় এবং আমাদের যোগভঙ্গ করে। প্রকৃত ঈশ্বর সেবকের সেবা ও উপাসনা স্বর্ণসূত্রে সদাই সম্বদ্ধ থাকে। উপাসনা ও সেবা তাঁহার জীবনে অতি মধুর ভাবে মিশ্রিত হয়।

দ্বিতীয় লক্ষণ আনন্দ। দর্শনানন্দ অপেক্ষা সেবানন্দের মূল্য যে অনেক অধিক তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কেননা রূপ দেখিয়া আনন্দ হওয়া স্বাভাবিক, সেবা করিয়া আনন্দ পাওয়া সাধন সাপেক্ষ। সম্ভোগের আনন্দ অপেক্ষা পরিশ্রমের আনন্দ নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট ও মহত্তর। বিশ্বাসীর সঙ্গে আমাদের এ বিষয়ে কতই প্রভেদ। বিশ্বাসী কাজ করিয়া মনে মনে বলেন প্রভু আমি ধন্য হইলাম, কাজ করিতে না পাইলে বলেন, "প্রভু এ কি গুরু দণ্ড দিলে, তোমার জন্য পরিশ্রম করিতে পাইলাম না, দেহ মনকে তোমার কার্য্যে নিয়োগ করিতে দিলে না।" আমাদের ইহার ঠিক্ বিপরীত। কাজ করিতে হইলে আমরা মনে মনে কতই বিরক্ত হই, এবং কাজ শেষ হইলে মনে করি যে আপদ ঘুচিল, আমরা বাঁচিলাম। কাজ করিতে না হইলে আমরা বাঁচিয়া যাই। কাজে যাইবার জন্য ব্যগ্রতা বা আনন্দ প্রকাশ করি না। এই বিকৃত সেবার ফল এই হয়, যে আমাদের জীবন শীঘ্রই শুকাইয়া যায়। যে কার্য্য ঈশ্বরের জন্য না হইল, তাহাতে আত্মার উপকার না হইয়া অনিষ্টই ঘটিয়া থাকে। ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন করিলাম, অথচ তাহাতে তাঁহার প্রতি আমার বর্দ্ধিত হইল না, এবং আমার হৃদয়ে প্রভূত আনন্দ জন্মিল না, সে কি প্রিয়কার্য্য সাধন হইল? যদি কার্য্য করিয়া আপনাকে পরিশ্রান্ত ও কার্য্যকে ভার বোধ করিলাম তাহা হইলে সে কার্য্য ব্যর্থ হইল।

সেবার ভাব স্ফূর্ত্তি না পাইলে, সেবানন্দ সাধনা না করিলে, উপাসনা পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইবে না, হীনাবস্থায় পড়িয়া থাকিবে। উপাসনা ও প্রিয় কার্য্য পরস্পরের মুখাপেক্ষী। অপ্রিয় কার্য্য করিয়া উপাসনার গৃহে অননুতপ্ত হৃদয়ে কে প্রবেশ করিতে পারিবে? আবার প্রিয় কার্য্য সাধনে সদাই ব্যস্ত না থাকিলে, উপাসনা কিসের উপর দাঁড়াইয়া থাকিবে? জলের বাঁধন জল নহে, স্থল—এ কথা খুব সত্য। উপাসনার বাঁধ প্রিয়কার্য্য প্রিয়কার্য্যের বাঁধ উপাসনা। ব্রাহ্ম ভাই, যদি অক্ষয় অমর জীবন চাও, তাহা হইলে তস্মিন্ প্রীতি ও তস্যপ্রিয় কার্য্য সাধন উভয়কেই সাদরে হৃদয়ে স্থান দাও। এতদুভয়কে বিযুক্ত করিলে জীবন সংগ্রামে দাঁড়াইতে পারিবে না।

শক্তি সঞ্চার তত্ত্ব।

অন্য কর্ত্তৃক শক্তি সঞ্চারিত না হইলে মানুষের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না, এ মতের পক্ষপাতী নহি বলিয়া ঐ কথা স্বীকার করিতে পারি না, যে শক্তি সঞ্চার বলিয়া কোন পদার্থ ধর্ম্মজগতে নাই। প্রকৃত শক্তি সঞ্চার তত্ত্ব কি, তাহা আমরা এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে সাধ্যমত দেখাইতে চেষ্টা করিব।

প্রস্তাবের অবতারণার পূর্ব্বে একটী কথা বলা আবশ্যক। সে কথাটী এই, যে আত্মায় শক্তি সঞ্চার সম্বন্ধে ঈশ্বর ভিন্ন অন্য গুরুর সাক্ষাৎ কর্ত্তৃত্ব আছে, ইহা আমরা বিশ্বাস করি না। শক্তি সঞ্চারের ক্ষমতা যদি মনুষ্য গুরুর হস্তে থাকিত, তাহা হইলে যাহারা গুরুবাদ অস্বীকার করে তাহাদের ত্রাণ নাই বলিতে হয়। গুরূপদেশ ভিন্ন ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ হয়, তাহার দৃষ্টান্ত প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম সম্প্রদায়। উহাদের মধ্যে গুরুবাদ প্রচলিত নাই, অথচ উহাদের ব্রহ্ম বিদ্যানুশীলন ও নব জীবন লাভের অভাব দেখা যায় না। কেবল যদি গুরূপদেশেই আত্মার শক্তি সঞ্চার হইত, তাহা হইলে সকল উপদেশই সফল হয় না কেন? গুরু শত শত উপদেশ দিলেন কিছু হইল না, আচার্য্য শত শত শ্লোক ও সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করিলেন, বিশেষ ফলোদয় হইল না, অথচ এক দিন হয়ত একটী অতি সামান্য কথায় জীবনের মূলদেশ পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, এরূপ শুনা গিয়াছে। এস্থলে কেমন করিয়া স্বীকার করিব, যে তাত্ত্বিক অর্থে গুরুবাদ স্বীকার না করিলে পরিত্রাণ অসম্ভব এবং গুরুদত্ত উপদেশ ও শক্তি সঞ্চারে কার্য্য কারণ সম্বন্ধ আছে? উপদেশ চাই, ইহা সত্য। শিশু আত্মার পূর্ণায়তন প্রাপ্তি সম্বন্ধে উপদেশের আবশ্যকতা কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু সে উপদেশ ব্যক্তি বা পুস্তক বিশেষে নিবদ্ধ করা, কেবল আত্মার অশেষ দুর্গতির কারণ হইয়া থাকে। "মানুষ ইচ্ছা করিলে প্রস্তরে উপদেশ, প্রবাহিতা নদীতে পুস্তক ও সকল পদার্থেই মঙ্গল লাভ করিতে পারে," কবি সেক্সপিয়রের এই মহান্ উপদেশের সহিত শিক্ষিত সমাজের সকলেই সুপরিচিত। অনন্ত জ্ঞানময় পরমেশ্বর তাঁহার পুত্র কন্যার শিক্ষার্থে জ্ঞান ব্যক্তি বা পুস্তকবিশেষে আবদ্ধ করিবেন ইহা কি সম্ভব? লুথার যে দিন

পোপের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন, শ্রীচৈতন্য যে দিন মুক্তি বিষয়ে অহেতুকী ভক্তির প্রাধান্য ও সাধারণের উহাতে অধিকার প্রচার করেন, সেই দিনই মানবের বিবেক ও চিন্তাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার আশা বিনষ্ট হইয়াছে। ফরাসীরাষ্ট্রবিপ্লবের পর মানব চিন্তাকে নিগড় বদ্ধ করিবার কথা কেহ মুখেও আনিতে পারেন না। আমাদের নিজ নিজ জীবনও এই বিষয়ে অনেক সময়ে সাক্ষ্য দিয়া থাকে। চন্দ্র, সূর্য্য, বৃক্ষ, লতা, পুষ্পাদি পদার্থ নিচয় কত সময়ে অবাক্ উপদেশ প্রদান করিয়া আমাদিগকে শান্ত, আশান্বিত, ও সুখী করিয়াছে। "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরু-মেবাভিগচ্ছেৎ মানিলেই" যে ব্রহ্ম জ্ঞান ও গুরূপদেশের কার্য্য কারণ সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইবে, এমন কিছু কথা নাই। গুরু সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া উপদেশ গ্রহণ করা এক কথা, আর গুরূপদেশ ভিন্ন ত্রাণ হয় না, অথবা ধর্ম্ম জীবনের উচ্চ পদবীতে আরোহণ করা যায় না, ইহা স্বতন্ত্র কথা। ব্রহ্মজ্ঞান উপার্জ্জন সম্বন্ধে গুরু কর্ত্তৃক শক্তি সঞ্চার যদি আবশ্যক হইত, তাহা হইলে "তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং॥" একাগ্রচিত্ত হইয়া ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর। ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন। "জ্ঞান প্রসাদেন বিশুদ্ধ সত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ"—জ্ঞান শুদ্ধি দ্বারা শুদ্ধ সত্ত্ব ব্যক্তি ধ্যানযুক্ত হইয়া নিরবয়ব ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেন, ইত্যাদি শ্রুতির সার্থকতা থাকিত না। শিক্ষিত সমাজে যিনি এখন গুরুবাদ বা পোপবাদ প্রচলিত করিতে চেষ্টা করিবেন, যুগ ধর্ম্মের বিরুদ্ধে তাঁহাকে অস্ত্র ধারণ করিতে হইবে। স্বাধীন চিন্তা প্রযুক্ত বিবেকই নূতন যুগের বিধান, যিনি উহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবেন, তিনি নিম্নগামী জলোচ্ছ্বাসের গতিরোধের চেষ্টা করিবেন। তাঁহার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

গুরুদত্তই হউক বা শাস্ত্রলব্ধ হউক, শব্দ বলিয়া শব্দের কিছু মাত্র শক্তি নাই। শব্দ ব্রহ্ম নহে, শব্দে কোন গুপ্ত, অস্ফুট শক্তি নিহিত নাই, একথা খুব সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া কি ইহা মানিতে হইবে, যে কোন অবস্থাতেই কোন ঘটনাতেই শব্দে শক্তির আবির্ভাব হয় না? শক্তিরূপিণী বিশ্বজননী জড়ে নানা-রূপে কার্য্য করিতেছেন, আর তাঁহার প্রিয় পুত্র কন্যাদিগের ভারতীতে কখন কার্য্য করেন না, ইহা কি বিশ্বাস যোগ্য কথা? যখন দেখিতেছি, যে ব্রহ্ম নামে পর্ব্বত প্রমাণ পাপ শৈল সকল ভূতলসাৎ হইতেছে, এবং মহাপাপীর জীবনে অত্যাশ্চর্য্য ও অমানুষিক পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, তখন কেমন করিয়া মানিতে পারি যে শব্দ দ্বারা কখনই শক্তি সঞ্চার হয় না? সাবধান থাকিতে হইবে যে এবিষয়ে যেন অণুমাত্র কুসংস্কার আসিয়া আমাদের হৃদয়কে কলুষিত না করে; কিন্তু কুসংস্কা-রের ভয়ে সাবধান হইতে গিয়া যে শব্দ পরিত্যাগ করিতে হইবে, একথা নিতান্ত অযৌক্তিক ও ভ্রান্তিসঙ্কুল তাহাতে সন্দেহ নাই। শব্দের যদিও কোন শাব্দিক প্রভাব নাই, কিন্তু একটী উপকরণের যোগে দেখা যায় সেই প্রভাবের সঞ্চার হইয়া থাকে। সে উপকরণ বিশ্বাস। আমরা এখন বিশ্বাসের মূল্য ভাল করিয়া বুঝি নাই। যে বিশ্বাসের সর্ষপকণামাত্র লইয়া মনুষ্য সন্তান পর্ব্বতকে স্থানান্তরিত ও জলধিকে বিক্ষোভিত করে, সে বিশ্বাস হইতে আমরা এখনও বহুদূরে রহিয়াছি। যথার্থই বিশ্বাস দ্বারা শব্দে শক্তি সঞ্চারিত হয়। তোমার আমার ব্রহ্মনাম করা এক জিনিস, বিশ্বাসী ভক্তের সে নাম করা এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ। তুমি আমি শত শত বার দয়াময় বলিলাম, রাশি রাশি সঙ্কীর্ত্তন ও সৎকথা মুখ হইতে বাহির করিলাম, চক্ষু আর্দ্র হইল না, যদি বা চক্ষু আর্দ্র হইল, প্রাণ বিগলিত হইল না, আর ভক্ত বিশ্বাসী ঈশ্বর নাম উচ্চারণ করিতে না করিতে প্রেমে বিহ্বল হইয়া সরল বালকের ন্যায় নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। কার্য্যেও ঐরূপ আকাশ পাতাল প্রভেদ। তুমি, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, ভাঙ্গিতেছি, আবার প্রতিজ্ঞা করিতেছি আবার ভাঙ্গিতেছি। তোমার আমার জয় পরাজয় নির্ণয় করা কঠিন। কতবারই সাধনে প্রবৃত্ত হইতেছি, কত ব্রত গ্রহণ করিতেছি, অথচ দশ বৎসরে একটী রিপু জয় করিতে পারিতেছি না। বিশ্বাসী ভক্তের জীবন সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকার। বিশ্বাসী ভক্তের কথায় পাপের বড়ই ভয়, কেননা সে বেশ জানে যে বিশ্বাসীর সঙ্গে প্রবঞ্চনা অথবা চতুরতা খাটিবে না। বিশ্বাসী বলিলেন, 'আজ ঈশ্বরের নাম করিয়া এই পাপ ত্যাগ করিলাম', অমনি সে পাপ বাস্ত-বিক তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গেল। শয়তান যখন মহর্ষি ঈশাকে অরণ্য মধ্যে ধন মান সম্পদের লোভ দেখাইয়া নরক-গামী করিতে চাহিয়াছিল, তিনি কেবল বলিয়াছেন, "শয়তান পশ্চাতে যা" আর শয়তান চিরকালের জন্যই তাঁহার পশ্চাতে রহিয়া গেল। ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া নিদারুণ যন্ত্রণা সহিয়াছিলেন, অথচ তাঁহার মুখে আশীর্ব্বাদ ও শত্রুদিগের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ব্যতীত অন্য কোন বাণী কেহ শুনিতে পায় নাই। ক্রুশেও শয়তান তাঁহার সম্মুখস্থ হইতে পারে নাই। বুলওয়ার লিটনের জানোনি নামক উপন্যাস পাঠকদিগের মধ্যে অনে-কেই বোধ হয় পড়িয়া থাকিবেন। যে চিত্রে গ্রন্থকার জানোনি ও "এডন এ"র শেষ সাক্ষাৎ বর্ণনা করিয়াছেন, সেই চিত্র স্মরণ করুন। যদিও তখন জানোনির অধ্যাত্ম শক্তি হ্রাস হইয়া আসিয়াছিল, যদিও তখন তাঁহার শয়তান শত্রুর বল প্রবৃদ্ধ হইয়াছিল, তথাপি তিনি অকুতোভয়ে শয়তানকে দূর করিয়া দেন, শয়তান চলিয়া যাইবামাত্র স্বর্গীয় দেব দূত আসিয়া তাঁহার মন শান্তি ও সুখে প্লাবিত করে। বাস্তবিক বিশ্বাসীর প্রতিজ্ঞা কখনই ভঙ্গ হয় না।

ভক্ত যখন ভক্তি পূর্ব্বক ব্রহ্মনাম উচ্চারণ করেন, বিশ্বাসী যখন বিশ্বাসের সহিত পাপের পরাজয় সাধনে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহার মুখনিঃসৃত অমৃতায়মান বচনাবলীতে অলৌকিক শক্তি সঞ্চারিত হইয়া থাকে। শব্দের গুণে অথবা কোন গুপ্ত শাব্দিক প্রভাবে যে ওরূপ শক্তি সঞ্চার হইতে পারে না, ইহা সহজেই বুঝা যায়, কেননা শ্রবণস্থ বায়ুতে বায়ুতরঙ্গের আঘাত বই শব্দ আর কিছুই নহে। এই শক্তি সঞ্চারের কারণ দুইটী, প্রথম ঐশী শক্তির প্রকাশ, দ্বিতীয় মানব হৃদয়ের বিশ্বাস ও ভক্তি। যখন এই দুইটী কারণের সমবায় উপস্থিত হয়, তখনই শব্দে তাড়িত সঞ্চার হয়। বিশ্বাসী জানেন, যে, অনন্ত মঙ্গলময় পরমেশ্বর সদাই তাঁহার মঙ্গল কামনা করিতে-

ছেন। সুতরাং তিনি যখন কোন সাধু সঙ্কল্প করেন তখন ঐশী-শক্তিকে আবাহন করেন। ঐশীশক্তির আবির্ভাবে তাঁহার শুভ-সঙ্কল্প প্রাচীনকালের মন্ত্রপূত ব্রহ্মাস্ত্রের ন্যায় মহাবীর্য্যশালী ও অমোঘ হইয়া উঠে। প্রয়োগ মাত্রেই পাপ সংহার হয়। আবার যখন ভক্ত প্রেমে মত্ত হইয়া ভক্তবৎসলের যশ কীর্ত্তন করেন, তখন ভক্ত মুখ নিঃসৃত পরমেশ্বরের নামাবলী জীবন্তভাব ধারণ করে। ভক্ত তোমার আমার মত মৃত ভাবে নাম সঙ্কীর্ত্তন করেন না, নাম সঙ্কীর্ত্তন না করিয়া থাকিতে পারেন না বলিয়াই উক্ত সাধন অবলম্বন করেন। যে সঙ্কীর্ত্তনে পবিত্রতা লাভের স্পৃহা বলবতী না করিল, যে উপাসনায় সার্ব্বভৌমিক প্রেম ও উদারতা উৎপাদন না করিল, সে মৃত সঙ্কীর্ত্তন ও নিদ্রিত উপাসনায় ফল কি। উপাসনার ও সঙ্কীর্ত্তনের প্রত্যেক শব্দ যদি বিশ্বাস ও ভক্তিতে মন্ত্রপূত করিয়া উচ্চারণ করি, তাহা হইলে অচিরে অলৌকিক পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা। ব্রহ্ম যে সকল সাধু-সঙ্কল্প ও পবিত্রতার চেষ্টার সহায়তা করিয়া থাকেন, এবং আপনার অনন্ত শক্তি আপন সাধকের আনুকূল্যে প্রেরণ করেন, এই কথা যে বিশ্বাস করিয়াছে, সে শব্দে শক্তি সঞ্চারের মর্ম্ম বুঝিয়াছে। শব্দ তখনই শক্তিমান্ হয় যখন উহা ব্রহ্ম শক্তিতে সঞ্জীবিত হইয়া উঠে। যাঁহারা 'শক্তি সঞ্চার কেবল গুরুদেবই করিতে পারেন' বলিয়া চীৎকার করিয়া থাকেন, তাঁহারা উপরের লিখিত সত্যগুলি যেন অনুষ্ঠান করিয়া দেখেন। ব্রহ্ম সকল শক্তির মূল শক্তি, তাঁহার শক্তি যাহাতে আমাদের কথায় ও কার্য্যে স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে, সে জন্য অনুক্ষণ চেষ্টা করিতে হইবে। তুমি আমি যদি ব্রহ্ম শক্তিস্ফুরণের পথে অন্তরায় না হই, স্বাভাবিক নিয়মানুসারে উহা নিশ্চয়ই আমাদের মধ্যে লীলা লহরী প্রকাশ করিবে। ব্রহ্মের অসুর-নাশিনী শক্তির উপরে যিনি বিশ্বাস করেন, ও বিশ্বাস রাখিতে পারেন,কার সাধ্য তাঁহার কেশাগ্র স্পর্শ করে? যদি প্রকৃতই আমরা জীবন্ত ও মন্ত্রপূত শব্দ লইয়া থাকিতে চাই, তাহা হইলে আমাদিগকে বিশ্বাস এবং ভক্তি উভয়েরই মাত্রা অধিক পরিমাণে চড়াইতে হইবে।

জীবন সংগ্রাম।

জীবন-সংগ্রামের কথা কেনা জানেন? কে না শুনিয়াছেন যে জীবে জীবে, উদ্ভিদে উদ্ভিদে, ও জড়ে জড়ে জীবনের জন্য অবিরত ঘোরতর সংগ্রাম চলিতেছে। জীব বিশেষ অন্য জীবকে বলিতেছে 'তুমি অকর্ম্মণ্য তুমি অন্তর্হিত হও, তোমার দ্বারা জীবনের উন্নতি সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতেছে না'; উদ্ভিদ উদ্ভিদন্তরকে বলিতেছে, 'তুমি পলায়ন কর তোমার আয়ু শেষ হইয়াছে, কাল পূর্ণ হইয়াছে এ পৃথিবীতে আর তোমার স্থান নাই।' নিম্ন জীবকে পরাজিত করিয়া উচ্চ জীব আপনার প্রভুত্ব সংস্থাপন করিতেছে, অকর্ম্মণ্য উদ্ভিদ্‌কে নির্ব্বাসিত করিয়া কর্ম্মণ্য উদ্ভিদ্ রাজত্ব করিতেছে। মানব জগতেও আমরা এই সংগ্রাম দেখিতে পাই; বিদ্যা বুদ্ধির আদর ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে অকর্ম্মণ্য ক্ষমতা হীন লোককে পশ্চাতে সরাইয়া দিয়া কর্ম্মঠ ও শক্তিমান্ লোক অগ্রসর হইয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিতেছে। প্রতিযোগিতা এত তীব্র যে লোকের জীবন ধারণ করা সুকঠিন হইয়া উঠিয়াছে। ক্ষমতাশীল ও বিচক্ষণ লোকদিগের মধ্যেই অত্যল্প লোক উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইতেছেন, অক্ষম ও নির্ব্বোধ লোকদিগের তো কথাই নাই। বিগত ১৬ই ফাল্গুন অধ্যাপক ডাঃ লাঙ্কেষ্টর লণ্ডন ইনষ্টিটিউসনে যে বক্তৃতা দেন তাহাতে বলিয়াছেন যে মানবদেহেও এইরূপ দিবানিশি সংগ্রাম চলিতেছে। বক্তা বলেন যে মানব শোণিতে শ্বেতবর্ণ ডিম্বাকৃতি যে সকল পদার্থ ভাসিয়া বেড়ায় উহাদের সঙ্গে দেহ প্রবেশোন্মুখ বিষাক্ত পদার্থচয়ের সর্ব্বদাই যুদ্ধ হইয়া থাকে। ঐ বিষাক্ত পদার্থ বিনাশ করাই শ্বেত ডিম্বকদিগের প্রধান কার্য্য। ক্ষত স্থান শুষ্ক হইয়া গেলে আমরা দেখি যে ডিম্ব সৈনিকগণ তথায় আসিয়া ক্ষতস্থ বিষাক্ত পদার্থ আহার করিয়া ফেলিয়াছে। যে ব্যাকটিরিয়া সংক্রামক রোগের নিদান বলিয়া আধুনিক পণ্ডিতগণ উল্লেখ করিয়া থাকেন, সেই ব্যাকটিরিয়া কীটাণুর সহিত কথিত ডিম্ব প্রহরিবর্গের চির শত্রুতা, ব্যাকটিরিয়া আসিবামাত্র ডিম্বেরা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় এবং যতক্ষণ না শত্রুদিগকে পরাজিত করিয়া আহার করিয়া ফেলে ততক্ষণ নিরস্ত হয় না। যদি ডিম্বদিগের কোন কারণে বলহ্রাস বা অগ্নিমান্দ্য ঘটে তাহা হইলেই প্রমাদ। ডিম্ব পরাজিত হইলেই জীবের মৃত্যু। ডাক্তার লাঙ্কেষ্টার বলেন, যে এই শ্বেত ডিম্বদিগের শিক্ষার উপরই চিকিৎসাশাস্ত্রের ভবিষ্যৎ উন্নতি অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। বিষপানে বিষাক্ত হইয়া ডিম্বদিগকে সময়ে সময়ে শরীর হইতে বহির্গত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইতে হয়; বক্তা বলেন যে যদি অল্প অল্প করিয়া উহাদিগকে বিষপান অভ্যাস করান যায় তাহা হইলে আর তাহাদিগকে শরীর হইতে ওরূপ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিতে হয় না। অধ্যাপকের মতে শ্বেত ডিম্বকদিগকে বিষপানে এত অভ্যস্ত করা যাইতে পারে যে বসন্তের প্রাণনাশক বীজ আহার করিয়াও উহারা উক্ত বীজ পরিপাক করিতে সমর্থ হয়। সুতরাং উত্তমরূপে শিক্ষিত হইলে শ্বেত ডিম্বকগণ দ্বারা নানা রোগ নিবারিত হইতে পারে। অল্প অল্প করিয়া বিষপান অভ্যাস দ্বারা শরীরকে যে নিরাপদে তীব্র বিষ সেবন করান যাইতে পারে এ কথা প্রাচীন ইউরোপ ও ভারতবর্ষে বিলক্ষণ জানা আছে। আসিয়া মাইনরের প্রদেশ বিশেষে মিথ্রিডেটিস নামক একজন নরপতি ছিলেন, শত্রুতে পাছে বিষ প্রয়োগ দ্বারা তাঁহার প্রাণ বিনাশ করে এই ভয়ে তিনি একটু একটু করিয়া বিষ ভক্ষণ করিতেন। শেষে তাঁহার শরীর এরূপ হয় যে কোন বিষই তাঁহার উপরে কার্য্য করিতে পারিত না। গুজরাটে মহম্মদ সা নামক একজন রাজা উক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া শরীরকে এতদূর বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন যে মক্ষিকা বা মশক তাঁহার শরীরে বসিবামাত্র গতাসু হইয়া ভূতলে পতিত হইত।

আমাদের অধ্যাত্ম শরীরেও এইরূপ দিবানিশি সংগ্রাম চলিতেছে, পাপে পুণ্যে, অসাধু ও সাধুভাবে এবং নীচ ও উচ্চ চিন্তায় অবিশ্রান্ত সংগ্রাম হইতেছে। বোধ হয় এই সংগ্রাম

লক্ষ্য করিয়াই অগ্নি উপাসক পারসীকেরা তাঁহাদের দেবতা অরমজ্দ ও আহির মানের ও হিন্দুগণের দেবাসুরের নিয়ত যুদ্ধ ও বিবাদ কল্পনা করিয়াছেন পাপ আসিয়া পুণ্যকে বলিতেছে, 'পুণ্য তুমি অপসৃত হও তোমার অধিকারের কাল ফুরাইয়া আসিয়াছে এখন আমি মানব হৃদয়ে রাজত্ব করিব' পুণ্য যদি সবল ও জীবন্ত থাকে তবে পাপের কথা শুনিবা মাত্র উহাকে সম্মুখ সমরে আহ্বান করে এবং ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া উহাকে পরাস্ত করে। পুণ্যের সহায় পুণ্যাবহ পরমেশ্বর। সুতরাং পরিশেষে পুণ্যেরই জয় হইয়া থাকে। কিন্তু পুণ্য ও সদ্ভাব যদি নিস্তেজ ও মলিন থাকে, তাহা হইলে 'সয়তান তুমি পশ্চাতে যাও' একথা আত্মা বলিতে পারে না এবং সাধুতার সূর্য্য ক্রমে ক্রমে হীনপ্রভ হইয়া শেষে একেবারে হয় ত নিবিয়া যায়। মহানন্দে তথন অসাধুতা আসিয়া অন্ধকারের রাজ্য সংস্থাপন করে। খুব উচ্চতর অবস্থাতেও এই সংগ্রাম লক্ষিত হইয়া থাকে কেবল প্রতিদ্বন্দ্বীদের অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে। আজ আমি একটী স্থূল রিপুর সহিত সংগ্রাম করিতেছি, কাল কি দশবৎসর পরে সে রিপুর সহিত সংগ্রাম করিতে না পারি, কিন্তু দেখিতে পাইব যে আর দশটী শত্রু মস্তক উত্তোলন করিয়াছে। রিপুর মূর্ত্তি কিন্তু পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে হয় ত অপরকে প্রহার করিলে ব্যথিত হইতাম, পাঁচ বৎসর পরে দেখি যে প্রহার ত দূরের কথা সামান্য বিরক্তি মনে আসিলেও হৃদয় অনুতপ্ত হইয়া উঠে। সংগ্রামশীল আত্মারও পরিবর্ত্তন হয়। যে বলবীর্য্য লইয়া আত্মা পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিল পাচবৎসর পরে দেখিতে পাই যে সংগ্রাম করিয়া করিয়া আত্মার সেই বল চতুর্গুণ হইয়াছে। ফলতঃ সংগ্রামই জীবন। অধ্যাত্ম শরীর যে সকল পদার্থ দ্বারা বিষাক্ত হইতে পারে উক্ত শরীরস্থ সৎচিন্তা সাধু ও মহদ্ভাবরূপ শ্বেত ডিম্বকগিদকে তাহার সহিত সর্ব্বদা সংগ্রাম করিতে হইবে। সচ্চিন্তা ও সাধুভাব সকলকে এরূপ ভাবে শিক্ষিত করিতে হইবে, যে তীব্রতর পাপ বিষও প্রবেশ করিয়া অধ্যাত্ম শোণিত বিষাক্ত না করিতে পারে। পাপ চিন্তা গ্রাস করাই সাধুচিন্তার কার্য্য। পাপ চিন্তা প্রবেশ করিতে না করিতে সাধু চিন্তাকে তাহার সহিত যুদ্ধে নামাইয়া দিতে হইবে। সাবধান হওয়া চাই, যে পাপ চিন্তাদ্বারা সাধুভাব বিষাক্ত না হইয়া পড়ে, তাহা হইলে অধ্যাত্ম শরীরের মৃত্যু অখণ্ডনীয়। সাধু ও মহদ্ভাবের নিকৃষ্ট ভাব গ্রাস করিবার শক্তির উপর আত্মার স্বাস্থ্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। আত্মায় যদি ক্ষত হয় ক্ষতস্থানে সাধু চিন্তারূপ শ্বেত ডিম্বকদিগকে সত্বর পাঠাইতে হইবে সাধুভাব ভিন্ন অসাধুভাবরূপ আধ্যাত্মিক ক্ষত কে নিবারণ করিবে?

অধ্যাত্ম শরীরের শোণিতে যে সংগ্রাম দিবানিশি চলিতেছে সে সংগ্রামে যিনি জয়লাভ করিতে চান তাঁহার তিনটী সামগ্রী চাই। প্রথম সাহস,—সংগ্রামে জয়লাভ করা ভীরুর কর্ম্ম নয়। কামানের গোলা নিকটে আসিতে না আসিতে যে ভূতলসায়ী হয়, বন্দুকের গুলি লাগিতে না লাগিতে যে অস্থির হইয়া উঠে সে কাপুরুষ সৈনিককলঙ্ক সংগ্রাম ক্ষেত্রে থাকিবার উপযুক্ত নহে। সেইরূপ প্রলোভন আসিতে না আসিতে যাঁহার চিত্ত কলুষিত হইয়া গেল, পাপের সঞ্চার হইবার পূর্ব্বেই যে মুহ্যমান হইল, সে কাপুরুষ কদাপি অধ্যাত্ম সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবার যোগ্য নহে। অত্যন্ত প্রলুব্ধ হইয়াও যিনি বীরবিক্রমে পাপের মস্তকে পদাঘাত করিয়া 'তুই দূর হ,' বলিতে পারেন, তিনি নিশ্চয়ই পাপের উপর জয় লাভ করিতে সমর্থ হন। সাহসের সঙ্গে সচ্চিন্তারূপ শ্বেত ডিম্বক যদি পাপরূপ বিষকে বলিতে পারে "সাবধান! অধ্যাত্ম শোণিতে প্রবেশ করিস না, যদি করিস তবে তোকে আহার করিয়া ফেলিব" তাহা হইলে পাপের সাধ্য নাই আত্মার শোণিতে প্রবেশ করিতে পারে। পাপকে বিদায় করা বা প্রশ্রয় দেওয়া পরিহাসের ব্যাপার নহে জীবন মৃত্যুর কথা। প্রশ্রয় দিলেই পাপ আত্মার শোণিত দুষ্ট করিয়া অচিরে তাহার বিনাশ সম্পাদন করিবে। কেবল সাহসে হয় না, সহিষ্ণুতাও চাই। আমাদের মনে হয় সহিষ্ণুতা সাহসের রূপান্তর মাত্র। মধ্যে মধ্যে আত্মার এরূপ অবস্থা আসে যে সময়ে কিছুতেই কিছু হইতেছে না, যত মন্ত্র প্রয়োগ করিতেছ সকলই ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে, যত প্রতিজ্ঞা করিতেছ, বাতাহত বিটপীর মত সকলই খণ্ড বিখণ্ড হইয়া যাইতেছে; হৃদয় অন্ধকার ও বিষাদে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, তখন কি করিতে হইবে? তখন কি অসহিষ্ণু ও নিরাশ হইয়া স্রোতে আত্মাকে ভাসিয়া যাইতে দিবে, যদি দাও তাহা হইলে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। বিষাক্ত দ্রব্যের পরিমাণ বা তীব্রতা বৃদ্ধি হইতেছে বলিয়া যদি শোণিতস্থ শ্বেত ডিম্বক দল তাহার বিনাশ করিতে ক্ষান্ত হয় তাহা হইলে শরীর যে আশু বিনাশ প্রাপ্ত হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? যতই কেন বিপদ্ ও প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাউক না তোমার কর্ত্তব্য ও জীবনের কার্য্য চিরকালই অক্ষুণ্ণ থাকিবে দুরবস্থায় পড়িয়াছ বলিয়া তোমার সাধুভাবকে কি অসাধুভাব গ্রাস করিতে নিবারণ করিবে? দেখিতে গেলে সহিষ্ণুতাই ধর্ম্ম জীবন গঠনের প্রধানতম উপায় বলিয়া বোধ হয়। সাধু বলেন, "যতই আক্রমণ কর না কেন আমি আমার বিশ্বাস ও ব্রত পরিত্যাগ করিব না ধর্ম্ম ও সাধুতার জয় অবশ্যম্ভাবী ইহা অবিশ্বাস করিতে পারিব না। পাপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে নিবৃত্ত হইব না।" তৃতীয় পদার্থ, সতর্কতা। এই উপায়টী সর্ব্বাপেক্ষা প্রকৃষ্টতম। অন্য অন্য উপায় পাপ প্রবেশের পর গ্রহণ করিতে হয় কিন্তু এই উপায় ভাল করিয়া গ্রহণ করিতে পারিলে পাপ আদৌ আসিতে পারে না। মানবের স্থূল শরীরস্থ শোণিতের শ্বেত ডিম্বকগুলি কেমন সতর্কতার সহিত প্রহরীর কার্য্য করিয়া থাকে! বিষাক্ত দ্রব্যের সাধ্য কি, ব্যাক্‌টিরিয়া কীটাণুর শক্তি কি, যে তাহারা শোণিতের মধ্যে প্রবেশ করে? প্রবেশ করিতে না করিতে কথিত ডিম্ব সকল জাগ্রৎ হইয়া তাহাদিগকে নষ্ট করিয়া ফেলে। পাপ সঞ্চার সম্বন্ধে যদি আমরা সেরূপ সতর্ক হই, তাহা হইলে অনেক বিপদ্ হইতে নিস্তার পাইতে পারি। পাপ আসিতে না আসিতে তাহাকে বিদায় করিতে হইবে। প্রাণপণে তাহার গতি রোধ করিতে হইবে। অতি সতর্কতার সহিত প্রহরীর কার্য্য করিবে বলিয়া সাধু চিন্তা ও সাধু প্রতিজ্ঞার জন্ম। অধ্যাত্ম শরীরের সুস্থতা

রক্ষণে তাহারা চিরব্রতী। এক নিমেষের অসাবধানতায় দীর্ঘকালের সাধনের ফল বিলুপ্ত হইতে পারে। সাধে কি সেকালের পণ্ডিতেরা বলিয়া গিয়াছেন, "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ" অর্থাৎ শানিত ক্ষুর ধারের ন্যায় সেই পথ দুর্গম।

প্রদেশীয় ব্রাহ্মসমাজ।

বরিশাল।

সর্ব্বমঙ্গলদাতা করুণাময় পরমেশ্বরের কৃপায় নিম্নলিখিত প্রণালীতে বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের অষ্টপঞ্চাশত্তম মাঘোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। ৪ঠা মাঘ হইতে ১৮ই মাঘ পর্য্যন্ত ১৫ দিন উৎসব হইয়াছিল। উৎসবের অধিকাংশ কার্য্যই অতি গম্ভীর ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। এই দীর্ঘকালব্যাপী উৎসবের সমস্ত বিবরণ বিশেষ ভাবে পত্রিকায় প্রকাশ করা সম্ভবপর নহে তাই অতি সংক্ষিপ্ত কার্য্য বিবরণ প্রকাশিত হইল।

৪ মাঘ—প্রাতে উপাসনা এবং উৎসবের উদ্বোধন। শ্রদ্ধেয় আচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র মজুমদার আচার্য্যের কার্য্য করেন। রাত্রে প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু কালীমোহন দাস "ব্রাহ্মসমাজের দায়িত্ব" বিষয়ক বক্তৃতা করেন। ব্রাহ্মসমাজ কি করিতে আসিয়াছে কি করিয়াছে এবং ব্রাহ্মসমাজের কি করা উচিত এই সমস্ত বিষয় তিনি একে একে বুঝাইয়া দেন। তাঁহার প্রাণের কথায় প্রায় সকলেই পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। এই দিন মধ্যাহ্নে এবং অপরাহ্নে অনেক ব্রাহ্ম পরিবারে উপাসনা ও ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গলার্থে প্রার্থনা হয়।

৫ই মাঘ—প্রাতে উপাসনা, শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র মজুমদার আচার্য্যের কার্য্য করেন। অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় প্রচার আশ্রম হইতে কীর্ত্তন করিতে করিতে নদীর তীরে যাওয়া হয়। সেখানে অনেক লোক সমবেত হয়। বাবু চণ্ডীচরণ গুহ মহাশয় প্রার্থনা করেন। পরে বাবু মনোমোহন চক্রবর্ত্তী এবং বাবু মনোরঞ্জন গুহ মহাশয় বক্তৃতা করেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের মর্ম্ম, মাহাত্ম্য, ও উদারতা বুঝাইয়া দেওয়া হয়। বক্তৃতান্তে কীর্ত্তন করিতে করিতে মন্দিরাভিমুখে যাওয়া হয়। কীর্ত্তনের পশ্চাৎ প্রায় ৩।৪ শত লোক অনেক দূর পর্য্যন্ত আসিয়াছিল। বহু লোক সঙ্গে কীর্ত্তন যখন প্রচারাশ্রমে পৌঁছিল তখন সকলের প্রাণ যেন সেখানে বাঁধা পড়িল। আশ্রম প্রাঙ্গণে এবং রাস্তায় লোকে লোকারণ্য। কেহই আর চলিয়া যাইতে পারে না। প্রাঙ্গণে অন্যূন দুই ঘণ্টা কীর্ত্তন হয়। অনেকে এমন ভাবে বিভোর হইয়াছিলেন যে তাহা বর্ণনা করা যায় না। সত্য সত্য আজ মায়ের দয়া সকলে দেখিয়াছেন।

৬ই মাঘ—রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই প্রার্থনা করিয়া ঊষা কীর্ত্তন বাহির হইল। ক্রমে ক্রমে তাহার পশ্চাতে এত লোক জুটিল যে অনেক স্থানে নগর কীর্ত্তনেও সেরূপ হয় না। অন্যূন দুই শত লোক অনেক সময়ই কীর্ত্তনের পশ্চাতে ছিল। কীর্ত্তন এমন চমৎকার হইয়াছিল যে বেলা ১০টা পর্য্যন্ত ঊষা কীর্ত্তন হইল। দশটার পর বহু লোক সঙ্গে উপাসনা মন্দিরে উপস্থিত হইয়া উপাসনা হইল। বাবু মনোরঞ্জন গুহ আচার্য্যের কার্য্য করেন।

সন্ধ্যার পর মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভা হয়। ব্রজমোহন বিদ্যালয় গৃহে সভার অধিবেশন হইয়াছিল। জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু নন্দকৃষ্ণ বসু মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত বাবু মনোরঞ্জন গুহ এবং শ্রীযুক্ত বাবু অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় রাজার জীবন সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সভাস্থলে অনুমান ৪০০ লোক উপস্থিত ছিলেন। হিন্দু সমাজের জাঁকাল কীর্ত্তন মহা গোলযোগ করিয়া সভার গাত্র স্পর্শ করিয়া চলিল, কিন্তু একটী লোকও সভা ছাড়িয়া উঠিল না। অধিকন্তু কীর্ত্তন হইতে অনেক লোক সভায় আসিল। ব্রাহ্মসমাজ এবং রামমোহন রায়ের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধাই ইহার কারণ। সভা ভঙ্গের পূর্ব্বে সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিপ্রায় (ইংরাজীতে) পাঠ করিলেন। পরে সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক সভা ভঙ্গ হইল।

৭ই মাঘ—প্রাতে সমাজ মন্দিরে উপাসনা। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। রাত্রে ছাত্রসমাজের উৎসব। প্রথমতঃ বেদী হইতে ছাত্রসমাজের গত বর্ষের রিপোর্ট পাঠ হয়। তৎপরে এই ছাত্রসমাজ দ্বারা কে কি উপকার পাইয়াছেন কয়েকটী ছাত্র দণ্ডায়মান হইয়া তাহা বলেন। তাহাতে ছাত্রসমাজের উপকারিতা উত্তমরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনটী ছাত্র কবিতা পাঠ করেন। পরে বাবু মনোরঞ্জন গুহ "মনুষ্যত্ব কি?" এই বিষয়ে একটী অনতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন।

৮ই মাঘ—প্রাতে ঊষা কীর্ত্তন করিয়া সহরের অংশ বিশেষে ভ্রমণ করা হয়। আজিও পূর্ব্বের ন্যায় কীর্ত্তন জমিয়াছিল এবং লোক সমাগম হইয়াছিল। অপরাহ্ণ দুইটার সময় কীর্ত্তন ও উপাসনা হয়। বাবু কালীমোহন দাস বেদীর কার্য্য করেন। রাত্রে বাবু মনোরঞ্জন গুহ "চৈতন্য ও ব্রাহ্মসমাজ" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা সাধারণের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

৯ই মাঘ—প্রাতে মন্দিরে উপাসনা, শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বেদীর কার্য্য করেন। একটার পর উদ্যানে সকলে সম্মিলিত হইয়া কিছুকাল নির্জ্জন সাধনের পরে ৩টার সময় প্রার্থনান্তর তথা হইতে নগর সংকীর্ত্তন বাহির হয়। প্রায় সমস্ত সহর বেষ্টন করা হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে লোকারণ্য চলিয়াছিল। কীর্ত্তন ফিরিয়া আসিলে মন্দিরে উপাসনা হয়। বাবু কালীমোহন দাস বেদীর কার্য্য করেন।

১০ই মাঘ—প্রাতে উপাসনা। বাবু মনোরঞ্জন গুহ বেদীর কার্য্য করেন। রাত্রে উপাসনা বাবু কালীমোহন দাস বেদীর কার্য্য করেন।

১১ই মাঘ—সমস্ত দিন উৎসব। সমস্ত ব্রাহ্ম পরিবার প্রাতে মন্দিরে গিয়াছিলেন এবং রাত্রি প্রায় ১১টার সময় গৃহে ফিরিয়াছিলেন।

প্রাতে উপাসনা। বাবু কালীমোহন দাস বেদীর কার্য্য করেন। মধ্যাহ্নে পাঠ ও তদবলম্বনে কিছু বক্তৃতা। পরে কীর্ত্তনাদি হয়। রাত্রিতে উপাসনা, বাবু মনোরঞ্জন গুহ বেদীর কার্য্য করেন। উপাসনা আরম্ভ হইল, মধুর সঙ্গীত হইল কিন্তু কি আচার্য্য কি উপাসক মণ্ডলী সকলের মধ্যেই অতি ভয়ানক শুষ্কতা উপস্থিত হইল। এমন কি আচার্য্য সে শুষ্কতা লইয়া আর বেদীতে থাকিতে চাহেন না। চারিদিক্ হইতে অভাবের কান্নার রোল পড়িল, ভ্রাতাভগিনীগণ উচ্চৈঃস্বরে ব্যাকুল ভাবে, চীৎকার করিয়া "মাগো একবার এসো মা" বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেম। কিছুতেই শুষ্কতা যায় না। এমন শুষ্কভাব আমরা কখনও উৎসবের মধ্যে দেখি নাই। বেদী হইতে শব্দ উঠিতে লাগিল "মা! তুমি এসো। নহিলে আমি নামিয়া যাই" চারিদিকেই কেবল "মা মা, এসো এসো" এই ধ্বনি কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। এই ভাবে বহুক্ষণ চলিয়া গেল। মায়ের কৃপা ভিন্ন মানুষের চেষ্টায় যে কিছুই হয় না তাহা মা ভাল করিয়া দেখাইলেন। অহঙ্কারী উপাসকগণের দর্প চূর্ণ করিলেন। সকলেই যখন আপনার শক্তিহীনতা বুঝিয়া কেবল মায়ের উপর নির্ভর করিলেন তখন মুহূর্ত্তের মধ্যে মায়ের কৃপা আবির্ভূত হইল। সকলের মুখে আবার নূতন ভাবের "মা মা" রব উঠিল, শুষ্কতা চলিয়া গেল, আরাধনা আরম্ভ হইল। ভাই ভগিনীগণ সকলেই আনন্দময়ী মায়ের আবির্ভাব জানিয়া আনন্দে মগ্ন হইলেন।

১২ই মাঘ—প্রাতে উপাসনা শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র মজুমদার বেদীর কার্য্য করেন। মধ্যাহ্নে ব্রাহ্মিকা সমাজের উৎসব, ব্রাহ্মিকাগণই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। রাত্রে শ্রীযুক্তা কুসুমকুমারী রায় "সেবার বিধান" বিষয়ক একটী অনতিদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। উহা স্বতন্ত্র মুদ্রিত হইয়া বিতরিত হইতেছে।

১৩ই মাঘ—প্রাতে উষাকীর্ত্তন। রাত্রে সঙ্গত সভার উৎসব। প্রথমতঃ বেদী হইতে সঙ্গীত ও সভার কল্যাণার্থ প্রার্থনা, পরে সঙ্গতের রিপোর্ট পাঠ হয়। পরে কীর্ত্তন হয়।

১৪ই মাঘ—প্রাতে উপাসনা বাবু মনোরঞ্জন গুহ বেদীর কার্য্য করেন। অপরাহ্ন ৪ ঘটিকার সময় প্রকাশ্য রাস্তায় বক্তৃতা; বাবু কালীমোহন দাস এবং বাবু মনোরঞ্জন গুহ বক্তৃতা করেন। বক্তৃতান্তে কীর্ত্তন করিতে করিতে মন্দিরে আসা হয়। রাত্রে কীর্ত্তন সমিতির উৎসব হয়।

১৫ই মাঘ—প্রাতে উপাসনা। অপরাহ্ণ ২টার পর পাঠ। রাত্রে ইংরাজী বক্তৃতা,—বক্তা বাবু অশ্বিনীকুমার দত্ত, বিষয় "Rejoicings in the Brahmo Samaj." সহরের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোকই বক্তৃতায় উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতা অতি সুন্দর হইয়াছিল।

১৬ই মাঘ—প্রাতে উপাসনা, মধ্যাহ্নে বালক বালিকাদিগের উৎসব। প্রথমতঃ বেদী হইতে বাবু মনোরঞ্জন গুহ প্রার্থনা করেন; বালক বালিকাগণ একত্রিত হইয়া গান করে। পরে তাহাদিগকে নীতি সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হয় এবং প্রশ্ন করিয়া তাহাদের নিকট হইতে উত্তর শুনা হয়। পরে বালক বালিকাগণ পরস্পরকে ভাই ভগিনী সম্বোধন করিয়া একটী গান করে। তৎপরে আশ্রম প্রাঙ্গণে বালক বালিকা এবং তৎসঙ্গে অন্যান্য প্রায় দুই শত লোককে মিষ্টান্ন ও কমলালেবু দেওয়া হয়। রাত্রে উপাসনা হয়।

১৭ই মাঘ—প্রাতে উপাসনা, রাত্রে বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের আগামী বৎসরের কার্য্য নির্দ্ধারণ।

১৮ই মাঘ—প্রাতে উপাসনা, রাত্রে প্রথমতঃ বেদী হইতে প্রার্থনা। পরে "ফুলের মালা" নামক উপহার পুস্তক বিতরণ। তৎপরে সুহৃদ্ সম্মিলন এবং প্রচারাশ্রমে প্রীতি-ভোজন। সুহৃদ-সম্মিলন প্রীতি-ভোজনেও অসীম আনন্দ হইয়াছিল।

নগাঁও।

নগাঁও ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চাশত্তম মাঘোৎসব নিম্নলিখিত প্রণালীতে সম্পন্ন হইয়াছে।

৪ঠা মাঘ মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় কয়েকটী ব্রাহ্ম ভ্রাতা খোল করতাল লইয়া "ওঠ জয় ব্রহ্ম বলে" সঙ্গীত আরম্ভ করিয়া ব্রাহ্ম পল্লীতে ভোর কীর্ত্তন করিয়া আসিলে পর শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ দত্ত মহাশয় একটী প্রার্থনা করেন। এই দিবস হইতে ১১ই মাঘ পর্য্যন্ত এই ভাবে ভোর কীর্ত্তন ও প্রার্থনা হইয়াছে। অপরাহ্ন ৭ ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত বাবু রামদুর্লভ মজুমদার বি, এ, উকিল মহাশয়ের গৃহে উপাসনা ও ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গলার্থ বিশেষ প্রার্থনা হয়। বাবু গণেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন।

৫ই মাঘ বুধবার পূর্ব্বাহ্ন ৯ ঘটিকার সময় ব্রাহ্মিকাদিগের উৎসব। শ্রীযুক্তা সুশীলা মজুমদার মহাশয়া উপাসনার কার্য্য এবং স্বর্ণলতা দত্ত মহাশয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ব্যাখ্যান হইতে কতক অংশ পাঠ করেন। প্রত্যেক ব্রাহ্মিকা সরলভাবে বিগলিত হৃদয়ে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রার্থনাতে বাস্তবিকই হৃদয়ের পিপাসা প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রায় ২ ঘটিকার সময় তাঁহাদের কার্য্য শেষ হয়। ৩ ঘটিকার সময় মন্দিরে বালক বালিকাদিগের সম্মিলন বালক ও বালিকাগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া প্রথমে "ভগিনীসকলে" এই গানটী করে তৎপর "লেখা পড়া শিখিয়া ঈশ্বরের রাজ্যে কাজ করিতে হইবে" এই বিষয় অবলম্বন করিয়া বাবু প্রিয়নাথ দত্ত মহাশয় সরল ভাবে একটী উপদেশ দেন। কোন কোন বালক বালিকা ২।৪টী সরল কথায় প্রার্থনা করিলে বাবু প্রিয়নাথ দত্ত মহাশয় কর্ত্তৃক বালক বালিকাদিগের সম্মিলনোপযোগী একটী প্রার্থনা ও বালক বালিকা কর্ত্তৃক আর একটী সঙ্গীত হইয়া কার্য্য শেষ হইলে পর সকলকে কমলালেবু ও মিষ্টান্ন দিয়া পরিতুষ্ট করা হয়। সন্ধ্যার পর ৭ ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত বাবু গণেশ চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বিপণি গৃহে সঙ্কীর্ত্তন ও উপাসনা হয়। প্রিয়নাথ বাবু উপাসনার কার্য্য করেন। "পিতা সম্মুখে থাকিতে ভয় কি?" এই গল্প অবলম্বনে একটী উপদেশ হয়।

৬ই মাঘ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ন ৭ ঘটিকার সময় জিলা স্কুলের ২য় শিক্ষক বাবু কালীমোহন দাস মহাশয়ের গৃহে উপাসনা হয়। বাবু গণেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় উপাসনার কাজ করেন।

৭ই মাঘ শুক্রবার অপরাহ্ন ৭ ঘটিকার সময় স্বর্গীয় জন্মেজয় দাস মহাশয়ের গৃহে সংকীর্ত্তন ও প্রার্থনা। প্রিয়নাথ বাবু বিশেষ প্রার্থনা করেন।

৮ই মাঘ শনিবার অপরাহ্ন ৭ ঘটিকার সময় বাবু প্রিয়নাথ দত্ত মহাশয়ের গৃহে উপাসনা ও তাঁহার ১ম পুত্রের জন্মদিনোপলক্ষে বিশেষ প্রার্থনা। গণেশ বাবু উপাসনা ও প্রিয়নাথ বাবু বিশেষ প্রার্থনা করেন। "উদ্বোধন কি?" এই বিষয়ে গণেশ বাবু একটী উপদেশ দেন।

৯ মাঘ রবিবার পূর্ব্বাহ্ন ৬॥ ঘটিকার সময় মন্দিরে উপাসনা প্রিয়নাথ বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন। "দীনাত্মারাই ধন্য" এই বিষয়ে উপদেশ হয়। এই বেলার উদ্বোধন ও প্রার্থনা বাস্তবিক হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। বিশেষতঃ ব্রাহ্মিকাদিগের সমতান সঙ্গীতে ও উপাসনান্তে মন বিগলিত হইয়াছিল এই দিনই উৎসবের আনন্দ অনুভব করা গিয়াছে।

অপরাহ্ন ৩ ঘটিকার সময় বালক বালিকা, যুবক বৃদ্ধ, সকলে মিলিত হইয়া মন্দিরের সম্মুখে জমাটভাবে সঙ্কীর্ত্তন করিলে পর গণেশ বাবু হৃদয়গ্রাহী একটী সরল প্রার্থনা করেন। তৎপরে বালক বালিকাগণ "সত্যের জয়" নামাঙ্কিত ধ্বজা হস্তে গ্রহণ করিয়া অগ্রসর হইলে "কর আনন্দে ব্রহ্মের জয় ঘোষণা" এই সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া নগর পরিভ্রমণে বহির্গত হন। স্বর্গীয় পদ্মহাস গোস্বামীর পিতৃভবনে উপস্থিত হইয়া জমাট ভাবে কীর্ত্তন করা হয়। তথায় বৃদ্ধ গোস্বামী মহাশয়ের ভক্তি ভাবে সকলে মোহিত হন। তৎপরে কাঞ্চাপটী প্রভৃতি স্থান দিয়া বাবু গুণাভিরাম বড়ুয়া রায় বাহাদুরের বাড়ীতে গিয়া মত্ততার সহিত কীর্ত্তন করিয়া তথা হইতে ঢাকাইপটী দিয়া নূতন বাজারের ধারে উপস্থিত হইয়া আবার অতি জমাট ভাবে কীর্ত্তন করা হয়; নানা শ্রেণীর শতাধিক লোক স্থির ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া কীর্ত্তন শুনিয়াছিল। তাহাতে সাধারণ লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া "ব্রাহ্ম ধর্ম্ম কি? এবং প্রত্যেকেরই সত্যনিষ্ঠ গৃহস্থ হইয়া ধর্ম্মধন লাভ করা কর্ত্তব্য" এই বিষয়ে গণেশ বাবু বাঙ্গালা ভাষায় ও প্রিয়নাথ বাবু আসামিয়া ভাষায় বক্তৃতা করেন। তথা হইতে নগরের পূর্ব্বপ্রান্ত দিয়া ব্রাহ্ম পল্লীর প্রত্যেক ব্রাহ্মের গৃহ প্রাঙ্গণাদিতে কীর্ত্তন করিতে করিতে মন্দিরে উপস্থিত হইয়া মন্দিরের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া কীর্ত্তন করা হয়। তৎপর ৭ ঘটিকার সময় মন্দিরে উপবিষ্ট হইয়া গণেশ বাবু ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রতিপাদক কয়েকটী শ্লোক পাঠ করত "উৎসব কি?" এই বিষয়ে একটী উপদেশ দিয়া প্রার্থনা করেন।

১০ই মাঘ সোমবার—পূর্ব্বাহ্ন ৬॥ ঘটিকা। মন্দিরে উপাসনা ও ব্যক্তিগত প্রার্থনা; গুরুনাথ বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন।

অপরাহ্ন ৭ ঘটিকা। সবডেপুটী কালেক্টর বাবু শরচ্চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের গৃহে উপাসনা; গণেশ বাবু উপাসনার কার্য্য করেন।

১১ই মাঘ মঙ্গলবার—মন্দিরে সমস্তদিনব্যাপী উৎসব প্রাতঃকালে গুরুনাথ বাবু ও সায়ংকালে গণেশ বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন। "মিত্র তুমি প্রাবন বারি ধারিণী" ও "উৎসব বাহিরের জিনিষ নয়" এই দুই বিষয়ে উপদেশ হয়। সন্ধ্যাবেলা ব্রাহ্মপল্লী ও মন্দিরের চতুর্দ্দিক দীপালোকে আলোকিত হইয়াছিল। রাত্রিকার উপাসনার পর শ্রীযুক্তা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী সকলকে মিষ্টান্ন ভোজন করান।

১২ই মাঘ বুধবার—পূর্ব্বাহ্ন ৭ ঘটিকা; শ্রীযুক্ত আনন্দরাম গোস্বামী মহাশয়ের গৃহে উপাসনা, গুরুনাথ বাবু উপাসনার কার্য্য করেন। লতাকুঞ্জে বাটীটি পরিবেষ্টিত থাকাতে প্রকৃতিদেবী উপাসকগণের সহকারিণী হইয়া হৃদয়রঞ্জনের দিকে তাহাদের মন প্রাণ আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

অপরাহ্ন ৭ ঘটিকা; পোষ্টাফিসের হেডক্লার্ক বাবু অমরচন্দ্র গুপ্তের গৃহে উপাসনা। গুরুনাথ বাবু উপাসনার কাজ করেন এবং "বিশ্বাসিনী কন্যার আশা পূর্ণ" বিষয়ে উপদেশ হয়।

১৩ই মাঘ বৃহস্পতিবার—পূর্ব্বাহ্ন ৭ ঘটিকা; শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন গুপ্ত মহাশয়ের গৃহে তাঁহার পিতৃব্যের আদ্য শ্রাদ্ধোপলক্ষে উপাসনা হয়। গুরুনাথ বাবু উপাসনার কার্য্য ও মধু বাবু শোক পূর্ণ হৃদয়ে বিশেষ প্রার্থনা করেন।

অপরাহ্ন ৭ ঘটিকা মন্দিরে উপাসনা হয় গণেশ বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন।

১৪ই মাঘ শুক্রবার অপরাহ্ন ৭ ঘটিকা। ধাত্রী যোগমায়াদের গৃহে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন।

১৫ই মাঘ শনিবার—অপরাহ্ন ৭ ঘটিকা; শ্রীযুক্ত গুণাভিরাম বড়ুয়া রায় বাহাদুরের গৃহে উপাসনা ও সংকীর্ত্তন হয় শ্রীযুক্ত গুরুনাথ দত্ত মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন।

১৬ই মাঘ রবিবার মন্দিরে উপাসনা ও সংকীর্ত্তন হয় শ্রীযুক্ত গুরুনাথ দত্ত মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

১৭ই মাঘ সোমবার অপরাহ্ন ৭ ঘটিকা; শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের গৃহে সংকীর্ত্তন ও উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন "অনুতাপে বিশ্বাসীর মুক্তি" এই বিষয়ে উপদেশ হয়। শ্রীযুক্ত গুরুনাথ দত্ত মহাশয় "উৎসবের শান্তি বচন" অবলম্বন করিয়া বিশেষ প্রার্থনা করেন।

প্রত্যেক ব্রাহ্ম পরিবারেই এই উৎসব উপলক্ষে যেমন উপাসনা উপদেশ ও সংকীর্ত্তনাদি হইয়াছে, সেইরূপ উপাসনান্তে প্রতি পরিবারে বালক বালিকা যুবক বৃদ্ধদিগের প্রীতি ভোজন হওয়াতে উৎসবানন্দ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। উপাসনাতে যেমন হৃদয়ের যোগ স্থাপন করে, প্রীতি-ভোজনে তেমনি সামাজিক বন্ধন দৃঢ়ীভূত করে। দয়াময়ের কৃপায় আমরা এস্থানে উভয় প্রকার বন্ধনের সূত্র পাইয়া সুখী হইয়াছি—দয়াময়ের কৃপাগুণে এবারকার উৎসব হৃদয়ের চির উৎসব হউক পুণ্যময়ের শুভ ইচ্ছা জয়যুক্ত হউক।

সংবাদ।

২২এ মাঘ সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনা গৃহে তিন আইন অনুসারে আর একটী অসবর্ণ ব্রাহ্মবিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্রের নাম বাবু দ্বারকানাথ রায়, বয়স প্রায় ৩০ বৎসর। পাত্র ডাক্তার পি, কে রায়ের ভ্রাতা ও নিজে

হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার; নিউইয়র্কের হোমিওপ্যাথিক কালেজে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। পাত্রী বাবু দুর্গামোহন দাসের কন্যা কুমারী শ্রীমতী শৈলবালা দাস, বয়স প্রায় ২০ বৎসর। পাত্র কায়স্থ পাত্রী বৈদ্য। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। বিবাহটী খুব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল।

গত ৬ই মাঘ বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্রের নামকরণ হইয়া গিয়াছে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। পুত্রের নাম জ্যোতিঃপ্রকাশ রাখা হইয়াছে।

গত ২৯ এ ডিসেম্বর হইতে ২রা জানুয়ারি পর্য্যন্ত দক্ষিণ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের ত্রয়োবিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর তাড়িত যোগে "ঈশ্বর আপনাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন" বলিয়া আশীর্ব্বাদ প্রেরণ করেন। এই আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া আমাদের দক্ষিণ ভারতবর্ষীয় ভ্রাতৃগণ উৎসবে অবতীর্ণ হন। জাতীয় সমিতি উপলক্ষে এবৎসর মান্দ্রাজে অনেক গুলি ব্রাহ্ম উপস্থিত ছিলেন। ২৮এ ডিসেম্বর বুধবার তাঁহাদিগকে লইয়া এক ধর্ম্ম সমিতি হয়, তথায় ভিন্ন ভিন্ন সমাজের প্রতিনিধিগণ আপন আপন সমাজের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তাঁহাদের বক্তৃতায় সকলেই উপকৃত হইয়াছিলেন। সমিতি ভঙ্গের পর প্রতিনিধিদিগকে খাওয়ান হয়, এবং তৎপরে পান সুপারি ও পুষ্প বিতরিত হয়। ২৯এ ডিসেম্বর ঈশ্বরোপাসনাও সংক্ষিপ্ত উপদেশের সহিত উৎসবের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। উপাসনার স্থলে রায় বাহাদুর গোবিন্দ রানেদ এবং এলফিনষ্টোন কালেজের প্রিন্‌সিপাল বারন আপাজী মোদক ও লাহোরস্থ ব্রাহ্ম প্রচারক পণ্ডিত সত্যানন্দ অগ্নিহোত্রী ও অন্যান্য অনেক ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। ঐ সময়ে যে সকল ব্রহ্মসঙ্গীত ও সংস্কৃত গান গীত হইয়াছিল, তাহা শুনিয়া সকলে প্রীত হন। শুক্রবার বাৎসরিক সভার অধিবেশনের দিন ছিল, উক্ত সভার অধিবেশন ঐ দিন হয় নাই। ৮ই জানুয়ারি হইয়াছিল সভার বার্ষিক বিবরণ পাঠ করা এবং বর্ত্তমান বৎসরে জন্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিল। রাত্রি ৭ ঘটিকার সময়ে ভি, এ, মোদক, ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসাদি মানুষের চারি আশ্রম সম্বন্ধে একটী সারগর্ভ সুন্দর উপদেশ দেন। শনিবার নগরকীর্ত্তন হয়, উহাতে অনেকে যোগ দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম ও বেদান্ত সম্বন্ধে তামিল ভাষায় লিখিত পুস্তিকা সাধারণকে বিতরণ করা হয়। প্রাতে শ্রীমান্ চারিয়ার উপাসনান্তে ভক্তি বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। অপরাহ্নে শ্রীমান্ প্রকাশ রাও ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন, এবং তৎপরে "হিন্দুদিগের অতীত ও বর্ত্তমান অবস্থা" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। সায়ংকালে কোইম্বাটোরগেজেট পত্রিকা সম্পাদক নরসিমুলু নাইডু উপাসনার কার্য্য সম্পাদন করেন ও তামিল ভাষায় একটী হৃদয়গ্রাহী উপদেশ দেন। রবিবার দরিদ্র বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে খাওয়ান ও বস্ত্রাদি দান করা হয়। এই কার্য্যের জন্য রাজা গজপতি রাও ২৫০ টাকা দান করিয়াছিলেন। বিদ্যালয়ের সাম্বৎসরিক উৎসব ঐ রবিবার অপরাহ্নে ৩॥ ঘটিকার সময়ে হইয়া গিয়াছে। ছাত্রদিগকে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। গুটীর মুন্সেফ লক্ষ্মী নরসিংহ চেটি বি এ, বি এল সভাপতির কার্য্য করেন। উপস্থিত ভদ্রলোকদিগের মধ্যে অনেকেই উক্ত বিদ্যালয়ের আবশ্যকতা সম্বন্ধে স্বীয় স্বীয় মন্তব্য প্রকাশ করিলে সভাপতি মহাশয় গরিব লোকদিগের শিক্ষা বিস্তারের আবশ্যকতা সম্বন্ধে একটী সুন্দর বক্তৃতা করিয়া সভার কার্য্য শেষ করেন। ২রা জানুয়ারি মিঃ সুব্রামিয়া রাজা রামমোহন রায়ের জীবন চরিত সম্বন্ধে ইংরাজীতে একটী বক্তৃতা করেন। সায়ংকালে শ্রীমান আভরগল উপাসনার কার্য্য করেন ও রাজা গজপতি রাও বাহাদুর ইংরাজীতে ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে একটী উপদেশ দেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম কিরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে, উহার উদ্দেশ্য এবং উদার ও পবিত্র ভাব রাজা বাহাদুর উজ্জ্বলরূপে পরিষ্কার ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। উপাসনা মন্দিরে কর্ণলের হেড এসিষ্টাণ্ট কালেক্টর মিঃ ভেনকাটা জাগারাও, মান্দ্রাজ হাইকোর্টের এটর্ণি এ, এল নরসিমুলু নাইডু, এস, পি, নরসিমুলু নাইডু অন্ন প্রকাশিকার সম্পাদক পার্থসারথি নাইডু এবং অন্যান্য অনেক ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন।

আগামী ৩০এ চৈত্র ও ১লা বৈশাখ নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে বর্ষ শেষ ও বর্ষারম্ভ উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ব্রহ্মোৎসব হইবে।

৩০এ চৈত্র বুধবার অপরাহ্ণ ৭ ঘটিকার সময় উপাসনা।

১লা বৈশাখ বৃহস্পতিবার প্রাতে ৬ ছয় ঘটিকার সময় সংগীত সংকীর্ত্তন। ৬॥ সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় উপাসনা।

অপরাহ্ণ ৫ টা হইতে ৬॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত ধর্ম্ম শাস্ত্র পাঠ। ৬॥ ঘটিকা হইতে ৭ ঘটিকা পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন। তৎপর উপাসনা।

বিজ্ঞাপন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক, সভা বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক পদে অভিষেক করিবেন স্থির করিয়াছেন।

সাঃ ব্রাঃ সমাজ কার্য্যালয়। ১৫ই মার্চ্চ, ১৮৮৮। } গুরুচরণ মহলানবিশ সম্পাদক, সাঃ ব্রাঃ সমাজ।

আগামী ৭ই এপ্রেল শনিবার বেলা ৪টার সময় ১৩নং মৃজাপুরষ্ট্রীট সিটি কলেজ ভবনে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অধ্যক্ষ সভার ১ম ত্রৈমাসিক অধিবেশন হইবে। তথায় নিম্নলিখিত বিষয় বিবেচনার্থ উপস্থিত হইবে।

আলোচ্য বিষয়।

(১) কার্য্য নির্ব্বাহক সভার ১ম ত্রৈমাসিক কার্য্য বিবরণ ও আয় ব্যয়ের হিসাব।

(২) সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনালয়ের চূড়া নির্ম্মাণ।

(৩) যাঁহারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ৫ বৎসরের চাঁদা দেন নাই তাঁহাদিগকে সভ্য-পদচ্যুত করিবার প্রস্তাব।

(৪) সভ্য মনোনয়ন।

(৫) বিবিধ।

২৯এ মার্চ্চ, ১৮৮৮। সাঃ ব্রাঃ সমাজ কার্য্যালয়। } শ্রীগুরুচরণ মহলানবিশ। সম্পাদক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১০ম ভাগ।
২৪শ সংখ্যা।

১৬ই চৈত্র বুধবার, ১৮০৯ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৯।

বাংসরিক অগ্রিমমূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩
প্রতিখণ্ডের মূল্য ৵০

পূজার আয়োজন।

প্রেমাস্পদ, কয়েক দিন হইতে আমি তোমার বিরহে বড় ক্লেশ পাইতেছি। যাতনার তীব্রতা এত বৃদ্ধিপাইয়াছে যে ধৈর্য্য ধারণ করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। তুমি আমার আলোক, তোমা বিহনে হৃদয় অন্ধকার হইয়া রহিয়াছে! তুমি আমার শান্তি, তোমা বিহনে অশান্তি আমার মনকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। মনকে কত বুঝাই যে অপেক্ষা কর মিলনের সুখে অচিরে নৃত্য করিয়া উঠিবে, মন বুঝিতে চায় না। তোমার জন্য যে ক্লেশ পায়, তুমি তাহাকে সুখী কর, তোমার এ অঙ্গীকার মনকে স্মরণ করাইয়া দিই, তবু যাতনার হ্রাস হয় না। মনে হয়, যে তোমার বিরহ ভিন্ন আর সকল জ্বালাই তোমার জন্য সহিতে পারি। প্রিয়দর্শন! দর্শন দিয়া মনের সকল জ্বালা নিবারণ কর। তুমি কাছে দাঁড়াইয়া থাকিতে আমি তোমার বিরহে ছট্‌ফট্‌ করিয়া মরিব, ইহা যে ঘোর বিড়ম্বনা। তোমার নৈকট্য চন্দ্র আমার চিদাকাশে স্ফূর্ত্তি পাউক, আমি তোমার সুশীল সহবাস জ্যোৎস্নায় আমার সন্তপ্ত প্রাণ শীতল করি। তুমি দেখা দিলেও আমি তোমার, না দিলেও আমি তোমার; সুখে দুঃখে, সুস্থতায় ও অসুস্থতায় সকল অবস্থায় আমি তোমার। আমি কার দ্বারে যাইব? যে এতদূর তোমার কৃপাসাপেক্ষ, সে তুমি বর্ত্তমানে ক্লেশ পাইবে,ইহা কি হইতে পারে? শরণাগত বৎসল! পদাশ্রিত কিঙ্করে কৃপা কর, বিরহ মেঘ অপসারিত করিয়া তোমার সহিত মিলনরূপ সূর্য্যের চারু কিরণ প্রকাশিত হইয়া আমার প্রাণকে আলোকিত করুক।

প্রভু! তুমি কত সহিতে পার! যে জন্মাবধি তোমাকে অপমান করিল, তোমার অশেষ লাঞ্ছনা করিল, অথচ অনুতপ্ত হইয়া সরল ভাবে সে তোমাকে ডাকিল, অমনি তাহার হইলে। অনুপম কৃপা ও সহিষ্ণুতা তোমার, দিবানিশি আমাদের মঙ্গল কামনায় রত, অথচ আমরা সদাই তোমার অবাধ্য হইতেছি। তোমার ভক্ত সন্তানেরাও তোমার মত সহিষ্ণু। মনুষ্য সন্তান তোমার ভক্ত মণ্ডলীকে কি যাতনাই না দিল! তাঁহারা সকলই অম্লান বদনে সহিলেন। প্রাণ গেল, তথাপি শত্রুদিগের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা ভিন্ন অন্য কথাই মুখ হইতে বাহির হইল না। আর আমি কি ঘোর অসহিষ্ণু! অন্যায়, অত্যাচার, নিন্দা আদৌ সহিতে পারি না। অন্যায়ের প্রতিবাদ ও অন্যায়কারীর প্রতি প্রেম এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারি না। আমার মনোমত না হইলেই আমি বিরক্ত হইয়া উঠি। এই নীচ প্রকৃতি বিনাশ করিয়া ক্ষমা, প্রেম, ও সহিষ্ণুতাতে আমাকে ভূষিত কর। তোমার পুত্র কন্যার ব্যবহারে যদি ক্রোধের বন্ধনে আপনাকে ফেলিলাম তবে কি জন্য এতদিন তোমার নাম গ্রহণ করিতেছি? তোমার পুত্র কন্যার প্রতি প্রেম যদি সদাই উছলিয়া না পড়িল, তবে কি সাধন করিতেছি? আমার দীনতা ও অকিঞ্চিৎকরত্ব যেন আমি কখন বিস্মৃত না হই। তোমার পুত্র কন্যা আমার পর নহে ইহা যেন সর্ব্বদা আমার মনে জাগ্রৎ থাকে।

যদি কেহ পূজার সময় অবাতকম্পিত দীপশিখা তুল্য হইতে চান, সমস্ত দিন তিনি আপনার মনের উপর আরোহণ করিয়া থাকুন। সমস্ত দিন যিনি চিন্তার দাস হইয়া থাকেন, চিন্তাকে দাস করেন না, সমস্ত দিন যিনি ভাবযোগ পরিচালিত হইয়া চিন্তা হইতে চিন্তান্তরে আপনাকে লইয়া যান,উপাসনার সময় তাঁহার পক্ষে চিত্ত শান্ত করা বড়ই কঠিন। স্বভাব চিরকালই আপনি প্রাধান্য সংস্থাপন করিবে। যদি শম দম স্বভাব না হইয়া থাকে, উপাসনার সময় যোগ ভঙ্গ হইবেই হইবে। অতএব যিনি সাধক হইতে চান, তিনি সতত শম দম অভ্যাস করিবার প্রয়াস পাইবেন। নির্ম্মল ও প্রশান্ত সরোবরের ন্যায় স্থির না হইলে ব্রহ্মের মুখ চন্দ্র তাহাতে প্রতিফলিত হইবে না। ব্রহ্মোপাসক আপন চিত্তকে সতত প্রশান্ত ও নির্ব্বিকার রাখিতে চেষ্টা পাইবেন। উপাসনা সরস ও সুমধুর হইলে যেমন সমস্ত দিন যোগ রক্ষা করা সহজ, সমস্ত দিন চিত্তকে স্ববশে ও শান্তভাবে রাখিতে পারিলে, পূজার সময় পূজ্য দেবতার প্রকাশ উপলব্ধি তেমনই সহজ। দেবতা যখন আনন্দ, অমৃত, শান্ত, দেবপূজককেও তখন আনন্দ ও শান্তি লইয়া পূজা করিতে আসিতে হইবে।

উপাসনা করিতে আসিয়া যদি দেখ, মন উদ্বিগ্ন হইয়া আছে অগ্রে সেই উদ্বেগের কারণ দূর কর এবং সুস্থিরতার জন্য প্রার্থনা কর, তবে তোমার আরাধনায় বসিবার অধিকার। যে সমস্ত দিন উপাসনা করে সেই উপাসনার সময় ভাল করিয়া উপাসনা করিতে সমর্থ হয়।

মানুষ বিহঙ্গ চিরকালই কি উড়িবে? কুলায় নির্ম্মাণ কর। প্রবৃত্তির অধীনতাশৃঙ্খল কাট, নিবৃত্তির বশ্যতা স্বীকার কর। সাধু চিন্তা, সংসঙ্কল্প ও দুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞা দিয়া নিরাকার কুলায় নির্ম্মাণ কর যে বিপদের দিন তথায় আসিয়া নিরাপদে বাস করিতে পারিবে। যদি দিবানিশি কেবল আকাশেই উড়িতে থাক, তবে ঝটিকার সময় কি করিবে? সকল রাজ্যেই সুদিন দুর্দ্দিন,সময় অসময় আছে। সুদিনের সময় যে দুর্দ্দিনের সম্বল করিয়া না রাখে সে নিতান্ত নির্ব্বোধ। যদি সুচতুর হও তবে কালবিলম্ব না করিয়া কুলায় নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হও। একাকী যদি সে কর্ম্ম করিয়া উঠিতে না পার, ব্রহ্মকৃপাসখীকে আহ্বান কর তিনি আসিয়া কুলায় নির্ম্মাণের কৌশল ও নিপুণতা তোমাকে শিক্ষা দিবেন। সাবধান! ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্যের প্রবল ঝটিকায় যেন তোমার কুলায় ভগ্ন ও বৃক্ষচ্যুত হইয়া ভূপতিত না হয়। যদি ক্রমাগত সাধু চিন্তা ও সাধু কামনা, উচ্চ আশা ও সঙ্কল্প এবং প্রতিজ্ঞা ও ব্রতে আপন মনকে আচ্ছন্ন করিতে পার, তবেই তুমি নিরাপদ। ব্রহ্ম সহবাস যতক্ষণ না তোমার স্বভাব হইতেছে, ততক্ষণ তোমার পতন অপরিহার্য্য। আর বিলম্ব করিও না! অন্তরের মধ্যে আত্মার জন্য শীঘ্রই নিরাকার গৃহ নির্ম্মাণ কর। সেখানে ব্রহ্ম দর্শনের অনেক সুবিধা হইবে। নির্ব্বিঘ্নে ব্রহ্ম সহবাস সম্ভোগ করিতে পারিবে, যোগ ভঙ্গের সকল কারণ বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

রসনা, নীরব থাকিও না, ব্রহ্মের যশোগান কর। দিবানিশি অবিরাম তাঁহাকে ডাক। বাহিরের ডাকের কথা বলিতেছি না, অন্তরের শব্দহীন অবাক্ সঙ্গীতের কথা উল্লেখ করিতেছি। সে সঙ্গীতে যদি প্রেমের প্রাবল্য এবং অনুরাগের সারল্য থাকে, তবে ব্রহ্ম না আসিয়া থাকিতে পারিবেন না। প্রেমই অসীম ও সসীমের মিলনের একমাত্র উপায়। যদি তুমি আকুল ও প্রেমোন্মত্ত হইয়া ব্রহ্মাভিমুখে উত্থিত হও, ব্রহ্মও প্রেমে বিগলিত হইয়া তোমার অভিমুখে অবতরণ করিবেন। মনুষ্য সন্তান! তুমি কি তাঁর যশোগান করিবে? সৃষ্টি অবধি ব্রহ্মাণ্ডময় গীত গাইয়াও যাঁর যশের কণামাত্র শেষ হইল না। তুমি কি মনে কর যে তোমার মত তিনি প্রশংসালোলুপ। অনন্ত ঐশ্বর্য্য ও মহিমা যাঁর, যাঁর মহিমা পূর্ণভাবে কেবল তিনি স্বয়ংই জানেন,তাঁহার মহিমা তুমি কি কীর্ত্তন করিবে? ভ্রান্ত হইয়া আপন স্বভাব আপন দেবতাতে আরোপ করিও না। তাঁর যশোগান তাঁর আবশ্যক না হইতে পারে, কিন্তু তোমার মুক্তি কিরূপে হইবে? যদি তুমি তাঁহার প্রেমে উন্মত্ত না হইলে,তবে 'আমি'র হস্ত হইতে কিরূপে রক্ষা পাইবে? আপনার অসারতা ও হীনত্ব কেমন করিয়া বুঝিতে পারিবে? যদি তাঁহার প্রেমের তত্ত্ব বুঝিয়া থাক তবে তাঁহার কথামৃত পানে বিরত থাকিও না। ভক্তবৃন্দ তাঁহার আশ্চর্য্য কীর্ত্তিকলাপ দিন রাত্রি স্মরণ করিয়া অস্থির হন,তুমি তাঁহাদের পদবী অবলম্বন করিয়া কৃতার্থ হও। আলস্য পরিত্যাগ করিয়া বিহঙ্গ বৃত্তি অবলম্বন কর, স্বর্গোদ্যানের গায়কদলের সুপরিচিত হইতে পারিবে।

প্রভু সত্য যদি বিশ্বাস কর, প্রভুর জয় হইবেই হইবে ইহাও বিশ্বাস করিতে হইবে। আকাশে মেঘ উঠিয়াছে, তাহাতে ক্ষতি কি? চারিদিকের অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে তাহাতেই বা ক্ষতি কি? প্রভু যখন সত্য, তখন মেঘ ও অন্ধকার তোমার কি করিবে। বিপদ্ সাগরের জলরাশি আন্দোলিত হইয়া গর্জ্জন করুক, আর একে একে তোমার আশার দীপ সকল নিবিয়া তোমার অসহায় চিত্তকে বিষাদে অবসন্ন করুক, চিন্তিত হইও না। প্রভুকে প্রাণ দিয়া এপর্য্যন্ত কেহ প্রাণ হারায় নাই, তুমিও হারাইবে না! প্রভুকে বিশ্বাস করিয়া এ পর্য্যন্ত কেহ প্রতারিত হয় নাই, তুমিও হইবে না। বাহিরের প্রতিবন্ধক ও অসহায়তার জন্য ভাবিও না, অন্তরে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, দেখিবে কেমন উজ্জ্বল সৌন্দর্য্যে ভূষিত হইয়া প্রফুল্লানন প্রভু তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। যদি আলোকেই বার মাস তাঁহাকে দেখিবে তবে আর তোমার সাধন ও পরীক্ষা কি হইল? অন্ধকারের ভিতর প্রভুর সত্তাকে দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন কর, অলৌকিক বল ও অভূতপূর্ব্ব আনন্দ ও শান্তি পাইবে। যদি ঘোর ঝটিকায় প্রভুর পদ ধরিয়া না থাকিতে পারিলে, তবে তোমার অনুরাগ কি? ফলাফল চিন্তা পরিত্যাগ, ও বহির্মুখ প্রাণকে অন্তর্মুখ কর, প্রভুর মুখ দেখিতে পাইবে। বিপদ্ যদি তাঁহাকে নিকটস্থ করে তবে সে বিপদ্ নিশ্চয়ই আমার অন্তরঙ্গ। বাহিরের বন্ধুহীনতা যদি প্রভুর চরণ আমাকে দৃঢ়তররূপে আলিঙ্গন করায়, তাহা হইলে সে বন্ধুহীনতা যে আমার পরম বন্ধু তাহাতে সন্দেহ কি? সত্যমেব জয়তে নানৃতম্।

ম্পাদকী

ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য ও তাঁহার প্রণালী। *

কিছুদিন হইল, এক দিবস কোন স্থানে যাইবার জন্য রেলগাড়ীতে উঠি। যে কামরায় আমি ছিলাম, তাহার পার্শ্বস্থ কামরায় দুই জন লোক ব্রাহ্মসমাজ লইয়া তর্ক বিতর্ক করিতেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহই আমাকে চিনেন না। এক জন ব্রাহ্মসমাজের অনুকূলে আর এক জন তাহার প্রতিকূলে তর্ক করিতেছেন। এক জন বলিতেছেন আর এক জন তাহার প্রতিবাদ করিতেছেন। তৃতীয় একটী লোক মুখে এক খানি কাপড় চাপা দিয়া শুইয়াছিলেন।

* বিগত ২২ই মাঘ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা গৃহে এই বিষয়ে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহারই সারাংশ।

আমি মনে করিয়াছিলাম যে তিনি নিদ্রিত, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি দ্বয়ের মধ্যে যখন খুব তর্ক বিতর্ক চলিতেছে, তখন তিনি উঠিয়া বলিলেন কি হইতেছে? ব্রাহ্মসমাজের কথা হইতেছে শুনিয়া বলিলেন, যে যখন বৌদ্ধ ধর্ম্ম এদেশে প্রবল হইতে পারে নাই, তখন ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উন্নতির আশা নাই। এই বলিয়া তিনি পুনরায় শয়ন করিলেন। তিনি এক জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। আমি তাঁহার সহিত অনেক কথা কহিলাম।

বাস্তবিক যাঁহারা ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকটে ইহা একটী গভীর প্রশ্ন, যে পৌত্তলিকতা ও জাতি ভেদের প্রতিবাদ করিয়া কোনও ধর্ম্ম এদেশে থাকিতে পারিবে কি না? এ প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া কঠিন। বৌদ্ধ ধর্ম্মের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া অনেকে বলিয়া থাকেন, যে জাতিভেদ ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মও যেমন তিষ্ঠিতে পারেন নাই, ব্রাহ্মধর্ম্মও সেইরূপ থাকিতে পারিবে না। বৌদ্ধ ধর্ম্মের সঙ্গে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের তুলনা সকল বিষয়ে চলে না। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব সময়ে দেশের যে অবস্থা ছিল, এখন সেরূপ অবস্থা নয়। এখন ইংরাজের রাজত্ব, এখন পাশ্চাত্য জ্ঞান দেশে প্রবেশ করিয়া কুসংস্কার ও অনুদারতার দুর্গ ভগ্ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। কিন্তু তথাপি এক সহস্র বৎসর প্রচারিত হইয়াও বৌদ্ধ ধর্ম্মের কেন দুর্দ্দশা হইল, তাহা চিন্তার বিষয় সন্দেহ নাই। চীন দেশীয় পর্য্যটক ফাহিয়ান বলেন, যে তমলুক নগর সমুদ্রের উপকূলে অবস্থিত ছিল, এবং ঐ নগরে তিনি সহস্র বৌদ্ধ সন্ন্যাসী দেখিয়াছিলেন। ইহাতেই বুঝা যায় তখন বৌদ্ধ ধর্ম্মের কতই উন্নতি হইয়াছিল। সে ধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে কেন চলিয়া গেল? কেহ কেহ বলেন, নিম্ন শ্রেণীর লোকে ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, উচ্চ জাতীয় লোক গ্রহণ করে নাই, সেই জন্য ঐ ধর্ম্ম তিষ্ঠিতে পারিল না, ক্রমশঃ ঐ ধর্ম্মে দুর্নীতি প্রবেশ করিল, এবং শ্রমণ কথাটী পর্য্যন্ত ঘৃণার কথায় পরিণত হইয়া দাঁড়াইল। কেহ কেহ বলেন, যে বৌদ্ধগণ একটু একটু হিন্দুভাব গ্রহণ করিলেন, হিন্দুধর্ম্মও বৌদ্ধকে অবতার বলিয়া গ্রহণ করত বৌদ্ধ ধর্ম্মকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। আবার কেহ কেহ একথাও বলিয়া থাকেন, যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম স্বাভাবিক ভাবে প্রচারিত হয় নাই, সেই জন্য তিষ্ঠিতে পারে নাই। বৌদ্ধ ধর্ম্ম সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম ছিল, সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম জন সমাজের ধর্ম্ম হইবে কেন? বৌদ্ধ ধর্ম্মের ভারতবর্ষ হইতে স্থানান্তরিত হইবার এইরূপে নানা কারণ প্রদর্শিত হইয়া থাকে। প্রকৃত কারণ যাহাই হউক, বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রয়োজন চলিয়া যাওয়াতে যে তাহার কার্য্য ও জীবনের আবশ্যকতা চলিয়া গেল, ইহাতে সন্দেহ নাই।

প্রকৃতির সকল বিভাগেই দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার কার্য্য আছে, সেই বিধাতার জগতে বাঁচে, যাহার কার্য্য নাই, সে বিনষ্ট হয়। যাহার কার্য্য যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ সে থাকে, যাহার কার্য্য ফুরায়, তাহার জীবনের আবশ্যকতাও চলিয়া যায়। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দৃষ্টান্তের প্রয়োজন নাই, সাধারণ দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা বেশ বুঝা যায়। যতদিন পশু বা পক্ষীর শাবক আপনি আহার সংগ্রহ করিতে সমর্থ না হয়, ততদিন তাহাদের পিতা মাতার স্নেহ প্রবল থাকে। জননীর স্তন দুগ্ধ ততদিনও সেই ভাবে থাকে, যতদিনও যে ভাবে সন্তানের জীবন রক্ষার জন্য উহার প্রয়োজন হয়। আমের আঁটির কোষ কেমন কঠিন। যখন বীজ হইতে অঙ্কুর বাহির হইল, তখন বীজ কোষের আবশ্যকতা না থাকায় উহা নষ্ট হইয়া যায়। আর একদিকে দেখ, যে অঙ্গ বা যে মানসিক শক্তি নিষ্ক্রিয় থাকিবে, তাহা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। পরমেশ্বরের জগতে অন্ন জল গ্রহণ করিয়া যে নিষ্ক্রিয় থাকিবে, সেই বিনাশ পাইবে; যে কাজ করিবে সেই থাকিবে, পরমেশ্বর তাহাকে রক্ষা করিবেন। যে এমন কিছু দিতেছে, যাহা অন্যের নিকট পাওয়া যায় না, সে নিশ্চয়ই জীবিত থাকিবে। আধ্যাত্মিক জগতেও আমরা এই সত্যের যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম করি। যে পরিমাণে আমাদের দ্বারা ঈশ্বরের কার্য্য নিষ্পন্ন হইতেছে, সেই পরিমাণে তিনি আমাদিগকে রক্ষা করিতে বাধ্য। তিনি নিরন্তরই এই কথা বলেন, "যে বহে আমার বোঝা, আমি বহি তার বোঝা বই।" যে তাঁহার কার্য্য করিতেছে তাহাকে তিনি রক্ষা করিবেনই করিবেন, এই বিশ্বাস যাঁহার আছে, "The Lord will provide" এই ভাব লইয়া যে তাঁহার কার্য্য করিতেছে, নিশ্চয়ই সে জীবিত থাকিবে।

এখন প্রশ্ন এই আমাদের এই যে ব্রাহ্মসমাজ, জগতে উহার কোনও কার্য্য আছে কি না? যাহা অপরের দ্বারা হইতেছে না, ব্রাহ্মসমাজের এমন কিছু কার্য্য আছে কি না? যদি থাকে, পরমেশ্বর ইহাকে অবশ্যই রক্ষা করিবেন। ব্রাহ্মসমাজ মানব জীবনের একটী নূতন আদর্শ হৃদয়ে ধারণ ও জীবনে সাধন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এ চেষ্টা সম্পূর্ণভাবে চলিতেছে, তাহা যদিও বলা না যাইতে পারে, আংশিকরূপে যে উহা হইতেছে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। হৃদয়ে কেবল ধারণ করিলেই হয় না, সাধন করা আবশ্যক। ধারণা অর্থে সত্যকে উজ্জ্বলভাবে বুঝা এবং সাধনা অর্থে কার্য্যে পরিণত করা। দুইই চাই। ধর্ম্মরাজ্যে এমন মানুষ দেখা যায়, যাহার ধারণা হইয়াছে, কিন্তু সাধনা হয় নাই। সে লোক যে সম্পূর্ণরূপে কার্য্য করিতেছে না ইহা একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই প্রতীতি হয়। চিত্র আঁকিবার পূর্ব্বে চিত্রকর চিত্রের সমস্ত ভাবটী উজ্জ্বলরূপে ধারণা করেন, পরে মনোভাব বর্ণ দ্বারা পটে চিত্রিত করেন। যিনি মনোভাব পটে যত স্পষ্ট প্রকাশ করিতে পারেন, তিনি সেই পরিমাণে ভাল চিত্রকর হন। কেবল ধারণাশীল চিত্রকরের অবস্থা যেরূপ, সাধনহীন ধারণাশীল আত্মার অবস্থাও তদ্রূপ। গায়কের দৃষ্টান্তেও এ সত্যটীর প্রমাণ পাওয়া যায়। যিনি গীতের স্বর লিপি করিতে পারেন, কিন্তু কণ্ঠে আনিতে পারেন না সে গায়ক যেমন, সত্যকে ধারণা করিতে পারে অথচ জীবনে পরিণত করিতে পারে না, সে সাধকও সেইরূপ। ইঞ্জিনিয়ারিং সকল বহি জানা আছে, অথচ হাতে কলমে কিছুই আসেনা, সে ইঞ্জিনিয়ার যেমন, সত্যকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া জীবনে যে আনিতে পারে না সেও সেইরূপ। যে পর্য্যন্ত সত্য জীবনে না পরিণত হয়

ততক্ষণ তাহার শোভা প্রকাশ পায় না। কৃষি ও রসায়ন-বিদ্যা পারদর্শী অথচ ক্ষেত্রকর্ষণ করিতে পারে না সে যেমন, সত্যমুখে বলিয়া কাজে যে না করে সেও তেমনি অপদার্থ। ব্রাহ্মসমাজ আপন আদর্শকে যখন কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তখন তাঁহার জীবন ঈশ্বরের ক্রোড়ে।

ব্রাহ্মসমাজ যে আদর্শ ধারণ করিয়া সাধনের চেষ্টা পাইতেছেন, সে আদর্শ কি? সমুদায় ধর্ম্মই মানব জীবনকে এক একটী ভাব দিয়াছেন। আমি দুইটী ধর্ম্মের কথা বলিব। হিন্দু ধর্ম্ম ও খৃষ্ট ধর্ম্ম মানব জীবনকে কিভাবে দেখেন, আমি সেই কথার উল্লেখ করিব।

আমাদের দেশে মানবজীবনকে কিভাবে দেখা হয়? আমাদের দেশে নিষ্ঠাবান্ হিন্দুমাত্রেই মানবজীবনকে একটী মায়া মোহের ব্যাপার মনে করেন। তাঁহারা মানবজীবনকে ভবসাগর বলেন। ভবঅর্থে জন্ম; জন্মই যত দুঃখের কারণ। সুতরাং মানবজীবনকে তাঁহারা দুঃখ, বিড়ম্বনা ও বন্ধন বলিয়া বিবেচনা করেন। আমাদের দেশের একটী প্রধান মত পুনর্জ্জন্ম। উহা হইতে নিষ্কৃতিলাভ করাই তাঁহাদের ধর্ম্মের উদ্দেশ্য। এই ভাব থাকিলে জীবনকে কেহ ভালবাসিতে পারে না। এই জন্য নিষ্ঠাবান্ আস্তিক হিন্দুমাত্রেই ভববন্ধনের জন্য দুঃখ করেন। যাঁহারা ইংরাজী পড়িয়াছেন, তাঁহারা এই ভাব বুঝিতে পারেন না; কিন্তু ইংরাজী অনভিজ্ঞ বৃদ্ধদিগের মনের ভাব এইরূপ। আমার একজন আত্মীয় তাঁহার স্ত্রীর নাম রাখিয়াছিলেন পাপ। এভাব হৃদয়ে যদি থাকে তবে মানব-জীবনের উপর ঘৃণা হয়। এইতো গেল আমাদের দেশের ভাব।

খৃষ্টীয় ধর্ম্মের দিকে চাহিয়া দেখিলে দেখিতে পাই, যে আজি কালি এমন অনেক উদারচেতা লোক আছেন, যাঁহাদের মত ঠিক্ ব্রাহ্মধর্ম্মের মত। তাঁহারা আপনাদিগকে খৃষ্টান বলেন বটে, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শই তাঁহারা হৃদয়ে ধরিয়াছেন। তাঁহাদের কথা বলিতেছি না; গোঁড়া খৃষ্টীয়ান-দিগের কথা বলিতেছি। তাঁহাদের মত এই যে, মানবজীবন এক সময়ে নির্দ্দোষ ছিল, কিন্তু কোন কারণে উহা পতিত ও পাপময় হইয়াছে। এই পাপময় জীবন হইতে পরিত্রাণলাভের জন্য বিধাতার নির্দ্দিষ্ট মুক্তির উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। মনুষ্যের সকলই অপবিত্র হইয়া গিয়াছে, নির্দ্দিষ্ট মুক্তির উপায় ছাড়িয়া প্রার্থনা করিলেও ঈশ্বরের বিরাগভাজন হইতে হয়। এই জন্য মধ্যবর্ত্তিতা, গুরুবাদ, অবতারবাদ আসিয়া পড়িয়াছে। কেন না মানুষ যখন আপনাকে হেয় ও ঈশ্বর হইতে দূরীভূত মনে করে তখন যাঁহারা ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ করা ব্যতীত আর উপায় কি?

ব্রাহ্মধর্ম্ম কি আদর্শ উপস্থিত করিতেছেন? ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতেছেন, এই যে পাপ, পুণ্যময় সুখ দুঃখময় মানব জীবন ইহা বিধাতার লীলাস্থল। মানবজীবন অতি পবিত্র বস্তু, ভগবান স্বয়ং ইহার ভিতর কার্য্য করিতেছেন। আমাদের মনে হয় বটে, যে আমাদের এই যে পাপ তাপ, ইহা ঈশ্বর হইতে আমাদিকে দূরে আনিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক কথা এই যে ঈশ্বর দূরে নহেন। এমন পাপী, বা মহাপাতকী কেহ নাই, যাহার নিকট হইতে ঈশ্বর দূরে আছেন। আমাদের জীবনের সহিত পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। প্রতি জনের হৃদয়ে, প্রতি জনের ঘরে, প্রতি মুহূর্ত্তে তিনি প্রকাশিত। এমন স্থান নাই, এমন সময় নাই, যে স্থানে বা যে সময়ে তিনি প্রকাশিত নহেন। ইহা কল্পনার কথা নহে, বিজ্ঞান সম্মত কথা। প্রত্যেক জড়বস্তু যেমন আকাশে অবস্থিত; আকাশ ছাড়িয়া যেমন বাহিরের বস্তু ভাবা যায় না, সেইরূপ আত্মার পরমাকাশ সেই পরমাত্মা। তিনি নিরন্তরই আমাদের আলিঙ্গন, বেষ্টন, ধারণ করিয়া আছেন। তবে আমরা দেখিনা কেন? ইহারও একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। সূর্য্যের আলোকের মধ্যে আমরা বিচরণ করিতেছি, সূর্য্যালোক আমাদিগকে আলিঙ্গন ও বেষ্টন করিয়া আছে অথচ কি আমাদের সব সময়ে মনে থাকে, যে সূর্য্যালোকের মধ্যে আমরা বাস করিতেছি? পরমেশ্বরের শক্তি ভিন্ন কে কার্য্য করিতে পারে? তাঁহার সঙ্গে আমাদের এরূপ ঘনিষ্ঠ যোগ যে পাপিষ্ঠ ঘোর নারকী যে তাহাকেও তিনি বক্ষে ধারণ করিয়া আছেন, সাধ্য নাই যে তাঁহাকে কেহ ছাড়িয়া যায়। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম এই কথা প্রচার করিতেছেন, যে পাপী হও নারকী হও, পরম করুণাময় পরমেশ্বর তোমাকে প্রেমবাহুপাশে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তোমার জীবনকে তাঁহার লীলাক্ষেত্র করিয়াছেন। দেখ ব্রাহ্ম ধর্ম্ম মানব জীবনের কি মহত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন! ব্রাহ্ম ধর্ম্ম বলিতেছেন, যে মানবজীবন ঘৃণার বস্তু নহে, বিধাতার লীলাস্থল।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

পণ্ডিত বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের পত্র সম্বন্ধে দুই একটী কথা।

মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়ের পত্রের উত্তরে গোস্বামী মহাশয় বলিয়াছেন "যাহা সত্য তাহাই ব্রাহ্ম ধর্ম্ম।" আমরাও তাহাই স্বীকার করি। গোস্বামী মহাশয় আরো বলেন "কোন নূতন বা অপ্রকাশিত সত্য আবিষ্কৃত হইতে পারে না ইহা বোধ হয় কেহই মনে করিতে পারিবেন না। ব্রাহ্মসমাজের নিকট হয়ত এখনও এমন অনেক গুলি সত্য অপ্রকাশিত রহিয়াছে যাহা সহস্র সহস্র বৎসর মধ্যে ব্রাহ্মসাধকের জীবনের মূল হইয়া দাড়াইবে"। সত্য "নূতন" আমরা মনে করি না। ঈশ্বর যেমন নিত্য ও অনন্ত তাঁহার সত্যও নিত্য ও অনন্ত কাল হইতে আছে ও থাকিবে। আমাদের নিকট যে সত্য অজ্ঞাত ছিল তাহার জ্ঞান আমাদের নিকট নূতন এই অর্থে সত্য "নূতন" বলা যাইতে পারে। গুপ্ত বা অপ্রকাশিত সত্য আবিষ্কৃত হইতে পারে তাহা আমরাও স্বীকার করি। কিন্তু সেই সত্য কখনও পুরাতন বা পূর্ব্বপ্রকাশিত সত্যের বিরোধী হইতে পারে না। গোস্বামী মহাশয় "ব্রাহ্ম ধর্ম্ম ও নববিধান" বক্তৃতাতে বলিয়াছেন "ঈশ্বর চিরকালই এক ঈশ্বর। তাঁহার ন্যায় আর পুরাতন কিছুই নাই, সত্য সকলই পুরাতন"। সূর্য্য চিরকাল যে সূর্য্য সেই সূর্য্য, তাহার তেজ

কখনও নূতন নহে"। মহর্ষি বলিয়াছেন "ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য ধ্রুব সত্য—তাহার রূপান্তর হয় না, পরিবর্ত্তন হয় না"। গোস্বামী মহাশয় এক্ষণে যে সকল মত ও কার্য্যকে ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য ও কার্য্য বলিয়া সমর্থন করিতেছেন, তাঁহার পূর্ব্ববক্তৃতা ও উপদেশাদিতে সেই সকল মত ও কার্য্যকে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরোধী ও অসত্য বলিয়াছেন। আজ শুনিব পৌত্তলিকতা গুরুবাদ ইত্যাদি কুসংস্কার ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্যের বিরোধী, কল্য শুনিব যে ঐ সমুদায় ধর্ম্ম লাভের সহায়তা করে। সত্যের কি এই প্রকার পরিবর্ত্তন হইতে পারে? এবং এই প্রকার পরিবর্ত্তন কি উন্নতির পরিচায়ক? সকল ধর্ম্মেই কতক গুলি স্থির মত ও লক্ষণ আছে। ৫৭ বৎসরেও কি ব্রাহ্মধর্ম্মের সেই রূপ কিছুই স্থির হয় নাই? ব্রাহ্মধর্ম্ম সনাতন এবং একমাত্র সত্য ধর্ম্ম। সত্য পথ ভিন্ন উহা কখনও লাভ করা যাইতে পারে না। ইহা কোনও ব্যক্তি কি পুস্তকে আবদ্ধ নহে। কিন্তু ইহারও যে কতক গুলি অপরিবর্ত্তনীয় সত্য মত আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। যে ব্রাহ্ম যখন যেরূপ ব্যবহার করিবেন এবং যাহা সত্য বলিয়া প্রচার করিবেন, তাহাই কি ব্রাহ্মধর্ম্মের কার্য্য ও সত্য হইবে ব্রাহ্মধর্ম্মে কি এমন "নূতন" বা "অপ্রকাশিত" সত্য আসিবে যাহাতে উহার "মূল উদ্দেশ্য" ও "বিশেষত্ব" বিনষ্ট করিবে? বিজয় বাবু এখন যে সকল আচরণ ও মতকে "নূতন সত্য" বলিয়া সমর্থন করিতেছেন, দেখা যাউক তদ্দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্য ও উদ্দেশ্যে আঘাত পড়িতেছে কি না, এবং সেই গুলি বস্তুতঃ নূতন সত্য কি না।

১। মহর্ষির পত্রের উত্তরে বিজয় বাবু ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ হইতে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, যে গুরু সম্বন্ধে উক্ত পুস্তকে যাহা লিখিত হইয়াছে তাঁহারও সেই মত। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থে গুরুর নিকট উপদেশ গ্রহণ সম্বন্ধে যে প্রাচীন শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তদ্দ্বারা যদি এই বুঝায় যে "ব্যক্তি বিশেষকে" গুরু মানিতেই হইবে, তবে এই মতের সহিত আমাদের সহানুভূতি নাই। বিজয় বাবু তাঁহার পূর্ব্বলিখিত কোনও পুস্তকে বলিয়াছেন,—"কোন ব্যক্তি বিশেষকে একমাত্র গুরু বলিলে অসত্যকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়, পরমেশ্বরকে আর গুরু বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না।" আমাদেরও ঐ মত। অন্যান্য বিদ্যা শিক্ষার জন্য যেমন শিক্ষক আবশ্যক, ব্রাহ্মসমাজ চিরকাল সেই প্রকার "সাধারণ ভাবে" ধর্ম্মশিক্ষকের আবশ্যকতা স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। ধর্ম্মোপদেশ দেওয়ার জন্য আচার্য্য ও প্রচারক নিযুক্ত করা দ্বারাই ইহা প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু বিজয় বাবু গুরুরূপে তাঁহার নিকট মন্ত্র গ্রহণকারী শিষ্যগণ হইতে যে সকল ব্যবহার গ্রহণ করিতেছেন, ব্রাহ্মসমাজ কিম্বা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ কি তাহা অনুমোদন করেন? পদধূলি অঙ্গে মাখা, প্রসাদ গ্রহণ, বিজয় বাবুর অনুপস্থিতে তাঁহার আসনের নিকট নমস্কার ইত্যাদি কার্য্য কি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থে অনুমোদিত হইয়াছে? মহর্ষি দ্বিতীয় পত্রে বলিয়াছেন—"সদ্‌গুরুর নিকট 'শিক্ষাব্যতীত' তাঁহার পদে পড়িয়া থাকা, প্রসাদ গ্রহণ প্রভৃতি কার্য্যের কিছুই মাহাত্ম্য নাই। ইহা কখন ধর্ম্মসাধনের উপায় নহে"। বিজয় বাবুর শিষ্যগণের মধ্যে অনেকে বিচার না করিয়া তাঁহার কথা গ্রহণ করিতেছেন। দিন দিন গুরুই তাঁহাদের প্রধান অবলম্বন হইতেছেন এবং "স্বাধীন চিন্তা" খর্ব্ব হইয়া যাইতেছে। বিজয় বাবু ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার বৈষ্ণব শিষ্যগণ তাঁহার প্রতি যে ভাবে ভক্তি প্রকাশ করিত উহার সহিত বর্ত্তমান শিষ্যগণের ব্যবহারের কোনও প্রভেদ আছে কি? তিনি পূর্ব্বেও শিষ্যদিগকে তাহাদের সরল বিশ্বাসানুযায়ী ধর্ম্মমতে চলিতে অনুমতি দিতেন, এখনও পৌত্তলিক শিষ্যদিগকে তাহাদের বিশ্বাসমতে চলিতে আদেশ করেন। পূর্ব্বে বৈষ্ণব ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় দেবতার নাম জপ করিতে বলিতেন; এখনও পৌত্তলিক নাম সাধন করিতে বলেন। বিশেষের মধ্যে এই যে, এখন বিজয় বাবু তাঁহার শিষ্যদিগকে দীক্ষিত করিবার সময় তাঁহার স্বীয় গুরুর সাহায্যে শিষ্যগণের হৃদয়ে "শক্তিসঞ্চার" করিয়া থাকেন। "শক্তি সঞ্চার" সম্বন্ধে আমি মহর্ষি মহাশয়ের মত জানিতে চাহিয়াছিলাম। তিনি স্বহস্তে যাহা লিখিয়াছেন তাহা এই—"একজন মনুষ্য যে আর একজন মনুষ্যে গূঢ়রূপে শক্তিসঞ্চার করিতে পারে, ইহা একেবারে অসম্ভব। অন্তর্যামী ঈশ্বরই অন্তরে থাকিয়া জ্ঞান, শক্তি ও প্রেম ভক্তের হৃদয়ে প্রেরণ করেন, এ ক্ষমতা আর কাহারো নাই। তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং" ইত্যাদি ভগবদ্‌গীতার এই বাক্য আমি শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করি। এবং এই আমার প্রতিদিনের পরীক্ষার কথা"! বিজয় বাবু বলিয়াছেন যাহা সত্য তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। পৌত্তলিক নাম প্রদান করা এবং যাহার যাহাতে সরল বিশ্বাস তাহাকে তাহাই করিতে বলা—এই কি ব্রাহ্মধর্ম্মের মধ্যে নূতন কিম্বা অপ্রকাশিত সত্য আবিষ্কৃত হইল? এই সকল মত চিরদিনই ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্যের বিরোধী।

কোন মনুষ্যকে গুরু করা সম্বন্ধে বিজয় বাবুর পূর্ব্বে কিরূপ মত ছিল তাহা ক্রমে দেখাইতেছি। তিনি কেশব বাবুর কন্যার বিবাহের সময় ঢাকাপ্রকাশ ও অন্যান্য পত্রিকাতে কেশব বাবুর শিষ্যগণ যে কেশব বাবুকে 'গুরু ও মধ্যবর্ত্তী' স্বীকার করিতেন তৎসম্বন্ধে অনেকগুলি পত্র প্রকাশ করেন। সেই সময় বাবু ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল বিজয় বাবুকে লিখিয়াছিলেন—"আমাদিগকে যাহা বলুন, গুরুত্যাগের ভয়ানক দৃষ্টান্ত দেখাইয়া জগতের অনিষ্ট করিবেন না"। এই কথা ধরিয়া বিজয় বাবু লিখিয়াছিলেন—"উল্লিখিত কয়েকটী কথা পাঠ করিয়া ব্রাহ্মবন্ধুগণ বুঝিতে পারিবেন যে, কেশব বাবুর প্রচারকগণ কেশব বাবুকে গুরু এবং মধ্যবর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করেন কিনা এবং কেশব বাবু তাহাতে সম্মতি দিয়া থাকেন কিনা?" আমরাও জিজ্ঞাসা করি বিজয় বাবু তাঁহার শিষ্যগণ কর্ত্তৃক বিশেষ গুরু বলিয়া পূজিত হইতেছেন কিনা এবং তিনি উহাতে সম্মতি দিয়া থাকেন কিনা? বিজয় বাবু আর এক পত্রে বলিয়াছেন—"১লা কার্ত্তিকের ধর্ম্মতত্ত্বে "পরিত্রাণ ও স্বাধীনতা" প্রস্তাব পাঠ করিয়া সুখী হইলাম। কারণ কেশব

বাবুর প্রচারকগণ প্রকাশ্যরূপে 'মনুষ্য গুরু' ও মধ্যবর্ত্তী স্বীকার না করিয়া ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা গোপনে গোপনে মনুষ্য গুরু ও মধ্যবর্ত্তীর মত অনেক-দিন হইতে পোষণ করিয়া আসিতেছেন"। ঐ পত্রের আর এক স্থানে বলিয়াছেন—"কেশব বাবু ও তাঁহার দলস্থ লোকেরা 'কার্য্যতঃ' যদি মনুষ্য গুরু ও মধ্যবর্ত্তীর মত পরিত্যাগ করেন, তাঁহা হইলে ব্রাহ্মসমাজ ভয়ানক মারাত্মক মত হইতে মুক্ত হইবে সন্দেহ নাই"। আমরাও বলি বিজয় বাবু এবং তাঁহার কতক শিষ্য মুখে ও পুস্তকে গুরুবাদ অস্বীকার করেন বটে, কিন্তু 'কার্য্যতঃ' মনুষ্য গুরুর মত পোষণ করিতেছেন। পাঠকগণ দেখুন বিজয় বাবু পূর্ব্বে কোন মনুষ্যকে গুরু করা সম্বন্ধে কতদূর বিরোধী ছিলেন। আর এখন বলিতেছেন গুরু না পাইলে ধর্ম্ম লাভ হয় না। সিদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত কাহারও সহিত তর্ক বিতর্ক করিবেনা, বিজয় বাবু তাঁহার কোন কোন শিষ্যকে এইরূপও বলিয়াছেন। ইহা দ্বারা কি অন্ধ বিশ্বাসের বৃদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তার খর্ব্বতা হইতেছে না? "ব্রাহ্মদিগের প্রতি নিবেদন" পুস্তকে তিনি বলিয়াছেন, "বিবেককে 'একমাত্র গুরু' করিয়া সর্ব্বদা তাহারই আদেশ প্রতিপালন করিতে হইবে"। বিজয় বাবুর এই মতের সহিত কি বর্ত্তমান মতের মিল হয়? এখন বিজয় বাবু বলেন "সদ্ গুরুর কৃপাদৃষ্টি" হইলে ঈশ্বরের করুণায় সাধন খুলিয়া যায়। এক মাত্র ঈশ্বরের করুণায় কি সাধন খুলিতে পারে না? ঈশ্বরের কি কৃপা ও শক্তির ত্রুটি আছে? সদ্‌গুরু কি প্রকারে স্থির করিতে হইবে? মনুষ্য শত উন্নত হইলেও দোষ গুণ মিশ্রিত অপূর্ণ থাকিবে। বিজয় বাবুর কোন কোন শিষ্য বলেন— "ধর্ম্ম জগতের চাবি গুরুর হস্তে, গুরু না দিলে ঘরে কেহ প্রবেশ করিতে পারে না"। বিজয় বাবু এক্ষণে কি প্রকার দূষণীয় মত শিক্ষা দেন তাহা ইহা দ্বারাই প্রকাশ পাইতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থে এই প্রকার গুরুর মত সমর্থিত হয় নাই। গুরু সম্বন্ধে বিজয় বাবুরও বর্ত্তমান মত কতদূর বিভিন্ন তাহা প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি তাঁহার বর্ত্তমান মত কি পূর্ব্বমতের ক্রমবিকাশ বলিব, না নূতন বা অপ্রকাশিত সত্য আবিষ্কৃত হইল মনে করিব? আমরা বিজয় বাবুর গুরুবাদের মতে "নূতন সত্য" কিছুই দেখি না। বৈষ্ণবগণ যে দূষণীয় গুরুর মত পোষণ করেন, বিজয় বাবু তাহাই প্রচার করিতেছেন। বিজয় বাবুর কোন শিষ্য বলেন, চৈতন্য প্রভু পূর্ব্ব বাঙ্গালাতে আসেন নাই, সেই অভাব দূর করিবার জন্য বিজয় বাবু পূর্ব্ব বাঙ্গালাতে কার্য্যক্ষেত্র স্থির করিয়াছেন। আমরাও বলি বিজয় বাবু এক্ষণে যে ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন, তাহা চৈতন্যের ধর্ম্ম, পরম হংস ও ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম হইতে পারে, কিন্তু রাজা রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি যে সনাতন সত্য ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন ইহা সেই ধর্ম্ম নহে। বিজয় বাবু বলেন তিনি "সার্ব্বভৌমিক" ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। সার্ব্বভৌমিক ব্রাহ্মধর্ম্মের লক্ষণ কি এই যে কোন বিশেষ ব্যক্তিকে গুরু স্বীকার করিতে হইবে, পৌত্তলিকতা ও নানা প্রকার কুসংস্কারের প্রশ্রয় দিতে হইবে, এবং হিন্দুধর্ম্মের আবর্জ্জনা সমূহ সরল ও বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মের মধ্যে মিশ্রিত করিতে হইবে, উচ্ছিষ্ট ভোজনে আধ্যাত্মিক উন্নতির ব্যাঘাত হয় ইহাও কি সার্ব্বভৌমিক ভাব? আমরা দেখিতেছি বিজয় বাবু সত্য ধর্ম্মের মধ্যে কতকগুলি সঙ্কীর্ণ ও অসত্য মত এবং আচরণ প্রবিষ্ট করাইয়া উহার সৌন্দর্য্য, উদারতা ও সরলভাব বিনষ্ট করিতেছেন। মহর্ষি ঠিক বলিয়াছেন যে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাসকে কতকগুলি অযথাবাদ ও কুসংস্কার যুক্ত করিয়া প্রচার করিলে তাহার গতিরোধ করা হয়।

২। বিজয় বাবু পত্রের এক স্থানে বলিয়াছেন,—"আমি যে পথে চলিতেছি, তাহা ঋষি প্রবর্ত্তিত পথ"। আমরা জানি ঋষিদিগের মধ্যে যথেষ্ট মত বিভিন্নতা ছিল, বিজয় বাবু কোন্ ঋষির পথ অবলম্বন করিয়াছেন? যাহা হউক, তাঁহার পথ ঋষি প্রবর্ত্তিত পথ হইলে হইতে পারে, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও প্রচারকগণ যে সত্য পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, ইহা অনেক বিষয়ে সেই পথের বিরোধী। ঋষিগণের সকল মত ও প্রণালী ব্রাহ্মসমাজ কখনও সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। ঋষিদিগের পথানুযায়ী ব্রহ্মোপাসক এখনও পরম হংস, ব্রহ্মচারী ও দণ্ডী প্রভৃতির মধ্যে দেখা যায়, কিন্তু তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী বলা যাইতে পারে না। তাঁহারা পরম সাধু হইতে পারেন কিন্তু 'ব্রাহ্ম সাধু' নহেন। বিজয় বাবু কোন বক্তৃতাতে বলিয়াছেন "ভারতবর্ষের প্রাচীন আর্য্য মহর্ষিরা এবং আধুনিক অনেকানেক দণ্ডী নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন, তবে কি জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুদয় হইল?" "এই প্রশ্ন দ্বারাই স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে ঋষিগণ প্রচারিত ধর্ম্ম ও রামমোহন প্রচারিত ব্রাহ্মধর্ম্মে পার্থক্য আছে। বিজয় বাবু এক পুস্তকে লিখিয়াছেন— "মহাত্মা রামমোহন রায় এই দেশে 'প্রথম' ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রকাশ করেন। তিনি কেবল হিন্দু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া এক ঈশ্বরের উপাসনা প্রচলিত করেন নাই। ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে যে, যদি তিনি পারস্য ভাষা এবং ইংরাজী ভাষা অধ্যয়ন না করিতেন, তবে তিনি দীর্ঘ শিখাধারী ব্রাহ্মণ হইয়া, হোম, যাগ, স্বস্ত্যয়ন, পুরশ্চারণ প্রভৃতি কার্য্যেতেই জীবন শেষ করিতেন"। ইহা দ্বারাও প্রতিপন্ন হইতেছে, বিজয় বাবু এক্ষণে যে পথ ধরিয়াছেন তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের পথ নহে। ত্রিশুল ধারণ, বৈষ্ণবদিগের করঙ্গ, ঝুলি ও পরিচ্ছদ গ্রহণ, সাধন গৃহ রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি দ্বারা পরিবেষ্টিত করা, পৌত্তলিকদিগের মহোৎসবে বৈরাগীদিগের সহিত নৃত্য গীত; অদ্বৈত গোস্বামীর আবির্ভাব উপলক্ষে বৈষ্ণবদিগকে লইয়া অবিরত ধূলি সহ (ধুলট) কীর্ত্তন; বৈরাগী সন্ন্যাসীদিগকে নিজ হস্তে সেবনার্থ গাঁজা প্রদান ইত্যাদি কার্য্য দ্বারা বেশ বুঝা যাইতে পারে তিনি কোন্ পথ অবলম্বন করিয়াছেন। আমরা যত দূর বুঝি বিজয় বাবু ক্রমে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের পথে যাইতেছেন। যে বিজয় বাবু এক সময়ে 'স্বাধীন চিন্তা'

ও 'জ্ঞানালোচনার' অভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মে পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কার আসিবে বলিয়া কত উপদেশ ও বক্তৃতা দিয়াছেন, এক্ষণে তিনি নিজে কি করিতেছেন, পাঠকগণ বিচার করিয়া দেখুন। দিন দিন বিজয় বাবু ও তাঁহার শিষ্যগণ কর্ম্মহীন হইয়া যাইতেছেন; কেবল তাহা নহে ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মধর্ম্মের চির-পোষিত মতের ও ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যের বিরোধী হইতেছেন বিজয় বাবুর হিন্দুসমাজস্থ শিষ্য ও সাধারণ হিন্দুগণ তাঁহাকে পৌত্তলিক হিন্দুরূপে পরিচিত করিতে ইচ্ছুক, ব্রাহ্মশিষ্যগণ তাঁহার বর্ত্তমান মত ও ব্যবহার সকলকে ব্রাহ্মধর্ম্ম সঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে যত্ন করিতেছেন। বিজয় বাবুর বর্ত্তমান মত ও ব্যবহারাদি ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরোধী হই-লেও তিনি আপনাকে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক বলিয়া পরিচিত করিতেছেন এবং বলেন যে তিনি এক চুলও ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে সরেন নাই। ইহা অতি আশ্চর্য্য ও কৌতুকজনক কথা তিনি এক্ষণে যাহা প্রচার করেন তাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম হইলে, ব্রাহ্মসাধারণ যাহা প্রচার করিতেছেন তাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম নহে। তিনি নিজে ব্রহ্মোপাসক কিন্তু তাঁহার বর্ত্তমান অনেক মত, আচরণ ও প্রচার প্রণালী ব্রাহ্মধর্ম্ম সঙ্গত নহে।

বিজয় বাবুর কোন কোন ব্রাহ্মসমাজস্থ শিষ্য বলেন, তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম চাহেন, ব্রাহ্মসমাজ চাহেন না। ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ একে অন্যকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। যে ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাদিগকে সত্য পথ প্রদর্শন করিয়াছেন ও বিবেকের সম্মান করিতে শিক্ষা দিয়াছেন, যে ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাদিগকে পবিত্র ব্রাহ্ম ধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট করিলেন; যে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়া তাঁহারা সামাজিক নানা প্রকার পাপ ও কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইলেন; যে ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাদিগকে জীবনের উচ্চ আদর্শ দেখাইয়া দিয়াছেন; যে ব্রাহ্ম সমাজ তাঁহাদিগকে স্বার্থত্যাগ এবং পরসেবার মাধুর্য্য বুঝিতে সক্ষম করিয়াছেন তাঁহারা সেই ব্রাহ্মসমাজকে চাহেন না এরূপ কথা কি প্রকারে মুখে আনেন আমরা বুঝি না। ব্রাহ্মসমাজ ব্রাহ্মমাত্রেরই প্রাণের অতি প্রিয় বস্তু। উহার কোন ত্রুটি থাকিলে সংস্কার করিব, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ চাইনা এমন নিষ্ঠুর কথা কখনও মুখে আনিতে পারি না। যে ব্যক্তি প্রাণের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মকে ভাল বাসেন তিনি কি কখনও ব্রাহ্মসমাজ চাই না এমন কথা বলিতে পারেন? যে ব্রাহ্ম, ব্রাহ্মসমাজ চাই না বলিতে পারেন তিনি ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ কার্য্য special mission এবং উচ্চলক্ষ্য বুঝিতে পারেন নাই।

৩। পৌত্তলিকদিগকে গ্রহণ করা অর্থাৎ দীক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে বিজয় বাবু বলেন যে ব্রাহ্মসমাজে এই রূপ লোকেরই আধিক্য। ইহার অর্থ কি? যাঁহারা পৌত্তলিকতা ও জাতি ভেদ প্রকাশ্যরূপে পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মানুসারে অনুষ্ঠানাদি করেন তাঁহাদের দ্বারাই ব্রাহ্মসমাজ গঠিত হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজে পৌত্তলিকদিগের আধিক্য কি প্রকারে হইল? ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাতে পৌত্তলিক ও অন্যান্য সকল শ্রেণীর লোকের আসি-বার অধিকার আছে এবং এরূপ লোক আসিয়া থাকেন বটে কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাদিগকে ব্রাহ্ম বলিয়া স্বীকার করেন না। কপটাচারী ব্যক্তি অপেক্ষা সরল বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ অধিক শ্রদ্ধার পাত্র তাহা আমরা ও স্বীকার করি। বিজয় বাবু পূর্ব্বে বলিয়াছেন "সম্পূর্ণ রূপে পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া চিরজীবন ধর্ম্মসাধন করিতে হইবে"। এখন বলেন 'প্রকৃত বস্তু লাভ হইলে সর্ব্ব প্রকার সাম্প্রদায়িকতা পদ্ধতি ও আচারগত পার্থক্য স্বতঃই স্খলিত হইয়া পড়ে'। এই মত অবলম্বন করি-য়াই তিনি পৌত্তলিকদিগকে দীক্ষা প্রদান করিতেছেন। ইহা দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের দীক্ষার আদর্শ যে নীচ হইয়া যাইতেছে কেবল তাহা নহে, পৌত্তলিকতা ইত্যাদি কুসংস্কারের প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে। পৌত্তলিকগণ কোন ব্যক্তিকে পৌত্তলি-কতা ও জাতিভেদ পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিতে দেখিলেই উক্ত মত দ্বারা তাহাকে প্রবোধ দিতে ও বিরত করিতে চেষ্টা করেন এবং দৃষ্টান্ত স্বরূপ ঋষি, পরমহংস, দণ্ডী, ব্রহ্মচারী প্রভৃতির নাম উল্লেখ করিয়া থাকেন। পৌত্তলিকগণ এইদূষণীয় মত সমর্থন করেন বলিয়াই চিরকাল জাতিভেদ রক্ষা ও দেবদেবীর উপাসনা করিয়াই জীবন শেষ করেন। আমরা বিজয় বাবুকে জিজ্ঞাসা করি তিনি প্রকৃত বস্তু লাভের পূর্ব্বে জাতিভেদ ও পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করাতে ব্রহ্মলাভের পক্ষে উপকৃত না ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন? ব্রহ্মলাভের পূর্ব্বে কোন ব্যক্তি জ্ঞান ও যুক্তির বলে জাতিভেদ ও পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিলে কি অপরাধী হইবে? জাতিভেদ ও পৌত্ত-লিকতা যে মনুষ্য মনকে নিতান্ত জড় ও সংকীর্ণ করে তাহা কি অস্বীকার করা যাইতে পারে? ব্রহ্মলাভের পূর্ব্বে অসত্য পরি-ত্যাগ করিলে কি উপকার হয় না? যে ভাবে ও যে পরিমাণে আমরা অসত্য পরিত্যাগ করিব সেই পরিমাণে আমাদিগের নিকট সত্যলাভের পথ উন্মুক্ত থাকিবে। কেবল সত্যের জন্য সত্য অবলম্বন করাতেও হৃদয়ের যথেষ্ট উপকার হয়। অবশ্য ব্রহ্ম লক্ষ্য করিয়া অসত্য পরিত্যাগ করিলে হৃদয়ের বল অধিকতর বর্দ্ধিত ও ফল স্থায়ী হয়। যে কোন ব্যক্তি জাতিভেদ ও পৌত্তলি-কতা পরিত্যাগ করে সেই ব্রহ্ম লাভ করিবে এমন মনে করি না। ব্রহ্ম লাভ যাহার লক্ষ্য সে কখনই জাতিভেদ, পৌত্ত-লিকতা, কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস পোষণ করিয়া উহা লাভ করিতে পারিবে না। জাতিভেদ পৌত্তলিকতা যে ব্রহ্মোপা-সনার ভয়ানক কণ্টক তাহা ব্রাহ্মমাত্রেই অবগত আছেন এই দুই বাধা ও অন্যান্য অসত্য পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি যে পরিমাণে ইন্দ্রিয় দমন করিতে পারেন, তিনিই তদনুসারে ব্রহ্মলাভের অধিকারী। ইংরেজী শিক্ষাদ্বারা বিজয় বাবুর হিন্দুসমাজস্থ শিষ্যগণের মধ্যে অনেকের পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদে বিশ্বাস নাই আমরা জানি, কিন্তু প্রকৃত বস্তু লাভ করিলে স্বতঃই ঐ সকল চলিয়া যাইবে, তাঁহারা বিজয় বাবুর এই মতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া—নিশ্চিন্তভাবে বিবেককে প্রবোধ দিতেছেন। এ জীবনে কখনও তাঁহাদের পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ পরিত্যাগের সময় হইবে কি না, তাহা বলা যায় না। বিজয় বাবু বলেন অধিকারীভেদে ধর্ম্ম-প্রচার করিতে হইবে। ইহার অর্থ কি এই যে কোন ব্যক্তিকে সাকার অবলম্বন দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা করিতে এবং কাহাকেও

নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা শিক্ষা দিতে হইবে? ব্রাহ্মধর্ম্মে কি বালক, যুবক, বৃদ্ধ, জ্ঞানী, মূর্খ সকলের সমান অধিকার নহে? অসত্য কি কখনও সত্যস্বরূপকে লাভ করিবার পক্ষে সহায়তা করিতে পারে? গোস্বামী মহাশয় পূর্ব্বে বলিয়াছেন,—"দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা করিয়া কার্য্য করা ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ নহে"। আমরাও তাহাই যুক্তিযুক্ত মনে করি। তিনি বলেন সহসা কোন ব্যক্তির নিকট তাহার গ্রহণ শক্তির অতীত সত্য প্রচার করিলে তাহার হিত অপেক্ষা অনিষ্টেরই অধিক সম্ভাবনা। একথা যুক্তিসঙ্গত নহে। যাহার পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদে বিশ্বাস আছে তাহার নিকট উহার দোষ প্রদর্শন করিলে, সে যদি দোষ বুঝিতে পারে তবে তাহার উপকার হইবে। বুঝিতে না পারিলেও কোন ক্ষতি হইবে না তাহার পূর্ব্ব বিশ্বাসানুসারেই সে চলিবে। যদি ঐ উপদেশ দ্বারা তাহার মনে পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদের উপকারিতা বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়, তাহাতেও তাহার সত্যলাভের পক্ষে সুবিধা হইবে। কারণ "সন্দেহ" আমাদিগকে সত্য অন্বেষণের জন্য ব্যাকুল করে। পৃথিবী গোলাকার এই সত্য কোন বালক ধারণ করিতে পারিবে না বলিয়া কি তাহাকে বলিব পৃথিবী চেপ্টা? কখনই না। কঠিন কঠিন প্রমাণ দ্বারা বালককে পৃথিবীর গোলত্ব না বুঝাইয়া সহজ প্রমাণ দ্বারা বুঝাইব এই মাত্র প্রভেদ। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বোধোদয় পুস্তকে লিখিত আছে "ঈশ্বর নিরাকার" শিক্ষক কি ঐ স্থান বালককে বুঝাইবার সময় বলিলেন "ঈশ্বর সাকার"? বিজয় বাবুর বর্ত্তমান অধিকারিভেদের মত কি একটী নূতন বা আবিষ্কৃত সত্য? এই মতদ্বারা কি ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলসত্যে আঘাত পড়িতেছে না?

বিজয় বাবু বলেন যাহার যেরূপ ধর্ম্মে সরল বিশ্বাস সে তদনুযায়ী সাধন করিতে করিতে কালে সত্য লাভ করিবে। এই মতটী যে নিতান্ত দূষণীয় ও ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্যের বিরোধী তাহা মহর্ষি সংক্ষেপে দেখাইয়াছেন। ইহা দ্বারাও পৌত্তলিকতা ও নানাপ্রকার অসত্যের প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে। এই মত গ্রহণ করিলে ধর্ম্ম প্রচারের আবশ্যকতাই থাকে না। এবং বিজয় বাবু কেন গুরু স্বীকারের জন্য শিষ্যদিগকে বলেন তাহাও বুঝি না। কারণ সরল বিশ্বাসানুসারে সাধন করিতে করিতে ইহকালে না হইলেও পরকালে সত্যলাভ হইবেই। ১৭৯১শকে শ্রদ্ধাস্পদ কেশব বাবু কয়েকটি যুবককে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার সময় বলিয়াছিলেন—"যাহাতে পৌত্তলিক পূজা বিনষ্ট হয় তজ্জন্য চেষ্টা করিবে"? বিজয় বাবুও পূর্ব্বে এই ভাবের ভূরি ভূরি উপদেশ দিয়াছেন কিন্তু এক্ষণে অধিকারিভেদে ভিন্ন রূপ উপদেশ দিতে হইবে বলিতেছেন। বিজয় বাবুর শিষ্যগণের মধ্যে যাঁহারা পূর্ব্বে পৌত্তলিকতার বিরোধী ছিলেন, তাঁহারাও এই মতানুবর্ত্তী হইয়া উহার সমর্থন করিতেছেন। বিজয় বাবুর এই মত দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের উপকার কি অপকার হইতেছে তাহা পাঠকগণ বিচার করিয়া দেখুন। পৌত্তলিকতাকে সাক্ষাৎ কিম্বা পরোক্ষভাবে উৎসাহ দেওয়া কি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকের কর্ত্তব্য? এই মত দ্বারা কি ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যে আঘাত করা হইতেছে না? এটি কি একটী নূতন বা অপ্রকাশিত সত্য? বিজয় বাবু বলেন তিনি সার্ব্বভৌমিক ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। এই কি সার্ব্বভৌমিক ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারতার লক্ষণ? অন্যান্য ধর্ম্মে যে সত্য আছে তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য; কারণ যাহা সত্য তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম; কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারতার অর্থ কি এই যে উপধর্ম্মের মধ্যে যে সকল কুসংস্কার ও আবর্জ্জনা আছে তাহা গ্রহণ করিতে হইবে বিজয় বাবু কোনও পুস্তকে বলিয়াছেন—"জ্ঞান সাপেক্ষ বিশ্বাস ধর্ম্মরাজ্যে যাইবার প্রধান অবলম্বন"। আমাদেরও এই মত। সরল বিশ্বাস হইলেই ধর্ম্মলাভ হইবে তাহা কখনই হইতে পারে না। বিশ্বাস সত্য ও জ্ঞানমূলক হওয়া চাই।

গোস্বামী মহাশয় বলেন "বুদ্ধির অসংশয়তালাভ অনায়াস সাধ্য নয়। মনের সেই উন্নত অবস্থালাভের জন্য বিবিধ উপায় থাকিতে পারে"। আমরা ব্রহ্মজ্ঞান-চর্চ্চাই বুদ্ধির নিঃসংশয়তা এবং মনের উন্নত অবস্থালাভের একমাত্র উপায় মনে করি। প্রাণায়াম অথবা ব্যক্তি বিশেষকে গুরু স্বীকার করিয়া তাঁহার পদসেবা কিম্বা অন্যের দ্বারা শক্তিসঞ্চার ইত্যাদি কার্য্য ঐ উন্নত অবস্থা ও ব্রহ্মলাভের উপায় ও প্রণালী মনে করি না। ব্রহ্মজ্ঞান-চর্চ্চা বিষয়ে ব্রহ্মবিদ্ সাধুব্যক্তিগণ আমাদিগকে সাহায্য করিতে পারেন, কিন্তু আমাদের আত্মার ব্যাকুলতা ও ঈশ্বর কৃপা ভিন্ন তাঁহাদের সহায়তা কখনই স্থায়ী ফল উৎপাদন করিতে এবং আমাদিগকে নিঃসংশয় অবস্থাতে উপনীত করিতে পারে না। ঈশ্বর স্বয়ং আমাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বৃত্তির মধ্য দিয়া অন্তরে প্রকাশিত না হইলে, কোনও মনুষ্যশক্তি কিছুই করিতে পারে না। ব্যাকুল চেষ্টা, সরল প্রার্থনা ও ব্রহ্মকৃপাই নিঃসংশয় ও উন্নত অবস্থা লাভের একমাত্র স্থায়ী উপায়।

বিজয় বাবুর পূর্ব্বমত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া তিনি দোষী তাহা আমরা মনে করিনা। আমরা যাহা পূর্ব্বে সত্য মনে করিতাম এখন তাহা অসত্য বোধ হইলেও কি পরিত্যাগ করিব না? অবশ্যই করিব। তবে কথা এই, বিজয় বাবু বলেন ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে একচুলও সরেন নাই; তিনি সত্য পথেই দণ্ডায়মান আছেন। আমরা তাহা স্বীকার করিনা। তিনি অতিশয় ধার্ম্মিক স্বীকার করি, কিন্তু মনে করি তিনি ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তাঁহার বর্ত্তমান মত, প্রচার ও সাধনপ্রণালী এবং আচরণাদি ব্রাহ্মধর্ম্মের চিরপোষিত মত ও সত্যের বিরোধী ইহাই আমরা এই প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। আশাকরি চিন্তাশীল ব্রাহ্মগণ মতগুলি আলোচনা করিয়া দেখিবেন। দুঃখের বিষয় অনেক ব্রাহ্ম ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য ও মত বিষয়ে আলোচনা করিতে ভালবাসেন না। তাঁহারা বলেন মত লইয়া ব্যস্ত হইয়া থাকিলে কি হইবে? জীবন চাই। আমরাও স্বীকার করি জীবন চাই। কিন্তু বিশুদ্ধ মত সত্যধর্ম্ম লাভের পথ স্বরূপ। মত বিশুদ্ধ না হইলে অসত্যে পতিত হইতে হয়। এ দেশে তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। মস্তক ও হস্তপদ শূন্য মানুষের যে অবস্থা, জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত বিশুদ্ধ মত ব্যতীত মনুষ্য হৃদয়েরও সেই অবস্থা হয়। কোন স্থানে যাইতে হইলে পথ অজ্ঞাত থাকিলে পথিকের যেরূপ অবস্থা হয়, ভ্রান্ত মত পোষণ করিলে সত্যধর্ম্মলাভের পক্ষেও সেইরূপ হইয়া থাকে। কোন স্থানে

যাইবার অভিলাষ না থাকিলে যেমন কেবল পথ জানা থাকিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না; প্রাণে ঈশ্বর লাভের আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে কেবল বিশুদ্ধ মত কাহাকেও মুক্ত করিবে না। কিন্তু পথ জানা থাকিলে কোন স্থানে যাইবার ইচ্ছা হইলেই যেমন তথায় পৌঁছিবার পক্ষে সুবিধা হয়; সেইরূপ অন্তরে ঈশ্বর লাভের আকাঙ্ক্ষা হইলে,বিশুদ্ধ মত আমাদিগকে বিশেষ সাহায্য করে। অতএব ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও সত্যগুলি বিশুদ্ধ রাখিবার জন্য প্রত্যেক ব্রাহ্মের বিশেষ যত্ন করা ধর্ম্মসঙ্গত কার্য্য। কেবল ভজন সাধন ও ভক্তির কথা বলিয়া মত বিষয়ে উদাসীন থাকিলে পবিত্র ও সরল ব্রাহ্মধর্ম্মে নানা প্রকার কুসংস্কার প্রবিষ্ট হইবে এবং কালে ব্রাহ্মধর্ম্মের "বিশেষত্ব" লোপ পাইবে।

শ্রীনবকান্ত চট্টোপাধ্যায়।
ঢাকা।

প্রদেশীয় ব্রাহ্মসমাজ।

রামপুরহাট।

মঙ্গলময় বিধাতার শুভ ইচ্ছায় বিগত ১৪ই ফাল্গুন হইতে ১৭ই পর্য্যন্ত রামপুরহাট ব্রাহ্মসমাজের চতুর্দ্দশ সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। গতবর্ষের মধ্যে স্থানীয় উপাসকেরা যেরূপ শুষ্কতা, অপ্রেম ও শোচনীয় অবস্থা ভোগ করিতেছিলেন, তাহাতে তাঁহাদের উৎসবানন্দ সম্ভোগের আশা অল্পই ছিল। কিন্তু দয়াময় অলৌকিক রূপে উৎসকের মধ্য দিয়া স্বহস্তে তাঁহার স্বর্গের প্রেমান্ন সকলকে ভোজন করাইয়া সকল দুঃখের অবসান করিয়াছেন্। উৎসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

উৎসব উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আসিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন কলিকাতা, বড়বেলুন, বর্দ্ধমান, রাণাগঞ্জ, ধুলিয়ান, পাকুড় প্রভৃতি স্থল হইতে শ্রদ্ধেয় ও শ্রদ্ধের ভগিনী ও ভ্রাতৃগণ আসিয়া যোগ দিয়াছিলেন।

১৪ই ফাল্গুন শনিবার সন্ধ্যার পর শ্রদ্ধেয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় উৎসবের উদ্বোধন-উদ্দীপক উপাসনা করেন। উপাসনান্তে অস্মদ্দেশীয় কোন ভক্তের এবং য়িহুদী সাধু যোবের আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া কঠোর পরীক্ষায় তাঁহারা কিরূপ অটল ভগবদ্বিশ্বাসের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা বর্ণনা করিয়া সুখ সৌভাগ্য, দুঃখ দারিদ্র্যে, শোক অশান্তির মধ্যে কিরূপে ভগবানকে ভালবাসিতে হয়, জীবন্ত বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হইয়া কিরূপে ধর্ম্ম জীবন যাপন করিতে হয়, তাহার উপদেশ দিলেন।

১৫ই ফাল্গুন রবিবার প্রাতে নগেন্দ্র বাবু উপাসনা করেন। তাঁহার উপদেশের ভাব এইরূপ ছিল—সংসার পালন ও ধর্ম্ম সাধন বিভিন্নমুখী বিষয় নহে। বরং ভগবদ্ভক্ত সাধুই সংসারের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝেন। তিনি যেরূপে সংসারের পদার্থ নিচয়কে, শিশুদিগকে, স্ত্রী পুত্রকে, আত্মীয় স্বজনকে, বিষয় ঐশ্বর্য্যাদিকে বুঝেন ও তাঁহাদের মিষ্টতা সম্ভোগ করেন; তিনি যেরূপ কর্ত্তব্য জ্ঞানে সংসারের কার্য্য করেন, তিনি যেরূপ মৃত্যু পর্য্যন্তকেও সুখদ জানিয়া আলিঙ্গন করেন, ঘোর সংসারের কীট তাহার শতাংশের একাংশেরও আস্বাদ পায় না।

এই দিবস অপরাহ্নে বাবু অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় কৃষ্ণপ্রসাদ বসাক ও যুগলকৃষ্ণ সরকারের উদ্যোগানুসারে প্রদেশীয় ব্রাহ্মসম্মিলনের (conference) প্রথম অধিবেশন হয়। বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত ব্রাহ্মগণ পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব বর্দ্ধন ও ধর্ম্ম জীবনের উন্নতি, ও এই প্রদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার জন্য কি কর্ত্তব্য আলোচনা করিয়া প্রস্তাবিত বিষয়গুলি কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টার জন্য সাধারণ পরামর্শে একটী কার্য্যনির্ব্বাহক সভা সঙ্গঠিত করিলেন ও বাবু যুগলকৃষ্ণ সরকারকে ঐ সভার সম্পাদক নির্দ্ধারিত করিলেন। এই সমাজ হইতে অনেক গুলি কাঙ্গালীকে চাউল ও তাহাদের মধ্যে অন্ধ, খঞ্জ ও নিতান্ত নিঃস্বদিগকে বস্ত্র দেওয়া হইয়াছিল।

সন্ধ্যার পর শাস্ত্রী মহাশয় মন্দিরে উপাসনা করিলেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম এই—

এক জন লোক আছেন তিনি আপনার স্ত্রীর প্রতি ভাল ব্যবহার করেন না। স্ত্রীটি সর্ব্বদা ম্লানমুখী হইয়া থাকেন; দাস দাসী সকলের কাছে যেন সে বেচারা চোর। সকলেই তাঁহাকে সামান্য বিষয় লইয়া উচ্চ কথা কয়, অগ্রাহ্য করে, তিরস্কার করে। সকলের কাছে এইরূপে অপমানিত হয়ে পতিকে জানান, পতি তার কিছু প্রতিকার করেন না বরং সময়ে সময়ে সামান্য ত্রুটীতে অপমান করেন। তিনি যে বাড়ীর স্বামিনী সে বাড়ীতে তাঁহার কোন অধিকারই নাই, ইচ্ছামত কোন কাজ করিতে পারেন না, দুইটী পয়সা খরচ করিতে পারেন না। বাড়ীতে যেমন অপর লোক দাস দাসী থাকে তিনি সেইরূপ অল্প স্থানের অধিকারী। আর এক বাড়ীতে দেখা যায় সে ব্যক্তি যখন পত্নীকে ঘরে আনিলেন তখন হইতে তিনি রাজরাজেশ্বরী, তিনি সকলকে আদেশ করেন বাড়ী তাঁর, গৃহের দাস দাসীদের উপর অধিকার তাঁর, গৃহের সকল ঘরে, সকল কার্য্যে, সকল ব্যবস্থাতে তাঁহার স্বাধীন অধিকার। প্রথম গৃহে পত্নীর কোন অধিকার নাই, দ্বিতীয় গৃহে পত্নী গৃহের কর্ত্রী, গৃহস্বামিনী

এই দুই চিত্রের ন্যায় সংসারে দুই প্রকার ধর্ম্মসাধক দেখিতে পাওয়া যায়। এক প্রকার লোক সংসারে ধর্ম্মের প্রভুত্ব স্থাপন করিতে দেন না, ধর্ম্মের অপব্যবহার করেন, ধর্ম্মকে কঠিন নিয়মে বাঁধিয়া অল্পস্থানে অধিকার দেন স্বার্থাদি রক্ষা করিয়া যদি একটু স্থান পান ধর্ম্মকে তাহার অধিকার দেন। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার সাধকের নিকট ধর্ম্ম কর্ত্রী, ধর্ম্ম চারিদিকে ব্যাপ্ত সকল ঘরে যাইতে পারেন। এমন কার্য্য নাই, বিষয় নাই, কুঠরী নাই ধর্ম্ম যেখানে আপন স্থান অধিকার করিতে পারেন না। ধর্ম্মভাব তাঁহার জীবনের সকল বিভাগেই প্রসারিত হয়।

এই শেষোক্ত স্থানেই বাস্তবিক ধর্ম্মের গৌরব রক্ষা

হয়। আমরা মুখে বলি পরমেশ্বর সার বস্তু; ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; একথা যদি বাস্তবিক সত্য হয়, তবে ধর্ম্মকে কি জীবনের সর্ব্ববিভাগের উপর রাজ্য দিব না? একদিকে রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, বন্ধুতা, আত্মীয়তা, মান, সম্ভ্রম, বিদ্যা, বুদ্ধি, সুখ, সম্পদ, আর এক দিকে ঈশ্বরকে রাখিয়া আমরা কি প্রকৃত রূপে বলিতে পারি পরমেশ্বরের সঙ্গে তুলনাতে ঐ সমস্তই তুচ্ছ? মুখে যদি ঈশ্বর সার ও সত্য, কিন্তু কার্য্যে ইহা করি না। ইহার কারণ আমরা যাহা বলি তাহার গুরুত্ব অনুভব করিতে পারি না। আর আবদ্ধ করিয়া রাখিলে ধর্ম্ম ক্রমে নিস্তেজ ও ম্লান হইয়া যায়।

সংসারে মানুষত ধর্ম্মের নাম অনেকে করেন। অথচ ব্রহ্মশক্তি কেন সকল হৃদয়ে আবির্ভূত হয় না। কেনই বা এক হৃদয় নবজীবন লাভ করিল; আর কেহ বা ১০।২০ বৎসর ঈশ্বরের নাম করিয়াও কিছু পাইলনা। তিনি ঈশাকে অনুগ্রহ করিলেন আর একজনকে করেন না কেন, তাহার হৃদয়ে তিনি কেন প্রকাশ পান না, কেন ইহার হৃদয়ে তাঁহার পবিত্রতা জয় যুক্ত হয় না? ইহার কারণ ধর্ম্মকে যিনি যে ভাবে গ্রহণ করেন, তিনি সেই ভাবে পান। যিনি বুঝিয়াছেন ধর্ম্ম সকলের উপরে থাকিবার বস্তু "এষাস্য পরমাগতিরেষাস্য পরমা সম্পদরেষোস্য পরমোলোক এষোস্য পরমানন্দ" ধর্ম্মসাধনে তাঁহারই জীবনে অপূর্ব্ব ফল উৎপাদিত হয়। দশ বৎসর আমি পড়িয়া আছি আর এক ব্যক্তি সে দিন আসিল, সে ব্যক্তির জীবনে কত দোষ দেখিয়াছিলাম, কি আশ্চর্য্য, কি শুভক্ষণে সে যে ঈশ্বরকে ডাকিতে লাগিল! আমরা দ্বারে অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছি, ঈশ্বরের দরজা কেন খোলা হইল না, আর সে ব্যক্তি ডাকিল আর খুলিয়া গেল। প্রাচীরের ভিতরে কত আনন্দ ধ্বনি উঠিতেছে, আমরা ভিতরে যাইতে পারিতেছি না, আর এই সকল লোক দলে দলে ঢুকিয়া গেল। আমি পাপের তাড়নায় মারা যাচ্চি, আমার প্রাণে ঈশ্বরের নাম মিষ্ট লাগে না, কিন্তু ঈশ্বরের নামে ও ব্যক্তির মস্তকের কেশ কণ্টকিত হয়, শরীর লোমাঞ্চিত হয়, চক্ষে আনন্দাশ্রু ঝরে। মানুষে, মানুষে এরূপ প্রভেদের কারণ যিনি যে ভাবে তাঁহাকে ধরেন, তাহার উন্নতি সেই ভাবে হয়।

১৬ই ফাল্গুন সোমবার—উৎসব। প্রাতে নগেন্দ্র বাবু উপাসনা করেন। উপদেশে তিনি বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন যে শরীরের ন্যায় আত্মারও রোগ আছে। প্রথম রোগ অরুচি; ইহাতে হরিকথা, ভগবানের চরণ অর্চ্চনা ভাল লাগেনা কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে পরনিন্দা অসার জল্পনা প্রভৃতি কুখাদ্য মিষ্টবোধ হয়। ২য় রোগ অক্ষুধা;—প্রেম, পবিত্রতা, সাধুবাক্য, রাশি রাশি সম্মুখে রহিয়াছে, আসিতেছে, কিন্তু খায় কে, লয় কে, ক্ষুধা নাই। ৩য় রোগ অজীর্ণতা;—সাধুর উপদেশ, স্বর্গের অন্ন, প্রেম পবিত্রতার কথা কত খাওয়া যাইতেছে কিন্তু এক দ্বার দিয়া প্রবিষ্ট হয় অন্য দ্বার দিয়া চলিয়া যায়। সমস্ত রোগেরই ঔষধ হরিনাম। যত অনিচ্ছা আসুক না কেন বারি বার এই নাম করিতে হইবে। এই নামে প্রেম পবিত্রতা রক্তে পরিণত করিয়াই বলীয়ান হতে হইবে। জীবন অভিনয় স্থল নহে, যুদ্ধক্ষেত্র। পাপের মোহিনীমূর্ত্তি আসিলে মহর্ষি ঈশার ন্যায় জোরে "দূরহ সয়তান" বলিয়া চক্ষারে তাড়াইতে হইবে।

অপরাহ্নে শাস্ত্রীমহাশয় ভাগবত হইতে পাঠ ও ব্যাখ্যা করিলেন। তৎপরে দূরস্থ দুইটী বন্ধুর এই উৎসব উপলক্ষে প্রেরিত সার কথা ও নিবেদন পাঠ হইল। তাহার পর সমাজের উপাসকগণ এক একটী প্রার্থনা করিলেন। অবশেষে সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তন হইল।

সন্ধ্যার পর শাস্ত্রী মহাশয় উপাসনা করিলেন। উপাসনার পর শ্রীযুক্ত বাবু যুগলকৃষ্ণ সরকার ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। দীক্ষিতের প্রতি উপদেশ, ও উৎসব শেষের প্রার্থনার পর যুগল বাবু একটী প্রার্থনা করিলেন। অবশেষে সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তন হইয়া উৎসবের কার্য্য শেষ হইল।

১৭ই ফাল্গুন মঙ্গলবার অপরাহ্নে সম্পাদকের বাটীর বহিঃপ্রাঙ্গণে শাস্ত্রী মহাশয় "ব্রাহ্মধর্ম্ম কি" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। বক্তা বক্তব্য বিষয়টিকে সার্ব্বভৌমিক ও বিশেষভাবে প্রভেদ করিয়া, বিশেষত্বের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের আধ্যাত্মিকতা, স্বাধীনতা, সাম্য, নীতি ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের একতা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, সাহস, বিবেকের প্রাধান্য, সমাজ সংস্কার প্রভৃতি কয়েকটী বিষয়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা ও কর্ত্তব্য অতি প্রাঞ্জল, সারগর্ভ উদ্দীপক ভাব ও ভাষায় বিবৃত করিলেন। বক্তৃতান্তে পুরুষেরা নগর সঙ্কীর্ত্তনে বাহির হইলেন ও মহিলারা মন্দিরে সমবেত হইয়া উপাসনা করিলেন। মহিলাদিগের উপাসনা কার্য্য শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী মাতঙ্গিনী চট্টোপাধ্যায় সম্পাদন করেন।

বরাহনগর।

বরাহনগর ব্রাহ্মসমাজের চতুর্ব্বিংশ সাম্বৎসরিক উৎসবের সংক্ষিপ্ত কার্য্য বিবরণ।

" ১৮ই ফাল্গুন শনিবার প্রাতঃকালে উৎসবের উদ্বোধন উপলক্ষে শ্রীযুক্ত গিরিজা সুন্দরী বন্দ্যোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। মধ্যাহ্নে বোর্ডিং স্কুলের মহিলাদিগের উৎসব হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপ চন্দ্র দাস মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার উপদেশের সারাংশ এই—মীরা বাই একজন অতি প্রসিদ্ধ ধনবানের কন্যা ছিলেন। তাঁহার পিতার বিপুল ধনসম্পত্তি সত্ত্বেও তিনি তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিতেন না। তিনি বুঝিয়া ছিলেন যে ধন সম্পদ প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য সকলই অসার। কেবল একমাত্র পরমেশ্বরই সার এবং শান্তির আলয়। এই জন্য তিনি ভগবানকে পাইবার নিমিত্ত সর্ব্বদা চিন্তা করিতেন এবং সংসারের প্রতি বীতরাগ হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পিতা মনে করিলেন যে মীরার বিবাহ দিলে হয়ত বৈরাগ্যভাব দূর হইয়া যাইবে। এই জন্য সৎপাত্র দেখিয়া তাঁহার বিবাহ দিলেন। কিন্তু মীরার প্রাণ এই ক্ষুদ্র পরিমিত জীবকে বিবাহ করিয়া তৃপ্ত হইতে পারিল না, তিনি চান অনন্ত বিশ্বের পতিকে; কেনই বা ইহাতে তাঁহার প্রাণ পরিতৃপ্ত হইবে? তিনি তাঁহার জন্য পাগল

হইলেন অবশেষে সেই শান্তিদাতা জগৎপতিকে প্রাপ্ত হইয়া শান্তি প্রাপ্ত হইলেন। তিনি সকলকে এই উপদেশটী দিয়া যান—"যদি ভগবানকে পাইতে চাও তবে তাহাতে লেগে থাক. অবশ্য একদিন না একদিন পাইবেই পাইবে।" মহিলাদিগের উৎসব শেষ হইলে, নৈশবিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কয়েকটী সাধুজীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা শ্রমজীবী এবং নৈশবিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া দেন যে যদি মানুষ পরমেশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া চেষ্টা এবং যত্ন করে তাহা হইলে নিশ্চয়ই উন্নতি লাভ করিতে পারে এবং ভবিষ্যতে বড় লোকও হইতে পারে। তদনন্তর ছাত্রদিগকে পারিতোষিক বিতরণ করা হইলে সংকীর্ত্তন হয়। রাত্রে বরাহনগর ব্রাহ্মসমাজ গৃহে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। তিনি এই বিষয়ে উপদেশ দেন "সরল বিশ্বাসী, ভক্ত এবং প্রেমিক না হইলে মনুষ্য সেই অদ্বিতীয় অনন্ত সত্য স্বরূপ ভূমা পরমেশ্বরের উপাসনায় বাস্তবিক অধিকারী হয় না"।

রবিবার প্রাতে বরাহনগর ব্রাহ্মসমাজ গৃহে একত্রিত হইয়া সংকীর্ত্তন করিতে করিতে ইনষ্টিটিউট হলে আসা হয়। সংকীর্ত্তন করিবার উপযুক্ত লোক অত্যল্প হইলেও জগদীশ্বরের কৃপায় সংকীর্ত্তন অতি সুন্দর হইয়াছিল। তৎপর উপাসনা হয় শ্রীযুক্ত বাবু উমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার উপদেশের সারাংশ এই—"যদি মানুষ ধার্ম্মিক ঈশ্বর পরায়ণ হইতে চায় তবে শারিরীক মানসিক এবং বাচনিক এই ত্রিবিধ পাপ হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত ভগবানের নিগট প্রার্থনা, সর্ব্বদা সাধু সঙ্গ, সদালাপ, সদনুষ্ঠান এবং শাস্ত্রাদি পাঠ প্রভৃতি অত্যাবশ্যক। শরীরের যে অবস্থা উপস্থিত হইলে ধর্ম্ম পথে বিঘ্ন আনয়ন করে তাহাই শারীরিক পাপ। মনের যে অবস্থা পাপের দিকে লইয়া যায় তাহাই মানসিক পাপ। এবং মিথ্যাবাক্য, কুৎসিৎ আলাপ, প্রলাপ বাক্য প্রভৃতি বাচনিক পাপ। এই সকল পাপ হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য অভ্যাস চাই। যে পরিমাণে পাপ যাইবে সেই পরিমাণে ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী এবং ধার্ম্মিক ঈশ্বরপরায়ণ হইবে। মধ্যাহ্নে ২৪ পরগণা বান্ধব সভার অধিবেশন হয়, তাহাতে বরাহনগরের শ্রমজীবিদিগের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচার করিবার প্রস্তাব এবং অন্যান্য কয়েকটী বিষয়ের আলাপ হয়। অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র "জাতীয় রোগ এবং তাহার প্রতিকার" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। রাত্রে উপাসনা হয়। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং একমাত্র সত্য স্বরূপ পরব্রহ্মকে জানাই সার, 'যে বিদ্যা দ্বারা তাঁহাকে জানা যায় তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা' এই বিষয়ে মহর্ষি সনৎকুমার ভক্ত চূড়ামণি নারদকে যে উপদেশ দেন তাহাই ব্যাখ্যা করেন।

সোমবার প্রাতে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপ চন্দ্র দাস মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। মধ্যাহ্নে বালিকা বিদ্যালয়ের বালিকাদিগের সম্মিলন। রাত্রে উপাসনা হয় শ্রীযুক্ত বাবু শশিপদ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।

সিলিগুড়ি।

সিলিগুড়ি ব্রাহ্মসমাজের ৮ম সাম্বৎসরিক উৎসব নিম্নলিখিত প্রণালীতে সম্পন্ন হইয়াছে।

৭ই ফাল্গুন প্রাতে উপাসনা হয়, শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপ চন্দ্র দাস প্রচারক মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন, এবং ঈশ্বর নিত্য জাগ্রত হইয়া আমাদের অন্তরে আছেন, 'আমরা জাগ্রত হইয়া তাঁহাকে নিয়া উৎসব করিতে পারি' এই উপদেশ দিয়াছিলেন। সন্ধ্যার পর প্রচারক মহাশয় ধর্ম্মসাধন সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন, বক্তৃতাতে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেন যে ঈশ্বরের আরাধনা, ধ্যান, এবং প্রার্থনা ভিন্ন মানবাত্মা ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হইতে পারে না এবং ধর্ম্ম, সাধন ভিন্ন জীবনে পরিণত হয় না। বক্তৃতা উৎকৃষ্ট হইয়াছিল।

৮ই ফাল্গুন প্রাতেঃ উপাসনা হয় প্রচারক মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম পুস্তক হইতে পাঠ করেন, এই সময়ের উপাসনা, গভীর এবং জীবন্তভাবে হইয়াছিল, ২টার পর হইতে সঙ্গীত আরম্ভ হয়, কিছুকাল সঙ্গীতের পর ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং অদ্বৈতবাদের বিভিন্নতা সম্বন্ধে আলোচনা হয়, মানুষ যে পরিমাণে পাপ করে সেই পরিমাণে নাস্তিক, এবিষয়ও আলোচনা হইয়াছিল। পুনরায় সন্ধ্যার পর উপাসনা হয় প্রচারক মহাশয়ই উপাসনার কার্য্য করেন, এবং ঈশ্বর প্রত্যেক উপাসকের আত্মাতে প্রথম একবার প্রকাশিত হয়েন, পরে উপাসক ব্যাকুল হইয়া না ডাকিলে আর তাঁহার দেখা পায়না, এই বিষয় উপদেশ প্রদান করেন।

৯ই ফাল্গুন প্রাতে সম্পাদকের গৃহে পারিবারিক উপাসনা হয়, এবং সন্ধ্যার পর সমাজ মন্দিরে সাধুজীবন সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া উপাসনা হয়। প্রচারক মহাশয়ই উভয় সময় উপাসনার কার্য্য করেন।

এবৎসরের উৎসব দয়াময়ের কৃপায় অতি মনোহর এবং গভীর হইয়াছিল, ঈশ্বরই যে মানবাত্মার একমাত্র আশ্রয় এবং বন্ধু তাহা স্পষ্টরূপে উপলব্ধ হইয়াছে। ঈশ্বর একমাত্র সার, শান্তি, আনন্দ, ইহা আত্মাতে বিশেষ ভাবে দয়াময়ের কৃপায় অনুভব করা হইয়াছে। দয়াময়ের কৃপা হইলে নরকের কীটও স্বর্গ সুখ পায়।

সংবাদ

গত ১৭ই ফাল্গুন মঙ্গলবার বরিশাল জেলার অন্তর্গত বাগধাগ্রাম নিবাসী চণ্ডাল বংশজ শ্রীআলোকচন্দ্র রায় খৃষ্ট ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহার বয়স অনুমান পঞ্চাশ বৎসর। বরিশালে দীক্ষা কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে। বাবু মনোরঞ্জন গুহ আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন।

বিগত ১৯এ ফাল্গুন ব্রাহ্মবন্ধু সভায় ডাক্তার পি, কে, রায়

লর্ষীর জীবন সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতা শুনিয়া উপস্থিত শ্রোতৃবর্গ উপকৃত হইয়াছিলেন।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে বাবু দুর্গামোহন দাস তাঁহার তৃতীয়া কন্যার বিবাহোপলক্ষে আমাদের বিলডিং ফণ্ডে এক শত টাকা দান করিয়াছেন।

ব্রহ্ম বিদ্যালয়ের সম্পাদক নিম্নলিখিত দান ও পুস্তকের জন্য দাতাদিগকে কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—৫০৲ ব্রাহ্মসমাজের জনৈক হিতৈষী—১০৲ ইংলণ্ড ও বিদেশীয় একেশ্বরবাদী সমাজের সভাপতি সার্ বোলাণ্ড উইলসন—ডাক্তার মার্টিনোর Types of Ethical Theory দুই খণ্ড, এবং বাবু রাধাচরণ শেঠ গণিত ৮ খানা।

ডাক্তার মার্টিনোর ধর্ম্ম বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় একখানি অতি উৎকৃষ্ট নূতন পুস্তক সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। অনেক দিন হইতে উক্ত পুস্তক বাহির হইবার কথা ছিল, কিন্তু ডাক্তারের জীবদ্দশায় উহা বাহির হয় কি না অনেকের আশঙ্কা ছিল। ডাক্তারের বয়স অশীতি বর্ষ। ডাক্তার বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে যে তাঁহার গভীর চিন্তার ফল স্বরূপ উক্ত পুস্তক তিনি সাধারণকে দান করিয়া যাইতে পারিলেন. ইহা সামান্য সৌভাগ্যের বিষয় নহে। পুস্তকখানি ব্রাহ্ম মাত্রেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের ইণ্টারপ্রেটর নামক পত্রিকা কয়েক মাস বন্ধ থাকিয়া নূতন আকারে ও বর্দ্ধিত কলেবরে নিয়মিতরূপে পুনরায় প্রকাশিত হইতেছে।

ইংলণ্ডের একাদশ সহস্র রমণী রবিবার মদের দোকান বন্ধ করিবার জন্য মহারাণীর নিকট আবেদন করিয়াছেন। আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের বর্ত্তমান সভাপতির স্ত্রীর ন্যায় মহারাণী যদি মদ্য পান হইতে একেবারে বিরত হন, মদ্য পান নিবারিণী সভা দ্বারা তাহা হইলে প্রভূত উপকার হয়।

নিউইয়র্ক দাতব্য সভার অধীন দাতব্যালয় সমূহের বাৎসরিক ব্যয় প্রায় তিন কোটী টাকা। উক্ত দাতব্যালয়ের যে সকল সম্পত্তি আছে তাহার মূল্য প্রায় একাদশ কোটী টাকা। ৬০০০০।৬৫০০০ লোক উক্ত দাতব্যালয় সকলে প্রতিপালিত হইয়া থাকে। এই দাতব্যের সহিত আমাদের দেশের দাতব্য যদি তুলনা করি, তাহা হইলে লজ্জায় ও ঘৃণায় মস্তক অবনত করিয়া থাকিতে হয়।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কুষ্টিয়ার ঔষধালয় ও স্কুল গৃহের জন্য ছয় সহস্র এবং ব্রহ্ম মন্দির নির্ম্মাণার্থ এক সহস্র টাকা দান করিয়াছেন। মহর্ষির প্রমুক্ত দানশীলতা কাহার অবিদিত আছে?

৩১নং নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট নিবাসী বাবু ব্রজলাল কুণ্ড সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ব্যবহারার্থ ৫০৲ টাকা মূল্যের একটী আমেরিকান অর্গান প্রদান করিয়াছেন। ব্রজলাল বাবু সভ্য না হইয়াও যে আমাদের সমাজের কার্য্যের সহিত সহানুভূতি করেন, তজ্জন্য তাঁহাকে আমরা হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা অর্পণ করি।

২৮এ ফাল্গুন তিন আইন অনুসারে কলিকাতায় একটী ব্রাহ্ম বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্রের নাম শ্রীযুক্ত বাবু অমরচন্দ্র দত্ত—বয়স ৩১ বৎসর। পাত্র কুমার ময়মনসিংহ বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কার্য্য করিয়া থাকেন। পাত্রী কুমারী হেমমালা দেবী, বয়স প্রায় ১৫ বৎসর—পাত্রী বাগ আঁচড়ার শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল মল্লিকের কন্যা। পাত্র কায়স্থ, পাত্রী পিরলী কায়স্থ। পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।

৭ই চৈত্র জগন্নাথপুরে শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত সরকারের পুত্রের নাম করণ হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। রজনী বাবু উক্ত শুভানুষ্ঠান উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ৩৲ টাকা দান করিয়াছেন।

স্ত্রী জাতির উন্নতি সাধনের জন্য আমেরিকার যুক্ত রাজ্যে পণ্ডিতা রমাবাই যে সভা সংস্থাপন করিয়াছেন, উক্ত রাজ্যের সভাপতি মিঃ ক্লিভল্যাণ্ডের পত্নী সেই সভার সভ্য হইয়াছেন।

আমেরিকার যুক্ত রাজ্যে সর্ব্বশুদ্ধ ত্রিশ লক্ষ স্ত্রীলোক অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকেন, তন্মধ্যে ছয় লক্ষ ক্ষেত্রে ও ছয় লক্ষ চল্লিশ সহস্র কারখানায় কর্ম্ম করেন, ছয় লক্ষ ত্রিশ লক্ষ বস্ত্র ধৌত করেন, চারি লক্ষ অশীতি সহস্র কাপড়ের কাজ করেন; ছয় লক্ষ দরজীর এবং নয় লক্ষ ষষ্টি সহস্র অন্যান্য ব্যবসা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। সার্দ্ধ দ্বি সহস্র নারী চিকিৎসা ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছেন। স্ত্রীজাতির কি আশ্চর্য্য উন্নতি!

কুমারী কর্ণিলিয়া সোরাবজী সম্প্রতি বি,এ পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া আহম্মদাবাদ কালেজের ফেলো ও শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন।

অধ্যাপক মোক্ষমুলর গ্লাসগো বিদ্যালয়ে ২ বৎসরের জন্য ধর্ম্মবিজ্ঞান বিষয়ে বক্তৃতা দিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ তিনি কুড়িটী বক্তৃতা পাঠ করিবেন।

সার মনিয়ার উইলিয়ম্‌স্ এডিনবরায় বৌদ্ধধর্ম্মের উপর ছয়টী বক্তৃতা দিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত ডাক্তার সার মোরেল মেকেঞ্জির খুল্লতাত রেবরেণ্ড মোরেল মেকেঞ্জি পিগেসস নামক জাহাজের আরোহী ছিলেন। ফারন দ্বীপপুঞ্জের সন্নিকটস্থ একটী পর্ব্বতে ঠেকিয়া যখন উক্ত জাহাজ জলমগ্ন হইবার উপক্রম হয়, তখন মিঃ মেকেঞ্জি প্রশান্ত ও নির্ভীক চিত্তে জাহাজের সকলকে একত্র করিয়া পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা প্রার্থনা করিতে করিতে জাহাজ আরোহী সমেত সমুদ্র গর্ভে নিমগ্ন হইয়া গেল।

কলিকাতা ও বোম্বে উভয়স্থানেই রমণী গ্র্যাজুয়েট আছেন। মান্দ্রাজে এপর্য্যন্ত কোন রমণী গ্র্যাজুয়েট হইতে পারেন নাই। মেসেঞ্জর বলেন, যে মান্দ্রাজ খৃষ্টীয়ান কালেজের কর্ত্তৃপক্ষগণ সম্প্রতি তথায় রমণীগণের বি,এ ও এম,এ পর্য্যন্ত শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

মালাবারির জীবনী তাঁহার জীবদ্দশাতেই বাহির হইয়াছে।

শ্রীহট্ট ইউনিয়ানের তত্বাবধানে প্রতি বৎসর যে পরীক্ষা হইয়া থাকে, সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মুসলমান বালিকাদিগকে মিঃ এ এম বসু কতকগুলি পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।